তিস্তাপারের বৃত্তান্ত

দেবেশ রায়

তিস্তাপারের বৃত্তান্ত

অকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

TISTAPARER BRITANTTA
A Bengali Novel By Debesh Roy
Published by Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Calcutta 700 073
Rs.125/

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৫৯

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী
নামপত্র ও মানচিত্র : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত
ভেতরের মানচিত্র : সোমনাথ ঘোষ

দাম : ১২৫ টাকা

ISBN-81-7079-483-8

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে। দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০৭৩
মুদ্রক : স্বপনকুমার দে। দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০৭৩।

উৎসর্গ

নন্দনপুর-বোযালমারির

নিতাই সরকার

ঘুঘুডাঙার

আকুলুদ্দিন

বানারহাটের

যমুনা উরাওনি

গয়েবকাটাব

রাবণ চন্দ্র রায়

এই বৃত্তান্ত তারা কোনোদিনই পড়বে না, কিন্তু তিস্তাপারে জীবনের পর জীবন বাঁচবে

লেখকের অন্যান্য বই

যযাতি
বেঁচে বর্তে থাকা
মফস্বলি বৃত্তান্ত
আত্মীয় বৃত্তান্ত
সময়-অসময়ের বৃত্তান্ত

সূচিপত্র

আদিপর্ব

গয়ানাথের জোতজমি ৯

বনপর্ব

বাঘারুর নির্বাসন ১০১

চরপর্ব

নিতাইদের বাস্তুত্যাগ ও সীমান্তবাহিনীর সীমান্তত্যাগ ১৯১

বৃক্ষপর্ব

বাঘারুর প্রত্যাবর্তন ২৭১

মিছিলপর্ব

উত্তরখণ্ডের স্বতন্ত্র রাজ্য দাবি ৩৪৯

অন্ত্যপর্ব

মাদারির মায়ের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ৪৩৭

পরিশিষ্ট ৪৯৩

দুশ উনিশ

ভু টা ন
নাগরাকাটা
ন্যাশন্যাল হাইওয়ে
তোর্সা নদী
মাদারিহাট
ধূপগুড়ি
তোর্সা নদী
কো চ বি হা র

এক

হাটের পথে

একই হাটে একসঙ্গে দুটো সাইনবোর্ড যাচ্ছে—এ বড় একটা দেখা যায় না।

একটা বেশ লম্বা-চওড়া, বড়, নতুন। হলুদের ওপর কাল, সরকারি সাইনবোর্ড যেমন হয়, শিলমোহর আঁকা, 'কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র'। আরো কী সব। টানতে লোকটির বেশ কষ্ট, একবার ঝুলিয়ে নেয়—কিন্তু তাতে রাস্তায় ঠুকে যায়। বগলেও নেয় দু-একবার—তাতে কাত হয়ে বেড় পাওয়া যায় না। অবশেষে মাথায়। সেটাই সবচেয়ে সুবিধের। এক হাতে মাথার ওপর সাইনবোর্ডটা ধরা, আর-এক হাতে নাইলনের জুতোজোড়াটা ঝোলানো—পেছনের ঝোরা পেরতে খুলতে হয়েছিল, সামনে আছে পায়ে ও ফেরিতে পার-হওয়ার আরো নদী, বার তিন-চার। নাইলনের প্যান্টটাও হাঁটুর তলা পর্যন্ত গোটানো, বেশ ভাঁজ করে-করে, যেন নদীগুলোর জলের মাপের একটা আন্দাজ আছে।

আর একটা সাইনবোর্ড, ছোট। কালর ওপর শাদা—কিন্তু মনে হয় বহুকালের। শিলমোহর আঁকা। বেশ বড়-বড় হরফে, 'হলকা ক্যাম্প'। থলির সঙ্গে বেঁধে পিঠে ঝুলিয়ে বিড়ি খেতে-খেতেই যাওয়া যাচ্ছে। বিড়ি না খেলে আর-এক হাতে করবেটা কী ? ধুতিটা হাঁটুরও ওপরে—নদী-নালা-কাদা-বালি পেরিয়ে যাওয়ার মত। পায়ের নতুন নীল ব্যান্ডের হাওয়াই স্যান্ডেলটার সোল আছে শুধু আঙুলের সঙ্গে খানিকটা। এতটা ক্ষইয়ে দিতে বেশ কয়েক বার নতুন ব্যান্ড পরাতে হয়েছে। পায়ের সঙ্গে এমন ভাবে মিশে গেছে যে খুলে হাতে ঝুলিয়ে নিতে গেলে খসে টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে। পা থেকে খসাতে গেলে, পায়ের পাতাও যেন কিছুটা খসে আসবে। এটা খুললে চলার এই শব্দটা থেমে যাবে। তা হলে আর চলাই যাবে না।

'কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র' এখন তার জুতোজোড়াটাও সাইনবোর্ডটার ওপর ফেলে, দুই হাতে সাইনবোর্ডের দুটো দিক ধরে, বেশ দুলে-দুলে তাড়াতাড়িই ছুটছে—এতক্ষণে যেন সে তার চলার একটা গতি বের করতে পেরেছে। অত বড় সাইনবোর্ডের টিনে ডডং-ডং ডডং-ডং আওয়াজ উঠছে। ওপরে জুতো জোড়াটাও লাফাচ্ছে। তার চলার ছন্দটা বেশ টিন পেটাইয়ের আওয়াজে সব দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। চার পাশ এত নির্জন, আওয়াজ বড় হলে কেমন ছড়িয়ে মিশে যায় বেশ।

চারপাশ নির্জন, শুধু এই রাস্তাটুকু দিয়ে লাইন বেঁধে লোক চলছে। আজ ·· ·স্তির হাট। হাইওয়েতে বাস থেকে নেমে কেউ-কেউ রিক্সাও নেয়। তারপর রিক্সাঅলার সঙ্গেই ছোট-ছোট নালা ঠেলেঠুলে রিক্সা পার করে। ফেরিতে রিক্সাঅলাই নৌকোতে মাল তুলে দেয়। ওপারেও রিক্সা আছে আজকাল। বড়-বড় মালপত্র যাদের, তাদের ত রিক্সা লাগেই। কাটা-কাপড়, গেঞ্জি, লুঙি, শার্টপ্যান্টের দোকানিরা সাইকেলের সামনে ঝুলিয়ে, পেছনে বেঁধে, কাজ সেরে নেয়। কিন্তু আলুর বা এলুমিনিয়ামের বড় দোকানির ত রিক্সা না হলে খরচা বেশি পড়ে যায়—এক রিক্সার মাল কয়েক জনের মাথায়-মাথায় নিয়ে যেতে।

কিন্তু বেশির ভাগই হেঁটে চলে—মাথায় বা বাঁকে বোঝা ঝুলিয়ে। বাসে হাইওয়েতে নেমে, বাসের মাথা থেকে বোঝা নামিয়ে, রিক্সায়-রিক্সায় কয়েক মাইল দূরের হাটে যাওয়ার সুবিধে। কিন্তু যারা দক্ষিণে চকমৌলানি থেকে বা উত্তরে সেই হায়হায়পাথার থেকে টাড়ি-বাড়ি-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে, নদী-নালা পেরিয়ে-পেরিয়ে, বাঁকে বা মাথায় বোঝা নিয়ে, বা গরু-ছাগল তাড়িয়ে-তাড়িয়ে রাস্তা ছোট করতে-করতে আসে, তাদের আর এই পাকা রাস্তাটুকুতে রিক্সার দরকারটা কী। চিলতে রাস্তাটুকুতে যেন নদীর বেগ এসে যায়, একটু তলার দিকের পাহাড়ী নদীর বেগ, হঠাৎ ঘণ্টাখানেকের জন্য একটা বান বয়ে যাচ্ছে যেন। রিক্সাও বেশ ছুটে চলে, হর্নটর্নও দেয়। পায়ের তলায় পাকা রাস্তা পেয়ে বোঝা-মাথায় বা বাঁক-কাঁধে মানুষের পায়েও বেগ এসে যায়। কেউ কারো দিকে তাকায়ও না, কথাও বলে না।

তাড়াতাড়ি হাঁটার বা মাল বইবার ফলে মানুষজনের দ্রুত নিশ্বাসের আওয়াজ শোনা যায়। চার পাশ এত নির্জন যে মানুষের শ্বাস নেয়া-ছাড়ার মত প্রায় নিঃশব্দ আওয়াজও মিশে যেতে পারে না, আলাদা হয়ে থাকে।

কিন্তু হাটে যাবার এখন শেষবেলা বলেই হোক বা এই রাস্তাটুকু পাকা বলেই হোক ভিড়টা ছুটতে থাকলেও কেমন জমাট থাকে। এতগুলো মানুষ একসঙ্গে একই দিকে যাচ্ছে—এতেই ত তাদের ভেতর বেশ একটা মিল পাওয়া যায়। তদুপরি, একজনের মাথায় বড়-বড় অক্ষরে লেখা সাইনবোর্ড আর আর-একজনের পিঠে বহু পুরনো এক ছোট সাইনবোর্ড যেন এই ভিড়টাকে আরো বেশি এক করে দিতে চায়—নিশান আর ফেস্টুনই যেমন মিছিল বানায়।

এখন, এই রাস্তার যে-ভিড়টুকু এদের দুই সাইনবোর্ডে বাঁধা পড়েছে, তার ভেতর দিয়ে হর্ন আর বেল বাজাতে-বাজাতে রিক্সা আর সাইকেল এঁকে বেঁকে বেরিয়ে যায় বটে কিন্তু তার পরেই ভিড়টুকু আবার জমাট। একজন একটিমাত্র ছোট খাশি নতুন দড়ি দিয়ে বেঁধে টানতে-টানতে নিয়ে যাচ্ছে। খাশিটার বোধ হয় আগেই কিছু অভিজ্ঞতা আছে বা ভয় পেয়েছে—এক পা-ও ফেলে না। লোকটিও বেশ নিশ্চিন্ত মনেই তাকে টানে। যেন জানে এভাবেই যথাসময়ে সে হাটে পৌঁছে যাবে। খাশিটা মাঝেমধ্যে রাস্তার ভেতর বসে যাচ্ছে। লোকটা দাঁড়িয়ে পড়ছে। খাশিটাকে টানছেও না, সাধছেও না। খাশির পেছনেই, এদিককার ছোট-বড় সব হাটেরই সেই চা-ওয়ালা ছেলেটি, তার কাঠের বাক্স মাথায়। ওরই ভেতর উনুন-কয়লা চা-বানানোর অন্য সব সরঞ্জাম। খাশিটা বসে গেলেই সে খাশির ঠিক পেছনে ছোট করে লাথি মারছিল আর খাশিটা কয়েক পা দৌড়য়। ছেলেটি কখন হাত বাড়িয়ে একটা কঞ্চি টেনে নিয়েছে। এখন আর লাথি মারতে হয় না, লম্বা কঞ্চিটা দিয়ে যথাস্থানে খোঁচা দিলেই খাশিটা একটু ছোটে। তিনটে ছোট-ছোট মুরগি উল্টো করে ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে লুঙিপরা একজন। মাঝখানে একটি বাচ্চা ছেলের মাথায় বেশ বড় সাইজের কুমড়ো। খুব ছোট টাইট হাফপ্যান্ট, পাতলা নেটের গেঞ্জি, মোজা-কেডস পরে একজন খালি হাতেই চলেছে। যতবার নদী-নালা পার হচ্ছে—ততবার জুতো-মোজা খুলছে আর পার হয়ে, পরছে। এদিকের ন্যাওড়া নদীর পুবের, বাগানের মজুররা ক্রান্তিহাটে খুব একটা যায় না। ক্রান্তিহাটের পশ্চিমে ত প্রায় শুধুই চা বাগান—হাটে তাদের একটা ভিড় হয়। এ হয়ত কোথাও গিয়েছিল, ফিরছে। বা হাটে কারো সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা আছে। তেল কুচকুচে কোঁকড়ানো চুল। পাতলা নাইলনের গেঞ্জির ভেতর থেকে শরীরের রং চিকচিকচ্ছে। তার বেশ ক্যাপ্টেনি মেজাজ—চলনে। এক ঝাঁক হাঁস খাঁচায়। একটা বাঁকের এক দিকে একটা লাউ আর-একদিকে একটা বড় বস্তা ছোট করে বাঁধা। এক জনের মাথায় সের দশেক পাট। ছিটের হাফশার্ট, চেক লুঙি, রবারের পাম্পসু, কাঁধে গামছা, ঘাড়ে-গর্দানে পিঠে-কোমরে বেশ পেটানো মাংস। জোতদার ত বটেই, বেচাকেনার ব্যাপারিও বোধহয়। হয়ত, লোক দিয়ে গরুর গাড়ি ভর্তি করে বেচার মাল পাঠিয়ে দিয়েছে আগেই। নয়ত, কিছু বেচার নেই, কিনতে যাচ্ছে। বা, হয়ত হাট বলেই যাচ্ছে, দর-ভাও জানতে, তেমন কোনো কাজ নেই। ফোতা-পরনে একখানা বেটি-ছোওয়ার মাথায় কলার ডোঙা ভাঁজ করে বানানো পাত্রে মাছ, সারাদিন ডোবায় ধরে এখন বেচতে যাচ্ছে। মাঝারি সাইজের এঁড়ে বাছুর অনেকক্ষণ ধরে আসছে—গলায় নতুন দড়ি। তার মানেই হাট। কিন্তু গোহাটা ত বসে সকাল থেকেই। যারা বেচে আর যারা কেনে তারা সারাদিন ধরেই প্রায় ঘুরে-ফিরে দেখে আর দাম করে আর নজর রাখে, কেউ যেন তার পছন্দটা কিনে না ফেলে। শেষ হাটে আসে চোরাই গরু। দামও পড়ে শস্তা। হাট পর্যন্ত যেতে হয় না অনেক সময়ই। রাস্তা থেকেই বেচা-বিক্রি হয়ে যায়। ক্রান্তির হাটটা অবিশ্যি সেদিক থেকে চোরাই গরু বিক্রির খুব ভাল জায়গা হতে পারত। পুবে হাইওয়ে থেকে দশ মাইল ভেতরে, মাঝখানে এক খেয়া, চার খাল। পশ্চিমে বিশাল আপলচাঁদ ফরেস্ট আর চা বাগান আর পাহাড়ি চড়াই সেই বাগরাকোট কয়লাখনি আর শেভক ব্রিজ পর্যন্ত—কোনো বর্ডার পার করে ময়নাগুড়ি দিয়ে এনে এই রাস্তায় ঢুকিয়ে দিলেই হত। কিন্তু তার পর ? এই চার খাল—এক খেয়া পার হবে কী করে ? 'গরু বেচিতে রাখোয়াল ফক্কা'। তাই বর্ডারের চোরাই মাল আর আসে না। এদিক-ওদিক থেকে দুটো-একটা চোরাই গরু ফরেস্টের ভেতর বেঁধেটেধে রেখে সময়-সুযোগ মত হাটের রাস্তায় এনে বেচে দেয়।

এখন এই রাস্তা জুড়ে সেই শেষ হাটার যাত্রীরা চলেছে—

পয়লা হাটাত দোকানিয়া বেচে

মাঝা হাটাত দেউনিয়া বেচে
শেষো হাটাত ঘরুয়া বেচে।

হাটের প্রথমে ব্যবসায়ীদের বড়-বড় কেনাবেচা শেষ হয়ে যায়। তখনই হাটের সারা দিনের দরদাম ঠিক হয়, পাট-তামাক এই সব কত করে যাবে। আজকাল ধান-চালের ত আর বড় কেনাবেচা হয় না—তার দামও আর এই সব হাটের ওপর ওঠানামা করে না। বড়-বড় কেনাবেচা হযে গেলে গরুর গাড়িতে, আজকাল ত তেমন-তেমন সময় ট্রাকও আসে, মাল সাবাদিন ধরে যেতে থাকে।

হাটেব মাঝবেলায় আসে জোতদাব-দেউনিযা। সংসারের জিনিশও কেনে, চাষ-আবাদের জিনিশও কেনে। আবাব বেচেও দেয় সংসাব আর চাষ-আবাদের নানা জিনিশ। আর একেবারে শেষ হাটে আসে ঘর-গেরস্থালির মানুষ জিনিশ বেচতে—একটা কুমড়ো, একটা হাঁস, চাবটি ডিম, একটা খাশি—এই সব।

এখন এই বাস্তাটুকু দিয়ে সেই শেষ হাট চলছে। চলতে গেলেই লাইন বাঁধা হযে যায়। আর লাইন বাঁধা হযে যায় বলেই আকাশের দিকে ফেবানো 'কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র', আর পিঠে-ঝোলানো 'হলকা ক্যাম্প' যেন এই পুবো লাইনটিবই পরিচয় হয়ে উঠতে চায। যেন, এই পুরো লাইনটাই গিযে ঢুকবে গো-প্রজননের কৃত্রিম ব্যবস্থায বা, সেটলমেন্টেব হলকা ক্যাম্পে।

দুই

ন্যাওড়া নদীর খেয়া

গাছাগাছালি, বনবাদাড়েব ভেতব দিযে-দিয়ে এই পাকা বাস্তাটা শেষ হয়ে যায নদীব পাড়ে। ন্যাওড়া নদী। খেযাটা ছাড়ছে। খেযায উঠতে মাঝখানে আর-একটা হাঁটুজল পেবতে হবে। সবাই সাইনবোর্ড টাঙানো লাইন ভেঙে, গড় গড করে গড়ান বেয়ে নেমে, 'হে-ই' 'হে-ই' করতে-করতে খেয়ার দিকে ছুটে চলে। খাশিটাকে মুহূর্তে লোকটা কাঁধে তুলে নেয আব কাঁধে উঠেই খাশিটা লেজ তুলে নাদি ফেলতে থাকে, যেন অপেক্ষাতেই ছিল। লোকটাও যেন জানতই। কাঁধেব ওপর এমন ভাবে খাশিব চার পা গুটানো যে নাদিগুলো সবই বাইরে পড়ে, লোকটিব গায়ে লাগে না। লোকটির গায়ে নাদি ফেলতে না পেরেই খাশিটা তাবস্ববে চিৎকাব তুলে শবীর ঝাঁকানোর চেষ্টা করে যাতে কাঁধ থেকে ছিটকে যেতে পাবে। কিন্তু লোকটি কাঁধের ওপব দুই হাতে খাশিটিব চাব পা আঁকড়ে লাফিয়ে গিযে খেয়ায় ওঠে। সাইনবোর্ড দুটো নিয়ে লোকদুটিও এমন ছোটে যে মুহূর্তে মনে হয, তাবা বুঝি এই সাইনবোর্ড দুটিই বেচতে যাচ্ছে—হাটে, যেন এখন এই সাইনবোর্ড-বেচাব 'সিজন'।

কিন্তু বড সাইনবোর্ডটা নৌকাব ওপর খাড়া দাঁড় করানো হলে, আর ছোট সাইনবোর্ডটা পিঠেই ঝুলিয়ে লোকটি দাঁড়ালে মনে হয—সত্যিই পুবো নৌকোটা 'কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র' ও 'হলকা ক্যাম্প'।

লোকটা ত ঘাট থেকে নৌকো আগেই ছেড়ে দিযেছিল। এদেব চিৎকারে লগিটা আর ঠেলে নি। এরা পাড়েব জলকাদা ডিঙিযে এসে কোনোবকমে নৌকোয উঠেছে। নৌকোব পাটাতন ভেজাই ছিল। এরা আরো একটু ভেজায। সবাই উঠতেও পাবে নি। কিন্তু লোক বেশি হয়ে যাচ্ছে দেখে মাঝি লগি ঠেলে নৌকোটা সরিয়ে নিয়েছে। লগির আর দু-এক ঠেলাতেই ত ওপারে পৌঁছে যাওয়া যাবে—এতই ছোট নদী। হযত হেঁটেও পাব হওয়া যায় কোথাও-কোথাও। কিন্তু সব জায়গায ত সব সময় এক জল থাকে না। আবাব ওপব থেকে ছোটখাট বানও এসে থাকতে পারে। সেই কারণেই নৌকোয় পার হওয়া।

নৌকোয় সবাইই দাঁড়িয়ে। তাব মধ্যেই এদিককার সবচেয়ে বড় জোতদার নাউছার আলম। ওয়াকফ এস্টেটের মালিক। হাজার-হাজার বিঘার চুকানদার। ডুয়ার্স যখন প্রথম বন্দোবস্ত দেয়া হয় তখন থেকে নাউছার আলমরা এখানকার সব জমির মালিক। খাশ জমির আইন পাশ হওয়ার পর গত পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর ধরে নাউছার আলমের সঙ্গে সরকারের মামলা লেগেই আছে। সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত

অনেকগুলি কেস গিয়েছে, তার অনেকগুলোতে আলম জিতেছে, সরকার হেরেছে। তা ছাড়া অসংখ্য জমিতে ইনজাংশন হয়ে আছে দশ-বার-পনের-বিশ বছর। ইনজাংশনের নিষ্পত্তি না-হওয়া পর্যন্ত সেই সমস্ত জমির ফসল আলমেব গোলাতেই উঠছে। সবকার আলমের জমিব ঘাসও ছুঁতে পাবে নি—এ-রকমই সবার ধারণা। আলমেব জমিব কোনো-কোনো অংশে আধিয়ারবা মাঝে-মধ্যে ভাগ দেয় নি বা সরকারের কাছে জমির পাট্টা চেয়েছে। কখনো পেযেওছে। কিন্তু সাধারণভাবে তেমন ঘটনা খুব বেশি নয়। নাউছার আলম লোকটি বেঁটেখাট। শাদা হাফশার্ট আর ছোট মাপের একটা পায়জামা পরনে। হাতে ছাতা। সবাইই সেলাম দিচ্ছে। নাউছারও তাদের সেলাম জানাচ্ছে। নাম ধরে-ধরে সবার খোঁজখবর করছে। এদিককার বড়-বড সব হাটে নাউছাব কিছুক্ষণের জন্য গিয়ে বসে। সবার সঙ্গে দেখাশোনা খোঁজখবর হয়।

নাউছারের কাছেই, কিন্তু একটু যেন দূরত্ব রেখে, দাঁড়িয়ে যোগানন্দ মন্ত্রী। প্রফুল্ল ঘোষ যখন মাস তিনেকের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিল—প্রথম যুক্তফ্রন্টের পর, তখন যোগানন্দও মন্ত্রী ছিল; বোধ হয় মাস-দুই। তার পর থেকে তাব নামই হযে আছে যোগানন্দ মন্ত্রী। ধুতি আর খদ্দরের পাঞ্জাবি পরে যোগানন্দও ছাতা হাতে দাঁড়িয়ে। নাউছার আলম যোগানন্দকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে, 'মন্ত্রীমশাই, ঐ বড় সাইনবোর্ডে কী লিখা আছে?' যোগানন্দ আগেই দেখেছিল। বলল, 'ঐ হবিযানার বলদেব—'

'ও', নাউছার বুঝে যায়। এ অঞ্চলে সেইই প্রথম 'কৃত্রিম গো-প্রজনন' শুরু করেছিল—তাও বছব কয় আগে। এখন তার বাথানে ত হরিয়ানা ছাড়া অন্য কোনো গরু নেই বললেই চলে। বাসে যেতে-যেতেও ফরেস্টের পাশের জমিতে মোষের সাইজেব গরু চরতে দেখলে অনেকেই বলে দিতে পারে, 'নাউছারের গরু'। নাউছাব আবাব জিজ্ঞাসা করে, 'আব ঐঠে কী লিখা মন্ত্রীমশাই, ঐ যে মানষিটার পিঠত?'

যোগানন্দ বলে, 'কালি থিকা ত এইঠে হলকা ক্যাম্প বসিবে—'

'ও'—নাউছার বুঝে যায়। একটু চুপ কবে থাকে। তারপর যেন আপন মনেই বলে, 'হলকা ক্যাম্পত জমি দিবে আর পশু হাসপাতাল বলদ দিবে, তবে ত মোর এইঠে সোনার সংসার হবা ধরিবে।' কথাটা কেউ-কেউ শুনতে পায়, কেউ-কেউ একটু হাসেও। নাউছারের মাথায় এই দুটো সাইনবোর্ডের ব্যাপারটা খেলে গেছে বলেই সে কথাটা বলে। কথাটার মধ্যে কোনো ঝাঁঝ ছিল না। দূর থেকে একজন একটু চেষ্টা করেই নাউছাবেব নজরে পড়ে, তার পব দূর থেকেই সেলাম জানায়। নাউছার আলম জিজ্ঞাসা করে, 'কী, বিবি হাসপাতালঠে ফিবি আইসছে?' লোকটি হেসে ঘাড় কাত করে। 'বেশ বেশ' বলে নাউছার তার পাশের লোকটিকে কিছু বলতে মুখ ঘোরায।

নৌকো পাড়ে ভিড়ে গেছে। নাউছাবের পাশে পাড়ের দিকে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তারা আস্তে নেমে যায়, নৌকো দুলিয়ে লাফায় না। পেছনে যারা ছিল, তাবাও কেউ হুটোপাটি করে নামে না। নাউছার আলম আস্তে-আস্তে নৌকো থেকে মাটিতে নামে। নেমে নৌকোর দিকে তাকিয়ে হেসে যেন ধন্যবাদ দেয়, 'বুড়া মানষি, আর লাফাঝাপা করিবাব না পাবি, আসেন, নামেন এ্যালায় সব।' ততক্ষণে যে যার মোট তুলে নিয়েছে। সবাই একে-একে নামতে শুরু কবে।

যোগানন্দ পেছনের দিকে ছিল। সে ধীরে-ধীরে নামে। হাটে তার কোনো কেনা-বেচার কাজ নেই। মাঝে-মাঝে হাটে এলে সবার সঙ্গে দেখাশোনা হয়, কথাবার্তা হয়, দেশগাঁয়ের ভাব বোঝা যায়। তা সে কথাবার্তা ত খেয়ানৌকোর ওপরও হতে পারে, নেমে পড়েও হতে পারে।

এ-ছাড়াও অবশ্য যোগানন্দের অন্য একটা ভয় ছিল। যদি নাউছাব আলম তার সঙ্গে চলতে শুরু করে তা হলে ত সে আর-কিছু করতে পারবে না। কিন্তু হাটসুদ্ধু লোক দেখবে যোগানন্দ এখন নাউছার আলমের সঙ্গে হাটে আসে। সেটা সে চায় না। সে নাউছার আলমকে এগিয়ে যাওয়ার সময় দেয়।

কিন্তু পাড়ে উঠে দেখে পাকা রাস্তায় রিক্সার ওপর নাউছাব আলম বসে এদিকে তাকিয়ে। চোখ ফেরানোরও কোনো উপায় নেই। কাছে যেতেই নাউছার বলে, 'কী মন্ত্রীমশাই, আর ত রিক্সা নাই এইঠে, আপনি কি মোর পাকে আসিবেন, নাকি এদিকে কামকাজ আছে—?'

নাউছার আলমও কি তার সঙ্গে যেতে চায় না, নাকি? 'না, আপনি যান, আমার একটু দেরি হবে। খালপাড়াঠে একোজনের আসিবার কথা।'

'আচ্ছা, আচ্ছা।' নাউছার জবাব দিতেই রিক্সাওয়ালা চালাতে শুরু করে দেয়। নাউছার আলম যেন

না—আরো নীচে লতাপাতা এত জটিল আর মাথার আচ্ছাদন এত কঠিন।

এই সব মিলিয়ে এখন যেন চারপাশ থেকে একটা ঢাকনা তোলার মত ভাব। আকাশটা নীল আর রোদটা এত প্রচণ্ড হওয়াতেই এই খোলামেলা ভাবটা ছড়ায় বটে কিন্তু সেই ঢাকনাটা এখনো সরে নি। আকাশ-ভাঙা জল আর মাটির তলার জল—এই দুদিকেই এখন ত জমা জলের পচন। আকাশের জল শেষ হলে মাটির তলার জল টেনে নেবে গাছপালা। এই ভরা বর্ষাতে কি সেই প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গেছে ? বাতাসও কেমন অনিশ্চিত—পুব থেকে কখনো, কখনো-বা উত্তর ঘেঁষাও মনে হয়। রোদও তেমনি অনিশ্চিত—কখনো মনে হয় আরামের আর কখনো মনে হয় শরীরের সব রস শুকিয়ে যাবে। ছায়াও তেমনি, কখনো মনে হয় ঠাণ্ডা, কখনো মনে হয় হিম।

আকাশ-বাতাসের এই দু-রকমের ভাবটা সবচেয়ে বোঝা যায় ধানখেতে। নতুন চারাব কাঁচা সবুজ যেন উঠে যাচ্ছে—সমস্ত ধানখেতের চেহারাই এখন রঙচটা ফ্যাকাশে সবজে। বাতাসে ত ধানখেত দোলেই—এত পাতলা পাতায় ও গোছায় ধানখেত ত প্রায় জলের মতই। কিন্তু সেই দোলায় একটা রঙেরই রৌদ্র ছায়াপাতের প্রবাহ খেলে না, যেন মনে হয় বিবর্ণ মড়া একটা খেত ছড়িয়ে পড়ে আছে। এখন ধীরে-ধীরে খেতের জল শুকোবে। তারপর মাটি শুকোবে। তারপর মাটি খটখটে হবে। আর, সামনের তিনমাসের এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ধানগাছের গা থেকে এই সবুজের শেষ আভাটাও চলে যাবে। বাতাসে ধানগাছের হিল্লোলিত রং দেখেই বোঝা যায় মাটিতে ও বাতাসে তখনো কতটা রস লেগে আছে। এই রস যত শুকোবে—ধানগাছের সবুজ তত ঝরবে। ঝরতে-ঝরতে শেষে আর-এক রঙের দিকে বদলে যাবে। তখন ধানগাছের শরীরের সব রস শুকিয়ে ধানের দুধ ঘন হবে। যত শুকোবে—ধানের দুধ তত জমবে। যত জমবে—ধানগাছ তত হলুদ হবে। যত হলুদ হবে—ধানের ভেতর চাল তত তৈরি হবে। তারপর বাতাস, মাটি ও শরীরের সব জল ঝরিয়ে সমস্ত ধানখেতটা সোনারং হয়ে যাবে। সোনালি হলুদ। ধানখেতের মরণের রোগ। যত শুকোবে তত সোনালি। আর, ধান তত পাকবে। তারপর একসময় সেই রসহীন শুকনো পাতার তুলনায় চালভরা শিষ অনেক ভাবী হয়ে উঠবে, ধানখেত নুয়ে যাবে, নেতিয়ে পড়বে, ধানগাছের মাথায় ধানের শিষ মাটিতে ফিরে যেতে চাইবে আর মাটিতে নোয়াতে পাতাগুলো খড়খড়িয়ে সোজা হয়ে উঠে বাতাসে দুলবে। তখন ধানখেত বাতাসে জলাশয়ের মত হিল্লোলিত হয় না, মাঠময় ছড়িয়ে থাকে—দেখলে মনে হয় ধানখেত নয়—পোয়ালের খেত।

সামনে ফরেস্টটা শেষ হয়ে যায়। ফরেস্টের ছায়ার ভেতর থেকে ওরা সামনে দেখে, ঘাস আর গাছ-গাছালির ওপর সেই পুরনো পরিষ্কার রোদ। যেন সেই রোদের আভাসেই এখানে ফরেস্টের ছায়াচ্ছন্নতাও কেটে যাচ্ছে। ফরেস্টটা পেরিয়ে ওরা বাঁ দিকে ঘোরে—ধানখেত।

ধানখেতের ভেতর দিয়ে সেই রোদে যেতে-যেতে আবার বর্ষাটাকে অতীত মনে হয়, যেন শরৎ শুরু হয়ে গেছে। ডাইনে একটা গাঁ। বাঁশের বেড়ার লাইন আর গায়ে গা লাগানো বাড়িগুলোর পেছন দিক দিয়ে বানানো প্রাকারেই বোঝা যায় মুসলমান পাড়া। গোচিমারি। পাশ দিয়ে ওরা আরো কোনাকুনি এগয়। একটু পরেই তিস্তার ঠাণ্ডা বাতাস। বাতাসটা তিস্তার ওপর দিয়ে আসছে—বাতাসের ঠাণ্ডাটা এমনই তাজা আর টাটকা, যদিও ভেজা। ফরেস্টের ভেতরের বাতাস যে বাইরে আসছিল, সেটাও ভেজা ছিল কিন্তু ফরেস্টের পাশ দিয়ে আসার সময় তার জলীয় তৈলাক্ত ভেজা ছায়াতেও ঘামিয়ে দিয়েছিল, ধানখেতের রোদেও সেটা যেন পুরো শুকোয় নি, অদৃশ্য তিস্তার এক ঝলকেই সেটা মুছে যায়। ওরা আর-একটা সরু পাকা রাস্তায় ওঠে। দলটা ডান দিকে ঘোরে। বিনোদবাবু পেছন থেকে বলেন, 'এইটা চ্যাংমারি হাটের রাস্তা, পেছনে।'

চ্যাংমারিটাও সুহাসের হলকায় পড়বে। সুহাস যা কাজের পরিকল্পনা করেছে তাতে একেবারে শেষে ঐ অঞ্চল ধরতে হবে। এখন যে-লাইনটা শুরু করবে, এর পরে তার তলায় পুব-পশ্চিমে আর-একটা লাইন হবে চ্যাংমারিতে। তখন চ্যাংমারি থেকে আদাবাড়ি, চক মৌলানি, দক্ষিণ চক মৌলানি, দক্ষিণ মাটিয়ালি, ঝাড় মাটিয়ালি, লাটাগুড়ি আর উত্তর মাটিয়ালী—এই মৌজা দিয়ে কাজ শেষ হবে। এগুলো গত সেটেলমেন্টের পর মাল সার্কেলে এসেছে, তার আগে ছিল মাটিয়ালি স্যর্কেলে। সুহাস একটু দাঁড়ায়। বিনোদবাবু তার পাশ দিয়ে এগিয়ে যান। দলের দিকে পেছন ফিরে সুহাস এই রাস্তাটি দিয়ে চ্যাংমারি হাটের দিকে তাকায়। তারপর আবার ঘুরে দলের পেছন-পেছন চলে। একটু যেতেই সামনে

দেখা যায় ফরেস্ট আর তিস্তা—ফরেস্টটা হঠাৎ এক জায়গায় শেষ হয়ে গেছে, সেখান থেকে একটা ঘাসহীন কাদাহীন ভেজা বালির প্রান্তরের মত নদী। বাতাসে জলের গর্জন। আর একটু এগলে তিস্তার স্রোত আর ফেনা দেখা যায়। তখন মনে হয়, তিস্তা ফরেস্টটাকে খাচ্ছে—ফরেস্টের পাড়ে এত ভাঙা জমি আব উপড়নো গাছ।

কুড়ি

তিস্তার পাড়ে জমি জরিপের আয়োজন

সুহাসদের আসতে দেখেই পুরো ভিড়টা দাঁড়িয়ে ওঠে।

এর ভেতর প্রিয়নাথ আর অনাথ পৌঁছে গিয়েছিল। তারা সার্ভে টেবিলটা একটা শালগাছের তলায় পেতে ফেলেছে। তার থেকে একটু তফাতে একটা চেয়ার দেখা যাচ্ছে, খালি, সে-ও গাছতলায়। সেই চেয়াব আর টেবিলের চাব পাশেই নানা বকম মানুষের জটলা। একটু দূরে আর-একটা গাছতলায় গাছে-গাছে এক পলিথিনের চাদর বেঁধে চায়ের দোকান, এদিককার সব হাটেই যে-ছেলেটি চায়ের দোকান দেয়, তার।

জায়গাটিতে এই পার্টি একটা ধাপ ভেঙে উঠল। তার আগে বিনোদবাবু আর জ্যোৎস্নাবাবু ওদের বোঝাটা মাটির ওপর নামিয়ে দিয়েছেন, সার্ভে টেবিলটার কাছে। ওপরে উঠে, জ্যোৎস্নাবাবু আর বোঝায় হাত দিলেন না, নিজের ঝোলানো ব্যাগটা নিয়ে ভিড়ের ঐ দিকেই চলে গেলেন, চায়ের দোকানটা যে-দিকে। হাফশার্ট গায়ে, ধুতি পরা, ক্যাম্বিশের পাম্পসু পায়ে গয়ানাথ এগিয়ে এসে নমস্কার করল, 'আসেন স্যার, আসেন।' তারপর সেই চেয়ারটা দেখিয়ে বলল, 'বসেন স্যাব।' বসতে একটু ইচ্ছে করছিল সুহাসের। উনি বলা মাত্র ঐ খালি চেয়ারটায় গিয়ে বসলে মনে হবে, সুহাস এখানে অতিথি, বেশিক্ষণ থাকবে না, এই ভদ্রলোকই গৃহকর্তা। কিন্তু সার্ভে পার্টিটা ত সুহাসেরই। তার ওপর দ্বিতীয় আর-একটি চেয়ার নেই। বসার প্রয়োজন হলেও, একটু সময় নেয়া ভাল।

বিনোদবাবুর হাত প্রায় যন্ত্রেব মত নিশ্চিত ও ব্যস্ততাহীন। তিনি সুহাসের কাছে কিছু জিজ্ঞাসাও করলেন না লাল সালুর বস্তা খুলে মৌজা ম্যাপটা সুহাসকে দিলেন। তারপর এখানকার খানাপুরী টেকনিক্যাল ম্যানুয়াল খুলে, তার ভেতব এই সেটেলমেন্টের খশড়া ফর্মটা ঢুকিয়ে নিলেন। মৌজার এক নম্বর দাগ থেকে টুকে যাবেন। আব এই জায়গাটাতে ম্যাপিং-এর একটা ঝামেলা আছে। সেই জন্যই কে-জি ওয়ান এখান থেকেই কাজ শুরু করছেন। খাতা আর কম্পাস হাতে বিনোদবাবু দাঁড়িয়ে অনাথ আর প্রিয়নাথকে খুঁজলেন। অনাথকে দেখেই বললেন, 'প্রিয়নাথকে ডাকো, তাড়াতাড়ি শিকল ধরো, এখন রোদ আছে, যতটা পার সেরে রাখো, ঐ, নদীর পাড় বরাবর চেন ফেলো।' বিনোদবাবু সুহাসের কাছে এসে বললেন, আপনি ত ম্যাপটা দেখেছেন। এখানেই ফ্লাডের জন্য একটা নতুন ম্যাপিং করতে হবে। আমি চেইন ফেলছি।'

বিনোদবাবু নদীর দিকে পা ফেললে অনাথ এসে বলল, 'প্রিয়নাথকে ত দেখছি না।' বিনোদবাবু তার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বললেন, 'তাকে কি এর মধ্যেই বাঘে খেল ? তাড়াতাড়ি চেইন ধরতে বলো। বৃষ্টি হলে ত তোমাকে-আমাকে আবার একদিন এখানকার কাজের জন্যেই আসতে হবে। দিন বেশি লাগালে তোমার-আমার কোনো লাভ নেই, অফিসার না হয় অ্যালাউন্স পাবে।'

বিনোদবাবু জানেন প্রিয়নাথ ঐ ভিড়ের মধ্যে মক্কেল ধরতে গেছে। বস্তি বা বড় জোতের কাজে বেশ সময় লাগে, অংশের মামলা থাকে, মক্কেলই প্রিয়নাথকে খুঁজে বের করবে। এখানে তিস্তা নদীর ভাঙন আর শাল গাছের ফরেস্টের মাপামাপি দেখতে ত এসেছে দুনিয়ার 'বনুয়ার দল'—সে রাজবংশীই হোক, আর মদেশিয়াই হোক, আর নেপালিই হোক। সারা তল্লাটে যাদের এক চিলতে জমির কাজ জোটে নি,

আর, এমন-কি ফরেস্টের জমি বেআইনি চাষ করতেও যাদের আসতে হয়েছে এই গাজোলডোবা-সিদাবাড়ির তিস্তার পাড় পর্যন্ত, তাদের ভেতর আব মক্কেল পাবে কোথায় ? এক গয়ানাথ জোতদার। কিন্তু সে ত আর ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকা খুচরো মক্কেল নয়। মৌজা-মৌজা জমিতে তার কারবার। কাজকর্ম ঠিকমত শেষ হলে সবাইকে থোক কিছু দেবে হয়ত। এখানকার কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করে দিতে পারলেই লাভ। প্রিয়নাথ এর ভেতর কোনো দেউনিয়ার কোনো মামলা আছে কি না সেটাই ঠাহর করতে গেছে। নদীর কাছাকাছি থেকে পেছন ফিরে বিনোদবাবু হাঁকেন, 'প্রি-য়-না-থ।' তাঁর আওয়াজটা তিস্তার হাওয়ার আওয়াজে ঢাকা পড়ে যায় বটে, কিন্তু তাতেও সুহাস পর্যন্ত একটু চমকে যায়, বিনোদবাবুর গলার এতটা জোর দেখে। মৌজা ম্যাপটা খুলে সুহাস চেয়ারটার দিকে এগয়।

'স্যার, একটা কথা ছিল স্যার, কথা না হয়, অনুরোধ, অনুরোধ ছিল স্যার'—সেই ভদ্রলোক।

'এই স্যার, জরিপ মানে সার্ভে ত আপনার স্যার রোজই হওয়া লাগিবে। অনেক টাইম ত লাগিবেই স্যাব কিন্তুক এই রোজ-রোজ কি এই টেবিল আর খাতাপত্র স্যার আপনাদের পক্ষে, আপনার না স্যার, কিন্তু উনাদের পক্ষেও টানাটুনি করা উচিত স্যার ?'

'সে আর কী করা যাবে, সার্ভে করতে হলে ত এ-সব লাগেই', ম্যাপটার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে সুহাস চেয়ারটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

'সেটা বিষয়েই আমার স্যার একটা অনুরোধ রাখার ছিল। সেটা আমাদের ত এইটা কাজ এটা ত আপনাকে মানিতেই লাগে স্যার', সুহাস যখন চেয়ারটায় বসতে যাচ্ছে গয়ানাথ বাধা দিয়ে বলল, 'বসিবেন না স্যার, কনেক থামেন।'

সুহাস ম্যাপটা বেশ মন দিয়ে যাচাই করছিল। এর পর এই ম্যাপের ওপরই নতুন ম্যাপের লাইন কোথা দিয়ে টানা হবে সেটা বের কবার আগে আউটলাইনটা দেখে নিচ্ছিল। খুব সুবিধে হত, যদি ঠিক এই সেকশনটার একটা এনলার্জড আউটলাইন আঁকা থাকত। লোকটার কথায় সে একটু চমকে চোখ তুলতেই চিৎকার উঠল, 'হে-ই বাঘারু।' যে-ভিড়টা ছড়িয়ে-ছিটিযে ছিল, তার , ভতর থেকে একজন এসে দাঁড়ায়। সুহাসের দুই হাতে ম্যাপ মেলা—নীল কাগজের ওপর শাদা রেখার। আর এই লোকটিই যেন আর-একটা ম্যাপ—বিলিফে আঁকা, এমন নিষ্প্রাণ বস্তুর মত সামনে এসে দাঁড়ায়। তার মাথা থেকে পা শাল-সেগুনেব দীর্ঘ কাণ্ডেব মত অনিয়মিত, বর্ণশূন্য ও রুক্ষ। চোখদুটো কোন গভীরে—মণি দেখা যায় না। নাকটা থ্যাবডা। পরনে একটি নেংটি—তার রংও গায়ের রংয়ের সঙ্গে মিশে আছে। গয়ানাথ এত জোরে চিৎকার করে উঠেছিল, যেন ফরেস্টের ভেতর থেকে বনমোরগের ডাক। আর এই লোকটি এসে দাঁড়িয়ে পড়াব পর, দাঁড়িয়ে থাকার পর, বোঝা যায় তাকেই ডাকা হয়েছে।

'চেয়ারখান মুছি দে।'

সুহাসকে আবার সেই হাফশার্ট-পরা লোকটার দিকে তাকাতে হয়।

'ঠিক আছে', বলে সুহাস চেয়ারটায় বসে পড়ে—চেয়ারটা তা হলে এই লোকটিই আনিয়ে রেখেছে—আর দুই হাঁটুর ওপর ম্যাপটা মেলে ধরে। তখন সুহাস টের পায়, সে বসে পড়া সত্ত্বেও ঐ রিলিফ মত লোকটি চেয়ারের মাথা, পেছন দিকটা, পায়াগুলো হাত দিয়ে-দিয়ে মুছে যাচ্ছে। শুকনো কাঠের সঙ্গে তার শুকনো হাতের ঘর্ষণে খসখস আওয়াজ উঠছে।

'তাই স্যার এই টেবিল শিকল এ-সকল স্যার আমার লোকজন নিয়ে ঠিক জায়গায় গোছ করি রাখি দিবে। আর রোজ-রোজ আনি দিবে। আর এই খাতাগুলা আনার জন্য একটা মানষিক সকালে আপনার ক্যাম্পত পাঠাম।'

সুহাস আর মুখ তুলে তাকায় না। সে একটা পেন্সিল দিয়ে তিস্তার পাড়টার যে-অংশটুকু আজকের ব্যাপার, তাকে চিহ্নিত করে।

'স্যার, এই স্থানে আমাদের একোটা সুনাম-খ্যাতি আছে, হাকিম-অফিসার-নেতাগণকে আমরা সেবা করিয়া থাকি। স্যালায় আপোনাকে এই নিবেদন।'

গয়ানাথ থামার পরে সুহাস বোঝে সে থেমেছে, সুহাস চোখ তোলে না। কিন্তু চোখ না তুলে বুঝতে প্যারে না লোকটি আছে না চলে গেছে।

একটু পরেই সুহাস বুঝতে পারে যে লোকটি যায় নি। সে একবার সোজা তাকিয়ে দেখে নেয়—দূরের লোকজন আর তার মধ্যে এই লোকটিই একমাত্র দাঁড়িয়ে। সুহাসের একবার ইচ্ছে হয়,

লোকটিকে চলে যেতে বলে। কিন্তু বলতে গিয়েও থেমে যায়। সুহাস যেন একটু রেগে থাকতে চাইছে—এটা বুঝে সুহাসের নিজেবই ভাল লাগে না। লোকটি ত এখনো পর্যন্ত আপত্তিকব কিছু বলে নি, সে মিছিমিছি বিরক্ত হচ্ছে কেন? সুহাস আবার ম্যাপের ওপর ঝোঁকে।

'স্যার'—লোকটিব গলা। কিছুক্ষণ কেটে যায়। লোকটি আবার ডাকে, 'স্যার।'

সুহাস ঘাড না তুলে বলে, 'বলুন না, বলে যান, শুনতে পাচ্ছি।'

'হ্যাঁ স্যার, আমাদের উচিত নয় আপনাকে বাধা দেয়া—'

সুহাস ঝোলানো ঘাড়টাই দোলায়। কিন্তু থামে না, দুলিয়েই যায়। লোকটি আব-কোনো কথা বলছে না দেখে সুহাস মাথাটা দুলিয়েই যায়। আব ম্যাপটাব দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে সে ম্যাপটাকে এতটাই আত্মসাৎ কবতে চায যেন এব পর সে ম্যাপ না দেখে জমি চিনে নিতে পাবে।

'আপনার সুবিধাব জন্যে স্যাব, এইটুকু সুযোগ আমাদেব দিবা নাগিবেই'—

একটু নীরবতার পর লোকটির গলা যেন অভিমানী হযে ওঠে, 'ই ত স্যার, আমাদেব অঞ্চলেব অপমান।'

সুহাস মনে-মনে কৌতুক বোধ কবে—হাকিম এমনই জিনিশ যার সঙ্গে মাতৃভাষায় কথা পর্যন্ত বলা চলে না। সুহাস চোখ তুলে তাকিয়ে দেখে, নদীর পাডে অনাথবাবু শেকলেব একদিক ধবে দাঁড়িয়ে আছে, আর-একদিক নিশ্চযই তিস্তার পাড় ধরে বনেব মধ্যে গেছে। বিনোদবাবু বোধহয ঐ দিকেই। [illegible] চেয়ার থেকে ওঠে। ঐ লোকটি এখনো বসে-বসে চেযাবেব পাযা মুছে যাচ্ছে। সুহাস নদীব [illegible] দিকে যায়।

একুশ

গাছের ডগায় মৌজা ম্যাপ

অনা[illegible] ছাড়িয়ে নদী[illegible] আরো কাছে সুহাস তিস্তার পাড় ধরে সোজা উত্তরে তাকায। এখন এই পাড়টা রাইট এ্যাঙ্গেলে উত্তরে গেছে। সুহাস যেখানে দাঁড়িয়ে সেই ফবেস্টটা মৌজা ম্যাপে জে-এল নাম্বাব ৮৭ আর ৮৮-ব সিদাবাড়ি-গোচাবাড়ি বর্ডাব লাইন থেকে উত্তরে, একটু পুবে সবে আসা। এখানেই এখন নদী। এর সরাসরি পশ্চিমে ছিল—এই সিদাবাড়ি-গোচাবাড়িরই একটা অংশ আর আপলচাঁদের একটা ছোট ছিট। আর তার উত্তবে এই সার্কেলেব সবচেয়ে বড় জে-এল ৮৪ নম্বব আপলচাঁদ ফরেস্ট।

তার পশ্চিমে ৮৫ নম্বর গাজোলডোবা, ও তারও উত্তরে মৌজা হাঁসখালিরই ২১ নম্বর জে-এল। এই ২১ নম্বর জে-এল থেকে ৮৪-নম্বরের পশ্চিম সীমা, ৮৫ নম্বর গাজোলডোবা ও সে যেখানে দাঁড়িয়ে তারও বাঁয়ের, পশ্চিমের, সিদাবাড়ি গোচাবাড়ি—সবটাই এখন তিস্তার ভেতরে। এব তলায় ৮৬ নম্বরে আপলচাঁদের একটা ছিট ছিল, সেটুকুও ম্যাপ থেকে বোঝা যাচ্ছে—যদিও সেটা অন্য মৌজার। কিন্তু তারও নীচে এই ৮৪-রই আরো একটা একটুখানি ছিট ছিল। তা হলে এখন যেটা ৮২ নম্বব উত্তর আর ৮৩ নম্বর দক্ষিণ হাঁসখালি তারও উত্তরে, আপলচাঁদেরও উত্তরে ছিল আসল হাঁসখালি। আবার এখনকার এই সব জোতের নীচ পর্যন্ত ছিল আপলচাঁদ। নইলে একই জে-এল নম্বরের মাঝখানে এত জোত এসে যায় কেমন করে? মৌজা ম্যাপটা মাটির ওপরই মেলে ধরে তার ওপর উবু হয়ে বসে সুহাস বড় হাঁসখালির ২১ নম্বরে, ৮৫ নম্বরে, ৮৬ নম্বরে ৮৭ ও ৮৮ নম্বরের পশ্চিম অংশে একটা করে ঢেবা মারে। ৮৭ ও ৮৮ নম্বরের পুবে একটা লম্বা দাগ দেয়। এর পর একটা রাস্তা আছে—সোজা আপলচাঁদের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে। এই গ্রামগুলো যদি বাতিল হয় তা হলেই একটা নতুন আউটলাইন বেরিয়ে আসে। কিন্তু নদী ত আর জে-এল নম্বর ধরে-ধরে ভাঙে নি। তাই ৮৪ নম্বরের পশ্চিম সীমাটা তাকে সাব্যস্ত করতে হবে।

এক-একটা ঢেরায় এক-একটা গ্রামের হিশেব চুকিয়ে, সুহাস ম্যাপটা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই

তিস্তার ভেতর থেকে এক হাওয়াপ্রপাত ঘটে যায় যেন, আর তার হাত থেকে অত বড় ও ভারী মৌজা ম্যাপটা একটা ছেঁড়া কাগজের মত উড়ে যায়। 'হে-এ-এ' বলে একটা চিৎকার করে উঠে ম্যাপটার পেছনে সুহাস ছোটে। ম্যাপটা তখন লাট খেয়ে মাটিতে পড়েছে। অনাথ শিকল ফেলে দিয়ে ম্যাপটা ধরতে ছোটে। কিন্তু সে ম্যাপটার ওপর পড়ার আগেই আবার ম্যাপটা উড়াল দেয়, এবার আর সোজা নয়, কোনাকুনি ভাবে ওপরে গাছের মাথার দিকে, প্লেনের আকাশে ওড়ার মত। তখন সুহাস দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু অনাথ হাত তুলে ধরতে চেষ্টা করছে। ম্যাপটা যেন কোনো ওস্তাদের লাটাইয়ের সুতোয় বাঁধা ঘুড়ি, এমন নিশ্চয়তায় আরো ওপরে উঠল ও একটা মাঝারি সাইজের ডালের খাঁজে সেঁদিয়ে ঝুলতে লাগল। এতক্ষণের অলস ভিড়টা যেন মুহূর্তে প্রাণ পেয়ে সবাই মিলে ঐ ম্যাপের পেছনে ছুটছে। সুহাসও ভেবেছিল, বাতাসের দমকাটা চলে গেলেই ম্যাপটা ঝুপ করে পড়বে। কিন্তু পড়ল না। সুতরাং আর-একটা দমকায় গাছ থেকে ওটাকে ফেলে দেবে এই আশাই অগত্যা করতে হয়।

এখন নদীর পাড়ে, নদীর দিকে পেছন ফিরে সুহাস। তার সামনে একটু দূরে সার্ভে টেবিল। তার থেকে একটু দূরে গাছতলায় সেই চেয়ার। তার থেকেও একটু দূরে, বাঁয়ে এই সমস্ত ভিড়টা গিয়ে জমা হয়েছে এক গাছের নীচে। সুহাস আঙুলে ধরা পেন্সিলের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে। তারপর নিজের বোকামিটাই আরেকবার দেখতে একটু আনমনায় দিগন্তের দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ধূসর জলভূমির দিকে তাকায়। তার ওপর দিয়ে যেন শুধু বাতাসই বয়ে আসছে—ধারাবাহিক কিন্তু প্রবলতর। 'হে এ বাঘারু'—চিৎকারে যেন আবার মোরগ ডেকে উঠল। সুহাস আবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে, গাছতলায় সেই ভিড়টার পেছনে সেই খাটো, রোগা, শুকনো লোকটা চিৎকার করছে। তার চিৎকারে ভিড়ের ভেতর কী আন্দোলন হয় সুহাস দেখতে পায় না। কিন্তু কিছু-একটা হচ্ছে, অনুমান করে। একটু এগিয়ে যেতেই লোকটি তার পাশে এসে বলে, 'স্যার, বাতাসটা বেশি ত, পাড়ি দিছি।' সুহাস দেখে, একটা লোক তরতর করে গাছটাতে উঠে যাচ্ছে। সে কি সেই লোকটিই, যে চেয়ার মুছছিল ? এ-লোকটি যেন সেরকম ভাবেই ডাকল।

যে গাছে উঠছিল সে ত এমন ভাবে গাছে ওঠে যেন হাঁটার চাইতেও গাছে ওঠার অভ্যাসই তার বেশি। কিন্তু সে ডালের খাঁজ থেকে ম্যাপটা বের করেও বুঝে উঠতে পারে না, ম্যাপটা নিয়ে কী করবে। সে যদি ওপর থেকে ছেড়ে দেয় তা হলে ত বাতাসে আবার উড়ে যাবে। সে যদি হাতে ধরে নামতে যায় তা হলে গাছের ঘসায় ম্যাপ ছিঁড়ে যেতে পারে। কিন্তু সুহাস, তার পাশের সেই হাফশার্ট-পরা লোকটি, আর গাছতলার ঐ ভিড়টা সমস্যা বুঝতে পারলেও লোকটি তা মেটাবার জন্য কিছুই করে না। সে একহাতের ঘেরে নিজেকে গাছটার সঙ্গে সেঁটে রাখে, আর-এক হাতে ম্যাপটা ধরে থাকে। বাতাসের ধাক্কায় সেখানেই ম্যাপটা ফরফর করে।

'হে-এ বাঘারু মুখত ধরি নামা কেনে, মুখত ধরি নামা।'

লোকটি যেন জানতই এ-রকম কোনো নির্দেশ আসবে। মুহূর্তের ভেতর সে অতবড় ম্যাপটা দাঁতে চেপে ঝুলিয়ে সড় সড় করে নেমে আসতে শুরু করে—যেন বাতাসের বেগে গাছটাই কাত হয়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে—ডালেপাতায় পাখির বাসা, পিঁপড়ের ডিম, এমন-কি সাপখোপ সবই। মাটিতে পৌঁছনোর আগেই ম্যাপের একটা কোনা মাটি ছোঁয়। লোকজন সেটা ধরে নেয়। লোকটা দাঁতের কামড় ছেড়ে দেয়। আর অন্যরা ম্যাপটা ধরে সুহাসের দিকে যায়। কিন্তু সুহাসের কাছে পৌঁছনোর আগেই সেই শার্টপরা লোকটা নিয়ে নেয়। তারপর সে সুহাসের দিকে হেঁটে এসে, ম্যাপটা দিয়ে বলে—'চাপি ধরি রাখিবেন, বড় বাতাস,' যেন ম্যাপটা তার প্রীতি-উপহার। নদীর কাছে সার্ভে টেবিলের পাশে সুহাস, আর, ঐ দিকে ভিড়, তারও পেছনে লোকটা কোথায় দেখা যায় না—যে গাছে উঠেছিল। ঐ ভিড় আর সুহাসের মধ্যে এই হাফশার্ট-পরা লোকটা সংযোগ স্থাপন করে যায় যেন। কিন্তু এই লোকটা কে ? কোনো-এক জোতদার ত বোঝাই যাচ্ছে। তালটা কী ?

বাইশ

জঙ্গলের ভেতরে

ফরেস্টের ভেতর থেকে প্রিয়নাথ বেরিয়ে আসে, 'স্যার, একটু ওদিকে চলেন, বিনোদবাবু দাঁড়িয়ে আছেন।'

'হ্যাঁ, চলুন,' প্রিয়নাথের সঙ্গে শালবনে ঢুকতে-ঢুকতে সুহাস হেসে বলে, 'ম্যাপটা হাত থেকে উড়ে গিয়েছিল।'

'যে বাতাস ! আমাকে দেন স্যার,' প্রিয়নাথ হাত বাড়িয়ে ম্যাপটা নেয়। সুহাস দেখে সেই শার্টপরা লোকটিও তার সঙ্গে চলেছে। একবার ভাবে বলে দেয়, আপনি কেন আসছেন। কিন্তু বলে না। দরকার কী। ওর সঙ্গে যখন কোনো মাপামাপির ব্যাপারে লাগবে তখন দেখা যাবে। কিন্তু তখনই-বা দেখা যাবে কেন ? সুহাস ভেবেই নিচ্ছে কেন, লোকটি কিছু একটা বদ মতলবে ঘুরছে। সন্দেহটা সুহাস মন থেকে সরাতে চায়। কিন্তু মনে লেগে থাকে। আর সে-কারণেই যেন সে থেমে, ঘুরে লোকটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে বসে, 'আপনারা ত এখানকার অনেক দিনের ?'

প্রশ্নটি শুনে প্রিয়নাথও থেমে যায়, লোকটিও থেমে যায়। প্রিয়নাথ একটু অবাক হয়ে সুহাসের দিকে তাকিয়ে থাকে। মাত্র ত এই কয়েক পা এসেছে—কিন্তু এতেই সুহাসের মনে হয় যেন ফরেস্টের কত ভেতরে। তিস্তাও দেখা যাচ্ছে না। তাদের সেই মাপামাপির জায়গাও না।

আর চারপাশে বর্ষার ফরেস্টের ঘন সবুজ জঙ্গলের ঘের। শালগাছের কাণ্ডময় গভীর শ্যাওলা। এই সবের ভেতর ওরা, দুজন থেমে যাওয়ায় সুহাসকেও থামতে হয়।

প্রিয়নাথ জিজ্ঞাসা করে, 'কে স্যার ?'

সুহাস বলে, 'না, আপনাকে নয়, ওঁকে জিজ্ঞাসা করছি, আপনারা ত এখানে অনেক দিনের ?'

প্রিয়নাথ না নড়ে বলে, 'উনি ত স্যার গয়ানাথ জোতদার।' কথাটা শোনাল যেন 'স্যার'টা গয়ানাথের উপাধি। শুনে গয়ানাথ তার দুই হাত বুকের কাছে তুলে নমস্কারের ভঙ্গিতে ঘাড় নুইয়ে থাকে, যেন এখানে সুহাস আর প্রিয়নাথই শুধু নয়, বেশ অনেক লোক আছে, যেন এই গাছগাছড়ার কাছেও তার এই পরিচয়ের একটা অর্থ আছে। ভঙ্গিটা প্রায় অপরিবর্তিত রেখে গয়ানাথ বলে, 'হয়। মুই গয়ানাথ।' লোকটি বোধহয় এই প্রথম তার নিজের ভাষাতেই সম্পূর্ণ কথাটি বলল। সুহাসের চোখেমুখে এই কথার কোনো অর্থ ধরা না পড়লেও সে বলে, 'ও ! আচ্ছা।' তারপর পা ফেলে।

গয়ানাথ কিন্তু সুহাস আর প্রিয়নাথের পেছনেই থাকে, পাশে আসে না। সেখান থেকেই জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি, স্যার কী বলিছিলেন ?'

'আপনারা ত এখানে অনেক দিন আছেন ?'

'হ্যাঁ স্যার। আমরা ত এইখানেই থাকি।'

'না। তা ত বটেই। কিন্তু ছোটবেলাতেও কি এখানে ছিলেন ? মানে তিস্তা কি বরাবরই এ-রকম কাছাকাছিই ছিল ?'

'তিস্তা ত স্যার, আটষট্টি সনটাক যদি বাদ করি ধরেন, তা হলে ধরেন একখান বলা যায়—' গয়ানাথ সুহাসের প্রথম প্রশ্নটার কোনো জবাব দেয় না।

'মানে, আটষট্টির ফ্লাডেই সবটা বদলাল ?'

'না, সে ত বদল হয়ই, নদী ত আর মানষির দালানবাড়ি না-হয়, যে, একেবারে পাকা থাকিবে, নড়চড় না হবে। বদল ত হয়ই—হওয়া নাগে।'

সুহাস ওঁর কাছে আসলে জানতে চাইছিল সে ম্যাপের সঙ্গে মিলিয়ে যে-বদলটা দেখছে তার কতটা এঁদের চোখে দেখা। কিন্তু গয়ানাথ অত দার্শনিকতায় পৌঁছে গেছে দেখে সে আর কথা বাড়ায় না। গয়ানাথের যেন খানিকটা প্রতীক্ষা ছিল, সুহাস কিছু বলবে, সেটুকু জুড়ে তীক্ষ্ণতর ঝিঁঝির ডাক আর প্রতিধ্বনিত তিস্তার গর্জনে এই ফরেস্টটা আরো ঘন ও নীরবতা আরো প্রসারিত হয়।

গয়ানাথ যেন আত্মচিন্তার মতই আবার যোগ করে, 'কিন্তুক আবার নদীর ত একটা পাকাপাকি ভাবও

আছে। অ, যতই ভাঙুক আর সরুক স্যার শ্যাযম্যাস একটা ঠিকই হয়। ধরেন—'

গয়ানাথ একটু থামে। কী উদাহরণ দেবে সেটি তাকে একটু ভাবতে হয় যেন। আর সুহাসও একটা অনুমানের চেষ্টা করে—গয়ানাথ তার নিজের কয়েক বছরের কোনো দেখাকে যেন একটা পাকা সিদ্ধান্তের মত করে বলছে। নদীর পাড় একেবারেই বদলে যায়, নদী পুরনো খাতে আব ফিরে যায় না, এমন ঘটনা গয়ানাথ দেখে নি, কিন্তু তাই বলে ত সেটা মিথ্যা নয়। সুহাস যেন বুঝে যায়, গয়ানাথের কাছে তার ম্যাপের সাক্ষ্যের যে-সমর্থন চাইছিল তা পাওয়া যাবে না।

এই নীববতায় তারা ভেজাপচা পাতার ওপর দিয়ে চলে যায়। সুহাস প্রিয়নাথকে জিজ্ঞাসা করে, 'কোথায় ?' প্রিয়নাথ কোনাকুনি হাতটা তুলে একটা আন্দাজ দেয়। সেই সময় গয়ানাথ বলে, 'ধরেন, এই আটষট্টির বানাটাই ধরেন। তিস্তা ত, ধরেন, এইখান থিকা সোজা বাঁয়ে ঢুকে, ধরেন, তিস্তা আর ধরলার মাঝখানে যে বিশাল তেকেনিয়া জায়গাখান, ঐটাকে ভাঙ্গি-ভাসি চলি গেল। আমরা ভাবিলাম, এই হইল, এখন থিকা ধরলার খাতখান তিস্তার খাত হয়্যা যাবে। কিন্তু তিস্তা ত আবার তার পুরানা খাতেই ফিরি গেল। এখনো যাছে।'

এই একটু আগে যে-জায়গাগুলিকে ম্যাপ থেকে বাদ দেবে বলে ঢ্যারা কেটে এসেছে সেগুলোর কথা মনে রেখে সুহাস বলে—'কিন্তু আপনাদের ত কত গ্রাম ভেসে গেছে।' নামগুলো তার মনে পড়ে না। যেটা মনে পড়ে, সেটাই বলে, 'এই ফরেস্টেরই ত অনেকখানি ভেসে গেছে। এর উত্তরে হাঁসখালি।'

'কিন্তু স্যার, নদী মানেই ত ভাঙাভাঙি। যাব পার ভাঙে আর নতুন পাড হয, সেইটা হয় নদী। আর যার পাড় ভাঙেও না নতুনও হয় না, ঐটা হয় ডোবা।'

নদীর এই সংজ্ঞায় সুহাস বেশ চমৎকৃত হয়। সে কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই গয়ানাথ আবার শুরু করে দিয়েছে—'কিন্তু আপলচাঁদের যত ভাঙিছে, ততখানই আবার গড়িবার ধরিছে।'

'কোথায় ?'

'যেইঠে ভাঙিছে সেইঠেই, নতুন চর, নতুন জঙ্গল।'

'স্যার এই দিকে', প্রিয়নাথ বাঁয়ে ঘোরে। আর সঙ্গে-সঙ্গে তিস্তার গর্জন যেন বেড়ে যায়। একটা ঝোপ পার হতেই সামনে কয়েকটা গাছেব ফাঁকে দেখা যায়—তিস্তা। বিনোদবাবু এক জায়গায় ভাঙা গাছের ওপর বসে খাতায় নোট করছেন। সুহাসরা এল দেখে উঠে দাঁড়ান।

তেইশ

নদীর ম্যাপ আঁকা

'স্যার, আপনি কি ম্যাপ কমপেয়ার করলেন ?'

'হ্যাঁ, এই দেখুন। যে-গুলোতে ক্রশ, তা বাদ যাবেই, তা হলে একটা আউট লাইন পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ফরেস্টের, মানে এই ভিলেজটার টোট্যাল একারেজটা দরকার। তা হলে আগের একারেজের সঙ্গে এটার একটা কমপ্যারিজন করা যেত। দেখুন, আমার ডিমার্কেশন।' সুহাস প্রিয়নাথের দিকে হাত বাড়ায়। প্রিয়নাথ ম্যাপটা খুলতে শুরু করে। সুহাস বলে, 'সাবধানে খুলবেন,' তারপর বিনোদবাবুর দিকে তাকিয়ে হেসে বলে, 'আমার হাত থেকে ম্যাপটা উড়ে গিয়েছিল, ওখানে।' বিনোদবাবু সামান্য হাসির ভঙ্গি আনেন। সুহাস তখন নিজে হেসে বলে, 'একেবারে গাছের মাথায়।'

মাটিতে ম্যাপটা পাতা হয়েছিল। সেই পড়ে-যাওয়া গাছটার ওপর এখন সুহাস বসে। বিনোদবাবু মাটির ওপর উবু হয়ে ম্যাপটার ঢেরা দেয়া জায়গাগুলোর ওপর দিয়ে আঙুলটা টেনে-টেনে বুঝে নেন। প্রিয়নাথ ম্যাপটা একদিকে চেপে থাকে। আর গয়ানাথ একটু দূরে দাঁড়িয়ে মাথাটা নিচু করে ম্যাপটার দিকেই তাকিয়ে থাকে, কিন্তু বোঝাই যায় সেখানে কিছু দেখছে না।

ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে বিনোদবাবু উঠে দাঁড়িয়ে প্রিয়নাথকে বলেন, 'প্রিয়নাথ, চেইনটা একটু বাঁয়ে

সরাতে বলো ত অনাথকে। আর-একটু ডাইনে সরো। মানে কোনাকুনি হবে। ঐটাকেই তা হলে পয়েন্ট ধরি স্যার, আপনি যেখান থেকে দেখলেন ?'

'ধরুন, ওটা ত ভাল পয়েন্টই হবে।'

প্রিয়নাথ শেকলটা একটু নাড়া দিয়ে চিৎকার করে কিছু বলে। তিস্তার বাতাসে সে-চিৎকার ভেসে যায়। কিন্তু ও-রকম ভাবেই ভেসে আসে অনাথেরও চিৎকার। বিনোদবাবু মেপে বলেন, 'হ্যাঁ ঠিক আছে। নাকি, আর-একটু ছেড়ে দেব স্যার ?'

কথাটার জবাব খুঁজতে সুহাস একেবারে পাড়ে গিয়ে তিস্তার গতিটা আন্দাজের চেষ্টা পায়। নদীর দিকে তাকানো, মানেই ত ওপারের দিকে তাকানো, নীলাভ দিগন্তসীমায়। কিন্তু সুহাস তাকিয়ে আছে এই পারের তটরেখার দিকে, তার পায়ের তলায়।

এখানে পাড়টা অনেক বেশি খাড়া। আর, একেবারে পাড় থেকে ঝাঁকড়া মাথার বিরাট গাছ, লাম্পাতি, হালকা গাছ বলেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। শাল হলে নিজের ওজনেই ভেঙে পড়ত। ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে তার কয়েক হাতের মধ্যে একটা বিশাল খয়ের গাছ ডালপালা সমেত উপুড় হয়ে জলের মধ্যে পড়ে। জলের মধ্যে পড়া সত্ত্বেও তার ডালপালা-পাতা সব জলের ওপরেই আছে—তলার দিকের খানিকটা জলে ডুবে গেছে। সুহাস একটু ঝুঁকে দেখে, তলার মাটিটাও খেয়ে নিচ্ছে। সে বলে, 'এদিকে ত পাড়টা আরো ভাঙবে বলে মনে হয়, আর-একটু ছাড়বেন নাকি ?'

'স্যার, আমরা এখন ওটাকেই পয়েন্ট ধরে করে রাখি। তারপর একারেজ দেখে আর নর্থের হলকার ম্যাপ দেখে অ্যালাইনমেন্টটা ঠিক করা যাবে।'

'আচ্ছা, তাই করুন।' মৌজা মাপের ওপর বিনোদবাবু পেন্সিলের নতুন লাইন টানতে থাকেন আর প্রিয়নাথের পাশ থেকে পুরো শিকলটার লাইনটা দেখে দেখে নেন।

'গয়ানাথবাবু, এর বাদে ত ওদলাবাড়ি চা-বাগান ?' গয়ানাথকে জিজ্ঞাসা করেন বিনোদবাবু।

'হ্যাঁ। কিন্তু নদী আর বন, কতটা খাবে, কতটা থাকিবে, তার হিশাব ম্যাপে করিবেন কেমনে ?' গয়ানাথ তার প্রত্যক্ষতাকে এদের আনুমানিকতাব বিরুদ্ধে দাঁড কবায়, যে-আনুমানিকতা আবাব মাপজোখে অনড, প্রায় আদালতেব রায়েব মতই। বিনোদবাবু কোনো উত্তর দেন না।

সেই ফাঁকে সুহাস দৃশ্য হিশেবেই দেখে—তিস্তার দিগন্ত থেকে দিগন্ত, যেন জলস্রোত নয়, একটা কঠিন জলভূমির বিস্তাব। একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মনে হয়, তিস্তা চলছে না, এই পাবভূমিটাই চলছে। তখন আবার চোখ বুজে ভাসাব বিভ্রমটা কাটাতে হয়। তিস্তাব স্রোত এতই খব যে প্রায় কোনো আলোড়নও হয় না, স্টিলেব পাতের মত একই তলে নদীটা বিস্তৃত হয়ে আছে। হঠাৎ মাঝে-মাঝে এক-একটা কাঠের গুঁড়ির ভাসমান মাথাটুকু কুটোর মত ভেসে গেলে বোঝা যায় নদীস্রোতেব বেগ কতটা। কিন্তু নদীর গর্জনকে তাব চাব পাশ থেকে বিচ্ছিন্ন না-কবে শোনা যায় না, বিশেষ কবে ফরেস্টে দাঁড়িয়ে, চারদিকের সমস্ত শব্দেব সঙ্গে নদীব শব্দ এতটাই মিশে থাকে। কিন্তু নদীব দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে, স্রোত দেখতে-দেখতে, নদীব আওয়াজটাকে চার পাশের আওয়াজ থেকে আলাদা করে নিলে, সিনেমায় যেমন স্মৃতিভ্রংশেব নষ্টস্মৃতিব পুনবাগমন বোঝাতে সাইরেনের আওয়াজ ক্রমবর্ধমান হয়ে ওঠে, অবিকল যেন তেমনি, তিস্তার গর্জনটাই বাডতে-বাডতে প্রধান হয়ে ওঠে। তখন মনে হয়, এই প্রচণ্ড পরিব্যাপ্ত আওয়াজটাকে না-শুনে কী করে থাকা যায়। তবু আওয়াজটার মধ্যে বিরতিহীন মেঘগর্জনের মত একটা দূরত্বেব ইঙ্গিত আছে—যেন ভেসে আসতে হচ্ছে। কিন্তু অবরুদ্ধ গুম-গুম ধ্বনি জলের তলা থেকে আরো তলায় নেমে যাচ্ছে। পাহাড় থেকে বিরাট-বিরাট বোল্ডার জলস্রোতে ভেসে-ভেসে জলের তলা দিয়ে গড়িয়ে-গড়িয়ে যাচ্ছে। টানা গড়গড় আওয়াজে যেন পাহাড়ে ধস নেমেই চলেছে। জলের তলায় বোল্ডারে-বোল্ডারে যখন ধাক্কা লাগে তখন জলেব তলা থেকে যেন কামান গোলার আওয়াজ হয়। লোকমুখে এই আওয়াজটার নামও তাই 'তিস্তার কামান।' সুহাস যখন জলস্রোতের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দৃশ্য-শব্দ শব্দের-ভেতরে-শব্দ শুনতে পাচ্ছিল তখন সে আর-কিছু শুনতে পায় না, দেখতেও পায় না। আর এই দৃশ্য ও শব্দ তার সমগ্রতা নিয়ে তাকে যেন সম্পূর্ণ অবশ করে দিচ্ছিল। সে দেখতে পাচ্ছিল, তিস্তা যে এখান থেকে উত্তরে, পশ্চিমে বেঁকে গেছে সেখানে ঐ ঘোলা জলের স্রোত প্রায় একটা তৈরি করা স্রোতের মত নিটোলতায় উজানে বাঁক নিচ্ছে। সেই বাঁক থেকে জলটা বয়ে আসছে সুহাসের দিকে। আর সুহাস চোখে-চোখে স্রোতটা উজিয়ে-উজিয়ে

সেই বাঁক পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে। তার দৃষ্টিতে ঘোর লাগে—এই স্রোতের প্রবলতা দৃষ্টি দিয়েও উজনো যায় না। সুহাস এই ঘোর সামলাতে প্রথমে চোখ বোঁজে। তারপর বসে পড়ে।

চব্বিশ

নদী আছে কি নাই : গয়ানাথী তর্ক

চোখ বন্ধ করতেই নদী আর নদীর আওয়াজ দুটোই মিশে যায় পরিবেশের সঙ্গে। এই ভাবে নদীর সামনে বসেই নদী থেকে নিজেকে আলাদা করে নিতে বা নদীকে আবার তার পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে অস্পষ্ট করে নিতে স্বস্তি বোধ করে সুহাস। সে নদীর দিকে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে বিনোদবাবু নোট নিচ্ছেন, গয়ানাথ তার দিকে তাকিয়ে, প্রিয়নাথবাবু নেই।

'প্রিয়নাথবাবু কোথায়?'

'চেইন গোটাচ্ছে।'

এবার গয়ানাথ সুহাসের দিকে এগিয়ে আসে, 'স্যার, এইখানে আপনাদের মাপামাপিতে কী পাইলেন? নদীখান কি ভাঙিছে? মাপামাপিতে।'

সুহাস বসে-বসেই বলে, 'আপনি যা দেখছেন আমরাও তাই দেখছি। আমরা শুধু এইসব মেপেটেপে এঁকে রাখছি।'

'সেইটাই ত কহিতে চাই স্যার। আটষট্টির ফ্লাডে নদীখান এইঠে আসি গেইছিল, ঢুকি গেইছিল, ঠিকই। কিন্তু তারপর আর ভাঙে নাই। এ্যালায় ফরেস্টখানই ঐদিকে, নদীর দিকে, এর বাদে বাড়ি যাবে।'

'সে যখন যাবে, তখন যাবে, এখন ত আর যাচ্ছে না,' বিনোদবাবু তাঁর খাতা থেকে চোখ না-সরিয়ে বলেন।

'কিন্তুক, স্যার, এই ভরা বর্ষায় ত নদী সবঠেই ঢুকি যাবে। যেখানে যাবে সেইটাই কি বাতিল? স্যালায় ত তামান মৌজা বাতিল হবা ধরিবে—'গয়ানাথ উত্তেজনা প্রকাশ করে ফেলে, আর সাধুভাষা বলতে পারে না। আর এতক্ষণে গয়ানাথের কথাতে সুহাসের মনে হয়, এইটুকু গ্রামে সারাজীবন ধরে থেকে এইখানকার নদীটা দেখে-দেখেই গয়ানাথ কোনো সর্বজনীন দার্শনিকতার বুলি আওড়াচ্ছে না, তার যেন আরো নির্দিষ্ট কিছু বলার আছে। সে তাই গয়ানাথকে জিজ্ঞাসা করে, 'তা হলে আপনার বক্তব্যটা কী, মানে, আপনি কিছু বলছেন?'

'না স্যার, আমি কহিছি আপনার মৌজার ম্যাপখানত্ বদলিবার ত কিছু নাই। য্যানং ম্যাপ আছে, থাউক—' কথাটা গয়ানাথ শেষ করতে পারে না। কিন্তু বোঝা যায় সে শেষ করতে চায়।

সুহাস জিজ্ঞাসা করে, 'মানে, আমরা দেখছি গাজোলডোবা নেই, হাঁসখালি নেই, চুরাশি নম্বর নেই, এতগুলো দাগ নেই আর আমরা মৌজা ম্যাপে লিখে দেব সব ঠিক আছে!'

'না, না, তা লিখিবার কাম কী আছে স্যার, কিছুই লিখিবেন না, য্যানং আছে, থাকুক কেনে।'

'তা হলে ত সেটা রেকর্ড করতে হবে। আমি দাগ নম্বরই-বা দেব কোথায়, আর দাগ নম্বর শুরুই-বা করব কোথায়?'

'সে ধরেন, ফরেস্টের জমি হাসিল হছে যেইঠে।'

'ফরেস্টের জমি হাসিল হয়েছে, মানে?'

'মানে, আগে ফরেস্ট ছিল, এ্যালায় চাষ হওয়া ধরিছে, সেটা ত আপনারা চাষজমি ধরিবেন?'

'কে চাষ করছে? ফরেস্টের জমি ত ফরেস্টের। কারা চাষ করতে দিয়েছে? বরং উল্টোটা হতে পারে, আগে আবাদ ছিল, এখন ফরেস্ট হয়েছে।'

'হ্যাঁ। তাও হবা পারে। কিন্তু এইঠে ত সব জমিই ফরেস্টের ছিল, তার থিকা চাষ হওয়া ধরিছে।'

বিনোদবাবু এতক্ষণে মুখ তুলে বলেন, 'সাত পুরনো কথা তুলে কী লাভ ? সে যখন ফরেস্ট হাসিল হত, তখন হত। এখন আমরা দেখছি নদীটা এতদূর এসেছে, সেটা লিখব না ?' বিনোদবাবু উঠে দাঁড়ান, তারপর সুহাসকে বলেন, 'আপনি বুঝলেন না স্যাব, ফরেস্টের জমি যখন গয়ানাথবাবুরা চাষ করবেন তখন সেটা চাষে দেখাতে হবে আব গয়ানাথবাবুব জমি যখন নদীর ভেতরে যাবে তখনো গয়ানাথবাবুরই থাকবে। কী বলেন গয়ানাথবাবু ?'

'কথাটা আপনি সিধা বলিলেন আমিনবাবু, কিন্তু ঠিকই। জমিনের ত আর পাখনা নাই যে উড়ি যাবে, যেখানকার জমি সেইঠেই থাকে, সে জমিব উপব জঙ্গলই হোক আব জলই হোক।'

সুহাস বুঝতে পাবে পাশাপাশি থেকে, পিছু-পিছু এসে, প্রথমে আনমনা ভাবে, এখন বেশ জোব দিয়ে গয়ানাথবাবু একটা কোনো কথা প্রমাণ করতে চাইছেন। সে-কথার সমর্থনে আইনেব প্রকাশ্য কোনো বিধান নেই বলেই তার কথাটা হয়ত এতটা ঘোবানো-প্যাঁচানো মনে হচ্ছে। কিন্তু হয়ত আইনেব সমর্থন নিহিত আছে বা থাকতে পারে। সুহাসেব সামনে কথা বলছে বলেই এ-রকম ভাবে বলছে। 'কিন্তু তাতে লাভটা কী আপনার ? মানে আপনাদের ? আমরা যদি নদীটা এঁকে নাও নেই, তা হলেও ত নদীটা এখানেই থাকবে।'

'কিন্তু নদী ত এইঠে সরি যাবে স্যার, আর মাস দুই বাদেই নদী সরি যাবে।'

'না, সে ত যাবেই, বর্ষায নদী যতটা আসে, শীতে ত আর ততটা থাকে না, কিন্তু আপনি শুধু শীতেব নদীটাকেই নদী বলবেন নাকি, বর্ষার নদীটাও ত নদী, বর্ষার জল যাবে কোথায় ?'

'সে ত স্যাব, যদি আপনি এইটাক নদী বলি ডিক্লার করি দেন, নুটিশ দেন, তার বাদেও ত নদী আরো ছড়ি পড়িবার পারে, বৃষ্টি বেশি হইলেও বাড়িটাডিত ঢুকিবার পারে, তখন কি কহিবেন, যে-যে-টাড়িত নদীর জল সিন্ধাইছে স্যালায় সব টাডি নদীবাড়ি হয়্যা গেইল ?' গয়ানাথেব এই কথা শুনে সুহাস বুঝতে পারে—উত্তব দেয়া মুশকিল এমন কথা না-শোনা, আর নিজের পক্ষে জোরদার কথা বার ব্যর বলা—তর্কের এই বেশ অভিজ্ঞ প্যাঁচ গয়ানাথেব ভাল আয়ত্তে আছে। সুহাসেব ঐ সন্দেহ কেটে যায় যে গয়ানাথ তাব কথাটা হযত বলতে পারছে না। বিনোদবাবু বলে ওঠেন, 'আমবা এখন যা দেখছি তাই লিখছি। এর পব অ্যাটেশটেশনের সময বলবেন, তখন ত আব বর্ষা থাকবে না, যাচেব সময বলবেন, ভুল হলে ভুলেব লিস্ট বেব হবে। চলেন স্যাব, আমাদেব দেবি হয়ে যাবে। এক জায়গাতেই ত সময গেলে চলবে না।'

'সে ত করা যাইবেই আমিনবাবু। কিন্তু, এইঠেও ত স্যাবেব কাছে মোব কাথাটা কহা যায। যায় কি না-যায় ?'

সুহাস তাডাতাড়ি বলে, 'নিশ্চয়, নিশ্চয, আপনি বলুন না, আমি ত শুনছি আপনার কথা।'

সুহাস টের পায় গযানাথ তার মত করে আইনের বিধান শুনিয়ে দিল। বিনোদবাবুও চুপ করে যান। গয়ানাথ তখন বলে, 'মোর কাথাটা ত সিধা স্যার, আপনারা যেইঠে নদী আঁকিলেন, ঐঠে নদী নাই, ঐটা বর্ষাব জল।'

যেন গয়ানাথের কথাটা যাচাই কবে দেখাব জন্যই সুহাস নদীর দিকে ফেরে। নদীর আরো একটু কাছে যায়। তারপর নিচু হয়ে সে পাড়ের মাটি ভাঙার লাইনটা দেখে। সে এবার ঐ লাইন বরাবর উত্তরে হাঁটে, নিচু হয়েই পাড় ভাঙার লাইন দেখতে-দেখতে, পরীক্ষা করতে-করতে। মাঝখানে সেই উপড়নো গাছটার বাধা। ফলে সেই গাছটাকে ঘুরে পার হতে হয়। গয়ানাথ আর বিনোদবাবু পেছনেই থাকেন। সুহাস বুঝে গেছে গয়ানাথ আইনের জোরেই কথা বলতে চায়, সুতরাং সুহাসও তার যুক্তিটা আর-একটু যাচাই করতে চায়। সে একটা বাঁক পর্যন্ত দেখতে চায়—যে-বাঁকটা এর চাইতেও ডাইনে নিয়ে গেছে নদীকে। এই পাড়ের লাইন নিশ্চিতভাবেই নদীর পাড়ভাঙার লাইন। বর্ষার জলে নদী যদি এতটা উঠে এসে থাকে তা হলে কি এ ভাবে পাড় ভাঙত ? সুহাস নদীর পাড়ভাঙা খুব একটা দেখে নি। সামান্য দেখে থাকলেও, মাত্র সেটুকুর ভিত্তিতে তার পক্ষে এমন বর্ষা তার ধারণারও বাইরে। সুহাস সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তিস্তার দিকে একবার তাকায়। তার সামনে একটু-আধটু পাতলা ঝোপঝাড়। তার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে তিস্তা। দূর ঘোলাটে বিস্তারের ওপর আকাশের আর আলোর বিচিত্র সন্নিপাতে ছায়া আর রোদেরও কত অজস্র বিন্যাস। সেই বিন্যাসের মধ্যে কোথাও স্রোত নেই, ভাঙন নেই, আক্রমণ নেই, আওয়াজ নেই। সুহাসের ইচ্ছে হল, সে তিস্তার আওয়াজ শোনে। চোখ বুজে সে তিস্তার

দিকে মন দেয়। প্রথমে ফরেস্টের ঝিঝিব ডাকের সঙ্গে মিশিয়ে শুনতে পায়। তারপর ধীরে-ধীরে সে শব্দ আলাদা হয়ে যায়। আলাদা হতে-হতে যেন জলতলের নির্ঘোষটা স্রোতের ওপরে উঠে আসে। তিস্তা যেন আবার, জলস্রোত থেকে ধ্বনিস্রোত হয়ে যায়। অবিরত ধ্বনি। বোল্ডারের সঙ্গে বোল্ডারের ঘর্ষণের কামানগর্জন মাটি ভেদ কবে উঠে আসছে। অদৃশ্য জলগর্ভ জীবন্ত হতে থাকে। সুহাস চোখ খোলে। আওয়াজটা অনেকখানি মিলিয়ে যায়।

সুহাস ফেবে। সে তার যুক্তি ঠিক কবে ফেলেছে। যদি কোনো প্রমাণ হাজির কবতে পাবে, গয়ানাথ করুক। নইলে সে যা লিখল, তাই পাকা।

গয়ানাথ, বিনোদবাবু তাব দিকেই তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। সুহাস তাঁদেব কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। দুজনেব কেউই কথা বলেন না। সুহাস বলে, 'না গয়ানাথবাবু, নদী এই পর্যন্তই এসেছে।'

গয়ানাথ যেমন দার্শনিক ভাবে শুনছিল, তেমনি শোনে। কথা বলে না। কিন্তু গয়ানাথ বা বিনোদ কেউ নড়েও না। সুহাস যখন বলতে যাবে, তা হলে চলুন বিনোদবাবু, তখনই বিনোদবাবু বললেন, 'স্যার, বলছিলাম গয়ানাথবাবু যখন এতই আপত্তি তুলছেন তখন আব-একবাব দেখে নিতে ক্ষতি কী?'

'আমি ত সেজন্যেই দেখে এলাম। এটা নদীরই আউটলাইন। স্পিল এরিয়া নয়।' 'গয়ানাথবাবুব যদি কোনো প্রমাণ দাখিলা থাকে তবে হাজির করুন,' বিনোদবাবুব এই কথায় সুহাস একবার গয়ানাথের আর-একবার বিনোদবাবুর মুখেব দিকে তাকায়। সুহাসও এই কথাটিই ভেবে রেখেছিল বলবে বলে, কিন্তু গয়ানাথ কোনো কথা বললে তাব উত্তরে বলবে, নিজে থেকে বলবে না। বিনোদবাবু আগেই বলে দিলেন? প্রমাণেব কথা একবার উঠলে আর পেছুনো যায় না। তবু বিনোদবাবু বললেন কেন? গয়ানাথবাবু সুহাসের কথা শুনতেই দাঁড়িয়ে থাকে। সুহাস বলে, 'আপনার কোনো প্রমাণ থাকলে, বলুন।'

'আমাকে একটু টাইম দেন স্যার। মোক ঐঠে যাবা নাগিবে। তাবপর প্রমাণ দিম। নিশ্চয় দিম।'

'হ্যাঁ, আপনি যান। তাড়াতাড়ি আসবেন।'

'হ্যাঁ স্যাব। যাম আর আসিম। যাম আব আসিম।'

গয়ানাথ মুহূর্তে সবসব শব্দ তুলে পাতা-কাদাব ভেতব দিয়ে বেরিয়ে গেল।

পঁচিশ

দশ বছব আগে-পরে 'গয়ানাথের জোত'

সুহাস গয়ানাথের প্রস্থানেব দিকে তাকিয়ে আছে। গয়ানাথ অবিশ্যি নেহাতই ছোটখাট, পাতলা। তার যাতায়াতে কোনো শব্দ না-হওয়াবই কথা। কিন্তু গয়ানাথ যেন তার চাইতেও নিঃশব্দে ফরেস্টের মধ্যে মিলিয়ে গেল খুব দ্রুতগামী জন্তুব মত। এতক্ষণ সুহাস, গয়ানাথের এমন তৎপরতা আছে, ভাবতেও পাবে নি। সে খুব আস্তে জিজ্ঞাসা করে, 'কে ভদ্রলোক?'

'গয়ানাথ জোতদাব। রাযবর্মন। তিনপুরুষেব। দেখেন নি? এই মৌজাব সবটাই ত ওর। এর নীচের মৌজাও আগে ত ওদেরই পুরোটা ছিল।'

'গয়ানাথ বায়বর্মন।' সুহাস যেন কোন স্মৃতি থেকে নামটা মনে আনার চেষ্টা করছে। দলিলদস্তাবেজে নয়, রেকর্ডে নয়, দাখিলাপর্চায নয়, গয়ানাথ নামটা তার কারো মুখে শোনা হয়ে আছে, 'এর কি ফরেস্টেরও দখল আছে না কি?'

'কোথায় নেই স্যার? এটা ত গয়ানাথের জোত বলেই সবাই জানে। আপনি মৌজার নাম বদলেও দিতে পারেন, "মৌজা গয়ানাথেব জোত"-ও লিখতে পারেন।' 'কেন? তা লিখব কেন?' সুহাস একটু

আনমনা ভঙ্গিতে বিনোদবাবুকে বলে বটে কিন্তু কথাটার মধ্যে একটা কোনো জোর ছিল। বিনোদবাবু তাড়াতাড়ি বলেন 'না, স্যার, এমনি বলছিলাম।'

এখন সুহাসেব কাছে যেন অনেক কিছুই পরিষ্কার হয়। একটু হেসে নদীর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, 'ওঁর জমি সব ?' বিনোদবাবু একটু হেসে মাথা হেলান। 'তা হলে নদীরও দোষ, আমাদেরও দোষ।'

গত বারের সেটলমেন্টের পঁচিশ বছর পর এই সেটলমেন্ট হচ্ছে। মাঝখানে আটষট্টির বন্যার মত ঘটনা ঘটে গেছে। তিস্তা ব্যাবাজের কাজ শুরু হবে। এই সার্ভে তিস্তা ব্যাবাজের জন্যেও হচ্ছে। তিস্তা ব্যারাজ বাঁধা হলে নদীর অনেক কিছু বদলে যাবে। এখন, এই সার্ভেতে এই মৌজাব ম্যাপ থেকে ঐ পুরনো দাগনম্বরগুলো চিরতরে বাদ চলে যাচ্ছে। হালের দাগ নম্বর নতুন কবে শুরু হবে। তার মানে নদী যা খেয়েছে তা নদীরই সম্পত্তি হয়ে গেল। এখন যদি দু-চার আট-দশ বার-চোদ্দ বছর পব এখানে চর জাগে, বা ব্যারাজের ফলে পাড়টা আরো এগিয়ে যায় তা হলে তাতে গয়ানাথেব কোনো অধিকাব থাকবে না, পুরোটা পোয়াস্তি হয়ে যাবে। যার ইচ্ছা সেই তখন দখল নিতে পারবে ও সরকারও সেই পোয়াস্তির বন্দবস্ত যার সঙ্গে ইচ্ছা তার সঙ্গে করতে পাববে। কিন্তু যদি নদীর সীমা এতদূর পর্যন্ত মানা না যায়, পুরনো মৌজা ম্যাপটাই যদি চালু থাকে, তা হলে পাঁচ-সাত, আট-দশ, বার-চোদ্দ বছর পবও চর পড়লে গয়ানাথ আইনত বলবে এটা চর নয়, তার নিজ খতিয়ানের অন্তর্গত কায়েম। আব, এবারের সেটলমেন্টে একজনের নামে একটা খতিয়ানই দেয়া হবে। মানে, ঐ নদীর তলেব মাটির জন্যেও হালখতিয়ান পেতে চাইছে গয়ানাথ। সুহাস কয়েক পা এগিয়ে ঝুঁকে, নদীব পাড়টা আবো মন দিয়ে দেখে। এইবার নদীর এই ভগ্ন লাইনের একটা অন্য ব্যক্তিগত তাৎপর্য ধবা পড়ছে। এখানে যে-জমি ভাঙছে সেটা ফরেস্টের। কিন্তু আবো দক্ষিণে-দক্ষিণে যে-জমি ভাঙছে বা ভেঙেছে সে সব গযানাথের জমি। তিস্তার জলের তলের মাটিটা আর প্রাকৃতিক থাকে না, জলেব তলার বহস্য থাকে না, অন্তর্স্রোতে আর খরস্রোতে যেন অমানবিক কোনো শক্তি থাকে না। তিস্তাব জল, বিশেষত এই তীববর্তী জল, তিস্তার মাটি, বিশেষত এই তীরবর্তী মাটি একটা খুব প্রাকৃত মানবিক শক্তি হয়ে ওঠে। ঝুপ ঝুপ করে যে-মাটি পড়ে, বা স্রোতের আঘাতে-আঘাতে যে-তীরেব তলা ফাঁক হয়ে যায়, সেই সব মাটি আব তীরভূমি গয়ানাথের।

সুহাস তিস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু দূরের বিস্তারেব অতিঅনির্দিষ্টতা থেকে চোখ গুটিয়ে আনে প্রায় চোখের তলাব নিকট নির্দিষ্টতায়—তিস্তার জল যেখানে ঘনিষ্ঠ মিত্র। সুহাস খুব কাছে তাকায় কাদাগোলা জলে ফেনার একটা সূক্ষ্ম শাদা রেখা, দুলছে, কয়েক হাত দূবে তিস্তাব পাহাড়- ধসানো স্রোতের টান এখানে পৌঁছয় না। মাটি থেকে একটা কুটো তুলে নিয়ে সুহাস ঐ জলে ছুঁড়ে দেয, যেন পরিচিত আত্মীয়তায়। তারপর বিনোদবাবু বলে, 'তা, ওঁর যা প্রমাণ তা ওখানেই দিতে পাবেন, এখানে আসার দরকার কী ?'

বিনোদবাবুও খানিকটা চুপ করে থেকে বিহ্বলের মত বলেন, 'হ্যাঁ, তাই ত স্যাব। আপনি বললেন. আমিও আর ভাবলাম না,' থেমে যোগ করেন, 'এখনো আমরা চলে যেতে পারি, ওরা ওখানে যাবে।'

'আচ্ছা এখানেই আসুন, যখন গেছেন—,' বলে সুহাস সেই গাছটার ওপর বসে, হেসে বিনোদবাবুকে বলে, 'কি, মৌজার নাম বদলে দেবেন নাকি—কী বললেন, "গয়ানাথের জোত" ?'

'না স্যার, এমনি বলছিলাম,' বিনোদবাবু যেন কৈফিয়ৎ দেন। কিন্তু সুহাস আবার বলে, মন্দ হত না নামটা—"গয়ানাথের-জোত", এদিকে ত এ-রকম নাম থাকে।'

'হ্যাঁ স্যার, থাকে—'

তাই কি সুহাসের মনে হচ্ছিল নামটা যেন তার শোনা, অনেকদিন আগে কেউ শুনিয়েছিল, স্মৃতিতে কোথাও আছে—নকশালবাড়ি, বুড়ার জোত, মঙ্গলবাড়ি জোত, কালীর জোত ? সেদিন এমন কোথাও চলে যাওয়ার বদলে, দশ-বার বছর পরে, এখন, সুহাস বসে আছে এমন-একটা জায়গায় যার নাম হতে পারে—গয়ানাথের জোত। সে ইচ্ছে করলেই এই নাম দিয়ে দিতে পারবে। দিয়ে দিতে পারে। আর গয়ানাথ জোতদার গেছে তার সামনে হাজির করার প্রমাণ-দলিল আনতে। সুহাস এখন জোতদারের বিচারক। এ ত সুহাসের একটা জিতই, বেশ বড় জিত। কিন্তু জয় বোধ করতে পারে না সুহাস, 'গয়ানাথের জোত' এই একটা নামের অনুষঙ্গেই জয়বোধ উধাও হয়ে যায় তার মন থেকে। সে অপেক্ষা করে থাকে, গয়ানাথের। গয়ানাথ তাকে বসিয়ে রেখে গেছে, আবার ফিরে আসছে, দশ বছর আগে

তাকে দেখে গয়ানাথ পালাতে-পালাতে এখন তাকে হাকিম বলে মেনে নিয়েছে। এখন গয়ানাথ আসছে—তার হাত দিয়ে এই নদী আর নদীব জল আর নদীর ভেতরের মাটি আর এই জঙ্গল সব গয়ানাথের বলে মানিয়ে নিতে। মেনে না নিলে আপিল হবে। আপিলের আপিল হবে। আপিলের আপিলের আপিল হবে। সেখানে সুহাস ত একটা ধাপ মাত্র। আত্মকরুণা থেকে নিজেকে বাঁচাতে সুহাস আবারও নদীব দিকে তাকায়। তাও ভাগ্যি তিস্তা গয়ানাথেব এতটা জমি পেযেছে—তাই সুহাস অন্তত জোতদারের হাকিম হয়ে বসতে পেরেছে। সুহাস আবার একটা কুটো ছোঁড়ে নদীর জলে। 'জোতদাববিরোধী মিত্রশক্তি', না, 'শ্রেণীসংগ্রামেব মিত্রশক্তি', আবার 'বামফ্রন্ট সরকাব কৃষকের মিত্র সরকাব', আবার, 'সুহাস কৃষকের মিত্র হাকিম'। চার পাশেই মিত্র। কিন্তু যার মিত্র, তাকেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ছাব্বিশ

ভিড ও গয়ানাথ

অনেক মানুষেব পায়ের চাপে পচা ভেজা পাতা দলে পিষে যাচ্ছিল। তার একটা হিস হিস শব্দ পাওয়া যায়। সুহাস তাকিয়ে দেখে বহু লোক আসছে। বিনোদবাবু বলেন, 'কী ব্যাপার, ওখানকার সবাইকেই নিযে এল নাকি ?'

'তাই ত মনে হচ্ছে', বলে সুহাস ভাবে, আগে থাকতেই তৈরি ছিল নাকি। তা হলে সকাল থেকে সার্ভেব ওখানে যে এত লোক জমা ছিল, সে সবই গয়ানাথের লোক ? যেন গয়ানাথের কোনো বিপরীত পক্ষ আছে, এমন করে সুহাস ভাবে, কেউ নদীর লোক নয় ?

সুহাস ভাঙা গাছেব ওপর বসেই ছিল। সমস্ত দলটা এসে সামনে দাঁড়িয়ে যায়। সুহাস বসে-বসেই তাকিয়ে থাকে। গয়ানাথকে দেখতে পায না। তাতে যেন একটা যুদ্ধ-যুদ্ধ ভাব আসে। এখানে এই বনের মধ্যে ত ছড়িযে যাওয়াব জাযগা নেই। ছডিয়ে যাওয়ার জন্যে সবাই এখানে আসেও নি। বসাব জায়গা নেই—বর্ষার জঙ্গলে। সমস্ত দলটাই ভিড করে সামনে, দাঁড়িয়ে। তাতে, বাধ্য হয়েই ভিড়টাকে কয়েকটা লাইনে দাঁড়াতে হয়েছে। আব ভিডটার মুখোমুখি একা-একা সুহাস, নদীকে পেছনে নিয়ে, বসে। বিনোদবাবু দাঁডিযে, সুহাসের থেকে একটু দূরে, কিন্তু ভিডেব সামনে। এখানে, এ-রকম করে দাঁড়াতে হয়েছে বলেই সবগুলো মুখই মিশে গেছে। সাজানো-গোছানো ঠেকে, প্রায় ক্যালেণ্ডারের জাতীয় সংহতির ছবির মত সাজানো-গোছানো—তামাটে মোঙ্গলীয় মুখেব পাশেই খাটো নেপালি মুখের তীক্ষ্ণতা, পেছনে লম্বা সাঁওতালি মুখ। সুহাস এখানে নতুন বলেই, ও এ-অঞ্চলের সঙ্গে তথ্যে আর ম্যাপে আর রিপোর্টেই তার পরিচয় বলে, এই মুখগুলোর পার্থক্য তার কাছে এত সহজে ধরা পড়ে। নইলে পোশাকে-আশাকে এ-ভিড়ের ভেতর বৈচিত্র্য এত কম যে লোকগুলিকে একটা ভিড় বলেই মনে হয়, আলাদা-আলাদা আদিবাসী-উপজাতির বলে মনে হয় না।

কিন্তু এতগুলো মানুষ এতটা ঘনিষ্ঠ হয়ে এই জঙ্গলের মধ্যে সুহাসের সামনে দাঁড়িয়ে, যেন, গয়ানাথ তাকে লোক জুটিয়ে ভয় দেখাচ্ছে। সুহাস উঠে দাঁড়ায়, তারপর একটু কড়া গলায় জিজ্ঞাসা করে, 'গয়ানাথবাবু কোথায় ?' হঠাৎ যেন সুহাস সতর্ক হওয়ার দরকার বোধ করে—এই জঙ্গলের ভেতর তাকে আর বিনোদবাবুকে এতটা আলাদা করে এনে কি গয়ানাথ কোনো ফাঁদে ফেলছে। বিনোদবাবুর দিকে তাকায় না সুহাস, কিন্তু বুঝতে পারে, তাঁর ভঙ্গিতেও অনিশ্চয়তা আছে। সুহাস ভুলতে পারে না তার ঠিক পেছনেই তিস্তা, বর্ষার। আর সামনে এত মানুষ, আদিবাসী।

কিন্তু এত অনিশ্চয়তা-অস্থিরতা নিয়েও সুহাস সামনের এই মুখগুলোর দিকে তাকায়, এই যে-রকম মুখের সমাবেশের স্বপ্ন বছর দশ-বার আগে তারা দেখত নানা ঘটনার, ইতিহাসের, এখন মনে হয় রূপকথার, অনুষঙ্গে। ব্যক্তিত্ব নয়, সমষ্টিই যে-মুখের আয়তনে আর রেখায়, নাক-মুখ-চোখ-কানের মত

ব্যক্তিগত সব শারীরিকেও, খোদাই-কবা, তেমনি এত মুখের সারি সুহাসকে কোনো এক লুপ্ত সমাবেশের সামনে হাজির করে। কে জানত, এমন প্রতিপক্ষতায় তার এই আবিষ্কাব ঘটে যাবে?

'এই সবি যা, সরি যা'—বনমোরগের গলায় গয়ানাথবাবুব এই চিৎকারটা দঙ্গলের ভেতর থেকে আগে শোনা যায়। তাবপব সামনেব সাবিব লোকজন একটু ফাঁক হয়ে যায় আর সেই ফাঁক গলে পেছন থেকে গয়ানাথ এদিকে আসতে গিয়েও আটকা পড়ে যায়। তাকে দেখতে না পেয়ে সামনেব একজন বাঁয়ে সবে ফাঁকটা বন্ধ করে দেয়। গয়ানাথকে কাত হয়ে, আগে মাথাটা বের করে, তারপর পিছলে, বেবিয়ে আসতে হয়। তাব কাপড়েব একটা দিক ভিড়েব ভেতর কোথাও আটকে যায় বলে তার উরু পর্যন্ত খুলে যায়। পাছে কাপড়টাও খুলে যায় তাই গয়ানাথ কাপড়টা ধরে থাকে। ভিড়েব ভেতব থেকে কেউ খুঁজে পায় না কাপড়টা কোথায় আটকেছে। আর ঐ অবস্থায় গয়ানাথ বনমোবগের গলায় চিৎকার করে ওঠে, 'শালো চুতিযাব ছোযাগিলান, শালো জঙ্গলত আসি জঙ্গলিযা হবা ধইচছিস, পাছত না দেখিস কায আছে আর কায় না-আছে? এইঠে কি সার্কাস আসিবাব ধইচছে, না, নাটঙ্গি হবা ধইচছে?'

ততক্ষণে ধুতি গয়ানাথেব কাছেই ফিবে এসেছে। গয়ানাথ সুহাসেব সামনে দাঁড়িয়ে দঙ্গলটাকে আবাব গালাগাল কবে। তার খর্বতার জন্যেই ভিড়টার মুখোমুখি তাকাতে তাব ঘাড়টা অনেক হেলাতে হত। অতটা হেলিয়ে এতটা বাগা যায না। বা, ঘাড় হেলিয়ে গলাব এই স্বরটা বের করা তাব পক্ষে সম্ভব নয়। তাই ভিড়টার সামনে দাঁড়িয়ে, ঘাড় নুইয়ে, মাটিব দিকে তাকিয়ে, গলাব সবচেয়ে বেশি যে-জোর দেওয়া সম্ভব সেই জোব জোগাড় করে, গয়ানাথ গালাগালি চালাতে থাকে—'কায আসিবাব কইছে সগাক? সগায আসি গেইছে শালো ভূতের দল। শালো পিপিড়াব নাখান নাইল বানাও, নাইল করি চলো, শালো গরুর দল।'

গয়ানাথেব প্রথম চিৎকাবে সবাই একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। কিন্তু কাপড়টা আটকে যাওযায় সবাবই একটা কাজ জুটে গেল। আব, কোথায় আটকেছে সেটা খুঁজে না পেয়ে কাজটা বেড়ে গেল। এব ভেতব কাপড়টা পুবোই খুলে যেতে পাবে গয়ানাথেব এই ভয় দেখে সবাই মজাও পেয়ে যায। এখন, গয়ানাথেব মাথানোযানো চিৎকাবেব ওপরে ভিড়ের লোকজন এ ওব গায়ে ধাক্কা দিয়ে হাসে। কিন্তু হেসে ফেলে এ ওব আড়ালে মুখ লুকোতে চেষ্টা কবে। ভিড়েব ভেতবে কেউই যে গয়ানাথকে দেখতে পায় নি, আব গয়ানাথই যে ভিড়েব আড়াল থেকে সামনে বেবতে পাবছিল না—এব চাইতে বড় মজা ভিড়ের পক্ষে আব-কী হতে পাবে?

গয়ানাথ ওয়াক থু করে সশব্দে থুতু ফেলে। কোঁচা দিয়ে মুখটা ও ঠোঁটটা মুছে নিয়ে খুব দ্রুত কোঁচাব তলাটা আবার উল্টো করে তুলে শার্টের নীচে গুঁজে দেয। তাবপব, আবাব মুখটা নামিয়ে কোঁচাটা একটু তুলে মোছে। এ সবটাই সে কবে সুহাসেব দিকে পেছন ফিরে, ভিড়টাব সামনে দাঁড়িয়ে, যেন ভিড়টা তার অন্দর। শেষে ভিড়টার দিকে পেছন ফিরে সুহাসের মুখোমুখি দাঁড়াবার আগে সে সামনের সারিব লোকগুলোব চোখে চোখ রেখে নিজেব মূল কণ্ঠস্ববে হিসিয়ে ওঠে, 'মহিষের বাথান।'

সুহাস বসে পড়েছিল। বসেই থাকে। সে গয়ানাথকে জিজ্ঞাসা করে না। তাব জিজ্ঞাসা কবার কিছু নেইও। তা ছাড়া, সুহাস বোঝে, গয়ানাথ একটু আগে একা-একা, ধীবে-ধীরে কথা বলে, সুহাসদের সামনে নিজেকে বেশ ভাল ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, ফলে কিছুটা জোরও পেয়েছিল। এখন, যে-ভিড়টা তাব সাক্ষ্য-প্রমাণ তাতেই সে চাপা পড়ায় তার এত চেষ্টা নষ্ট হল। এখন, সুহাসও তাকে আর জোর ফিরে পাওয়ার সময় দেবে না। তাকে তার প্রমাণ সোজাসুজি হাজির করতে হবে। যে-প্রমাণই হোক, সুহাস কী বলবে ঠিক করেছে—আপনাব কথা শুনলাম, আমাদের যা সিদ্ধান্ত তা ড্র্যাফটে, খশড়ায় থাকবে। তখনো দেখে যদি আপনার আপত্তি থাকে দরখাস্ত করবেন।

গয়ানাথ বলে, 'স্যার।'

'হ্যাঁ, কই কী এনেছেন?' সুহাস হাত বাড়ায়।

'প্রমাণ দেখাম, স্যার?' গয়ানাথ জিজ্ঞাসা করে।

'প্রমাণ দেখাবেন বলেছেন আপনি, দেখাবেন কিনা সেটা ত আপনার ব্যাপার', সুহাস আইনি ভাষায় কথা বলে।

'স্যার, মুই ডাকিছু দুই জনাক, ইমরা সগায় আসি গেইসে।'

'সে আসুক না। কী দেখাবেন দিন না।'

'আপনি কিছু মনে করিবেন না স্যাব।'
'কেন ?'
'এই জংলিগিলান এই জঙ্গলের ভিতবত্ চলি আসিছে।'
'তাতে আমাব কাজেব ত কোনো অসুবিধে হচ্ছে না—আপনি কী দেখাবেন, দেখান না।'
'দেখাছি স্যার, কিন্তুক মোর কুনো দোষ নিবেন না।'
'দোষগুণেব ব্যাপাবই নেই কিছু। এ ত আইনের ব্যাপাব।'
'না, এই জংলিগিলান আসি গেইসে।'
'ঠিক আছে, দিন না কী দেখাবেন।'
'হে-এ-এ বাঘাক', আবার বনমোরগের গলায় চিৎকাব কবে গয়ানাথ।
গয়ানাথের ডাক শুনে ভিডটাকে ঠেলেঠুলে একজন সামনে এসে দাঁড়ায়। ভিড়টাকে পেছনে ফেলে সে বেশি দূব এগিয়ে আসে না বলে বোঝা যায় না, গয়ানাথেব ডাক শুনে সেই সামনে এল কি না। গয়ানাথ বলে, 'যা কেনে, ঝট কবি যা, মৌজাব লাইনখান ধবি যাবি, বুঝিলু ?' নীববেই সেই লোকটি উত্তর দিকে চলে যায়, নদীর পাড ঘেঁষে, নদীভাঙাব লাইন পবীক্ষা কবতে একটু আগে যেদিকে সুহাস গিয়েছিল। সেই লোকটি এ-বকম চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর সুহাসেব মনে হয়—আগে কি এই লোকটিই চেয়াব মুছছিল আব গাছে উঠেছিল ? কিন্তু সেই লোকটিই কি ? ভিডেব দিকে তাকিয়ে সুহাস বুঝতে পাবে না। এতবার গয়ানাথবাবুর মুখে এই নামটা উচ্চাবিত হতে শুনেও সে যেমন লোকটিব নাম বুঝতে পাবছে না, তেমনি এই এত লোক সামনা-সামনি দল পাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও সে চিনতে পাবছে না—একটি মুখও। বা, একটি মুখ থেকে অপব মুখকে আলাদা কবতে পাববে না।
লোকটি চলে যাওযাব পব ভিডা একটু আলগা হয। অনেকে ওব সঙ্গে-সঙ্গেই উত্তর দিকে চলে যায় ঝোপেব আডালে-আডালে। আবাব অনেকে ঐ জাযগাতেই বসে পড়ে, হাঁটু জডিয়ে হেলে, আব কেউ-কেউ দাঁড়িযে-দাঁড়িয়ে বিনোদবাবু, সুহাস আব গয়ানাথকে লক্ষ্য কবে।
'স্যাব, আপনি ত এই জিলাব ম্যাপট্যাপ সব দেখি নিছেন ?'
'জেলাব ? হ্যাঁ। কেন ?'
'না, এমনিই, ধবেন, হামবালা ত তিস্তাব খুব পাখে খাডি আছি, আমাদেব পাছত, মানে ধবেন কি না আরো উত্তবে আর পুবে চালসা, হাযহায়পাথাব।'
'হ্যাঁ, সে ত জানিই।'
'সে ত জানিবেনই স্যাব। আপনাবা না জানিলে কায জানিবে ? আব এই যে তিস্তাখান, এব সরাসরি ঐ পাবে, পচ্চিমে, বৈকুণ্ঠপুব ফবেস্ট। এই তামানটাই ত ফরেস্ট আছিল সেই চালসাঠে হেই বোদাগঞ্জ।'
'তখন নদী ছিল না ?'
'সেইটাই ত বলি স্যাব, নদী থাকে, ফবেস্টও থাকে, মৌজাও থাকে, কিছুই যায না—'

সাতাশ

জমি জরিপ : গয়ানাথী পদ্ধতি

গয়ানাথ নদীর দিকে আঙুল দেখায়। আর সুহাস দেখে, দূরে নদীতে দুজন মানুষ ঘাসকুটোর মত ভেসে যাচ্ছে। সুহাস একটু অপ্রস্তুত চিৎকারই করে ওঠে, 'আরে আরে।'
'ছাড়ি দেন স্যার, অ ত বাঘারু।'
'মানে ?' জিজ্ঞেস করেই সুহাস যেন বুঝে ফেলে, 'কী ব্যাপাব, এরা কি নদীতে নামল নাকি ?'
'হ্যাঁ স্যার। যেইঠে এ্যালায় ভাসি যাছে ঐঠে ত মোর এই মৌজাখান শুরু।'
'তাই বলে আপনি এই বর্ষার তিস্তায় ওদের নদীতে নামালেন ?'

'ও ত বাঘারু স্যার, এ্যালায় উঠি আসিবে। আর মুই ত এক বাঘারুক নামিবার কইচছি। আর-একটা কায় নামিছে রে?' গয়ানাথ গলা তুলে জিজ্ঞেস করে।

'মইনুদ্দিন। ডোয়া-ডাবারির।'

'অ? মইনুদ্দিন। অয় ত চ্যাম্পিয়ন সাঁতারু স্যার। এ্যালায় মোর কাথাটা শুনেন স্যার। ঐ যেইঠে বাঘারু আর মইনুদ্দিন এ্যালায় পাক খাছে—ঐঠে বৈকুণ্ঠপুরের বোদাগঞ্জ আর এই আপলচাঁদ এক হয়্যা আছিল্। মোর বুড়া ব্যাপার, মানে মোর ঠাকুরবাবার, মানে ঠাকুরদাদার মৌজাখান ঐঠে আছিল্। কিন্তুক মুই এ্যালায় কি কছি যে ঐ যে মৌজাখান ঐঠে মোর নামে লিখি দেন? মোরঠে ওর দলিল আছে, ঠিকঅ। কিন্তু ঐঠে ত নদী। তিস্তা নদী। ঐ নদীখান ত আমি মানি নিছি। কিন্তুক তাই বলি কি এইঠেও নদী মানিবার নাগিবে?' বলে সে পাড়ের তলায় জল দেখায়—'এইঠে নদী না হয়, বর্ষার জল। বাঘারু এইঠে আসি গেলে দেখিবেন এইঠে জল নাই, সোতা নাই। যার জল নাই, সোতাও নাই—সেইটা কি নদী হবা পারে? এইটা নদী না হয়। এইটে আপনার দাগ নম্বর দিবা নাগিবে।'

এতক্ষণে সেই পুরো ভিড়টাই নদীর পাড়ে ঘেষাঘেষি করে ওদের সাঁতার দেখছে। সুহাসের কেমন অপ্রস্তুত লাগে।

গয়ানাথ তাকে সাঁতারে ফাঁসাবে সে ভাবতেও পারে নি। বিনোদবাবুও কি পারেন নি? নাকি তাঁর সঙ্গে গয়ানাথের বোঝাপড়া হয়ে গেছে কোনো! এই দুজনকে তার সামনে নদীতে নামানোর পেছনে গয়ানাথের কোনো মতলবও থাকতে পারে। যদি ঐ দুইজনের কিছু হয়? গয়ানাথের মতলবটা কী? সরকারি অফিসার হিশাবে তাকে কি কোনো কিছুর সাক্ষী রাখতে চাইছে? কিন্তু এখন কি সুহাস এখান থেকে সরে যাবে? সেটা যাওয়া যায়? ঐ লোকদুটো ওঠার আগে?

সুহাসের বাঁ পাশে গয়ানাথ। সুহাস তাকে বলে, 'আপনি এভাবে সময় নষ্ট করছেন কেন? আমাদের আজ সার্ভের প্রথম দিন। আমাদের ড্রাফট রেবলে আপনি যা প্রমাণ-সাক্ষ্য দেয়ার তা দিতে পারতেন। ওদের উঠতে বলুন।'

'ও ত এ্যালায় উঠি আসিবে। কিন্তু তার টাইম ত দিবা নাগিবে। ওরা কী আর স্রোত কাটাইয়া আসিবার পারিবে? স্রোত ধরি-ধরি আসিবার নাগিবে।'

এই তিস্তাটাকে আজ সকাল থেকে কতবারই না দেখতে হচ্ছে সুহাসকে। মাঝে-মধ্যে ত সে এমনিও তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখল। কিন্তু তিস্তার পেটে গয়ানাথের জমিতে গয়ানাথ তার দখলের প্রমাণের কথা তুলেছে যখন থেকে, যেন এই নদী আসলে নদী নয়—গয়ানাথের জোত, তখন থেকেই তিস্তা যেন আর দৃশ্য থাকছিল না, হয়ে উঠছিল তার এই সার্ভেরই ঘটনাস্থল। আর, এখন তিস্তা নদীর এই দিগন্ত-ছাপানো বিস্তারে, ঐ দুটো প্রায় অদৃশ্য মানুষ জলের ফেনার মত ভেসে যেতে-যেতে তিস্তাকে যেন ঢুকিয়ে দিচ্ছিল সার্ভে ম্যাপের লাইনের মধ্যে। সুহাস আবার বলে, 'ওদের পাড়ে উঠতে বলুন।'

'উঠিবার বলিলেই কি আর উঠিবার পারিবে স্যার? এ ত স্রোতে ভাসি-ভাসি ঘুরি-ঘুরি উঠিবার নাগিবে। উজানে গিয়া নদীতে নামিয়া শরীরখান ছাড়ি দিছে। এলায় ভাটিত গিয়া, ধরেন কেনে মাইলটাক ভাটিত গিয়া, বাঁয়ত মোড় নিবার পারিবে, ঐঠে একটা চরা আছে। সেইঠে সাঁতার কাটি এইঠে আসিবে।'

সুহাস দেখে তিস্তার ভেতরে লোক দুটিকে আর দেখা যাচ্ছে না। সে তাদের মাথায় চুলটকুও দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু তার পেছনের ও পাশের সেই ভিড়ের কেউ আঙুল তুলে দেখাচ্ছে—'ঐঠে ঐঠে', 'ভাসি গেলাক', 'আগত বাঘারু', 'হে-ই ডুবি গৈলাক হে।' ঐ আঙুল ধরে-ধরে তাকিয়ে সুহাস দু-একবার দুটো কাল বিন্দু দেখতে পায় বটে কিন্তু দেখামাত্র ঐ কাল বিন্দু দুটি এত দূরে ভেসে যায়, সে আর চোখ ঠিক রাখতে পারে না। কিন্তু যখন দু-এক মুহূর্তের জন্যে দেখে, তখন তার মনে হয় না ওরা কখনো ফিরতে পারবে, বা ফেরা সম্ভব—তিস্তার এই ধূসর বিস্তারে ঐ দুটি কাল বিন্দু এতই অবান্তর। 'হে-ই আর দেখা না যায়', 'চরটা পাই গেইসে।'

কে-একজন মদেশিয়া ভাষায় জিজ্ঞাসা করল, 'দুই মানুষ চর পাই গেলাক?'

'হয়। দুজনাই পাই গিছে।'

'এ্যালায় ফিরিবে।'

'কনেক বিশ্রাম করিবার নাগিবে ত হে।'

ছেলেটি এসে চা-টা রাখে।

'না, না, এখানে শুকনা লঙ্কা হয় কোটে ? এইঠে ত শুকনা লঙ্কা না হয়। ধরেন, এই ক্রান্তির হাটতও বছব খানিক আগতও শুকনা লঙ্কা না আছিল। তখন নারায়ণপ্রসাদের গোডাউন ছিল শিলিগুড়ি।'

'নারায়ণপ্রসাদ কে ?'

'এই ধরেন কেনে এই তামান এলাকার, আসামের, শুকনা লঙ্কার ডিলার। উমরার শুকনা লঙ্কার মালগাড়ি ত এখন মাল স্টেশনে আসে।'

'ত সে এখানে কী করে ?'

'নারায়ণপ্রসাদ বছর তিন আগে এইখানে একখান চা-বাগান কিনি নিসে। ত বাগান মাস ছয় পর হয়্যা গেইল বন্ধ। নারায়ণপ্রসাদ ওর এই বাগানের গোডাউনটাক বানাইল শুকনা লঙ্কার গোডাউন। ব্যস, সেই থাকি আসাম আর তামান-তামান জায়গায় সব পাইকারি বেচাকেনা হবার ধরিছে এই ক্রান্তি হাটত। স্যালায় ত ক্রান্তি হাটার এ্যানং নামডাক।'

'আর সেই চা-বাগান ?'

'সে ত বছর খানেক আগে খুলি গেইছে। ত ফ্যাকটরি ত আর চলে না। গ্রিনটি বেচা হয়্যা যায়। গোডাউনটা শুকনা লঙ্কারই আছে।'

সুহাসের চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। সে বলল, 'আর আলু ?'

'সে ত এই বছরই একখান ঠাণ্ডা ঘব চালু হবা ধরিছে ওদলাবাড়িত্।'

'ওদলাবাড়িতে ত এখানে কী ?'

'সে ত ঠিক বলিবার পারিম না। এইঠেও বুঝি একটা গুদাম থাকিবার পারে।'

সুহাস আগেই উঠে দাঁড়িয়েছিল। এখন আস্তে-আস্তে বেরতে শুরু করল। তখন ভদ্রলোক পেছন-পেছন এসে বললেন, 'আমাদের কথাটা একটু বিবেচনা করি দেখিবেন। এর মধ্যে ত কুনো দোষ নাই। আমাদের বাড়িঘরেরও ত সাগাইকুটুম আছে।'

ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বরে এমন কিছু আন্তরিকতা ছিল যার জন্যে সুহাসকে একটু ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতে হয়। কিন্তু দোকানেব মাঝখানটাতে বড় ভিড়। এদিকের বেঞ্চের একটা বড় দল খাওয়ার পর উঠে পয়সা দিতে যাচ্ছিল—প্রায় লাইন দিয়ে। বোঝাই যাচ্ছিল দলটা আসলে একটাই—ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে। ফলে সুহাসকে তাড়াতাড়ি দোকান থেকে বেবিয়ে দোকানের সামনে দাঁড়াতে হয়।

ভদ্রলোকও পিছু-পিছু এসে দাঁড়ান। সুহাস তখন তাঁকে বলতে পারে, 'আপনারা এ-রকম করে বললে আমারই লজ্জা হয়। হবে-খন, আমরা ত এখন থাকবই।'

ভদ্রলোক দুই হাত সামনে নিয়ে বিনীত ভঙ্গিতে মাথা হেলান।

প্রিয়নাথ একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। যখন সুহাসের সঙ্গে আরো দু-চারজন কথা বলছে তখন প্রিয়নাথ এগিয়ে এসে এদের পেছন থেকে বলে, 'স্যার, আমি ক্যাম্পে এগুলো' বেখে আসি ?'

সকলেই ঘাড় ঘুরিয়ে প্রিয়নাথকে একবার দেখে নেয়। আর তাদের দেখার সুবিধে করে দেয়ার জন্যেই যেন প্রিয়নাথ তার মুখটা আলোতে মেলে রাখে। এরপর ত তার সঙ্গেই সবাইকে কথা বলতে হবে।

'আপনি যান, আমি যাচ্ছি,' সুহাস প্রিয়নাথকে বলল। তারপর হঠাৎ ভিড়টা সরে গেল। সুহাস ভেবেছে সে এখন চলে যেতে পারে। কিন্তু ফাঁক দিয়ে বেরবার জন্যে পা ফেলতেই খুব ছোটখাট একটা লোক সামনে এসে নমস্কার করে দাঁড়াল, খুবই মৃদু গলায় বলল, 'আমার নাম নাউছার আলম।'

'অ্যাঁ !' বলে হকচকিয়ে সুহাস প্রতিনমস্কার করতে ভুলে গেল। নাউছার আলম—এই নামটা ত প্রায় গেজেটিয়ারে উঠে গেছে। সরকার বেশির ভাগ কেসেই হেরেছে—সুপ্রিমকোর্ট পর্যন্ত। বাকি জমিতে ইনজাংশন। নাউছার আলম—এই নাম শুনে যাকে ভেবেছিল ডাকাতের মত পরাক্রান্ত, সে কি না এ-রকম ছোটখাট ভদ্রলোক। কিন্তু ততক্ষণে অন্য সবার দিকেও ঘুরে-ঘুরে নমস্কার করে, খুব স্বাভাবিক ভাবেই 'আচ্ছা চলি' বলে ভদ্রলোক ভিড় থেকে বাইরে চলে গেছেন।

বার

শেষহাটি থেকে হাট শেষ

একটা চরম বিন্দু আছে যখন কোনো কিছুই আর হাটের বাইরে নয়। তখন যে হাটের রাস্তায় আছে, হাটে এসে পৌঁছয় নি—সে-ও হাটের ভেতরে ঢুকে যায় দূর থেকে। এই একটা সময়, যখন হাটটা যেন তার অব্যবহিত চারপাশের অনির্দিষ্ট সীমাটুকুও উপছে যায়। বেড়ে যাওয়ার ও জমে ওঠার সেই অস্পষ্টতায় হাটটা যেন আর হাটে ধরছে না। এই সময়ই নেমে আসে গোধূলি। মানুষের পায়ের ধুলোয় আবছায়া ঠেকে সব। কোথাও-কোথাও লম্বা কুপি জ্বলে উঠে দীর্ঘ-দীর্ঘতর ছায়ায় ছায়ায় হাটটার ভিড় যেন সহসা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়। আর এই অবস্থাটা কিছুক্ষণ চলতে-চলতেই দেখা যায়—সীমান্ত থেকে সীমান্তের দিকে চলে যাওয়া মুখগুলো আর এদিকে ফেরানো নয়, মুখগুলো ঘুরে গেছে, আদিগন্ত পথে-মাঠে মানুষের সারির মুখ এখন কেন্দ্রের বিপরীতে, দিগন্তের দিকে—হাট শেষ-ভাঙা ভাঙতে শুরু করে। কখন যেন হাটটা চরমে উঠে মিইয়ে গেল। মানুষজনের পায়ের দাগ বদলে গেল।

হাটে যাওয়ার পথে মানুষজন যত কথা বলে, যেন হাট থেকে ফেরার পথে তার চাইতে অনেক বেশি। নাকি, হাট থেকে ফেরা ত সব সময়ই অন্ধকারে, তখন ত আর মানুষজন পরস্পরকে দেখতে পায় না, তাই কথা বলে-বলে আন্দাজ নেয়। কথা বলে-বলে পথ বানায়। নাকি, হাট-ভাঙা মানে সমবেত ধ্বনির সেই কেন্দ্রটিই ভাঙা, তার টুকরোগুলো তখন চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে। রাত্রিময় ধ্বনিমগ্ন পথে-পথে গড়াতে-গড়াতে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে হাটটা শেষে ধুলোবালি ও আকাশে ছড়িয়ে-ছড়িয়ে যায়।

হাটের শুরুও শুরু হয় দূরের মানুষ নিয়ে। হাটের শেষও শুরু হয় দূরের মানুষ দিয়েই। যারা বাস ধরবে, তারা সবচেয়ে আগে হাট ছাড়ে। যাদের বাস হাট থেকেই ছাড়ে, তারা তারও পর। রিক্সা যাদের দাঁড়িয়ে থাকে, এর পরই তারা ওঠে। তাদের শেষে, সাইকেলের যাত্রীরা। এই পুরো সময় জুড়েই চলে পায়ের যাত্রীরা—যদিও তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে, ক্রমেই বাড়তে থাকে। আর দূর-দূর রাস্তার দূরত্ব থেকে মানুষের কণ্ঠস্বর সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে গুটিয়ে আসতে-আসতে শেষ পর্যন্ত হাটের আশেপাশের গাঁগঞ্জের মধ্যে মিশে যায়। সবচেয়ে শেষে আসে, শেষে যায়।

মানুষজন যে-ভাবে হাটে আসে সে-ভাবেই ত ফেরে, জিনিশপত্রের বোঝা নিয়ে, পশুপাখি ঝুলিয়ে, বা টেনে। মাঝখানে হাটে হাত বদল হয়ে যায়। ধীরে-ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকারে পশুপাখির চোখের সামনের অভ্যস্ত আলো বা অন্ধকার বদলে যায়। সব অনভ্যস্ততেই ত পশুপাখির ভয়। কিন্তু সেই নিরুপায় অন্ধকারে অভ্যাসের একমাত্র ধারাবাহিকতা থাকে মানুষের কণ্ঠস্বরে বা মানুষের স্পর্শে। হাটে আসা-যাওয়ার পথ এই পশুপাখির অনিশ্চয়তার ডাকাডাকিতে মুখর হয়ে যায়। বা পায়রা-হাঁস-মুরগির অনিশ্চিত নীরবতায়। 'হাম্বা' ডাক শুনে কি বলা যায় কোন বাছুর বিক্রি না হয়ে অভ্যস্ত হাতের টানে ফিরে চলে, আর কোন বাছুরের দড়িতে নতুন হাতের নতুন টান?

সেই অশ্বারোহী ও তার ঘোড়া এখন শূন্য হাটে পাক খায়। ঘোড়াটার পেছনটা এখন ঝোড়ো বাতাসে দোল খাওয়া চালাঘরের মত, আরো ঘন-ঘন দোল খাচ্ছে। এর পরই যে-কোনে সময় সম্পূর্ণ ভেঙে পড়বে। ঘোড়ার পেছনটাই শুধু দেখা যায়—তার দুটো পায়ের কেমন অনেকগুলো ভাঁজ বা পেছনের হাড় দুটো উঁচু। লেজটা দুই পায়ের মাঝখানে নেতিয়ে ঝুলে, মাছি তাড়াবার জন্যও আর উঠবে না, এমন। ঘোড়ার সামনেটা আর ঘোড়ার নয়। অশ্বারোহী দুই হাতে ঘোড়ার কাঁধের ওপর ভর দিয়ে মাথাটা ঝুলিয়ে বসে। সেই চাপে ঘোড়ার গলাটা লম্বা হয়ে ঝুলে গেছে। ক্রমেই গলাটা আরো লম্বা হয়ে যাচ্ছে। ঘোড়াটি গলা লম্বা করে ঝুলিয়ে দিয়েও ঘাসে মুখ দেয় না। তার পিঠের ওপর নিজেরই ঘাড়ের ভেতর মাথা গুঁজে দেয় অশ্বারোহী আর লম্বা করে দেয়া গলার তুলনায় ঘোড়াটার নড়বড়ে পেছনটাকে কেমন হালকা লাগে, যেন মাথাঘাড়সমেত ঘোড়াটা কোনো ফাঁদ গলায় নিয়েছে, আর এখন শুধু পেছনের অংশটুকুই তার নিজের।

সেই ঘোড়া আর তার আরোহী এখন এই শূন্য হাটের অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়ায়, যেন এখনো সেখানে হাট, যেন এখনো তাদের মানুষজন ঠেলে-ঠেলেই এগতে হচ্ছে। কিন্তু এখন আর অশ্বারোহী

তার ভিক্ষার ঝুলি কাঠির ডগায় ঝুলিয়ে এগিয়ে দিচ্ছে না। এখন আর ঘোড়াটিকে পেছনে ধাক্কা খাওয়ায় চমকে উঠতে হয় না। আর অস্পষ্ট চাঁদনিতে সেই ঘোড়া আর অশ্বারোহী ঘুমুতে-ঘুমুতে প্রায় নির্জন হাটের অলিগলি দিয়ে পাক খেতে-খেতে যেন মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে বস্তির দিকেই চলেছে। হতে পারে, এই অশ্বারোহী অন্ধ। হতে পারে, এই ঘোড়াটি অন্ধ। হতে পারে, এই ঘোড়া আর অশ্বারোহী দু-জনই ঘুমিয়ে পড়েছে। কোনো এক সময় পথ পেয়ে যাবে—তারপর আকাশের পটভূমিতে, নদীর চর ও অরণ্যের দূরত্বকে এই ঘোড়া আর তার আরোহী আদিগন্ত প্রান্তরের আলে-আলে কমিয়ে আনবে। ভাদ্রের আকাশের ধূসরতায়, নীল আর প্রান্তরের সবুজে, অবণ্যের কৃষ্ণাভ হবিতে এই ঘোড়া ও তার আরোহী কখনো মিশে যাবে, কখনো ঘোড়াটির লম্বিত গলাটিই ঝুলে থাকবে, কখনো ঘাড়ের ভেতব গুঁজে যাওয়া মাথা নিয়ে আরোহীর ছায়াটুকু ভেসে থাকবে, কখনো ঘোড়াব পেছনটা একটা ভাঙা মেশিনের মত লাফাতে-লাফাতে যাবে—যেন কেউ টেনে নিয়ে যাচ্ছে, কখনো নদীব দুই পাড়ে ছায়া—মাঝখানের জলটুকুতে ওদের ছায়া, কখনো জলহীন নদীখাতটুকু যেন ঘোড়ার চারটি পায়ের ভঙ্গুরতা থেকে উজিয়ে গেছে, কখনো নদীর বাঁধের ওপর ছায়ায়-আলোয়, নদীর ভিতর-চরে বালিয়াড়ি ভেঙে, বা অরণ্যের কোনো গাছতলায়। এখন মধ্যরাত্রিতে এই শূন্য হাটে বোঝা যায় না, এই ঘোড়া ও তার আরোহীর কোথাও একটা অবতরণ আছে।

বিকেল আর সন্ধ্যার সব দৃশ্য এখন রাত্তির গভীরতায় ছায়ামূর্তি হয়ে যাচ্ছে। যেন, নদী বা পাহাড়পর্বত বা বনজঙ্গলের মত এই হাটখোলাও একটা প্রাকৃতিক ব্যাপাব। যতক্ষণ এই হাটখোলায় মানুষজন ছিল, আলো ছিল, চঞ্চল ছায়া ছিল, পশু ও মানুষের আহ্বান ছিল—ততক্ষণ তার বিস্তার ছিল না, যেন সমস্ত দৃশ্যটাই ছিল সংহত, একান্ত। এখন, মধ্যবাত্রিবও পবে, এই জনহীনতায়, এই নৈঃশব্দ্যে, এই হাটখোলার প্রান্তর যেন তার প্রাকৃতিক বিস্তারে ফিরে যাচ্ছে—ধীরে-ধীরে, প্রায় কোনো সজীব অস্তিত্বের অনিবার্যতায়। এখন, এই রাত্রি আব অন্ধকারেব ভেতব থেকে সারাদিনের সেই ব্যস্ততাকেই কেমন অলীক ঠেকতে পারে।

কিন্তু হাটটা এখন সম্পূর্ণ জনশূন্যও নয়। অত পাহাড়-পাহাড় মাল সবই কি ফেরত গেছে। কিছু হয়ত আছে, কাল সকালে যাবে। সেই যে প্রায় শেষহীন মাটির হাঁড়ি। আব অন্ধকাব থেকে গো-হাটার গরুর হাম্বা। সারা হাটে, সেই হাটের পেছনের আপাত গোপন হাটেও, এখানে-ওখানে ঝরে পড়ে আছে দু-একজন মাতোয়ালা মানুষ—এখন অন্ধকারে তাদের গায়ের চামড়ার তামা বা কাল মিশে গেছে, নাকের মোঙ্গলীয় খর্বতা আর অস্ট্রিক শান হারিয়ে গেছে, তাদের কুঞ্চিত বা স্বল্প সরল চুলে ঢাকা মাথার খুলির আকার অন্ধকার থেকে আর আলাদা করা যায় না। আজ সারারাত তাদের ওপর শিশিরপাত ঘটবে অবিরত। ভেতরে-ভেতরে তপ্ত সেই শরীর শিশিরে-শিশিরে ঠাণ্ডা হবে। কাল সকালে, বা রাতেই কখনো, এই মানুষজন তাদের নেশামুক্ত পায়ে আবার ফিরে যাবে পাহাড়ে, নদীর চরে, বনের ভেতরে।

আর এখন এই পুরো প্রকৃতি ছায়াময়—যেমন হয়, যখন উঠে আসার আগে চাঁদ দিগন্তের নীচে, বা, চাঁদকে আড়াল দিতে-দিতে সহসা কোনো পাহাড় বা টিলা উঁচু হয়ে উঠতেই থাকে, বা, মাঝখানে মাইল-মাইল ফরেস্টের ওপারের অববাহিকায় চাঁদ।

তের

সাহেবের আত্মবিলাপ

সুহাস বলে ফেলেছিল, যা হক, ক্যাম্পেই রান্না করবে—সেই জন্যই ত শেষ পর্যন্ত জ্যোৎস্নাবাবু-বিনোদবাবুও সেটা মেনে নিলেন। এ যেন, মন্ত্রীদের মত দু-কোপ মাটি কেটে হাড়কালি মেহনতের মানুষজনকে অনুপ্রাণিত করার নামে অপমান। জ্যোৎস্নাবাবু ত তার স্টাফ নন। প্রাইভেট আমিন। বিনোদবাবুদের চেনা লোক। সঙ্গে থাকলে কাজ খুব তাড়াতাড়ি এগয়। পার্টিরা ওঁকে দিয়ে

কাগজপত্র তৈরি করে নেয়। কিন্তু কর্মচারীদের সামনে তাকে যে এ-রকম একটা 'উদাহরণ' হয়ে উঠতে হল এতেই সুহাসের নিজের ওপর এত বিরক্তি। আর, ব্যাপারটা এত 'আলোচিত-প্রচারিত' হওয়ায় যেন একটা 'নৈতিক কর্মসূচি'-র, না কী যেন, 'অ্যান্টিকরাপসন ড্রাইভ'-এর চেহারা নিল। যেন সুহাস কোনো নৈতিকতা বা সংস্কারের প্রয়োজনে এমন একটা ব্যবস্থার কথা বলেছিল!

কিন্তু সুহাসের বিরক্তিটা বাড়ে এই কারণে যে বিকল্পটাও সে বুঝতে পারে না। সে কি এখন হাট কমিটির জোতদার আর চা-বাগানের ম্যানেজারদের বাড়িতে বা বাংলোয় গেস্ট হয়ে এখানকার জমিজমার বেআইনি দখল বা আইনি দখল বা জমির আইনসঙ্গত পরিমাণ এই সব নির্ণয় করবে? আবার, এখানেও সুহাস আর-এক প্যাঁচে পড়ে যায়—সে কি সেটলমেন্টের অফিসার হয়ে এসে এই এলাকায় ভূমি-বিপ্লব ঘটাচ্ছে না-কি? তার কাজ ত রেকর্ড করা। রেকর্ড করার সময় দু-এক জায়গায় হয়ত সত্যনির্ধারণে তার বুদ্ধি বা বিবেচনাশক্তি, বা তার চাইতেও বেশি, ইচ্ছাশক্তি দবকার হতে পারে। এবার আছে বর্গাদার রেকর্ডিং। কিন্তু কেউ রেকর্ড করাতে চাইলে সে রেকর্ড করবে। সুহাস খুব ভালই জানে জমির ওপর আধিয়াবের দখলটা যেখানে নির্ভর করে জোতদারেরই ওপর—নিজের বা নিজের মতই আরো অনেকেব দখলবোধেব ওপর নয়—সেখানে বর্গাদার রেকর্ডিং করাতে জোতদারও আসে না, বর্গাদারও আসে না। অপারেশন বর্গা ত সরকারের একটা আইন—যা আরো নানা আইনের মত ফাঁকি দিতে হয়।

এত জেনেশুনেবুঝেও সুহাস এই মাল এলাকা নিয়ে এত ম্যাপট্যাপ দেখে, এঁকে, সেনসাস রিপোর্ট-টিপোর্ট ঘেঁটে, এত-এত তৈরি হল কেন।

এই মধ্যরাত্রিতে সুহাসের নিজের কাছেই নিজের এই দ্বিচারণ যে ধরা পড়ে যায়, সে কারণেই সে বিরক্ত হয়ে ওঠে। তার কোনো ক্ষমতা নেই জেনেও, আর এই সব রেকর্ডিং করে কিছু সমাধান সম্ভব নয় জেনেও, সে ত নিজেকে তৈরি করেছে যদি কিছু করা যায় তার জন্যেই।

সুহাস কি তা হলে বেঁচে যেত যদি সে নিজেব খাওয়ার ব্যবস্থা নিজে করে নিত আর অফিসের কর্মচারীবা চিরকাল যা হয়ে আসছে তেমন ব্যবস্থাই মেনে নিতেন? কিন্তু জোতদার বা চা-বাগান ত আর বিনা স্বার্থে লোকগুলোকে খাওয়াত না। তা হলে ত এই কর্মচারীরাই তার হাত দিয়ে চা-বাগান আর জোতদারের কাজগুলো করিয়ে নিত। সব কিছুতে, সরকারে-সংগঠনে-আইনে ও তার ব্যক্তিগত ভূমিকাতে, যতই অবিশ্বাস করুক সুহাস—তার হাত দিয়ে জোতদার আর চা-বাগান কলকে খাবে এটা সে মেনে নেয় কী করে?

কিন্তু তার সততাপনায় বাধ্য হয়ে এই কম মাইনের কর্মচারীরা তাঁদের ডেইলি অ্যালাউন্সের টাকা কটা বাঁচাতে পারবেন না; অথচ একসঙ্গে এতগুলো টাকা পাওয়া যাবে বলে হয়ত খরচ-খরচার একটা প্ল্যানও তাঁরা পরিবারে ছকে রেখেছেন। এই আত্মত্যাগ করে যাওয়ার জন্যে আদর্শের যে-ডোজ অবিরত দিয়ে যাওয়া দরকার তা সুহাস পাবে কোথায়? আর দেবেই-বা কেন? তা হলে কি উচিত হয়েছে ওঁদের এতটা ক্ষতি করা? সুহাস ত ওঁদের চাইতে অনেক বেশি মাইনে পায়। তার ডেইলি অ্যালাউন্সও অনেক বেশি। তার বেশি টাকা মাইনের বেশি সুযোগ-সুবিধেয়, কম পারিবারিক খরচার ফাঁকে, একটু বাড়তি টাকা থাকে বলেই কি সুহাস নৈতিকতায় আদর্শস্থল হয়ে ওঠাব দম্ভ দেখায তার অধস্তন কর্মচাবীদের সামনে?

এর সঙ্গে-সঙ্গে সুহাসকে আর-একটা সন্দেহে জড়িয়ে পড়তে হয়। অফিসের কর্মচারীরা অ্যান্টি করাপসন ড্রাইভ'-এ যেমন তাকে সমর্থন দিতে বাধ্য, তেমনি সেই কারণে যে-আর্থিক ক্ষতি হবে তা পুষিয়ে তুলতে অন্য কোনো ব্যবস্থা কি নেবে না? শুধু খেলে ত না হয় গৃহকর্তার কাজটুকু করে দেয়ার দায় থাকত। এখন কি ঘুষ আরো ব্যাপক হয়ে উঠবে না? অর্থাৎ সুহাসের হাত দিয়ে অনেক বেশি কলকে খাওয়ার চেষ্টা হবে না? তা হলে, সুহাসকে কতদিকে চোখ রাখতে হবে? কোন দিকে? একটা দিকের দায় মেটাতে সুহাস নিজেকে আরো কত প্যাঁচে জড়িয়ে ফেলল? আর, সুহাসের যাতে গা ঘুলিয়ে ওঠে, সেই ব্যক্তিগত নীতিবায়ুতেই কি সে জড়িয়ে পড়ল তার অফিস-টফিস সমেত? কিন্তু এ ত আবার অফিসার হিশেবেও তার করণীয় বা কর্তব্য—বেঙ্গল সার্ভিস রুল বা ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট হ্যান্ডবুকে নির্ধাবিত। শেষে, সুহাস কি তার ব্যক্তিগত নীতিবায়ুজনিত আত্মদ্বন্দ্ব মেটাতে ব্যুরোক্রেসির নীতিতন্ত্রের

নৈর্ব্যক্তিকে পরিত্রাণ খোঁজে, এই মধ্যরাতে, তেতো মনে ? যেন, অফিসার বলেই তার আচার-আচরণের দ্বারাই সৎ-অসৎ, ভাল-মন্দ নির্ধারিত হবে ? সে রান্না করে খাবে বলেই এঁরাও রান্না করে খাবেন ? আমলাগিরির এমন নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থার মধ্যে সুহাস এমন 'ফিট' হয়ে যাচ্ছে কেমন করে ? নাকি, সাহেবদের তৈরি ব্যবস্থায় এমনি ভাবেই 'ফিট' হয়ে যেতে হয় ? সুহাসের চাকরি জীবনের এই প্রথম ক্যাম্পেই।

চৌদ্দ

ফরেস্টারচন্দ্রের আত্মঘোষণা

এখন এই মাঠটা একটু স্পষ্ট। হাটখোলার চালা আর ঘবগুলো মিলে ছায়ার একটা নকশাও তৈরি হচ্ছে ; সেই নকশাটা ধীরে-ধীরে বোনা হচ্ছে—আকাশের পটভূমিতে। ধীরে-ধীরে সেই নকশার কারিকুরি বাড়ছে, বিস্তাব বাড়ছে। ঝোপঝাড, ফাঁক-ফুকর—সেই নকশার ভেতর এসে যাচ্ছে। ধীরে-ধীরে এসে যাচ্ছে দূরেব, প্রায় দিগন্তবেখাব গাছ-গাছালি। আর তারও পরে, বড়-বড় গাছের মাথা। এখন, এই সমস্ত পরিবেশটাকেই নানা ধরনের ও দূবত্বের ছায়া দিয়ে-দিয়েই আন্দাজ কবা যায়। ছায়াগুলো এত ধীবে-ধীবে বাড়ে আব ছড়ায়, ধীবে এত বেশি দূবত্ব ছায়ায়-ছায়ায় আভাসিত হয়, যেন, যে-কোনো মুহূর্তে এই স্থিব ছায়া চঞ্চল হয়ে উঠতে পাবে বা, এই স্থির ছায়াগুলির ভেতর দিয়ে কোনো চলচ্ছায়া চলে গিয়ে ছায়াময় পবিস্থিতিকে জ্যান্ত কবে তুলতে পাবে।

নানা উচ্চতাব আব বেধের ছায়া যত স্পষ্ট হচ্ছিল—নীচটা যেন ততই হয়ে উঠছিল অস্পষ্ট, অন্ধকাব। সেই নাচেব মাঠ, সদব বাস্তা আর হাটে ঢুকবার নানা গলিঘুঁজিতে অন্ধকারটা একটু বেশি জমাট বাঁধা। উঁচুতে, দিগন্তে ত বেশি নতুন-নতুন ছাযার মাথা যে সেই গোডার অন্ধকারটা যেন আরো তলানিতে পড়ে যায়।

মাঠটাব ভেতরে সেই তলানিটুকু আলোড়িত হয়ে উঠছিল। অবশ্য আকাশের, দিগন্তের, নীরব অথচ দ্রুত ছায়াময় বদলের অনুষঙ্গেই মনে হতে পারে তলার এই অন্ধকারও বদলাচ্ছে। রাত্রি ও অন্ধকার ত সবটুকু ব্যেপেই রয়েছে। তাই তার এক সীমান্তের আলোড়ন হয়ত আরেক সীমায় ঢেউ তোলে, ক্ষীণ।

জলের ভেতরের কোনো আলোড়ন যেমন সেই জায়গার ভেতর থেকে জলটুকুকে আলোড়িত করে—অন্ধকারটাও তেমন হচ্ছিল। একটা গোঙানিও যেন শোনা যায়—তবে রাত্রিতে ত কত রকমই আওয়াজ ওঠে।

আলোড়নটা যে অন্ধকারের নয় ও আওয়াজটাও যে শুধু রাত্রিরই নয়—সেটা বোঝাতেই ঐ অন্ধকারটা ধীরে-ধীরে একটা কঠিন আলোড়নের আকার নেয়, গভীর নিভৃতিতে বাঘিনীর একা-একা খেলায় যেমন আলোড়ন ওঠে ঝোপঝাড়ে। তারপর সেই অন্ধকারটা ফুঁড়ে একটা মানুষের দাঁড়ানোর নানা চেষ্টা আর বারবারই পড়ে যাওয়া ঘটতে থাকে—নদীর স্রোতে ভেসে যাওয়া ডুবো মানুষের যেমন হাবুডুবু দেখা যায়। তার দাঁড়িয়ে ওঠাটাই যেন একটা কঠিন কাজ হয়ে ওঠে তার পক্ষে, যেমন সার্কাস-দেখানো যে-কোনো চারপেয়ে পশুরই হয়। কী অসম্ভব কষ্টে তাকে দু-পায়ের ওপর দাঁড়াবার চেষ্টা করে, আবার ভেঙে যেতে হয় নিজের শয়ান অস্তিত্বে।

এমনি করে এক সময় লোকটি দাঁড়িয়েই ওঠে। দাঁড়িয়েই থাকে তার গায়ে অন্ধকারের এক পুরু পলেস্তারা লাগিয়ে। দাঁড়িয়ে থাকে আর টলে। তাতে অন্ধকারটা টলে না অবশ্য, কিন্তু অন্ধকারের গাঢ়তার একটা তারতম্য ঘটে। তারতম্যের সেই সামান্য তফাতেই লোকটির ভঙ্গির আভাস মেলে—তা ছাড়া সবটাই ত ছায়া। পটভূমির ছায়ার লাইনটার ফাঁক দিয়ে মাঝেমধ্যে একটু আকাশ, তার মাথার ওপর তোলা দুই হাতের দশটি আঙুল আর মাথার চুলের ছায়াময় রেখাগুলিকে প্রখর করছিল। সেখানেও, ডুবো মানুষের মতই, লোকটি হাতটাই নাড়ায়।

লোকটি দাঁড়িয়ে ওঠার পর আর-কোনো গোঙানি শোনা যায় না। যেন, গোঙানিটা এতক্ষণ ছিল তার দাঁড়িয়ে ওঠার চেষ্টারই আনুষঙ্গিক আর, দাঁড়িয়ে ওঠার পর, দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টায় সে কোনো আওয়াজই করছিল না।

অনেকক্ষণ পর, মাটির দিকে তাকিয়ে কথা বললে যেমন আত্মগত আওয়াজ বেরয় গলা দিয়ে, তেমনি স্বরে লোকটি ডাকে, 'হু-জ্-উ-র।' সে এই ডাকটি ডাকার আগেই তার গলায় একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ উঠেছিল। ডাকটি শেষ হয়ে গেলেও আওয়াজটি থাকে। জোরে ঢোক গিলে সেই আওয়াজটাকে বন্ধ করে। জোরে ঢোক গিলতে গিয়ে তাকে গলার ভেতরে যে-অতিরিক্ত জোর চালান করতে হয়, তাতেই তার ঘাড়টা তার বুকের ওপর ঝুলে পড়ে। ও-রকম ঝুলেই থাকে, যেন মাথাটা তার মাথা নয়, গলার লকেট।

দুমড়ে-মুচড়ে গলাটাকে শক্ত করে সে তোলে। বেশি নাড়ায় না, পাছে আবার ঝুলে যায়। শক্ত অবস্থাতেই সামনে জোরে হাঁক দেয় 'হা—কি—ম।' দ্বিতীয় হাঁক দিতে পারে না। তা হলেই মাথাটা মুচড়ে ভেঙে যাবে, মাথাটা শক্ত রাখা দরকার। কিন্তু মাথা আর শক্ত রাখা যায় কতক্ষণ। সেটা যখন নিজের ভারেই নুয়ে ঝুলে পড়তে চায় বুকের ওপর, তখন লোকটি মাথাটা জোর করে পেছনে ভেঙে দেয় আর আকাশের দিকে তাকিয়ে ডাকে, 'সা-হে-ব'।

লোকটি যেন তার হুজুর-হাকিম-সাহেবের আকাশ থেকে নেমে আসাটা দেখে। বেশ কিছুটা সময় লাগে ত আকাশ থেকে নামতে। কিন্তু তার হাকিম মাটিতে পা ফেলার সঙ্গে-সঙ্গে ত আর সে ঘাড় সোজা করে হাকিমকে দেখতে পারে না। তাকে ঘাড় তুলতে সময় নিতে হয়। তুলে, সে অন্ধকারের মধ্যে হুজুরকে খোঁজে—এদিকে-ওদিকে, এ-কোনায় ও-কোনায়, তারপর একদিকে সোজা কয়েক পা গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বলে, 'হুজুর, মুই আসি গেছু, মুই ফরেস্টারচন্দ্র বাঘারুবর্মন।'

ফরেস্টার তার দুটি হাত জোড়া করতে চায়। কিন্তু সেটা কিছুতেই হয়ে উঠতে পারে না। দুটো হাতের যেন দু-ধরনের গতি ও ভার। বাঁ হাতটা ওঠে ত ডান হাতটা ওঠেই না। বাঁ হাতটাকে নমস্কারের ভঙ্গিতে অনেকখানি তুলে ফরেস্টার চোখ কুঁচকে দেখে তার ডান হাতটি নেই, চোখটা আরো পাকিয়ে সে যেন বুঝে উঠতে চায়, ডান হাতটা গেল কোথায়। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে নেহাতই অকস্মাৎ তার ডান পাশে সেই হাতটাকে খুঁজে পায়। তখন সেই হাতটাকে বাঁ হাতের কাছে আনার জন্যে তুলতে থাকে। তাকিয়ে-তাকিয়ে একটু-একটু করে। এদিকে বাঁ হাত আবার ঝুলে যেতে থাকে। কিছুটা ঝুলে যাওয়ার পর সেটাও ফরেস্টারের নজরে পড়ে। সে তখন দুটো হাতকেই স্থির করে একবার বাঁ, আর একবার ডান হাতের দিকে তাকায়। এ-রকম বারদুয়েক তাকানোর পর আর দেরি না-করে সে হঠাৎ দুটো হাতকেই নমস্কারের জায়গায় টেনে নিয়ে আসে। একটু বাঁকাচোরা ভাবে দুটো হাতই জোড়া লেগে গেলে ফরেস্টার সেই জোড়াহাতের দিকে তাকিয়ে খুব হাসে, যেন সে দুই হাতের গোলমাল ঠেকিয়ে দুই হাতকে খুব জব্দ করতে পেরেছে। আপন মনে হাসতে-হাসতে জোড়াহাতের দিকে তাকিয়ে ফরেস্টার বলে, 'এ্যালায় ?' বলে, আবার হাসে।

এবার আর জোড়াহাতটাকে মাথায় না তুলে, সে মাথাটাকেই জোড়াহাতের ওপর নামিয়ে আনে। নামাতে তার সময় লাগে। মাথা ঠিক সমান ভাবে নামতে চায় না—ভেঙে দুমড়ে ঝুলে যেতে চায়। কিন্তু ফরেস্টার এখন ঝুলে যেতে দেয় না। সে ধীরে-ধীরে মাথাটাকে জোড়াহাতের কাছাকাছি নোয়াতে চায়। হাত দুটো একটু এলোমেলো ভাবে জোড়া লেগেছিল, আঙুলগুলো ঝুলছে, কব্জিটা ওপরের দিকে। কব্জির ওপরে কপাল ঠেকায় ফরেস্টার। তারপর হাতদুটো জোড়া রেখেই সে মাথাটা সোজা করে। ধীরে-ধীরে সোজা করতে-করতে হঠাৎ সোজা হয়—যেন খট্‌ করে শব্দও হল ঘাড়টা ফিট হয়ে যাওয়ার। তারপর ফরেস্টার কথা শুরু করে, 'হু-জু-উ-র, মুই ফরেস্টারচন্দ্র আসি গেইছু।' এটুকু বলতেই জোড়াহাতের দিকে নজর পড়ে। তখন, যেন ছিঁড়ে আলাদা করতে হচ্ছে এমন ভাবে, ফরেস্টার হাতদুটোকে পরস্পর থেকে আলাদা করে, সোজা দাঁড়ায়। এবার হেসে বলে, 'হুজুর, আসি গেইছি। মুই ফরেস্টারচন্দ্র। ফরেস্টারচন্দ্র বাঘারুবর্মন। দেখি নেন। মোর মুখখান, দেহখান, দেখি নেন। টর্চ ফিকেন, কি ম্যাচিসের কাঠি জ্বালান। দেখি নেন। ওয়ান-টু-থিরি—'

যেন একটা টর্চ সত্যি জ্বলল, ফরেস্টার এমন ভাবে দাঁড়ায়। তার দুই চোখ হাসিতে বুজে গেছে। তার মোটা-মোটা দাঁতগুলি বেরিয়ে আছে। সে সেই হাসিমুখ আবার ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখায়। যেন, তার

ফোটো তোলা হচ্ছে। বাঁয়ে একবার, ডাইনে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে সোজা হয়ে ফরেস্টার জিজ্ঞাসা করে, 'হুজুর। দেখি নিছেন তো মোক ? ভাল করি দেখি নিছেন ত ? মোর নামখান ফোমে রাখিবেন হুজুর, ফরেস্টারচন্দ্র বাঘারুবর্মন। বাপাখানের নাম হইল··· । কিন্তু বাপাখানের কথা ছাড়ি দাও। বাপার বাদে অনেক কাথা। মোব নিজের-কাথাটা আগত শুনাবু তোমাক।'

সেই কথাটা শুরু করতে গিয়েও ফরেস্টার থেমে যায়। হঠাৎ দুই হাতের পাতা দিয়ে চোখ ঢাকে, 'তোমার টর্চের আলোখান মোর চোখদুইটা ঝলঝলাই দিছে হে হুজুর। চক্ষুর পাতাখানের উপর আলোর তারা চকমকাছে, চকমকাছে—য্যানং তিস্তার চরত বালি চমকায়। খাড়াও হে হুজুর, এই চকমকিখান একটু কমিবার ধরুক।'

দুই হাতের পাতায় চোখ ঢেকে, ফরেস্টার অন্ধকারকে আরো অন্ধকার করছিল। নীরবতা তৈরি হচ্ছিল। সে-নীরবতায় এতক্ষণের কথাবার্তাগুলোও মিলিয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে সেই নীরবতার ভেতর থেকে ফরেস্টার শুরু করে, 'শুন হে হুজুর, কাথা মোর একখান। না হে, একখান না হয়, দুইখান। কাথা মোর দুইখান। কী দুইখান কাথা ? একখান কাথা হইল্ যে তোমরা ত জমির হাকিম। ত মোব নামখান তুমি কাটি দাও। মোর জমিঠে মোর নামখান তুমি কাটি দাও। মোর একখান ত জমি আছিল্। আপলচাঁদ ফরেস্টের গা-লোগো। মোক ঐঠে পাঠায় গয়ানাথ জোতদার। হাল-বদল-বিছন সগায় ওর। মুই হালুয়া আছিল্ কয়েক বছর। অ্যালায় আর নাই। মোর নামখান কাটি দাও। ঐ জমিখান লিখি দাও গয়ানাথ জোতদারের নামত্। বলদ যার, বিছন যার, হালুয়া যার, ধান যার—জমি ত তারই হবা নাগে হুজুর। ত ঐ জমিখান মুই, ফরেস্টারচন্দ্র বাঘারুবর্মন, ছাড়ি দিছু। লিখি দাও, শ্রীফরেস্টারচন্দ্র বাঘারুবর্মনক এই জমিঠে উচ্ছেদ দেয়া গে-এ-এ-ই-ল্।'

হাঁকটা শেষ করে ফরেস্টার হেসে ওঠে। হাসির ঝোঁকে শরীরের সামাল ঢিলে হয়ে যায় বলে একটু টাল সামলায় হাসতে-হাসতেই। হাসিটা শেষ হলে ফরেস্টার একটা তৃপ্তির আওয়াজ তুলে বলে, 'ব্যাস্, হুজুর। মনত রাখিবেন। আপলচাঁদের ফরেস্টারচন্দ্র বাঘারুবর্মন উমরার দেউনিয়া-জোতদার গয়ানাথ রায়বর্মনাক উচ্ছেদ দিয়া দিল্। গয়ানাথ সব শিখিবার চাছে। কহে, হে ফরেস্টার, মোক হালুয়াগিরিখান শিখি দে। বাপপিতামহর কামটা মুই ভলি গেছু, মোক শিখি দে। ত মুই নিচয় শিখি দিম। হুজুর, কালি আমি গয়ানাথক সব শিখাই দিম, ক্যানং করি হাল দিবার নাগে, মই দিবার নাগে, পাতা গুছিবার নাগে, ছাই ছড়ি দিবার নাগে, কোদা করিবার নাগে, রোয়া গাড়িবার নাগে—সব শিখাই দিম—কালি সকালে। ব্যাস, কালি সকালঠে গয়ানাথই জোতদার, গয়ানাথই হালুয়া। মুই এ্যালায় যাছ, গয়ানাথের বাড়িত, উমরাক হালুয়াগিরি শিখাবার তানে।'

ফরেস্টার যাওয়ার জন্য পা বাড়ায়। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, 'কিন্তু [illegible] ত দুইখান কাথা আছে। একখান কাথা মুই ফরেস্টারচন্দ্র এ্যালায় গয়ানাথ জোতদারক খালাশ দিছু। মনত রাখিবেন হুজুর, ফরেস্টারচন্দ্র বাঘারুবর্মন। এইঠে ত অনেক ফরেস্টার। অনেক বর্মন। কায় সাচা আর কায় মিছা ? হুজুর ! দেখি নেন। যেইলা ফরেস্টারচন্দ্রের বাঁ পাছাত আর ডাহিন পিঠত বাঘের দুইখান থাবার দাগ আছে ঐলা ফরেস্টারচন্দ্র আসল। ত দেখাও। সগায় পাছার কাপড় তুলি দেখাও। তুলো হে তুলো। পাছার কাপড় তুলো আর পাছাখান ঘুরাও।' ফরেস্টার নাচের ভঙ্গিতে ঘুরপাক খায় আর খিলখিল হাসিতে যেন তার চারপাশের অনুপস্থিত ভিড়ের এক-একজনকে আঙুল দেখিয়ে বলে, 'তুলো, তুলো, পাছার কাপড় তুলো', ফরেস্টার পাক খায় আর আঙুল দেখায়, 'তুলো, তুলো।' এক পাক ঘোরা হয়ে গেলে ফরেস্টার মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, 'কায়ও দেখাবার পারিবে না, হুজুর। সগার পাছা ঢাকা থাকিবে। সগার পাছাত হাগা আছে, বাঘা নাই। কিন্তুক মুই সাচা ফরেস্টারচন্দ্র বাঘারুবর্মন—আদি। মুই মোর পাছাখান এ্যানং উদলা করি দিম। খাড়াও হে হুজুর। তোমার টর্চখান আর চোখ্ত না ফেলো। হ্যাঁ, রেডি। ওয়ান-টু-থিরি।'

ফরেস্টার তার পরনের কানিটুকু সরিয়ে পেছনটা উদোম করে দেয় আর যেন টর্চের আলো সত্যিই পড়েছে এমন ভাবে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখায়, এক পাক, তার চার পাশে যেন সত্যিই দেখবার লোকের জটলা।

পাক শেষ করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ফরেস্টার বলে, 'ব্যাস, হুজুর। এ্যালায় ত জানি গিছেন, যায় বাঘারু সে-ই সাচা ফরেস্টারচন্দ্র। এইঠে ফরেস্টার ত অনেক হুজুর—বর্মনও হুজুর অনেক। রায়বর্মনও

কনেক-আধেক আছে। কিন্তুক বাঘারুবর্মন এই একোটাই। ত মুই যাছ হুজুর। গয়ানাথক হালুয়াকাম শিখাবার যাছি। তোমরালা কাল রায় দিয়া দিবেন—বাঘারু তার জমি গয়ানাথ জোতদারক দিয়া দিছে, এ্যালায় গয়ানাথ হালুয়া হবা ধরিবে-এ—।'

'ত মুই যাছ হুজুর', বাঘারু কয়েক পা গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, 'হুজুর, একখান সিগারেট খায়্যা যাছু।' বাঁ কান থেকে একটা সিগারেট বের করে বাঘারু ঠোঁটে লাগায়। পোড়া সিগারেটের শেষাংশ। ডান কানের পেছন থেকে দেশলাইয়ের কাঠি আর কানের ভেতর থেকে দেশলাইয়ের বারুদ-লাগানো একটা টুকরো বের করে আনে। তারপর সিগারেট ঠোঁটে চাপাস্বরে বলে, 'সাহেব ভাবিছেন মুই মাতাল খাছি। দেখো কেনে, কেনং ফস করি জ্বালাম কাঠিখান। ওয়ান-টু-থিরি।' প্রথমবার জ্বলল না। দ্বিতীয়বার জ্বলল। শিখাটিকে বাঁচাতে তার দুই পাঞ্জার ঘের দেয়। ওটুকু বেঁকোতেই তার শক্ত পাঞ্জায় টান ধরে, যেন ভেঙে যাবে। পাঞ্জার ওপর আনত মুখে ঐ অন্ধকারে খোদাই হয়ে যায় অনড় দৃঢ় মোঙ্গোলীয় স্থাপত্য। সিগারেটটা ধরিয়ে, কাঠিটা ফেলে দিয়ে, নাক-মুখ দিয়ে বাঘারু যত ধোঁয়া ছাড়ে তাতে মনে হয় সিগারেটটা একটানেই শেষ হয়ে গেছে। সিগারেটটা নামিয়ে বাঘারু তাকিয়ে-তাকিয়ে আগুন দেখে।

পনের

সার্ভে পার্টির যাত্রা

সুহাস টের পেয়েছিল যে ওঁরা জেগেছেন ও তৈরি হচ্ছেন। কিন্তু সারা রাতের ঘুম তখনই যেন চোখ ঝাঁপিয়ে আসে। সে পাশ ফিরে শোয়। কিন্তু পাশের ঘরের আওয়াজ আরো বাড়ছে। সকাল ছটা থেকে কাজ শুরু হবে সেই তিস্তা পারে— তারপর আপলচাঁদের দক্ষিণ কিনারা দিয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে এগবে। এখান থেকে হাঁটতে হবে দু-তিন মাইল। এখনই না-উঠলে দেরি হয়ে যাবে।

এ-কথা ভাবতে-ভাবতেই দরজায় টোকা পড়ে— 'স্যার'। বিনোদবাবুর গলা।

'হুঁ,' সাড়া দিয়ে সুহাসকে উঠতে হয়। চোখ খুলতে পারে না, এত জ্বালা করে। ফলে, পা-টা কিছুতেই স্যাণ্ডেলে গলাতে পারে না। দরজা খুলে সুহাস বেরিয়ে দেখে তার ঘরের সামনে বারান্দায় একটা বড় বালতিতে জল, পাশে মগ।

মুখ ধোয়া শেষ হতে-হতেই প্রিয়নাথ একটা কাপে চা নিয়ে সুহাসের টেবিলে রেখে আসে। এইবার সুহাস বুঝতে পারে, তাব পার্টির আর-সবাইই একেবারে তৈরি হয়ে আছে, শুধু তার জন্যই দেরি। সে অবিশ্যি এখুনি তৈরি হয়ে যাবে, কিন্তু প্রথম দিন সে সবার শেষে তৈরি হচ্ছে এতে সুহাস একটু লজ্জা পেল। তবে তাকে কেউ যেমন তাগাদা দিল না, তেমনি বিনোদবাবু বা অনাথ-প্রিয়নাথ কেউই খুব তাড়াহুড়োও করছে না। ওরা যেন জানেই সুহাসের দেরি হবে। বা, সুহাস যখন বেরবে তখনই কাজ হবে—তাই ওদের কোনো উত্তেজনা নেই।

চা খেতে-খেতেই সুহাস দ্রুত জল নিয়ে এল ও দাড়িতে সাবান ঘষতে শুরু করল। সুহাস ভেবেছিল দু-চুমুক চা খেতে-খেতেই দুই টানে দাড়ি নামিয়ে দেবে। নামালও তাই, কিন্তু ঠেকে গেল গোঁফে। গোঁফে তাড়াহুড়ো করলে সময় আরো বেশি লাগবে। তাই সুহাস ব্লেডটা আস্তেই চালাতে চায়। কিন্তু আঙুলটা যেন ঠিক থাকে না। সুহাস তাড়াতাড়ি ব্লেডটা তুলে নিল। আর আয়নায় নিজের গোঁফটার দিকে তাকিয়ে ভাবল, প্রতিটি দিন ত এই গোঁফ তাকে জ্বালায় ও জ্বালাবে। এখুনি সে ত এটাকে নামিয়ে দিতে পারে। বড়জোর বিনোদবাবু, প্রিয়নাথবাবু আর অনাথবাবু সেটা টের পাবে। আর ত কেউ তাকে আগে দেখেও নি। অফিসে ফিরে গেলে, তখন···। এই সুযোগ ত তার দ্বিতীয়বার না-ও আসতে পারে। আজই ত সবাই গোঁফঅলা হাকিমকে দেখে ফেলবে। তখন ত আর সে গোঁফ উড়িয়ে দিতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত সুহাস ব্লেডটা নিয়ে নীচের লাইনটা একটু সোজা করে দেয়, আর ওপরে ব্লেডটা একটু বোলায় মাত্র। তবু, যেন অভ্যাসবশেই আয়নায় দেখে নিতে হয়। আর দেখলে তখন সেই ছোট কাঁচিটাও তুলতে হয়। একটু লাইনটা ঠিক করে আয়না থেকে তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নেয়।

বিনোদবাবু জানলায় এসে বলেন 'আপনি তৈরি হোন, আমি বরং ওদের নিয়ে এগিয়ে যাই। জ্যোৎস্নাবাবু আপনাকে নিয়ে যাবেন।'

'আমার ত হয়েই গেছে,' বলে চায়ের কাপটাতে শেষ চুমুক দিয়ে সুহাস, 'বাথরুমটা যেন কোনদিকে ?' বলেই বোঝে বিপদে পড়ল। কাল সন্ধ্যাতেও দু-একবার মনে হয়েছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করে উঠতে পারে নি। বিনোদবাবু জানলা থেকে সরে গিয়েছিলেন, সেখান থেকেই বললেন, 'পায়খানা কি আছে ? দেখি—।'

তাব মানে, এঁরা সেই অন্ধকার থাকতে উঠে মাঠে বা ঝোপঝাড়ে কোথাও গিয়ে কাজ সেরে এসেছেন। এখন বেলা হয়ে গেছে। মাঠে যাওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়াও, সুহাস মাঠে যেতে পারবে কি ? এই ব্যাপারটাতে সুহাস প্রথম থেকেই একটু অনিশ্চিত। এখনো সে অনিশ্চয়তা কাটে নি. ভাবছে, এঁদের মত শেষ রাতে উঠলে হয়ত তার পক্ষেও মাঠে যাওয়া সম্ভব হত। কিন্তু এখন বেরিয়ে দুপুর বারটা-একটা পর্যন্ত কাজ। তৈরি না-হয়ে বেবযই-বা কী করে ? দুপুবে ফিরে এলেও ত আর এখানে বাথরুম গজাবে না। একটু অপ্রস্তুত ভাবেই সুহাস ঘর থেকে বেবয। তার বাথরুমের জন্যে সমস্ত পার্টির কাজে রওনা হতে দেরি হয়ে যাবে— এটাও তাব ভাল লাগে না। তার চাইতে বরং বিনোদবাবু যা বললেন, সেটাই ভাল, প্রিয়নাথবাবু আব অনাথবাবুকে নিয়ে বিনোদবাবু গিয়ে পৌঁছন. জ্যোৎস্নাবাবুর সঙ্গে সে না-হয একটু দেরিতেই পৌঁছবে। বারান্দায় কাউকে না-পেযে সুহাস সিঁড়ির মাথায় এসে দেখে, কুয়োপাড়ের কাছে বিনোদবাবু আর প্রিয়নাথবাবু দাঁড়িয়ে, আর জ্যোৎস্নাবাবু একটা লোককে কিছু বলছেন। সুহাস কিছু বলার আগেই বিনোদবাবু বললেন, 'স্যার, পাযখানাটা ত নোংরা হয়ে আছে, ভেতরে জঙ্গলও হয়েছে, এখন বলা হল, পরিষ্কার করে রাখবে। আপনি —' বিনোদবাবু কথাটা শেষ করতে পারলেন না। ততক্ষণে জ্যোৎস্নাবাবু লোকটির সঙ্গে কথা সেরে ফিরে বিনোদবাবুর কথার পিঠেই সুহাসের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গিবিজাবাবুব কাছে খবর পাঠালাম, আমরা ফেবার আগেই সব ঠিকঠাক করে রাখবে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ চলুন, আমরা বওনা হয়ে যাই, পরে দেখা যাবে,' বলেই সুহাস জামা-প্যান্ট পরতে ঘরে যায়। আর যেতে-যেতে ভাবে, নেহাত মাঠে যাওয়াব দবকাব হলে বরং যেখানে যাচ্ছে সেখানেই সুবিধে। অবশ্য গাঁ-সুদ্ধ লোক দাঁড়িযে থাকবে আর সাহেব মাঠে যাবে—সেটা দেখাবে কেমন। সার্ভে ত বেলা বারটা-একটা পর্যন্ত। দেখাই যাক। সুহাস বাইরে বেবিয়ে এসে বলে, 'চলুন, দেরি হল না ত ? গিরিজাবাবু কে ?'

'এখানকার হাট কমিটির, ঐ যে কাল আপনাব সঙ্গে দেখা কবলেন। না, দেরি আর কী, দেখতে-দেখতে পৌঁছে যাব।'

কাল সন্ধ্যাযই যাঁর নিমন্ত্রণ অত করে প্রত্যাখ্যান কবল সুহাস, আজ সকালেই তাঁর সাহায্য দরকাব—এতে যেন লজ্জাই পায। এখন আবার ভদ্রলোক বিকেলে এসে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে না চান, যেখানে অ্যাটাচড্‌···। সামনেই ত চা-বাগান আর তাদের ইন্‌স্পেকশন বাংলো। সুহাস যে মাঠে যেতে পারে নি এতেই যেন তার দুর্বলতা ধরা পড়ে গেল।

ওঁরা পাকা রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। প্রিয়নাথ পেছন থেকে এসে বিনোদবাবুর হাতে চাবি দুটো দিল—তালা আটকাচ্ছিল। তারপর ওরা দক্ষিণ দিকে চলে। সুহাস কে-বির (খানাপুরী কাম বুঝারত) কাজ শুরু করছে একেবারে তিস্তার পাড় থেকে—ঠিক যেখানে আপলচাঁদ ফরেস্টের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমা, গাজোলডোবা চা-বাগান। পশ্চিমে তিস্তা। গাজোলডোবার একটু দক্ষিণ থেকে একটা ছোট নদী, খানা, বেরিয়ে আরো দক্ষিণে গিয়ে তিস্তাতে মিশেছে। এখান দিয়েই ৬৮ সালের বন্যায় তিস্তার বান ঢোকে। গাজোলডোবা চা-বাগানের আর ঐখানে আপলচাঁদ ফরেস্টের বেশ বড় অংশ একেবারে ভেসে যায়। ফলে, ওখানে ম্যাপিং-এর একটা বেশ ঝামেলা আছে। অর্থাৎ এখন তিস্তা কোথা দিয়ে বইছে, চর উঠছে কি না, গাজোলডোবার কতটা নদীতে আর কতটা এখনো কায়েমে, ৬৮-র বন্যার পর গত দশ-পনের বছরে আবার আগের ম্যাপের অবস্থায় ফিরে এসেছে কি না, আপলচাঁদের সাদার্ন আর সাউথ ইস্টার্ন বর্ডার কোথায় ধরা হবে—এই সবের একটা মীমাংসা করতে হবে। তারপর আপলচাঁদ ফরেস্টকে বাঁয়ে, উত্তরে রেখে ওরা ধীরে-ধীরে সোজা উত্তর-পশ্চিমমুখো আনন্দপুর চা-বাগানের জোতল্যান্ড পর্যন্ত পৌঁছবে। এখানে ম্যাপিং-এর ঝামেলা কম, আর ফরেস্ট ল্যাণ্ডের ত মৌজা ম্যাপ ইত্যাদি ডিপার্টমেন্ট

থেকেই তৈরি করে দেয়, চা-বাগানেরও তাই। সুতরাং ফরেস্টকে বাঁ হাতিতে রেখে ঐ ফালিটার সার্ভে শেষ করে, পরের দফায় আবার রাজাডাঙ্গা দিয়ে ঘুরে, এর নীচের ফালিটা দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সেই একেবারে খালপাড় পর্যন্ত যাবে। এই প্ল্যান অনুযায়ীই নোটিশ ও মৌজা-ইস্তাহার দেয়া হয়েছে।

পাকা রাস্তা ছেড়ে ওরা মাঠে নামে, আল ধরে যেতে হচ্ছে বলে একটা লাইনও হয়ে গেল। সবচেয়ে আগে অনাথ—কাঁধে ফোল্ডিং সার্ভে-টেবিল। তার বেশ পিছনে প্রিয়নাথ—শিকলভরা থলিটা তার ডান কাঁধে, কিন্তু বাঁ আর ডান দুই হাত দিয়েই সেটা চেপে ধরা। ভারের চোটে প্রিয়নাথের মাথা বাঁয়ে হেলে গেছে। তার পেছনে জ্যোৎস্নাবাবু—তাঁর কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ, হাতেও একটা বোঁচকা। তাঁর নিজের জিনিশপত্র ব্যাগে, আর হাতে লাল সালুতে মোড়া 'মৌজা'র একটা অংশ। তার পেছনে সুহাস। দুই হাতই খালি। পেছনে বিনোদবাবু—তাঁর হাতেও ত 'মৌজা'ই। সুহাসকে এরা কেউই কিছু নিতে বলে নি, সুহাসও কিছু চায় নি। কারণ সুহাস বুঝে উঠতে পারে না এর মধ্যে কোনটা সে চাইতে পারে। একমাত্র 'মৌজা'-র দু-একটা খাতা সে নিতে পারত। কিন্তু এঁরা বস্তাগুলো বেঁধেইছেন এমন করে যে তার কিছু চাওয়ার উপায় থাকে না। কিন্তু সুহাসের নিজের পক্ষে এটা বড় খারাপ লাগে যে বাকি চারজন, বা বলা যায় তিনজন, কারণ জ্যোৎস্নাবাবু ত আর তার পার্টির লোক নন, যখন বেশ ভারী-ভারী মাল বইছে তখন সে একা একেবারে শূন্য হাতে। জ্যোৎস্নাবাবুরও ত কোনো কিছু বইবার কথা নয়। কিন্তু তিনি এই পার্টিতে থাকেন আর প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন বলে তাঁকে ওটুকু বইতেই হয়। এতে হয়ত তাঁর প্র্যাকটিসেরও সুবিধে।

'জ্যোৎস্নাবাবু, আমাকে আপনার কাঁধের ব্যাগটা দিন না'—পেছন থেকে সুহাস বলে।

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই যেন জ্যোৎস্নাবাবু বলে ফেলেন, 'না স্যার, না স্যার, ও ত আমার ব্যাগ।'

অগত্যা সুহাসকে চুপ করতে হয়—একবার শুধু পেছনে বিনোদবাবুর দিকে তাকায় —দুই হাতে মোটা-মোটা 'মৌজা' নিয়ে হাঁটছেন। সুহাস সেই মৌজার সাইজ দেখেই বোঝে, তার পক্ষে এ ভাবে ঝুলিয়ে নেয়া সম্ভব হত না, কাঁধে দিতে হত। এবং নিজের মৌজা নিজে কাঁধে নিয়ে সার্ভে অফিসার উপস্থিত হলে তাকে আর সার্ভে করতে হবে না!

ষোল

গয়ানাথের হালুয়াগিরি প্র্যাকটিস

হালে বলদ জুতে, মাঠে নামিয়ে বাঘারু বাইরে থেকে গয়ানাথকে ডেকেছে—'হে দেউনিয়া, উঠ কেনে, শাদা হবা ধরিছে হে।'

গয়ানাথ উঠে বিছানায় বসে কাশি শুরু করেছে। এই কাশি তুলবে, তারপর খানিকটা হাঁফাবে, তারপর গয়ানাথ নামবে।

বাঘারু দারিঘরে ঢুকে মাচার পোয়ালের ফাঁকে বিড়ি খোঁজে। পায় না। বেরিয়ে এসে দেখে 'ভটভটিয়াখান' বাইরে এনে রেখে এখন আসিন্দির-জোয়াই (জামাই) দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে। 'হে জোয়াই, সিগারেট খিলাও একখান।' নিজের সিগারেটটায় একটা লম্বা টান দিয়ে আসিন্দির হাত বাড়িয়ে বাঘারুকে দেয়। বাঘারু সিগারেটটা হাতে ধরে রেখে টেনে-টেনে নিশ্বাস নেয়। সিগারেটের না, আসিন্দিরের গন্ধ। 'জোয়াইটার গা দিয়া ক্যানং প্যাটরোলের নাখান গন্ধ, আর ঐ বুড়াটার গাঅত কাদাখোচার গন্ধ।'

'অ্যাই, কহিছিস কী?'

"কুছু না, কুছু না, গন্ধে কাথা', বাঘারু মাঠের দিকে তাকিয়ে আধখানা সিগারেট টানে তর্জনী আর বুড়ো আঙুলে ধরে। কিন্তু তার আঙুলগুলি এতই থ্যাবড়া যে প্রায় অর্ধেক সিগারেট ঢাকা পড়ে যায়।

ঠোঁট ছুঁচলো করে বাঘারু—ঠোঁট তার মোটা নয়। মাঠের মাঝখানে শাদা আর ছাই-ছাই বলদজোড়া নানা দিকে তাকিয়ে দেখছে, এক-একদিকে বেশ অনেকক্ষণ ধরে।

গয়ানাথ হাল দেবে বলেই দু-দুটো বলদ জোড়া হয়েছে। বলদেই টানুক। বুড়া শুধু ধরে থাকবে। এই সার্ভের সাহেব নাকি নাকশালিয়ার ঘর। 'যে-জোতদার নিজ চাষ দেখাবে, উমরাক নাকি কহিবে, চালাও, হাল চালাও, তারপর নাকি দুই হাত দেখিবার চাহিবে—নরম কি শক্ত, বেঁকে কি না-বেঁকে, গাওত্ হাত দিলে বাবলা গাছের নাখান খড়খড় করে কি না-করে, আর যায় হাল দিবার না পারিবে উমরাক ক্যানসেল্ল করি দিবে, আধিয়ারের নামে জমি রেকর্ড করি দিবে।'

গয়ানাথ তাই এখন হালুয়াগিরি শিখছে। আপলচাঁদ ফরেস্টের পাশে, ফরেস্টের জমির সঙ্গে তার টানা জমি। নিজ চাষেই। সেখানে বাঘারু মাঝে-মাঝে চাষ করে,আরো 'কায়-কায়' করে। সেই জমিটা নিজচাষ রেকর্ড করার সময় সাহেব যদি গয়ানাথকে হাল চালিয়ে দেখাতে বলে সে সত্যি হালুয়া কি না! হাত গয়ানাথের এমন কিছু নরমও না, ফর্শাও না। কিন্তু হাল ত টানবে বলদ। বলদ ত চেনে বাঘারুকে। বলদ ত আর জানে না কে গিরি আর কে হালুয়া, আর কে সাহেব। শেষে, সাহেব যদি তাকে জমিতে নামায়, আর তখন যদি বলদ তার কথা না শোনে? তাই গয়ানাথ বাঘারুকে বলেছে, 'বলদটাকে একটু মোক চিনি দে কেনে বাঘারু, মোর আওয়াজ-টাওয়াজখান একটু চিনি দে।'

আসিন্দির বলে, 'হে বাঘারু, তোর বুড়ার কি মাথাটা খারাপ হয়া গেইল রে? এ্যালায় হাল ড্রাইভ করিবার চাহে?' বাঘারু এ কথার উত্তরে ঘুরে তাকায় না। মাঠের দিকে, বলদের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে, যেমন ঐ বলদ দুটিও আছে, সামনে, একটু নীচে, জমিতে হাল কাঁধে। তারপর বলে, 'কায় জানে? কালি হাটত শুনিবার পাছ সাহেব নাকি হাত টিপিবে, গাও টিপিবে, মাথা টিপিবে—'

কথা শেষ হওয়ার আগে আসিন্দির জোরে হেসে ওঠে, এই প্রায়ান্ধকার উষার পক্ষে একটু বেশি জোরে, 'তোর আর বলদের ত একই বুদ্ধি। তোর সেটেলমেন্টের সাহেবের তানে কি বিয়া বসিবার ধইচছে হে—কন্যার গাও টিপিবে, গাল টিপিবে?' তারপর, আসিন্দিরের আরো কিছু মনে পড়ে, সে হো হো হেসে গয়ানাথকে ইঙ্গিত করে বলে 'এই বুড়াখানের গাও টিপিলে ত জিভাখান বাহির হয়্যা যাবে, আর গাল টিপিলে ত সিনজাকাঠির [পাটকাঠি] নাখান হাড়গিলা মড় মড় করি ভাঙি যাবার ধরিবে।'

গয়ানাথ দরজা খুলে বেরিয়ে খড়ম খটখটিয়ে কুয়োপাড়ের দিকে যায়, তার গায়ে ধুতির খুঁট। মুখে-চোখে জল দিয়ে আবার দ্রুত খটখটিয়ে ফিরে আসে। ঘরের ভেতর থেকে গেঞ্জি গায়ে দিয়ে, ধুতিটা হাঁটুর ওপর তুলে খড়মটা পায়েই, যেন তৈরি হয়ে, বেরিয়ে আসে। আসিন্দির তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখে। বুড়ো যখন দরজার পাশে খড়মটা খুলে উঠোনে নামে, আসিন্দির বলে—'তোমরালার কাম কি ঐ মাঠে যাওয়ার? ছাড়ি দেন। উকিলবাবুকে পাঠি দেন। ঐঠে আমি আছে, যা করিবার উমরায় করিবেন, তোমরালা এ্যালায় হাল ঠেলিবার ধরিছেন?'

গয়ানাথ হেসে জবাব দেয়, 'কেনে রে বাউ, হালুয়ার জোয়াই হবার তানে লাজ লাগিছে?' তারপর মাঠের দিকে তাড়াতাড়ি নামতে-নামতে বলে, 'হে বাঘারু, চল্ কেনে।'

আসিন্দিরও পেছন-পেছন আসে। মাঠের আলে নামে না। ওপর থেকে বলে, 'তোমাক এইখান বুদ্ধি কায় দিল, হাকিম কি ড্রাইভিং লাইসেন্স দিবেন নাকি?'

'আরে, কাল হাটত শুনিছু এ শালোর ঘর হাকিম নাকশালিয়া। হাত টিপিবে, গাঁও টিপিবে'।

'আরে, তোমার কি মাথা খারাপ করিবার ধরিছেন। সেটেলমেন্টের হাকিম আসি তোমার হাত দেখিয়া জমি রেকর্ড করিবেন? তোমরালার এই সব কাম কী? ছাড়ি দাও, মুই যাছ ক্যাম্পত, দেখিম।'

'আরে বাপা, তুই ত তোর জীবনখানে একখান সেটেলমেনটোও দেখিস নাইরে বাপা। যেইঠে যা নিয়ম, করিবার নাগে। খতিয়ানও থাকিলো, আবার ধর কেনে এই পেরাকটিসও থাকিলো।'

'কিসের পেরাকটিস?'

'এই হালুয়াগিরির। যদি মোক আজি চাষ দিবার কহে?'

'তোমাক কোটত্ হাল দিবার কহিবে?'

'ঐ ফরেস্টের জমিঠে—'

'ত তুমি চলি আইস কেনে, মুই পেরাকটিস দিছু। হাকিম কহিলে কহিবেন, মুই বুড়া হছি, এ্যালায় মোর জোয়াইখান হাল দিছে', আসিন্দির দাঁড়ায়।

'আরে, খাড়ো না কেনে বাউ', বলে গয়ানাথ তাড়াতাড়ি গিয়ে বলদের পেছনে হাল ধরে।

আসিন্দির চিৎকার করে ওঠে, 'হে বাপ, মোক ছাড়ি দাও, মুই চাষ দিছু।'

গয়ানাথ একবার 'হেট' আওয়াজ করে। বদলদুটো লেজ নাড়ায়, মুখটাও একটু ঘোরায়, কিন্তু নড়ে না। 'হেট' বলে আর-একবার আওয়াজ তোলে গয়ানাথ কিন্তু বলদ নড়ে না! বাঘারু পাশ থেকে জিভ দিয়ে টাকরায় দুটো আওয়াজ তুলতেই বলদ দুটো পা ফেলে এগিয়ে যায়।

আসিন্দির চিৎকার করে ওঠে, 'হেই বাপ, তোমাক তয মুই ফেলি দিম, ছাড়ি দাও। মুই যাছু, মোক দেও।'

গয়ানাথ এবার ধমকে ওঠে, 'হে-ই, চুপ যা কেনে ছাগির বেটা, তোর কথা শুনি মোর জমিখান আজি খরচা করিবার ধরিম নাকি হে?'

সতের

হাল, বলদ ও মোটর-সাইকেল

আপলচাঁদ ফরেস্টের সঙ্গে লাগোয়া জমিটার জন্যই এত ঝামেলা। ফরেস্টের সঙ্গে জমিটা এতই লাগানো যে, দেখলেই মনে হয় জমিটা ফরেস্টেরই, কেউ হয়ত চাষ আবাদ করছে। ঐ ফরেস্টের একটা অংশ ছিল এদেরই—গয়ানাথের বাবা পদ্মনাথ, পদ্মনাথের বাবা ভদ্রনাথের আমলে। ভদ্রনাথের আসল নাম ভাদই রায়। তার আমল থেকেই এরা ভদ্র ও নাথ হয়েছে। পরে, বছর পঞ্চাশ আগে সেটেলমেন্টের সময় একটা দাগ নম্বরেই ফরেস্টের খাস জমিও ঢুকে যায়। এমন অবশ্য হওয়ার কথা নয়। হয়ও না। কিন্তু হয়ে যাওয়ার পর তার নিজ জমিটা যাতে ফরেস্টের জমির ভেতর ঢুকেই থাকে ও এক খতিয়ানেই থাকে সেটা ভদ্রনাথ রায়, পদ্মনাথ রায় ও গয়ানাথ রাগ তিনপুরুষ ধরে দেখে আসছে। তখনকার দিনে ত আর জমিজমার খবর হালুয়া-আধিয়াররা রাখত না। ফলে সবাই জানত ভাদই রায়েব জমিটাই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু সেখানে ভাদই রায়ের জমির টানা অংশটা ভাদই রায়েরই আছে। আর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকও কোনো সময় একটা চাষের জমিতে শালগাছ পুঁততে যায় নি। বা যাতে না পোঁতে সেটা ভদ্রনাথ, পদ্মনাথ, গয়ানাথ তিনপুরুষ ধরে দেখে আসছে। ফলে, ফরেস্টের অনেক-অনেকখানি জমিও গয়ানাথ নিজের জমি বলেই চাষ করে।

কিন্তু এবার বিপদ হতে পারে। এখন সব হালুয়া-আধিয়াররা জমি বোঝে, মাপামাপিও বোঝে। তদুপরি এই জমির লাগাও আনন্দপুরের ভেস্ট জমিতে রাধাবল্লভের দলের জবরদখল। তারা উকিল-মোক্তার ডাকে, শিট ম্যাপ দেখতে পারে, কোন দাগ কোথা দিয়ে গেছে তাও বলে দিতে পারে। তারা যদি এখন জরিপের সুযোগে হঠাৎ 'ইনকিলাব' বলে ঝাণ্ডা গাড়ে? সুতরাং গয়ানাথ কোনো ঝামেলাই নেই। তাকে যদি নিজে হাল চালিয়ে দেখাতে হয় জমি তার, তা হলে তাই দেখাবে।

গয়ানাথ জমিটার দক্ষিণ থেকে সোজা তার বাড়ির দিকে আসছিল—মাটিতে হাল লাগিয়ে কাঠি দিয়ে খোঁচানোর মত একটা সরু লাইন বানাতে-বানাতে। আসিন্দির তার মোটর-সাইকেলের স্টার্টারে কিক মারতেই বদল দুটো কান খাড়া করে যেন দাঁড়িয়ে পড়ে। গয়ানাথ চিৎকার করে ধমকে ওঠে, 'হে-ই শালা জোয়াই, ভটভটি বন্ধ কর্।' চেঁচালে গয়ানাথের গলা দিয়ে বনমোরগের মত আওয়াজ বেরয়। আসিন্দির পা নামিয়ে হে-হে করে হাসে, 'উঠি আইস কেনে, উঠি আইস, না-হয় ত তোমরাক ফেলি দিব হে বাপা।' গয়ানাথ তার বাড়িটাকে পেছনে রেখে বাঁয়ে ঘোরে। পেছন থেকে তার মেয়ে চিৎকার করে, 'বাবা, চা দিছি।'

গয়ানাথ যখন জমিটার এই সীমায় চলে এসেছে, তখন আসিন্দির হঠাৎ মোটর-সাইকেলটাতে স্টার্ট দিয়ে অ্যাকসেলিরেটারটাকে একবার পুরো ঘুরিয়ে দেয়। সেই গাঁ আঁ-আঁ-আঁ শব্দে মুহূর্তের মধ্যে কান ও লেজ খাড়া করে দুই বদল দুই দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েই দু-দিকে দৌড় দিল। গয়ানাথ হালের

মাথা ছেড়ে দেয়ার সময়টুকুও পেল না, জমির ওপর উপুড় হয়ে পড়ল।

কাঁধে জোয়াল আর পেছনে হাল নিয়ে বলদ দুটো দুদিকে দৌড়তে গেলেই ঠেকে যায়। বাঁ দিকের ছাইরঙা বলদটার পা বেকায়দায় ছিল। ডান দিকের শাদা বলদটা একটা হেঁচকা টানে পাশের ডাঙা জমির দিকে দৌড়লে হালটা এক ঝটকায় গিয়ে তার গায়ে পড়ে। আর ছাইরঙা বলদটা ঘুরে দৌড়তে গেলে প্রথমে দড়িতে পেঁচিয়ে যায়, আর তারপরে শাদা বলদটার বিপরীত টানে, জোয়াল দড়ি-টড়ি সব নিয়ে ধপাস করে মাটিতে পড়ে। জোয়ালের সঙ্গে বাঁধা তার গলাটা মুচড়ে যায়। ছাই বলদটা পড়ে যাওয়ার হ্যাঁচকা টানে শাদা বলদের পেছনের পা দুটো সামনের উঁচু আল থেকে হড়কে যায়। বলদটা তখন সামনের পা দুটো দিয়ে মাটি খুবলে-খুবলে দাঁড়াতে চায়।

গয়ানাথকে পড়ে যেতে দেখে বাঘারু গয়ানাথের দিকে এক পা ফেলেই ঘুরে, 'হে-ই হে-ই' বলে বলদ দুটোকে ধরতে দৌড়য়। বলদ দুটো পড়ে না গেলে ধরতে পারত কি না সন্দেহ! বাঘারু গিয়ে আগে জোয়ালটার দড়ি টেনে বের করে এনে ছাই-বলদটাকে ঢিলে করে। আর বলদটা দাঁড়িয়ে উঠে কান ঝটপট করে এদিক-ওদিক তাকিয়ে যেন খুঁজতে থাকে সেই আওয়াজটা কোথায়।

ছাই বলদটা খালাশ হতেই শাদা বলদটা জোয়ালটাকে টানতে-টানতে ওপরের আলটাতে সামনের দু পা তুলে দাঁড়ায়। পেছনে জোয়ালের আব লাঙলের ভার নিয়ে সে চট করে উঠতে পারে না। বাঘাক দৌড়ে গিযে তার দড়ি ধরে ফেলে। তারপর দুই লম্বা দড়ি জোয়াল থেকে ছাড়ানো শুরু করে।

ততক্ষণে গয়ানাথ মাটি থেকে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। তার কপালে-নাকে-মুখে, গেঞ্জিতে হাঁটুতে কাপড়ে, কাদা। গয়ানাথ দাঁড়িয়ে উঠে নিজেকেও দেখে না, বলদগুলোকেও দেখে না। সে যে-টুকু হাল দিয়েছিল, তারই এক-খাবলা মাটি তুলে ঢিলের মত করে তার বাড়ির দিকে ছোড়ে। সেটা তাব সামনেই ঝুরঝুর করে ঝবে যায়। তখন গয়ানাথ, 'শালো জোয়াই, তোর পাছত বাংকুয়া (বাঁক) সিন্ধাম'—বলে তার বাড়ির দিকে দৌড়তে শুরু করে। আসিন্দির একসেলিরেটারটা একবার ঘুরিয়েই বন্ধ করে দিযেছিল। আর তাব হাসির শব্দে গয়ানাথের বৌ আর মেয়ে দৌড়ে এসে দাঁড়ায। তখনো গয়ানাথ মাটিতেই পড়ে। তিনজন মিলে যে-হাসি হাসে সেটা গয়ানাথ উঠে দাঁড়ানোব পরও থামে না। গয়ানাথ ঢিল মাবার পব বেড়ে যায়। আর, গয়ানাথ তাদের দিকে ছুটতে শুরু করলে তিনজনই ঢিল-খাওযা মুরগিব মত নানা দিকে ছুটে যায়। এতটা দৌড়ে আর বাড়িতে ওঠার ঢাল বেয়ে উঠে গয়ানাথ হাঁপিয়ে গিয়েছিল। সে উঠেই মোটর-সাইকেলটাতে একটা লাথি মারে। মোটর-সাইকেলটা সামান্য নড়েও না। তার পায়ের কাছে একটা কাঠের টুকরো পড়ে ছিল, সেটা তুলে মোটর-সাইকেলটার ওপর মারে। 'হেই, কী কবিবার ধরিছেন?' গয়ানাথের বৌ এসে দাঁড়ায়, 'চা ঠাণ্ডি হবা ধরিছে, খায়্যা নেন।' শুনে গয়ানাথের মেয়েও ঘর থেকে বাইরে আসে, 'বাবা, তোমাক কায় কহিসে হাল চালাবার!'

'তোর বাপ কইসে। কোটত স্যায় শেয়ালখাগের বেটা, শালো, ছাগের ছোয়া—'

শুনে গয়ানাথেব বৌ মুখে আঁচলচাপা দেয়। আর ঠিক পেছনে বাড়ির নীচে, মাঠের পাশ থেকে আসিন্দির জোড়হাতে চিৎকার করে, 'হে বাপা, মোক ক্ষেমা দাও কেনে, মোক ক্ষেমা দাও কেনে, বাপা,' কিন্তু বলেই হেসে ফেলে। আসিন্দিরের গলা শুনে গয়ানাথ পেছন ফিরে বনমোরগের চিৎকার করে ওঠে, 'শালো, মুই হাল দিছু, আর তুই বেটার-ঘর ভটভটাছিস, শালো।'

'ক্ষেমা দাও কেনে বাপ, মোর কাথাটা কেনে শুনিলু না। মুই ত ওর্নিং দিছু তোমাক', নিবাপদ দূরত্ব থেকে আসিন্দির হাত জোড় করে।

'শালো তোর ওর্নিং-এর পাছত মারো।' চায়ের কাপটা নিয়ে মেয়ে এসে গয়ানাথের সামনে দাঁড়ায়—ঠোটে আঁচলচাপা দিয়ে ও আসিন্দিরের উল্টোদিকে চেয়ে। চায়ের কাপটা গয়ানাথ হাতে নিতেই মেয়ে বারান্দায় পিঁড়ি পেতে বলে, 'বসি-বসি খাও বাপা।' গয়ানাথ ততক্ষণে এক চুমুক দিয়ে ফেলেছে।

পিঁড়িতে বসে সে রাগের শেষটুকু দিয়ে চিৎকার করে, 'শালো, ছাগির বেটা, যা কেনে, তুই হাল ধর, মুই না যাও জরিপের পাখে, তোকই হাল দিবার নাগিবে।'

আঠার

আসিন্দিরের হাল দেয়া

এতে আসিন্দির যেন বেঁচে যায়। সে 'যাছি হে বাপ, যাছি, মুই ত যাবারই চাছি।' বলে মাঠ-বরাবর দৌড়য়, বাঘারু যেখানে দাঁড়িয়ে হাল-বদল নিয়ে। তার সেই দৌড়ে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে গয়ানাথ ধুতির খুঁট খুলে মুখের কাদা মোছে। তারপর চায়ে চুমুক দেয়। গয়ানাথের বৌ ও মেয়ে এসে তার পেছনে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখে, আসিন্দির বাঘারুর হাত থেকে দড়িদড়া নিয়ে নিলে, বাঘারু জোয়ালটা দুই বলদের কাঁধে জোতে। ছাই-বলদটা সরতে চাইছিল না। বাঘারু তার গলায় ঘাড়ে হাত দিয়ে নির্ভয় দিলে সেই শাদা বলদটার পাশে এসে দাঁড়ায়। যেন এখনো কোথাও মোটর সাইকেলের আওয়াজ উঠতে পারে—এমন ভাবে ডাইনের বলদটা বাঁয়ে অনেকখানি মাথা ঘুরিয়ে গয়ানাথের বাড়ির দিকেই তাকিয়ে থাকে। জোয়াল জোতা হয়ে গেলে আসিন্দির বাঘারুর হাত থেকে দড়িদড়া টেনে নিয়ে হালের গোছাটা চেপে ধরে। তারপর বলে, 'অ্যালায় স্টার্ট দিছু রে বাঘারু।'

'হে জোয়াই, আলাং-পালাং না করেন, গরু ডর খাছে', বলে বাঘারু আর অপেক্ষা না-করে জিভ দিয়ে টাকরায় একটা খুব নরম শব্দ তোলে।

বলদ দুটো নড়ে না। কিন্তু শব্দটা শুনতে ডাইনের বলদটা যেন মুখটা আর-একটু ঘোরায়। বাঘারু তখন নরম করে পর পর দুবার 'টট্টর' 'টট্টর' শব্দ তুলে সামনে গিয়ে দুই বলদেরই শিঙের মাঝখানে হাত রেখে একটু চুলকে দেয়। বলদ দুটো ঘাড় তোলে। গলকম্বলে একটু সুড়সুড়ি দিয়ে, বাঘারু বলে, 'দেন কেনে জোয়াই, স্টার্ট দেন।'

আসিন্দির নির্ভুল নির্দেশ দেয়। আর বলদদুটো চলতে শুরু করে। হালের গোছা তার হাতে শক্ত করে ধরা আর ফাল পুঁতে যাচ্ছে মাটিতে। বেশ বড় বড় মাটির চাঙড় উঠে দু-পাশে পড়ে যাচ্ছে। সামান্য একটু পরেই বলদদুটি বোঝে তারা বেশ শক্ত সমর্থ দুই হাতে। জোয়ালের ওপর সমান টান পড়ছে। বলদ দুটোর ঘাড় ধীরে-ধীরে সোজা হয় আর আসিন্দির তার টাকরার আওয়াজে বলদ দুটোর গতি বাড়ায়। কোনোদিনই যাকে হাল ধরতে হয় না পেশিবহুল শক্ত-সমর্থ শরীরে এই আচমকা হালচালানোয় তার যেন একটা শারীরিক আরামই জোটে, স্বেদমোচনের আরাম। অভ্যেস নেই বলে আসিন্দিরের হাতের চাপটা সমান থাকে না, একটু কম-বেশি হয়ে যায়। তখন হালও লাফায়, জোয়ালও লাফায়, বলদও একটু হোঁচট খায়। কিন্তু সে ত মাত্র দু-একবার। তার ধুতি আর গেঞ্জিতে আসিন্দিরকেও জমির ভেতর প্রোথিত মনে হয় না, তাকেও মনে হয় শখের হাল চালাচ্ছে। কিন্তু দেখতে-দেখতে যে-গভীর নালী তৈরি হয়ে যায় তার হলচালনার ফলে, যে-কালো-কালো নরম মাটি ঝুর-ঝুর উপড়ে যাচ্ছিল ফালের দু পাশে—তাতে তার গায়ের জোর ও তার যোগ্যতার প্রমাণে হলচালনার বিষয়টিই বদলে যাচ্ছিল।

দূরের দিকে তাকালে কুয়াশা এখনো গভীর। চোখের সামনের কুয়াশা কাটছে। সামনের বাঁশগাছের মাথায় মাকড়সার জালের মত কুয়াশার জাল। চার-পাঁচজন লোক ফরেস্টের পাশ দিয়ে বন পেরচ্ছে। দু-একজনের মাথায় এক-একটা পাঁজা। দিগন্ত পর্যন্ত ত চেনাই এখানে—এমন-কি আকাশের রেখাটিও! বাঘারুকে একটু নজর করে এই দৃশ্যটা ঠাওরাতে হয়। 'হে জোয়াই, দেখ কেনে'—আসিন্দিরকে বাঘারু ডাকে। আসিন্দির হাল ছেড়ে এলে দেখায় 'দেখ কেনে।' একটু নজর করে দেখে আসিন্দির ছুটে গিয়ে মাঠ থেকেই গয়ানাথকে বলে, 'হে বাপা, তোমার সার্ভে পার্টি ত যাছে হে সার্ভের জায়গাত্।' বাঘারু গিয়ে হালের দড়ি ধরে। 'অ্যাঁ?' বলে গয়ানাথ লাফিয়ে ওঠে, 'বাঘারু—উ।' বাঘারু মাঠের ভেতর থেকেই তাকায়। 'ঐ চিয়ারখান নিয়া ছুটি যা সার্ভের জায়গাত, ছুটি যা।' বলে গয়ানাথ দৌড়ে কুয়োপাড়ে যায়। আসিন্দির তাড়াতাড়ি গিয়ে বাঘারুর হাত থেকে দড়িদড়া ধরে বলে, 'কাউক্ পাঠাই দে জলদি, আর চলি যা চেয়ারখান নিয়া।'

বাঘারু দৌড়তে-দৌড়তে সদরবাড়ির ভেতর দিয়ে পেছনে গোয়ালবাড়িতে গিয়ে চিৎকার করে, 'হে-ই ভোচকু, যা কেনে বলদদুইটাক নিগি আন।' তারপর আবার দৌড়ে ফিরে এসে দেখে গয়ানাথের

মেয়ে চেয়ারটায় বসে। 'উঠো কেনে, উঠো।' গয়ানাথের মেয়ে লাফিয়ে ওঠে। চেয়ারটা উল্টিয়ে মাথায় নিয়ে বাঘারু সোজা পশ্চিম দিক দিয়ে নেমে যায়। এই দিক দিয়ে একটা ছোট রাস্তা আছে। এখন তার পরনে নেংটি, সারা গায়ে আর-এক চিলতে কাপড় নেই, মাথার ওপর .উল্টনো চেয়ার, পা ওপর দিকে তোলা। বাঘারু খুব তাড়াতাড়ি হাঁটতে শুরু করে, এ-আল, ও-আল দিয়ে। তাকে সার্ভে পার্টির আগে পৌঁছতেই হবে। চেয়ারটা কোনো গাছের তলায় ঠিকঠাক করে রাখলে হাকিম বসবে। আর হাকিম যদি আগে যায় তবে বসবে কোথায়। হাকিম আছে, চেয়ার নেই—এই অসম্ভব অবস্থা দূর করার ভার নিয়ে বাঘারু তার বড় বেশি চেনাজানা এই মাঠ-ঘাট বনবাদাড় দিয়ে, ছোট থেকে আরো ছোট পথে, ছুটছে।

গয়ানাথ জামাকাপড় পরে এসে উঠোন থেকে চেঁচায়, 'হে জোয়াই, ভটভটিখান বাহির কর, লেট হয়্যা যাছে, মোক ছাড়ি দিয়া আয়।' আসিন্দির ভোচকুকে দৌড়ে আসতে দেখে বলদদুটোকে ছেড়ে দৌড়ে এসে লুঙি-গেঞ্জিতেই মোটর-সাইকেলটাকে ঠেলে-ঠেলে উঠোন দিয়ে বাইরে নিয়ে যায়, বড় আলের মুখে। গয়ানাথ ঘরের ভেতর থেকে মার্কিন-কাপড় দিয়ে বাঁধা একটা পুঁটুলি চটের ব্যাগে ভরতে-ভরতে বেরিয়ে আসে। সেটা হাত বাড়িয়ে সামনে নিয়ে, আসিন্দির ট্যাঙ্কের ওপর রাখে। গয়ানাথ পেছনে বসে। গয়ানাথের বৌ আর মেয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে আসে কিন্তু তার আগেই মোটর-সাইকেলে স্টার্ট দেয়ার আওয়াজ ওঠে। ওরা বড় আল দিয়ে হু-স করে বেরিয়ে যায়।

উনিশ

বনপথে আকাশ-বাতাস

সুহাসকে সামনে জ্যোৎস্নাবাবু্র প্রাইভেট আর পাবলিক বোঝার ভার দেখতে হয় আর পেছনে বিনোদবাবুর ক্রমঘন নিশ্বাস শুনতে হয়। প্রিয়নাথ আর অনাথ তাদের কাঁধের আরো ভারি বোঝা নিয়ে অনেকটা আগে চলে গেছে—তাদের টেবিল আর শিকলের ব্যাগটা দুলতে-দুলতে এগিয়ে যাচ্ছে, যেন ঐ ভারের বোঝাতেই তাদের পায়ের গতিও বেড়েছে।

মাসটা ভাদ্রের শেষ। বর্ষার একেবারে মধ্যপর্ব। এই সকালে অবশ্য বৃষ্টি নেই, মেঘও নেই। ফলে রোদের তাপ বাড়ছে। এই সকালেও। সেটা এত জোরে-জোরে হাঁটার জন্য, নাকি, এত সকালের এই চাপা রোদের তীব্রতার জন্যও, তা বোঝার উপায় নেই।

এখন এই বৃষ্টিহীন, মেঘহীন সাতসকালে যেন কারো মনে হয়ে যেতে পরে বৃষ্টি এবারের মত শেষ। মাঠের ঘাস, খেতখামার, ফরেস্ট আর চা-বাগানের সব গাছগাছড়ার, ঝোপঝাড়ের, গাছপালার রং একেবারে মোটা কাঁঠাল পাতার মত কালচে সবুজ। ঝোপঝাড় আর খাটো-খাটো সব বুনো গাছগাছড়া বর্ষার জলে ফুলেফেঁপে এতটাই, যে আর খাড়া থাকতে পারে না, নিজের ভারে নিজেই নুয়ে পড়ে মাটির ওপর স্তূপাকার—যেন এগুলো সবই মাটির ভেতরের জল থেকে ফেনিয়ে ওঠা। কিন্তু এখন, এই সকালের রোদে সেই সব ঝোপঝাড়ের ওপর থেকেও যেন বাড়তি জল উপচে যাচ্ছে। সামনে একটা ফরেস্ট শুরু হয়েছে। একটু উঁচুতে। এই তলা থেকে ফরেস্টের ওপরে জলকণার এই বাষ্পীভবনের ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে—ফরেস্টের ভেতর থেকে, মাথা থেকে ধিকিধিকি আগুনের ধোঁয়ার মত, যেন পাতলা মেঘ ভেসে যাচ্ছে কোনাকুনি ওদলাবাড়ির দিকে—তার মানে বাতাস এখনো পুব থেকেই বইছে। কী ফরেস্ট যেন····। একই নামে একটা চা-বাগানও আছে। স্যর্কল ম্যাপটা অন্তত সুহাস সঙ্গে রাখতে পারত। 'কী যেন ফরেস্টটা, এটা?'

'মালহাটি', জ্যোৎস্নাবাবু না তাকিয়ে উত্তর দেন।

মালহাটি, মালহাটি। মালহাটি ফরেস্ট আর মালহাটি টি এস্টেট।

ওরা একটা টিলার মত উঁচু ডাঙা, বরমতল, থেকে নীচে.নামছিল। সামনে আবার চড়াই-এ উঠে

বোধহয় কিছুটা সমতল জমি—তারপর ফরেস্ট। সেই নিচু জমিটাতে একজন একটা বলদের ঘাড়ে লাঙল লাগিয়ে হাল দিচ্ছে। লোকটাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখতে হয়, সেই ডাঙার মাথা থেকে উল্টোদিকের চড়াইয়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত। সামনের চড়াই মাঝামাঝি পর্যন্ত উঠলেই ফরেস্টে নজর আটকে যায়। তখন প্রিয়নাথ আর অনাথ প্রায় ফরেস্ট ছোঁয়-ছোঁয়। এখন এই একটু তলা থেকে দেখা যাচ্ছে ফরেস্টের গাছগুলোর মাথাতে রোদ ঝলমল করছে। গাছের পাতায় বা বাতাসে কোথাও ধূলিকণা নেই, এমন-কি আকাশেও মেঘ নেই, ফলে রোদ যেন শান দিয়ে উঠছে। আর ফরেস্টের মাথাটা তাতে ঝিকিয়ে উঠছে। অনাথ আর প্রিয়নাথ ফরেস্টের ভেতর কিন্তু ঢুকল না, ফরেস্টটাকে বাঁ হাতে রেখে ডাইনে ঘোরে। ফরেস্টের যত কাছে যাওয়া যায়—গাছের মাথাগুলো তত অদৃশ্য হয়ে যায়। দৃষ্টি যেন ধীরে-ধীরে ফরেস্টের মাথা থেকে কাণ্ড বেয়ে নেমে আসতে থাকে। তারপরই ফরেস্টের লম্বা ছায়াটায় ঢুকে যেতে হয়।

সেই ছায়া দিয়ে এগিয়ে, ফরেস্টটাকে বাঁ হাতিতে রেখে ডাইনে ঘুরে, ফরেস্টটার গা ঘেঁষে যেতে হয়। তখন ত আর রোদ নেই। কিন্তু বর্ষার জলে ফরেস্টের রোদহীন এই অংশে মোটা ঘাস প্রায় হাঁটু পর্যন্ত। পায়ে জল লাগে আর এ-রকম একটু চলতে-চলতেই ধীরে-ধীরে ঘামটা শুকিয়ে যায়। আরাম লাগে। নিশ্বাসটা স্বাভাবিক হয়ে আসে। কিন্তু তারপরই একটু আগের রোদ ঝলমল যেন-শরতের আকাশকে মনেও পড়ে না। মনে হয় যেন চার পাশেই বৃষ্টি পড়ছে—তারা ফরেস্টের গাছের পাশ দিয়ে-দিয়ে যাচ্ছে বলে গায়ে জলকণা লাগছে না। ডাইনে তাকালে, কালচে সবুজ ঘন ঘাসের প্রান্তর, আর বাঁয়ে তাকালে, নিশ্ছিদ্র প্রায়ান্ধকার জঙ্গল—গাছের কাণ্ডগুলোও জঙ্গলের সবুজে ঢাকা, শ্যাওলায় বা লতায়।

ততক্ষণে শীত লাগতে শুরু করেছে, আর সেই শীতেব মধ্যেও চামড়াটা কেমন তৈলাক্ত হয়ে ওঠে। ফরেস্টের ভেতর থেকে গরম বাষ্পের ভাপ বইছে। একদিকে শীত, আর-একদিকে সেই ভাপের গবমের ঘাম। বুকটা পিঠটা ভাবী হয়ে ওঠে। নিশ্বাসও ভারী হতে থাকে।

মাটির ওপর ফুলে ফেঁপে ওঠা এই জলীয় জঙ্গল যেন মাটিরই গোঁজিয়ে ওঠা। জলে-জলে লতাপাতার মাটির তলার শেকড় এত বেশি ফাঁপা, সেগুলো যেন আর মাটি আঁকড়াতে পারে না। শাল-সেগুন-খয়ের-লাম্পাতি নিজেদের শরীরের ভারেই সেঁদিয়ে যাচ্ছে মাটির ভেতরে। এত বর্ষার এত জলে এই গাছগুলোর পাতাও মোটা ও ঘন হয়ে ছড়িয়ে গেছে—ডালপালার সেই ভারে শালগাছের দৈর্ঘ্যকেও আর দীর্ঘ মনে হয় না।

কয়েক মাসের বর্ষার অবিরল জলে সব কেমন ছোট হয়ে গুটিয়ে গেছে। দুই ধারের মোটা মুথা ঘাসের নীচে পায়ে চলার পথ চাপা পড়ে গেছে। ডাইনের পড়ো নিচু জমির ভেতর থেকে ঘাস আর জঙ্গল বেড়ে বেড়ে যেন ডাঙা হয়ে উঠেছে। ছোট টিলার ওপর ছোটখাট বুনো গাছের মাথা আকাশে ঝাকিয়ে উঠেছে। সেই সব গাছের মাথায় এখন আকাশের পটভূমি। ফলে, আকাশও যেন নেমে এসেছে বেশ নীচে। অথচ এই একটু আগে আকাশকে কেমন নীল ও গোল দেখাচ্ছিল। একদিকে ঘাস-লতাপাতা-ঝোপঝাড়-গাছপালা আর বিরাট-বিরাট গাছের ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া মাথা নিয়ে মাটির সংকীর্ণ হয়ে ফুলেফেঁপে ওঠা, আর, তার সঙ্গে ওপর থেকে আকাশের এমন নিচু হয়ে এই সবের পরিপ্রেক্ষিত হওয়া—পৃথিবীটাকে যেন গুটিয়ে দেয়, যেন সব কিছুই পাকিয়ে ওঠা, আড়াল হয়ে যাওয়া। টিলার ওপরে, দৃষ্টি আড়াল করা কোনো ঝাঁকড়া গাছের মাথায় আকাশের নীল। গাছটা এখন মাটির তলায় জল শুষে বাঁচছে, বাড়ছে। কিন্তু এর ভেতরেই কি বর্ষার পরের এই প্রক্রিয়াটা শুরু হয়ে গেছে? এর পর শরতের রোদে মাটি শুকিয়ে গেলে, মাটির তলার জল আরো-আরো নেমে গেলে, জলকণা সরিয়ে বাতাস খড়খড়ে হয়ে উঠলে, এই সব ঝোপঝাড় ধীরে-ধীরে শুকিয়ে যেতে শুরু করবে। পায়ের তলার মাটি এখন আচমকা দেবে যায়। দিনে-দিনে এই জল মাটির আরো নীচে চলে যাবে—তখন ধীরে-ধীরে মাটি শক্ত হবে, শক্ত হতে-হতে কোথাও-কোথাও পাথরের মত হয়ে উঠবে। কোথাও-কোথাও। কারণ, ফরেস্টের ভেতরের মাটি পচা পাতায় সারা বছরই ত নরম। এখনো ফরেস্টের, যাকে বলে ঝোপঝাড়, প্রায় যেন স্থির, কিন্তু উচ্ছ্বসিত জলাশয়ের মত ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে, দূরে-দূরে মিশে গেছে বড়-বড় গাছের ফাঁক দিয়ে-দিয়ে। ওগুলোতে মানুষ ডুবে যাবে। ডুবে গেলে আর মুখ তুলতে পারবে

না—আরো নীচে লতাপাতা এত জটিল আর মাথার আচ্ছাদন এত কঠিন।

এই সব মিলিয়ে এখন যেন চারপাশ থেকে একটা ঢাকনা তোলার মত ভাব। আকাশটা নীল আর রোদটা এত প্রচণ্ড হওয়াতেই এই খোলামেলা ভাবটা ছড়ায় বটে কিন্তু সেই ঢাকনাটা এখনো সরে নি। আকাশ-ভাঙা জল আর মাটির তলার জল—এই দুদিকেই এখন ত জমা জলের পচন। আকাশের জল শেষ হলে মাটির তলার জল টেনে নেবে গাছপালা। এই ভরা বর্ষাতে কি সেই প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গেছে? বাতাসও কেমন অনিশ্চিত—পুব থেকে কখনো, কখনো-বা উত্তর ঘেঁষাও মনে হয়। রোদও তেমনি অনিশ্চিত—কখনো মনে হয় আরামের আর কখনো মনে হয় শরীরের সব রস শুকিয়ে যাবে। ছায়াও তেমনি, কখনো মনে হয় ঠাণ্ডা, কখনো মনে হয় হিম।

আকাশ-বাতাসের এই দু-রকমের ভাবটা সবচেয়ে বোঝা যায় ধানখেতে। নতুন চারার কাঁচা সবুজ যেন উঠে যাচ্ছে—সমস্ত ধানখেতের চেহারাই এখন রঙচটা ফ্যাকাশে সবজে। বাতাসে ত ধানখেত দোলেই—এত পাতলা পাতায় ও গোছায় ধানখেত ত প্রায় জলের মতই। কিন্তু সেই দোলায় একটা রঙেরই রৌদ্র ছায়াপাতের প্রবাহ খেলে না, যেন মনে হয় বিবর্ণ মড়া একটা খেত ছড়িয়ে পড়ে আছে। এখন ধীরে-ধীরে খেতের জল শুকোবে। তারপর মাটি শুকোবে। তারপর মাটি খটখটে হবে। আর, সামনের তিনমাসের এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ধানগাছের গা থেকে এই সবুজের শেষ আভাটাও চলে যাবে। বাতাসে ধানগাছের হিল্লোলিত রং দেখেই বোঝা যায় মাটিতে ও বাতাসে তখনো কতটা রস লেগে আছে। এই রস যত শুকোবে—ধানগাছের সবুজ তত ঝরবে। ঝরতে-ঝরতে শেষে আর-এক রঙের দিকে বদলে যাবে। তখন ধানগাছের শরীরের সব রস শুকিয়ে ধানের দুধ ঘন হবে। যত শুকোবে—ধানের দুধ তত জমবে। যত জমবে—ধানগাছ তত হলুদ হবে। যত হলুদ হবে—ধানের ভেতর চাল তত তৈরি হবে। তারপর বাতাস, মাটি ও শরীরের সব জল ঝরিয়ে সমস্ত ধানখেতটা সোনারং হয়ে যাবে। সোনালি হলুদ। ধানখেতের মরণের রোগ। যত শুকোবে তত সোনালি। আর, ধান তত পাকবে। তারপর একসময় সেই রসহীন শুকনো পাতার তুলনায় চালভরা শিষ অনেক ভারী হয়ে উঠবে, ধানখেত নুয়ে যাবে, নেতিয়ে পড়বে, ধানগাছের মাথায় ধানের শিষ মাটিতে ফিরে যেতে চাইবে আর মাটিতে নোয়াতে পাতাগুলো খড়খড়িয়ে সোজা হয়ে উঠে বাতাসে দুলবে। তখন ধানখেত বাতাসে জলাশয়ের মত হিল্লোলিত হয় না, মাঠময় ছড়িয়ে থাকে—দেখলে মনে হয় ধানখেত নয়—পোয়ালের খেত।

সামনে ফরেস্টটা শেষ হয়ে যায়। ফরেস্টের ছায়ার ভেতর থেকে ওরা সামনে দেখে, ঘাস আর গাছ-গাছালির ওপর সেই পুরনো পরিষ্কার রোদ। যেন সেই রোদের আভাসেই এখানে ফরেস্টের ছায়াচ্ছন্নতাও কেটে যাচ্ছে। ফরেস্টটা পেরিয়ে ওরা বাঁ দিকে ঘোরে—ধানখেত।

ধানখেতের ভেতর দিয়ে সেই রোদে যেতে-যেতে আবার বর্ষাটাকে অতীত মনে হয়, যেন শরৎ শুরু হয়ে গেছে। ডাইনে একটা গাঁ। বাঁশের বেড়ার লাইন আর গায়ে গা লাগানো বাড়িগুলোর পেছন দিক দিয়ে বানানো প্রাকারেই বোঝা যায় মুসলমান পাড়া। গোচিমারি। পাশ দিয়ে ওরা আরো কোনাকুনি এগয়। একটু পরেই তিস্তার ঠাণ্ডা বাতাস। বাতাসটা তিস্তার ওপর দিয়ে আসছে—বাতাসের ঠাণ্ডাটা এমনই তাজা আর টাটকা, যদিও ভেজা। ফরেস্টের ভেতরের বাতাস যে বাইরে আসছিল, সেটাও ভেজা ছিল কিন্তু ফরেস্টের পাশ দিয়ে আসার সময় তার জলীয় তৈলাক্ত ভেজা ছায়াতেও ঘামিয়ে দিয়েছিল, ধানখেতের রোদেও সেটা যেন পুরো শুকোয় নি, অদৃশ্য তিস্তার এক ঝলকেই সেটা মুছে যায়। ওরা আর-একটা সরু পাকা রাস্তায় ওঠে। দলটা ডান দিকে ঘোরে। বিনোদবাবু পেছন থেকে বলেন, 'এইটা চ্যাংমারি হাটের রাস্তা, পেছনে।'

চ্যাংমারিটাও সুহাসের হলকায় পড়বে। সুহাস যা কাজের পরিকল্পনা করেছে তাতে একেবারে শেষে ঐ অঞ্চল ধরতে হবে। এখন যে-লাইনটা শুরু করবে, এর পরে তার তলায় পুব-পশ্চিমে আর-একটা লাইন হবে চ্যাংমারিতে। তখন চ্যাংমারি থেকে আদাবাড়ি, চক মৌলানি, দক্ষিণ চক মৌলানি, দক্ষিণ মাটিয়ালি, ঝাড় মাটিয়ালি, লাটাগুড়ি আর উত্তর মাটিয়ালী—এই মৌজা দিয়ে কাজ শেষ হবে। এগুলো গত সেটেলমেন্টের পর মাল সার্কেলে এসেছে, তার আগে ছিল মাটিয়ালি সার্কেলে। সুহাস একটু দাঁড়ায়। বিনোদবাবু তার পাশ দিয়ে এগিয়ে যান। দলের দিকে পেছন ফিরে সুহাস এই রাস্তাটি দিয়ে চ্যাংমারি হাটের দিকে তাকায়। তারপর আবার ঘুরে দলের পেছন-পেছন চলে। একটু যেতেই সামনে

দেখা যায় ফরেস্ট আর তিস্তা—ফরেস্টটা হঠাৎ এক জায়গায় শেষ হয়ে গেছে, সেখান থেকে একটা ঘাসহীন কাদাহীন ভেজা বালির প্রান্তরেব মত নদী। বাতাসে জলের গর্জন। আর একটু এগলে তিস্তার স্রোত আর ফেনা দেখা যায়। তখন মনে হয়, তিস্তা ফরেস্টটাকে খাচ্ছে—ফরেস্টের পাড়ে এত ভাঙা জমি আর উপড়নো গাছ।

কুড়ি

তিস্তার পাড়ে জমি জরিপের আয়োজন

সুহাসদের আসতে দেখেই পুরো ভিড়টা দাঁড়িয়ে ওঠে।

এর ভেতর প্রিয়নাথ আর অনাথ পৌঁছে গিয়েছিল। তারা সার্ভে টেবিলটা একটা শালগাছের তলায় পেতে ফেলেছে। তার থেকে একটু তফাতে একটা চেয়ার দেখা যাচ্ছে, খালি, সে-ও গাছতলায়। সেই চেয়ার আর টেবিলের চার পাশেই নানা রকম মানুষের জটলা। একটু দূরে আর-একটা গাছতলায় গাছে-গাছে এক পলিথিনের চাদর বেঁধে চায়ের দোকান, এদিককার সব হাটেই যে-ছেলেটি চায়ের দোকান দেয়, তার।

জায়গাটিতে এই পার্টি একটা ধাপ ভেঙে উঠল। তার আগে বিনোদবাবু আর জ্যোৎস্নাবাবু ওদের বোঝাটা মাটিব ওপর নামিয়ে দিয়েছেন, সার্ভে টেবিলটাব কাছে। ওপবে উঠে, জ্যোৎস্নাবাবু আর বোঝায় হাত দিলেন না, নিজের ঝোলানো ব্যাগটা নিয়ে ভিড়ের ঐ দিকেই চলে গেলেন, চায়ের দোকানটা যে-দিকে। হাফশার্ট গায়ে, ধুতি পরা, ক্যাম্বিশের পাম্পসু পায়ে গয়ানাথ এগিয়ে এসে নমস্কার করল, 'আসেন স্যার, আসেন।' তারপর সেই চেযাবটা দেখিয়ে বলল, 'বসেন স্যার।' বসতে একটু ইচ্ছে করছিল সুহাসের। উনি বলা মাত্র ঐ খালি চেয়ারটায় গিয়ে বসলে মনে হবে, সুহাস এখানে অতিথি, বেশিক্ষণ থাকবে না, এই ভদ্রলোকই গৃহকর্তা। কিন্তু সার্ভে পার্টিটা ত সুহাসেরই। তার ওপর দ্বিতীয় আর-একটি চেয়ার নেই। বসার প্রয়োজন হলেও, একটু সময় নেয়া ভাল।

বিনোদবাবুর হাত প্রায় যন্ত্রের মত নিশ্চিত ও ব্যস্ততাহীন। তিনি সুহাসের কাছে কিছু জিজ্ঞাসাও করলেন না। লাল সালুব বস্তা খুলে মৌজা ম্যাপটা সুহাসকে দিলেন। তারপর এখানকার খানাপুরী টেকনিক্যাল ম্যানুয়াল খুলে, তাব ভেতর এই সেটেলমেন্টের খশড়া ফর্মটা ঢুকিয়ে নিলেন। মৌজার এক নম্বর দাগ থেকে ঢুকে যাবেন। আর এই জায়গাটাতে ম্যাপিং-এর একটা ঝামেলা আছে। সেই জন্যই কে-জি ওয়ান এখান থেকেই কাজ শুরু করছেন। খাতা আর কম্পাস হাতে বিনোদবাবু দাঁড়িয়ে অনাথ আর প্রিয়নাথকে খুঁজলেন। অনাথকে দেখেই বললেন, 'প্রিয়নাথকে ডাকো, তাড়াতাড়ি শিকল ধরো, এখন রোদ আছে, যতটা পার সেরে রাখো, ঐ, নদীর পাড় বরাবর চেন ফেলো।' বিনোদবাবু সুহাসের কাছে এসে বললেন, আপনি ত ম্যাপটা দেখেছেন। এখানেই ফ্লাডের জন্য একটা নতুন ম্যাপিং করতে হবে। আমি চেইন ফেলছি।'

বিনোদবাবু নদীর দিকে পা ফেললে অনাথ এসে বলল, 'প্রিয়নাথকে ত দেখছি না।' বিনোদবাবু তার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বললেন, 'তাকে কি এর মধ্যেই বাঘে খেল? তাড়াতাড়ি চেইন ধরতে বলো। বৃষ্টি হলে ত তোমাকে-আমাকে আবার একদিন এখানকার কাজের জন্যেই আসতে হবে। দিন বেশি লাগালে তোমার-আমার কোনো লাভ নেই, অফিসার না হয় অ্যালাউন্স পাবে।'

বিনোদবাবু জানেন প্রিয়নাথ ঐ ভিড়ের মধ্যে মক্কেল ধরতে গেছে। বস্তি বা বড় জোতের কাজে বেশ সময় লাগে, অংশের মামলা থাকে, মক্কেলই প্রিয়নাথকে খুঁজে বের করবে। এখানে তিস্তা নদীর ভাঙন আর শাল গাছের ফরেস্টের মাপামাপি দেখতে ত এসেছে দুনিয়ার 'বনুয়ার দল'—সে রাজবংশীই হোক, আর মদেশিয়াই হোক, আর নেপালিই হোক। সারা তল্লাটে যাদের এক চিলতে জমির কাজ জোটে নি,

আর, এমন-কি ফরেস্টের জমি বেআইনি চাষ করতেও যাদের আসতে হয়েছে এই গাজোলডোবা-সিদাবাড়ির তিস্তার পাড় পর্যন্ত, তাদের ভেতর আর মক্কেল পাবে কোথায় ? এক গয়ানাথ জোতদার। কিন্তু সে ত আর ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকা খুচরো মক্কেল নয়। মৌজা-মৌজা জমিতে তার কারবাব। কাজকর্ম ঠিকমত শেষ হলে সবাইকে থোক কিছু দেবে হয়ত। এখানকার কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করে দিতে পারলেই লাভ। প্রিয়নাথ এর ভেতর কোনো দেউনিয়ার কোনো মামলা আছে কি না সেটাই ঠাহব করতে গেছে। নদীর কাছাকাছি থেকে পেছন ফিরে বিনোদবাবু হাঁকেন, 'প্রি-য়-না-থ।' তাঁর আওয়াজটা তিস্তার হাওয়ার আওয়াজে ঢাকা পড়ে যায় বটে, কিন্তু তাতেও সুহাস পর্যন্ত একটু চমকে যায়, বিনোদবাবুর গলার এতটা জোব দেখে। মৌজা ম্যাপটা খুলে সুহাস চেয়ারটার দিকে এগয়।

'স্যাব, একটা কথা ছিল স্যার, কথা না হয়, অনুরোধ, অনুরোধ ছিল স্যার'—সেই ভদ্রলোক।

'এই স্যার, জরিপ মানে সার্ভে ত আপনার স্যার রোজই হওয়া লাগিবে। অনেক টাইম ত লাগিবেই স্যার কিন্তুক এই রোজ-রোজ কি এই টেবিল আর খাতাপত্র স্যার আপনাদের পক্ষে, আপনার না স্যার, কিন্তু উনাদের পক্ষেও টানাটুনি করা উচিত স্যার ?'

'সে আর কী করা যাবে, সার্ভে করতে হলে ত এ-সব লাগেই', ম্যাপটা৲ দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে সুহাস চেযারটাব সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

'সেটা বিষযেই আমার স্যাব একটা অনুরোধ রাখাব ছিল। সেটা আমাদের ত এইটা কাজ এটা ত আপনাকে মানিতেই লাগে স্যার', সুহাস যখন চেয়াবটায় বসতে যাচ্ছে গয়ানাথ বাধা দিয়ে বলল, 'বসিবেন না স্যার, কনেক থামেন।'

সুহাস ম্যাপটা বেশ মন দিয়ে যাচাই করছিল। এব পর এই ম্যাপেব ওপরই নতুন ম্যাপের লাইন কোথা দিযে টানা হবে সেটা বের করাব আগে আউটলাইনটা দেখে নিচ্ছিল। খুব সুবিধে হত, যদি ঠিক এই সেকশনটার একটা এনলার্জড আউটলাইন আঁকা থাকত। লোকটাব কথায় সে একটু চমকে চোখ তুলতেই চিৎকাব উঠল, 'হে-ই বাঘারু।' যে-ভিড়টা ছড়িযে-ছিটিযে ছিল, তার ভেতর থেকে একজন এসে দাঁড়ায। সুহাসেব দুই হাতে ম্যাপ মেলা—নীল কাগজেব ওপর শাদা রেখার। আর এই লোকটিই যেন আর-একটা ম্যাপ—বিলিফে আঁকা, এমন নিষ্প্রাণ বস্তুব মত সামনে এসে দাঁড়ায়। তার মাথা থেকে পা শাল-সেগুনেব দীর্ঘ কাণ্ডের মত অনিযমিত, বর্ণশূন্য ও রুক্ষ। চোখদুটো কোন গভীরে—মণি দেখা যায় না। নাকটা থ্যাবড়া। পরনে একটি নেংটি—তাব রংও গায়ের রংয়ের সঙ্গে মিশে আছে। গয়ানাথ এত জোরে চিৎকাব করে উঠেছিল, যেন ফরেস্টের ভেতর থেকে বনমোরগেব ডাক। আর এই লোকটি এসে দাঁড়িয়ে পড়ার পর, দাঁড়িয়ে থাকার পর, বোঝা যায় তাকেই ডাকা হয়েছে।

'চেয়ারখান মুছি দে।'

সুহাসকে আবার সেই হাফশার্ট-পরা লোকটার দিকে তাকাতে হয়।

'ঠিক আছে', বলে সুহাস চেয়ারটায় বসে পড়ে—চেয়ারটা তা হলে এই লোকটিই আনিয়ে রেখেছে—আর দুই হাঁটুর ওপর ম্যাপটা মেলে ধরে। তখন সুহাস টের পায়, সে বসে পড়া সত্ত্বেও ঐ রিলিফ মত লোকটি চেয়ারের মাথা, পেছন দিকটা, পায়াগুলো হাত দিয়ে-দিয়ে মুছে যাচ্ছে। শুকনো কাঠের সঙ্গে তার শুকনো হাতের ঘর্ষণে খসখস আওয়াজ উঠছে।

'তাই স্যার এই টেবিল শিকল এ-সকল স্যার আমার লোকজন নিয়ে ঠিক জায়গায় গোছ করি রাখি দিবে। আর রোজ-রোজ আনি দিবে। আর এই খাতাগুলা আনার জন্য একটা মানষিক সকালে আপনার ক্যাম্পত পাঠাম।'

সুহাস আর মুখ তুলে তাকায় না। সে একটা পেন্সিল দিয়ে তিস্তার পাড়টার যে-অংশটুকু আজকের ব্যাপার, তাকে চিহ্নিত করে।

'স্যার, এই স্থানে আমাদের একোটা সুনাম-খ্যাতি আছে, হাকিম-অফিসার-নেতাগণকে আমরা সেবা করিয়া থাকি। স্যালায় আপোনাকে এই নিবেদন।'

গয়ানাথ থামার পরে সুহাস বোঝে সে থেমেছে, সুহাস চোখ তোলে না। কিন্তু চোখ না তুলে বুঝতে প্যারে না লোকটি আছে না চলে গেছে।

একটু পরেই সুহাস বুঝতে পারে যে লোকটি যায় নি। সে একবার সোজা তাকিয়ে দেখে নেয়—দূরের লোকজন আর তার মধ্যে এই লোকটিই একমাত্র দাঁড়িয়ে। সুহাসের একবার ইচ্ছে হয়,

লোকটিকে চলে যেতে বলে। কিন্তু বলতে গিয়েও থেমে যায়। সুহাস যেন একটু রেগে থাকতে চাইছে—এটা বুঝে সুহাসের নিজেরই ভাল লাগে না। লোকটি ত এখনো পর্যন্ত আপত্তিকর কিছু বলে নি, সে মিছিমিছি বিরক্ত হচ্ছে কেন? সুহাস আবার ম্যাপের ওপর ঝোঁকে।

'স্যার'—লোকটির গলা। কিছুক্ষণ কেটে যায়। লোকটি আবার ডাকে, 'স্যার।'

সুহাস ঘাড় না তুলে বলে, 'বলুন না, বলে যান, শুনতে পাচ্ছি।'

'হ্যাঁ স্যার, আমাদের উচিত নয় আপনাকে বাধা দেয়া—'

সুহাস ঝোলানো ঘাড়টাই দোলায়। কিন্তু থামে না, দুলিয়েই যায়। লোকটি আর-কোনো কথা বলছে না দেখে সুহাস মাথাটা দুলিয়েই যায়। আর ম্যাপটার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে সে ম্যাপটাকে এতটাই আত্মসাৎ করতে চায় যেন এর পর সে ম্যাপ না দেখে জমি চিনে নিতে পারে।

'আপনার সুবিধার জন্যে স্যার, এইটুকু সুযোগ আমাদের দিবা নাগিবেই'—

একটু নীরবতার পর লোকটির গলা যেন অভিমানী হয়ে ওঠে, 'ই ত স্যার, আমাদের অঞ্চলের অপমান।'

সুহাস মনে-মনে কৌতুক বোধ করে- হাকিম এমনই জিনিশ যার সঙ্গে মাতৃভাষায় কথা পর্যন্ত বলা চলে না। সুহাস চোখ তুলে তাকিয়ে দেখে, নদীর পাড়ে অনাথবাবু শেকলের একদিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে, আর-একদিক নিশ্চয়ই তিস্তার পাড় ধরে বনের মধ্যে গেছে। বিনোদবাবু বোধহয় ঐ দিকেই।
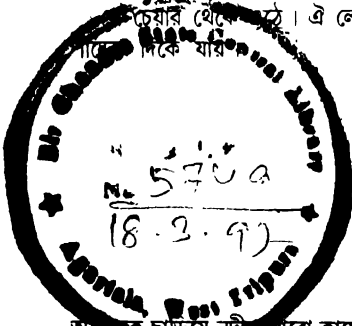
সে চেয়ার থেকে ওঠে। ঐ লোকটি এখনো বসে-বসে চেয়ারের পায়া মুছে যাচ্ছে। সুহাস নদীর পাড়ের দিকে যায়।

একুশ

গাছের ডগায় মৌজা ম্যাপ

অনাথকে ছাড়িয়ে নদীর আরো কাছে সুহাস তিস্তার পাড় ধরে সোজা উত্তরে তাকায়। এখন এই পাড়টা রাইট এ্যাঙ্গেলে উত্তরে গেছে। সুহাস যেখানে দাঁড়িয়ে সেই ফরেস্টটা মৌজা ম্যাপে জে-এল নাম্বার ৮৭ আর ৮৮-র সিদাবাড়ি-গোচাবাড়ি বর্ডার লাইন থেকে উত্তরে, একটু পুবে সরে আসা। এখানেই এখন নদী। এর সরাসরি পশ্চিমে ছিল—এই সিদাবাড়ি-গোচাবাড়িরই একটা অংশ আর আপলচাঁদের একটা ছোট ছিট। আর তার উত্তরে এই সার্কেলের সবচেয়ে বড় জে-এল ৮৪ নম্বর আপলচাঁদ ফরেস্ট।

তার পশ্চিমে ৮৫ নম্বর গাজোলডোবা, ও তারও উত্তরে মৌজা হাঁসখালিরই ২১ নম্বর জে-এল। এই ২১ নম্বর জে-এল থেকে ৮৪-নম্বরের পশ্চিম সীমা, ৮৫ নম্বর গাজোলডোবা ও সে যেখানে দাঁড়িয়ে তারও বাঁয়ের, পশ্চিমের, সিদাবাড়ি গোচাবাড়ি—সবটাই এখন তিস্তার ভেতরে। এর তলায় ৮৬ নম্বরে আপলচাঁদের একটা ছিট ছিল, সেটুকুও ম্যাপ থেকে বোঝা যাচ্ছে—যদিও সেটা অন্য মৌজার। কিন্তু তারও নীচে এই ৮৪-রই আরো একটা একটুখানি ছিট ছিল। তা হলে এখন যেটা ৮২ নম্বর উত্তর আর ৮৩ নম্বর দক্ষিণ হাঁসখালি তারও উত্তরে, আপলচাঁদেরও উত্তরে ছিল আসল হাঁসখালি। আবার এখনকার এই সব জোতের নীচ পর্যন্ত ছিল আপলচাঁদ। নইলে একই জে-এল নম্বরের মাঝখানে এত জোত এসে যায় কেমন করে? মৌজা ম্যাপটা মাটির ওপরই মেলে ধরে তার ওপর উবু হয়ে বসে সুহাস বড় হাঁসখালির ২১ নম্বরে, ৮৫ নম্বরে, ৮৬ নম্বরে ৮৭ ও ৮৮ নম্বরের পশ্চিম অংশে একটা করে ঢেরা মারে। ৮৭ ও ৮৮ নম্বরের পুবে একটা লম্বা দাগ দেয়। এর পর একটা রাস্তা আছে—সোজা আপলচাঁদের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে। এই গ্রামগুলো যদি বাতিল হয় তা হলেই একটা নতুন আউটলাইন বেরিয়ে আসে। কিন্তু নদী ত আর জে-এল নম্বর ধরে-ধরে ভাঙে নি। তাই ৮৪ নম্বরের পশ্চিম সীমাটা তাকে সাব্যস্ত করতে হবে।

এক-একটা ঢেরায় এক-একটা গ্রামের হিশেব চুকিয়ে, সুহাস ম্যাপটা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই

ফুলবাড়ি বস্তি
২১ নং হাঁসখালি
আপল চাঁদ ফরেস্ট
তিস্তা নদী
হাতির রাস্তা
৮০ নং আনন্দপুর
৮২ ও ৮৩ নং হাঁসখালি
৮৫ নং গাজোলডোবা
৮৮ নং গোচাবাড়ি
৮৭ নং সিদাবাড়ি
৮৬ নং আপল চাঁদ
ক্রান্তিহাট
হলকা ক্যাম্প
৮৪ নং আপল চাঁদ

তিস্তার ভেতর থেকে এক হাওয়াপ্রপাত ঘটে যায় যেন, আর তার হাত থেকে অত বড় ও ভারী মৌজা ম্যাপটা একটা ছেঁড়া কাগজের মত উড়ে যায়। 'হে-এ-এ' বলে একটা চিৎকার করে উঠে ম্যাপটার পেছনে সুহাস ছোটে। ম্যাপটা তখন লাট খেয়ে মাটিতে পড়েছে। অনাথ শিকল ফেলে দিয়ে ম্যাপটা ধরতে ছোটে। কিন্তু সে ম্যাপটার ওপর পড়ার আগেই আবার ম্যাপটা উড়াল দেয়, এবার আর সোজা নয়, কোনাকুনি ভাবে ওপরে গাছের মাথার দিকে, প্লেনের আকাশে ওড়াব মত। তখন সুহাস দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু অনাথ হাত তুলে ধরতে চেষ্টা করছে। ম্যাপটা যেন কোনো ওস্তাদের লাটাইয়ের সুতোয় বাঁধা ঘুড়ি, এমন নিশ্চয়তায় আরো ওপরে উঠল ও একটা মাঝারি সাইজের ডালের খাঁজে সেঁদিয়ে ঝুলতে লাগল। এতক্ষণের অলস ভিড়টা যেন মুহূর্তে প্রাণ পেয়ে সবাই মিলে ঐ ম্যাপের পেছনে ছুটছে। সুহাসও ভেবেছিল, বাতাসের দমকাটা চলে গেলেই ম্যাপটা ঝুপ করে পড়বে। কিন্তু পড়ল না। সুতরাং আর-একটা দমকায় গাছ থেকে ওটাকে ফেলে দেবে এই আশাই অগত্যা করতে হয়।

এখন নদীর পাড়ে, নদীর দিকে পেছন ফিরে সুহাস। তার সামনে একটু দূরে সার্ভে টেবিল। তার থেকে একটু দূরে গাছতলায় সেই চেয়ার। তার থেকেও একটু দূবে, বাঁয়ে এই সমস্ত ভিড়টা গিয়ে জমা হয়েছে এক গাছের নীচে। সুহাস আঙুলে ধরা পেন্সিলের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে। তারপর নিজের বোকামিটাই আরেকবার দেখতে একটু আনমনায় দিগন্তের দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ধূসর জলভূমির দিকে তাকায়। তার ওপর দিয়ে যেন শুধু বাতাসই বয়ে আসছে—ধাবাবাহিক কিন্তু প্রবলতব। 'হে এ বাঘারু'—চিৎকারে যেন আবার মোরগ ডেকে উঠল। সুহাস আবাব ঘাড় ঘুবিয়ে দেখে, গাছতলায় সেই ভিড়টার পেছনে সেই খাটো, রোগা, শুকনো লোকটা চিৎকার কবছে। তার চিৎকাবে ভিড়েব ভেতর কী আন্দোলন হয় সুহাস দেখতে পায় না। কিন্তু কিছু-একটা হচ্ছে, অনুমান করে। একটু এগিয়ে যেতেই লোকটি তার পাশে এসে বলে, 'স্যার, বাতাসটা বেশি ত, পাড়ি দিছি।' সুহাস দেখে, একটা লোক তরতর করে গাছটাতে উঠে যাচ্ছে। সে কি সেই লোকটিই, যে চেয়ার মুছছিল ? এ-লোকটি যেন সেরকম ভাবেই ডাকল।

যে গাছে উঠছিল সে ত এমন ভাবে গাছে ওঠে যেন হাঁটার চাইতেও গাছে ওঠার অভ্যাসই তার বেশি। কিন্তু সে ডালের খাঁজ থেকে ম্যাপটা বের কবেও বুঝে উঠতে পারে না, ম্যাপটা নিয়ে কী করবে। সে যদি ওপর থেকে ছেড়ে দেয় তা হলে ত বাতাসে আবার উড়ে যাবে। সে যদি হাতে ধরে নামতে যায় তা হলে গাছের ঘসায় ম্যাপ ছিঁড়ে যেতে পারে। কিন্তু সুহাস, তার পাশের সেই হাফশার্ট-পরা লোকটি, আর গাছতলার ঐ ভিড়টা সমস্যা বুঝতে পারলেও লোকটি তা মেটাবার জন্য কিছুই করে না। সে একহাতের ঘেবে নিজেকে গাছটার সঙ্গে সেঁটে রাখে, আব-এক হাতে ম্যাপটা ধরে থাকে। বাতাসের ধাক্কায় সেখানেই ম্যাপটা ফরফব করে।

'হে-এ বাঘারু মুখত ধরি নামা কেনে, মুখত ধরি নামা।'

লোকটি যেন জানতই এ-বকম কোনো নির্দেশ আসবে। মুহূর্তের ভেতব সে অতবড় ম্যাপটা দাঁতে চেপে ঝুলিযে সড় সড করে নেমে আসতে শুরু করে—যেন বাতাসের বেগে গাছটাই কাত হয়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে—ডালেপাতায় পাখিব বাসা, পিঁপড়ের ডিম, এমন-কি সাপখোপ সবই। মাটিতে পৌঁছনোর আগেই ম্যাপের একটা কোনা মাটি ছোঁয়। লোকজন সেটা ধরে নেয়। লোকটা দাঁতের কামড় ছেড়ে দেয়। আর অন্যরা ম্যাপটা ধরে সুহাসের দিকে যায়। কিন্তু সুহাসের কাছে পৌঁছনোর আগেই সেই শার্টপরা লোকটা নিয়ে নেয়। তারপর সে সুহাসের দিকে হেঁটে এসে, ম্যাপটা দিয়ে বলে—'চাপি ধরি রাখিবেন, বড় বাতাস,' যেন ম্যাপটা তার প্রীতি-উপহার। নদীর কাছে সার্ভে টেবিলের পাশে সুহাস, আর, ঐ দিকে ভিড়, তারও পেছনে লোকটা কোথায় দেখা যায় না—যে গাছে উঠেছিল। ঐ ভিড় আর সুহাসের মধ্যে এই হাফশার্ট-পরা লোকটা সংযোগ স্থাপন কবে যায় যেন। কিন্তু এই লোকটা কে ? কোনো-এক জোতদার ত বোঝাই যাচ্ছে। তালটা কী ?

বাইশ

জঙ্গলের ভেতরে

ফরেস্টের ভেতর থেকে প্রিয়নাথ বেরিয়ে আসে, 'স্যার, একটু ওদিকে চলেন, বিনোদবাবু দাঁড়িয়ে আছেন।'

'হ্যাঁ, চলুন,' প্রিয়নাথের সঙ্গে শালবনে ঢুকতে-ঢুকতে সুহাস হেসে বলে, 'ম্যাপটা হাত থেকে উড়ে গিয়েছিল।'

'যে বাতাস ! আমাকে দেন স্যার,' প্রিয়নাথ হাত বাড়িয়ে ম্যাপটা নেয়। সুহাস দেখে সেই শার্টপরা লোকটিও তার সঙ্গে চলেছে। একবার ভাবে বলে দেয়, আপনি কেন আসছেন। কিন্তু বলে না। দরকার কী। ওর সঙ্গে যখন কোনো মাপামাপির ব্যাপারে লাগবে তখন দেখা যাবে। কিন্তু তখনই-বা দেখা যাবে কেন ? সুহাস ভেবেই নিচ্ছে কেন, লোকটি কিছু একটা বদ মতলবে ঘুরছে। সন্দেহটা সুহাস মন থেকে সরাতে চায়। কিন্তু মনে লেগে থাকে। আর সে-কারণেই যেন সে থেমে, ঘুরে লোকটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে বসে, 'আপনারা ত এখানকার অনেক দিনের ?'

প্রশ্নটি শুনে প্রিয়নাথও থেমে যায়, লোকটিও থেমে যায়। প্রিযনাথ একটু অবাক হয়ে সুহাসের দিকে তাকিয়ে থাকে। মাত্র ত এই কযেক পা এসেছে—কিন্তু এতেই সুহাসেব মনে হয় যেন ফরেস্টের কত ভেতরে। তিস্তাও দেখা যাচ্ছে না। তাদের সেই মাপামাপির জায়গাও না।

আর চারপাশে বর্ষার ফরেস্টের ঘন সবুজ জঙ্গলের ঘের। শালগাছের কাণ্ডময় গভীর শ্যাওলা। এই সবের ভেতর ওরা, দুজন থেমে যাওয়ায় সুহাসকেও থামতে হয়।

প্রিয়নাথ জিজ্ঞাসা করে, 'কে স্যার ?'

সুহাস বলে, 'না, আপনাকে নয়, ওঁকে জিজ্ঞাসা করছি, আপনারা ত এখানে অনেক দিনের ?'

প্রিয়নাথ না নড়ে বলে, 'উনি ত স্যার গয়ানাথ জোতদাব।' কথাটা শোনাল যেন 'স্যার'টা গয়ানাথের উপাধি। শুনে গয়ানাথ তার দুই হাত বুকের কাছে তুলে নমস্কারের ভঙ্গিতে ঘাড় নুইয়ে থাকে, যেন এখানে সুহাস আর প্রিয়নাথই শুধু নয়, বেশ অনেক লোক আছে, যেন এই গাছগাছড়ার কাছেও তার এই পরিচয়ের একটা অর্থ আছে। ভঙ্গিটা প্রায় অপরিবর্তিত রেখে গয়ানাথ বলে, 'হয়। মুই গয়ানাথ।' লোকটি বোধহয় এই প্রথম তার নিজের ভাষাতেই সম্পূর্ণ কথাটি বলল। সুহাসের চোখেমুখে এই কথার কোনো অর্থ ধরা না পড়লেও সে বলে, 'ও ! আচ্ছা।' তারপর পা ফেলে।

গয়ানাথ কিন্তু সুহাস আর প্রিয়নাথের পেছনেই থাকে, পাশে আসে না। সেখান থেকেই জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি, স্যার কী বলিছিলেন ?'

'আপনারা ত এখানে অনেক দিন আছেন ?'

'হ্যাঁ স্যার। আমরা ত এইখানেই থাকি।'

'না। তা ত বটেই। কিন্তু ছোটবেলাতেও কি এখানে ছিলেন ? মানে তিস্তা কি বরাবরই এ-রকম কাছাকাছিই ছিল ?'

'তিস্তা ত স্যার, আটষট্টি সনটাক যদি বাদ করি ধরেন, তা হলে ধরেন একখান বলা যায়—' গয়ানাথ সুহাসের প্রথম প্রশ্নটার কোনো জবাব দেয় না।

'মানে, আটষট্টির ফ্লাডেই সবটা বদলাল ?'

'না, সে ত বদল হয়ই, নদী ত আর মানষির দালানবাড়ি না-হয়, যে, একেবারে পাকা থাকিবে, নড়চড় না হবে। বদল ত হয়ই—হওয়া নাগে।'

সুহাস ওঁর কাছে আসলে জানতে চাইছিল সে ম্যাপের সঙ্গে মিলিয়ে যে-বদলটা দেখছে তার কতটা এঁদের চোখে দেখা। কিন্তু গয়ানাথ অত দার্শনিকতায় পৌঁছে গেছে দেখে সে আর কথা বাড়ায় না। গয়ানাথের যেন খানিকটা প্রতীক্ষা ছিল, সুহাস কিছু বলবে, সেটুকু জুড়ে তীক্ষ্ণতর ঝিঝির ডাক আর প্রতিধ্বনিত তিস্তার গর্জনে এই ফরেস্টটা আরো ঘন ও নীরবতা আরো প্রসারিত হয়।

গয়ানাথ যেন আত্মচিন্তার মতই আবার যোগ করে, 'কিন্তুক আবার নদীর ত একটা পাকাপাকি ভাবও

আছে। অ, যতই ভাঙুক আর সরুক স্যার শ্যাষম্যাস একটা ঠিকই হয়। ধরেন—'

গয়ানাথ একটু থামে। কী উদাহরণ দেবে সেটি তাকে একটু ভাবতে হয় যেন। আর সুহাসও একটা অনুমানের চেষ্টা করে—গয়ানাথ তার নিজেব কয়েক বছবের কোনো দেখাকে যেন একটা পাকা সিদ্ধান্তের মত করে বলছে। নদীর পাড় একেবাবেই বদলে যায়, নদী পুরনো খাতে আব ফিরে যায় না, এমন ঘটনা গয়ানাথ দেখে নি, কিন্তু তাই বলে ত সেটা মিথ্যা নয়। সুহাস যেন বুঝে যায়, গয়ানাথের কাছে তার ম্যাপের সাক্ষ্যেব যে-সমর্থন চাইছিল তা পাওয়া যাবে না।

এই নীরবতায় তারা ভেজাপচা পাতাব ওপব দিয়ে চলে যায়। সুহাস প্রিয়নাথকে জিজ্ঞাসা করে, 'কোথায় ?' প্রিয়নাথ কোনাকুনি হাতটা তুলে একটা আন্দাজ দেয়। সেই সময় গয়ানাথ বলে, 'ধরেন, এই আটষট্টির বানাটাই ধরেন। তিস্তা ত, ধবেন, এইখান থিকা সোজা বাঁয়ে ঢুকে, ধরেন, তিস্তা আর ধরলার মঝখানে যে বিশাল তেকেনিয়া জায়গাখান, ঐটাকে ভাঙ্গি-ভাসি চলি গেল। আমরা ভাবিলাম, এই হইল, এখন থিকা ধরলার খাতখান তিস্তার খাত হয়্যা যাবে। কিন্তু তিস্তা ত আবার তার পুরানা খাতেই ফিরি গেল। এখনো যাছে।'

এই একটু আগে যে-জায়গাগুলিকে ম্যাপ থেকে বাদ দেবে বলে ঢ্যাবা কেটে এসেছে সেগুলোর কথা মনে রেখে সুহাস বলে—'কিন্তু আপনাদের ত কত গ্রাম ভেসে গেছে।' নামগুলো তার মনে পড়ে না। যেটা মনে পড়ে, সেটাই বলে. 'এই ফরেস্টেবই ত অনেকখানি ভেসে গেছে। এর উত্তরে হাঁসখালি।'

'কিন্তু স্যাব, নদী মানেই ত ভাঙাভাঙি। যাব পার ভাঙে আব নতুন পাড হয. সেইটা হয নদী। আর যার পাড় ভাঙেও না নতুনও হয না, ঐটা হয ডোবা।'

নদীর এই সংজ্ঞায় সুহাস বেশ চমৎকৃত হয়। সে কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই গয়ানাথ আবার শুরু করে দিয়েছে—'কিন্তু আপলচাঁদের যত ভাঙিছে, ততখানই আবার গড়িবার ধরিছে।'

'কোথায় ?'

'যেইঠে ভাঙিছে সেইঠেই, নতুন চর, নতুন জঙ্গল।'

'স্যার এই দিকে', প্রিয়নাথ বাঁয়ে ঘোরে। আর সঙ্গে-সঙ্গে তিস্তার গর্জন যেন বেড়ে যায়। একটা ঝোপ পার হতেই সামনে কয়েকটা গাছের ফাঁকে দেখা যায়—তিস্তা। বিনোদবাবু এক জায়গায় ভাঙা গাছের ওপর বসে খাতায় নোট করছেন। সুহাসরা এল দেখে উঠে দাঁড়ান।

তেইশ

নদীর ম্যাপ আঁকা

'স্যার, আপনি কি ম্যাপ কমপেয়ার করলেন ?'

'হ্যাঁ, এই দেখুন। যে-গুলোতে ক্রশ, তা বাদ যাবেই, তা হলে একটা আউট লাইন পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ফরেস্টের, মানে এই ভিলেজটার টোট্যাল একারেজটা দরকার। তা হলে আগের একারেজের সঙ্গে এটার একটা কমপ্যারিজন করা যেত। দেখুন, আমার ডিমার্কেশন।' সুহাস প্রিয়নাথের দিকে হাত বাড়ায়। প্রিয়নাথ ম্যাপটা খুলতে শুরু করে। সুহাস বলে, 'সাবধানে খুলবেন,' তারপর বিনোদবাবুর দিকে তাকিয়ে হেসে বলে, 'আমার হাত থেকে ম্যাপটা উড়ে গিয়েছিল, ওখানে।' বিনোদবাবু সামান্য হাসির ভঙ্গি আনেন। সুহাস তখন নিজে হেসে বলে, 'একেবারে গাছের মাথায়।'

মাটিতে ম্যাপটা পাতা হয়েছিল। সেই পড়ে-যাওয়া গাছটার ওপর এখন সুহাস বসে। বিনোদবাবু মাটির ওপর উবু হয়ে ম্যাপটার ঢেরা দেয়া জায়গাগুলোর ওপর দিয়ে আঙুলটা টেনে-টেনে বুঝে নেন। প্রিয়নাথ ম্যাপটা একদিকে চেপে থাকে। আর গয়ানাথ একটু দূরে দাঁড়িয়ে মাথাটা নিচু করে ম্যাপটার দিকেই তাকিয়ে থাকে, কিন্তু বোঝাই যায় সেখানে কিছু দেখছে না।

ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে বিনোদবাবু উঠে দাঁড়িয়ে প্রিয়নাথকে বলেন, 'প্রিয়নাথ, চেইনটা একটু বাঁয়ে

সরাতে বলো ত অনাথকে। আর-একটু ডাইনে সরো। মানে কোনাকুনি হবে। ঐটাকেই তা হলে পয়েন্ট ধরি স্যার, আপনি যেখান থেকে দেখলেন?'

'ধরুন, ওটা ত ভাল পয়েন্টই হবে।'

প্রিয়নাথ শেকলটা একটু নাড়া দিয়ে চিৎকার করে কিছু বলে। তিস্তার বাতাসে সে-চিৎকার ভেসে যায়। কিন্তু ও-রকম ভাবেই ভেসে আসে অনাথেরও চিৎকাব। বিনোদবাবু মেপে বলেন, 'হ্যাঁ ঠিক আছে। নাকি, আর-একটু ছেড়ে দেব স্যার?'

কথাটার জবাব খুঁজতে সুহাস একেবারে পাড়ে গিয়ে তিস্তার গতিটা আন্দাজের চেষ্টা পায়। নদীর দিকে তাকানো, মানেই ত ওপারের দিকে তাকানো, নীলাভ দিগন্তসীমায়। কিন্তু সুহাস তাকিয়ে আছে এই পারের তটরেখার দিকে, তার পায়ের তলায়।

এখানে পাড়টা অনেক বেশি খাড়া। আর, একেবারে পাড় থেকে ঝাঁকড়া মাথার বিরাট গাছ, লাম্পাতি, হালকা গাছ বলেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। শাল হলে নিজের ওজনেই ভেঙে পড়ত। ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে তার কয়েক হাতের মধ্যে একটা বিশাল খযেব গাছ ডালপালা সমেত উপুড় হয়ে জলের মধ্যে পড়ে। জলের মধ্যে পড়া সত্ত্বেও তার ডালপালা-পাতা সব জলের ওপরেই আছে—তলার দিকের খানিকটা জলে ডুবে গেছে। সুহাস একটু ঝুঁকে দেখে, তলার মাটিটাও খেয়ে নিচ্ছে। সে বলে, 'এদিকে ত পাড়টা আরো ভাঙবে বলে মনে হয়, আর-একটু ছাড়বেন নাকি?'

'স্যার, আমরা এখন ওটাকেই পয়েন্ট ধরে করে রাখি। তাবপর একারেজ দেখে আব নর্থের হলকার ম্যাপ দেখে অ্যালাইনমেন্টটা ঠিক করা যাবে।'

'আচ্ছা, তাই করুন।' মৌজা মাপের ওপর বিনোদবাবু পেন্সিলের নতুন লাইন টানতে থাকেন আর প্রিয়নাথের পাশ থেকে পুরো শিকলটার লাইনটা দেখে দেখে নেন।

'গয়ানাথবাবু, এর বাদে ত ওদলাবাড়ি চা-বাগান?' গয়ানাথকে জিজ্ঞাসা করেন বিনোদবাবু।

'হ্যাঁ। কিন্তু নদী আর বন, কতটা খাবে, কতটা থাকিবে, তাব হিশাব ম্যাপে কবিবেন কেমনে?' গযানাথ তাব প্রত্যক্ষতাকে এদেব আনুমানিকতাব বিরুদ্ধে দাঁড কবায়, যে-আনুমানিকতা আবাব মাপজোখে অনড, প্রায় আদালতেব বাযের মতই। বিনোদবাবু কোনো উত্তব দেন না।

সেই ফাঁকে সুহাস দৃশ্য হিশেবেই দেখে—তিস্তাব দিগন্ত থেকে দিগন্ত, যেন জলস্রোত নয়, একটা কঠিন জলভূমির বিস্তার। একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মনে হয়, তিস্তা চলছে না, এই পাবভূমিটাই চলছে। তখন আবাব চোখ বুজে ভাসাব বিভ্রমটা কাটাতে হয়। তিস্তাব স্রোত এতই খব যে প্রায় কোনো আলোড়নও হয না, স্টিলেব পাত্রেব মত একই তলে নদীটা বিস্তৃত হয়ে আছে। হঠাৎ মাঝে-মাঝে এক-একটা কাঠের গুঁড়িব ভাসমান মাথাটুকু কুটোর মত ভেসে গেলে বোঝা যায় নদীস্রোতেব বেগ কতটা। কিন্তু নদীব গর্জনকে তাব চার পাশ থেকে বিচ্ছিন্ন না-কবে শোনা যায না, বিশেষ করে ফরেস্টে দাঁড়িয়ে, চারদিকের সমস্ত শব্দেব সঙ্গে নদীব শব্দ এতটাই মিশে থাকে। কিন্তু নদীব দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে, স্রোত দেখতে-দেখতে, নদীব আওয়াজটাকে চাব পাশেব আওযাজ থেকে আলাদা করে নিলে, সিনেমায যেমন স্মৃতিভ্রংশেব নষ্টস্মৃতিব পুনবাগমন বোঝাতে সাইরেনেব আওযাজ ক্রমবর্ধমান হয়ে ওঠে, অবিকল যেন তেমনি, তিস্তাব গর্জনটাই বাড়তে-বাডতে প্রধান হযে ওঠে। তখন মনে হয়, এই প্রচণ্ড পরিব্যাপ্ত আওয়াজটাকে না-শুনে কী করে থাকা যায়। তবু আওযাজটার মধ্যে বিরতিহীন মেঘগর্জনের মত একটা দূরত্বেব ইঙ্গিত আছে—যেন ভেসে আসতে হচ্ছে। কিন্তু অবরুদ্ধ গুম-গুম ধ্বনি জলেব তলা থেকে আরো তলায় নেমে যাচ্ছে। পাহাড থেকে বিরাট-বিরাট বোল্ডার জলস্রোতে ভেসে-ভেসে জলেব তলা দিয়ে গড়িয়ে-গড়িয়ে যাচ্ছে। টানা গড়গড় আওয়াজে যেন পাহাড়ে ধস নেমেই চলেছে। জলের তলায় বোল্ডারে-বোল্ডারে যখন ধাক্কা লাগে তখন জলের তলা থেকে যেন কামান গোলার আওয়াজ হয়। লোকমুখে এই আওয়াজটার নামও তাই 'তিস্তার কামান।' সুহাস যখন জলস্রোতের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দৃশ্য-শব্দ শব্দের-ভেতরে-শব্দ শুনতে পাচ্ছিল তখন সে আর-কিছু শুনতে পায় না, দেখতেও পায় না। আর এই দৃশ্য ও শব্দ তার সমগ্রতা নিয়ে তাকে যেন সম্পূর্ণ অবশ করে দিচ্ছিল। সে দেখতে পাচ্ছিল, তিস্তা যে এখান থেকে উত্তরে, পশ্চিমে বেঁকে গেছে সেখানে ঐ ঘোলা জলের স্রোত প্রায় একটা তৈরি করা স্রোতের মত নিটোলতায় উজানে বাঁক নিচ্ছে। সেই বাঁক থেকে জলটা বয়ে আসছে সুহাসের দিকে। আর সুহাস চোখে-চোখে স্রোতটা উজিয়ে-উজিয়ে

সেই বাঁক পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে। তাব দৃষ্টিতে ঘোব লাগে—এই স্রোতের প্রবলতা দৃষ্টি দিয়েও উজনো যায় না। সুহাস এই ঘোব সামলাতে প্রথমে চোখ বোঁজে। তাবপব বসে পড়ে।

চব্বিশ

নদী আছে কি নাই   গযানাথী তর্ক

চোখ বন্ধ কবতেই নদী আব নদীব আওযাজ দুটোই মিশে যায পবিবেশেব সঙ্গে। এই ভাবে নদীর সামনে বসেই নদী থেকে নিজেকে আলাদা কবে নিতে বা নদীকে আবাব তাব পবিবেশেব সঙ্গে মিলিযে অস্পষ্ট কবে নিতে স্বস্তি বোধ কবে সুহাস। সে নদীব দিকে পেছন ফিবে তাকিযে দেখে বিনোদবাবু নোট নিচ্ছেন, গযানাথ তাব দিকে তাকিযে, প্রিযনাথবাবু নেই।

'প্রিযনাথবাবু কোথায ?'

'চেইন গোটাচ্ছে।'

এবাব গযানাথ সুহাসেব দিকে এগিযে আসে, 'স্যাব, এইখানে আপনাদেব মাপামাপিতে কী পাইলেন ? নদীখান কি ভাঙিছে ? মাপামাপিতে ?'

সুহাস বসে-বসেই বলে, 'আপনি যা দেখছেন আমবাও তাই দেখছি। আমবা শুধু এইসব মেপেটেপে এঁকে বাখছি।'

'সেইটাই ত কহিতে চাই স্যাব। আটষট্টিব ফ্লাডে নদীখান এইঠে আসি গেইছিল, ঢুকি গেইছিল, ঠিকই। কিন্তু তাবপব আব ভাঙে নাই। এ্যালায ফবেস্টখানই ঐদিকে, নদীব দিকে, এব বাদে বাড়ি যাবে।'

'সে যখন যাবে, তখন যাবে, এখন ত আব যাচ্ছে না,' বিনোদবাবু তাঁর খাতা থেকে চোখ না-সরিয়ে বলেন।

'কিন্তুক, স্যাব, এই ভবা বর্ষায ত নদী সবঠেই ঢুকি যাবে। যেখানে যাবে সেইটাই কি বাতিল ? স্যালায ত তামান মৌজা বাতিল হবা ধবিবে—'গযানাথ উত্তেজনা প্রকাশ কবে ফেলে, আর সাধুভাষা বলতে পাবে না। আব এতক্ষণে গযানাথেব কথাতে সুহাসেব মনে হয, এইটুক গ্রামে সাবাজীবন ধবে থেকে এইখানকার নদীটা দেখে-দেখেই গযানাথ কোনো সর্বজনীন দার্শনিক তাব বুলি আওডাচ্ছে না, তাব যেন আবো নির্দিষ্ট কিছু বলাব আছে। সে তাই গযানাথকে জিজ্ঞাসা কবে, 'তা হলে আপনার বক্তব্যটা কী, মানে, আপনি কিছু বলছেন ?'

'না স্যাব, আমি কহিছি আপনাব মৌজাব ম্যাপখানত্ বদলিবাব ত কিছু নাই। য্যানং ম্যাপ আছে, থাউক—' কথাটা গযানাথ শেষ করতে পাবে না। কিন্তু বোঝা যায় সে শেষ কবতে চায।

সুহাস জিজ্ঞাসা করে, 'মানে, আমবা দেখছি গাজোলডোবা নেই, হাঁসখালি নেই, চুরাশি নম্বব নেই, এতগুলো দাগ নেই আর আমবা মৌজা ম্যাপে লিখে দেব সব ঠিক আছে।'

'না, না, তা লিখিবার কাম কী আছে স্যার, কিছুই লিখিবেন না, য্যানং আছে, থাকুক কেনে।'

'তা হলে ত সেটা রেকর্ড কবতে হবে। আমি দাগ নম্বরই-বা দেব কোথায়, আর দাগ নম্বর শুরুই-বা করব কোথায় ?'

'সে ধরেন, ফরেস্টের জমি হাসিল হছে যেইঠে।'

'ফরেস্টের জমি হাসিল হয়েছে, মানে ?'

'মানে, আগে ফরেস্ট ছিল, এ্যালায় চাষ হওয়া ধরিছে, সেটা ত আপনারা চাষজমি ধরিবেন ?'

'কে চাষ করছে ? ফরেস্টের জমি ত ফরেস্টের। কারা চাষ করতে দিয়েছে ? বরং উল্টোটা হতে পারে, আগে আবাদ ছিল, এখন ফরেস্ট হয়েছে।'

'হ্যাঁ। তাও হবা পারে। কিন্তু এইঠে ত সব জমিই ফরেস্টের ছিল, তাব থিকা চাষ হওয়া ধরিছে।'

বিনোদবাবু এতক্ষণে মুখ তুলে বলেন, 'সাত পুরনো কথা তুলে কী লাভ ? সে যখন ফরেস্ট হাসিল হত, তখন হত। এখন আমরা দেখছি নদীটা এতদূর এসেছে, সেটা লিখব না ?' বিনোদবাবু উঠে দাঁড়ান, তারপর সুহাসকে বলেন, 'আপনি বুঝলেন না স্যার, ফরেস্টের জমি যখন গয়ানাথবাবুরা চাষ করবেন তখন সেটা চাষে দেখাতে হবে আর গয়ানাথবাবুর জমি যখন নদীর ভেতরে যাবে তখনো গয়ানাথবাবুরই থাকবে। কী বলেন গয়ানাথবাবু ?'

'কথাটা আপনি সিধা বলিলেন আমিনবাবু, কিন্তু ঠিকই। জমিনের ত আর পাখনা নাই যে উড়ি যাবে, যেখানকার জমি সেইঠেই থাকে, সে জমির উপর জঙ্গলই হোক আর জলই হোক।'

সুহাস বুঝতে পারে পাশাপাশি থেকে, পিছু-পিছু এসে, প্রথমে আনমনা ভাবে, এখন বেশ জোর দিয়ে গয়ানাথবাবু একটা কোনো কথা প্রমাণ করতে চাইছেন। সে-কথার সমর্থনে আইনের প্রকাশ্য কোনো বিধান নেই বলেই তার কথাটা হয়ত এতটা ঘোরানো-প্যাচানো মনে হচ্ছে। কিন্তু হয়ত আইনের সমর্থন নিহিত আছে বা থাকতে পারে। সুহাসের সামনে কথা বলছে বলেই এ-রকম ভাবে বলছে। 'কিন্তু তাতে লাভটা কী আপনার ? মানে আপনাদের ? আমরা যদি নদীটা এঁকে নাও নেই, তা হলেও ত নদীটা এখানেই থাকবে।'

'কিন্তু নদী ত এইঠে সরি যাবে স্যার, আর মাস দুই বাদেই নদী সরি যাবে।'

'না, সে ত যাবেই, বর্ষায় নদী যতটা আসে, শীতে ত আর ততটা থাকে না, কিন্তু আপনি শুধু শীতের নদীটাকেই নদী বলবেন নাকি, বর্ষার নদীটাও ত নদী, বর্ষার জল যাবে কোথায় ?'

'সে ত স্যার, যদি আপনি এইটাক নদী বলি ডিক্লার করি দেন, নুটিশ দেন, তার বাদেও ত নদী আরো ছড়ি পড়িবার পারে, বৃষ্টি বেশি হইলেও বাড়িটাডিত ঢুকিবার পারে, তখন কি কহিবেন, যে-যে-টাড়িত নদীর জল সিন্ধাইছে স্যালায় সব টাড়ি নদীবাড়ি হয়্যা গেইল ?' গয়ানাথের এই কথা শুনে সুহাস বুঝতে পারে—উত্তর দেয়া মুশকিল এমন কথা না-শোনা, আর নিজের পক্ষে জোরদার কথা বার ব্যর বলা—তর্কের এই বেশ অভিজ্ঞ প্যাঁচ গয়ানাথের ভাল আয়ত্তে আছে। সুহাসের ঐ সন্দেহ কেটে যায় যে গয়ানাথ তার কথাটা হয়ত বলতে পারছে না। বিনোদবাবু বলে ওঠেন, 'আমরা এখন যা দেখছি তাই লিখছি। এর পর অ্যাটেশটেশনের সময় বলবেন, তখন ত আর বর্ষা থাকবে না, যাঁচের সময় বলবেন, ভুল হলে ভুলের লিস্ট বের হবে। চলেন স্যার, আমাদের দেরি হয়ে যাবে। এক জায়গাতেই ত সময় গেলে চলবে না।'

'সে ত করা যাইবেই আমিনবাবু। কিন্তু, এইঠেও ত স্যারের কাছে মোর কাথাটা কহা যায়। যায় কি না-যায় ?'

সুহাস তাড়াতাড়ি বলে, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়, আপনি বলুন না, আমি ত শুনছি আপনার কথা।'

সুহাস টের পায় গয়ানাথ তার মত করে আইনের বিধান শুনিয়ে দিল। বিনোদবাবুও চুপ করে যান। গয়ানাথ তখন বলে, 'মোর কাথাটা ত সিধা স্যার, আপনারা যেইঠে নদী আঁকিলেন, ঐঠে নদী নাই, ঐটা বর্ষার জল।'

যেন গয়ানাথের কথাটা যাচাই করে দেখার জন্যই সুহাস নদীর দিকে ফেরে। নদীর আরো একটু কাছে যায়। তারপর নিচু হয়ে সে পাড়ের মাটি ভাঙার লাইনটা দেখে। সে এবার ঐ লাইন বরাবর উত্তরে হাঁটে, নিচু হয়েই পাড় ভাঙার লাইন দেখতে-দেখতে, পরীক্ষা করতে-করতে। মাঝখানে সেই উপড়নো গাছটার বাধা। ফলে সেই গাছটাকে ঘুরে পার হতে হয়। গয়ানাথ আর বিনোদবাবু পেছনেই থাকেন। সুহাস বুঝে গেছে গয়ানাথ আইনের জোরেই কথা বলতে চায়, সুতরাং সুহাসও তার যুক্তিটা আর-একটু যাচাই করতে চায়। সে একটা বাঁক পর্যন্ত দেখতে চায়—যে-বাঁকটা এর চাইতেও ডাইনে নিয়ে গেছে নদীকে। এই পাড়ের লাইন নিশ্চিতভাবেই নদীর পাড়ভাঙার লাইন। বর্ষার জলে নদী যদি এতটা উঠে এসে থাকে তা হলে কি এ ভাবে পাড় ভাঙত ? সুহাস নদীর পাড়ভাঙা খুব একটা দেখে নি। সামান্য দেখে থাকলেও, মাত্র সেটুকুর ভিত্তিতে তার পক্ষে এমন বর্ষা তার ধারণারও বাইরে। সুহাস সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তিস্তার দিকে একবার তাকায়। তার সামনে একটু-আধটু পাতলা ঝোপঝাড়। তার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে তিস্তা। দূর ঘোলাটে বিস্তারের ওপর আকাশের আর আলোর বিচিত্র সন্নিপাতে ছায়া আর রোদেরও কত অজস্র বিন্যাস। সেই বিন্যাসের মধ্যে কোথাও স্রোত নেই, ভাঙন নেই, আক্রমণ নেই, আওয়াজ নেই। সুহাসের ইচ্ছে হল, সে তিস্তার আওয়াজ শোনে। চোখ বুজে সে তিস্তার

দিকে মন দেয়। প্রথমে ফরেস্টের ঝিঁঝির ডাকের সঙ্গে মিশিয়ে শুনতে পায়। তারপর ধীরে-ধীরে সে শব্দ আলাদা হয়ে যায়। আলাদা হতে-হতে যেন জলতলের নির্ঘোষটা স্রোতের ওপরে উঠে আসে। তিস্তা যেন আবার, জলস্রোত থেকে ধ্বনিস্রোত হযে যায়। অবিরত ধ্বনি। বোল্ডারের সঙ্গে বোল্ডারের ঘর্ষণের কামানগর্জন মাটি ভেদ করে উঠে আসছে। অদৃশ্য জলগর্ভ জীবন্ত হতে থাকে। সুহাস চোখ খোলে। আওয়াজটা অনেকখানি মিলিযে যায।

সুহাস ফেবে। সে তাব যুক্তি ঠিক কবে ফেলেছে। যদি কোনো প্রমাণ হাজির কবতে পাবে, গয়ানাথ করুক। নইলে সে যা লিখল, তাই পাকা।

গযানাথ, বিনোদবাবু তাব দিকেই তাকিয়ে দাঁড়িযেছিলেন। সুহাস তাঁদেব কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। দুজনের কেউই কথা বলেন না। সুহাস বলে, 'না গযানাথবাবু, নদী এই পর্যন্তই এসেছে।'

গযানাথ যেমন দার্শনিক ভাবে শুনছিল, তেমনি শোনে। কথা বলে না। কিন্তু গয়ানাথ বা বিনোদ কেউ নড়েও না। সুহাস যখন বলতে যাবে, তা হলে চলুন বিনোদবাবু, তখনই বিনোদবাবু বললেন, 'স্যার, বলছিলাম গযানাথবাবু যখন এতই আপত্তি তুলছেন তখন আব-একবাব দেখে নিতে ক্ষতি কী?'

'আমি ত সেজন্যেই দেখে এলাম। এটা নদীবই আউটলাইন। স্পিল এবিয়া নয।' 'গযানাথবাবুর যদি কোনো প্রমাণ দাখিলা থাকে তবে হাজিব করুন,' বিনোদবাবুব এই কথায় সুহাস একবার গয়ানাথের আর-একবাব বিনোদবাবুব মুখেব দিকে তাকায। সুহাসও এই কথাটিই ভেবে রেখেছিল বলবে বলে, কিন্তু গযানাথ কোনো কথা বললে তাব উত্তবে বলবে, নিজে থেকে বলবে না। বিনোদবাবু আগেই বলে দিলেন? প্রমাণেব কথা একবাব উঠলে আব পেছুনো যায় না। তবু বিনোদবাবু বললেন কেন? গয়ানাথবাবু সুহাসেব কথা শুনতেই দাঁড়িয়ে থাকে। সুহাস বলে, 'আপনার কোনো প্রমাণ থাকলে, বলুন।'

'আমাকে একটু টাইম দেন স্যাব। মোক ঐঠে যাবা নাগিবে। তাবপর প্রমাণ দিম। নিশ্চয় দিম।'

'হ্যাঁ, আপনি যান। তাড়াতাড়ি আসবেন।'

'হ্যাঁ স্যাব। যাম আব আসিম। যাম আব আসিম।'

গয়ানাথ মুহূর্তে সবসব শব্দ তুলে পাতা-কাদাব ভেতব দিযে বেরিয়ে গেল।

পঁচিশ

দশ বছর আগে-পরে 'গয়ানাথের জোত'

সুহাস গয়ানাথের প্রস্থানের দিকে তাকিয়ে আছে। গয়ানাথ অবিশ্যি নেহাতই ছোটখাট, পাতলা। তার যাতায়াতে কোনো শব্দ না-হওযারই কথা। কিন্তু গয়ানাথ যেন তাব চাইতেও নিঃশব্দে ফরেস্টের মধ্যে মিলিয়ে গেল খুব দ্রুতগামী জন্তুর মত। এতক্ষণ সুহাস, গযানাথেব এমন তৎপরতা আছে, ভাবতেও পারে নি। সে খুব আস্তে জিজ্ঞাসা করে, 'কে ভদ্রলোক?'

'গয়ানাথ জোতদার। বায়বর্মন। তিনপুরুষের। দেখেন নি? এই মৌজার সবটাই ত ওর। এর নীচের মৌজাও আগে ত ওদেরই পুবোটা ছিল।'

'গয়ানাথ রায়বর্মন।' সুহাস যেন কোন স্মৃতি থেকে নামটা মনে আনার চেষ্টা করছে। দলিলদস্তাবেজে নয়, রেকর্ডে নয়, দাখিলাপর্চায নয়, গয়ানাথ নামটা তার কারো মুখে শোনা হয়ে আছে, 'এর কি ফরেস্টেরও দখল আছে না কি?'

'কোথায় নেই স্যার? এটা ত গয়ানাথের জোত বলেই সবাই জানে। আপনি মৌজার নাম বদলেও দিতে পারেন, "মৌজা গয়ানাথের জোত"-ও লিখতে পারেন।' 'কেন? তা লিখব কেন?' সুহাস একটু

আনমনা ভঙ্গিতে বিনোদবাবুকে বলে বটে কিন্তু কথাটার মধ্যে একটা কোনো জোর ছিল। বিনোদবাবু তাড়াতাড়ি বলেন 'না, স্যার, এমনি বলছিলাম।'

এখন সুহাসের কাছে যেন অনেক কিছুই পরিষ্কার হয়। একটু হেসে নদীর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, 'ওঁর জমি সব ?' বিনোদবাবু একটু হেসে মাথা হেলান। 'তা হলে নদীরও দোষ, আমাদেরও দোষ।'

গত বারের সেটলমেন্টের পঁচিশ বছর পর এই সেটলমেন্ট হচ্ছে। মাঝখানে আটষট্টির বন্যার মত ঘটনা ঘটে গেছে। তিস্তা ব্যারাজের কাজ শুরু হবে। এই সার্ভে তিস্তা ব্যারাজের জন্যেও হচ্ছে। তিস্তা ব্যারাজ বাঁধা হলে নদীর অনেক কিছু বদলে যাবে। এখন, এই সার্ভেতে এই মৌজার ম্যাপ থেকে ঐ পুরনো দাগনম্বরগুলো চিরতরে বাদ চলে যাচ্ছে। হালের দাগ নম্বর নতুন করে শুরু হবে। তার মানে নদী যা খেয়েছে তা নদীরই সম্পত্তি হয়ে গেল। এখন যদি দু-চার আট-দশ বার-চোদ্দ বছর পর এখানে চর জাগে, বা ব্যারাজের ফলে পাড়টা আরো এগিয়ে যায় তা হলে তাতে গয়ানাথের কোনো অধিকার থাকবে না, পুরোটা পোয়াস্তি হয়ে যাবে। যার ইচ্ছা সেই তখন দখল নিতে পারবে ও সরকারও সেই পোয়াস্তির বন্দবস্ত যার সঙ্গে ইচ্ছা তার সঙ্গে করতে পারবে। কিন্তু যদি নদীর সীমা এতদূর পর্যন্ত মানা না যায়, পুরনো মৌজা ম্যাপটাই যদি চালু থাকে, তা হলে পাঁচ-সাত, আট-দশ, বার-চোদ্দ বছর পরও চর পড়লে গয়ানাথ আইনত বলবে এটা চর নয়, তার নিজ খতিয়ানের অন্তর্গত কায়েম। আর, এবারের সেটলমেন্টে একজনের নামে একটা খতিয়ানই দেয়া হবে। মানে, ঐ নদীর তলের মাটির জন্যেও হালখতিয়ান পেতে চাইছে গয়ানাথ। সুহাস কয়েক পা এগিয়ে ঝুঁকে, নদীর পাড়টা আরো মন দিয়ে দেখে। এইবার নদীর এই ভগ্ন লাইনের একটা অন্য ব্যক্তিগত তাৎপর্য ধরা পড়ছে। এখানে যে-জমি ভাঙছে সেটা ফরেস্টের। কিন্তু আরো দক্ষিণে-দক্ষিণে যে-জমি ভাঙছে বা ভেঙেছে সে সব গয়ানাথের জমি। তিস্তার জলের তলের মাটিটা আর প্রাকৃতিক থাকে না, জলের তলার রহস্য থাকে না, অন্তর্স্রোতে আর খরস্রোতে যেন অমানবিক কোনো শক্তি থাকে না। তিস্তার জল, বিশেষত এই তীরবর্তী জল, তিস্তার মাটি, বিশেষত এই তীরবর্তী মাটি একটা খুব প্রাকৃত মানবিক শক্তি হয়ে ওঠে। ঝুপ ঝুপ করে যে-মাটি পড়ে, বা স্রোতের আঘাতে-আঘাতে যে-তীরের তলা ফাঁক হয়ে যায়, সেই সব মাটি আর তীরভূমি গয়ানাথের।

সুহাস তিস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু দূরের বিস্তারের অতিঅনির্দিষ্টতা থেকে চোখ গুটিয়ে আনে প্রায় চোখের তলার নিকট নির্দিষ্টতায়---তিস্তার জল যেখানে ঘনিষ্ঠ মিত্র। সুহাস খুব কাছে তাকায় কাদাগোলা জলে ফেনার একটা সূক্ষ্ম শাদা রেখা, দুলছে, কয়েক হাত দূরে তিস্তার পাহাড়- ধসানো স্রোতের টান এখানে পৌঁছয় না। মাটি থেকে একটা কুটো তুলে নিয়ে সুহাস ঐ জলে ছুড়ে দেয়, যেন পরিচিত আত্মীয়তায়। তারপর বিনোদবাবু বলে, 'তা, ওঁর যা প্রমাণ তা ওখানেই দিতে পারেন, এখানে আসার দরকার কী ?'

বিনোদবাবুও খানিকটা চুপ করে থেকে বিহ্বলের মত বলেন, 'হ্যাঁ, তাই ত স্যার। আপনি বললেন, আমিও আর ভাবলাম না,' থেমে যোগ করেন, 'এখনো আমরা চলে যেতে পারি, ওরা ওখানে যাবে।'

'আচ্ছা এখানেই আসুন, যখন গেছেন—,' বলে সুহাস সেই গাছটার ওপর বসে, হেসে বিনোদবাবুকে বলে, 'কি, মৌজার নাম বদলে দেবেন নাকি—কী বললেন, "গয়ানাথের জোত" ?'

'না স্যার, এমনি বলছিলাম,' বিনোদবাবু যেন কৈফিয়ৎ দেন। কিন্তু সুহাস আবার বলে, মন্দ হত না নামটা—"গয়ানাথের-জোত", এদিকে ত এ-রকম নাম থাকে।'

'হ্যাঁ স্যার, থাকে—'

তাই কি সুহাসের মনে হচ্ছিল নামটা যেন তার শোনা, অনেকদিন আগে কেউ শুনিয়েছিল, স্মৃতিতে কোথাও আছে—নকশালবাড়ি, বুড়ার জোত, মঙ্গলবাড়ি জোত, কালীর জোত ? সেদিন এমন কোথাও চলে যাওয়ার বদলে, দশ-বার বছর পরে, এখন, সুহাস বসে আছে এমন-একটা জায়গায় যার নাম হতে পারে—গয়ানাথের জোত। সে ইচ্ছে করলেই এই নাম দিয়ে দিতে পারবে। দিয়ে দিতে পারে। আর গয়ানাথ জোতদার গেছে তার সামনে হাজির করার প্রমাণ-দলিল আনতে। সুহাস এখন জোতদারের বিচারক। এ ত সুহাসের একটা জিতই, বেশ বড় জিত। কিন্তু জয় বোধ করতে পারে না সুহাস, 'গয়ানাথের জোত' এই একটা নামের অনুষঙ্গেই জয়বোধ উধাও হয়ে যায় তার মন থেকে। সে অপেক্ষা করে থাকে, গয়ানাথের। গয়ানাথ তাকে বসিয়ে রেখে গেছে, আবার ফিরে আসছে, দশ বছর আগে

তাকে দেখে গয়ানাথ পালাতে-পালাতে এখন তাকে হাকিম বলে মেনে নিয়েছে। এখন গয়ানাথ আসছে—তার হাত দিয়ে এই নদী আর নদীর জল আর নদীর ভেতরের মাটি আর এই জঙ্গল সব গয়ানাথের বলে মানিয়ে নিতে। মেনে না নিলে আপিল হবে। আপিলের আপিল হবে। আপিলের আপিলের আপিল হবে। সেখানে সুহাস ত একটা ধাপ মাত্র। আত্মকরুণা থেকে নিজেকে বাঁচাতে সুহাস আবারও নদীর দিকে তাকায়। তাও ভাগ্যি তিস্তা গয়ানাথের এতটা জমি পেয়েছে—তাই সুহাস অন্তত জোতদারের হাকিম হয়ে বসতে পেরেছে। সুহাস আবার একটা কুটো ছোঁড়ে নদীর জলে। 'জোতদারবিরোধী মিত্রশক্তি', না, 'শ্রেণীসংগ্রামের মিত্রশক্তি', আবার 'বামফ্রন্ট সরকার কৃষকের মিত্র সরকার', আবার, সুহাস কৃষকের মিত্র হাকিম। চার পাশেই মিত্র। কিন্তু যার মিত্র, তাকেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ছাব্বিশ

ভিড় ও গয়ানাথ

অনেক মানুষের পায়ের চাপে পচা ভেজা পাতা দলে পিষে যাচ্ছিল। তার একটা হিস হিস শব্দ পাওয়া যায়। সুহাস তাকিয়ে দেখে বহু লোক আসছে। বিনোদবাবু বলেন, 'কী ব্যাপার, ওখানকার সবাইকেই নিয়ে এল নাকি?'

'তাই ত মনে হচ্ছে', বলে সুহাস ভাবে, আগে থাকতেই তৈরি ছিল নাকি। তা হলে সকাল থেকে সার্ভের ওখানে যে এত লোক জমা ছিল, সে সবই গয়ানাথের লোক? যেন গয়ানাথের কোনো বিপরীত পক্ষ আছে, এমন করে সুহাস ভাবে, কেউ নদীর লোক নয়?

সুহাস ভাঙা গাছের ওপর বসেই ছিল। সমস্ত দলটা এসে সামনে দাঁড়িয়ে যায়। সুহাস বসে-বসেই তাকিয়ে থাকে। গয়ানাথকে দেখতে পায় না। তাতে যেন একটা যুদ্ধ-যুদ্ধ ভাব আসে। এখানে এই বনের মধ্যে ত ছড়িয়ে যাওয়ার জায়গা নেই। ছড়িয়ে যাওয়ার জন্যে সবাই এখানে আসেও নি। বসার জায়গা নেই—বর্ষার জঙ্গলে। সমস্ত দলটাই ভিড় করে সামনে, দাঁড়িয়ে। তাতে, বাধ্য হয়েই ভিড়টাকে কয়েকটা লাইনে দাঁড়াতে হয়েছে। আর ভিড়টার মুখোমুখি একা-একা সুহাস, নদীকে পেছনে নিয়ে, বসে। বিনোদবাবু দাঁড়িয়ে, সুহাসের থেকে একটু দূরে, কিন্তু ভিড়ের সামনে। এখানে, এ-রকম করে দাঁড়াতে হয়েছে বলেই সবগুলো মুখই মিশে গেছে। সাজানো-গোছানো ঠেকে, প্রায় ক্যালেণ্ডারের জাতীয় সংহতির ছবির মত সাজানো-গোছানো—তামাটে মোঙ্গলীয় মুখের পাশেই খাটো নেপালি মুখের তীক্ষ্ণতা, পেছনে লম্বা সাঁওতালি মুখ। সুহাস এখানে নতুন বলেই, ও এ-অঞ্চলের সঙ্গে তথ্যে আর ম্যাপে আর রিপোর্টেই তার পরিচয় বলে, এই মুখগুলোর পার্থক্য তার কাছে এত সহজে ধরা পড়ে। নইলে পোশাকে-আশাকে এ-ভিড়ের ভেতর বৈচিত্র্য এত কম যে লোকগুলিকে একটা ভিড় বলেই মনে হয়, আলাদা-আলাদা আদিবাসী-উপজাতির বলে মনে হয় না।

কিন্তু এতগুলো মানুষ এতটা ঘনিষ্ঠ হয়ে এই জঙ্গলের মধ্যে সুহাসের সামনে দাঁড়িয়ে, যেন, গয়ানাথ তাকে লোক জুটিয়ে ভয় দেখাচ্ছে। সুহাস উঠে দাঁড়ায়, তারপর একটু কড়া গলায় জিজ্ঞাসা করে, 'গয়ানাথবাবু কোথায়?' হঠাৎ যেন সুহাস সতর্ক হওয়ার দরকার বোধ করে—এই জঙ্গলের ভেতর তাকে আর বিনোদবাবুকে এতটা আলাদা করে এনে কি গয়ানাথ কোনো ফাঁদে ফেলছে। বিনোদবাবুর দিকে তাকায় না সুহাস, কিন্তু বুঝতে পারে, তাঁর ভঙ্গিতেও অনিশ্চয়তা আছে। সুহাস ভুলতে পারে না তার ঠিক পেছনেই তিস্তা, বর্ষার। আর সামনে এত মানুষ, আদিবাসী।

কিন্তু এত অনিশ্চয়তা-অস্থিরতা নিয়েও সুহাস সামনের এই মুখগুলোর দিকে তাকায়, এই যে-রকম মুখের সমাবেশের স্বপ্ন বছর দশ-বার আগে তারা দেখত নানা ঘটনার, ইতিহাসের, এখন মনে হয় রূপকথার, অনুষঙ্গে। ব্যক্তিত্ব নয়, সমষ্টিই যে-মুখের আয়তনে আর রেখায়, নাক-মুখ-চোখ-কানের মত

ব্যক্তিগত সব শাবীরিকেও, খোদাই-কবা, তেমনি এত মুখেব সাবি সুহাসকে কোনো এক লুপ্ত সমাবেশের সামনে হাজির করে। কে জানত, এমন প্রতিপক্ষতায় তাব এই আবিষ্কার ঘটে যাবে?

'এই সরি যা, সবি যা'—বনমোবগেব গলায় গয়ানাথবাবুব এই চিৎকাবটা দঙ্গলের ভেতর থেকে আগে শোনা যায়। তারপর সামনের সারির লোকজন একটু ফাঁক হযে যায় আর সেই ফাঁক গলে পেছন থেকে গযানাথ এদিকে আসতে গিযেও আটকা পড়ে যায। তাকে দেখতে না পেয়ে সামনের একজন বাঁয়ে সরে ফাঁকটা বন্ধ করে দেয। গয়ানাথকে কাত হয়ে, আগে মাথাটা বের করে, তাবপর পিছলে, বেরিয়ে আসতে হয়। তাব কাপড়েব একটা দিক ভিড়েব ভেতব কোথাও আটকে যায় বলে তাব উরু পর্যন্ত খুলে যায়। পাছে কাপড়টাও খুলে যায তাই গযানাথ কাপডটা ধবে থাকে। ভিড়ের ভেতর থেকে কেউ খুঁজে পায না কাপড়টা কোথায় আটকেছে। আব ঐ অবস্থায় গয়ানাথ বনমোরগেব গলায় চিৎকাব করে ওঠে, 'শালো চুতিয়াব ছোযাগিলান, শালো জঙ্গলত আসি জঙ্গলিয়া হবা ধইচছিস, পাছত না দেখিস কায় আছে আর কায না-আছে? এইঠে কি সার্কাস আসিবাব ধইচছে, না, নাটঙ্গি হবা ধইচছে?'

ততক্ষণে ধুতি গয়ানাথেব কাছেই ফিবে এসেছে। গযানাথ সুহাসের সামনে দাঁড়িয়ে দঙ্গলটাকে আবার গালাগাল কবে। তার খর্বতাব জন্যেই ভিডটাব মুখোমুখি তাকাতে তাব ঘাড়টা অনেক হেলাতে হত। অতটা হেলিয়ে এতটা বাগা যায না। বা, ঘাড হেলিয়ে গলার এই স্বরটা বেব কবা তাব পক্ষে সম্ভব নয়। তাই ভিড়টাব সামনে দাঁড়িয়ে, ঘাড নুইযে, মাটিব দিকে তাকিযে, গলার সবচেয়ে বেশি যে-জোব দেওয়া সম্ভব সেই জোব জোগাড করে, গযানাথ গালাগালি চালাতে থাকে—'কায আসিবার কইছে সগাক? সগায় আসি গেইছে শালো ভূতেব দল। শালো পিপিড়াব নাখান নাইল বানাও, নাইল করি চলো, শালো গরুর দল।'

গয়ানাথের প্রথম চিৎকাবে সবাই একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। কিন্তু কাপডটা আটকে যাওযায় সবাবই একটা কাজ জুটে গেল। আব, কোথায আটকেছে সেটা খুঁজে না পেযে কাজটা বেড়ে গেল। এব ভেতব কাপডটা পুরোই খুলে যেতে পাবে গযানাথের এই ভয় দেখে সবাই মজাও পেয়ে যায়। এখন, গয়ানাথেব মাথানোযানো চিৎকাবেব ওপবে ভিড়েব লোকজন এ ওব পাযে ধাক্কা দিযে হাসে। কিন্তু হেসে ফেলে এ ওর আড়ালে মুখ লুকোতে চেষ্টা কবে। ভিড়েব ভেতবে কেউই যে গযানাথকে দেখতে পায় নি, আব গয়ানাথই যে ভিড়ের আড়াল থেকে সামনে বেবতে পারছিল না—এব চাইতে বড মজা ভিড়ের পক্ষে আর-কী হতে পাবে?

গয়ানাথ ওয়াক থু করে সশব্দে থুতু ফেলে। কোঁচা দিয়ে মুখটা ও ঠোঁটটা মুছে নিয়ে খুব দ্রুত কোঁচার তলাটা আবার উল্টো করে তুলে শার্টেব নীচে গুঁজে দেয। তাবপব, আবাব মুখটা নামিয়ে কোঁচাটা একটু তুলে মোছে। এ সবটাই সে করে সুহাসের দিকে পেছন ফিবে, ভিডটাব সামনে দাঁড়িয়ে, যেন ভিড়টা তার অন্দব। শেষে ভিডটাব দিকে পেছন ফিরে সুহাসেব মুখোমুখি দাঁড়াবার আগে সে সামনের সারির লোকগুলোর চোখে চোখ বেখে নিজেব মূল কণ্ঠস্বরে হিসিযে ওঠে, 'মহিষের বাথান।'

সুহাস বসে পড়েছিল। বসেই থাকে। সে গয়ানাথকে জিজ্ঞাসা করে না। তাব জিজ্ঞাসা কবাব কিছু নেইও। তা ছাড়া, সুহাস বোঝে, গয়ানাথ একটু আগে একা-একা, ধীরে-ধীরে কথা বলে, সুহাসদের সামনে নিজেকে বেশ ভাল ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, ফলে কিছুটা জোরও পেয়েছিল। এখন, যে-ভিড়টা তাব সাক্ষ্য-প্রমাণ তাতেই সে চাপা পড়ায তার এত চেষ্টা নষ্ট হল। এখন, সুহাসও তাকে আর জোর ফিরে পাওয়ার সময় দেবে না। তাকে তার প্রমাণ সোজাসুজি হাজির করতে হবে। যে-প্রমাণই হোক, সুহাস কী বলবে ঠিক করেছে—আপনার কথা শুনলাম, আমাদেব যা সিদ্ধান্ত তা ড্র্যাফটে, খশড়ায় থাকবে। তখনো দেখে যদি আপনার আপত্তি থাকে দরখাস্ত করবেন।

গয়ানাথ বলে, 'স্যার।'

'হ্যাঁ, কই কী এনেছেন?' সুহাস হাত বাড়ায়।

'প্রমাণ দেখাম, স্যার?' গয়ানাথ জিজ্ঞাসা করে।

'প্রমাণ দেখাবেন বলেছেন আপনি, দেখাবেন কিনা সেটা ত আপনার ব্যাপার', সুহাস আইনি ভাষায় কথা বলে।

'স্যার, মুই ডাকিছু দুই জনাক, ইমরা সগায় আসি গেইসে।'

'সে আসুক না। কী দেখাবেন দিন না।'

'আপনি কিছু মনে করিবেন না স্যাব।'
'কেন ?'
'এই জংলিগিলান এই জঙ্গলেব ভিতরত্ চলি আসিছে।'
'তাতে আমাব কাজের ত কোনো অসুবিধে হচ্ছে না—আপনি কী দেখাবেন, দেখান না।'
'দেখাছি স্যাব, কিন্তুক মোব কুনো দোষ নিবেন না।'
'দোষগুণেব ব্যাপাবই নেই কিছু। এ ত আইনেব ব্যাপাব।'
'না, এই জংলিগিলান আসি গেইসে।'
'ঠিক আছে, দিন না কী দেখাবেন।'
'হে-এ-এ বাঘারু', আবাব বনমোরগেব গলায় চিৎকার কবে গয়ানাথ।
গযানাথেব ডাক শুনে ভিডটাকে ঠেলেঠুলে একজন সামনে এসে দাঁডায। ভিডটাকে পেছনে ফেলে সে বেশি দূব এগিয়ে আসে না বলে বোঝা যায না, গযানাথেব ডাক শুনে সেই সামনে এল কি না। গয়ানাথ বলে, 'যা কেনে, ঝট কবি যা, মৌজাব লাইনখান ধবি যাবি, বুঝিলু ?' নীরবেই সেই লোকটি উত্তব দিকে চলে যায, নদীব পাড ঘেঁষে, নদীভাঙাব লাইন পরীক্ষা করতে একটু আগে যেদিকে সুহাস গিযেছিল। সেই লোকটি এ-বকম চলে যাওযার কিছুক্ষণ পব সুহাসেব মনে হয়—আগে কি এই লোকটিই চেযার মুছছিল আব গাছে উঠেছিল ? কিন্তু সেই লোকটিই কি ? ভিডের দিকে তাকিয়ে সুহাস বুঝতে পাবে না। এতবার গযানাথবাবুব মুখে এই নামটা উচ্চারিত হতে শুনেও সে যেমন লোকটির নাম বুঝতে পাবছে না, তেমনি এই এত লোক সামনা-সামনি দল পাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও সে চিনতে পাবছে না—একটি মুখও। বা, একটি মুখ থেকে অপব মুখকে আলাদা করতে পাববে না।
লোকটি চলে যাওযাব পব ভিডা একটু আলগা হয। অনেকে ওব সঙ্গে-সঙ্গেই উত্তর দিকে চলে যায় ঝোপেব আডালে-আডালে। আবাব অনেকে ঐ জাযগাতেই বসে পডে, হাঁটু জডিয়ে হেলে, আব কেউ-কেউ দাঁডিয়ে-দাঁডিয়ে বিনোদবাবু, সুহাস আব গযানাথকে লক্ষ্য কবে।
'স্যাব, আপনি ত এই জিলাব ম্যাপট্যাপ সব দেখি নিছেন ?'
'জেলাব ? হ্যাঁ। কেন ?'
'না, এমনিই, ধবেন, হামবালা ত তিস্তাব খুব পাখে খাডি আছি, আমাদেব পাছত, মানে ধবেন কি না আবো উত্তরে আব পুবে চালসা, হাযহাযপাথাব।'
'হ্যাঁ, সে ত জানিই।'
'সে ত জানিবেনই স্যাব। আপনাবা না জানিলে কায জানিবে ? আব এই যে তিস্তাখান, এব সরাসবি ঐ পাবে, পচ্ছিমে, বৈকুণ্ঠপুব ফরেস্ট। এই তামানটাই ত ফবেস্ট আছিল সেই চালসাঠে হেই বোদাগঞ্জ।'
'তখন নদী ছিল না ?'
'সেইটাই ত বলি স্যাব, নদী থাকে, ফবেস্টও থাকে, মৌজাও থাকে, কিছুই যায না—'

সাতাশ

জমি জরিপ · গয়ানাথী পদ্ধতি

গয়ানাথ নদীর দিকে আঙুল দেখায়। আব সুহাস দেখে, দূরে নদীতে দুজন মানুষ ঘাসকুটোব মত ভেসে যাচ্ছে। সুহাস একটু অপ্রস্তুত চিৎকারই করে ওঠে, 'আরে আরে।'
'ছাডি দেন স্যার, অ ত বাঘারু।'
'মানে ?' জিজ্ঞেস করেই সুহাস যেন বুঝে ফেলে, 'কী ব্যাপার, এরা কি নদীতে নামল নাকি ?'
'হ্যাঁ স্যার। যেইঠে এ্যালায় ভাসি যাছে ঐঠে ত মোর এই মৌজাখান শুরু।'
'তাই বলে আপনি এই বর্ষার তিস্তায় ওদের নদীতে নামালেন ?'

'ও ত বাঘারু স্যাব, এ্যালায় উঠি আসিবে। আব মুই ত এক বাঘারুক নামিবাব কইচছি। আর-একটা কায় নামিছে বে?' গযানাথ গলা তুলে জিজ্ঞেস করে।

'মইনুদ্দিন। ডোয়া-ডার্বাবব।'

'অ? মইনুদ্দিন। অয ত চ্যাম্পিযন সাঁতাৰু স্যাব। এ্যালায মোব কাথাটা শুনেন স্যাব। ঐ যেইঠে বাঘারু আর মইনুদ্দিন এ্যালায পাক খাছে—ঐঠে বৈকুণ্ঠপুবেব বোদাগঞ্জ আব এই আপলচাঁদ এক হয়্যা আছিল্। মোব বুড়া ব্যাপাব, মানে মোর ঠাকুববাবার, মানে ঠাকুরদাদাবমৌজাখান ঐঠে আছিল্। কিন্তুক মুই এ্যালায কি কছি যে ঐ যে মৌজাখান ঐঠে মোব নামে লিখি দেন? মোবঠে ওর দলিল আছে, ঠিকঅ। কিন্তু ঐঠে ত নদী। তিস্তা নদী। ঐ নদীখান ত আমি মানি নিছি। কিন্তুক তাই বলি কি এইঠেও নদী মানিবাব নাগিবে?' বলে সে পাড়েব তলায জল দেখায—'এইঠে নদী না হয, বর্ষাব জল। বাঘারু এইঠে আসি গেলে দেখিবেন এইঠে জল নাই, সোতা নাই। যাব জল নাই, সোতাও নাই—সেইটা কি নদী হবা পাবে? এইটা নদী না হয। এইটে আপনাব দাগ নম্বর দিবা নাগিবে।'

এতক্ষণে সেই পুবো ভিড়টাই নদীব পাড়ে ঘেষাঘেষি কবে ওদের সাঁতাব দেখছে। সুহাসেব কেমন অপ্রস্তুত লাগে।

গয়ানাথ তাকে সাঁতাবে ফাঁসাবে সে ভাবতেও পারে নি। বিনোদবাবুও কি পাবেন নি? নাকি তাঁব সঙ্গে গযানাথেব বোঝাপড়া হযে গেছে কোনো? এই দুজনকে তাব সামনে নদীতে নামানোব পেছনে গয়ানাথেব কোনো মতলবও থাকতে পাবে। যদি ঐ দুইজনেব কিছু হয? গয়ানাথেব মতলবটা কী? সবকাবি অফিসাব হিশাবে তাকে কি কোনো কিছুব সাক্ষী বাখতে চাইছে? কিন্তু এখন কি সুহাস এখান থেকে সবে যাবে? সেটা যাওযা যায? ঐ লোকদুটো ওঠাব আগে?

সুহাসেব বাঁ পাশে গযানাথ। সুহাস তাকে বলে, 'আপনি এভাবে সময নষ্ট কবছেন কেন? আমাদেব আজ সার্ভেব প্রথম দিন। আমাদেব ড্রাফট বেবলে আপনি যা প্রমাণ-সাক্ষ্য দেযাব তা দিতে পাবতেন। ওদেব উঠতে বলুন।'

'ও ত এলায উঠি আসিবে। কিন্তু তাব টাইম ত দিবা নাগিবে। ওবা কী আব স্রোত কাটাইযা আসিবাব পাবিবে? স্রোত ধবি-ধবি আসিবাব নাগিবে।'

এই তিস্তাটাকে আজ সকাল থেকে কতবাবই না দেখতে হচ্ছে সুহাসকে। মাঝে-মধ্যে ত সে এমনিও তাকিযে-তাকিযে দেখল। কিন্তু তিস্তাব পেটে গযানাথেব জমিতে গযানাথ তাব দখলেব প্রমাণেব কথা তুলেছে যখন থেকে, যেন এই নদী আসলে নদী নয—গযানাথের জোত, তখন থেকেই তিস্তা যেন আব দৃশ্য থাকছিল না, হয়ে উঠছিল তাব এই সার্ভেবই ঘটনাস্থল। আর, এখন তিস্তা নদীর এই দিগন্ত-ছাপানো বিস্তাবে, ঐ দুটো প্রায অদৃশ্য মানুষ জলেব ফেনাব মত ভেসে যেতে-যেতে তিস্তাকে যেন ঢুকিয়ে দিচ্ছিল সার্ভে ম্যাপেব লাইনেব মধ্যে। সুহাস আবাব বলে, 'ওদেব পাড়ে উঠতে বলুন।'

'উঠিবাব বলিলেই কি আব উঠিবাব পাবিবে স্যার? এ ত স্রোতে ভাসি-ভাসি ঘুরি-ঘুবি উঠিবাব নাগিবে। উজানে গিয়া নদীতে নামিযা শবীবখান ছাড়ি দিছে। এলায ভাটিত গিযা, ধরেন কেনে মাইলটাক ভাটিত গিযা, বাঁযত মোড় নিবাব পাবিবে, ঐঠে একটা চবা আছে। সেইঠে সাঁতাব কাটি এইঠে আসিবে।'

সুহাস দেখে তিস্তাব ভেতরে লোক দুটিকে আব দেখা যাচ্ছে না। সে তাদেব মাথায় চুলটকুও দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু তার পেছনেব ও পাশেব সেই ভিড়েব কেউ আঙুল তুলে দেখাচ্ছে—'ঐঠে ঐঠে', 'ভাসি গেলাক', 'আগত বাঘারু', 'হে-ই ডুবি গৈলাক হে।' ঐ আঙুল ধবে-ধবে তাকিয়ে সুহাস দু-একবার দুটো কাল বিন্দু দেখতে পায বটে কিন্তু দেখামাত্র ঐ কাল বিন্দু দুটি এত দূরে ভেসে যায়, সে আর চোখ ঠিক রাখতে পারে না। কিন্তু যখন দু-এক মুহূর্তের জন্যে দেখে, তখন তাব মনে হয না ওরা কখনো ফিরতে পাববে, বা ফেবা সম্ভব—তিস্তাব এই ধূসব বিস্তাবে ঐ দুটি কাল বিন্দু এতই অবাস্তব।

'হে-ই আব দেখা না যায', 'চবটা পাই গেইসে।'

কে-একজন মদেশিয়া ভাষায জিজ্ঞাসা কবল, 'দুই মানুষ চর পাই গেলাক?'

'হয়। দুজনাই পাই গিছে।'

'এ্যালায় ফিরিবে।'

'কনেক বিশ্রাম করিবার নাগিবে ত হে।'

'শরীল ছাড়ি দিবে, বসি পড়িলে শরীল ছাড়ি দিবে।' .

'বিশ্রাম কেনে হে ? যাওয়ায় তানে ত স্রোতত ভাসি গেইছে।'

'স্রোতত্ ভাসিবার আর জোর লাগে না, নাকি হে ? ভাসি থাকিবার তানে—'

'হয়, হয, রওনা দিছে হে।'

'কোটত কোটত ?' ভুরুর ওপর হাতের ঢাকা দিয়ে অনেকেই দেখতে চেষ্টা কবে। কিছুক্ষণেব স্তব্ধতার পর কেউ বলে, 'না হে, কাঠ ভাসি যাছে, 'কাঠখান ভাসি গেলাক আর তয় কইথে ভাসি আইলাক ?' মদেশিয়া গলায় নিরুত্তেজ রসিকতা, 'নদীর পানি পিকে মাইত্ গেলে হে ?' নদীর ভেতরে ঐ দুইজনের ভেসে যাওয়াটায় নজর রাখতে দৃষ্টি আর মন যে-তীব্রতায় বাঁধা ছিল, তা এখন শিথিল হয়ে গেছে। ঐ দুইজন নদীর ভেতরের কোনো একটি চরে একটু গা-হাত-পা মেলে দিয়ে যেমন বিশ্রাম নিচ্ছে হয়ত, এই এতগুলো লোকও তেমনি, নদীব ভেতরে ঐ দুজনকে যতক্ষণ আবাব দেখতে না-পায় ততক্ষণ, কথায়-কথায় একটু এলিয়ে নিচ্ছে।

গয়ানাথই এক বিশ্রাম নিতে পারছে না। সে ভুরুর ওপর একবাব ডান হাতের ঢাকা, আর-একবাব বাঁ-হাতের ঢাকা দিয়ে কোনো একটি বিন্দুতে ঐ লোক দুজনকে খুঁজবার চেষ্টা করছে। গয়ানাথ যদি ভুরুটা একটা হাত দিয়েই ঢাকা দিত তা হলে হয়ত তাকে এতটা অস্থিব দেখাত না। কিন্তু একবাব ডান, আব-একবাব বাঁ হাত তোলা ও নামানোব ফলে মনে হচ্ছিল সে বুঝি তিস্তার পুরো বিস্তাবটার ওপবই চোখ বোলাচ্ছে। আব, ঐ অত তীব্র স্রোতেব অত বিস্তাবেব দিকে অতক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে মনে হয, এই পাডটাই ভেসে চলেছে, জাহাজের মত, আব গযানাথ ডেকে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দূর-দূর দ্বীপে কাকে বা কাদের খুঁজছে।

সবাই চুপ হয়ে গিয়েছিল, অচেতনেই হযত। আর ফরেস্টেব এত গভীরে, নদীর এত কিনারে চুপ হয়ে গেলে ত এই জায়গাটা তাব স্বাভাবিক স্তব্ধতাই ফিরে পায়। তাতে যুক্ত হয় শুধু এতগুলো মানুষের সমবেত শ্বাসপতন শ্বাসগ্রহণ। সেই অবকাশে তিস্তাব ওপর থেকে বাতাস লাফিয়ে উঠে গাছগাছড়ার মধ্য দিয়ে গভীবতব বনাঞ্চলে চলে যাওযাব পথে যেন মুচড়ে দিতে চায় শালগাছকেও।

'ফিবি আসিবাব ধবিছে', খুব চাপা গলায় কেউ বলে। সবাইকে কথাটা মেনে নিতে হয, কথটা এমন ভাবে বলা। তাবপব খোঁজাখুঁজি চলে নীববেই। সুহাসও তাব চোখ তীক্ষ্ণ করে দেখে। কিন্তু সে ত জানেই না কোনদিকে তাকাতে হবে। একমাত্র যখন এই ধূসব সমতলের ওপর কাল বিন্দুটা স্থির দেখা যাবে, তখন সুহাস বুঝতে পারবে—সাঁতার কেটে এগিয়ে আসছে।

'ঐ যে, ঐ যে, আসিছে, আসিছে—' সুহাস দেখে সবাই তার বাঁয়ে আঙুল দেখাচ্ছে। তাকিয়ে থেকেও সে কিছু দেখতে পায় না। কতটা দূরত্ব এই স্রোতেব বিপরীতে লোক দুটোকে সাঁতরাতে হবে ?

সুহাসেব পাশ থেকে গয়ানাথ বলে, 'হে-এ মউয়ামারিব সীমানায ঢুকিল, ..া।' সুহাস বলে ফেলে, 'অ্যাঁ ?'

তখন গযানাথ সুহাসকে জিজ্ঞাসা করে, 'দেখিছেন ত, উমরায় আসিছে ?'

'কোথায় ?'

এই যে বাঁ হাতঠে', গযানাথ তাব ডান হাতটা সুহাসের মুখের ডাইনে আড়াল দিয়ে বলে, 'এই বার এইঠে বাঁ দিকে ঘাড ঘুবান ধীবে-ধীরে, ঘুরান, ব্যস, দেখেন', গয়ানাথ সুহাসকে সময় দেয়, 'দেখিবার পাছেন ?'

সুহাস যেন খুব নিশ্চিত নয় এমন ভাবে বলে, 'হ্যাঁ—'

গয়ানাথ সুহাসকে আবো কিছু সময় দেয়। তারপর জিজ্ঞাসা করে, 'দেখিবার পাছেন ত স্যার ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। হ্যাঁ।' সুহাস তার নজর স্থির রাখে। এখন ত ওরা সাঁতরে এদিকে আসছে—তাই কালো বিন্দুটা চোখ থেকে সরে যাচ্ছে না, একবার দেখতে পেলে কিছুটা অপরিবর্তিতই থাকছে।

'ঐ যেইঠে সাঁতার কাটিবার ধরিছে ওর বাঁ হাতে, মোর বাঁ হাতে, এই সাইডে', বলে বাঁ-হাতটা তোলে, 'আঠার নম্বর দাগ মউয়ামারি মৌজা আর ডাইনে, এই সাইডে, পাঁচ নম্বর হাঁসখালি মৌজা। দুইখানই মোর দাগ। ষোল আনা নিজ খতিয়ান। ত মউয়ামারিটা বাদ দেন। ঐঠে তে মউয়ামারি শেষ হয়্যা গেইসে। কিন্তু হাঁসখালিটা ধরেন। হাঁসখালির ত ঐঠে শুরু, ঐঠে ঘুরিঘুরি চলি আসিছে।' দু-জনকে এখন বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। তাদের হাতের আর পায়ের কোনো আন্দোলন বোঝা যাচ্ছে না যদিও,

কিন্তু ধীবে-ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে তাদেব মাথা আর ঘাড়েব আন্দোলন। গয়ানাথ তার বনমোরগের গলাটাকে সবচেয়ে ওপবে তুলে, 'হে-এ-এ বাঘারু, বাঁ-হাতত সরি যা সরি যা', বলে ডান হাতটা নাড়ায় সবে যাওযাব ইঙ্গিত দিয়ে। গযানাথেব এত চিৎকাব তিস্তার বাতাসে হুমড়ি খায গাছেব মাথায়।

'দেউনিযা, ঐ পাড়ে বংধামালিব বাঁধে গিয়া চিল্লান, শুইনবাব পাবে, এই পার থিক্যা চিল্লালে ত আপনার হাতির পাল আবাব ডাইন-বাঁ শুরু করবি নে—', বেশ ভারী উঁচু গলায় পূর্ববঙ্গেব উচ্চারণে কথা কটি কানে আসে।

গয়ানাথ কানে নেয় না। ততক্ষণে সাঁতারু দুজনেব হাতে তিস্তাব জল-ছিটকনো চোখে পড়ে। গয়ানাথ আবাব চিৎকাব করে—'সরি যা, বাঁয়ে সবি যায়, সতের নম্বর দাগ ধর, ধব'—দুজনের মধ্যে যে এগিযে ছিল সে সত্যি বাঁয়ে ঘুবে যায একটু, প্রথমে বোঝা যায় না, কিন্তু তাব মাথা নিশ্চিত ভাবে বাঁয়ে ঘোবে—'ঐঠে একখান পুকুব আছে, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টেব সঙ্গে অংশ-বন্দোবস্ত, ঐঠে হাতিব পাল জল-খোযায তানে আসিলে হামবালা কিছু কবিম না। হে-এ-এ বাঘারু, ডাইনে ঘুর, ডাইনে ঘুব, সিধা আয়।'

গযানাথ সুহাসকে যেন সময দেয সাঁতবে-সাঁতবে লোকটাব ঘোরাটা দেখতে ও তার একটা আন্দাজি মাপ নিতে। তারপব বলে, 'এইঠে শুরু হইল স্যাব, সিদাডোবা, হাতিডোবা, বাঘাডোবা।'

'গয়াডোবা'—গলা শুনে সুহাস বুঝতে পাবে সেই পূর্ববঙ্গেব দলটা হবে। কিন্তু এই দলটা এল কখন, দেখে নি ত সুহাস, নাকি প্রথম থেকেই ওখানে ছিল—আড়ালে-আড়ালে।

'শালো, তো বাপাডোবা', সুহাসেব পাশ থেকেই গযানাথ পেছনে ঘাড ঘুরিয়ে চেঁচায। ফলে যে-সমবেত হাসি ওঠে তাতে বোঝা যায গযানাথেব এমন আচমকা রাগে সবাবই ফুর্তি।

আটাশ

গয়ানাথী প্রমাণ

এখন আব নদীব ভেতবে কাবো খুব মন ছিল না। লোক দুটি কাছাকাছি এসে গেছে। গযানাথ বলে, 'এইবাব দেখেন স্যাব, আপনাকে ত দুইখান মৌজা দেখাছি, এ্যালায় দেখেন, এই মৌজাব কতখানি আপনারা নদীক ছাড দিবাব ধবিছেন—হে-ই বাঘারু সিধা বাঁয়ে চলি যা।' বাঘারু সোজা বাঁয়ে চলতে থাকে। চলতেই থাকে। সুহাস গযানাথেব দিকে তাকিয়ে বলে, 'আপনি ওদেব উঠতে বলুন, আমি আপনাব পযেন্ট বুঝেছি,' কিন্তু বোঝে সে এই জাযগা ছেড়ে না গেলে গয়ানাথও তাকে ছাডবে না, 'আমরা ফিবে যাব,' আর ফিরে যাচ্ছেই এটা বোঝাতে নদীর দিকে পেছন ফিবে ডাকে, 'বিনোদবাবু।'

সুহাসকে পেছন ফিবতে দেখেই ভিডটা ফাঁক হয়ে গিয়েছিল। বিনোদবাবুব গলা শোনা গেল, 'হ্যাঁ স্যার।'

'চলুন, আমরা ফিরে যাচ্ছি।'

'হ্যাঁ স্যার।'

'কিন্তুক হুজুব, মোব ত প্রমাণখান দেখিলেন না, আসল প্রমাণ?'

'দেখালেন ত সব, আবার কী প্রমাণ?' সুহাস দুই পা সরে যায়, ভিড়টাও সরে যায়, গয়ানাথও সরে আসে। তিস্তার ভেতরে দুটো লোক ভাসতে থাকে। সেটা পাছে গয়ানাথ আর সবাই ভুলে যায সুহাস বলে, 'ওদের উঠতে বলুন।'

'কিন্তুক স্যার, আপনি ত নদীখান দেখিলেন, মোর দাগনম্বরখান দেখিলেন না।'

পেছন থেকে পূর্ববঙ্গের সেই দলটি বলে, 'কুঁচকি পর্যন্ত দেখাইয়া ছাড়ছেন ত—'

সুহাসের সামনে থেকে গয়ানাথ ঠাণ্ডা গলায় জবাব দেয়, 'তোর ধোকর-বাপের ঘরখান বাকি আছে রে।'

নিশ্চিত ভঙ্গি বা ঠাণ্ডা স্বর বা কথাটির জন্যই এবার গয়ানাথ জিতে যায়। সমবেত হাসিতে সেই

অনুমোদন থাকে। সুহাস একটু অপ্রস্তুত হয়েই বোঝে তার ঠোঁটেও হাসিই লেগে আছে। বলাটা ভাল হয়েছে।

'এক মিনিট স্যাব, এক মিনিট, হে বাঘারু এইঠে আসি খাড়া, এইঠে'—সামনে থেকে সবাইকে সবিয়ে দিয়ে গয়ানাথ সুহাসের জন্যে দৃশ্য খুলে দেয। সুহাস তাব জাযগা থেকে নড়ে না। ঘাড় ঘুবিয়ে তাকায়। জলেব ভেতর গয়ানাথের বাঘারু দাঁড়িয়ে। লোকটাব বুক পর্যন্ত জল। মাথার চুল লেপটে আছে! এই লোকটিই কি··, আব-একজন সাঁতাক বোধহয উঠে গেছে।

বাঘারু, এইবার হাঁটা ধর, সিধা হাঁটা ধব', জলের ভেতর বাঘারু মাতালের মত হাঁটে, সেটা জলের তলাব অসমতলতাব জন্যই হোক আব বাঘারুব ক্লান্তিব জন্যই হোক।

পেছন থেকে আওযাজ ওঠে, 'লেফট বাইট, লেফ্‌ট বাইট' যেন বাঘারুকে হাঁটাব নির্দেশ দিচ্ছে, 'লেফ্‌ট বাইট।'

বাঘারু এক জাযগায ডুব জলে পডে গিয়েই ভেসে ওঠে। গয়ানাথ তার পকেট থেকে একগাদা দলিল বের কবে বলে, 'এই যে স্যাব, মোব খতিযানখান, ষোল আনিব খতিযান।' ভাঁজ খুলে সুহাস দেখে, এই মৌজাব যে-এলাকা এখন নদীব ভেতরে তাব বিভিন্ন দাগ-নম্বরেব নানা খতিযান। সে দ্রুত উল্টে বলে, 'ঠিক আছে, আমি ত দেখলাম।'

'কী দেখিলেন স্যাব ?'

'আমাব যা দেখাব দেখলাম।'

'দেখিলেন ত স্যাব, এ্যানং বিশালিয়া নদী, আব এইঠে ক্যানং হাঁটুজল না বুকজল। এইঠে বৃষ্টিব জল আসি বসিবাব ধইচছে—এইটা নদী না।'

'ঠিক আছে। আপনি আপনাব খতিযানগুলো বিনোদবাবুকে দেখাবেন। আমি ত দেখে নিয়েছি। ঐ লোকটাকে মিছিমিছি অত দূব ঘোবালেন কেন, এখান থেকে বাঁশ ফেললেই ত আপনাব কথা বোঝা যেত, নদী নয, জল।'

'কিন্তুক স্যাব, আপনাকে ত ম্যাপেব তানে সব বুঝিবাব নাগিবে, তাই মৌজাব আসল মাথাঠে শুরু কবিলাম। কোটত মাথা আব কোটত ল্যাজ।'

সুহাস হাঁটতে শুরু কবে। তাকে ঘিরে ধরা ভিডটাও তাব সঙ্গে-সঙ্গে ঘোবে। দু-পা হাঁটতেই সুহাস বোঝে সে একটা ভিডেব মাঝখানে, ভিডটা নডলে তবে সে নডতে পাববে। ভিডটা যাতে নডে সে কাবণে সে এগিযে যাবাব ভঙ্গি কবে। এমন সময তাব বাঁ পাশ থেকে গলা পবিষ্কাব কবে একজন বলে ওঠে, 'স্যাব, আপনাব নিকট আমাদের কিছু বক্তব্য আছে।'

সুহাস সেদিকে মুখ তোলে। 'এই জায়গা দাও, জাযগা দাও—' বলে পেছন থেকে কেউ ভিড সবায। সেই ফাঁকেব মধ্যে একজন এসে দাঁড়ায বোগা, কোবা কাপডের পাঞ্জাবি, বাডিতে জলকাচা ধুতি, বগলে ছাতা, চুল আঁচডানো নেই, মুখে বসন্তেব দাগ, গলায কণ্ঠির মালা, লোকটি তাব জন্যে নির্ধাবিত জায়গায় এসে চোখ বন্ধ ও ঘাড কাত কবে চুপচাপ দাঁডিযে থাকে, ঠোঁটে হাসিব একটা ভাবও আসে। কাত ঘাডটাই একটু নাডিয়ে চোখ বুজেই লোকটি বলে, 'কথাটা হচ্ছে—আমাদেব বক্তব্য এই যে মাল থানাব ক্রান্তি অঞ্চলে বিভিন্ন কুখ্যাত জোতদাব, যথা এই গয়ানাথ বর্মন—'

'খবরদাব বাধাবল্লভ', গয়ানাথ আবার মাটির দিকে তাকিয়ে চিৎকাব করে ওঠে, 'মোক জোতদার কহিবাব চাও, কহ, কিন্তুক মোক কুখ্যাত্ কহিবা না।'

রাধাবল্লভ চোখ না-খুলে তার দিকে ঘাড়টা শুধু ঘুরিয়ে আর-একটু হাসি দিয়ে বলে, 'কী কহিব না ?' তারপব পাশাপাশি লোকদেব দিকে ঘাড় ঘুবিয়ে জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে তার হাসিতে কোঁচকানো মুখে বোজা চোখের ভুরু নাচায়।

'হ্যাঁ বলুন,' সুহাস বলে, 'চলুন না ওখানে গিয়ে একে-একে শোনা যাবে। এভাবে শুধু শুনে গেলে কোনো লাভ ত নেই, দাগ নম্বর ধবে-ধরে কাজ শুরু করা যাক, আপনাদের বক্তব্য বলবেন,' সুহাস এবার বাইরে যাওয়ার জন্য হাঁটতে শুরু করে। ভিড়টাও তার সঙ্গে-সঙ্গে চলতে থাকে। পেছন থেকে রাধাবল্লভের গলা শোনা যায়, 'আমাদিগের তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু এই সমস্ত কুখ্যাত জোতদার যথা গয়ানাথ বর্মন, নগেন মজুমদার, তারানাথ বসু ও নাউছার আলি ইহাদের কথা অনুযায়ী যদি সেটেলমেন্ট হয়, তবে আমরা আমাদের জমি মাপিতে দিব না।'

এতজন লোক তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারছিল না। রাধাবল্লভ প্রায় সুহাসের ঘাড়ের পেছন থেকে বলে যাচ্ছে। সে যে-কথাটা শুরু করেছিল, সেটা শেষ করে থেমে যায়।

'সগায় কুখ্যাত আর এক রাধাবল্লভ সাহা 'সাচা—স্যার, এই ডাকাতিয়া মানষিটাব কাথা না-শুনিবেন।' গয়ানাথ বলে।

সুহাস একটু সন্দিগ্ধ হয়। আসলে কি এদের জবরদখল জমি, তাই মাপতে দিতে চায় না বলে একটা ওজর দিয়ে রাখছে? কিন্তু কথাটা তুলতে চায় না বলেই কিছু জিজ্ঞাসা করল না। এবার অবশ্য সরকার জোর দং, অনুমতি দং, বর্গা দং সবই রেকর্ড করাচ্ছে। শুধু খাশজমির জোর দং রেকর্ড না-করার অর্ডার দিয়েছে। সুহাসের ধারণা, এ-অর্ডারও বদলাবে। প্রাইভেট ল্যান্ডেব জোবদখল যদি বেকর্ড হয়, খাশ ল্যান্ডে কেন হবে না। তাই সে ঠিক করেছে শাদা কাগজে খাশজমির জবরদখলদারদের লিস্ট রাখবে।

সুহাসকে ঘিরে চলা ভিড়টার ভেতর থেকে 'কমরেড', 'কমরেড' শব্দটা দু-একবাব শোনা যায়। কিন্তু সুহাস বুঝতে পারে না, কে কাকে বলছে। রাধাবল্লভ কোনো পার্টির লোক নিশ্চয়ই। কিন্তু কোন্। এক হতে পারে কংগ্রেস-আই। আর এক হতে পারে কমিনিস্টরা কেউ। সরকারি পার্টি ছাড়া এত জোর পাবে কোত্থেকে যে বলবে—সেটলমেন্টের শেকল ফেলে দেবে? কিন্তু 'কমরেড' বললে ত আর কংগ্রেস-আই হবে না, যদি অবশ্য রাধাবল্লভকেই ডেকে থাকে। তাহলে কি এখানে অনেক পার্টি আছে? নাকি কংগ্রেস-আই আজকাল 'কমরেড' বলাও ধরেছে?

এই সমস্ত দলটার পথ আটকে, সুহাসের একেবারে সামনে এসে দাঁড়ায় লোকটি—পায়েব নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত ভেজা, সারা গায়ে জল, পরনের কানিটা উরুর সঙ্গে লেপটে গেছে। লোকটা একটা ভেজা শালগাছের মত দাঁড়িয়ে থাকে—বানের জল নেমে যাওয়ার পর ডাঙা জমির একটা বিচ্ছিন্ন শালগাছের মত এই ভিড়ের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। তার পাশ কাটিযে ভিডটাকে এগতে হয়।

উনত্রিশ

জনসমাবেশ

আদিবাসী-উপজাতি ভিড়টাকে নিয়ে সার্ভে পার্টি যখন বন থেকে বেবিযে আসে তখন এখানে, সার্ভে টেবিল আর গয়ানাথের চেয়ার যেখানে পাতা, একটা বেশ সাজানো-গোছানো জনসমাবেশই হয়ে আছে। সমাবেশটা লম্বালম্বিই ছড়িয়েছে। এই জায়গাটা ডাঙাব ওপবে, পুবে ঢাল বেযে নিচু জমি, একটু দূর থেকেই কাদায় ভরা। এখান থেকে ডাঙাটা বনের পাশ দিয়ে বেঁকে-বেঁকেই সোজা উত্তব-পুবে গেছে। দেখলে মনে হয় এটা যেন ফরেস্টেরই বর্ডার, যেন এই হাত দশ-পনেব জমি ছাড দিয়ে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট ফরেস্ট বানিয়েছে।

এই রাস্তাব মত জমিটার ওপর মোটা মুথাঘাস অসমভাবে বেড়ে উঠেছে। ফলে কোথাও ঘাসেব আস্তরণ খুব পাতলা, তলার মাটিই প্রায় বেরিয়ে পড়েছে। আর কোথাও আস্তবণ এত মোটা, যে বসলে ঘাসে লেগে থাকা জলে পেছনের কাপড় চুপসে যায়। এই রাস্তার মত ডাঙার ওপরটা পরিষ্কার, যেন যত্ন করে নিয়মিত পরিষ্কার রাখা হয়। দু-পাশে—ডাইনের নিচু জমিটাতে বা বাঁয়েব ছোট নালীব ওপাবে বনের গাছগাছড়ার মধ্যে লম্বা ঘাসের জঙ্গল ঘন ও বড় হয়ে উঠেছে। এ-সব ঘাসবনে বাঘ থাকে। ঝোপঝাড়-জঙ্গলও দুপাশে মাটি কামড়ে, গাছ কামড়ে ছড়িয়েছে, বেড়েছে। অথচ বাস্তাটাব ওপর কোনো ঝোপঝাড় বা ঘাসবন নেই। হাতির পাল এখান দিয়ে জল খেতে আসে। ফরেস্টের নানা জায়গা থেকে সল্ট লিক এসে এই রাস্তায় মিশেছে। এখন বর্ষাকাল। ফরেস্টের ভেতরেই জল পাওয়া যায়। কিন্তু হাতির পাল অভ্যাসে কখনো-কখনো আসা যাওয়া করে। আর সেই আসা যাওয়ায় এই রাস্তার মত ডাঙা পরিষ্কার হয়, হাতির পাল লম্বা নালীঘাস খেয়ে আর ঝোপঝাড় মাড়িয়ে সাফসুরত করে দিয়েছে। কিন্তু হাতির শুঁড়ের নাগালের বাইরে একদিকে ফরেস্টের আর-একদিকে নিচু জমির ঢালে সেই লম্বা

নালীঘাস বেড়ে উঠেছে। হাতির পাল ঐটুকু নালী পেরতেও পারে না, আবার ঢাল বেয়ে নীচে নামতেও পারে না।

এখন এই হাতি-লাইন জুড়ে সেই মানুষজন লম্বা হয়ে ছড়িয়েছে! একটু দূরে আপলচাঁদের ভেতর দিয়ে যে-রাস্তা ওদলাবাড়ি গিয়ে ন্যাশন্যাল হাইওয়ের সঙ্গে মিশেছে সেই পাকা রাস্তার ওপরই একটা জিপগাড়ি দাঁড়িয়ে—আনন্দপুর চা বাগানের। আর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের অ্যামবাসাডার আর-একটু এগিয়ে। দুই গাড়ির বাবুরা ও সাহেবরা কেউ গাড়ির ভেতরে বসে; কেউ গাড়িতে হেলান দিয়ে, কেউ-বা গাড়ির ওপর পা তুলে দিয়ে বাইরে, দাঁড়িয়ে। দুই গাড়ির মাঝখানের জায়গাটাতে ঢালের ওপর পা ছড়িয়ে ড্রাইভাররা ও একজন গার্ড গল্প করছে। গার্ডের পিঠে বন্দুক ঝোলানো। দুটো গাড়ির দাঁড়াবার জায়গা থেকে ফরেস্টের দিকে একটা এ-রকমই পরিষ্কার সল্ট লিক ভেতরে ঢুকে গেছে—সেই ফাঁকাটাতে দুটো-একটা ভাঙা গাছ ছাড়া গাছগাছড়া নেই, সামান্য একটু ঝোপঝাড় কোথাও-কোথাও। অনেক দূর পর্যন্ত এই এত ঘন সবুজ শূন্যতা দেখতে কেমন লাগে। ঠিক সল্ট লিকটার মুখে একদল মদেশিয়া বসে, গোল হয়ে। তাদের কারো পরনে গামছার মত রঙিন কাপড়ের ফালি, কারো পরনে হাফপ্যান্ট। কারো উদোম গা, কারো স্যান্ডো গেঞ্জি—ধবধবে, দু-একজনের গোলগলা নাইলনের। অনেকের হাতে ছোটখাট লাঠি। দু-জনের কাঁধে ছোট কুড়ুল ঝোলানো—কুড়ুলটাই আংটার মত ঘাড়ে লাগানো।

এই মদেশিয়ার দল আসল ভিড়টা থেকে একটু দূরেই আছে—সামনে যেখানে ম্যাপ-চেয়ার-টেবিল, সেখান থেকে। তারপর খানিকটা ঝোপ পেরিয়েই সেই জায়গাটি যেখান দিয়ে সার্ভে পার্টি ঢুকেছিল। এই এত মানুষের পায়ের চাপে জলেভেজা ঘাসগুলোর ওপরও যেন পায়ে চলা পথ তৈরি হয়ে গেছে। নেপালিদের একটা দল গলিটার পাশেই দাঁড়িয়েছিল, এখন সেখান থেকে সরে উল্টোদিকে এল। সকালে শুরুতে লোক ছিল না। তখন যেন চায়ের দোকানটা বেশ দূরেই ছিল। কিন্তু এখন চায়ের দোকানটাব সামনে-পাশে দুদিকেই মানুষজন। জ্যোৎস্নাবাবুও ঠিক এর পাশেই তাঁর সেরেস্তা খুলে বসেছেন। ফলে সবচেয়ে বেশি ভিড় এই জায়গাতেই। চওড়া জায়গাটার ঠিক মাঝখানে চরের কৃষকদের একটা বিরাট দল বসে আছে। চা খাচ্ছে, বিস্কুট খাচ্ছে। দেখে মনে হয় তারা যেন এখানে সারাদিন থাকতেই এসেছে।

ত্রিশ

কৃষক সমিতির 'প্রোগ্রাম'

দলবল নিয়ে রাধাবল্লভ এসে এই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ায়।

তার বাঁ বগলে ছাতা, ডান হাতটা মাথার ওপরে কনুইয়ে ভাঁজ ফেলে, ডান হাতের আঙুলগুলো ঘাড়ের কাছে, চোখদুটো প্রায় সব সময়ই বোজা, বোধহয় কোনো অসুখ আছে, চোখের কোণে ময়লা জমে।

সকালে দলবল নিয়ে সার্ভের জায়গায় পৌঁছতে দেরি হয়ে যাওয়ায় রাধাবল্লভ যেন ঠিক ভূমিকা পাচ্ছে না। এমন-কি জুতমতো একটা দাঁড়ানোর জায়গাও পাচ্ছে না। ঠিক ছিল, সকালবেলা এখানে ঝাণ্ডা গেড়ে, ভোটের দিন বুথ অফিসের মত একটা অফিসই খোলা হবে, চাটাই-মাদুর পেতে। অন্তত একজন উকিল বা মোক্তারবাবু যাতে অবশ্যই আসেন, কাল কোট আর শাদা প্যান্ট পরে, সেই ব্যবস্থা করতে শহরের পার্টি অফিসে দুদিন আগে লোক গিয়েছিল। শহর থেকে বলেও ছিল, নিশ্চয়ই পাঠাবে। সকালে এখানে একটা ঝাণ্ডাটাণ্ডা নিয়ে অফিস করে বসলে, তাতে উকিল বা মোক্তার একজন থাকলে, লোকজন বুঝত তাদের জোরও আছে, আইনও আছে।

ঠিক ছিল, সার্ভে শুরু হওয়ার আগেই স্লোগানটোগান দিয়ে রাধাবল্লভ একটা বক্তৃতা করবে।

বক্তৃতায় এখানকার 'কুখ্যাত' জোতদাবদের নাম বলবে ও অফিসারদের সাবধান করে দেবে যে এদের সঙ্গে যেন কোনো আপস করা না হয়। তা হলে কৃষক সমিত এই জরিপের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে। অর্থাৎ এই সেটেলমেন্টকে কৃষকদের ও আধিয়ারদের পক্ষে প্রথম থেকেই নিয়ে আসতে হবে। আরো সব বক্তৃতায় সারা দিন ধরে এখানকার চা-বাগানের জোতদারি, ফরেস্টের জোতদারি, খাশজমির দখলদারি নিয়ে সব বলবে—কিন্তু ধীরে-ধীরে। প্রথমে শুধু সাবধান করে দেবে, তারপর আবার শ্লোগান হবে। হৃষীকেশ বলেছিল, শুধু শ্লোগান কেউ শোনে না, গানও হওয়া চাই। 'তা করো, তুমি গান বাঁধো আর গাও, ভালই ত, অফিসার বুঝিবে আমরা গানও জানি।'

কিন্তু তাদেব পৌঁছতে-পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে গেল। ভগতের এঁড়ে বাছুরটা কাল রাত্তিতে ফেরে নি—সন্ধ্যায় আনতে গেলে দড়ি ছিঁড়ে পালিয়েছে। সেটাকে খুঁজে বের না-করে আর সার্ভের এখানে আসে কী করে। গরু অবশ্য পাওয়া গেল পাশের বাড়িরই একজনের গোয়ালে। ভগতের বাছুর চিনে সে রাত্রিতে রাস্তা থেকে বেঁধে এনে রেখেছে। কিন্তু দেরি যখন হয়েইছে তখন জলপাইগুড়ির প্রথম বাসটাতে, উকিল-মোক্তার যেই শহর থেকে আসুক, তাকে নিয়েই ক্যাম্পে যাওয়া ভাল। সে-বাসে কেউই এল না। হৃষীকেশ ঠাট্টা করে বলল, 'ভগতের কোটটা মুই পডি যাছ, উকিলের নাথান লাগিবে।' ভগতের একটা কাল কোট আছে—সারাটা শীতকাল নেংটির ওপর সেই কোটটা পরে থাকে।

ওরা দলবল নিয়ে যখন ক্যাম্পে পৌঁছেছে তখন ক্যাম্প পার্টি বনের ভেতর সেঁধিয়ে গেছে। ওদের ঝাণ্ডা গাড়াও হল না, বক্তৃতাও হল না, শ্লোগানও হল না, গানও হল না। গয়ানাথ যখন বাঘারুকে ডাকতে এল তখন যেন ওবা এতক্ষণের অপেক্ষার পর হাতে শিকার পেল—বনের মধ্যে গয়ানাথের সঙ্গে অফিসার একা-একা কী করে। ওবাও সকলের সঙ্গে বনের মধ্যে ঢুকল। তারপব ওখানেই রাধাবল্লভ বক্তৃতাটা শুরু করেছিল, প্রোগ্রামেব বক্তৃতা অংশটা অন্তত হোক, কিন্তু তখন সবাই বেবচ্ছে। বক্তৃতাটা শেষ হল না। বন থেকে বেবনোব মুখটিতে আবার সেই বক্তৃতাই শুরু করেছিল একটু। কিন্তু তাদের পাশ কাটিয়ে আর-সবাই যে-যাব মত বন থেকে বেরিয়ে যায়। তখনো বক্তৃতাটি শেষ হল না। এখন দলবল নিয়ে রাধাবল্লভ এই আসল জায়গাটিতে ঢুকল। ওপরে নীচে তাকিয়ে সে পুরো জায়গাটি, সেই তিস্তাপাড় থেকে ঐ ওদলাবাড়ি রোড পর্যন্ত, একবার দেখে—ঐ সীমায় মোটবগাড়ি, জিপগাড়ি, আর, এই সীমায় সার্ভের টেবিলচেয়ার।

চায়ের দোকানের সামনে এসে ওদের দলটা দাঁড়ায়। একে চায়ের দোকানেব ভিড উপচে পড়েছে। তার ওপব চরের লোকজন এসেও ওর সামনেই বসেছে। তদুপরি জ্যোৎস্নাবাবু—আমিন। ফলে ওরা আর এগতেই পারে না প্রায়। রাধাবল্লভ চায়ের দোকানের দিকে পেছন ফিরে জমির ঢাল দিয়ে সোজা পুবে তাকিয়ে থাকে। তার বগলের ছাতাটা নামায় না। ডান হাত দিয়ে একবার চোখ মোছে। বুদ্ধিমান এদিক-ওদিক ঘুরে রাধাবল্লভের পেছনে এসে বলে—'কমরেড্ লেকচার এইখানেই দাও, এত লোক, ঠিক শুনিবার পাবে, চাও খাছে, কায়ও নড়িবে না, শুনিবার হবে।' বলে বুদ্ধিমান আবার হে হে করে হেসে হাততালি দেয়, যেন এই এতগুলি লোককে সেই বুদ্ধি করে এখানে নিয়ে এসে আটকে রেখেছে, এখন কমরেড বক্তৃতা শুরু করলেই হয়। বুদ্ধিমানের ডাকে রাধাবল্লভ ফেরে না। রাবণ এক গ্লাশ চা এনে রাধাবল্লভকে ধরিয়ে দেয়। রাধাবল্লভ ম্লান হাতে চাটা নিয়ে চুমুক দেয়। তারপর বগল থেকে ছাতা না-সরিয়েই বাঁ হাতটা দিয়ে পকেট ঝাঁকিয়ে দেখে পয়সা আছে কি না, একটা পান খেলে হয়। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে আলবিশ ভগত আর হৃষীকেশ চা খাচ্ছে। হৃষীকেশ ত কোথাও চুপ করে থাকতে পারে না ওখানেই চেঁচামেচি শুরু করেছে।

চা খাওয়া শেষ হলে আলবিশ এসে রাধাবল্লভের কাছে দাঁড়ায়। আলবিশ ভগত পুরোহিত। তাই মাছমাংস খায় না, চুলগুলো কানের দুপাশ দিয়ে কাঁধের ওপর থোকায়-থোকায় পড়েছে। কপালটা বড়। চুলে নিয়মিত তেল ও চিরুনি দেয়। দাড়ি বোধহয় রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু কম থাকায় দেখার মত হয়ে ওঠে না। জুলপির কাছ দিয়ে খানিকটা নেমে এসেছে আর গোঁফটা ঠোঁটের ওপর ছেঁড়া-ছেঁড়া হয়ে ঝুলে আছে। আলবিশের চোখদুটো আর সামনের দাঁতগুলো বড় বড়। সে যখন কথা বলে তখন তার ঘাড়টা সামনে দোলায় আর দাঁতগুলো বের করে চোখটা নাচায়। 'হে কমরেড, তা এইখানে একখান লেকচার ঝাড়খে চলো', আলবিশ আবার ঘাড দুলিয়ে হাসে, 'লেকচার ঝাড়খে, ঘরকে চলো।'

আলবিশের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে রাধাবল্লভ বলে, তোমার এখন ঐ এক কথা'। ঘর চললে এখন কী হবে। এমনিই ত আমরা দেরি করি ফেলিলাম। এখনো ত আমাদের বক্তব্য বলাই হল না।'

'তব বোল্ কোরো কেনে, বক্তব্য বোল্ কোরো,' বলে ভগত একটু সরে যায়। ইতিমধ্যে বুদ্ধিমান ও হৃষীকেশ আসে। বুদ্ধিমান বলে, 'কমরেড, এইখানে মিটিংখান শুরু করি দাও।' হৃষীকেশ কোনো কথাই গোপনে বলে না, চিৎকার করে চার পাশে তাকিয়ে, এক হাতের তালুর ওপরে আর-এক হাতের মুঠোতে ঘুসি মেরে বলে, 'কমরেড, মিটিংখান শুরু করি দাও।'

হৃষীকেশের চেহারা শৌখিন। তার পরনে শার্ট, আর নাইলনের প্যান্ট। পায়ে স্যান্ডেল—চামড়ার। বাগানের এক বাবুর কাছ থেকে সেলাইমেশিন জোগাড় করে লাটাগুড়ি হাটে হৃষীকেশ একটা দর্জির দোকান দিয়েছে। সেটাই তার প্রধান পেশা, এখন। ব্যাঙ্কের লোন পেলে একটা মেশিন কিনবে আর শিলিগুড়ি থেকে কারিগর আনবে। বছর বিশপঁচিশ আগে লাটাগুড়িতে খাশজমির দখলে হৃষীকেশের বাবা ছিল। হৃষীকেশের বাবা মারা গেছে অনেকদিন, সে-জমি অবশ্য দখলে আছে হৃষীকেশ ও তার দাদার মধ্যে দুই ভাগে। হৃষীকেশের ভাগে এখন আধি। সে চাষ করে না বটে কিন্তু তাই বলে কৃষক সমিতি ত আর ছাড়ে নি। কমরেডের সঙ্গে সার্ভে ক্যাম্পে এসেছে—কৃষক সমিতির দাবিদাওয়া নিয়ে। একটা গানও তৈরি ছিল—শখের নাটক আর গানে হৃষীকেশের দারুণ নেশা। কিন্তু আজ আর গানটা গাওয়ার কোনো সুযোগ পাবে মনে হয় না। হৃষীকেশ রাধাবল্লভকে বলে, 'ঐখানে যেটুকু বলা হইছে—তার পর থিকা বলেন।'

রাধাবল্লভ জিজ্ঞাসা করল, 'বলব ?'

বুদ্ধিমান বলে, 'বলেন, বলেন, তাড়াতাড়ি বলেন। সগায় বসি-বসি চা খাছে, এখন বসি-বসি শুনিবে। বলেন।'

একত্রিশ

রাধাবল্লভের বক্তৃতা

রাধাবল্লভ ছিল চায়ের দোকানের দিকে পেছন ফিরে। সে চায়ের দোকানের দিকে ঘুরল। তার বাঁ বগলে ছাতা ত প্রায় সেঁটে আছে। ডান হাতটা তুলে মাথার ওপর কনুইয়ের ভাঁজ ফেলে আঙুলগুলো নিয়ে এল ঘাড়ে, মাথার পেছনে। রাধাবল্লভ চোখ বন্ধ করে, ঘড়িটা একদিকে হেলাতেই হৃষীকেশ পাশ থেকে বলে, 'রিপিট দিবেন না, যা বলা হই গিছে তার পর থিকা বলেন—'

যেন এই কথার জবাবেই রাধাবল্লভ শুরু করে, 'কথাটা হচ্ছে আমাদের এই মাল-লাটাগুড়ি-ক্রান্তি অঞ্চলে বহু কুখ্যাত—'

'এই পার্টটা ত হয়া গিছে কমরেড।'

রাধাবল্লভ চোখ খোলে, 'আমাকে বলতে দাও হৃষীকেশ।'

'বলেন, কিন্তু রিপিট দিবেন না।'

রাধাবল্লভ আবার চোখ বন্ধ করে। সামান্য সময় নিয়ে ঘাড় হেলিয়ে শুরু করে, 'কথাটা হচ্ছে আমাদের এই মাল-লাটাগুড়ি-ক্রান্তি অঞ্চলে বহু কুখ্যাত জোতদার আছে। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য কৃষকদের শোষণ করা। কিন্তু কথাটা হচ্ছে কেন ? ধরেন, আনন্দপুর চা-বাগানের জোতের জমিও আছে, চায়ের জমিও আছে। কিন্তু এই মালিকলোক চায়ের জমিতে ধান চাষ করেন আর ধানের জমিতে চা চাষ করেন। এই মালিকলোক চা-বাগানের মজুরদের দিয়ে ধান চাষ করান আর জমির আধিয়াদের দিয়ে চা-বাগানের কাজ করান। কিন্তু এই কৃষকরা মজুরদের মতন মাহিনা পায় না। ঠিকা মজুরি পায়। আর মজুররাও কৃষকদের মতন আধি-ভাগ্য পায় না। মজুরির পয়সা পায়। কোম্পানির সব দিকেই লাভ—জোতদারিতেও লাভ, ডিরেক্টরিতেও লাভ। আর মজুর-কিষানের সব কিছুতেই ক্ষতি—মজদুরিতেও ক্ষতি, হালুয়াগিরিতেও ক্ষতি—' রাধাবল্লভ, বোধহয় দম নেয়ার দরকারেই একটু থামে,

সেই ফাঁকে হৃষীকেশ বলে, 'এ কোন লেকচার দিছেন কমরেড, ই ত মজুর-কৃষককের মিটিং না হয়, সার্ভের, জমির সার্ভে হছে, জমির কথা কহেন,' হৃষীকেশের কথা শুনেই হয়ত, বা হয়ত জমির কথাতে কিছুতেই আসতে পারছিল না বলেই রাধাবল্লভ জোর করে একটা বিরতি নিয়েছিল, আবার শুরু করেই সে সরাসরি জমির কথাতে চলে আসতে চায়, আগের কথার প্রসঙ্গসূত্র ছাড়াই।

'আমরা কৃষক সমিতির পক্ষ থেকে সমস্ত জমির বন্দবস্ত চাই কৃষকের স্বার্থে। যে-কৃষকরা খাশ জমি দখলে রেখে চাষ করিছেন, জোতদারের লাঠিগুলি, পুলিশের অত্যাচার, জেল-মামলা-মোকদ্দমা সহ্য করিছেন, তাদের সেই সব জমিতে বন্দোবস্ত দিতে হবে। যে-কৃষকরা ফরেস্টের জমি দখলে রেখে চাষ করিছেন, যেখানে শুধু ছিল হায়-হায়-পাথার, সেখানে বানি দিছেন হলহলা ধানের খেত, সেই সব জমি দখলদার কৃষকের নামে বন্দোবস্ত দিতে হবে। কিন্তু ফরেস্টের জমিতে যে-সমস্ত জোতদার চাষ করে তাহাদের হাত হইতে এই সব জমি কাড়ি লইয়া হালুয়া-আধিয়ারের মধ্যে বিলি করিতে হইবে।' রাধাবল্লভের কথাগুলিতে আবেগ সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছিল—তাদের কৃষক সমিতির প্রত্যক্ষ নানা অভিজ্ঞতার স্মৃতির আবেগ। আর সেই আবেগের টানে, স্মৃতির প্রবলতায় কেমন অবান্তর হয়ে যায় তার নানা বক্তব্যের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য নানা যুক্তি। তার অব্যবহিতকে রাধাবল্লভ চরম গুরুত্বেই সামনে এনে দেয়—যুক্তির পরম্পরায় নয়, অভিজ্ঞতার সবল চাপে। সে একটু থামে। আপাতত মনে হয় বটে, দম নেয়ার জন্যে, কথাটা শুনে বোঝা যায় সে আর-একটি সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়াচ্ছে।

'আর আমাদের একটি বিশেষ বক্তব্য আছে চরুয়াভাই কৃষকদের উদ্দেশ্যে। আমাদের এই তিস্তানদীর স্রোত সব সময়ই বদলায়। আজ যেটা কায়েম, কালি সেইটা চর। তাই জোতদারের দল তাদের জমি তিস্তার ভিতর গেলেও সেইখানে দখল রাখে। চরজমিতেও সাধারণ কৃষক দখল পায় না। আবার অন্যদিকে তিস্তার এমন-এমন চর আছে, যাহা শক্ত পাকা, নদীতে ভাসিবার কোনো আর ভয় নাই, কায়েমের থিকাও কায়েম। কিন্তু সরকারের নিয়ম যে পঞ্চাশ বছর ধরি চর যদি চর না থাকে তাহা হইলে কায়েম বলিয়া ডিক্লেয়ার হইবে না। সেই সুযোগে আমাদের পূর্ববঙ্গের হিন্দুভাইগণ আসিয়া এই তামান-তামান চর জমি চাষ করিবার ধরিছেন। যেইঠে আছিল ভামনি বন, বাঘের বাসা সেইঠে এখন ধান, পাট, তরকারি, তরমুজ হছে। কিন্তু এই পূর্ববঙ্গের ভাইরা আমাদের এইঠেকার রাজবংশী আর মদেশিয়াদের চরে ঢুকিতেই দেন না। যেন চরটা একটা—'

যে-বিরাট দলটা ছড়িয়ে বসে চা খাচ্ছিল তাদের ভেতর থেকে একজন লাফিয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ওঠে, 'এই শালা সাহা, চরের কথা এইখানে তোলার তুমি কে?'

হৃষীকেশ এদিক থেকে হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, 'খবরদার, লেকচার থামানো চলিবে না।' হৃষীকেশের চিৎকার শেষ না-হতেই বুদ্ধিমান চিৎকার করে শ্লোগান তোলে 'ইন-কি-লা-ব', আর অত ভিড়ের ভেতরে নানা জায়গা থেকে অনেক হাত ওপরে ওঠে, কোনো-কোনো হাতে চায়ের গ্লাশও ধরা, 'জি-ন্দা-বাদ।'

চরের দলের ভেতর থেকে একজন এক লাফে বুদ্ধিমানের সামনে এসে পড়ে—'শালা।' বুদ্ধিমান পাল্টা আক্রমণে প্রায় তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, 'শা-লো'। কিন্তু কেউই কারো গায়ে হাত দেয় না। দুজন মুখোমুখি, গায়ে গা লাগিয়ে প্রায়, দুর্গা ঠাকুরের অসুরের ভঙ্গিতে পরস্পরের দিকে চোখ পাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। যেন যে-কোনো মুহূর্তে মারামারি বাঁধবে।

এত গোলমালের ভেতর রাধাবল্লভ চোখ খোলে, মৃদু হাসিতে ডান হাতটা তুলে সবাইকে বলে, 'আপনারা শান্ত হন। শান্ত হন। কথাটা হচ্ছে এই মারামারিতে কার লাভ হইবে? কথাটা হচ্ছে আমাদের এই মাল-লাটাগুড়ি-ক্রান্তি অঞ্চলে অনেক কুখ্যাত জোতদার—'

যে-লোকটি বুদ্ধিমানের সামনে লাফিয়ে পড়েছিল সে একটা পাল্টা লাফে রাধাবল্লভের দিকে ফিরে বলে, 'সে জোতদার-টোতদার নিয়া যা কওয়ার কও। চর নিয়া কিছু কওয়া চইলবে না। চরে জোতদারও নাই, আধিয়ারও নাই, সেটেলমেন্টও নাই, পাট্টাও নাই।'

রাধাবল্লভ আবার তার ডান হাতটা তোলে, 'আপনারা শান্ত হন, কথাটা হচ্ছে চরের বা বাগানের কথা নয়। কথাটা হচ্ছে গত সেটেলমেন্টের পর আমাদের এই মাল-লাটাগুড়ি-ক্রান্তি এলাকায় অনেক কিছু হইয়াছে, ফ্লাডও হইয়াছে, চরও জাগিছে, ফরেস্টও হইছে, জমিও হইছে, নদীও হইছে—'

'হ্যাঁ, ঐ সব বলো সাহা, ফরেস্ট বলো, জোতদারও বলো, চরফর তুইলব্যা না, চরে শালা তোমার কৃষক সমিতি করা চইলবে না।'

'চরে জমি আছে আর চাষি আছে', চরের দলের ভেতর থেকে চিৎকার করে একজন বলে।

'খবরদার। কৃষক সমিতির কথা তুলিলে জিভখান টানি লিব' বলে হৃষীকেশ হঠাৎ লাফ দিয়ে ঐ দলটার সামনে পড়ে। সঙ্গে-সঙ্গে আলবিশ লম্বা হাত বাড়িয়ে তার পাট-পাট বাবরি ছুঁতেই সে বসে পড়ে।

'শালো, কার কথা, কী কথা কুছু শুনবেক নাহ, চিল্লাখে ত চিল্লাখে।'

যে-লোকটি কৃষক সমিতির কথা তুলেছিল চরের দলের কেউ তার মাথায় চাঁটি মারে, 'ঠিক আছে, সাহা, বলো বলো।'

'কথাটা হচ্ছে, আপনারা জানেন এইবারের সেটেলমেন্ট কৃষকের স্বার্থে করিতে হইবে।'

'ঠিক কথা, সাহা, শালা জোতদারগুলাক ঠ্যাঙাও আর জমিগিলা খালাশ করো।

রাধাবল্লভ হঠাৎ থেমে যায়, যেন সে বক্তৃতাটা থামিয়ে দিল মনে হয়। কিন্তু বক্তৃতাটা থামার মত জায়গায় আসে নি। সবাই রাধাবল্লভের মুখের দিকে তাকায়। রাধাবল্লভ হাসার চেষ্টা করছিল।

রাধাবল্লভ জোরে হাসতে পারে না। তার ব্রণের আর বসন্তের দাগভর্তি মুখে অসংখ্য কুঞ্চন দেখা যায়। তারপর, তার নীচের ঠোঁটটা বিস্ফারিত হয়। পান-খাওয়া জিভ আর দাঁত বেরিয়ে পড়ে। রাধাবল্লভ তার মুখের ওপর ডান হাতটা বুলিয়ে বলে, 'এইটা খুব মজার কথা হইছে', মজাটাতে তার এত হাসি আসে যে তাকে আবার মুখেচোখে হাত বোলাতে হয়, 'জোতদাররা কয়, চরের কথা বলো, আর চরুয়ারা কয়, জোতদারের কথা বলো—'

হাসির ঝোঁকে রাধাবল্লভ চোখ ঢেকে মাথা নাড়ায়। আর চরের দলটাই হাততালি দিয়ে ওঠে।

বক্তৃতা থেমে যাওয়া, রাধাবল্লভের গলার স্বর নেমে আসা, হাসাহাসি, হাততালি—এতে আলবিশের মনে হয় বুঝি বক্তৃতা শেষই হল। সে তাড়াতাড়ি একটা পান এনে পেছন থেকে হাত বাড়িয়ে রাধাবল্লভকে দেয়। রাধাবল্লভ পানটা মুখে দিয়েও হাসতেই থাকে। তার ছোট শীর্ণ এঁটুকু-মুখে অত বড় পান আর অতটা হাসি একসঙ্গে আঁটে না। থামানো লেকচার শুরু করা, পুরো হাসিটা হাসা আর পানটাকে চিবিয়ে দলা করে এক গালে ঠেলে নেয়া—এব ভেতরে যেটুকু সময় চলে যায় তাতেই যেন রাধাবল্লভের লেকচারটা শেষ হয়ে গেল বলে সবাই ধবে নেয়। আবার শুরু করতে হলে, রাধাবল্লভকে গোড়া থেকে ধরতে হবে।

রাধাবল্লভ হাসি মিশিয়ে পান চিবয়।

বত্রিশ

হৃষীকেশের গান

হৃষীকেশ সেই যে নীচে বসে পড়েছিল আর দাঁড়ায় নি, সেখানেই উটকো হয়ে বসে আছে। ঐ বিরতির সুযোগে মুখ তুলে চিৎকার করে উঠল; 'চরের জমিতে জোতদারও নাই, আধিয়ারও নাই, শুধু গুড় আছে, চাটো আর চাটো, চাটো আর চাটো—'

বলতে-বলতেই সে উঠে দাঁড়িয়ে যাত্রার কুজা মন্থরার মত দু-চার পা হাঁটে। তাতেই সবাই বোঝে হৃষীকেশ অভিনয় করবে, সবাই একটু নড়েচড়ে বসে। পিঠ নুইয়ে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটতে-হাঁটতে হৃষীকেশ সেই চরের দলটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় আর তাদের সামনে লম্বা জিভ বের করে হাতটা চাটার ভঙ্গিতে জিভের সামনে ওঠায়-নামায়। যারা দাঁড়িয়েছিল বসে পড়ে। 'এই রিশিকেশ ঘুরে-ঘুরে।' হৃষীকেশ হঠাৎ তার পেছনটা অনেক উঁচুতে তুলে দেয়, সেই উঁচু পেছন থেকে গড়িয়ে যেন পিঠটা নেমেছে, মাথাটা আরো নীচে, কিন্তু মুখটা তোলা, তাতে জিভ বের করা। এটা হনুমানের লঙ্কাপোড়ানোর ভঙ্গি। তখন একটা বিরাট লেজ থাকে—পোয়াল দিয়ে মুড়ে-মুড়ে বানানো। হৃষীকেশ তার উঁচু পেছনটাকে আরো উঁচু করতে ও বেতালে নাচাতে পারে, একবার বাঁয়ে, আর-একবার ডাইনে,

দু-একবার দুটোই সমানে। এতে তার খুব নাম। হৃষীকেশ এবার তার পেছনটাকে চরের দলটার সামনে নিয়ে গিয়ে হঠাৎ প্রচণ্ড দুলিয়ে লাফিয়ে ঘুরে যায় আর হাতটা জিভের সামনে এদিক-ওদিক চাটা ভঙ্গিতে ঘোরায়। চরের দলের একজন হৃষীকেশের পেছনে মারার জন্য একটা লম্বা লোমশ পায়ে লাথি ছোঁড়ে কিন্তু হৃষীকেশ এমন পিছলে যায় যে লাথিটা লাগে না। লোকটার পা আছড়ে পড়ে। হৃষীকেশ আবার তারই সামনে পেছনটা ঘুরিয়ে নিয়ে যায়। সমবেত হাসিতে আর হাততালিতে লড়াইটা জমে ওঠে। আর, ঐ লোকটির পা-চালানো আর তারই মুখের ওপর হৃষীকেশের পেছন-ঘোরানোতে ব্যাপারটাতে যেন নাটকীয়তাই এসে যায়। হৃষীকেশ হঠাৎ মুখ তুলে সবাইকে জিজ্ঞাসা করে, 'কহেন আপনারা, এইটা কি চাটিবার ধইচছি আমি ? এইঠে এক চাট, আবার ঐঠে এক চাট, কহেন, আপনারা।'

হৃষীকেশ আবার হাতচাটার ভঙ্গিটা তার চার-পাশে জমা ভিড়টাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখায়। আর মাঝেমধ্যে বলে, 'কহেন আপনারা, এইটা কিসের চাটন ?' এক-একবার জিজ্ঞাসা করে আর তার পেছনটা উঁচু হয়ে দোলে। শেষে চরের দলটার সামনে একবার চাটন দেখিয়ে, আর-একবার পেছন নাচিয়ে হৃষীকেশ বলে, 'এইঠে চাটিলেও মিষ্টি, ঐঠে চাটিলেও মিষ্টি, য্যানং মোর আখি গুড়ের গজা, আর ? আর ? কহেন আর কী ?'

হৃষীকেশ গানের ঝোঁকে সোজা হয়ে এক পাক ঘোরে, আর জিজ্ঞাসা করে। ও এমনি ঘুরতে-ঘুরতে গানের পরের লাইনটার মিল খুঁজছে। দর্শক ও শ্রোতাদের মধ্যেও প্রত্যাশা তৈরি হয়ে উঠছে—একটা লাগসই পরেব লাইনে গানটা পুরো জমে উঠবে। হৃষীকেশ ঘুরতে-ঘুরতে আবার চরের দলের সামনে এসে পড়ে।

হৃষীকেশ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, এক হাত কানের পাশে দিয়ে, আর-এক হাতে ঠোঁটটা ঢেকে চরের দলটার দিকে তাকিয়ে গলা ফাটিয়ে গান ধরে—

ও-ও আমার চরুয়া-হালুয়া ভাই
তোর গুণের সীমা নাই
তোর এতোখান্ জমিতে ভোখো না মেটে
তোর প্যাটের সীমা নাই।
ও-ও আমাব চরুয়া-হালুয়া ভাই
তোর প্যাটেব সীমা নাই
তোর গলার তলায় প্যাটখান শুরু
হাঁটুর তলায় যায়।

চারদিকে হাততালির তুমুল সমর্থন। হৃষীকেশ থেমে সকলের দিকে তাকিয়ে মাথাটা একটু-একটু ঝাঁকিয়ে অভিনন্দন নেয়। পাট-পাট করা বাবরি চুল, ঝকঝকে দাঁত, সুপুষ্ট মুখে তাঁকে বেশ পেশাদার গায়কই মনে হয়। গানটা সে শুরু করে রাজবংশীদের প্রচলিত সুরেই প্রথমে একটা খুব বড় টান দিয়ে, এক-একটা নিশ্বাসের ঝোঁকে-ঝোঁকে। চরের দলের ভেতর থেকেই একজন একটা সিগারেট ছুঁড়ে দেয়। হৃষীকেশ লুফে নিয়ে বলে, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

এ-রকম একটা গানের আসর বসে যাওয়ায় সবাই এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। দেখতে-দেখতে একটা যেন পালাগানের মত ভাবই ধরে। সেই ভিড়ের ভেতর রাধাবল্লভ আলবিশও দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুনছিল। পেছন থেকে কেউ একজন একটা লাঠি দিয়ে আলবিশকে খোঁচা মারতেই আলবিশ পেছন ফিরে তাকায়। লোকটি রাধাবল্লভকে দেখিয়ে আলবিশ আর রাধাবল্লভকে বাইরে আসতে বলে। ওরা দুজন যখন 'দেখি' 'দেখি' বলে বেরচ্ছে, হৃষীকেশ ওদের গলা শুনে দাঁড়িয়ে উঠে তাকাতেই চরের দলের একজন উঠে হৃষীকেশের হাত চেপে ধরে চিৎকার করে ওঠে, 'এই পুঙ্গির ভাই, থামবি না, গান যখন শুরু করছিস শেষ কল্লতি হব।' হৃষীকেশ দেখে আলবিশ আর রাধাবল্লভ ভিড় থেকে বেরিয়ে গেল, কিছু বলল না। সে আবার সকলের মুখের সামনে নিজের প্রসারিত হাতটা ঘুরিয়ে এক পাক ঘুরে আসে।

আ-আ মুই একি করলু রে
মোর চরুয়া-হালুয়া ভাই
তোর সাথে মুই বিয়া বসিলুঁ
বাসর হইল নাই।

চারপাশের ভিড়টা জমাট বেঁধে যায়। অভিজ্ঞতায় তাবা টের পেয়ে যায় হৃষীকেশ গানের নিয়ম অনুযায়ীই চরম বিন্দুর দিকে যাচ্ছে। হৃষীকেশ শেষ লাইন দুটো বার দুই গেয়ে ও গানের মুখে ফিরে গিয়ে কৌতূহলটাকে আরো বাড়ায়। এবার বেশ মোটা পেট নিয়ে হাঁটার ভঙ্গি করে ও প্রথম স্তবকটা ফিরে গায়। তারপর একটুও বিবতি না দিয়ে হঠাৎ ধরে বসে,

ও-ও-রে নিঠুর চরুয়া-হালুয়া রে-এ
তোর প্যাটের তলায় প্যাট ডংডঙাছে
খাড়া কিছুই নাই

এতক্ষণে যেন পুরো গানটা তার প্রত্যাশিত চবম বিন্দুতে ওঠে। হৃষীকেশ ডান হাতটা সামনে নিয়ে কনুই থেকে আঙুল পর্যন্ত ঝুলিয়ে দোলায় আর ঘুরে ঘুরে গায়—

তোর প্যাটের তলায় প্যাট ডংডঙাছে
খাড়া কিছুই নাই

আর তার এক পাক ঘোরাব মধ্যে হাসিটা যখন ছড়িয়ে পড়ছে আর উঁচুতে উঠছে তখন সেই চরের দলটার কাছে পৌঁছে হৃষীকেশ নিজের দুই পেটে দুই হাত দিয়ে চরম দুঃখের অভিনয়ে ডুকরে ওঠে

ও-ও রে মোর চরুয়া-হালুয়া রে-এ
মোর প্যাটের ভোখো ত মিটাইলি রে
(কিন্তুক) মোর তলপেট ভরে নাই—

তলপেট চেপে ধরে ডুকরে কান্নার স্ববে হৃষীকেশ ঘুরে যায় 'মোর তলপেট ভরে নাই', আর কিছুটা এ-রকম ঘুরেই হঠাৎ সোজা হয়ে এক হাত মাথার ওপরে, আর এক হাত কোমরে দিয়ে কোমর দুলিয়ে-দুলিয়ে গেয়ে যায়, 'মোর তলপেট ভরে নাই', 'মোর তলপেট ভরে নাই ;' তারপর ধপ করে মাটিতে বসে পড়ে এক পা, হাঁটুতে ভাঁজ ফেলে সামনে ছড়িয়ে, আর এক পা পুরো ভাঁজ করে, কাওয়ালির ঢঙে বাঁহাত কানেব পাশে নিয়ে ডান হাত সামনে ছড়িয়ে দিয়ে কাঁধ থেকে কনুই পর্যন্ত ঝাঁকিয়ে-ঝাঁকিয়ে দ্রুত লয়ে গেয়ে ওঠে, 'তলপেট ভরে নাই' 'তলপেট ভরে নাই।' চারপাশের সবাই তার গান ও ভঙ্গির তালে হাততালি দিয়ে-দিযে দ্রুত থেকে দ্রুত লয় বাড়াতে থকে। বাড়াতে-বাড়াতে এক সময় সুরটা চরমে উঠে একটা চিৎকারে শেষ হয়ে যায়। হৃষীকেশ মাটি থেকে উঠে পকেট থেকে সেই সিগারেটটা বের করে ধরায়। তারপর এক মুখ হাসি নিয়ে চরের দলটার দিকে তাকিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে।

তেত্রিশ

কৃষক-মজুর : আলোচনা

হৃষীকেশের গান যখন শুরু হয়েছে, অর্থাৎ রাধাবল্লভের বক্তৃতা থেমে গেছে—আনন্দপুরের বীরেনবাবু আর ফাগু ওরাও রাধাবল্লভকে ভিড়ের ভেতর থেকে বাইরে নিয়ে আসে। সঙ্গে আলবিশ। তারপর সেই গাড়িদুটোর দিকে হাঁটতে থাকে। রাধাবল্লভ বলে, 'এইখানেই কথাবার্তা বলেন, আপনাদের সঙ্গে অতদূরে গেলে এদিকে ত সবাই খোঁজাখুঁজি করবে।'

'আরে চলোই না। এখান থেকে কি কেউ দেখতে পাবে না নাকি, যে তুমি ওখানে কথা বলছ।'

আলবিশ মাথা দুলিয়ে বলে, 'চলো, কমরেড, চলো, চলিবার কহথে ত চলো।'

সবাই মিলে সন্ট লিক পার হয়ে গিয়ে বসে। একটু দূরে গাড়িতে ফরেস্টের বাবুরা। সন্ট লিকের মুখে মদেশিয়াদের যে-দলটা বসে ছিল তরা কেউ এদিকে আসেও না, তাকাও না।

বীরেনবাবুই প্রথম কথা শুরু করেন, 'শোনো রাধাবল্লভ, সার্ভে ত শুরু হল। এখন ত মাঠখশড়ার কাজ বোজই এগবে। তোমাদেব জমি ত বোধহয় আজকালই পড়বে। দু-একদিনের মধ্যেই ত বাগানেও

পৌঁছবে। তা তোমরা কী করবে—বাগানের ব্যাপারে?'

'কথা হচ্ছে কিছু করার নাই। আপনাদের জোতল্যান্ডের ভেস্ট জমিতে আমাদের কৃষকরা দখল নিয়ে এতদিন ধরে চাষ করে। আমরা সরকারের কাছে পাট্টা চাই।'

'পাট্টা ত আর তোমার সেটেলমেন্টে হবে না, সে যেখান থেকে চাওয়ার তুমি চাও। কিন্তু তোমরা এখন কোনো বোঝাপড়ায় না-এলে ত দাঙ্গা বাধবে।'

'দাঙ্গা বাধিলে তা আপনাদেরই সুবিধা। আপনাদেরই মুনাফা। আপনারা ত আপনাদের মজুরদের বুঝাইছেন যে আমরা জমি ছাড়ি দিলেই আপনারা ওদের বন্দোবস্ত দিবেন। তার উপর বলতে লাগছেন আপনাদের বাগান আর-বাড়াতে পারেন না—এই জমি ছাড়া। তাই নাকি পার্মানেন লেবারও নিতে পারেন না। কাম যদি এত কমই আপনাদের, বাগানটা ছাড়ি দেন না।'

'ওটাও ভেস্ট করে দেব? তা বলো, আমাদের তুমি চাকরি-বাকরি দেবে?' বীরেনবাবু একটু হাসি দিয়ে কথাটা মোলায়েম করতে চেষ্টা করেন। রাধাবল্লভও চুপ করে যায়। একটু পরে বীরেনবাবু আবার শুরু করেন, 'এবারের সেটেলমেন্ট ত তোমাদের পক্ষেই যাবে। এখনই যা-ব্যবস্থা করার করে নাও। এর পরের ভোটে যদি সি-পি-এম হেরে যায় তখন আবার তোমাদের ঝামেলা। এখন মেটানোই ত ভাল। কোম্পানিও বেকায়দায় আছে, রাজি হয়ে যাবে। আর সরকার ত এখন তোমাদেরই পক্ষে। এই অফিসারও ত শুনলাম নকশাল, মানে, ছিল। সে-ও ত তোমাদেরই পক্ষে। এখন একটা বন্দোবস্ত করে নিলে তোমাদেরই সুবিধে।'

আলবিশ একটু পেছনে বসে ছিল। সে গলাটা বাড়িয়ে শুনছিল আর মাথা দোলাচ্ছিল, যেন মনে হয় সব কথাতেই তার সম্মতি আছে। মাঝে-মাঝে 'হাঁ-হাঁ'-ও বলছিল। বীরেনবাবুর কথা শেষ হলে সে বলে বসে, 'হে-এ বাবুমন [বাবুরা], তঁয় কহথে কি হামনিমন [আমরা] সব জমি ছোড় হুঁ? আউর বাগানিয়া-লোক এসব জমি দখল লে লিবে? ত হামনিমন কাঁহা যাবে?'

বোধহয় অতটা ঝুঁকে আছে বলেই কথার শুরুতেই তার মুখ দিয়ে লালা পড়ার উপক্রম হয়। বার বার সেই লালা টেনে ভেতরে নিতে-নিতে সে আবার বলে, 'তোঁহার মালকিকার [মালিকেরা] এতনা ঠিকা মজদুরকো কাম মে লেতা রোজ, লেকিন কইকো পার্মানেন করনেসে ত বুঝ আতা হ্যায়, কিয়া, না—ই বাগানপর কাম হ্যায় বহুত, ইসকো অউর জমিকো জরুরত হ্যায়।' কথা বলতে আলবিশ খুব একটা অভ্যস্তও নয়। কিন্তু তার লম্বা চেহারা, লম্বা চুল, বড় মাথায় মনে হয় তার যেন কথা আছে। তদুপরি মদেশিয়া হয়েও বাংলা আর রাজবংশী মিশিয়ে এক অদ্ভুত ভাষা তৈরি করে ফেলে, বীরেনবাবুদের সঙ্গে কথা বলছে বলেই।

আলবিশের কথার উত্তরে সেই ফাগু ওঁরাও ছেলেটি রেগে গিয়ে বলে, 'মালকিকারকো দোষ নাখে [নেই]। বাগান বাঢ়নেকো জমিন না থে ত পার্মানেন কাম বানাই যাবে কেইসে?'

আলবিশ বেশ জোরে-জোরে মাথা ঝাকায়, আর 'হাঁ', 'হাঁ', করে, যেন এতক্ষণে কথার আসল যুক্তিটা এই ছেলেটি ঠিক ভাবে বুঝতে পারল। ছেলেটি বেশ রেগেই কথাটা বলে। বীরেনবাবু হাত উঁচু করে বলে, 'ফাগু, এত রাগছ কেন, এতে ত কোনো ঝগড়ার কথা নেই।' ফাগু তার লাঠিটা দিয়ে ঘাসের ওপর আস্তে-আস্তে মারে আর মুখটা একটু সরিয়ে রাখে। আলবিশ আবার কথা শুরু করতে চায়। তার ডানহাতটা সে এগিয়ে দেয় প্রথমে উপুড় করে—পাঁচ আঙুল ছড়ানো, তারপর চিত করে—পাঁচ আঙুল গুটোনো। একবার মুঠিও পাকায়, আলগা। সেটা যখন খুলে যায় তখন তার চওড়া কপালে লম্বা-লম্বা ভাঁজ, গভীর। কথাটা বলার চেষ্টাতেই এতটা পরিশ্রম করে, অবশেষে আলবিশ বলতে পারে, 'ঠিক বাত ত, ঠিক বাত। লেকিন বাগানের কাম বেশি, ফয়দা বেশি, মুনাফা বেশি ত পার্মানেন মজুর ভি বেশি হোগা, হ্যাঁ? তো হতে-হতে ত কোম্পানি কহতে শেকে যে, কি? না, বাগানকো এতনা কাম, আউর বাড়ানে হোগা, ত হামকো জমিন নাহি হ্যায়! হাঁ? কোম্পানিকো হিশাব লাগানে বোলো, কুন সাল পর কেত্‌না পার্মানেন লেবার—। 'হাঁ-আ-আ' এই শেষ হাঁ-আ-আ-টায় এতটাই লম্বা করে ঘাড় হেলিয়ে ফেলে আলবিশ যে তার মুখ থেকে লালা গড়িয়ে তার নিজেরই হাতের ওপর পড়ে। পড়ার পর সে টের পায়। টের পেয়ে 'হাঁ-আ-আ' বলার জন্য মুখটা যে-হাঁ করেছিল, সেটা বন্ধ করে। ঝোল টানার মত শব্দ করে লালা টেনে নেয়। হাতটা উল্টে ঘাসের ওপর মুছে নেয়। তারপর হাতের তালু দিয়ে ঠোঁটটা মোছে।

আলবিশের কথার পর সবাইই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। এখানে যারা আছে তারা সবাইই ব্যাপারটা এত বেশি জানে, যে কথাটা উঠতেই সবাই বুঝে যায় এ-কথার উত্তর দেওয়া মুশকিল। কোম্পানির অজুহাত যে চা-বাগানের এলাকা না-বাড়ালে নতুন শ্রমিক নিয়োগ করা যাবে না, সুতরাং আনন্দপুরের জোতল্যান্ডের যে-অংশ ভেস্ট হয়েছে সেটা আনন্দপুর চা কোম্পানিই সরকারের কাছ থেকে লিজ নেবে চা-বাগিচা বাড়ানোর জন্য। অর্থাৎ ভেস্ট জোতল্যান্ড আবার তার জোতদারের কাছেই ফিরে যাবে ইনডাশট্রিয়াল ল্যান্ড হয়ে। সুতরাং সেই ভেস্ট জমি দখল করেছে যে-কৃষকরা তাদের জমি ছাড়তে হবে। কিন্তু কোম্পানির পার্মানেন্ট শ্রমিক প্রতি বছরই কমছে। আগে কোম্পানি তার পার্মানেন্ট শ্রমিকের সংখ্যা বছর পাঁচ-সাত আগে যা-ছিল তার সমান করুক, তবে ত বোঝা যাবে যে আরো নতুন শ্রমিকের দরকার। রিটায়ারমেন্ট, ছুটিছাটা, মৃত্যু এ-সব কোনো খালি জায়গাতেই কোম্পানি পার্মানেন্ট শ্রমিক নিয়োগ করে না। সব কাজ ঠিকা শ্রমিক দিয়ে সারছে। তাহলে এখন এই ছুতোয় ভেস্ট জমির কৃষকউচ্ছেদেব এই চেষ্টা কেন?

আলবিশের কথার রেশটা কাটতে যতক্ষণ লাগে, তারপরে বীরেনবাবু বলে, 'কিন্তু একটা ত মীমাংসা তোমাদের করতে হবে। নইলে বাগানের শ্রমিকরাই-বা তাদের হক ছাড়বে কেন?'

রাধাবল্লভ তার ডান হাত দিয়ে মুখটা মুছে বলে, 'কিন্তু কথাটা হচ্ছে এই কথাটা আপনারা কেন সবাই বুঝেন না চা-বাগানের মজুরেব হক কোম্পানির সঙ্গে, আর আমাদের এই ভেস্ট জমির হক, সরকারের সঙ্গে। আপনারা আমাদের ভিতর লড়াই লাগাচ্ছেন কেন?'

রাধাবল্লভের কথাব উত্তরে বীরেনবাবু একটু রাগ করেই বলেন, 'এই সব কথা বলে কোনো লাভ নেই রাধাবল্লভ। সে কোম্পানির সঙ্গে যা তাদের করার মজুররা করবে, কিন্তু কোম্পানিকে বললেই ত বলছে আমাকে জমি দাও, আমি বাগান বাড়াব, বাগান বাড়লেই মজুরের লাভ হবে।'

বীরেনবাবু বেগে ওঠায় রাধাবল্লভ আরো একটু বেশি রেগে জবাব দেয়—'দেখেন বীরেনবাবু, আপনি ত কোম্পানি না?'

'তা ত না-ই, আমি ত কোম্পানির চাকরি করি।'

'তা হলে আপনি কোম্পানির হয়ে এত কথা বলেন কেন?'

'তুমিও ত রাজবংশী না রাধাবল্লভ, তা হলে তুমিই-বা রাজবংশীদের নিয়ে এত কথা বলো কেন?'

রাধাবল্লভ উঠে দাঁড়ায়, 'এই আলবিশ চলেন, এদের সঙ্গে আর কী কথা হবে। ঠিক আছে, আপনারা যা করার করেন। এখন হাটে-হাটে ঢোলাই দেন রাধাবল্লভ সাহা ভাটিয়া, ও কেন রাজবংশীদের নিয়ে জমি দখল করে। তারপর চাঁদা দিয়া মানষি দিয়া একটা উত্তরখণ্ড পার্টি খাড়া করেন।'

চৌত্রিশ

কৃষক মজুর : লেনদেন

বীরেনবাবু বোঝেন একটা ভুল কথা বলে ফেলেছেন। কিন্তু এখন যদি একটা মীমাংসার সূত্র বের না করা যায় তা হলে সব মাঠে মারা যাবে। সেই কথাটাই বলতে পারলেন না। আসলে রাধাবল্লভ তাঁর চাকরি নিয়ে কথা তুলেই মাথাটা গরম করে দিল। বীরেনবাবু ফাগুকে একটা গুঁতো মেরে বলেন, 'এই ধরে আন, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে, যা, তাড়াতাড়ি যা।'

ফাগু দৌড়ে গিয়ে আলবিশ আর রাধাবল্লভের পথ আটকায়। সন্ট লিকের কাছের ভিড়টা থেকেও দু-চারজন গোলমালের আভাসে উঠে আসে। ফাগু তাদের দিকে ফিরে ধমক দিয়ে বলে, 'কুছু না খে, তফাত যাও।' ফাগুর কথা শুনে তারা আর এগয় না, কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকে।

ফাগু রাধাবল্লভকে ধরে বলে, 'হে কমরেড চলো, চলো, বাতচিতমে ঐসা ত হোতাই হ্যায়। তোমকো ভি কৃষক সমিতি লাল ঝাণ্ডা, হামকো ভি মজদুর ইউনিয়ন লাল ঝাণ্ডা। তো বাতচিত ত হোনাই চাহে।'

রাধাবল্লভের রাগ তত ছিল না কিন্তু যেন ক্লান্তি ছিল, সে বলে, 'আরে ভাই, এত কথা বলি কী কাজ হইবে ? তোমরা কোথায় আমাদের পাকে কোম্পানিকে বলিবেন যে খাশজমির কৃষক উচ্ছেদ করা চলিবে না তা না, উল্টা কোম্পানিই তোমাদের দিয়া আমাদের উচ্ছেদ দিছে। এরপর একদিন তীরধনুক দিয়া মারামারি লাগাই দিবে আর তোমরাও লাগি যাবা।'

আলবিশ রাধাবল্লভের কথার খেই ধরে বলে, 'আর ব্যস, লাগ যাবে দেশিয়া আর মদেশিয়ার ফাইট, পুলিশ আযগা ব্যস—ফটাফট দুই দলের কমরেডমন এ্যারেস্ট।' ফাগু বলে, 'আরে, ছোড় দোও উ-সব বাত। কায় না জানে তোমার খাশজমিঠে দেশিগা-ভাটিয়া-মদেশিয়া সব কোই হায়, চলো-চলো, বাত খতম করো—'

রাধাবল্লভ ফিরতে-ফিরতে বলে, 'ঐটাই ত তোমাদের কোম্পানির বিপদ. না-হইলে কত দাঙ্গা বান্ধাইত।'

আলবিশ রাধাবল্লভকে সমর্থন দিয়ে বলে—'ত—য ?' তারপর দুজনেই বসে।

ফাগু তার উদ্যোগ ছাড়ে না। সে বীরেনবাবুকে বলে, 'আপনি ঐ সব আলগা বাত করবেন না। ই ত রাধা-কমরেডনে বোলা, হামরা লেবাররাভি বলব, খাশজমিঠে কৃষকলোগকো হঠানা নাহি চোলেগা। আউর উলোক ভি হামকো বাত বোলেগা। কিয়া, ঠিক হ্যায় না রাধা-কমরেড ?'

রাধাবল্লভ বলে, 'ঠিক ত হ্যায় কিন্তু বোলেগাটা কী ?'

আলবিশ বলে, 'হাঁ-আ, বোলো, কিযা তোঁহার মতলব, বোলো—'

ফাগু বীরেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করে, 'কিয়া বীরেনবাবু, ঠিক হ্যায় না ?'

বীরেনবাবু বলে, 'হ্যাঁ, এখন তোমরা ঠিক করো কী বলবে। তোমরা যদি দুই পক্ষ এক হয়ে কিছু বলো, সরকারও সেটা মানতে বাধ্য হবে, এই তোমার সেটেলমেন্টেই সেটা রেকর্ডও হয়ে যাবে।'

ফাগু বলে, 'তো বোলো, কিয় বোলেগা ?'

ফাগু কথাটা কাকে বলে বোঝা যায় না, কারণ কথাটা সেই তুলেছে এবং জবাবটা তারই দেয়ার কথা। কিন্তু আবার বোঝাও যায় যে সে এই কথাটারই জবাব বীরেনবাবুর কাছ থেকে জেনে নিতে চায়। বীরেনবাবুই তাদের আসল মুখিয়া কিন্তু তার কথার জবাবেই ত আর বীরেনবাবু শর্তটা দিতে পারে না, তাই তাকে চুপ করে থাকতে হয়। যেন ব্যাপারটা নিয়ে তারা সবাইই ভাবছে, বীরেনবাবুও। শেষে বীরেনবাবু শুরু করে, 'যারা জমি দখল করে আছে, মানে রাধাবল্লভের লোকেরা—'

বাধা দিয়ে রাধাবল্লভ বলে, 'আমার কোনো লোক নাই বীরেনবাবু, লোক থাকে ভদ্রলোকদের আর জোতদারদের। আমি ত ভদ্রলোকও না, জোতদারও না।'

'কেন ? তোমাকে ত সবাই বাবু বলেই ডাকে, সে যাকগে, যারা জমি দখল করে আছে তাদের যাতে জমি থেকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ না হয় সেটা দেখতে হবে, এই ত ?'

'শুনি না, আপনাদের কথাটা শুনি।'

'ফাগুরা কী বলবে বলুক। কী ফাগু ?'

'না, সে ত বলনেই হোগা, জরুর।'

'কিয়া ?' বীরেনবাবুই আবার প্রশ্ন করে।

'ঐ যে, রাধাবল্লভমনকো উচ্ছেদ নাহি চলেগা।'

'নাহি ত চলেগা কিন্তু জমিটা ত তোমাদেরও চাই ?'

'জরুর। চা-বাগানকো খাশ, বাগানকো দেনা হোগা।'

'সবই ত হোগা। কিন্তু সেটা হবে কী করে সেটা বলো।'

'সে ত জরুর বলনে হোগা—' বলে ফাগু থেমে যায়। আবার কিছুটা চুপচাপ থেকে বীরেনবাবু বলে, 'তা হলে তোমাদের জমিটা মাপামাপি হোক আগে।'

এইবার রাধাবল্লভ বলে ওঠে, 'মানে, আমাদের জমি আবার মাপামাপি কিসের ? সরকারের ভেস্ট জমি। সরকার মাপামাপি করে দাগ নম্বর ধরি-ধরি দখল নিছে। ব্যস—সরকারের ফর্ম দেখি সেটেলমেন্টে দাগ নম্বর মিলাবে। আমাদেরও পাট্টা দেয় নাই। আমরাও মাপতে দিব না। পাট্টা দিলে মাপ হবে, পাট্টা নাই ত মাপ নাই।'

'বাঃ ! তোমরা যদি পুরো জমিটা কার কত দখলে আছে তার একটা হিশাব বের করতে না দাও তা

হলে মীমাংসাটা কী হবে ?'

'কায় হিশাব কিয়েগা ? হাম ত জানেথে কিসকো কেতনা জমিন।'

আলবিশ কথা শুরু করলে রাধাবল্লভ তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, 'চুপ যান ভগত, চুপ যান। বীরেনবাবু আমাদের জমি মাপাইতে চায। তো চাউক। যায পারে স্যায় মাপুক।'

'রাধাবল্লভ, শোনো। যদি তোমার কথাটা মেনেও নেই, তা হলেও ত দেখতে হবে কে কতটা জমি দখল করে আছে ? তাহলে কোম্পানিও সরকাবকে বলতে পারে যে তোমাদের আইন-অনুযাযী কৃষকদের পাট্টা দাও। তারপর দিয়েথুয়ে যা বাকি থাকবে সেটা কোম্পানি বাগানের জন্য লিজ নিবে। ফাগুরাও সেই কথা বলবে। কী ফাগু ?'

'জরুর। হামনিমন বলেগা সব পাট্টা দোও, উসকে বাদ কোম্পানিকো দোও।'

'মানে, বীরেনবাবু, আপনারা আমাদেব বলিছেন আমবা দুই বিঘা জমি নিজেদের দখলে বাখিয়া বাকি জমিটা আপনাদেব দিযা দিব ?'

'সরকাবের ত তাই নিযম। যা নিয়ম তাই ত কবতে হবে। নইলে তোমাদেব ওখানে এক-একজনেব ত একহাল জমিও আছে। হৃষীকেশ ত দর্জিগিরি কবে। ওব কী কবে জমি থাকে ?'

'ঐ সব কথা বাদ দেন। আমবা বিশ বছব ধবে জমি দখল বাখছি। আপনাবা ত আমাকে গুলিও কবছেন। মাথায়-বুকে না লাগিযা হাতে লাগিল', বাধাবল্লভ ডান হাত দিয়ে তার বাঁ বাহুটা চেপে ধবে—বাঁ বগলেই ছাতা, 'সে ত আব জমি ছাড়িবাব জন্য না।'

'রাধাবল্লভ, তোমাকে গুলি কি আমবা কবেছি ? এই সব কথা বলো কেন ?'

'ঠিক আছে। ঠিক আছে। সেটা কোনো কথা না। কথা হচ্ছে, এই যদি আপনাদেব কথা হয় তবে কথাবার্তা এখানেই শেষ। আমবা জমি ছাডিবও না, জবিপও কবতে দিব না। ভেস্ট জমি ত খাশজমি। খাশজমির খতিয়ান আলাদা। তার আবার মাপামাপি কিসেব ?'

বীরেনবাবু বুঝে যায় তার আসল প্রস্তাবটা বাধাবল্লভ প্রত্যাখ্যান কবল। সেও তখন বলে, 'বাঃ বাঃ তোমরা খাশজমিতে আধিযাবি চালাবে আব মজুবরা বাগানের জমিতে নিজেদের হক পাবে না, না ?'

'ঐটা বাগানের জমি না, সরকারের জমি। ঐখানে মজুরদেব কোনো হক নাই। আপনারা মজুরদের সঙ্গে আমাদেব দাঙ্গা বাধাচ্ছেন—' রাধাবল্লভ উঠে দাঁডিযে ছিল। সঙ্গে-সঙ্গে আলবিশও। ফাগুও উঠে দাঁড়ায়। বীরেনবাবু বসে থেকেই বলেন, 'দাঙ্গা ত আমবা কবতে যাব না—তোমাদেব পার্টিব ইউনিয়নই যাবে। তখন তাদরে সঙ্গে বুঝো। বাগানেব ওযার্কাবরাই দাবি কবছে যে এই খাশজমি কতটা কাব দখলে আছে, মাপা হোক।'

'ঠিক আছে বুঝব—আমবা জমিতেই আছি। আপনাবা অফিসার ধবি আস্েন। দেখি কে কাব জমি মাপে—' রাধাবল্লভ উঠে পড়ে।

পঁয়ত্রিশ

কৃষক-মজুর : শ্রেণীসংগ্রাম

বেরিয়ে এসেই রাধাবল্লভ বলে, 'ভগত, তাড়াতাড়ি জমিতে চলেন, গোলমাল হইতে পারে।' তারপর সেই গানের আসরের দিকে তাকিয়ে বলে, 'বুদ্ধিমানকে ডাকি আনেন।' বাধাবল্লভ দাঁড়িয়ে থাকে না, সে উল্টোদিকে সোজা হাঁটতে শুরু করে। আলবিশ ভিড়টার দিকে প্রায ছোটে। তার বযস হয়েছে। তাড়াতাড়ি হাঁটতে গেলে পিঠটা নুয়ে যায়, যেন পা যে যথেষ্ট তাড়াতাড়ি চলছে না, সেটার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সে কোমর থেকে মাথাটা এগিয়ে দিচ্ছে। আলবিশ ভিড়ের ভেতরে বুদ্ধিমানকে খুঁজে বেড়ায়। এক পাক ঘুরে দেখে চায়ের দোকানে বসে হৃষীকেশের গানের সঙ্গে তাল দিচ্ছে।

'হেই বুদ্ধিমান উঠো, উঠো।'

বুদ্ধিমান না তাকিয়ে বলে, 'আরে ভগত বসি যাও কেনে, দেখেন না শালো রিশিকেশ ক্যানং পালা বান্ধিছে, চরুয়ার পালা।' ভিড়ের ভেতর থেকে হৃষীকেশের তারস্বর ভেসে আসে। ভগত আর দেরি করতে চায় না। রাধাবল্লভ আবার একা-একা গেছে। সে বুদ্ধিমানের পিঠে তার হাঁটু দিয়ে একটা গুঁতো মারে। এইবার বুদ্ধিমান আলবিশের মুখেরদিকে তাকায়, আলবিশ হাতের ইঙ্গিতে তাকে উঠতে বলে।

গত প্রায় পনের বছর ধরে বুদ্ধিমান কৃষক সমিতির সঙ্গে। আর এখানে কৃষক সমিতি মানেই এই খাশজমি দখলে রাখা, চাষ করা, লোন পাওয়া, মামলা করা এই সব। এক-একবার ভোটে এক-এক রকম সরকার এক-এক রকম আইন জারি করে। কিন্তু এই দখলি খাশজমির কোনো মীমাংসাই হয় না। দখলে রাখাই ত আইনের বার-আনি। সেই এত রকমের অভিজ্ঞতায় বুদ্ধিমান মুহূর্তে বুঝে ফেলে—কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে আলবিশের কানে-কানে বলে, 'কী হইল ?'

'কমরেড তোঁহাক জমিত্ যাবার কইসে।'

'কেন ? কুন্নে গোলমাল বাধি গেইল ?'

'না জানি। বাহির চল।'

আলবিশ আর বুদ্ধিমান তাড়াতাড়ি হাঁটতে শুরু করে। বুদ্ধিমান হঠাৎ দাঁড়িয়ে বলে, রিশিকেশকে ডাকি—'

আলবিশ দাঁড়িয়ে পড়ে। কিন্তু কিছু ভাবতে পারে না। হৃষীকেশকে ডাকা মানে ত এখন এই গানের আসরটা ভাঙতে হবে। তার মানে, এই এতগুলো লোকই ত জেনে যাবে। তার মানে, গোলমাল ত আরো পাকাতে পারে। কিন্তু গোলমাল ত এখনো শুরু হয় নি। হতে পারে। 'বীরেনবাবু শালোঠো ধমকসে বাত করলেক। কমরেড একেলা হো। না। ছোড় দে ; আগারি চলো থ।'

বুদ্ধিমান পা ফেলে বলে, 'চলো, চলো।'

ওরা তাড়াতাড়িই হাঁটছিল। বুদ্ধিমান বেঁটে আর আলবিশ ঢ্যাঙা। ফলে বুদ্ধিমানের অস্থির পা ফেলার সঙ্গে আলবিশের লম্বা-লম্বা পা ফেলা মিলে যাচ্ছিল।

আলবিশ বুদ্ধিমানকে বলল, 'শালো বীরেনবাবুঠো—'

'কোন বীরেনবাবু ?'

'আরে, শালো আনন্দপুরকো।'

'অ। অয় শালার ত চাকরি হবা ধরিছে হামরালার উচ্ছেদের তানে—উকিল।'

'কায় উকিল হো ?'

'ঐ শালার বীরেন। বীরেন-উকিল।'

'ধুত। উকিল ত কোর্টমে যাথে, কালা কোট পহিনকে। উকিল হোকে বাগানমে কিয়া করথে !'

'তোমার মাথা করেগা। এ্যানং বড় উকিল যেইলার একখান মক্কেলও নাই। সেই তানে চা-কোম্পানি উমরাক চাকরি দিয়া নিয়া আসিছে—এ্যালায় এই খাশ-জমির হালুয়া-আধিয়ারের পাছত কাঠি দাও। কী একখান অফিসার হইছে, বাগানের। কী কহিছে শালা ?'

'কহিছে কি তোমলোগ দু-বিঘা করকে লেকে বাকি জমিন ছোড় দো।'

'কেনে, শালোর বনুসের (বউ) ধোকর মানষির তানে ?'

আলবিশ রেগে দাঁড়িয়ে পড়ে, 'আরে আগারি ত বাতঠো শুনেগা, না, এইসা বাত কর যায়গা ?'

'কখন বলিবার ধরলেক হে, তোমাক ঐ শালো, এ্যানং কাথা ?'

'এই, যব কমরেডকো লেকচারঠো—'

'কোন লেকচার ? কমরেড ত তামান টাইমেই নেকচার ঝাড়িছে, ঘুমের ভিতরও কহে কুখ্যাত জোতদার...'

এবার আলবিশ হেঁসে ফেলে, 'আরে এই গানবাজনা কো আগারি।'

'কী ? তোমরাক্ ডাকি নিয়া গেইসে ?'

'হয়।'

'কায় ডাকি নিল ?'

'ফাগু আর বীরেনবাবু। তো হামনিমন্ ত গাইছুঁ। উসকে বাত, বইঠকে বইঠকে উমনিমনকো সাথ বাতচিত হোথে লাগেল্।'

'এক্‌কেবারে বইঠকে-বইঠকে বাতচিত ? খাড়কে খাড়কে না ?'

ওরা হাতির রাস্তার সেই বাঁকটার কাছাকাছি এসে গিয়েছিল, বাঁয়ে ঘুরলেই সামনে, ডাইনে, সেই খাশজমির এলাকা শুরু, বাঁয়ে ফরেস্টই চলে। চা-বাগান আরো অনেক দূরে।

বাঁকটা ঘুরতেই ওরা দেখে সেই জমির ভেতরে আর হাতিরাস্তার ওপরে কিছু লোকজন। সেই সার্ভের লোকজনকেও দেখা যাচ্ছে। ওরা দু-জন দাঁড়িয়ে পড়ে। 'শালো, চেইন ফেলাচ্ছে—জমি মাপিবার ধইচছে— ?'

বুদ্ধিমান ডাইনের ঢাল বেয়ে মাঠেব ভেতর দিয়ে আলে-আলে দৌড়তে শুরু করে। আলবিশও তার হাঁটার গতি বাড়ায়। কিন্তু সে ঢাল বেয়ে আলে নামে না। কাদায় থকথক করছে নতুন রোয়া মাঠ, আলে-আলে অত লাফাতে পারবে না আলবিশ।

কিন্তু ঘটনার জাযগাটিতে কোনো উত্তেজনা নেই, কোনো ঘটনাও নেই। সার্ভের লম্বা চেইনটা এই জমিগুলোর ওপর দিয়ে মবা সাপের মত পড়ে আছে। তাব ওপব বসে আছে বেটিছোয়ারা, জেনিমন (মদেশিয়া চৌরা), ছাওয়া-ছোটর ঘর, লেডকা-লেড়কি। রাধাবল্লভ সামনে কিছু লোক নিয়ে দাঁড়িয়ে। এই জমিটার একটা ঢাল ওপরে, কিছু দূরে চা-বাগানের মজুরদের একটা ভিড়—কেউ-কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে। আর বাঁ পাশে হাতির রাস্তার মোড়টাতে সুহাস, বিনোদবাবু, প্রিয়নাথ, অনাথ দাঁড়িয়ে বীরেনবাবু ও আরো কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলছে।

বুদ্ধিমান এসে রাধাবল্লভের সামনে দাঁড়ায। দীর্ঘ একটি শ্বাসে বুক ভরে জিজ্ঞাসা করে, 'কী হইছে কমরেড ?' তারপব নিশ্বাসটা ছাড়ে : মনে হয় বুদ্ধিমানের শ্বাস-প্রশ্বাসের চাপে তাব গেঞ্জিটা ছিঁড়ে যাবে। এখন এতটা হেঁটে ও এইটুকু দৌড়ে আসায় তার চোখের নীচের উঁচু হাড়দুটোতে যেন ঘাম চকচকায, ঐ দুটো আরো প্রখব হযে উঠতে পারে। নিশ্বাসে আন্দোলিত বুকের জন্যই কী না, বোঝা যায় না, বুদ্ধিমানের হাতদুটোও তার শবীরেব পাশে ফুলে ফেঁপে দোলে।

ততক্ষণে আলবিশও পৌঁছে গেছে। রাধাবল্লভ চোখটা বন্ধ করে, ডান হাতটা মাথাব ওপর কনুইয়ে ভেঙে আঙুলগুলোকে ঘাড়ের কাছে নিয়ে যায়, তারপব রোগা বুকটা চিতিয়ে, একটু কেতরে বক্তৃতার মত শুরু করে, 'কথাটা হচ্ছে, আমরা যখন আজ সার্ভেব অফিসারেব নিকট কৃষক সমিতির বক্তব্য বলিবার ছিলাম, তখন আমাকে আর আলবিশ ভগতকে আনন্দপুর চা-বাগানের বাবু বীরেনবাবু আর ঐ ইউনিয়নের ফাগু উবাও ডাকি নিয়া আলোচনায় বসিবাব চাহেন। আমরা আলোচনায় বসি। তাহারা অ্যালাং-প্যালাং বহুত কাথা কহিছে। সেই সব কাথা এখন আর বলিয়া কুনো কাম নাই। সে যাই হোক, বীরেনবাবু কহেন যে আমাদের জমি ছাড়িবার লাগিবে, মাথাপিছু দুই বিঘা করিয়া জমি থাকিবে আর এই তামান জমি মাপামাপি হওয়ার ধরিবে।'

এই কথাতে, চারপাশে এমন গুঞ্জন ওঠে যাতে রাধাবল্লভকে থামতে হয়। সে হাত তুলে তাদের থামিয়ে বলে, 'কিন্তুক সেইটাও কুনো কথা নহে। আমরা এই সব কথায় ঐ আলোচনাকক্ষ ত্যাগ করি। কিন্তু সেইটাও কুনো কথা নহে। আমরা যেই টাইমে ঐ সব আলোচনা করিবার ধইচছি, আলোচনা আর কথাবার্তা চলিছে, আর আমাদের কুনো মানষি যখন জমিতে নাই, সগায় গেইসে সার্ভের জায়গায়, রিশিকেশ গান গাহিবার ধরিছে, স্যালায় এই বীরেনবাবুর ঘর, এই কোম্পানির ঘর, আমাদের পাছত দিয়া, লুকাইয়া আমিনবাবুকে দিয়া, এইঠে আমাদের জমিতে চেইন ফেলিছে।'

দম নেবার জন্য রাধাবল্লভকে থামতে হয়। তখন তার গলার সবগুলো রগ ফুলে উঠেছে। যে কণ্ঠস্বরে ও যে-ঘৃণায় সে এই কথাগুলো বলতে চায় তার সবটুকু যেন সে উগরে দিতে পারছে না। তাই তার মুখটা একটু ডাইনে বেঁকে গেছে—যদিও তার শ্রোতারা বেশির ভাগই বাঁয়ে। আর তার নীচের ঠোঁটটা চেবড়ে যাচ্ছে। তাতে তার ক্ষয়ে-যাওয়া দাঁতের কালচে গোড়ায় জমে ওঠা থুতু দেখা যায়। রাধাবল্লভ ধিক্কারে বলে ওঠে, 'বীরেনবাবু আনন্দপুর চা-কোম্পানির চাকরি করেন। তিনি আলোচনার নামে আমাদের বনের আড়ালে নিয়া গিয়াছেন। আর সেই ফাঁকে এই আমিনকে চেইন দিয়্যা এইখানে জমি মাপিবার কাজে পাঠাইছেন। এইঠে আমাদের বেটিছোয়া, ছাওয়া-ছোটর ঘর সেই চেইনখান চাপি ধরি এইঠে বসি গিছে। আর সেই সময় চা-বাগানের ইউনিয়নের এই শ্রমিকরা এইখানে আসিয়া লাইন বান্ধি এই সব বোটিছোয়া আর ছাওয়া-ছোটর ঘরকে হুমকি দেখায়, ভয় দেখায়। আমি যখন এইখানে আসি পৌঁছাই তখন দেখি এই অবস্থা। আপনারা সবাই প্রস্তুত হোন। আমরা আমাদের দখলের জমি

ছাড়িব না। এই জমি মাপিবাব দিব না। চা-কোম্পানির আর আমলাতন্ত্রের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করেন।'

রাধাবল্লভ তার পাঞ্জাবির হাতায় মুখটা মোছে। রাধাবল্লভের পাশে দাঁড়িয়ে যারা তার কথা শুনছিল তারা আলগা হয়ে যায়। বুদ্ধিমান হঠাৎ লাফ দিয়ে সামনের আলটার ওপর উঠে মজুরদের দিকে তাকিয়ে থাকে। কয়েকবার পায়চারি করে। বুদ্ধিমানকে দেখিয়ে মজুরদের লাইনের মেয়েদের ভেতরে একটু হাসাহাসিব ভাব আসে।

ছত্রিশ

কৃষক-মজুর : ভাষণসংগ্রাম

বুদ্ধিমান যে-বড়, উঁচু আলটায় দাঁড়িয়েছিল, সেটা পশ্চিমে গিয়ে হাতির রাস্তার সঙ্গে মিশেছে। সেখান থেকে সুহাস ঐ আল ধরে এদিকে আসে, একা। আমিন আর চেইনম্যানেরা ওখানে দাঁড়িয়ে থাকে। বীবেনবাবুও।

সুহাস কাছাকাছি আসতেই বুদ্ধিমান শ্লোগান দিয়ে ওঠে, 'খাশজমির দখলদারি', আর সমবেত উঁচু আওয়াজ ওঠে, 'ছাডছি না, ছাড়িম না—'

'খাশজমি মাপামাপি'
'নাহি চলেগা, নাহি চলেগা'
'খাশজমির পাট্টা চাই'
'লোন চাই, সাব চাই'

বুদ্ধিমানেব গলা থেকে বাধাবল্লভ শ্লোগানটা নিয়ে নেয়। হাতটা তুলে টেনে বলে, 'কৃষকদের বিরুদ্ধে বাগানেব মালিক ও আমলাদেব ষডযন্ত্র—' এই শ্লোগানটা এরা জানে না, চুপ করে থাকে। পেছন থেকে একটি মেয়ের ক্ষীণ গলায একবাব 'চলিবে না' শোনা যায়। দম নিয়ে রাধাবল্লভই শ্লোগানের জবাবে আরো চিৎকার কবে, 'ব্যর্থ কবো।' দ্বিতীয় 'ব্যর্থ করো'তে অনেকেই গলা দিতে পারে।

এব মধ্যে সুহাস লাফিয়ে আল থেকে নেমে এদের সামনে চলে আসে।

শ্লোগান থামলেও সুহাস কথা শুরু করে না। তখন এরা আরো একটু চুপ করে, মজুরদের লাইনটাও একটু-একটু এগিয়ে আসে। সুহাস গলা না তুলে, বরং একটু হাসি মিশিয়ে বলে, 'আপনাদের জমি মাপা হবে না। আপনারা চেইনটা ছেড়ে দিন—'

কথাটা সুহাস এত ঠাণ্ডা ভাবে বলে যে সবাই একটু অপ্রস্তুত হয়। কয়েক মুহূর্তের একটা ইতস্তত ভাব আসে, কী কবা উচিত এই নিয়ে। সুহাস পাশের দিকে তাকায়। তারপর আবার মুখ ঘোরায়। অনাথবাবু আব প্রিয়নাথবাবুকে ডেকে চেইনটা গোটাতে বলবে কিনা ভাবে।

কিন্তু ওঁরা কেউ এদিকে আসছেনই না একেবারে।

ততক্ষণে রাধাবল্লভ চোখ বুজে ঘাড় কাত করে ফেলেছে। সে আর গলা চড়ায় না। কিন্তু তার শীর্ণ চোখেমুখে রাগ, ধিক্কাব, কষ্ট এই সবের ছাপ বড় বেশি স্পষ্ট। রাধাবল্লভ বলে, 'আমরা সরকারের চেইন আটকাতে চাহি না। বিশেষত বামফ্রন্ট সরকারের চেইন, বামফ্রন্ট সরকার জনগণের বন্ধু-সরকার। কিন্তু যাহাদের চক্রান্তে এই চেইন খাশজমিতে ফেলা হইছে তাদের বিচর করিতে হইবে।'

'দেখুন, চক্রান্ত-টক্রান্ত কিছু নেই। আমরা এখন দাগনম্বরওয়ারি জমি মেপে যাচ্ছি। তাতেই আপনাদের জমিতে চেইন পড়েছে। আমাদের এখন এই জমি মাপার কথা নেই। আমরা চেইন তুলে নিচ্ছি, আপনারা ছেড়ে দিন।' বিনোদবাবু, অনাথবাবু, প্রিয়নাথবাবু কেউই এগচ্ছেন না—সুহাস মনে-মনে একটু রেগেই আবার ডাইনে তাকায়। এখন চেইন যদি এঁরা ছেড়ে দেন, দিয়েওছেন মনে হয়, তা হলে কি সুহাসকেই চেন গোটাতে হবে।

'স্যার, এ-বিষয়ে আমাদের সমস্ত বক্তব্য শুনিলেই বুঝিবেন যে কত বড় ষড়যন্ত্রের মধ্যে এই

চা-কোম্পানিরা বামফ্রন্ট সরকারকে ঠেলি দিচ্ছে।'

সুহাসকে বাধ্য হয়েই দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। কিন্তু রাধাবল্লভ তার কথা শুরু করতে পারে না। মজুররা লাল ঝাণ্ডা তুলে 'জিন্দাবাদ' 'জিন্দাবাদ' শ্লোগান দিযে এগিয়ে আসে বড় আলটার ওপরে। তারপর সুহাসের উদ্দেশে আওয়াজ তোলে, 'খাশ জমিনকো সেটেলমেন্ট করনে হোগা, করনে হোগা', 'খাশ জমিনমে আধিয়ারি নাহি চলে গা, নাহি চলে গা', 'বামফ্রন্ট সরকারকো কানুন মাননে হোগা মাননে হোগা।'

রাধাবল্লভকে বুদ্ধিমান জিজ্ঞাসা করে, 'কমরেড, রিশিকেশকে ডাকিব ?'

'ডাকো ডাকো, সগাক ডাকো, খবর দাও', রাধাবল্লভ চোখ না খুলে বলে। বুদ্ধিমান ভিড়টার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে মাঠ বরাবর ছুট দেয—'লড়াই বান্ধিবে—।' পেছনে শ্রমিক আব সামনে কৃষক নিয়ে সুহাস মাঝখানে। পেছনের শ্লোগান থামলে সে রাধাবল্লভকে বলে, 'দেখুন, আমি ত সার্ভে করতে এসেছি। আপনাদের জমি আমরা মাপব না, এ নিয়ে আর কী বক্তব্য আমি শুনব ? শুধু সার্ভে নিয়ে কেউ কিছু যদি চলতে চান, বা, উত্তরাধিকাব বা অংশ নিয়ে, দখল নিয়ে, সেইগুলো শুনতে পারি।'

সুহাস আগেই আন্দাজ করেছিল যে এই দলেব সবাই একটা এলাকায় এক লপ্তে খাশজমি দখল করেছে। তাতে প্রায় প্রত্যেকেরই নিশ্চয় এক-দেড়-দুইহাল জমি আছে। এখন মাপামাপি করতে গেলে সেটা ধবা পড়বে। তখন ভেস্ট জমি আবাব ভেস্ট হবে। তাই এরা প্রথম থেকেই আওয়াজ তুলেছে জমি মাপতে দেবে না। খাশজমি দখলে রেখেছে যে-কৃষক সে ত বরং তাড়াতাড়ি রেকর্ড করাতে চায়। গবমেন্ট অর্ডার প্রথমে ছিল, খাশজমি মাপা হবে ও দখলদারদেব নাম বেকর্ড হবে। পরে অর্ডার এসেছে, এখন ও-সবের দবকাব নেই। দ্বিতীয় অর্ডারের কারণ নিশ্চযই এই রকমই আরো সব ঘটনা।

এতক্ষণ আনন্দপুরের এস্টেট অফিসাবে নথিপত্র আর মৌজা ম্যাপ দেখে সুহাসের এই ধারণাটাই প্রমাণিত হযেছে। চা-কোম্পানির মতলবও সুহাস বুঝতে পেরেছে। কিন্তু, সেই বিবাদ-মীমাংসায় তার কোনো ভূমিকা নেই। বরং সে একটু বিবক্তই হয, বিনোদবাবু তাকে না বলে এই জমিতে চেইন ফেলে প্রথম দিনই এ-রকম একটা গোলমাল বাধালেন কেন ?

যে-দলটা ঢালটাব ওপব এসে দাঁড়িযেছিল, তারা কিছুটা চুপচাপই সুহাস ও বাধাবল্লভের কথা শুনছিল। সুহাসের কথার পর চা-বাগানেব শ্রমিকদের দলের ভেতর থেকে বক্তৃতা শুরু হয়ে যায়, 'সাথিমন, চা-বাগানকো লেবারলোক অউর কিষানলোক দুষমন নাখে। ভাই-ভাই হায। সাথি-সাথি হায। এককো দুখ অউবকো বুঝনা পডলেক। নাহি বুঝলেঁ তঁ মালিকমন মজুরকো অউর কিষানকো খতম করনে পড়ে। লেকিন সাথিমন, হামার এই ক্ষেতিপব এক খারাপি কাম হলেক, কী, না, চিয়া-বাগানকো ভেস্ট ল্যাণ্ডপর কিষানলোকোঁ জববদখল কায়েম করতা থে। এতনা জবর দখল যে ই গবমেন্টকো সেটেলমেন্ট ভি উ হোনা নাহি দেগা। লেকিন বামফ্রন্ট সরকার জনগনকো সাথি সরকার হ্যায়। ইসকো সব কাম ঠিক-ঠিক করনা পড়েক। ত হাম বলে কি, সবক... যো অফিসার হ্যায়, হিঁয়া, উ অফিসারকো সবকাবকো কানুন ত সাফ-সাফ করনে হোগা। হামনিমনকো ই ডিম্যান্ড হ্যায় কি যো ই-ভেস্ট জামিনকো পুরা মাপ করনে হোগা, অউর কোন কো পাশ কেতনা জমিন হ্যায় ইসকো লিস্ট বাহার কবনে হোগা। সাথিমন, মজুরোঁ অউর কিষানোঁ দুষমন নাখে। মজুরকো ইউনিয়নকো লালঝাণ্ডা লাল, লাল পার্টি আর কিষান সমিতিকো ভি ওহি ঝাণ্ডা ওহি পার্টি। হামলোগ সাথি হ্যায়। উ হি দফে হামনিমন কি ডিম্যান্ড ই হায় যে সব খাশজমিকো তালাশ করনে হোগা, করনে হোগা। ই অফিসারলোগো অউর জোতদারলোগোকো যো কলকব্জা হোতা হ্যায়, যো-ক্যাপাসিটি হোতা হ্যায় উ খতম করনে হোগা। ইনকিলাব জিন্দাবাদ।' ফাগু উরাওঁ বক্তৃতা শেষ করে আবার শ্লোগান দেয়, 'ই-ন-কি-লা-ব।' কিন্তু এই শ্লোগানের জবাবে কোথায় যেন একটা মজাও মিশে থাকে। মদেশিয়া মেয়েদের অকারণ হাসিতে শ্লোগানের সুরটা রিনরিন বেজে ওঠে, বাজতে থাকে। তাতে শ্লোগানের একটা আদিবাসী ধরন ধরা পড়ে—কোনো কিছুই যেন গান ছাড়া বা নাচ ছাড়া হয় না, তেমনি আবার সন্দেহও উঁকি দেয় এই শ্লোগানের দল লড়াইয়ে আসে নি, এই শ্লোগানটার আদায়-অনাদায়ের সঙ্গে তাদের বাঁচামরার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই।

সুহাস রাধাবল্লভের দিকে পেছন ফিরে, বাগানের দলকে বলে, 'আপনাদের এস্টেট অফিসারকে আসতে বলুন।'

'কৌন কো ?'

'এস্টেট অফিসার, এস্টেট অফিসার, আমাদের সঙ্গে যিনি কথা বলছিলেন, ওখানে।'

ফাগু হুকুম দেয়, 'বীরেনকো বোলো, বীরেন এস্টেট অফিসার।'

'হো বীরেনবাবু, বীরেনবাবু হো—অ', ডাকটা বাগানের দলটার সামনে থেকে পেছনে চলে যায়।

রাধাবল্লভের দিকে তাকিয়ে সুহাস বলে, 'দেখুন, এখন ত আমাদের রোজই সার্ভে করতে হবে। কাজটা তাড়াতাড়ি না হলে ত আপনাদেরও অসুবিধা। কিন্তু এ-সব হাঙ্গামা ত আমরা মেটাতে পারব না, মানে আমাদের ত এটা কাজ নয়।'

'কী আপনাদের কাজ নয়, স্যার, বামফ্রন্ট সরকার জনগণের বন্ধু সরকার সুতরাং—'

'না। সে ত ঠিক আছে—কিন্তু যার যা কাজ সে ত তাই করবে, আমি ত আর ধরেন·ফরেস্ট রেঞ্জারের কাজ করতে পারব না, এটা আমাদের, মানে সেটেলমেন্টের কাজ নয়।'

'কোনটা স্যার আপনাদের কাজ নয়?'

এই যে, এই খাশজমি এক-একজন কতটা করে দখল করছেন, তাঁরা পাবেন নাকি চা-কোম্পানি পাবে, এটা ত আমরা ঠিক করতে পারব না।'

রাধাবল্লভ বলে, 'স্যার, আপনি যদি আমাদের মাপতে চান, চলুন স্যার মাপিবেন, আমরা চেইন ঘাড়ে করি আপনাকে মাপি দিব। মাপাই ত আপনার কাজ। আমরাও মাপাই চাই।'

'শুনুন, এই ভেস্ট জমিগুলো ত দাগে-দাগে মিলিয়ে সরকার মেপে তবে দখল নিয়েছে, আমরাই নিয়েছি, সুতরাং এই জমির খানাপুরী-বুঝারতের কাজ হয়ে আছে, আমাদের মৌজা ম্যাপেই আছে। আর, কার দখলে কে কতটা রেখেছেন সরকার তা রেকর্ড করতে নিষেধ করেছেন। অনেক জায়গায় তার একটা লিস্টি আমরা নিয়েছি। যদি সরকার চায়, আমরা জমা দেব। আপনারা যদি চান, সে-রকম একটা লিস্টি বানিয়ে আমাকে দিতে পারেন।'

ভগত বলে, 'সে আমরা লিশ্চয় দিব স্যার, আপুনি চাহিলে দিব স্যার, আমরা ত সরকারের সাহিত বন্দোবস্তই চাহি স্যার, কিন্তুক খাশ জমি মাপিবার দফে বাগানের মজুরদের দাবি কেন স্যাব, ই মাপামাপিতে ওদের ত কুনো ফায়দা নাই। না কি, ঐ বীরেনবাবুকো মারফৎ কোম্পানি দাঙ্গা বাধাবাব ধরলেক, স্যার।'

'আপনি কি আমাকে ডেকেছেন?' বীরেনবাবু ঢালের ওপর থেকে বলেন, নীচে নামেন না। সুহাস অপেক্ষা করে উনি নামবেন, কিন্তু বুঝে যায় নীচে কৃষক সমিতির লোকজনের ভেতর নামতে তাঁর ভয় হচ্ছে। সুহাসের এই অপেক্ষা আর বোঝার মাঝখানেব ফাঁকটুকুতে রাধাবল্লভ বলে, 'স্যাব, এই বীরেনবাবু লোকটা আমাদের ফরেস্টের ভিতর নানান কথায় ভুলাইয়া রাখি এই সব আমিনবাবুর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া এইঠে চেইন ফেলিছে আর এ্যালায় বাগানিয়া মজুব আউর বস্তির কৃষকের ভিতর দাঙ্গা বাঁধিবার তাল করিছে।'

বীরেনবাবু ওপর থেকে চিৎকার করে ওঠে, 'রাধাবল্লভ, বি কেয়ারফুল—' সেটাও একটা শ্লোগানের মত শোনায়। বাগানের দল যেন তার জবাবেই বলে ওঠে, 'নাহি চলেগা, নাহি চলেগা।'

সুহাস কৃষক সমিতির দিকে পেছন ফিরে বীরেনবাবুকে ধমকে বলে, 'শুনুন, আপনার ত এখানে কোনো ইন্টারেস্ট নেই, তবে আপনি কেন আমাদের কাজে এত ইনভলভড্ হচ্ছেন আর একটা ল-অ্যান্ড-অর্ডার সিচুয়েশন তৈরি করছেন?'

'আমি আপনাদের কাজে কোনো ভাবেই বাধা দেইনি।'

'আপনি ত এঁদের সঙ্গে একটা কমপ্রোমাইজের চেষ্টা করছিলেন যখন এখানে চেইন পড়েছে'—আর ঠিক তখনই কৃষক সমিতির দলটা পেছন থেকে আচমকা 'জিন্দাবাদ' শ্লোগান তোলে আর হাঁকার দিতে-দিতে হৃষীকেশ আর বুদ্ধিমান পেছন থেকে ছুটে আসে।

সাঁইত্রিশ

কৃষক-মজুর : সম্মুখসংগ্রাম

হৃষীকেশ মৌজ করে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছিল। কিন্তু চরের দলটা প্রায় একসঙ্গে দাঁড়িয়ে ওঠে। তারপর হৃষীকেশকে বলে, 'হালায় আর সিগারেট ফুঁইকতে হবে না, তাড়াতাড়ি দৌড় লাগা। আনন্দপুরের জমিতে কাইজ্যা লাইগ্যা গিছে। চল্—চল্।'

হৃষীকেশ লাফিয়ে ওঠে। কেমন বিহ্বলের মত চারদিকে একবার তাকায়—তাদের দলের কেউই নেই। যারা এতক্ষণ গান শুনছিল তাদের কেউ-কেউ চায়ের দোকানটার কাছে, জ্যোৎস্না আমিনের সামনে কয়েকজন। অনেকে সোজা সেই হাতির রাস্তা ধরে উত্তরে আনন্দপুরের দিকে যাচ্ছে বেশ তাড়াতাড়ি, যেন এখানকার গানের পালার শেষে ওখানে আরো লম্বা পালা আছে। হৃষীকেশ কয়েক পা আস্তে-আস্তে হাঁটে। আবার আশেপাশে তাকায়। সে যেন বিশ্বাসই করতে পারে না তাদের দলের কেউ নেই। চরের দলের কেউ-কেউ তাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যায়। হৃষীকেশ পেছন ফিরে একবার তিস্তার দিকে তাকায়। সেই চেয়ারটা খালি পড়ে আছে, আর একটু দূরে সেই টেবিলটা। হৃষীকেশের এটা বুঝে নিতেই একটু সময় লাগে, যে-ভিড়টার মাঝখানে সে এতক্ষণ ছিল, সে-ভিড়টাতে সে এখন নেই। সিগারেটটা এতক্ষণ টানে নি। এইবার জোরে-জোরে দুটো টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। চায়ের দোকানটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'আরে, এই, কী হইছে ?' ভিড়টার ভেতর থেকে একজন চেঁচিয়েই জবাব দেয়, 'জানি না কী হবার ধরিছে—সগায় ত ঐঠে, হাকিম আমিন সগায়, শুনিবার পাছ তোমরালার সমিতির তানে বাগানের মদেশিয়াগিলার মারামারি হবার ধরিছে।'

'অ্যাঁ ?'—এই একটি কথাতে হৃষীকেশ সম্বিৎ ফিরে পায়। এ-রকম একটা মারামারি লাগার আশঙ্কা ত সব সময়ই থাকে। আজ সার্ভের ব্যাপার নিয়েই সেটা লেগে যেতে পারে। কিন্তু হৃষীকেশ ছাড়া মারামারি হবে কী করে ? হৃষীকেশ সঙ্গে-সঙ্গেই দৌড়তে শুরু করে, যতটা জোরে পারে। কমরেড ত আর মারামারি করতে পারবে না। আলবিশও পারবে না। আর ত সব চ্যাংরাছোঁড়ার দল। তাদের কী করতে হবে, সেটা হৃষীকেশ ছাড়া আর-কেউ ঠিকই করতে পারবে না। এক বুদ্ধিমান আছে। কিন্তু বুদ্ধিমান ত একা পড়ে যাবে। হৃষীকেশ চরের লোকগুলোকে পেরিয়ে চলে যায়। 'এই খাড়া খাড়া, চল্, আমরাও ত যাচ্ছি।' হৃষীকেশ দাঁড়ায় না, দৌড়তে-দৌড়তেই ভাবে বাগানের মদেশিয়ারা যদি বস্তির মধ্যে এসে ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে থাকে ? তাহলে ত··· ! হৃষীকেশ আন্দাজের চেষ্টা করে চিয়াড়ি [তীর-ধনুক] চালানোর মত দল তাদের ভেতর পাকাতে কত সময় নেবে। কিন্তু সবই ত নির্ভর করে কে বেশি তৈরি, তার ওপর। আনন্দপুরে সমিতির সঙ্গে মারামারি বেঁধেছে আর সে এখানে গান করছে অথচ তাকে একবার না-ডেকেই সবাই চলে গেল ! ডাকার টাইম পায় নাই ? একটা হাঁক দিলেই ত হত, হৃষীকেশ চলি আইস—এখন দৌড়তে-দৌড়তে হৃষীকেশ সেই ডাক শোনার চেষ্টা করে। না কি ডেকেছিল, হৃষীকেশ শুনতে পায় নি, আর ওরা ভেবেছে হৃষীকেশ ত আসিছেই। তাহলে ত···। না কি, কেউ বোঝেই নাই। হঠাৎ শুরু হই গিছে ? কিন্তু হৃষীকেশ ছাড়া একটা মারামারি এতক্ষণ চলছে কী করে। ততক্ষণে হৃষীকেশ আনন্দপুরের জমির কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। এই হাতির রাস্তাটা সামনে বাঁয়ে বেঁকেছে—সেই বাঁকটা নিলেই আনন্দপুরের ভেস্ট জমির এলাকা। জমির কাছে এসে হৃষীকেশ বোঝে সে এত জোরে দৌড়চ্ছে যে জমিতে পৌঁছে আর দম পাবে না। সে তাড়াতাড়ি তার দৌড়ের বেগ কমিয়ে দেয়। কমিয়ে দিতেই তার বুক আর কানের পাশের শিরার দবদব শব্দে যেন কানে তালা লাগে।

হৃষীকেশ যখন বাঁকটার কাছাকাছি তখন দেখে উল্টোদিক থেকে বুদ্ধিমান ছুটে আসছে। হৃষীকেশকে দেখে বুদ্ধিমান দাঁড়িয়ে পড়ে চিৎকার করে, 'রি-শি-কে-শ, ল-ড়া-ই, ল-ড়া-ই', বুদ্ধিমান এক লাফে নালীটা পার হয়ে জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পড়ে। সে ছোট কোঁতকার মত একটা ডাল নিয়ে আবার লাফিয়ে নালীটা পেরতেই হৃষীকেশ লাফ দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে পড়ে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে হৃষীকেশ ডালফাল কিছু পায় না। সে একটা গাছের নিচু ডালটাই টেনে নামিয়ে ভাঙে। ডালটা ভাঙে বটে কিন্তু সেটাকে গাছ থেকে ছেঁড়া যায় না। সমস্ত শরীর দিয়ে ডালটাকে টেনে নামানোর চেষ্টা করতে থাকে হৃষীকেশ। তখন

বাইরে থেকে বুদ্ধিমান ডাক দেয়, 'হে-এ হৃষীকেশ চলি আয়, চলি আয়, এই লাঠিখান ধর।'

বুদ্ধিমানের গলা শুনে হৃষীকেশ নালীটা লাফিয়ে পাব হয়ে দেখে বাস্তাব ওপব একটা সাইজমত ডাল ফেলে রেখে বুদ্ধিমান সোজা দৌড়চ্ছে। হৃষীকেশ ডালটা তুলে নিয়ে একটা বিরাট হাঁকাব তুলে 'রে এ-এ-এ' কবে সামনে হাতির রাস্তাব ভিড়টাব দিকে ছুটল। বুদ্ধিমানও হাঁকার দিতে শুরু কবেছে। আব হাতির বাস্তাটা দবদব করে ওঠে ওদের ছুটন্ত পায়ের দাপটে। সেই দৌড়ে, সেই হাঁকারে আর লাঠিদুটোর ভঙ্গিতে সামনে বুদ্ধিমানের গেঞ্জিপরা আর পেছনে হৃষীকেশের জামাপরা শরীবে পেশির যেন নর্তনও দেখা যায়।

সামনে এই হাতির রাস্তাটাব ওপরই ভিড়—সেখান থেকে ডাইনে জমি নেমে গেছে। সেখানেও ভিড়। দৌড়তে-দৌড়তে বোঝা যায় না কে কোন দিকে দাঁড়িয়ে। কিন্তু বুদ্ধিমান জায়গাটা দেখেই গিয়েছিল, তাছাড়া তারা জানেই কোন দল কোথায় দাঁড়াতে পারে। হাতির রাস্তাব ওপরের ভিড়টা ঐ দুইজনেব উদ্যত আক্রমণের সামনে ভাগ হয়ে গিয়েছিল—ওরা যাতে মাঝখান দিয়ে গলে যেতে পারে। কিন্তু তার আগেই প্রথমে বুদ্ধিমান, পেছনে হৃষীকেশ ঢাল বেয়ে নীচে নেমে যায়। সামনে একটা থকথকে কাদা জমি ছিল, লাফ দিয়ে তার আলে ওঠে। তারপর দুই-চারটা আল পেবিয়েই আবাব একটু মাঠ। ভিড়টাব কাছে ওবা ততক্ষণে প্রায় পৌঁছে গেছে। বুদ্ধিমান আর হৃষীকেশ লাঠিদুটোকে মাথার ওপর তুলে 'শা—লা, মাথা ফাটি দিম, শা—লা', বলে আরো জোরে হাঁকার তুলতেই ভিড়ের ভেতর থেকে 'ইন-কিলাব' হাঁকাব উঠে ওদের গলার সঙ্গে মিশে যায়। সব সাজিযেগুছিয়ে যেন হৃষীকেশ আর বুদ্ধিমানের জন্যই ওবা অপেক্ষা করছিল। তাদের আওয়াজ শুনেই ভিড়টা সরে তাদের ঢোকার জায়গা করে দিয়েছিল। ওরা পেছন থেকে ভিড়টার ভেতর ঢুকে পড়ে, এক লাফে বড় আলের ওপর উঠে সামনে বাগানের মদেশিয়াদের দিকে তেড়ে যায়। অত বেগে ঐ আওয়াজ তুলে মাত্র দুজনের ঐ তেড়ে আসায় বীরেনবাবু এক লাফে মদেশিয়াদেব লাইনটাব ভেতবে ঢুকে যান। তাতে আবার মদশিয়াদের ভেতর যাবা সামনে ছিল তাবা হঠাৎ দুপা পেছিয়ে যায়। তারা পেছিয়ে গেলে তাদের পাশাপাশি যারা তারাও দু-এক পা পেছিযে যায়। ফলে মদেশিযা লাইনটাই একটু বেসামাল হয়ে পড়ে। এইটুকুর অপেক্ষাতেই যেন কৃষক সমিতি ছিল। বাধাবল্লভেব চিৎকার শোনা যায়—'ই-ন-কি-লা-ব' ; একটা দীর্ঘ প্রলম্বিত 'জি-ন্দা-বা-দ' আওয়াজের সঙ্গে, যেন শ্লোগানটা শেষ করলেই দম ফুরিয়ে যাবে, কৃষক সমিতি প্রায় মিছিলেব মত করেই বড় আলেব ওপব উঠে মদেশিয়া লাইনটাব ওপর আছড়ে পড়ে। মদেশিযারা সবাইই প্রথমে এক-পা দু-পা করে, তাবপব প্রায় যেন দৌড়ের মত করেই, পেছুতে থাকে। এটা টের পেয়ে রাধাবল্লভ আবার বণধ্বনি তোলে—'ই-ন-কি-লা-ব'।

কিন্তু একেবারে আচমকা তাদেব থেমে যেতে হয়। মদেশিয়ারা পেছুচ্ছে দেখে তাদের পেছনে এক টিবির ওপব থেকে তিনজন মজুব তিনটি চিযাড়ি [ধনুক] বাগ করে ধরছে রাধাবল্লভদের দিকে। বুদ্ধিমান চিৎকার করে ওঠে, 'খববদার।' হৃষীকেশ ঘাড়টা ঘুরিয়ে তার দলের লোকদের চিৎকাব করে বলে, 'চিয়াড়ি জোতো, চিযাড়ি জোতো'। কিন্তু কৃষক সমিতি বোধহয় চিয়াড়ি বের করার সময় পায় নি। রাধাবল্লভ আর হৃষীকেশ দুজনই পেছন ফিরে আঁতিপাঁতি খুঁজে নেয়, তাদের দলের চিয়াড়ি বেরিয়েছে কি না। কোথাও খুঁজে পায় না। ওদিকে মদেশিয়াদের চিয়াড়িতে তীর লাগানো হয়ে গেছে। একমাত্র উপায় সবাই মিলে আবো জোবে ছুটে চিয়াড়ি ছোঁড়ার আগেই ওদের ওপর হামলে পড়া। বুদ্ধিমান হাঁকাব তোলে—'ই-ন-কি-লা-ব'। কৃষক সমিতির দলটা নতুন উদ্যমে ছুটে যাওয়া শুরু কবতেই—এবার আর বাঁধভাঙা বন্যার জলের মত নয়, এইবারের ছুটে যাওয়ার মধ্যে যেন মুহূর্তে একটা হিশেব হয়ে যায়, তিনটি চিয়াড়ি একবারও ছোঁড়া হলে তিনজন মারা যাবে, ওদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছুতে কবার ছুঁড়তে পারবে, কত জন মারা যাবে—আলবিশ ভগত পেছন থেকে দৌড়ে সামনে এসে মদেশিয়াদের দিকে মুখ করে দুই হাত ওপরে তুলে দাঁড়িয়ে পড়ে। কৃষক সমিতির দলটাও সঙ্গে-সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ে, বুক চিতিয়েই, আলবিশের ভঙ্গিতেই।

আলবিশের তখন চোখ দুটো আরো বড় হয়ে গেছে, কপালের লাইনগুলো যেন আরো গভীর, বাবরি চুল থোকা-থোকা ঘাড়ের ওপর আর হাঁ করে থাকায় তার বড়-বড় দাঁত, পান-খাওয়া লাল জিভ বেরিয়ে এসেছে।

সামনে টিবির ওপরে যারা চিয়াড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তারা চিৎকার করে ওঠে, 'ভগত, তফাত হো।'

কিন্তু ভগত তফাতে যায় না, কোনো কথাও বলে না। আলবিশ ওঁরাও, ওদের একটা গোত্রের একটা অংশের পুরোহিত। কিন্তু পুরোহিত ত পুরোহিতই। ভগত ত ভগতই। কৃষক সমিতি হলেও ভগত। লালঝাণ্ডা হলেও ভগত। বুদ্ধিমানকে রাধাবল্লভ দাঁতে দাঁত চিপে বলে, 'বুদ্ধিমান, শ্লোগান দিও না।' চিয়াড়ির দলটা ভগতের ওপর তীর ছুঁড়তে ইতস্তত করছে, এত সামনাসামনি, যেন তাতে ভগতকেই মারা হয়। এখন শ্লোগান দিলে ওরা চিয়াড়ি ছাড়ার ছুতো পেয়ে যাবে। কিন্তু হৃষীকেশ আর রাধাবল্লভ এটাও বোঝে এখন যদি ওরা চিয়াড়ি ছাড়েই তাহলে তিনের বদলে ত্রিশ জন মারা যাবে। এখন আর ছুটে গিয়ে ওদের ওপর হামলে পড়া যাবে না। আর কৃষক সমিতির সবাই যেমন লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাতে চিয়াড়ি ছাড়লেই তিনজন পড়বে। সামনে দৌড়তে-দৌড়তে চিয়াড়ি বা গুলি খেলেও দল সামনেই ছোটে। কিন্তু দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে একজন মারা গেলে, পুরো দল পেছন ফিরে দৌড়বে। তখন একের পর এক পড়তে থাকবে। রাধাবল্লভ আর হৃষীকেশ তাদের বুকের আর কপালের শিরার দবদব শব্দে যেন হিশেব কষে যায় জনা দু-তিনের মৃত্যুতে তারা যেটা জিততে পারত, কতজনের মৃত্যু দিয়ে সেটা এখন হারতে হবে। বুকের এক-একটা আওয়াজে যেন এক-একজন করে মরছে।

কিন্তু আলবিশ কিছু একটা টেব পায়। সে তার ওবাওঁ স্বভাবে বুঝে যায়—চিয়াড়ি-ছাড়াব চবম সময়টা পেরিয়ে গেল—এব পর আর চিয়াড়ি ছোঁড়া যায় না। কিন্তু দলটা, তৈরি চিয়াড়ি নামাতে পারছে না—তাতে তাদের হার মেনে নেয়া হয়। আলবিশ ঝট করে মদেশিয়াদের দিকে পেছন ফিবে দুই হাত তুলে কৃষক সমিতির দলকে চিৎকার করে বলে, 'বৈঠ করো, সবকোই বৈঠ করো, বৈঠ করো।' রাধাবল্লভ আর হৃষীকেশ সবচেয়ে আগে বসে পড়ে। তারা পেছন থেকে টেনে বুদ্ধিমানকে বসায়। কৃষক সমিতির দল হুডমুড করে বসে পডতে থাকে। আলবিশ ছাডা।

আটত্রিশ

কৃষক মজুর : ঐক্যের সংগ্রাম

মাঠেব ভেতর সুহাস একা দাঁডিয়ে।

সদ্যরোয়া ধানখেত তখন পায়ে-পায়ে কাদা। চাবাগুলো কাদাব মধ্যে ঢুকে গেছে। এত মানুষের পা এই খেতটুকুকে দলেছে যে মাটির ভেতরেব জল ওপরে উঠে এসেছে। সেই কাদাগলা জলে কিছু চারা ধান ভাসছে।

সার্ভের লোহার চেইনটা লম্বা হয়ে পড়ে আছে—ওদিকে সবুজ মাঠের ভেতর থেকে এখানে কাদামাটির ভেতব দিয়ে, ওদিকে হাতির রাস্তা পর্যন্ত।

বড় আলের নীচে সুহাস একা দাঁড়িয়ে জমিমাপার চেইনটা উদ্ধারে ব্যস্ত। তার কথার মাঝখানে চিৎকার করে দুজন ঢুকে পড়ার পর যে-কাণ্ড শুরু হল—দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া সুহাসের কিছু করার ছিল না। কিন্তু সিনেমার মত দেখেও সুহাস ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না ওরা কি বুড়ো সাঁওতালকে দেখেই তীরধনুক নামিয়ে নিল, নাকি ভয় দেখানোর জন্যই তুলেছিল, ছোঁড়ার জন্য তোলে নি।

আজ থেকে মাত্র বছর দশ আগে ধনুক, সাঁওতাল, আদিবাসী, জমিন, লড়াই, 'টোটা', 'তীর'…এই সব নিয়ে সুহাস যা-যা শুনত, ভাবত, দেখত, সে-সব এখনই তার ওপর দিয়ে ঘটে গেল, ঘটে যাচ্ছে। অথচ এই ঘটনার একেবারে কেন্দ্রবিন্দু হয়েও সেই অতীতের, মাত্র বছরদশেকের অতীতের, কোনো ঝিলিক তার মনে কোথাওই খেলে গেল না। এতগুলো আদিবাসী মুখের ভিড় সত্ত্বেও না।

তাহলে, হয়ত বছর দশেক পরে স্মৃতিতে আজকের এই ঘটনাটায় সেই রূপকথা আবার ঝিলিক দিয়ে উঠবে, স্মৃতিতে এই ভিড়টাকে চেনা যাবে—আদিবাসীর, এই লড়াইটাকে চেনা যাবে—জমির। দশ বছর অতীতের স্বপ্ন আর দশ বছর পরের সম্ভাব্য স্মৃতির ভেতর বর্তমানে সুহাস বাঁয়ে তাকিয়ে দেখে

বিনোদবাবু, অনাথবাবু, প্রিয়নাথবাবু হাতির রাস্তা থেকে তার দিকে আসছেন। সুহাস এগিয়ে যায়, লাফিয়ে আলের ওপর ওঠে। তারপর ওদের দিকে হাঁটে। দূর থেকে বিনোদবাবু জিজ্ঞাসা করেন, 'স্যার, আপনার কিছু হয় নি ত ?'

'না, তা হয় নি, কিন্তু আপনারা চেইন ফেললেন, অথচ এতক্ষণ ছিলেন কোথায় ?'

'স্যার, যে-রকম মারামারি দেখলাম, আমরা আর সাহস পেলাম না—'

'না।.আমার জন্য বলছি না। কিন্তু চেইনটা গোটাতে হবে আপনাদের। আর আমি বুঝতে পারছি না বিনোদবাবু, চেইনটা এই জমিতে ফেলতে কে বলল।'

'কেন স্যার। আমরা ত পর-পর করে যাচ্ছি—'

'না। তা ত করে যাচ্ছেন। এটা ত আর বর্ডার লাইন নয়, একেবারে ভেস্টেড ল্যান্ডের মাঝখানে। আমরা ত ভেস্টেড ল্যান্ড মাপছি না, মাপার কথাও নয়।'

'আমি ত দেখি নি স্যার, কী প্রিয়নাথ, তোমরা—' বিনোদবাবু বলেন। প্রিয়নাথ উত্তর দেয়, 'আমরা ত আর দাগ নম্বর চিনি না স্যার, আমরা যেমন লাইন বেঁধে চেইন টানছিলাম তেমনি টানছি।'

অনাথ লাফিয়ে নেমে চেইন গুটোতে শুরু করে।

সুহাস ওঁদের তিনজনের দিকেই তাকিয়ে বলে, 'দেখুন, এ-রকম ভুল যেন আর না হয়, এত গোলমাল বেধে গেল এই এক কাণ্ড থেকে।'

বিনোদবাবু একটু চুপ করে থেকে বলেন, 'আপনি কিছু বলছেন স্যার ?'

'না। তেমন কিছু হলে ত বলতামই, তবে এ-রকম অদ্ভুত ভুল হওয়া ত নিরাপদ নয়।'

'সে ত স্যার আজকে একটা আপনার ডেনজারই হয়েছিল। তা হলে এখন ত ক্যাম্পে ফিরব স্যার ?'

'হ্যাঁ চলুন।'

আগে আগে সুহাস ও পেছনে-পেছনে বিনোদবাবু ফেরা শুরু করতেই 'স্যার', 'স্যার' বলে পেছন থেকে হাঁকাহাঁকি শুরু হয়। সুহাস দাঁড়িয়ে পড়ে। রাধাবল্লভ, সেই বুড়ো সাঁওতাল, হাফপ্যান্ট-পরা একজন নিশ্চয়ই বাগানের, আর তাদেরও পেছনে বীরেনবাবু, ওপব থেকে এই আলে নেমে এদিকে আসছে। কাছাকাছি এসে রাধাবল্লভ, বলে, 'স্যার, আমরা ত আপনার জন্য বসি আছি স্যার!'

'আমার জন্য কেন ?'

'না, আপনি তখন কী একটা কথা বলছিলেন, তার ভেতর একটা মিস-আন্ডারস্ট্যানডিং মানে, ওরা দুজন, হৃষীকেশ আর বুদ্ধিমান', বীরেনবাবু বলেন। সুহাস বুঝতে পারে ওদের যুদ্ধের সমাপ্তিঘোষণার একটা উপলক্ষ চাই। তা হলে দুই পক্ষেরই একটা যুক্তি জোটে যে সরকারি অফিসারেব কথা-অনুযায়ী তারা আপস করছে। নইলে তাদের নিজেদের ওপবই জয়-পরাজয় নির্ধারণের দায় চাপে।

সুহাস বলে, 'আমি ত আমার চেইন উদ্ধার করতে গিয়েছিলাম। এখন ক্যাম্পে ফিরে যাব। আপনাদের কি মিলমিশ হয়ে গেল ?'

ফাগু একটু হেসে বলে, 'মিলমিশ তো হোনা হোগা, কিষান অউর মজদুরকো এক পার্টি, এক ঝাণ্ডা। কিষান অউর মজদুরকো একাই—'

ফাগুকে থামিয়ে দিয়ে ভগত হাতিরাস্তার দিকে তাকিয়ে বলে, 'আরে, এম-এল-এ আসি গেলাক, এম-এল-এ।'

সকলেই ঘুরে দেখে।

বিনোদবাবু বলেন, 'আমরা তা হলে এগোই স্যার। আপনি—'

সুহাস দাঁড়িয়ে থাকে। এম-এল-এ এসে গেলে সে আর যায় কী করে ?

উনচল্লিশ

এ কি কৃষক না মজুর ?

বড় আলপথটা দিয়ে বীরেন্দ্রনাথ রায়বর্মন এম-এল-এ আসছে—ধুতি-পাঞ্জাবিতে বেঁটেখাঁট মানুষটির চলনে কোনো জড়তা নেই। পেছনে গয়ানাথ। গয়ানাথের পেছনে সেই সার্ভে ক্যাম্পের চেয়ার উল্টো করে মাথায় নিয়ে বাঘারু।

এম-এল-এ-কে দেখা যাওয়ায় ওপরেব লোকজন সব উঠে দাঁড়িয়েছে ও মারামারি হতে-হতে না-হওয়ার ফলে যে-একটা সাজানোগোছানো ভাব এসেছিল সেটা ভেঙে গেছে। ওদের কাছাকাছি আসতেই গয়ানাথ পেছন ফিবে বাঘারুকে বলে, 'যা, ঐ দিক দিযা উঠি আগত চেয়ারখান পাতি দে।'

বাঘারু আল থেকে লাফিয়ে নীচে নামে, সেই বিধ্বস্ত ধানখেতে, তারপর ছোট আল দিয়ে এগিয়ে আবার বড় আলে উঠে, ঐ ভিডটার কাছে পৌছয়। বাঘারু ভিড়ের পেছন দিয়ে ঢুকেছে। আর ভিড়টা সোজাসুজি এম-এল-এর দিকে মুখ করে আছে। ফলে, বাঘারুকে পেছন থেকে চেয়ারটা মাথায় নিয়ে ঠেলে-ঠেলে একেবাবে ও-মাথায় ভিড়টাব সামনে গিয়ে পৌছতে হবে, এম-এল-এ ওখানে পৌছনোর আগেই। এদিকে ভিডেব পেছন থেকে বাঘারু যাকেই ঠেলা দেয সেই 'হে-ই' বলে চিৎকার করে ওঠে। ঢোকবার জাযগা আব বাঘারু পায না। কিন্তু সে দেখতে পাচ্ছে 'এমেলিয়া' ওদিক দিয়ে উঠতে শুরু করেছে। বাঘারু এতক্ষণ চেয়াব মাথায় ঢোকবাব পথ খুঁজছিল, কারণ ফাঁক না পেলে লোকজনের মাথায-ঘাড়ে চেয়ারের ধাক্কা লাগতে পাবে। কিন্তু এখন, যখন দেউনিয়া 'এমেলিয়া'কে নিয়ে প্রায় পৌছে গেছে তাব আর-কিছু করাব থাকে না। সে চেয়াবটা মাথা নিয়েই পেছন থেকে ঢুকে পড়ে। 'হে-ই, হে-ই', 'কায় রে' হেই, হেই', বলতে-বলতেই একটা গোলমাল পড়ে যায়। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই সবাই তাকিযে চেযাবটা দেখে ফেলে সবে ফাঁক করে দেয়। লোকজন পেছনে চেয়ারের দিকে একবার আর সামনে এম-এল-এব দিকে একবাব ঘাড ঘোরায। বাঘারু যখন প্রায় হাত দুয়েক দূবে, তখন এম-এল-এ দাঁডিয়ে পডেছে, আব, হাত দুয়েক দূব থেকেই বাঘারু চেয়ারটা মাথা থেকে নামিয়ে হুমড়ি খেয়ে এম-এল-এর সামনে চেয়াবটা মাটিতে রাখে। এম-এল-এই আচমকা দুপা পেছিয়ে যায়।

'শালো, বলদ, চেয়ারের ওপর মানষি বসিবে, না মানষির উপর চেয়াব ফেলাছিস ?' চেয়ারটার মাথায় হাত দিয়ে এম-এল-এ দাঁড়ায় আর বাঘারু যেখানে দাঁড়িয়ে চেয়ারটা নামিয়েছিল সেখানটাতেই দাঁড়িয়ে থাকে—তাব নেংটিপরা ঢ্যাঙা শরীরটা নিয়ে। যদি বাঘারু ছোটখাট হত, বা অন্তত একটু রোগা, ভিড়ের ভেতর দাঁড়ালেও যদি ওকে দেখা না যেত, যদি মিশে যেত ভিড়ের সঙ্গে, তা হলেও তাকে খেয়াল না করে থাকা যেত। কিন্তু এই বাঘারুটা ত একটা পুরনো [illegible]ল-গাছের মত—তার শ্যাওলা-ছাতাধরা শরীরে সবাইকে আড়াল করেই তাকে দাঁড়াতে হয়। এমন-কি তার নেংটিটাও তার শরীবের সঙ্গে এমনই মিশে আছে যে বাঘারু যেন সত্যি একটা গাছই। কৃষক-মজুরের সমাবেশেও বাঘারু বেমানান। এখানে চা-বাগানের মজুববা আছে। তাদের হাফপ্যান্ট, গেঞ্জি। কারো-কারো নাইলনেরও। মাথায় তেল ও কাল চুল আঁচডানো। ধুতি পরাও যারা, একটু বয়স্ক, তাদের খাকি হাফশার্ট আর ধুতি ফর্শাও বটে। এখানে কৃষক সমিতির দলের সবাই হৃষীকেশ নয়, এমন-কি বুদ্ধিমানও নয়। আলবিশই আছে—তার পরনের কাপড় ত প্রায় নেংটিই, এত খাটো। কিন্তু তারও তৈলাক্ত বাবরি ঘাড়ের ওপর দোল খায়। অথচ এত বড একটা বাঘারু, তার শরীরের চামড়া গাছের বাকলের মত, মুখ-চোখে কোনো ভাষা নেই, মাথার চুলের আলাদা রং নেই। সত্যি এখানে চলে না। এখানেও চলে না।

'হে-ই বাঘারু, সরি যা কেনে।'

'হে পাহাড়টো, তফাত হো ভাই।'

'হে-ই—'

বাঘারু টের পায় না। আর তখন এম-এল-এ, তার একেবারে নাকের সামনে এ-রকম একটা প্রাচীরের মত লোক খাড়া থাকায় দু-বার গলা খাকারি দেয় কিন্তু কিছু বলতে পারে না। গয়ানাথ পেছন থেকে এম-এল-এর পাশে এসে আঙুলটা তলার খেতের দিকে দেখিয়ে বলে, 'হে-ই বলদখান, ঐঠে

গিয়া খাডা, খাডা থাকিবু।'

বাঘারু সঙ্গে-সঙ্গে সোজা হেঁটে এম-এল-এর পাশ দিয়ে, গয়ানাথের পেছন দিয়ে পরে আরো দু-একজনকে ঠেলা দিয়ে নীচে নেমে যায়। তার চেহারাটাই এমন যে অনেকখানি জায়গা না-হলে তার চলে না। ফলে, সে চলে যাওয়ার পর অত মানুষজন সত্ত্বেও জায়গাটা একটুক্ষণের জন্য একটুখানি খালি-খালি লাগে।

সেই সুযোগটা নিয়ে সুহাস এম-এল-এব সামনে এসে মনস্কার করে বলে, 'আমি এখানকার হলকার চার্জে—'

'আচ্ছা, আচ্ছা, আপনারা ত হাটে ক্যাম্প করেছেন, দেখে আসছি, এইখানে কোনো প্রবলেম নাই ত ? শুনলাম কি মারামাবি নাকি—'

সুহাস তাড়াতাড়ি 'না, আমার কোনো প্রবলেম নেই', বলে সবার দিকে মুখ ঘুরিয়ে যোগ করে,' এঁদের যদি কিছু থাকে এঁরা বলবেন। আমি তা হলে যাই, আমাদের ক্যাম্পের লোকজন ওয়েট করছেন, ওঁদের ত আবার গিয়ে রান্নাবান্না—' 'হ্যাঁ, হ্যাঁ', এম-এল-এ ঘড়ি দেখে, 'দুটা ত প্রায় বাজে। আমিও ত বসতে পাবব না। আমি যাব সেই ফুলবাড়ি বস্তি, মাঝখানে ফরেস্ট, তাড়াতাড়ি যাওযা লাগবে, ঐখানে একটা ক্যালভার্ট নিয়ে গোলমাল।'

'বাগানের জিপটাকে খবব দিচ্ছি', বীরেনবাবু বলেন।

'ফুলবাড়ি বস্তিতে জিপও যায় না। নদী আছে, হাঁটতেই হবে। আর আপনাদের জিপগাডি বেশি চডলে হাঁটা ভুলে যাব। তারপব আপনারা যখন জিপ দেবেন না— ?' এম-এল-এ হাসে। সুহাসের সন্দেহ হয়, আসলে লোকটা বাগানের জিপের খোঁজেই এসেছিল, অন্তত নদী পর্যন্ত যেতে পারত, কিন্তু এখন আর জিপ নেয়া যায় না। এম-এল-এ যখন, জিপ নেবেই-বা না কেন ?'

'কিন্তু আপনি আমাদের এইখানে ক্যাম্পে হাত পুডাবেন রান্না করে, সে ত আমাদের দুর্নাম।'

'না, না, ঠিক আছে, আচ্ছা, আমি যাচ্ছি, নমস্কার।'

'হ্যাঁ, নমস্কার।'

এইবাব এম-এল-এ সোজা তাকিয়ে বলে, 'শুনেন, আমাদের সরকারের আমলে অন্তত আধিয়াব-বেকর্ডটা করে ফেলার জন্য এই সেটেলমেন্টের ব্যবস্থা। জলপাইগুড়িতে তিস্তা ব্যারেজের জন্যে এই এলাকাব সেটেলমেন্ট অত্যন্ত দবকার। এখন আধিয়ার মানে যে আধিয়ারই, তা ত নাও হতে পারে। কিন্তু চাষটা কে করে সেইটা রেকর্ড হওয়া দরকার। সেটা অনুমতি দং-এও যদি হয়, হোক। কিন্তু হোক। কিন্তু এই সব নিয়ে নানারকম গোলমাল বাধাবার চেষ্টা হচ্ছে। এখন আমাদের মধ্যে যদি গোলমাল থাকে, মারামাবি থাকে সে-সব পবে মীমাংসা করা যাবে। এখন আপনারা গোলমাল করবেন না। কী বাধাবল্লভদা—'

রাধাবল্লভ হেসে, চোখ বুজে, ঘাড় কাত করে থাকে। তারপর বলে, 'কথাটা হচ্ছে, আপনি আসছেন এ ত আমাদের সৌভাগ্যের কথা। কিন্তুক আপনি ত থাকিতে পারিবেন না। একদিন আসেন আমাদের এইখানে, বসি আমাদের সব সমস্যা শুনেন, মীমাংসা করি দেন, তা হলি আর মারামারি হবে না।'

'হ্যাঁ। সে একদিন তাহলে, আপনাদের সুবিধেমত একদিন, যখন আমাদের সেসন বন্ধ, ঠিক করে বসলেই হবে।'

'আমাদের ত রোজই সুবিধা। আপনি সময়সুযোগ করি আসিবেন, আগে খবর দিবেন আর একদিন পুরা দিন পুরা বাত থাকিবেন। আসিলেন আর গেলেন এ্যানং নয়।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে, আমি জানাব' চেয়ারের মাথা থেকে এম-এল-এ হাতটা তোলেন, 'কী ফাগু, তাহলে আমাকে ত আজ আবার ফুলবাড়ি যেতে হবে।' গয়ানাথ পাশ থেকে সরে নেমে যায়।

'উত ঠিকো বাত খে, সব করনে হোগা', ফাগু মাথা নাড়ে।

'কিন্তু কথাটা হচ্ছে আপনার বোধহয় আর-একটা বিষয় একটু জানা ভাল', রাধাবল্লভ বলে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলেন, বলেন', এম-এল-এ এক পা এগিয়ে আসে।

'কথাটা হচ্ছে বাগানের, চা-বাগানের, কোম্পানি কোন অফিসার রাখবে, তার কী কাজ হবে, সেই সব ত আমাদের বিবেচনার বিষয় নয় কিন্তু একটা কথা আপনি কোম্পানির সঙ্গে করিবেন যে, কী যেন, এস্টেট অফিসারের কাম কী ইউনিয়ন করা ?'

বীরেনবাবু সামনেই ছিলেন, এম-এল-এব পাশে। তিনি হঠাৎ চাপা গলায় বলে ওঠেন, 'হাইলি অবজেকশনেবল। ফাগু—'

ফাগু ব্যাপারটা ধরতে পারে না। সে মাথাটা নাড়ায়। এম-এল-এ গলাটা একটু বাড়িয়ে অন্য গলার স্বরকে চাপা দিয়ে বলেন, 'সেটা ত রাধাবল্লভদা ইউনিয়নই বুঝবে, আপনি-আমি ত আর বলতে পারি না। কিন্তু এর ফলে যদি আমাদের ক্ষতি হয়, তা হলে ইউনিয়নের সঙ্গে বসতে হবে। আপনারা নিজেদের মধ্যে বসতে পারেন। আবাব, আমি যেদিন আসব সেদিনও এই নিয়ে কথা বলা যাবে। কেমন ?' একটু থেমে তিনি যোগ কবেন, 'কিন্তু আজ ত আর আমি থাকতে পারছি না, এখন রওনা হলেও ফুলবাড়ি পৌছতে বিকেল হয়ে যাবে।' 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর লেট করা ঠিক না'—রাধাবল্লভের কথাটা আসলে সমষ্টিমতেরই প্রকাশ, এখানকার অভিজ্ঞতায় যা নিযে কোনো মতপার্থক্য থাকতেই পাবে না।

চল্লিশ

বাঘারুর জিপারোহণ

অনেকেই এম-এল-এ-কে এগিযে দিতে আসে। রাধাবল্লভ মোটা আলটায় নামে, সঙ্গে ভগত। হৃষীকেশ মোটা আলেই দাঁড়িয়ে পড়ে, বাধাবল্লভের সঙ্গে আর এগয না। ফাগু এম-এল-এর পাশাপাশিই চলে। বীরেনবাবু একটু পেছনে। ফাগু বোঝাচ্ছিল, 'আপ কুচ শোচথে মাত। ই ত হামরা ঘরকা মামলা, ঘরমে ফযশালা হোনা, কিযা বাধা দাদা ?

বাধাবল্লভ পেছন থেকে বলে, 'তুমি ত সবই বেশ বুঝমানের মত বলো সেই হল বিপদ, যে যাই বোঝায় তাইই বোঝো।' শুনে এম-এল-এ ঘাড় ঘুরিয়ে রাধাবল্লভের দিকে তাকিয়ে হাসে।

ফাগু মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলে, 'ই ত ঠিক বাত্—'

এম-এল-এ তখন ফাগুর বাহুটা চেপে ধবে বলে, 'এই ফাগু কমরেড, শুনো। সব বাতই ত ঠিক বাত। লেকিন তোমাকে এইটা ভাবতে হবে, তোমার পার্টিব পক্ষে কোন বাতটা ঠিক। সেইটা হচ্ছে সবার বড় ঠিক বাত।'

'হাঁ জরুর', ফাগু মাথা হেলায়। এম-এল-এ সহ সবাই একসঙ্গে হেসে ওঠে।

'না। শুনো। এই যে আজ যদি আমাদের পার্টির মধ্যেই একটা দাঙ্গা-, মারামারি-খুনাখুনি হত, পুলিশ আসত, কাগজে খবর ছাপা হত—সেটা ত আমার সরকারের বদনাম হত—'

'জরুর। লেকিন ঐ রিশিকো মাথা গরমাগরম্। উ কাঁহাসে লাঠি লেকে জিন্দাবাদ দেকে, আরে বাবা', বলে ফাগু হেসে নিতে কথা থামায়।

'হ্যাঁ। নিশ্চয বিশিকেশের দোষ। রিশিকেশ'—এম-এল-এ পেছন ফিরে দেখে হৃষীকেশ নেই। রাধাবল্লভ হাসে, 'আর বলেন কেন, একদিকে রিশিকেশ, সব কিছুতেই লাঠি, আর-একদিকে আমাদের ফাগু, সব কিছুতেই ঠিক বাত—এদের যে যায় বুঝায়, তাই বুঝে', রাধাবল্লভ বীরেনবাবুর দিকে তাকায়। এম-এল-এ চোখ সরিয়ে নেয়, যেন, এই ইঙ্গিতটা সে বুঝতে চায় না।

ওরা হাতির রাস্তায় উঠেছিল। রাধাবল্লভরা দাঁড়িয়ে পড়ে—'আমরা আর আগাই না—তাহালি আপনি ত আসিবেন, তখনই সব কথা—।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক আছে, আপনারা যান। একটু মাথা ঠাণ্ডা করে চালাবেন। আমি আসার আগে চিঠি দিব।'

'আপনি কি একা-একা যাবেন নাকি ফরেস্ট দিয়া' ? পেছন থেকেই রাধাবল্লভ জিজ্ঞাসা করে। এম-এল-এ না ঘুরে হাত তুলে বলে, 'না না সে যাবে কেউ'—ফাগুর বাহু এম-এল-এর হাতে ধরাই ছিল। ফলে, মনে হয় যেন এম-এল-এ চায়ই সে তার সঙ্গে আরো কিছুটা চলুক। হাত না-ছাড়লে আর না গিয়ে থাকে কী করে ? বীরেনবাবু একটু পেছন-পেছনই আসছিলেন। কিন্তু রাধাবল্লভরা চলে

যাওয়ার পর, মনে হচ্ছে, তিনি এই দলের সঙ্গে যাচ্ছেন।

ওরা ওদলাবাড়ি যাওয়ার রাস্তাটার মুখের দিকে এগচ্ছিল—ফরেস্টের ভেতর দিয়ে যে-বড় রাস্তাটা ওদলাবাড়ি গেছে। দূর থেকে দেখাই যাচ্ছিল রাস্তাটার মুখে আনন্দপুরের জিপটা দাঁড়িয়ে। গয়ানাথ জোতদারও কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে এম-এল-একে আসতে দেখে দু-পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

সেই মোড়, জিপগাড়ি ও গয়ানাথ কাছাকাছি আসতেই পেছন থেকে বীরেনবাবু বলেন, 'কী ফাগু, বাগানের জিপ ত দাঁড়িয়েই আছে।'

ফাগু সঙ্গে-সঙ্গেই ঘুরে বীরেনবাবুকে বলে, 'হাঁ। কমরেডকো পৌঁছ দোও, ফুলবাড়ি বস্তি।' এই ঘোরার ফলেই ফাগুর বাহু থেকে এম-এল-এর হাত খসে যায়।

বীরেনবাবু একটু হেসে বলেন, 'তা হলে বাহাদুরকে ডাকো।'

বাহাদুর জিপের পাশেই মাটিতে বসেছিল বলে তাকে দেখা যায় নি। সে উঠে দাঁড়াতেই বীরেনবাবু বলেন, 'বীরেনবাবুকে ফুলবাড়ি ছেড়ে দিয়ে এসো।'

এম-এল-এ বলে ওঠে, 'আরে এইটুকু ত হাঁটিই চলে যাব, তাব উপব বস্তি পর্যন্ত ত আর গাড়ি যাবে না, মাঝখানে ত নদী।'

গয়ানাথ জিপের সামনের সিটের দিকে আঙুল তুলে বলে, 'উঠেন, উঠেন, ঐ নদী পর্যন্ত গাড়িতে যান, তার বাদে নদী পার করি দিবে—হে-এ বাঘারু।'

যখন আঙুল তুলল তখন মনে হল গয়ানাথ জিপটার মালিক, যখন কথা বলল তখন মনে হল এম-এল-এর মালিক আর যখন বাঘারুকে ডাকল তখন মনে হল বাঘারুর মালিক।

গাড়িটা পেরিয়ে রাস্তার মুখে এলে বীরেনবাবু সামনের সিট দেখিয়ে বলেন, 'নিন, ওঠেন। কী, ফাগুও যাবে নাকি?'

'হাঁ, জরুর'—এম-এল-এ উঠে ব্রিফ কেসটা কোলের ওপব তুলে একটু ডাইনে সবে জায়গা দেয়, ফাগু সামনের সিটে বসে। গয়ানাথ এগিয়ে এসে বলে, 'এই যাচ্ছে, মোর মানষি। আপনাকে নদীখান পার করি দিয়া, ফুলবাড়ি পৌঁছাই দিয়া, আসিবে।'

এম-এল-এ বাঘারুকে ঠিক দেখে কিনা বোঝা যায় না। গয়ানাথ বলে, 'হে-এ বাঘারু, পাছত ওঠ্ কেনে।'

জিপগাড়িটা তখন স্টার্ট দিয়ে তৈরি। এতই লম্বা বাঘারু যে সে মাটি থেকে পা তুলেই জিপের ভেতর ঢুকে যেতে পারত। কিন্তু পায়ের দৈর্ঘ্য আব জিপের উচ্চতার তুলনা ত কোনোদিনই তাব অভিজ্ঞতায় আসে নি। তাই জিপ গাড়িটা যেন একটা পাহাড়, তাতে উঠতে বাঘারু পেছনের লোহার ডালাটার ওপর দুই হাতে শরীরের ভর দিয়ে ভেতরে গলে যেতে চায় কিন্তু তার মাথা ছাতে ঠেকে যায়। আর তখনই গাড়িটা চলতে শুরু করলে বাঘারু প্রায় হুমড়ি খেয়ে ঐ ঢাকনার ওপবই পড়ে। কিন্তু পড়তে-পড়তেই, তাড়াতাড়ি হাতের ভরে উঠে, পা দুটো উঁচু কবে, ডান হাঁটু ঐ বেলিঙের ওপরে তুলে দিতে পারে। ফলে রেলিংটাব ওপরই বসে পড়ে। বাঁ পায়ের পাতা রাস্তায় ঘসে। তখন সে জিপের ভেতর গড়িয়ে যায়। তার লম্বা, পেশল, নগ্ন, রোমহীন, বাঁ পাটা জিপের পেছনে শূন্যতার ফ্রেম জুড়ে অনেকক্ষণ থাকে। তার মাটিলেপা, থ্যাবড়া, হুকওয়ার্মের ফুটোয় দাগি পায়ের তলাটা খুব শাদাসিধে সোজা টাঙানোই যেন, ওখানে, পোস্টারের মত। আর ঐ পাটা অমনই যেন থাকার কথা ওখানে। নিজেকে টেনে হিঁচড়ে ভেতরে ঢোকাতে থাকে বাঘারু, যতক্ষণ তার মাথা সামনের সিটের পেছনে গিয়ে ঠেকে না যায়। আর নুড়িছড়ানো বর্ষার রাস্তার খানা-খন্দে লাফিয়ে-লাফিয়ে হেলেদুলে, কাতরে-বেঁকে জিপ গাড়িটা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে গড়ানো বোল্ডারের মত বেতালে-বেচালে গড়িয়েই যাচ্ছিল। তাতে বাঘারুর এই ঝাঁপানো আর গড়ানো টেরই পাওয়া যায় না। শুধু বাহাদুর একবার টেরিয়ে দেখে নিয়েছিল। জিপের অতটুকু জায়গায় নিজের অতবড় শরীরটাকে সেঁদিয়ে, কাত হয়ে, উপুড় হয়ে, হাঁটু আর হাতের পাতার ওপর ভর দিয়ে উঠে, বসে, শেষে আবার ঘুরে বাইরের দিকে তাকানো—এমনিতেই মেহনত ও কৌশলের ব্যাপার, তদুপরি জিপের ঝাঁকুনিতে প্রায় অসম্ভবই হয়ে উঠতে চায়। শেষ পর্যন্ত জিপের মেঝেতে বসে, পেছন ফিরে, পেছন থেকে ফরেস্টের দিকে তাকাতে পারে বাঘারু।

এমনভাবে ফরেস্টকে ত আর দেখে না, ফরেস্ট সব সময়ই প্রথমে বাঘারুর সামনে, তারপরে সে ফরেস্টের ভেতরে, তারপরে ফরেস্ট তার সব দিকে—ওপরে-নীচে, ডাইনে-বাঁয়ে, সামনে-পেছনে, শেষে

পর্যন্ত ফরেস্ট তার গায়ের সঙ্গে মিশে যায়। এমনি হয়ে আসে বরাবব। কিন্তু পেছনে বসে ফরেস্টের উচু-নিচু, মাথা-গোড়া, কোনো কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। সেই আড়াল থেকে ফরেস্ট দুপাশে হু-হু গলে গিয়ে রাস্তা বানিয়ে দিচ্ছে। ফরেস্ট স্থির থাকে, পাহাড়ের মত, আর বাঘারুই সেখানে ঢোকে। জিপের পেছনে সেই স্থির, ফরেস্ট তার দুপাশ দিয়ে সরে যায়। যেন ফবেস্টের ভেতব সে ঢুকছে না—ফরেস্টের ভেতর এই কাল রাস্তাটা সিঁদছে। পেছনে যতদূর চোখ যায় কাল বাস্তাটা লম্বা থেকে লম্বাই হয়ে যাচ্ছে, আরো লম্বা। বাঘারু একটু বেশি লম্বা বলেই হয়ত তার চোখ একটু ঠেকে যায় সামনের ফাঁকটার ওপরে। তাই সে গাছের মাথা দেখতে পায় না। শুধু, তাই নয়, তার মনে হচ্ছিল যেন এই বনের তলার জংলার ভেতর দিযে একটা পাতালের মত বনে সে ঢুকে যাচ্ছে। পাতালেব মত বনে—যেখানে বনের মাথা দেখা যায় না, শুধু তলা দেখা যায়।

এই কি ফরেস্টাবচন্দ্র বাঘাক-বর্মনের ফবেস্ট? এর ত কোনো কিছুই সে চিনতে পারছে না, কোনোদিন যে এই ফবেস্টে সে ছিল তাও যেন মনে হচ্ছে না। অথচ চোখ বেঁধে ছেড়ে দিলে, বর্ষাব এই জংলায আব লতায পা-জড়িযে যেতে পাবে বটে, কিন্তু বড, পুবনো কোনো গাছেব সঙ্গে ঠোক্কর খাবে না, নিশ্চযই। এখন জিপেব ভেতব থেকে, পেছনে সে বুঝতেই পাবছে না, কোন দিক দিযে কোথায় যাচ্ছে।

জিপ গাডিব পেছন থেকে, গাডিব ভেতবে ঝাঁকুনি খেযে লাফাতে-লাফাতে, কাত হযে, হোঁচট খেয়ে বাঘারু তাব এই চিবকালেব ফরেস্টটাকেই অচেনা হয়ে যেতে দেখে, যেমন সে দেখে যখনই কখনো এ-বকম গাডিতে দেউনিযা তাকে তুলে দেয়! আসিন্দিবেব ভটভটিযাব পেছনে তাকে বসালে এ-রকম লাগে না। তখন ত সবই সামনে, তার বুকেব সামনে। তাই, গাডিটা থামাব পব, প্রথমে ফাগু লাফিয়ে ও তার পরে এম-এল-এ ব্রিফকেসটা নিযে একটু ঘষটে, নেমে গেলেও বাঘারু নামতে পারে না। ফাগু আর এম-এল-এ নেমে যাওযাব মানে যে তাবও নামা—এই অভ্যস্ত প্রযোজনীয বোধটাও অব লোপ পেযে বসে থাকে মোটব গাড়িতে গতিতে অতিক্রান্ত দূরত্বটুকু বুঝতে। এত তাডাতাডিই কি ফুলবাডিব নদীর পারে পৌঁছে যাওয়া যায়? এ যেন ফরেস্টটাকে টেনে ফুলবাডিব নদীটার কাছে আনা। চাবপাশেব বনজঙ্গলেব যে-পরিচয় অন্তত বাঘারুকে কিছু আশ্বস্ত কবতে পাবত—তাও এই জিপেব আডাল থেকে অদৃশ্য।

বাহাদুর হঠাৎ গিয়াব বদলে সাঁ-সাঁ কবে জিপটা পেছিযে নেয়। তখন ফরেস্টটা বাঘারুব সামনে, সবটুকু দেখতে না পেলেও, সামনেই। ফবেস্টেব ভেতবে সেই ঢুকছে, ফরেস্টটা স্থিবই আছে—এই বোধটুকু সে অন্তত ফিরে পায়।

কিন্তু পরক্ষণেই বাহাদুর আবাব একটা ধাক্কায় সামনে এগিযে যায়। বাঘারু হুমড়ি খেয়ে পড়ে। গাডিটা সবটুকু ঘুবিযে আনন্দপুব ফিবে যাওয়াব জন্য দাঁড কবিযে বাহাদুর ঘাড না-ঘুরিযে বলে, 'উতরো।'

তখন বাঘারুব সামনে, একটু দূরে, ব্রিফকেস হাতে এম-এল-এ আর ফাগু। গাড়িটা ঘুরে দাঁডাতেই ফাগু ছুটে এসে সামনেব সিটে বসার পরও বাঘারুব জিপ থেকে নামা শেষ হয় না। সে, বাহাদুরেব কথা শোনামাত্র দাঁড়িয়ে পড়েছিল। মাথায ঠোক্কর খেয়ে বসে পডেছে। তারপব ঘবে-ঘষে ঐ পেছনের ডালাটার কাছে এসে এক পা বেব কবে। কিন্তু সে পা মাটিতে বাখার আগেই জিপ গাড়িটা হু-স করে বেবিয়ে যায়। ফাগু পেছন ঘুবে 'লাল সেলাম' বলে এদিক-ওদিক ঘাড ঘোরায, কিন্তু এম-এল-এ-কে পায় না। তখন বাস্তা জুড়ে বাঘারু দাঁডিয়ে। পেছন থেকে এম-এল-এ ডাকে, 'চলেন ভাই, ঝট করি নদীখান পার করি দেন।'

জিপগাড়ি যখন আর দেখা যায না, তখনো আওয়াজ আসছে। বাতাসে পেট্রলপোড়া গন্ধ। বাঘারু হাঁটতে শুরু করে। পেছনে এম-এল-এ। বাঘারু একটা ছোট ডালকে লাঠি বানায। সেটা দিযে দু-পাশের জঙ্গল সবায়। একটুখানি বন পেবলেই মাঠ। মাঠ পেরলেই নদী। নদী পেরলেই ফুলবাডি।

একচল্লিশ

মায়ের বাঘারুপ্রসব, বাঘারুর ব্যাঘ্রনিধন ও এম-এল-এ তরণ এবং বাঘারুব প্রথম সংলাপ নিয়ে আদিপর্ব্বের শেষ অধ্যায়

কয়েক-পা যেতেই বনের গন্ধ সাবা শবীবে ভব করে। ঝিঁঝিব ডাক ক্রমে বাড়ে। দুজন দুজনেব নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পায়। যেন, এ-বকম অনেকক্ষণ হাঁটতে হবে, ওদের, যেমন হয়, বনে।

এম-এল-এ পেছন থেকে জিজ্ঞাসা কবে, 'তোমবালাব নামখান কী হে ?'

বাঘারু তাব হাতেব লাঠিটা দিয়ে সামনেব জঙ্গল সবাতে-সরাতে বলে, 'ঐখান ত বড লজ্জার কথা বাবু।'

'কোনখান ?'

'ঐ। মোব নামখান।'

'ধুত, নামতে আব লজ্জা কী আছে? নাম ত নামই।'

'মোব নামখানি বাড়ি যাছে।'

'কায় বাড়ি যাছে ?'

'যত টাইম যাছে, মোর নামখান সলসল করি বড হয়্যা যাছে। এ্যালায এ্যাতখান বাড়ি গেইছে যে ঐ নামখানে মুই আব আঁটো না। ঢলঢলাছে।'

'ত নামখান ক কেনে, শুনি।'

'কছি, এমেলিয়া বাবু। কিন্তু তোমাক মোর নামটা ছোট করি দিবাব নাগিবে। য্যানং সগার নাম ছোট হবার ধরে, মোর নামখানও ছোট হওয়া নাগিবে।'

বাঘারু খুব নিচু গলায় কথা বলছিল। আর লাঠিটা দিয়ে সামনেব জঙ্গলটা সবাতে-সবাতে এগচ্ছিল। এম-এল-এ দেখে, জঙ্গলটা যেন কোনো সময়ই বাঘারুব কোমব ছোঁয় না। সে যেন মাঠেব ওপব দিয়ে হাঁটছে, এমনি তাব হাঁটা, আস্তে-আস্তে। বাঘারুকে চালু বাখতে এম-এল-এ একটু অন্যমনস্ক গলাযই বলে, 'নামখান আবাব কাব ছোট হইল্ রে ?'

'সগারই ত ছোট হয় বাবু, মোরখানই এক বাড়ি যাছে। ধরো কেনে, মোর দেউনিয়া গযানাথ বায়বর্মনখান হয়্যা গিছে গয়া-জোতদার—'

এম-এল-এ খুক কবে হেসে ফেলে, 'আর ?'

'ধরো কেনে, রাধাবল্লভখান হয়্যা গিছে রাধু-লিডার—'

এম-এল-একে এবার আর-একটু বেশি হাসতে হয়, 'আর ?'

'ধবো কেনে, তোমাব নামখানও ত ছোট হবাব ধবিছে। ছোট হয়্যা যাছে, আর বাড়িবে না।'

'কেনে ?'

'আগত আছিল বীরেন্দ্রমোহন বায়বর্মন, এ্যালায হছে এ্যামেলিয়া।'

'ধুত, এইটা কি নাম নাকি, এইটা ত কাম।'

'ঐ ঐ বাবু, কামতই ত নামখান হয়। মোর ত সেইটাই গোলমাল। হাজারিয়া কাম। হাজারিয়া নাম। কামও বদলি যাছে, নামখানও বাড়ি যাছে। এক কামের পরে আরেক কাম, এক নামেব পর আরেক নাম।'

এম-এল-এ বলে ওঠে, 'তায় তোমাক মালষিলা ত বাঘারুই কয় ?'

মুখ না ফিরিয়ে চলতে-চলতে বাঘারু বলে, 'মানষিলা ত মোক বাঘারু নামখান দিয়াই খালাশ, কিন্তু মুই লাগাম কুনঠে ? মানষিলা তজানে না, মোর আর-একখান নাম আছিল। গয়ানাথ দিছে।'

'গয়ানাথ নাম দিছে ?'

'হয়। গয়ানাথ ত্ মোক নাম দিছে বাবু। গয়ানাথ মোর মাও-এর দেউনিয়া, মোর দেউনিয়া, জমির দেউনিয়া, ফরেস্টের দেউনিয়া, তিস্তা নদীর দেউনিয়া, ভোটের দেউনিয়া। ত ধরো, এ্যানং একখান ভোটের আগত কহিল, হে বাউ, ভোটত তয় নামখান দিয়া দিছু। ত মুই পুছিলোঁ, কী মোর নামখান। ত কহিল, ফরেস্টচন্দ্র বর্মন, মনত রাখিস ফরেস্টচন্দ্র বর্মন। ত মুই মনত রাখি দিছু—ফরেস্টচন্দ্র বর্মন।

মনত বাখি ভোট দিছু—গয়ানাথের ভোট। কিন্তু তার বাদে একোদিন সাহেবক দেখিলোঁ—পায়ে গামবুট, মাথায় টুপি, মিলিটারির নাখান ফরেস্টারসাহেব ফরেস্টের ভিতর হাঁটিছে, যান মাখনা হাতি। ত মুই মোর নামখান বদলি ফরেস্টার করি নিছু, মোর পাকা নাম— । লিখা আছে ফরেস্টচন্দ্র বর্মন। কিন্তু মুই কহি ফরেস্টারচন্দ্র বর্মন।' এম-এল-এ ততক্ষণে বাঘারুর পেছনে। তাকালে সে দেখতে পায়, বাঘারুব উদোম পিঠে ও পাছায় নানা দাগ—গাছের কাণ্ডে ফাটা-ফাটা যেমন কত দাগই থাকে।

'তা তোব নামখান শেষ হইল কুনঠে?'

'ঐটাই ত কাথা। মুই ত সবখান নামই রাখি দিছু—ফরেস্টারচন্দ্র বাঘারুবর্মন। বর্মন এইঠে অনেক মিলিবে, ফরেস্টচন্দ্রও অনেক পাবেন, বায-বর্মনও আছে, কিন্তু বাঘারু-বর্মন এই একোখান। নামখান এ্যানং বড় হয়্যা গেইল যে ঢলঢলাছে, খলখলাছে, খুলি-খুলি যাছে।'

'ত মানষি ত তোমাব নামখান কাটছাট কবি টাইট কবি নিসে?'

'ক্যানং?'

'সগায় ত তোমাক বাঘারুই ডাকে, তুমিই ত এ্যালায় নামখান বড় করিবার ধবিছেন।'

'হে-এ এমেলিয়া বাবু। তোমবালার ক্যানং কাথা? আরে বাঘারুখান ত মোব নাম না-আছিল। মানষিলা দিসে—'

'তাব আগত কী আছিল?'

'কহিছু না, ফবেস্টাবচন্দ্র বর্মন— । তাব আগতও আছিল একখান।'

'তাব আগতও তোমাব নাম আছিল?'

'আছিল্ ত। মোব জন্মিবাব আগত্ও মোব একখান নাম আছিল্।'

'জন্মিবাব আগত্?'

'হয। হয। মোব ত একখান মা আছিল।'

'হয়। তা ত থাকিবার নাগেই হে।'

'ত মুই এখান এ্যানং চায়ের বাগানেব ফ্যাক্টরিব চোঙের নাখান মানষি। মোব এখান মা না থাকিলে চলে? মা না থাকিলে মুই আসিম কুনঠে?'

'ত ঠিকই। কোটত আছিল্ তোমার মাও?'

'মোর মাওখান্ ত গয়ানাথেবই আছিল্। কাজকাম কবিত। খোযা খাইত। আর ফরেস্টের ভিতরত গিয়া শুখা কাঠ, ডালপালা কুড়ি আনিবাব নাগিত। আস্ত-আস্ত ডাল। আস্ত-আস্ত গাছ। আনি গয়ানাথের খোলানে পাঞ্জা করি রাখিত। দিন নাই, বাতি নাই, কাঠ কুড়ি যাছে, কুড়ি যাছে। য্যালাই পাহাড়ের নাখান উঁচা হবাব ধরিত, গয়ানাথ একখান ট্রাক ধরি আনি বেচি দিত। মুই য্যালায মোর মাওয়েব প্যাটত আসিছু, প্যাটের ভিতরত আসি গেইছু, মাওয়েব প্যাটখান বড় হওয়া ধবিছে, সগায় জানি গেইছে মুই আসিম, মুই আসিম, স্যালায় সগায় মোক ডাকিবার ধইচছে—"কুডানিয়াব ছোয়া"—'

'ত, এইখান তোমাবালার প্রথম নাম।'

'তার আগত মোর নামখান আর আসিবে কোটত। কিন্তু মুই মাওযেব প্যাটের ভিতর ত বড় হওয়া ধইচছি আব মাওয়ের প্যাটখান এককেরে ঢাক হয়া যাছে, ফাটি যাবে কি যাবে না, সেই টাইমত একদিন—' বাঘারু ঘুরে এম-এল-এর মুখোমুখি দাঁড়ায়, 'মাওয়ের মোর প্রসববেদনা উঠিবার ধরিছে। মুই জন্মিবার ধইচছি। মাওয়ের প্যাটখান ফালা ফালা করি বাহির হওযা ধইচছি। আব মাওখান মোর জমিত লুটাপুটি খাছে, লুটাপুটি খাছে—'

বাঘারু তার কোমর বরাবর জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে, যেন ওখানে ওর মা এখনো ছটফটায়। তার সেই দেখাটা চলতে থাকে নিজের জন্ম দেখা পর্যন্ত। তার থেকে কয়েক হাত দূরে এম-এল-এ সেই জায়গাটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

'মুই ত বাহির হয়্যা গেছু। মাওয়ের প্যাট থিকা বাহির হয়্যা গেছু।'

আবারও তাকে চুপ করতে হয়—মাটির ওপর শ্রান্ত মা ও নতুন বাচ্চাকে দেখতে। দেখা শেষ হলে, ফিস ফিস করে বলে, 'মুই ত এ্যানং কান্দিবার ধরিছু যে জঙ্গলের গাছঠে পাখি উড়ি গেইসে', সেই শালগাছ থেকে ওড়া পাখিদের দেখতে ও আকাশে চোখ তোলে। এম-এল-এও ঘাড় ভেঙে ওপরে তাকায়, যেখান থেকে আকাশ ভেঙে বনস্পতি মহীরুহ নেমে আসছে। বাঘারু দেখে, পাখিগুলো

আকাশে পাক দিচ্ছে, শালগাছের মগডালে বসছে, আবাব উড়ছে, পাক দিচ্ছে। সেই পাখিদের তীক্ষ্ণ ডাক ওপরে। আব সেই বাচ্চার তীক্ষ্ণ কান্না নীচে। ঐ নিস্তব্ধ ঝিঁঝি-ডাকা বনান্ত তোলপাড়। বাঘারু খুব গোপনে বলে, 'মুই কান্দি আব পাখি চিল্লায়। পাখি চিল্লায় আব মুই কান্দি। কিন্তু নাড়ী কাটিবে কায় ? ক্যানং কবি ?' বাঘারু চোখ তোলে না। বনতলে নাড়ীতে বাঁধা এক মা ও এক শিশু বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে।

মোর মাও-এরঠে একখান ছোট কুড়ালিয়া আছিল্। এই ধরো কেনে, ডাল কাটিবার তানে। সারাদিন ত কাটাকুটি চলিত। ধারও আছিল চকচকা। ঐ ছোট কুড়ালিয়াখান দিয়া মাও নিজের নাড়ীখান কাটি দিল। ব্যস। কাটি দিল।' বাঘারু তাব বুক ও বাহুর দিকে তাকায়, ফিরে-ফিবে তাকায় আব এম-এল-একে দেখায় যেন তাব এই সাবালকতা সদ্য, ঐ নাড়ীকাটার পবই। তাবপর বলে, একটু হাসি মিশিয়ে, ওব তানে ত সগায মোক কহিত, "কুড়ালিযা-কাটা"। ত দেখো কেনে, জন্মিবাব আগতঠে মোক নিযা একখান পালাগান বান্ধা হওযা ধবিছে—"কুড়ানিযায ছোয়া। কুড়ালিযা কোটা"—।

বাঘারু আবাব হাঁটতে-হাঁটতে, জঙ্গল সবাতে-সরাতে বলতে শুরু কবে, 'বাবণের যেইলা গরু আর মহিষ, গয়ানাথের স্যানং বাথান। গযানাথের য্যানং গরুব বাথান, মহিষেব বাথান, স্যানং গযানাথের মানষির বাথান, স্যানং গযানাতেব জমিব বাথান। য্যানং এই পৃথিবীব তামান মানষি গয়ানাথের আধিয়াব আব হালুযা, এই পৃথিবীব তামান গরু আব মহিয গযানাথেব বাথানেব গরু আব মহিষ, স্যানং এই পৃথিবীর তামান জমি গযানাথেব জমি, তামান ফবেস্ট গযানাথেব ফবেস্ট, ফবেস্টেব ভিতব য্যালা হাতি আব বাঘ স্যালায গয়ানাথেব হাতি আব বাঘ—

'ত এ্যানং একোদিন, আপলচাঁদেব ফরেস্টেব ভিতরঠে দুপহরেব টাইমত্ মুই আসিবার ধরিছু। মনত না আসে কোটত আসিছু, কোটত যাছু। কিন্তুক কোটত-না-কোটত ত যাছুই। আপলচাঁদেব ফরেস্ট ত মোব ধবো কেনে গযানাথেব খোলানবাড়িব নাখান। কত কাজ এইঠে থাকিবাব পারে। ঐঠে গয়ানাথের চষিবাব জমি আছে। চড়িবাব গরু আছে। হালুযা আব বাথোলিযা মানষি আছে। মুইও আছি। ত মনত নাই এ্যালায়—কোটতঠে কোটত যাছি। কিন্তু হঠাৎ এক শালগুড়িব আড়ালঠে—। না, কাথাটা ঠিক না হইল ! মোব হাতত আছিল একখানা গাঁঠিয়া লাঠি। ধবো, এই দেড়হাতি একখান গাঁটিযা লাঠি, এই লাঠিটার ঠে ছোট। মুই ত যাছি। আব, একবাব এদিক, একবাব ওদিক ঝোপ-ঝাড়ত লাঠি চালাছি। এ্যানং এ্যানং করি।'

বাঘারু দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে একবাব বাঁয়ে একবাব ডাইনে ঘুবে নাচেব মত নিজেকে দোলায়। আর সেই নাচের সঙ্গতিতেই একবাব বাঁয়ে, আব একবাব ডাইনে, 'এ্যানং এ্যানং করি', বলে-বলে হাতের লাঠিটা দিয়ে জঙ্গলে মারে, বর্ষার জঙ্গলের মাথা ভেঙে-ভেঙে যায়। কিন্তু বাঘারু যে-ছন্দে ডাইনে-বাঁয়ে দুলছে আর যে-ছন্দে তার হাতটা ওঠানামা করে সেটা কিন্তু দ্রুত হয় না। বাঘারু তাব হাঁটা বোঝানোর জন্য তাড়াতাড়ি হাঁটে, একটু, ছুটে-ছুটে যাওযাব ভাব এনে। এম-এল-এর সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়ে বেশ কযেকটা গাছের আড়ালে চলে যায় সে। তারপর থেমে পড়ে। তারপর সেই গাছগুলোর ভেতর একটা গাছের মতই একেবাবে সোজা হয়ে দাঁড়ায়—দুই পা ফাঁক, কোমর থেকে বুক ঠেলে জেগেছে, আবার কাঁধদুটো উঁচু থেকে ঝুঁকে পড়েছে সেই বুকের চড়াইয়ে। মুহূর্তের জন্য বাঘারুর পুবো আকারটা যেন সেই জঙ্গলে, গাছগুলোর ভেতর খোদা হয়ে যায়। কিন্তু পবমুহূর্তে সেই ক্ষোদিত মূর্তিটা ভেঙে ফেলে সে কোমর ভেঙে নিচু হয়ে বলে,'এ্যানং কবিতে-কবিতে যেই মুই এক শালগুড়ির তলার ঝোপটাত এ্যানং করি খোঁচা দিছু, দিয়া আবার চলিবার ধইচছি', বাঘারু একটি পা ফেলে বোঝায়—সে চলে যাচ্ছিল, 'অমনি পাছতঠে এ্যানং করি একখান বাঘ আসি মোর পাছত এক পা আর ঘাডত এক পা দিযা মোর ঘাড়খানেব বগলত অব হাঁ কবা মুখখান নিযা আসিছে, উঃ কি গন্ধ বাঘেব মুখত।' এম-এল-এ ঐ গল্পটার দিকে এগচ্ছিল। দাঁড়িয়ে পড়ল।

বাঘারু নাকে হাত দেয়, পরমুহূর্তে আবার সোজা হযে বলে, 'বাঘায় হামাক ঠেলিবার ধরিছে, ফেলি দিবার চাহে আর মুই পাও দুইখান গর্ত করি মাটির ভিতরত সিন্ধাবার চাহি, খসা-ঝরা পাতায় য্যান মোর পাও দুইখান পিছল না খায়, পড়িলে ত সর্বনাশ আর এ্যানং করি ঘুরি গিয়া মোর ঐ দেড়হাতি লাঠিখান বাঘার মুখের ভিতর সিন্ধাই দিয়া দুই হাতত ঠেলিবার ধবিছু—কায় কাক ফেলিবাব পারে—বাঘ মোক না মুই বাঘক', প্রায় দমবন্ধ করে বাঘারু বলে, 'চলিছে, ঠেলাঠেলি চলছে,' আর, তারপর সে কেমন পেঁচিয়ে ঘুরে যায়, যেন তার পেছনে, তার পিঠের ওপর এখন সত্যিই বাঘ থাবা গেড়েছে, আর তার সেই

মুচড়ে যাওয়া শরীরে সে দুই হাতে দুদিক থেকে বাঘের মুখের ভেতর আড়াআড়ি ঠেকানো লাঠিটা ঠেলছে, ঠেলছে। ফরেস্টের এই আবছায়ায় তার সেই স্থির অথচ প্রচণ্ড বেগের মূর্তিকে যেন দুর্গাপ্রতিমার অসুরের মূর্তি মনে হয়—কিন্তু অসুরের মত ত সে পিঠটা বাঁকাবার জোর পায় না, অসুরের মত ত সে বুকটা চিতিয়ে দাঁড়াতে পারে না। দুটো হাতের ওপর তার মোচড়ানো শরীরের সমস্ত ওজন, 'লাঠিখান একটু ঢিলা হবা ধরিলেই ত বাঘ মোর ঘাড়ত দাঁত বসাইবে', আর, দুই পা যেন একটুও না টলে, 'মোর ত জানা আছে আপলচাঁদ ফরেস্টের জমিখান ঐঠে নরম, কুনতিঝোরার জলকাদায় আর পাতাপচায়। বাঘা ত আর আপলচাঁদের জমি চিনে না। মুই চিনো। কিন্তু পা দুইখান পিছলি যাবারও পরে ত—তাই গোড়ালিখন শক্ত করি দিছু।' আবার, সেই শক্ত পায়ের চাপে মাটি কাঁপে, 'বাঘা মুখখান এদিক-ওদিক করিবার ধরিছে', বাঘারু নিজের মাথা ঝাঁকিয়ে বোঝায়, 'কিন্তু মুই ত আর না পারো, মোর হাঁটুখান ভাঙি যাছে' যেন হাঁটু ভেঙে যাচ্ছে এমন একটা ভাঁজের মত আভাস আসে কোমরে, 'কাথাটা হইল, কায় আগত পড়ি যাবে, মুই না বাঘায়। যায় পড়িবে স্যায় হারিবে, ব্যস, মুই য্যালা ধরি নিছু মুই পড়ি যাম-যাম, এই মোর হাঁটুখান—ডান হাঁটুখান-ভাঙি গেইল-গেইল, আর পারিলোঁ না হে, মুই বাঘার প্যাটত গেইল, গেইল হে, স্যালায়, ঠিক স্যালায়, বাঘাখান মোর ঘাড়ঠে আর পাছাঠে থাবাখান চট করি নামি নিল আর মোর দুই হাতত মোর দেড়হাতি লাঠিখান ধরা, মোর হাতটাও নামি যাছে, নামি যাছে,' বাঘারু নিচু হতে-হতে দেখায় সেও কেমন বাঘের দিকে নেমে যাচ্ছে, 'স্যালায় মুই বুঝি গেইলু, আরে, আরে, বাঘাখান ত মোক ছাড়ি দিছে, ব্যাস, যেই বুঝিনু—সড়াত করি লাফ দিয়া সামনের গাছটাত চড়ি গেইল, চড়ি গেইল।'

বাঘারু লাফ দিয়ে গাছের ডাল ধরে ঝুলে ডান পা-টা তুলে ডালের ওপর রেখে বাঁ-পা-টা তোলার ভঙ্গি করে, 'তার বাদে আরো উপবত উঠিবার ধবি', নিচু হয়ে দেখায় তবতব করে ডাল বেয়ে ওপরে উঠল, 'একেবারে উপবত গিয়া চাহি দেখি', একটু ঝুঁকে, দেখার ভঙ্গি করে, যেন তলায় বাঘ, আর সেই ডালের ওপর বসে হেসে কুটিপাটি হয়, সে হাসি আর থামো না, 'মোর ঐ দেড়হাতি লাঠিখান এ্যানং করি বাঘার মুখত চাপি গেইছে যে বাঘাব দাঁতেব ফাঁকত লাঠিখান সিন্ধি গেইছে। আর বাঘা বাহির করিবা পাবে না, শুধু মাথা ঝাঁকাছে ত ঝাঁকাছে, এ্যানং এ্যানং করি', বাঘারু দাঁতে লাঠিসোঁটা বাঘের মত মাথা ঝাঁকায়, 'স্যালায মুই উপরেব ডালঠে য্যালায একখান বড বাঘার মতন আওয়াজ ছাড়িছু—হালু-ম্—স্যালায ঐ বাঘা দাঁতত্ কাঠিখান নিয়া চোঁ চাঁ দৌড়, দৌড়, দৌড়, দৌড়।' বাঘারু আবার. কিছু হেসে নেয়।

'ব্যস। বাঘা গেইল অব বাড়ি। আব মুই জলপাইগুডিব হাসপাতালত্ এ্যানং করি—কায জানে ছয় মাস না দুই মাস। একখান চাষও চলি গেইল, মোর হালও চলি গেইল'—সে দেখায কী ভাবে শুয়ে ছিল।

'সেইঠে মোর নাম হয়া গেইল বাঘারু। বাঘাখানক মুই হাবি দেছু, স্যালায় মোর নাম হইল বাঘারু। যায় জেতে তার নামখান ত একড [রেকর্ড] হয়। বাঘাখানা মোক মাবিলে ঐ জায়গাখানেব নাম ধরিত বাঘাখোযা। তা, ধবো কেনে, পুবা একখান পালাটিয়া গান বান্ধ্যা হয়্যা গেইল—কুডানিব ছোযা, কুড়ালিয়া-কোটা, বাঘারুয়া, ফবেস্ট্রয়া, চন্দ্র বর্মন।'

বাঘারু পেছন ফিবে পথ দেখিয়ে আবার চলতে শুরু করলে তাব দেশিয়া ঘরের এম-এল-এও দেখে বাঘারুর পিঠে-পাছায় মাংস-খুবলনো বাঘের থাবার দাগ—শাল-গাছেব কাণ্ডে যেমন কত দাগই না থাকে। ঘাড না ঘুবিয়ে বাঘারু বলে, 'এমেলিযাবাবু।'

'কহেন।'

'মোক একখান ছোটনাম কবি দেন।'

'কহিলেন ত আপনার পালাটিয়া-গানের মতন নাম। মুই ত গান বান্ধিবাব পারো না।'

'মুই না চাও পালাটিযা-গান। নামের পালাটিয়াখান ঢলঢলাছে, খলখলাছে। মোক একখান মানষির নাম দেন।'

এম-এল-এ কোনো জবাব দেয় না। চলতে-চলতে বাঘারু আবার বলে, 'তুমি একখান জ্যান্ত এমেলিয়ার ঘর। বাগানিয়া মানষিক ঝাণ্ডা দিছেন, বস্তির মানষিক জমি দিছেন আব মোক একখান নাম দিবার না পারেন? এ ক্যানং হাকিম হবা ধরিছু তুই, এমেলিয়া?'

জঙ্গলটা শেষ করে ওরা সেই পাথারে পড়ে। নিধুয়াপাথার। উঁচু ডাঙা, বরমতল, পাথার, পাথারের পর নদী—ব্রিজহীন।

বাঘারু বলে, 'আসেন এমেলিয়াবাবু, পার হওয়া নাগে।'

এম-এল-এ জিজ্ঞাসা করে, 'ক্যানং করি ?'

বাঘারু বলে, 'মোর ঘাড়ত উঠেন।'

এম এল-এ একবার চারপাশে তাকায়। জঙ্গল, পাথর, আকাশ আর এই নদী। বাঘারু নদীর পাড়ে বসে বলে, 'উঠেন।'

ব্রিফকেস মাটিতে রেখে, জুতোটা খুলে বাঁ হাতে নিয়ে বাঘারুর ডান কাঁধের ওপর দিয়ে এম-এল-এ পাটা নামিয়ে দেয়। বাঁ হাতে মাথাটা চেপে ধরে বাঁ পা-টাও বাঘারুর বাঁ কাঁধ দিয়ে নামাতে পারে। জুতোটা ডান হাতে বদলি করে নিচু হয়ে বাঁ হাতে ব্রিফকেসটা তুলে নেয়। একহাতে ব্রিফকেস আর এক হাতে জুতোসহ বাঘারুর মাথাটা চেপে ধরে। বাঘারু জিজ্ঞাসা করে, 'টাইট করি বসিছেন ?'

'বসিছু।'

'খাড়াম ?'

'খাড়া।'

এম-এল-একে কাঁধে নিয়ে বাঘারু দাঁড়িয়ে দু-পা ফেলতেই জুতো-ব্রিফকেস নিয়ে বাঘারুর মাথাটা চেপে ধরে এম-এল-এ চিৎকার করে ওঠে, 'পড়ি যাছে, মোর ব্রিফকেস পড়ি যাছে।' পেছিয়ে এসে বাঘারু বসে পড়ে। প্রথমে জুতোজোড়াটা মাটিতে ফেলে দিয়ে ব্রিফকেস সহ এম-এল-এ নেমে আসে, 'মুই না পার এ্যানং করি পার হবার—'

মোক গয়ানাথ কইছে. পার করি দিবার নাগিবে তোমাক।'

'ক্যানং করি পার হম ? সাঁতরিবার পারি। সাঁতরিম ? জামা-কাপড় খুলি—'

'না-হয়, না-হয়। ভিজা গাওত আবার জামা-কাপড় পরিবেন কেমনে ? গা শুখাবার টাইম নাগিবে। মোর পিঠত ঝুলো। নাও ঝুলো কেনে।'

'এই জুতা ? ব্যাগ ?'

'মোক দাও—' বাঘারু এক হাতে জুতো আর-এক হাতে ব্যাগটা নেয়। কিন্তু এম-এল-এ বাঘারুব পিঠে ঝুলতে গেলে মাটিতে তার পাছা ঠেকে যায়। বাঘারু তখন পাড়ের নীচে পিঠ নুইয়ে দাঁড়ায়। আর এম-এল-এ তার গলা ধরে পেছনে ঝুলে পড়ে, দুটো পা দিয়ে বাঘারুব কোমর পেঁচিয়ে।

'ঠিক আছে ? হাটিম ?'

'হয়। হাঁট।'

বাঘারু জুতো আর ব্রিফকেস দুলিয়ে-দুলিয়ে, পেছনে এম-এল-এ ঝুলিয়ে জলে পা দিতেই এম-এল-এ বলে ওঠে, 'হে বাঘারু, না হয় রে—'

'কেনে ?' বাঘারু দাঁড়িয়ে পড়ে।

'হাত খুলি যাছে। মোক নামি দে।' বাঘারু আবার পেছিয়ে পাড়ের কাছে নিচু হয়। এম-এল-এ তার পিঠ থেকে নামে। জুতো আর ব্রিফকেস ফিরিয়ে দিতে-দিতে বাঘারু বলে, 'নিজেব ওজনখান হাতত ধরিবার পার না ? ত খাড়াও কেনে, খাড়াও।'

এম-এল-এ সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

'জুতা আর বাক্স দুই হাতত টাইট করি ধর।'

বাঘারু তার আপাদমস্তক ন্যাংটো শরীরের সঙ্গে দুহাতে জাপটে নেয় এম-এল-এ-কে। বাঘারুর শরীরের ওপর তার শরীরের পুরো ভারটা দিয়ে জুতো আর ব্রিফকেসসহ এম-এল-এ বাঘারুর গলাটাও জড়িয়ে ধরে। ধুতি, পাঞ্জাবি, জুতো, ব্রিফকেস সহ একটা আস্ত এম-এল-এ যেন বিসর্জনের ঠাকুর, বাঘারুর কাঁধ ছাড়িয়ে—জলের ঠিক ওপরেই, ঠিক ওপরেই। নদীর জলে ধীরে-ধীরে বাঘারুর হাঁটু ডোবে, কোমর ডোবে। তখন এম-এল-এর পেছন আর জুতো-ব্রিফকেস প্রায় জল ছোঁয়-ছোঁয় যেন, আর দু-এক পা গেলেই সেই গভীর জল, সেখানে বাঘারু তলিয়ে যাবে—পরমুহূর্তে ভারমুক্ত ভেসে উঠতে।

কিন্তু বাঘারু জানে, আর দুই পা গেলেই জল আবার কমতে শুরু করবে। এই নদীটার সঙ্গে কোনো

বরফগলা ঝোরার যোগ নেই—বাঘারু জানে।

না থাকলেও নদী ত! আকাশ ছাড়া কোনো ঢাকনা নেই।

নদী ত! স্রোত এসে বাঘারুকে ঘা মারলে ফুলে ওঠে—বানভাসি ফরেস্টে এক একটা শালগাছের গোড়ায় যেমন হয়।

চলন্ত শালগাছের মতন মাঝনদীতে বাঘারু দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর আবার স্রোত সামলে এম-এল-এ কাঁধে পা বাড়ায়।

তিস্তাপারের এই বৃত্তান্তের আদিপর্ব এখানে—এই মাঝনদীতেই, আপাতত শেষ করা যায়। সামান্য কয়েক-পা গেলেই ওপারে ফুলবাড়ি বস্তি। নদীটা ব্রিজহীন হলেও, ফুলবাড়ি বস্তি ও তার আশেপাশে আরো সব বসতি-এলাকায়, খেতিতে, চা-বাগানে ছোট ছোট ঝোরায় বা স্রোতে অনেক জায়গায় ক্যালভার্ট আছে, যেমন থাকে। যা এখনো মাঝে-মাঝে দুটো-একটা তৈরি হচ্ছে, যেমন হয়। সে-রকম একটা ক্যালভার্ট তৈরিব ব্যাপারে ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে স্থানীয় লোকজনের গোলমালের ব্যাপারেই এম-এল-এ যাচ্ছে। তার মানে, এঞ্জিনিয়ার, কনট্রাক্টার, ওভারসিয়ার, সিমেন্টের মিকশ্চার, লোহা, বালি, পার্সেন্টেজ, ইউনিয়ন, কৃষক মজুর, লিডার, অফিসার থেকে এম-এল-এ, আবার এম-এল-এ থেকে...,মিটিং, মিটিং—ইত্যাদি। সেখানে ত ফরেস্টারচন্দ্র বাঘারু-বর্মন আবার অবান্তর, এখনো যতক্ষণ-না একটা পথহীন ফরেস্ট বা ব্রিজহীন নদী পথে পড়ে।

কিন্তু সে ত বৃত্তান্ত আর-এক—

বনপর্ব

বাঘারুর নির্বাসন

বিয়াল্লিশ

এম-এল-এ ফিরে এল

ক্রান্তি হাটের হাটখোলায় সন্ধ্যা নেমে গেল। রাস্তার ওপরের মিষ্টির দোকানের হ্যাজাকের আলোতে মাঠের ঐ কিনারাটা উজ্জ্বল দেখায়। অন্য দোকানগুলোতেও আলো জ্বালানো হয়েছে। ফলে সুহাসের এই বারান্দা থেকে রাস্তার ওপরটাকে, দোকানগুলোর চালাঘরের ওপর দিয়ে উজ্জ্বলতর দেখায়। ধীরে-ধীরে রাস্তার ধারের গাছগুলির নীচের পাতাগুলোতেও আলোর ছিটে লাগে।

সুহাসের বারান্দা থেকে রাস্তার এক অংশ দেখা যায় না; কিন্তু ওপরের আলোর আভা বোঝা যায়। সেটুকু বাদ দিয়ে হাটখোলার বাকি অংশটা সন্ধ্যায় অন্ধকারে দুমড়েমুচড়ে আছে। নড়বড়ে সব বাঁশের ওপর ভামনির ছাউনিগুলো মাটিতে আরো থুবড়ে পড়ে। সন্ধ্যা যত বাড়ে, মাটি আর আকাশের মাঝখানের ফাঁকটাও ততই বাড়ে।

একদল লোক মাঠটা পার হয়ে হলকা ক্যাম্পের এই ঘরের দিকে আসছে। সুহাস বারান্দায় বসেছিল। অতজন লোককে একসঙ্গে আসতে দেখে সুহাস অনুমান করে, সার্ভের ব্যাপারে কিছু বলার জন্য দল পাকিয়ে আসছে। সে ঠিক করে ফেলে, কথা বলতে হলে সার্ভের সময় বলতে হবে আর আপত্তি থাকলে লিখিত দিতে হবে—সে সরকারি দলই হোক আর বিরোধী দলই হোক। প্রথম থেকেই সুহাস এ ব্যাপারটায় আইন-অনুযায়ী চলতে চায়, যাতে কারোই কিছু বলার না থাকে।

দলবলটা যখন মাঠের মাঝখানে, সুহাস শুনতে পায়, 'আপনার এখানে একটু বসব।'

শুনেও প্রথমে সুহাস বুঝতে পারে না। চেয়ার থেকে উঠে সিঁড়ির দিকে একটু এগিয়ে যায়। অন্ধকারে তখনো চিনে নিতে পারে না, কে। তারপর হঠাৎ হাঁটার ভঙ্গিটা দেখে বুঝে ফেলে, এম-এল-এ।

ঘরের ভিতর থেকে প্রিয়নাথ এসে আগেই দাঁড়িয়েছিল। সে এবার লণ্ঠনটা এনে দরজার বাইরে রাখে। আর, এম-এল-এ সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে-উঠতে বলে, 'আপনার এখানে একটু বসব।'

'আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, আসুন আসুন', বলে সুহাস প্রিয়নাথের দিকে তাকাতেই প্রিয়নাথ ঘরের ভেতর থেকে একটা চেয়ার নিয়ে বাইরে দেয়। চেয়ারটা বাইরে আনতে-আনতেই এম-এল-এ উঠে এসেছে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। তা হলে চেয়ারটা দেবে কোথায়? এম-এল-এই সরে জায়গা করে দেয়। প্রিয়নাথ প্রথমে সিঁড়ির মাথাতেই চেয়ারটা রাখে। কিন্তু বোঝে, তাতে ওঠা-নামার অসুবিধে হবে। তাই একটু সরিয়ে দেয়।

এম-এল-এ চেয়ারটা দেখে। তারপর সেটাকে আর-একটু কোনাকুনি করে নিয়ে বসে, পাশে মাটিতে তার ব্রিফকেসটা রেখে। বসে পড়তেই এম-এল-এর ডান পাশে সিঁড়ি, বাঁপাশে ঘরের দরজা, সামনে বারান্দা, আর কোনাকুনি মাঠটা পড়ে। ঠিক কোথায় বসলে সবটাই তার সামনে পড়বে এ যেন এম-এল-এ অভ্যেসেই ঠিক করে নিতে পারে।

সুহাস প্রিয়নাথকে বলে, 'একটু চা এনে দেয়া যাবে, প্রিয়নাথবাবু?' সে তার ঘরের দিকে যায় পয়সা আনতে। প্রিয়নাথ তার পেছন-পেছন দরজার কাছে সুহাসকে ধরে বলে, 'স্যার, স্টোভটা জ্বালিয়ে বানিয়ে দেই স্যার? আমাদের ত রান্নাও চাপাতে হবে।'

'জ্যোৎস্নাবাবু—বিনোদবাবুরা কোথায়, জানেন?'

'কাছাকাছিই আছেন কোথাও স্যার, চলে আসবেন। অনাথ একটু গেছে কাঁঠালগুড়ির মোড়ের দিকে, ওদের দেশের একটা দল নাকি ওখানে থাকে।'

'আচ্ছা, চা করুন তা হলে।'

'আপনি খাবেন ত স্যার?'

'দেবেন এক কাপ', সুহাস কিছু ভাবে, প্রিয়নাথ ফেরার জন্যে ঘুরলে বলে, 'এখনই রান্না চাপাবেন না, ওঁরা এসেছেন—'

প্রিয়নাথ একটু অবাক হয়ে বলে, 'কেন স্যার?'

'ওঁরা কেন এসেছেন বুঝতে পারছি না ত, যদি আমাদের কাছেই কাজকর্ম থাকে।'

প্রিয়নাথ একটু হেসে বলে, 'স্যার, তা হলে ত আপনার কোনোদিনই খাওয়া-ঘুম হবে না, এ ত লেগেই থাকবে।'

প্রিয়নাথের হাসিতে অভিজ্ঞতার এমন ছাপ ছিল যে সুহাসকে মেনে নিতে হয়।

প্রিয়নাথ ফিরে যায়।

সুহাস ঠিক বুঝে উঠতে পারে না কী ভাবে তৈরি হবে। হতে পারে, এম-এল-এ তাকে কিছু কাগজপত্র দিয়ে যাবে। সুহাস রেখে দেবে। তারপর সুহাস ভাবে, রশিদও দেবে। এই কাগজগুলোর একটা আলাদা ফাইল করবে। কিন্তু এখানে ত আর অফিসের আর-কেউ নেই। সে নিজেই ফাইলটা রাখবে। যদি জবাব দেয়ার থাকে, জবাবও দেবে। সুহাস যেন বুঝতে পারে, ঐ-রকম একটা নিয়ম-কানুনের বেড়া ছাড়া সে নিজেকে বাঁচাতে পারবে না। সুহাস ফেরে। প্রিয়নাথের রাখা লণ্ঠনের লাল আলোতে মেঝেটা চকচক করছে, এম-এল-এর চেয়ারের পায়া আর এম-এল-এর বাঁ পায়ের ওপর ওপর তোলা ডান পায়ের আঙুলগুলোতে আলো পড়েছে। এম-এল-এ পা-টা নাচাচ্ছে বলে বারান্দার সিলিঙে লণ্ঠনের আলোটায় ছায়া পড়ছে আর আলো হচ্ছে। এম-এল-এর মুখটার ছায়া দেয়ালের কোনায় একটু লেগে বাইরে চলে গেছে।

তেতাল্লিশ

জমির আল ও এসেম্বলির মাথাধরা

এম-এল-এ সুহাসকে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনার এখানে আর গোলমাল হয় নাই ত?'

সুহাস একটু আলগা দাঁড়িয়েছিল। চেয়ারটা নিয়ে সে এম-এল-এর কাছে বসে না। আবার, চেয়ারটা এখন যেখানে আছে, সেখানেও যায় না। চেয়ার আর এম-এল-এর চেয়ারের মাঝখানে দাঁড়ায়, ভঙ্গিতে আত্মবিশ্বাস নিয়ে। যদি এম-এল-এ তার কছেই এসে থাকে তা হলে সেটা আগে বলুক। এম-এল-এর কথার জবাবে সুহাস বলে, 'না-আ', তারপর বোঝে আরো কিছু বলা দরকার, যোগ করে, 'আমাদের সঙ্গে আর কার কী গোলমাল হবে?'

এম-এল-এ একটু জোরে হেসে ওঠে, 'এই আপনি ভাবছেন নাকি? আপনার সঙ্গেই তো গোলমাল।'

'কেন? আমাদের সঙ্গে আর গোলমাল লাগবে কি সে', এম-এল-এ কথাটা যে-হালকা চালে বলে সেটা সুহাসকেও ছোঁয়, 'যেমন দেখব, তেমন লাইন টানব— এখানে আল, এখানে রাস্তা, এখানে গাছ।'

'ঐ সব আল, গাছ এইসব দাগ দিবেন কেন?' বেশ হাসি-হাসি মুখেই এম-এল-এ জিজ্ঞাসা করে, যেন ধাঁধা।

'আছে, তাই দেব।'

'হ্যাঁ, ঐ ত মজা। ঐটা যদি না থাকে তয় ত একজন বলিবার পারে ঐ জায়গাটায় গাছ নেই।'

'না থাকলে বলবে, নেই।'

'না হয়, না হয়। যার সম্পত্তির সীমা ধরেন ঐ গাছ পর্যন্ত, সেইলা ত চাহিবে গাছটা না-থাকুক।'

'কেন?'

'কহিবার পারিবে, গাছ নাই ত মোর জমিখানারও সীমা নাই।'

সুহাস হেসে ফেলে, 'তা অবিশ্যি পারে।'

আর নিভৃত আলাপের সুরে এম-এল-এ বলে, 'তা উ ত আপনাকে আসিয়া বলিবে যে ম্যাপে গাছটা দিবেন না।'

সুহাস আরো হেসে বলে, 'হ্যাঁ, তা পারে—'

এম-এল-এ তখন হেসে বলে, 'দেখেন না, এক বিঘত জমি নিয়া খুনাখুনি পর্যন্ত হওয়া ধরে ? আর, আপনি ত এই তামান জমির সীমা টানাটানি করিছেন—।'

সুহাস হাসি-হাসি মুখে তাকিয়ে থাকে। এম-এল-এ একটু চুপ করে থেকে বলে, 'গোলমাল তো আপনার সঙ্গেই হইবে, কত গোলমাল।'

এম-এল-এর কথার ভেতর নিভৃত আলাপের ভঙ্গি ছিল। তার একটা কারণ, আলাপটা সত্যিই নিভৃত ছিল। আর-একটা কারণ, সুহাস অনুমান করতে চায় কি এই নিভৃত আলাপে এম-এল-এ তাকে কিছুটা সমর্থনই দিয়ে যেতে চায়! ভেবে ফেলেই সুহাস সাবধান হয়, এই সমর্থনটুকুর বদলেই হয়ত যাওয়ার আগে তাকে কোনো ব্যক্তিগত ও দলগত কাজের কথা বলবে। সুহাস আসলে বুঝতে পারছে না—এম-এল-এ তারই বারান্দায় এসে বসল কেন। সেটা না-বোঝা পর্যন্ত সুহাসের অস্বস্তি কাটবে না।

প্রিয়নাথ কাচের গ্লাসে চা এনে দেয়। তার পর জিজ্ঞাসা করে, একবার এম-এল-এর দিকে, আর একবার সুহাসের দিকে তাকিয়ে, 'একটা বিস্কুট দেব ?'

'দাও, একখান বিস্কুট দাও', এম-এল-এ বাঁ হাতে চায়ের গ্লাশটা নিয়ে ডান হাতটা বাড়িয়ে রাখে। প্রিয়নাথ বিস্কুট আনতে যায়। সুহাস তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করে, 'আপনাকে কিছু খাবার এনে দেবে ?'

'আরে না-না,' প্রিয়নাথ বিস্কুটটা এনে দিলে এম-এল-এ গ্লাশের চায়ে নরম করে-করে খায়। সুহাস বিস্কুট নেয় না। চায়ে চুমুক দিয়ে এম-এল-এ জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি ত এই প্রথম এই কাজে আসছেন, না ?'

জবাব দিয়েও সুহাস ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, সে লোকটিকে পছন্দ করছে, না অপছন্দ করছে। লোকটার কথা বলার ভাষাটা এমন—রাজবংশী ভাষার সঙ্গে চলতি বাংলার মিশেলটা নিয়ে কোনো অস্বস্তি নেই। বলতে-বলতে বলতে-বলতে তার নিজের এই ভাষা তৈরি হয়ে গেছে। সেটা দিয়ে সে সবার সঙ্গে সব জায়গাতেই কথা বলতে পারে—কলকাতাতে, নিশ্চয় তার পার্টিটার্টিতে, আবার তার এই সব গ্রামেও নিশ্চয়। লোকটাকে বেশ কাজের লোক বলে মনে হয় তার মুখের কথা শুনেই। আবার চেয়ারটা ভরে বসেছে একেবারে পাইকার-দেউনিয়ার মত, পায়ের ওপর পা তুলে, জামাটা ঘাড়ের পেছনে ঠেলে দিয়ে। চায়ে চুমুক দিয়ে এম-এল-এ আবার বলে, 'গ্রামের জমিজমার ত ধরেন কেনে দখলই হচ্ছে আইন। দখল যার জমি তার। আপনি যদি একখান লাইন টানি দিয়া আমার জমিখানের ভাগ, ধরেন, আর-একজনের জমির ভিতর ঢুকাইয়া দেন, তা হলি ত আমি পরের দিন লোকজন লাঠিসোঁটা নিয়া ঐ জমিটার দখল নিয়া নিম। ব্যাস—', কথাটা শেষ করে এম-এল-এ বলে, 'ত আপনার সঙ্গে গোলমাল হবে না ? প্রত্যেকদিন গোলমাল হবে আপনার মাপামাপি নিয়া। তবে আপনি ত শক্ত অফিসার। জোতদারদের বাড়ি খাবেন না, বলে দিছেন। জোতদাররা ভয় খাইছে', এম-এল-এ এবার বেশ জোরে-জোরে হেসে ওঠে।

সুহাস যেন নিজের অবস্থাটা বোঝানোর জন্য বলে, 'আমরা তো আর প্রপার্টিরাইট মানে সম্পত্তি কার সে-সব ঠিক করছি না, সে-সব ত সিভিল কোর্টের ব্যাপার।'

'প্রপার্টি রাইট-টাইট ত আপনার গয়ানাথ জোতদার, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট আর আনন্দপুর চা-বাগানের ব্যাপার। আর-সব মানুষের রাইট মানে ত এক বর্ষার চাষ। ব্যাস। কোর্টে যাইতে আমাদের সব মানষি ভয় পায়। সেইখানে ধরেন গ্রামের মাতব্বর, কি ধরেন পার্টির নেতা, কি ধরেন আপনাদের মতন অফিসার যা হুকুম দেন সেটাই সবাই মানি নেয়। মানি নিবার চায় অন্তত। সাধারণ মানুষের কাছে ত সরকার মানেই সরকারি অফিসার—এই ধরেন ডি· সি, এস·ডি·ও, জে এল আর ও, থানার দারোগা আর আপনাদের মতন আরো সব অফিসার। অফিসার ভাল না-হলে ত সরকার বদলি যায়। এই দেখেন না, সাতালডিব ব্যাপার। সব ইঞ্জিনিয়ারগুলা মিলি শয়তানি করে।'

সুহাস একটু চমকে বোঝে, এই লোকটি এখানকারই এম-এল-এ বটে, কিন্তু সত্যি করেই তার পেছনে অভিজ্ঞতাব এমন একটা ভূমি আছে, যেখান থেকে কোনো সময়েই লোকটা সরে না। আর সেই কারণেই এতক্ষণ তার কথায় এমন ঘনিষ্ঠতা বোধ করে ফেলছিল সুহাস। এই লোকটিও কি সেই কারণেই সুহাসের কাছে এসে বসল ? সুহাসও এখানকার লোক নয়, তাই তাদের ভিতব, এখানকার অভিজ্ঞতা নিয়ে, এই সব কথা বিনিময় হতে পারে।

সুহাস জিজ্ঞাসা করে, 'আপনাকে তো নিশ্চযই এসেম্বলিতে প্রায়ই বলতে হয়।'

'মাঝে-মাঝে বলতে হয়, লোকাল ব্যাপার-ট্যাপার থাকলে, আর দু-এক সময় কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করতে হয়। আমাদের অন্য কমরেডরা আছেন সব, তারাই বলে দেন।'

লোকটি থেমে গেলে সুহাস জিজ্ঞাসা করে বসে, 'আপনার ভাল লাগে এসেম্বলি ?' এম্-এল-এ চুপ করে যায়। সুহাস বোঝে, সে ভেবে নিচ্ছে কথাটার জবাব দেবে কি দেবে না। নাকি আসলে জবাবটাই ভাবছে, এমন করে কোনো কথা হয়ত তার এর আগে মনে হয় নি ? অথবা, কতটা বলবে আর কতটা বলবে না, তার সূক্ষ্ম হিশেব ?

এম-এল-এ নীরবে একটু হাসে, 'আপনি খুব জবর প্রশ্ন করলেন,' আবার একটু চুপ করে থেকে বলে, 'হয় সত্যি জবাব দিব, না-হয় ত চুপ করি থাকব', আবার একটু চুপ করে থেকে বলে, 'আমিও আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি কেন এই কথা জিজ্ঞাসা করলেন।' সুহাস বোঝে না এই ভাষায় প্রশ্নটা আসলে করাই হল কি না। এম-এল-এ বলে, 'কিন্তু সেটা ত আমি জানি, আপনারা কেন এই কথা জিজ্ঞাসা করেন জানি, আমি ঠিক উত্তরটাই দিব।'

একটু সময় নিয়ে এম-এল-এ বলে, 'প্রথম থিকেই বলি। বড় ঘুম পায়।'

সুহাস হাসে, 'আমরা ত তাই শুনি, এসেম্বলিতে ভাল ঘুম হয়।'

'হ্যাঁ। এয়ার কনডিশন ত। আর কলকাতায় সে গরম। ঘামিটামি ঢুকিলেন আর অনং ঠাণ্ডা। শরীরটা চট করি ছাড়ি দিবার চায়। প্রথম প্রথম ত চোখ দুইখান খুলা রাখাই এক হাঙ্গাম। হয়া গেইল। যখনই যাই তখনই ঘুমাই। তার পর ভাত না খাইয়া রুটি খাওয়া ধবিলাম।'

'এসেম্বলির জন্যে খাওয়া বদলালেন ?'

'না-বদলাই করি কী। আমরা ত ভাত খাই, জানেনেই, হাইজাম্পেব নাখান। অত ভাত খায়া ঐ হলে ঢুকিবার বাদে মরার মতন ঘুম আসে। এখন ঘুমটা কমি গেইসে। ইচ্ছা কবিলে ঘুমাবার পাবি। ইচ্ছা করিলে জাগি থাকবার পারি। কিন্তু মাথাধরাখান মোব এ্যালাযও সারে নাই।'

'মাথা ধরে ?'

'হ্যাঁ।'

'বক্তৃতায় ?'

'না। ঐ এয়ার কনডিশনে। যখন বাহিরে আসি কেমন গা গোলায় আর মাথা ধবে আর বুকটা ঠাণ্ডা লাগে।'

'তা হলে যান কেন ? আপনাকে ত আর অত ঘন-ঘন বলতে হয় না।'

'আমাকে বলতে হয় না কিন্তু আমাদের সব প্রফেসব কমরেডরা আছে, উকিল কমরেডবা আছে। ভাল বলে। ইউনিয়নের নেতারাও ভাল বলে। তাদের সব পয়েন্ট দেই, কী কেস বুঝাই, কোর্টেব মতন আর কী!'

'কোর্টের মতন ?'

'ঐ আর-কি। আপনি আমি কি আর কোর্টে গিয়া সওয়াল করতে পাবি ? তাব জন্য উকিল-মোক্তার লাগে। কালা কোর্ট লাগে। ওবা সব কোর্টের আইন জানে। তেমনি এসেম্বলিরও নিযম আছে সব। কখন কোনটা বলা যায়। বললে ঠিকমত লাগবে। কখন কোন কথাটা তুলতে হয়। সেই সব যারা জানে তারাই বলা-কওয়া করে।'

'আপনিও তো উকিল। মেম্বার—'

'জুনিয়র জুনিয়র' বলে এম-এল-এ হো হো করে হেসে উঠে যোগ করে, 'আপনি আমার ভোটার না ত তাই বলি দিলাম। ভোটারকে বলি আমি না গেলে ত এসেম্বলি অচল—' বলে এম-এল-এ আরো হাসে। সুহাসও তার সঙ্গে যোগ দেয়। তারপর জিজ্ঞাসা করে, 'তা হলে যান কেন ওখানে ?'

'এইটা আপনারা কী বলেন ?' এম-এল-এ হাসি কমাতে-কমাতে বলে, 'পার্টি করি মানে তো ক্ষমতা চাই। এসেম্বলিতে যে-পার্টির মেম্বাব বেশি সেই পার্টি ক্ষমতায় আসে। আমরাও ক্ষমতায় আছি। পার্টি করিবেন কিন্তু ক্ষমতা নিবেন না এ ক্যানং করি হবে ? বিয়া বসিবেন কিন্তু বউয়ের সঙ্গে শুবেন না—এ কি হয় ? সে ত হিজড়ারাও কবার পারে—গর্ভ ধরে শুয়াররা আর এক মানষিই পারে হিজড়া হবার।' এম-এল-এর হাসি উত্তাল হয়ে ওঠে। সুহাসকে, যেন পরাজিতের মত স্মিত থাকতে হয়।

চুয়াল্লিশ

এম-এল-এ-র চা খাওয়া

এম-এল-এ-র সঙ্গে যে-দলটা এসেছিল তার কেউ-কেউ চায়ের দোকানে গেছে আর কেউ-কেউ সিঁড়ির ওপর হেলান দিয়ে বসে। প্রিয়নাথের লণ্ঠনে এত কালি পড়েছে সেটার আলোতে আর-কিছু দেখা যায় না, শুধু সেটাকেই দেখা যায়। কিন্তু ক্রান্তি হাটের মত জায়গার একটা আস্ত এম-এল-এ এ-রকম অন্ধকারে একটা বারান্দায় বসে থাকবে—এটা ত খুব স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। পরন্তু এম-এল-এ আজ দুপুরেই সার্ভে ক্যাম্প দেখে, সেখানে সকলের সামনে একটা বক্তৃতা দিয়ে, ক্রান্তি হাট দিয়ে, আপলচাঁদ ফরেস্ট দিয়ে, সেই ফুলবাড়ি বস্তি চলে গিয়েছিল। আবার, সন্ধ্যাবেলায় ফিরে এসেছে। সঙ্গে ফুলবাড়ির লোকজন। লোকজন অবিশ্যি এম-এল-এর সঙ্গে সব সময়ই থাকে। কিন্তু দুপুরে ক্রান্তি হাট থেকে গিয়ে, আবার সন্ধ্যাতেই ক্রান্তি হাটে ফিরে আসা, এটা খুব সাধারণ ব্যাপার নয়। এম-এল-এরা সব সময় ফোঁড়াফুঁড়ি করে চলে। এদিক দিয়ে ঢুকে ওদিক দিয়ে বেরয়। এই বীরেনবাবু এম-এল-এ ফুলবাড়ি থেকে মানাবাড়ি-ওদলাবাড়ি দিয়ে বেরলে 'ট্যুরে' তার ঐ—জায়গাটাও দেখা হয়ে যেত, লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা হতে পারত। তা না করে যখন সে ফিরে এসেছে তখন ঘটনা খুব পাকিয়ে উঠেছে, নিশ্চয়। এসে, আবার বারান্দায় বসে আছে ? এম-এল-এ কখনো এক জায়গায় বসে থাকে না, মিটিং ছাড়া। এম-এল-এ মানেই চলছে—হয় হেঁটে, নয় গাড়িতে, না-হয় প্লেনে, না-হয় ট্রেনে। মিটিং ছাড়া এম-এল-এ একা-একা বসে আছে, মানে, ঘটনাটাও বসে পড়ার মত।

এই রকম একটা ঘটনা ক্রান্তি হাটেই ঘটে যাবে, আজ সন্ধ্যাবেলায়, এর জন্য কেউ তৈরি ছিল না। এম-এল-এ কাউকে খবর দেয় নি। যাবার সময় বলেও যায় নি, ফিরে আসবে। সোজা হলকা ক্যাম্পে গিয়ে বারান্দায় বসেছে, অন্ধকারে। আর, এখানকার লোকজনকে সে-খবরটা শুনতে হয়, ফুলবাড়ি বস্তির যারা এম-এল-এর সঙ্গে এসেছে, চায়ের দোকানে তাদের কারো-কারো কথা থেকে। হাটবার ছাড়া ক্রান্তি হাটের এই চায়ের দোকানে এতগুলো অচেনা মুখের লোক যদি একসঙ্গে বসে চা খায়, তা হলে তাদের কথাবার্তায় কান পাততেই হয়, আর তাতেই খবরটা জানা যায়। তখন তাদের সরাসরি জিজ্ঞাসাও করা যায়—কেন এসেছে, কোথায় আছে, কী ব্যাপার। ফুলবাড়ির ফুলঝোরার ওপরে যে-ক্যালভার্টটা তৈরি হচ্ছিল, তাই নিয়ে গোলমাল। এম-এল-এ নাকি রেলিংটাতে এক লাথি মেরেছে আর রেলিংটা ভেঙে গেছে। ইনজিনিয়ারকে ডাকতে মালবাজারে লোক গেছে। ইঞ্জিনিয়ারকে এখানে ধরে নিয়ে আসবে।

দোকানপাতিতে যারা বসে ছিল, তারা ত হাট-কমিটির ঘরের দিকে, এখন হলকা ক্যাম্পের দিকে, হাঁটা দেয়ই, এম-এল-এর পার্টির লোকদের খবর দেয়ার জন্যেও কেউ-কেউ ছোটে, আর কেউ-কেউ যায় তাদের দেউনিয়াদের জানাতে। গেরিমাটি রঙের জামাপরা ভদ্রলোক সিঁড়ি বেয়ে উঠে মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে বলেন, 'এইঠে কখন আসি বসিছ ?'

'এই তো আলায় আইচচু।'

'ফুলবাড়িঠে ?'

'হয়।'

'ঐঠে কি লাথি দিয়া ব্রিজ ভাঙি দিছ !'

'না-হয়, না-হয়', বলে এম-এল-এ হাসে।

'ত চলো কেনে, ঘরতে চলো, হাত মুখ ধোও, তার বাদে আসি বসিও, এইঠে কি মিটিং দিবেন আজি ?'

'না-হয়, না-হয় মিটিং দিম কেনে ?'

'কায় যে কহিল মালবাজারঠে ইনজিনিয়ার আসিবে।'

'আসিবে। মোরঠে কাথা আছে।'

রাস্তা থেকে একটা দল মাঠে নামে। তাদের পেছনে একটা খুব চড়া আলো ঝুলিয়ে কেউ আসে। আচমকা ভাবটা কেটে গেলেই বোঝা যায়, হ্যাজাক। মাঠের লোকজনের লম্বা-লম্বা ছায়া বারান্দার আর ঘরের দেয়ালের আলোকে অন্ধকার দিয়ে ফালা-ফালা করতে করতে ক্রমেই ওপরে উঠে যায়। সেই লোকজন, আর তাদের পেছনে একজন একটা টিনের থালার মধ্যে কয়েক কাপ চা আর একটা ডিশে মিষ্টি আর সিঙাড়া নিয়ে, এসে দাঁড়ায়। যার হাতে হ্যাজাকটা ছিল সে পেছন থেকে সামনে এসে বারান্দার ওপর আলোটা রাখায় লোকজনের খাড়া ছায়া বারান্দার দেয়াল থেকে বারান্দা গড়িয়ে মাঠে লম্বা হয়ে যায়। হ্যাজাকের পাশেই চা-মিষ্টির থালাটা নামিয়ে রেখে খালি গায়ের ছেলেটি বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে গলা বাড়িয়ে বলে, 'ঐ দোকানঠে পাঠাই দিছে, এত্তি—'

সেই গেরিমাটি-জামা ভদ্রলোক এতক্ষণে বারান্দায় উঠে এসে মিষ্টির ডিশটা তুলে এম-এল-এর সামনে ধরে বলে, 'ন্যাও, খ্যাও কেনে'। একটা সিঙাড়া তুলতে-তুলতে এম-এল-এ সুহাসের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, 'সাহেবকে দেন।'

ভদ্রলোক সুহাসের সামনে নিয়ে যায়। সুহাস একটা ছোট মিষ্টি তুলে নেয়। ভদ্রলোক আবার এম-এল-এর সামনে ধরে বলেন, 'তুমি খাও ত বীরেন, আত্তিরে [রাত্রিতে] এইঠে থাকিবেন ত ?'

'আরে না-হয়, মোক কালি জলপাইগুড়ি যাবা লাগিবে, মিটিং আছে', বলে, এম-এল-এ একটা মিষ্টি তুলে মুখে ফেলে আঙুলটা পায়ে মুছে বলে, 'মুই আর খাম না', তারপর মিষ্টির ঢোকটা গিলে ফেলে বলে ওঠে, 'আরে আবার চা-টা কোথায় ?

গেরিমাটির জামাপরা ভদ্রলোক মিষ্টির ডিশটা থেকে একটা করে মিষ্টি ভাগ করে-করে বিলি করতে-করতে বলে, 'দিছু খাড়াও', তারপর তাড়াতাড়ি এসে ঐ থালাটার ওপর ডিশটা নামিয়ে রেখে, থালায় উপচনো চায়ের জলে আঙুলটা ধুয়ে, একটা কাপ তুলে এনে এম-এল-একে দেয়। এম-এল-এ চায়ের কাপে চুমুকটা দিয়েই বলে, 'এ-হে, এ তো ঠাণ্ডা হয়া গেইসে—', বলে এক চুমুকে কাপটা শেষ করে দেয়।

সুহাস একটু আড়ালে চলে গিয়েছিল তার নিজের ঘরের দিকে। এম-এল-এ যে চা-টা মুখে দিয়ে কথাটা বলে ওঠে এতে যেন তাদের দু-জনের মধ্যে অভিজ্ঞতার একটা বিনিময় ঘটে যায়, নাগরিক অভিজ্ঞতার। সে জিজ্ঞাসা করে, 'কী, চা খাবেন নাকি আর-এক কাপ ?'

সুহাসের কথার ভেতরই ইঙ্গিত ছিল—সে বানানোর কথাই বলছে, দোকান থেকে আনার কথা নয়।

'আপনি খাবেন ? তা হলে আমিও খাই', বলে এম-এল-এ হাসে।

সুহাস তার ঘরের কাছ থেকে এগিয়ে এসে প্রিয়নাথের ঘরে ঢোকে। প্রিয়নাথ তখন রান্না চাপিয়ে দিয়েছে, 'প্রিয়নাথবাবু, আপনার হাতের চা ত আমাদের ভাল লেগে গেছে।'

'বসেন স্যার, আমি দিচ্ছি করে', প্রিয়নাথ তরকারি কুটতে-কুটতে বলে।

'আপনি একা রাঁধছেন— ?'

'ওঁরা এসে যাবেন স্যার। ও তো আমাদের ঠিক হয়ে গেছে স্যার—।'

সুহাস বেরিয়ে আবার তার ঘরের সামনে এসে চেয়ারটিতে বসে পড়ে।

তার মানে, এই এম-এল-এর রুচি-স্বভাবে কলকাতার ছোঁয়া লেগে গেছে ? এই অঞ্চলের ভেতর প্রোথিত এই মানুষটির স্বাদে ও অভ্যাসে নাগরিকতা এসে যাচ্ছে ? কলকাতা ও নাগরিকতার সেই টানেই কি লোকটি ফুলবাড়ি বস্তি থেকে এসে তার এখানে বসেছে, একই অভিজ্ঞতা বিনিময়ের লোভে ?

এই একটু আড়াল থেকে সুহাস মনের এই প্রশ্নগুলি নিয়ে এম-এল-এর দিকে তাকায়। এম-এল-এ তখন তার পা-নাচিয়ে-নাচিয়ে হাসতে-হাসতে সামনে মাঠের ভেতর ও পেছনে সিঁড়িতে দাঁড়ানো লোকগুলোর সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

পঁয়তাল্লিশ

এম-এল-এ ও গয়ানাথ

আলো ফেলে রাস্তায় একটা গাড়ি এসে দাঁড়ায়। কিন্তু আওয়াজ করতেই বোঝা যায় মোটর সাইকেল। মোটর সাইকেল চলার সময় যত আওয়াজ করে, দাঁড়ালে আওয়াজ হয় তার চাইতে বেশি। কয়েকবার হেঁচকি তুলে মোটর-সাইকেলটা আবার চলতে শুরু করে। আস্তে-আস্তে চলছে বলে হ্যান্ডেলটা নড়ে আর আলোটা বাঁয়ের জঙ্গল আর ডাইনের বাড়িঘরের গায়ে আছড়ায়---যেন কিছু খোঁজাখুঁজি চলছে। আলোটা মাঠের ভেতর কিছু চলে আসে, আবার ঘুরে যায়। মোটর সাইকেলের আওয়াজটাও বাড়ে-কমে। তারপরই মোটর সাইকেলের আলোটা এই বারান্দার দিকে পড়ে আর আরো আওয়াজ তুলে এদিকে ছুটে আসে। হেডলাইটের আলো বারান্দা টপকে ঘরের ভেতর চলে যায়, হ্যাজাকের আলোটা মুছে দিয়ে। কিন্তু মোটর সাইকেলটা হঠাৎ থেমে যায়। আওয়াজ বাড়ে, আলো বাড়ে কিন্তু মোটর সাইকেলটা আর এগয় না। সিঁড়ির ওপর থেকে কেউ বলে, 'ফাঁসি গেইছে'। এম-এল-এ বলে ওঠে, 'দেখেন ত কায়, ঠেলি দিয়া আসেন কনেক।' দুজন লাফিয়ে নেমে মোটর সাইকেলের আলোটার দিকেই ছুটে যায়—'বলদের গাড়ি কাদোত গাড়ি গেইছে, ঠেলো এ্যালায়।' আলোটা একটা আওয়াজ তুলে নিবে যায়।

তখন বারান্দায় হ্যাজাকের আলোতে দেখা যায় মোটর সাইকেলের ওপর একজন বসে আছে, আর-একজন, বেঁটেমত, সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার শুরু করেছে। গয়ানাথ জোতদারকে চিনতে এইটুকু আলোরও দরকার ছিল না, শুধু গলার আওয়াজ শুনলেই হত। সিঁড়ির ওপর থেকে কেউ বলে, 'ব্যাস, ভটভটি জোতদার আসি গেইল।'

তার মানে, এখন এই ভিড়ে শুধু ফুলবাড়ি বস্তির লোকজনই নেই, এখানকার লোকজনও কেউ-কেউ আছে—যারা গয়ানাথকে সকালে ভটভটিয়াতে চড়ে সার্ভের জায়গায় যেতে দেখেছে। গয়ানাথের এই নামকরণ এর আগে কখনো হয় নি। জামাইয়ের ভটভটিয়াতে সে সাধারণত ওঠে না, এমন কি জলপাইগুড়ি যাওয়ার জন্যে বাস ধবতেও না। কিন্তু সকালে সার্ভে পার্টি পৌঁছে গেছে দেখে চড়তে হয়েছিল। আর, এখন এই সন্ধ্যায় আসিন্দিরই গিয়ে খবর দিল এম-এল-এ আবার এসে বসে আছে। একই দিনে দুই-দুইবার ভটভটিয়া চড়ে একই জনসমাবেশে নামলে ত একটা নামকরণ হয়েই যায়। কিন্তু নামটা টিকবে কি না তা নির্ভর করবে ভটভটিয়া সম্পর্কে গয়ানাথের পরবর্তী ব্যবহারে।

গয়ানাথ তখন তার কাপড় এক হাতে তুলে, আর-এক হাত নেড়ে আসিন্দিরকে শাসাচ্ছে, 'শালো, ভটভটিয়াখান তোর পাছত ঢুকাই দিম। মাঠে চষিবার ধইচছে এই এক দো-চক্কিয়া। কহিছু মোক আস্তার [রাস্তার] ওপর নামি দে, নামি দে। না, চলো কেনে, চলো কেনে, এ্যালায় তো যাছি তর শ্বশুরবাড়ি। শালো, তর কোন জারুয়া [জারজ] বাপ মাঠের ভিতর দিয়া হাইওয়ে বানাই থছে ? শালো ডাঙ্গুয়া [প্রৌঢ়া বিধবার যুবক সঙ্গী] ঢেমনা— ।' সিঁড়ির ওপর ও মাঠে যারা দাঁড়িয়ে ও বসে ছিল তারা হাততালি দিয়ে ওঠে।

এম-এল-এ চিৎকার করে ডাকে, 'হে গয়ানাথ কাকা, চলি আসেন এইঠে, ও ঠেলি দিবে উমরায়, চলি আসেন।'

সেই ডাকে গয়ানাথ এদিকে আসতে শুরু করে বটে কিন্তু দুপা এসেই ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার চিৎকার করে ওঠে, 'শালো ঢেমনা', তারপর হন হন করে এগিয়ে আসে, যেন এইটুকু গালগালই বাকি ছিল। গয়ানাথ কাছাকাছি আসতেই কেউ বলে, 'আসিন্দিরের পাছাখান কত ফাঁক হে, একখান আস্ত ভটভটি ঢুকি যাবে ?'

গয়ানাথ সেদিকে তাকিয়ে আবার চিৎকার করে, 'তর বাপের পাছত ঢুকিবে—'

এম-এল-এ চিৎকার করে বলে, 'হে কাকা, ক্যানং বুদ্ধি তোমার, জোয়াইঅক [জামাই] কছেন অ্যালাং-প্যালাং ?'

গয়ানাথ তখন সিঁড়িতে পা দিয়েছে। চিৎকার করে ওঠে, 'কায় কহিছে ঐ ডেঙ্গুয়া মোর জোয়াই? মুই অক তালাক দিম।'

পেছনে এবার হাততালির সঙ্গে চিৎকারও। এম-এল-এ হো হো হাসে। গয়ানাথ গিয়ে বারান্দায় ওঠে। আর তখনই মোটর সাইকেলের আলোটা সগর্জন জ্বলে হু—স করে বারান্দার সামনে চলে এসে আওয়াজটা দুই-চার বার বাড়িয়ে কমিয়ে হো-হো করে হেসে, বাইকটা ঘুরিয়ে, আসিন্দির রাস্তার দিকে চলে যায়। আসিন্দিরের ওপর রাগের ঝোঁকে গয়ানাথ হন হন করে বারান্দার ওপর উঠে এসেছিল। এখন বুঝতে পারছে বারান্দায় তার বসার বা দাঁড়ানোর জায়গা নেই। গয়ানাথ সামনের অফিস ঘরেও ঢুকতে পারে না, মেঝের ওপর ধপাস করে বসে পড়তেও পারে না। পারে, কিন্তু আর-কেউ ত তেমন বসে নেই। তার চাইতে মাঠে বা রাস্তায় ঘোরাঘুরি করাটাই ভাল ছিল—এম-এল-একে একবার মুখ দেখিয়ে। কিন্তু এম-এল-এ ফিরে এসে এই হল্কা ক্যাম্পেই বসে আছে কেন, সেটা তার জানা দরকার। তখন গয়ানাথের বাঘারুর কথা মনে পড়ে। একবার তাকায়, তাকে কোথাও দেখা যায় কি না। তা হলে ওর সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারত ফুলবাড়ি বস্তিতে কী হয়েছে। কিন্তু বাঘারুকে কোথাও দেখা যায় না। বাঘারুর কথা মনে হতেই গয়ানাথ ভাবে যে তার ত হকই আছে এম-এল-এর ভালমন্দের খবর নেযার, কারণ তার লোকই ত সঙ্গে ছিল নদী পাব করে দিতে। গযানাথ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই জিজ্ঞাসা কবে, 'কুনো অসুবিধা হয নাই ত তোমাব?'

'কেনে? কী অসুবিধা?' এম-এল-এ জিজ্ঞাসা করে।

'এই, ফুলবাড়ি গেলেন, আবার চলি আসিলেন?'

'ই আর অসুবিধা কী। ঐ ইনজিনিয়ারক খবর দিবার গিসে। এইঠে বসিবার সুবিধা, তাই বসি আছি।'

'উমরায ঠিক মতন পার করি দিছে ত নদীখান?'

'কায়?'

'আরে, ঐ বলদটা, তোমাব নগত যায গিছে ফুলবাড়ি যাওয়ার বাদে।'

'হয, হয', এম-এল-এর মনে পড়ে যায়, 'বাঘারু। কী বাঘারু?' এম-এল-এ মনে আনতে চেষ্টা কবে।

গযানাথ জিজ্ঞাসা করে, 'হয হয। বাঘাক। ঐটা ফিরে নাই তোমার নগত?'

'তা ত কহিবাব পাব না। ফিরিবাব পাবে। ফিবিবাব টাইমে ত নৌকা আছিল্। আহা কহেন না কাকা—'

'কী?'

'তোমার ঐ মানষিটার নাম, কী, বাঘারু-বর্মন ত?'

'বর্মন? অব বাপা বর্মন!'

'আবে, উমবাব একখান পুবা নাম, নাম্বা নাম আছে না—?'

'বাঘাকব একখান নাম আছে? তোমাক কহিছে?'

'কহিছে ত কত কথা। উমবাক তো বাঘ ধবিছিল?'

'হয়। তোমাব তানে কাথা কহিছে ঐটা, এতত?'

'সে কি একখান কাথা? কত কাথা? অব জন্মকথা। অর মাই-এব কথা। মানষিটা বড় ভাল হে তোমার কাকা—'

'বলদ'।

'উমবাক একখান আধিযারি দিছেন?'

'কাক?'

'উমরাক?'

'বাঘাকক?'

'হয়'।

'বাঘারুক আধিযাবি?'

'হয। এ্যানং কামেব মানষিটা—'

'উ কহিছে তোমাক ? আধিয়ারি দিবার কাথা ?'

'না-হয়, না-হয়। মুই কহিছু।'

'উ তো হালের আগত থাকে। হালের পাছত্‌ বান্ধিলে উল্টা চাষ হবা ধরিবে।'

'কী কহিছেন ? চারি পুহে এ্যাত জমি তুমার আর ঐ মানষিটাক একখান আধিয়ারি দিবার না পারেন ?'

'আরে তোমরালা তো মোকই একখান আধিয়্যর বানাবার ধইচছেন। মুই আর কাক আধিয়ারি দিম ? খাড়াও কেনে। ঘরতে চলো। হাতমুখ ধোও। তার বাদে এইঠে আসি মিটিং দাও। আসিন্দিরক ডাকি, ভটভটিখান নি আসুক।' গয়নাথ, হয় কথাটা এড়াতে, নয়, সামাজিকতার তাড়ায় বারান্দা থেকে নেমে রাস্তার দিকে হনহন করে হাঁটে। এম-এল-এ পেছন থেকে চেঁচায়, 'হে কাকা শুনেন, হে—'

ছেচল্লিশ

এম-এল-এর লাথি

গাড়ির আওয়াজটা পাওয়া গিয়েছিল আগেই। সেটা ক্রমেই বাড়তে থাকে। তার পর, উত্তরে, কাঁঠালগুড়ির মোড়ে যে এদিকে ঘুরল সেটাও বোঝা যায় আওয়াজ থেকেই। তার পর, আলোটা রাস্তায় পড়ে। আর, সেই আলোটা আর আওয়াজটা বাড়তে থাকে। এই বারান্দায় বসে, এই মাঠটা পার হয়ে রাস্তায় গাড়িটাকে আসতে দেখা, যেন নদীব বান-আসা দেখার মত। কেউ একজন বলেও বসে, 'আসি গেইছে'।

গাড়িটা একটু এগিয়ে আড়াল হয়, যা হওয়ার কথা। ঐ মিষ্টির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছে, যা করার কথা। এম-এল-এ শুধু বলে দিয়েছিল, ক্রান্তি হাটের হল্‌কা ক্যাম্প।

গাড়িটাতে আওয়াজ ওঠাপড়া শুরু হয়। তারপরই আলোটাকে দেখা যায় ফাঁক-ফোকর দিয়ে হাটখোলায় পড়ছে আর সরে যাচ্ছে। শেষে এই বারান্দাটাকেও একটু ছুঁয়ে ঘুরে যায়। এইবার গাড়িটা একটা জোর আওয়াজ তুলে মাঠের দিকে ঘোরে। হেডলাইটের আলো এসে বারান্দায় ঝাঁপিয়ে পড়ে।

যে-ভাবে গাড়িটা মাঠ বরাবর মোড় নিয়েছিল তাতে হু-স করে মাঠ পেরিয়ে বারান্দার সামনে এসে দাঁড়াবার কথা। তার বদলে ব্রেক কষে গোঁ-গোঁ করতে থাকে আর মাঠ বরাবর আলোটা শুধু পড়ে থাকে।

গাড়ি থেকে একজন, দুজন, তিনজন, চারজন, পাঁচজন নামে। তারা মাঠটা পার হয়ে সোজা হাঁটতে শুরু করে। গাড়িটা রাস্তার ওপর উঠে দাঁড়ানোর জন্যে পেছুতে গেলে, এদের ভেতর দুজন হাত তুলে 'না' করে। বারান্দা থেকে সেই হাত-তোলা নিষেধটা ছায়ার মত দেখায়। আলোতে মাঠের কাদা-জল দেখে-দেখে এরা সাবধানে এই ঘরবারান্দার দিকে এগয়।

এ-রকম দেখে-দেখে আসে বলেই, সময় নেয়। বা, এদের আসাটা এ-রকম দেখতে হচ্ছে বলেই মনে হয় সময় লাগছে। তাছাড়া পাঁচজন কারা-কারা সেটাও এই বারান্দা থেকে সবাই বুঝে নিতে চায়। বারান্দার ওপরে ত এক কোনায় এম-এল-এ চেয়ারে, আর-এক কোনায় সুহাস চেয়ারে। প্রিয়নাথও দরজায় আসে। সিঁড়িতে যারা ছিল তারা উঠে দাঁড়িয়েছে। আর, ঐ পাঁচজনের পেছনে-পেছনে আরো অনেকে ওদিককার দোকানগুলো থেকে বেরিয়ে চলে আসছে। এতক্ষণ সবাই নানা জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অপেক্ষা করছিল, এখন জড়ো হয়ে যাচ্ছে।

ঐ পাঁচজনের দলটার ভেতর থেকে কেউ-একজন চিৎকার করে ওঠে, 'হে-ই বীরেনদা, তুমি কি আর মিটিং ডাকার জায়গা পাও নাই নাকি, এই কাদা মাঠ— ?' 'আরে, মণিদা আসছেন নাকি ?' এম-এল-এ

তাড়াতাড়ি পা নামিয়ে সোজা হয়, তার পর উঠে বারান্দার কোনায় গিয়ে দাঁড়ায়। এবার এম-এল-এই চিৎকার করে ওঠে, 'আরে মণিদা, আপনি আবার কোথা থিকে আসছেন ?'

'বাঃ বাঃ', এবার পাঁচজনের দলটা একেবারে কাছে চলে এসেছে, সিঁড়ির কাছের লোকজন সরে গিয়ে পথ করে দিচ্ছে, যাতে দলটা বারান্দার উঠে যেতে পারে, 'তুমি গিয়ে লাথি মেরে সব ক্যালভার্ট ভাঙতে পারো আর আমি এইটুকু আসতে পারি না ?'

এম-এল-এ হে-হে করে হেসে ওঠে, কিন্তু সে-হাসির আওয়াজটা একটু অন্যরকম শোনায়। তাকে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রিয়নাথকে বলতে হয়, 'একটা বিছানা-মাদুর-টাদুর কিছু পাওয়া যাবে, এখানে বসার জন্যে ?' প্রিয়নাথ ঘরের ভেতর ঢুকে যায়। সুহাসকে তার ঘরের সামনে চেয়ারটা ছেড়ে দাঁড়াতেই হয়। সে একবার ভাবে, চেয়ারটা এগিয়ে দিয়ে ঘরে ঢুকে যাবে। এই মিটিঙের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই। তার থাকাও বোধহয় উচিত নয়।

প্রিয়নাথ ঘরের ভেতর থেকে কয়েকটা চট বের করে আনে। সেগুলো একা-একা বিছিয়ে দিতে চেষ্টা করলে এম-এল-এ সিঁড়ির লোকজনের দিকে তাকিয়ে বলে, 'এই ধরেন কেনে আপনারা'। দুজন তাড়াতাড়ি উঠে এসে চটটা ধরে। গাড়িটা এতক্ষণে রাস্তার ওপর ওঠার জন্যে পেছুতে শুরু করলে মাঠটা ও বারান্দাটা একটু অন্ধকার ঠেকে। হ্যাজাকটাতে একজন এসে পাম্প দিতে শুরু করে।

এম-এল-এ কি ভেবেছিল, সে চেয়ারে বসে থাকবে আর ইনজিনিয়ার-অফিসাররা বসার জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে ? তা না-হলে বারান্দার ওপরে একটা বসার ব্যবস্থার জন্যে সে ত অনেক আগেই বলতে পারত।

মণিই প্রথমে বারান্দায় ওঠে—'আমি তোমার জন্যে মালবাজারে বসে আছি, আর তুমি এখানে খুব মিটিং করছ', মণি পকেট থেকে সিগারেট-দেশলাই বের করে।

'আরে আমি ভাবলাম ত ওদলাবাড়িতে সন্ধ্যাবেলায় একটু দেখাশোনা করি রাত্রিতে মালবাজারে চলি যাব। আপনার ত আজকে মালবাজারেই আসার কথা—কাল জলপাইগুড়ি যেতে হবে না ?'

'সেই জন্যেই ত এলাম। এসে শুনি তুমি নাই।'

'আরে ফুলবাড়ির ঐ জায়গাটা নিয়ে গোলমাল চলিছেই। আমার ত মাস-দুই-তিন আসাই হবে না, ভাবলাম গোলমালটা আজিকে চুকাই দেই।'

'তা চুকাও। কিন্তু এর পর ত তোমাকে সার্কাসের দলে নিয়ে নেবে—তুমি লাথি দিয়ে ক্যালভার্টের রেলিং ভেঙে দিলে ?'

সিঁড়ির কাছের ভিড় থেকে কেউ একজন চিৎকার করে বলে, 'সিমেন্টের বদলে বালি দিলে ত পোলাপানও লাথথি দিয়্যা ভাঙবার পারে। তা হালেই বোঝেন কী দিয়া ব্রিজ বানাইছে ?'

মণি সিগারেটে টান দিতে-দিতে সিঁড়ির ভিড়ের কথাটা শোনে। তার পর আস্তে করে এম-এল-একে জিজ্ঞাসা করে, একটু সময় দিয়ে, কিন্তু সবাইকে শুনিয়ে, 'আমি ত ভাবলাম, তোমার পা ভেঙেছে তাই এখানে পড়ে আছ, নিয়ে যেতে হবে। তা এঁরা বলছেন, না, উনি ঠিক আছেন—ক্যালভার্ট ভেঙেছে।'

এম-এল-একে এবার হেসে উঠতেই হয়। বলতে হয়, 'আমার কথা ছাড়ি দেন। ফুলবাড়ির মানষিদের সঙ্গে ত ইনজিনিয়ারদের দেখা হওয়ার দরকার।'

'ইনজিনিয়ারদের ত অফিস আছে—।'

'সে অফিস-টফিস হইয়্যা গিছে মণিদা, উনি ফুলবাড়ির লোক শুইনলেই কয়্যা দ্যান দ্যাখা হব না', সিঁড়ির ওপর থেকে একজন চেঁচায়।

'সে বলবেন, ওঁরা ত এসেছেন, এত চেঁচাচ্ছেন কেন ?' মণি সিঁড়ির দিকে দু-পা গিয়ে একটু কড়া গলায় বলে।

'এই চুপ যা চুপ যা মিটিং শুরু হোক।'

'না, আমিও ত কথার কথাই কইছি।'

'দেখি, দেখি', বলে সেই গেরিমাটি রঙের জামাপরা ভদ্রলোক ঢোকেন, পেছনে একজন মাথায় শতরঞ্চি। উনি বারান্দায় উঠে দাঁড়িয়ে লোকটিকে বলেন, 'টান-টান করি পাতি দেন।' এতজন উঠতে থাকার ফলে সিঁড়ির মুখটাতে একটা ভিড় হয়। হাট কমিটির মেম্বার ওপরে ওঠেন। মণি নেমে আসে। এম-এল-এ নেমে আসে। আর-একজন সিঁড়ির দুই ধাপ উঠে বলে, 'নমস্কার মণিবাবু।'

'আরে গয়ানাথবাবু, আপনিও এসে গেছেন ?'

'আসিবার নাগে ত, কহেন ?' আমাদের ক্রান্তি হাটের আজি কত সৌভাগ্য।'

'কী হল, এত সৌভাগ্য ?'

'এই যে আপনারা সব মিটিং করিবার সেন্টার বানিলেন, সৌভাগ্য না ?' বলে গয়ানাথ ইনজিনিয়ারদেরও দেখায়। তারা একটু দূরে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে। তাদের নিয়ে কিছু বলা হল দেখে একজন একটু হেসে জিজ্ঞাসা করে, 'কিছু বললেন ?'

মণি সিগারেট তুলেই 'না' জানায়।

গয়ানাথ মণিকে বলে, 'হেই মণিবাবু, শুনেন একটু।' সিঁড়ি থেকে নেমে একটু সরে দাঁড়ালে গয়ানাথ জিজ্ঞাসা করে, 'আতিত [বাত্রিতে] কতজন থাকিবেন ? পাকাবার শুরু করি ?'

'আরে না, না, আমরা এখনই যাব, এখনই, ও সব কববেন না।'

সাতচল্লিশ

ভাষণ ও ভাবন

হাট কমিটির এই শতরঞ্চিটা এত বড়, সুহাসের দরজা পর্যন্ত প্রায় গেছে। চওড়ার দিকটা মুড়ে দিতে হয়েছে। সুহাসের দবজাব কাছে, শতরঞ্চির মাথায় দুটো চেয়ার পাশাপাশি সাজানো। হ্যাজাকটা চেযার দুটোর কাছাকাছি রাখা। হাট কমিটির মেম্বার ভদ্রলোক সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে বলে, 'মণিবাবু, বসেন এইঠে। আগত কহি রাখিলে ত টেবিল-চেয়ার আনা যাইত কিন্তু এ্যালায় ত ইশকুল বন্ধ আর মাস্টার ত থাকে সেই মানাবাড়ি—'

'আরে না না, টেবিল চেয়ার লাগবে কিসে, এ ত আপনারা জনসভার ব্যবস্থা করছেন। আমাদের আর কতক্ষণের মিটিং হবে ? কী ? বীরেনদা ?'

'হ্যাঁ। এ ত মিটিং না হয়, কথাবার্তা কহিবার জন্যে', বলতে-বলতে এম-এল-এ বারান্দায় ওঠে। জুতো খুলে হাতে নিয়ে একেবারে হ্যাজাকের সামনে গিয়ে বসে। আর এম-এল-এর পেছনে-পেছনে সব্বাই বারান্দায় উঠতে শুরু করে। যে যার, জুতো খুলে হাতে নিচ্ছে। একটা দল গিয়ে হ্যাজাকের সামনে এম-এল-এর মুখোমুখি, কিন্তু বারান্দার কোনার দিকে বসে। সবাই বসে পড়ার পর দেখা যায় জায়গার তুলনায় লোক অত বেশি নেই। এম-এল-এ ডাকে, 'মণিদা আসেন, আর দেরি করা যায় না'।

মণি স্যান্ডেলটা বারান্দার ওপরে খুলে রেখে আসে। পেছন থেকে ইনজিনিয়ারদের একজন বলে, 'আপনারা দরকার হলে ডাকবেন, আমরা এখানে আছি।'

'কেন। কথা হবে আপনাদের সঙ্গে আর আপনারা ওখানে থাকবেন কেন', এম-এল-এ ইনজিনিয়ারদের দিকে তাকিয়ে বলে, যোগ করে, 'মুখখান পাছত করি-করি কথা কহিবার নাগিবে ?'

ইনজিনিয়াররা এবার একে-একে উঠতে শুরু করে। তাদের প্রথম জনের পায়ে ফিতেওয়ালা জুতো বলে নিচু হয়ে খুলতে হয়। একটু সময় নেয়। পেছনের দু-জন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই পা তুলে জুতোর বেল্ট খুলে নেয়। আর-একজনের পায়ে স্যান্ডেল। মণিবাবুর জুতোর পাশে জুতোগুলো খুলে রেখে ওরা একটু এগিয়ে, সকলের পেছনে দেওয়াল ঘেঁষে বসে।

হঠাৎ গয়ানাথ সিঁড়ি ভেঙে বারান্দায় উঠে আসে, তার পর সরু গলাটা তুলে জিজ্ঞাসা করে, 'মণিবাবু ও আমাদের এম-এল-এ মেম্বার, আমার একটা প্রশ্ন ছিল।' সবাই তাকালে গয়ানাথ বলতে থাকে, 'প্রশ্নটা হছে কি, এই মিটিংটা-কি প্রাইভেট দিছেন না জনসভা দিছেন ? য্যালায় প্রাইভেট মিটিং হবা ধরে, মোরা থাকিম না। কেনে। না, মোরা আপনার পার্টির মানষি না। আর যদি জনসভা দিছেন ত আমরা থাকিবার চাহি। কেনে। না মোরা জনসভার মেম্বার এবং মণিবাবু ও হামরালার এম-এল-এ মেম্বারের ভাষণ শুনিবার চাহি। কেনে—'

গয়ানাথকে থামিয়ে দিয়ে মণি বলে ওঠে, 'কী, বীরেনদা ?'

এম-এল-এ গয়ানাথকে বলে, 'আরে বসেন না বসেন, এ ত সবাব কথাই হচ্ছে, আপনি থাকিলে ত ভালই হয় । মোরা কহিবার পারিম গয়ানাথবাবুও এই মিটিঙে ছিলেন । আবে, যাব ঘরত আসি বসিলাম, তিনিই নাই', এম-এল-এ দবজার দিকে ঘাড ঘুবিয়ে ডাকে, 'কই, আপনিও আসেন-না ।'

সুহাস ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বলে, 'আমি আব এখানে কী—'

'আরে, বসুন না, বসুন', মণি ডান হাতটা ডাইনে ছড়িয়ে যেন জাযগা দেখায ইনজিনিযারদেরই দিকে । সুহাস এম-এল-এর সামনে দিয়ে আবার প্রথম দলটাব পাশ দিয়ে গিয়ে ইনজিনিয়ারদেব কাছাকাছি দেওয়াল ঘেঁষে বসে ।

গয়ানাথ আবার বলে, 'ঠিক আছে । আপনাবা আলাপন শুরু কবেন । মোব অনুমতিখান ত থাকিল । আপনাদের চায়ের ব্যবস্থা দেখি আসি, বসিম ।'

এম-এল-এ এমন ভাবে মুখটা তোলে যে সকলেই বোঝে এইবাব সে কিছু বলবে । কিন্তু এম-এল-এ হঠাৎ পাশে তাকিয়ে ঘাড় উঁচু করে সিঁড়ির দিকটা দেখে, ঘাড ফিবিয়ে চেযারের ওপরটা দেখে, বলে ওঠে, 'আমার ব্রিফকেসটা ?' সকলেই একবার খোঁজে যেন । প্রিয়নাথ ঘবেব ভেতব থেকে হাত বাড়িয়ে ব্রিফকেসটা দেয় ।

ব্রিফকেসটা পাশে রেখে এম-এল-এ বলে, 'শুনেন, এখন কথাটা আবম্ভ হওযা দরকার । এই কথাটা হওয়া উচিত ছিল ফুলবাড়িতে । কিন্তু সেখানে আমাদের এসিস্ট্যান্ট ইনজিনিয়ার সাহেব ছিলেন না । আব মালবাজারে তাঁর অফিসেও আমি কথাগুলি বলতে পারতাম । কিন্তু একটা মুখোমুখি কথার দবকার ছিল । তাই আমি এইখানে আসার জন্য বলি । উনি দয়া করে আসিছেন । আমাদের জিলা কৃষক সমিতির সম্পাদক কমরেড মণি বাগচিও আসছেন । সুতরাং এখন কথাবার্তা হইতে পাবে । তা হলে আমার অনুরোধ ফুলবাড়ির মানষি যারা, এইখানে আছে যাবা, তাদেবই উচিত প্রথমে সব বলা । তাদের কী বলার আছে । তাব বাদে আমরা ইনজিনিয়াব সাহেবেব কথা শুনিব । ত কন, ফুলবাডিব কমবেডরা কেউ কহেন ।'

যে দলটা এম-এল-এর মুখোমুখি বাবান্দাব কোনাব দিকে একসঙ্গে ছিল, তাবা নডেচডে বসে । সামনের একজনকে ধাক্কা দিয়ে বলে, 'হে-ই নকুইল্যা, তুই ক' কেনে ।'

সে ঘাড় ঘুরিয়ে বলে, 'কাকা কহেন ।'

যাকে কাকা বলা হয় সে মাঝামাঝি বসে ছিল । সে বসে থেকে এম-এল-এর দিকে তাকিয়ে উঁচু গলায় শুরু করে, 'এব মধ্যি এত কওনের-শোননেব কী আছে, জানি না । য্যাখন থিক্যা ঐ ফুলবাড়ির ফুলঝোরার উপব একখান ব্রিজ হইব বইল্যা ঠিক হইযাছে, তখন থিক্যাই নানা গোলমাল লাইগ্যাই আছে। আমরা গিয়্যা খোঁজ নেই, তা কয়, কেডা কইছে ব্রিজ হব, অ্যাঁ,' লোকটি একবার এম-এল-এর দিকে, একবার মণির দিকে, আর একবার মাথা ঘুবিয়ে ইনজিনিযাবদেব দিকে তাকায় । তাবপর মাথা ঝাঁকিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করে, 'কেডায় কইছে ব্রিজ হব, অ্যাঁ, কেডায় কইছে ? নে বাবা, আমরা ত পইড়ল্যাম গিয়া সাত হাত জলের তলায় ত ধরেন গিয়্যা, ঐ ফুলঝোরাব ব্রিজ নিয়্যা ত গত ত্রিশ বচ্ছর ধইর‍্যাই কত কাণ্ড । আমি যখন ধরেন বিশ বছরের জুয়ান তখন খগেন দাশগুপ্ত মন্ত্রী । আর সেই কী কয়, আরে তখুন মালবাজার জেনারেল সিট, কী নাম, সেই এম-এল-এ, তারে তখুন ত কইলেই কয়, হয়্যা গ্যাল গা, এই ধর সামনের বর্ষার আগেই হয়্যা যাবে নে, একবার ত কাণ্ড— ।'

লোকটি গল্প বলতে-বলতে একবার এম-এল-এব দিকে, একবার মণিব দিকে, আর একবার ইনজিনিয়ারদের দিকে ঘাড় বারবার ঘোবাতে-ঘোবাতে নিজেই ধীবে-ধীবে ঘুরে যায় । এখন তাব মুখ মণির দিকেই । মণি আর-একটা সিগারেট ধরিয়ে একটু এলিয়ে বসে আছে । মণি হেড়ে লম্বা । ফলে মনে হয় নিজেকে ভেঙেচুরে বসেছে যেন । তার মুখেচোখে বিরক্তির ভাবটা সে গোপনের চেষ্টা করে সিগারেটের ধোঁয়ার ছলে । লোকটি তখন বলতে শুরু করেছে, 'হইল কী, আমরা ত সেইবার পূর্তমন্ত্রীরে সবাই মিল্যা বলছি যে ব্রিজ নাই ত ভোট নাই । তাই শুইন্যা মন্ত্রী কয কী, সে কী ? ব্রিজ হয় নাই ? আমাদের ত জানা হইয়্যা গেল ব্রিজ হইছে, তার টাকাপয়সা সুদ্ধ্যা দেয়ানেয়া শ্যাষ । আমরা ভাবল্যাম, খাইছে । মিথ্যা কইর‍্যা যদি একবার ব্রিজের টাকা বাইর হয়্যা থাকে, আবার কি আর হইব ব্রিজ ? ব্যাস, খোঁজ-খোঁজ, কোথায় গেল ব্রিজ । অফিসাররা খুঁইজব্যার ধরল জলপাইগুড়ির অফিসের কাগজে—কই

গেল ব্রিজ। মন্ত্রী খুঁইজব্যার ধইরল কইলকাত্তার কাগজে—কই গেল ব্রিজ। আর আমরা হককলে খুঁইজব্যার লাইগল্যাম এইখ্যানে, কই গেল ব্রিজ।' লোকটি থামে। সে জানে এখানে হাসির জন্যে সবাই একটু সময় নেয়। সে নিজে খানিকটা হেসে সেই সময়টুকু দেয়। মণি এম-এল-এ-র দিকে তাকিয়ে হাতের পাতা একবার উল্টোয়। এম-এল-এর চোখ দেখে বোঝা যায় না, সে সেটা দেখল কিনা। কিন্তু গল্প যে বলছিল সে দেখে ফেলে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'মণিবাবু, আমি তাড়াতাড়ি কয়্যা দিচ্ছি। আচ্ছা, ছাড়ান দ্যান সেই গল্প। এখন কথাটা হইল কি—'

পেছন থেকে একটি ছেলে গলাটা তুলে বলে, 'কাকা, মুই কম ? এইবারকার কথাখান মুই কম ?'

কাকা আবার সকলের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, 'ক না ক্যা, আমি ত তগ কইতেই কই। আমি কথা শুরু কইরলেই সাত কইল্যানা কথা মনে আছে। আর তগ কাম হচ্ছে এই কইল্যানা। ধরেন কেনে, আমাগো সময় নেতা ছিল নরেশ চক্কত্তি-পটল ঘোষ, আর এ্যাখন আমাগো মণিবাবু লিডার, তারপর কী কয়, বীরেনবাবু এম-এল-এ। এ্যাহন ত তরাই কবি—ক, ক।'

কাকার গলার স্বরটা একটু উঁচুতে। সে টেনে-টেনে, নানা ভঙ্গিতে, স্বর তুলে নামিযে গল্পটা যখন বলছিল তখন কিন্তু ধীরে-ধীরে সেই গল্পের একটা আবহাওযা তৈবি হচ্ছিল। এমন-কি, এইখানে যারা ভদ্রলোক, সুহাস আর ইনজিনিয়াররা আর প্রিয়নাথ, যদি মণিকে নাই ধবা হয়, তাবাও যেন গল্পটার একটা টান বোধ করে ফেলছিল। এম-এল-এ এমন বসে ছিল যাতে মনে হয় গল্পটা সারারাত চললেও তার আপত্তি নেই, বা এখন থেমে গেলেও তার আপত্তি নেই, বা একমাত্র সে জানে কখন গল্পটা আপনি থেমে যাবে। একমাত্র মণি বাগচিই অধৈর্যে বারবার সিগারেট ধবাচ্ছিল। কিন্তু এই এলাকাটা বীবেনেব। বীরেন এখানে বসে থেকে এ্যাসিস্ট্যান্ট ইনজিনিয়ারকে ডাকিয়ে এনেছে। সুতরাং কী-হবে না-হবে সেটা বীরেনই ঠিক করবে। পরে নিশ্চয়ই বীরেনকে সে বলবে, এইভাবে যদি অফিসারদের হ্যারাস করা হয় তা হলে কোনো অফিসার আর-কোনো কাজ করার উৎসাহ পাবে না। কিন্তু মণি জানে, বীবেনও তাকে জিজ্ঞাসা করে বসতে পারে যে এ্যাসিস্ট্যান্ট ইনজিনিয়ার গিয়ে বলল আর মণি অমনি গাড়িতে কেন চড়ে বসল—এটা জেনেশুনে যে বীরেন ক্রান্তি হাটে নিজে বসে আছে। তাতে ত সবার ধারণা হল যে পার্টির ভেতর অফিসারদের খুঁটি হচ্ছে মণিবাবু। কিন্তু এমন আশঙ্কা আছে বলেই মণি ভেবে রেখেছে তাব কৈফিয়ৎ। বীরেনবাবু লোকজন নিয়ে ক্রান্তি হাটে বসে থেকে যদি ইনজিনিযারদেব ডেকে পাঠায় আর তারা যদি 'প্যানিকি' হয়ে মণির সাহায্য চায়, তা হলে ত অফিসারদের 'মর‍্যাল' রাখার জন্যেই মণিকে অফিসারদের সঙ্গে আসতে হয়। মণি জানে, তাদেব পার্টির ভেতর এখন সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা, অফিসাররা যেন 'ডিমর‍্যালাইজড' না হয়, তাতে দু-এক জায়গায় লোকজন একটু ভুল বুঝলে, বুঝবে। মণির ধারণা, পার্টির ভেতরের এই ঝোঁকগুলো বীরেন বুঝে উঠতে পারে না। কিন্তু তাই বলে মণি ত আর বীরেনের এলাকায় নাক গলাতেও পারে না।

আটচল্লিশ

এম-এল-এ ও অফিসার . সংলাপেব আরেক ধরন

তখন সেই ছেলেটি দাঁড়িযে উঠে বলতে শুরু কবে, 'কমবেডমন—।'

এম-এল-এ হাতটা তুলে বলে, 'বসি-বসি বলো হেমেন, বসি-বসি বলো।'

কাকা তখন একগাল হেসে একটা হাত তুলে নাড়ায়। কিন্তু হাসির বেগে কথা বলতে পারে না। কাকার ভঙ্গিতে অথবা এম-এল-এর কথায় ঐ দলটা হেসে ওঠে। দলটার ভেতব যে একটা বেশ উত্তেজনা পাকিয়ে উঠছিল, সেটা সত্ত্বেও সবাই হেসে ওঠে। হাসির ফলে উত্তেজনাটা যে একটু শিথিল হয়ে যায়, তা সত্ত্বেও হেসে ফেলে। আর হেমেন দুহাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ে।

'আরে, আরে, হল কী, হল কী, বলো, হেমেন,' মণি সোজা হয়ে বসে বলে। মণির দাঁতগুলো বড়-বড়। ফলে তার সব কথাই একটু রাগী-রাগী শোনায়। আর এর মধ্যে কাজের কথার শুরুটাও যে ঘটে না এতে ত মণি একটু বিরক্তই ছিল। ইনজিনিয়ারদের কাছে সে ঘটনাটা শুনেছে। কিন্তু এদের তরফের কথাটা ত শোনে নি। যদিও না-শুনেও সে বুঝে ফেলতে পারে, ঘটনাটা কী হয়েছে। অফিসারদের কথা থেকেই সত্য ঘটনাটা জানা যায়। মণি বুঝতে পারছে না, বীরেন ব্যাপারটাতে কতটা জড়িত! স্বাভাবিক ছিল, মালবাজারে গিয়ে ইনজিনিয়ারের সঙ্গে কথা বলা। বীরেন যখন তা করে নি, তখন মণিকে আগে বীরেনের মনটা বুঝতে হবে। মণির কথাতে একটু বিরক্তি থাকায় এই দলের হাসিটা থেমে যায়। কাকাও হাসি বন্ধ করে বলে, 'আরে, ঐটা ত তোতলা। কথা কইব্যার পারে না। তাই খাড়া হইয়া ভাষণ দিব্যার ধইরছে। ভাষণ দিলে হেমেন আমাগ তোতলায় না—' কাকার কথাতে আবার একটা হাসির দমক ওঠে। কিন্তু হেমেন হাতের ভেতর থেকে মুখ তোলে না।

'ছাড়ি দ্যান, মুই কহিছু', জব্বর দাঁড়ায়। ফুলবাড়ির সবচেয়ে বড় জোতদারের ছোট ছেলে। কংগ্রেসের বাড়ি, বড় ভাইরাও সব কংগ্রেস। জব্বর সাতষট্টি সালে প্রথম সি-পি-আই হল। তার পর বছর দুই পর-পর পার্টি বদলিয়ে এখন আবার বামফ্রন্টে ঘুরে এসেছে। টেরিলিনের প্যান্ট আর টেরিলিনের গেঞ্জি পরনে জব্বর দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করে, 'শুনেন, কথাটা ত ·বারই জানা। আমাদের ফুলঝোরার ক্যালভার্টটা তৈরি হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা প্রথম থিকেই এই ঠিকাদারের কাজে সন্তুষ্ট হতে পারি নাই। আমরা কেউই পারি নাই—আমাব বাবাও পাবে নাই, আবার জগদীশ কাকাও পাবে নাই। এইটা পার্টিব কথা না। আমাদের সবাইয়েব কথা। আমাদের ভয় ছিল ব্রিজটা ভাঙি পড়িবে। ত আজ আমাদের এম-এল-এ সাহেবের পায়ের আঘাতেই সেইটা হল। এটা আমাদের পরম সৌভাগ্য। কাবণ—'

জব্বরের কথায় বাধা দিয়ে ইনজিনিয়াবদেব ভেতর থেকে কেউ বলে, 'একটু জোরে বলুন, শুনতে পাচ্ছি না।'

জব্বর আঙুল নাড়ায যত বেশি, তত জোরে কথা বলে উঠতে পাবে না। গলাটা একটু তুলে সে বলে, 'আজ আমাদের সৌভাগ্য এম-এল-এ সাহেব ফুলবাড়িতে গিযাছিলেন এবং আমাদেব অভিযোগ সত্য কি না, ব্রিজ ভাঙি যেতে পারে কি না, সেটা পরীক্ষাব জন্য ব্রিজেব রেলিঙে নিজেই লাথি মাবিলেন এবং ব্রিজেব বেলিঙ ভাঙি গেল। অর্থাৎ কিনা, আমবা যদি পরে বলতাম তা হলে ফুলঝোবার মানুষের সবই দোষ হইত যে তোমরা নিজেরাই ব্রিজ ভাঙিছ, বুঝেন, অমাদের ব্রিজ আমবাই ভাঙিব? যে-ব্রিজেব জন্য আমাদেব কত মানুষেব কত কষ্ট গিয়াছে—' জব্বরের গলা উঠতেই এম-এল-এ হাত তুলে তাকে থামায।

'ঠিক আছে', জব্বব বসে পড়ে। এম-এল-এ পবিষ্কাব করাব জন্যে দু-[illegible]ব গলা ঝাড়ে। মুখের ওপব দুই-একবার হাত বোলায। বোঝা যায়, নিজেই এবাব বলবে। ইনজিনিযারদের দলটা দেয়াল থেকে পিঠ সরিয়ে সোজা হয়। মণি আব-একটা সিগাবেট ধরিযে পা গুটিযে সোজা হয়ে বসে। মণি বুঝতে চাইছে, বীবেন কী চায। আব ব্যাপাবটাব সঙ্গে এমন আচমকা জড়িযে পড়ে মণি একটা সমাধান তাড়াতাড়ি বেব কবে নিতে চাইছে। বীবেন সমাধান চায়, না, আরো পাকাতে চায়—তা অবিশ্যি মণি জানে না। আব, এখন, এই জব্বর ছোকবাব কথা শুনতে-শুনতে মণির মনে হতে থাকে যে সাব-এ্যাসিস্ট্যান্ট ইনজিনিযারেব কাছে খবর পেয়ে আচমকা এখানে আসতে হচ্ছিল বলেই এ্যাসিস্ট্যান্ট ইনজিনিযাব তাকে বুঝিয়েছে সে ব্যাপাবটি মেটাতে চায, মণিদেরই কথা মত, যদিও মণিদেব পার্টির লোকজনেব কথা ঠিক নয়। আজকের এই মিটিংটা একবার পাব হয়ে গেলে ঐ অফিসারই নানা প্যাঁচ কষতে পারে। যদি প্যাঁচ কষাকষিই চলে, তা হলে বীবেনের প্যাঁচটাই পড়ুক আগে। মণি, তার স্বভাব-অনুযায়ী, এতক্ষণ যা ভেবে আসছিল, তার বিপবীত সিদ্ধান্ত নিতে ঝুঁকছে। ততক্ষণে এম-এল-এ কথা শুরু করে দিযেছে। গযানাথ, হাট কমিটিব মেম্বাবসহ আবো অনেকে সিঁড়ি দিয়ে ওপবে উঠে এসে শতরঞ্চির মাঝখানটাতে বসে—সুহাসেব পাশে, ফুলবাড়ি বস্তিব দলেব পেছনে। শুদ্ধ্যা

'এটা ফুলবাড়ি বস্তির সবাই বলতে পাবে যে তাবা এই কনট্রাকটারেব ব্যাপাবে আমাকে, সবকাবকে ও ডিপার্টমেন্টকে অনেক চিঠি দিছে। আমার পক্ষ থিকে বলতে পাবি যে আমি সেই সব চিঠিব জবাব দিতে পারি নাই। কিন্তু আমি স্থানীয় পি-ডবল্‌-ডির এ্যাসিস্ট্যান্ট ইনজিনিয়ারের অফিসে সেই সব চিঠি

পাঠাইছি। আমাদের কি এ্যাসিস্ট্যান্ট ইনজিনিয়ার সাহেব একটু আলোচনা করিবেন সেই চিঠিগুলি বিষয়ে যে তিনি পাইছেন কি না, কী করিলেন, এই সব বিষয় ?'

এ্যাসিস্ট্যান্ট ইনজিনিয়ার এই ধরনের মিটিঙে অনভ্যস্ত ত বটেই, একটু ভয়ও পেয়েছে। উঠে দাঁড়ায়। এম-এল-এ বলে, 'আপনি বসেন, আমরা শুনতে পাব, বসে-বসে বলেন।

ইনজিনিয়ারকে একটু সময় নিতে হয় কী ভাবে শুরু করবে স্থির করতে, 'সভাপতি মহাশয়,' না, 'বন্ধুগণ', না, 'কমরেডস'। 'কমরেডস' বলা চলে না, কারণ বোঝাই যাচ্ছে এখানে সব পার্টির লোকই আছে। আর, জীবনে কোনোদিনই ইনজিনিয়ারকে 'বন্ধুগণ' বলতে হয় নি, বসে-বসে 'বন্ধুগণ' বলা যায় কি না বুঝতে পারে না। 'সভাপতি মহাশয়' অবিশ্যি বলা যায় কিন্তু এটা সভাপতির সভা, না, এম-এল-এর সভা ? খুব কম সময়ের ভেতর এতগুলো কথা তাকে ভেবে নিতে হয়। আর তখনই শোনে এম-এল-এ তাকে প্রশ্ন করে, 'আপনি এদের ডেপুটিশন আর আমার পাঠানো চিঠি ত পেয়েছেন ?'

'হ্যাঁ। এই ব্যাপারটা ত আমাদের এস-এ-ই মিস্টার মণ্ডল ডিল করেন। উনি বলতে পারবেন।'

'ওনার সঙ্গে ত আমাদের কথাবার্তা হইছে। উনিই ত আপনাকে খবর দিছেন। আমি জানতে চাই যে আপনি কখনোই চিঠিপত্রগুলা দেখিছেন, কি দেখেন নাই ?' এম-এল-এ খুব ঠাণ্ডা ভাবে প্রশ্ন করে। কিন্তু ফুলবাড়ির ভিড়টা এই কথাতে যেভাবে একসঙ্গে মাথা নাড়ে তাতে মনে হয় প্রশ্নটা খুব দরকারি।

ইনজিনিয়ার তখন বলতে শুরু করে, 'আসলে সরকারি অফিসেও এক-একজন অফিসার এক-একটা কাজের চার্জে থাকেন, সেই সব কাজের করসপনডেন্স ফাইলগুলোও তাঁরাই দেখেন। আমাকে যখন জানান তখন আমি জানতে পারি।'

এই কথায় এম-এল-এ হেসে ওঠে, সামান্য, তারপর বলে, 'আপনার অফিসের জন্যে এই নিয়মটা ত আপনার ভাল নিয়ম। সেটা আমি জানতাম না বলেই সব গোলমাল পাকি গেইছে। কিন্তু এক-এক সরকারি অফিসে এক-এক নিয়ম হইলে আমাদের মত মানষির বিপদ হয়।'

'সব সরকারি অফিসেই ত মোটামুটি এই নিয়মই হয়, এক-এক ফাইল এক-এক অফিসারের চার্জে। আমি ত ফুলঝোবা ক্যালভার্টের ফাইল সঙ্গে নিয়ে এসেছি।'

'সে ত আজ এখন আনবেন, আমরা সব এইখানে বসি আছি, ত আনবেন। কিন্তু আপনি য্যানং সরকারি অফিসের আইন জানেন, আমরাও ত দুটা-একটা জানি। আমি এমন সরকারি অফিসের কথা জানি অফিসের কোনো নতুন বিয়া-বসা মেয়ের চিঠি আসিলেও অফিসার নিজে পড়ি দেন—'

একটা চাপা হাসির দমক ওঠে। গয়ানাথ ঘন-ঘন মাথা ঝাঁকায়, যেন এ-রকম তারও অনেক জানা। হাট কমিটির মেম্বার চুপচাপ হাসে। আর মণি একটু অবাক হয়ে বীরেনের দিকে তাকায়। বীরেন এত থেমে-থেমে, এত গুছিয়ে-গুছিয়ে, ইনজিনিয়ারকে অপদস্থ করে দিচ্ছে ? এসেম্বলিতে বীরেন অবিশ্যি দুটো-না-তিনটে বক্তৃতা করেছে, কাগজে উঠেছিল। বক্তৃতা ও ভাল করে। আর এম-এল-এ হয়েও খাটে সবচেয়ে বেশি। কিন্তু তাই বলে এতটাই বদলে গেছে ?'

মণির যেন আর মনে থাকে না সে ইনজিনিয়ারদের কাছে শুনে তবে এখানে এসেছে। তার ম হয়—বীরেনের এই পরিবর্তন দেখাটাই তার লক্ষ ছিল।

এম-এল-এ বলে, 'তা হলে এই কথাটা এই মিটিঙে আর তোলার দরকার নাই যে আমরা আপনার চিঠির জবাব কেন পাই না।'

'না, সেটা আপনারা নিশ্চয়ই বলবেন। কিন্তু অমাদের অফিসে ক্ল্যারিক্যাল স্টাফ মাত্র দুজন। আর, টাইপিস্ট একজন। তিনি মেটার্নিটি লিভ নেয়ায় নতুন রিলিভিং হ্যান্ড আসে নি। আমাদের একজন এ্যাসিস্ট্যান্ট, টাইপের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সেও তিনি কোঅর্ডিনেশন কমিটির মেম্বার বলে—।'

'সে ঠিক আছে। কিন্তু আমি ত আপনাদের এইখানকার এম-এল-এ।'

এবারের হাসিতে ইনজিনিয়ারও যোগ দেয়, মণিও হেসে ফেলে। এম-এল-এ তখন বলে, 'আমি কি আমাদের এই এলাকায় যে-সব কাজ হচ্ছে তা নিয়ে কোনো কথা জানাবার থাকলে আগে জানি নিব কোন অফিসার কোন কাজের চার্জে আছেন, তার পর তার কাছে লিখব ?'

'না সেটা কেন হবে, আপনি আমাকেই লিখবেন।'

'কিন্তু আপনি ত আমার চিঠিরও কুনো জবাব দেন নাই। আমি আগে আপনাকে চিঠিতে জানালাম

যে আজ আমি ফুলবাড়ির ঐ ব্রিজটা দেখতে যাব। কিন্তু ঐখানে দেখি আপনাদের মিস্টার মণ্ডল আছেন। কিন্তু কথা ছিল ত আপনার সঙ্গে।'

'আমি ওটা বুঝি নি। আমি ভেবেছি মিস্টার মণ্ডল কাজটার চার্জে আছেন, উনি থাকলেই হবে।'

'আমার যদি আপনার সঙ্গে কোনো কথা থাকত আমি আপনার অফিসে যেতাম। কিন্তু আসলে এই কথাটা ঐ ব্রিজের সামনে হওয়া দরকার। কারণ এই অভিযোগটা হচ্ছে যে কনট্রাক্টার এই কাজটা ঠিকমত করে নাই—'

উনপঞ্চাশ

ঠিকাদার আর ইনজিনিয়ার····

'এই সব কমপ্লেন যদি একটু স্পেসিফিক না হয়, কী পার্টিকুলার কমপ্লেন, তা হলে ত ডিপার্টমেন্টের পক্ষে এনকোয়ারি করা মুশকিল। এতে আবার সব কাজেরই প্রগ্রেস হ্যামপার করবে। কনট্রাকটাররা ডিমব্যালাইজড হবে।'

'সে যদি ফুলবাড়ি বস্তির লোকেবা আপনাকে বলতেই পারত যে কী কী দোষ হচ্ছে তা হলে ত ওরাই ইনজিনিয়াব হত। কিন্তু যে-কথাটা বাববাব হচ্ছিল যে কনট্রাকটাব বালি আর সিমেন্টের মিশাল ঠিকমত বানাচ্ছে না। ফুলঝোবা দিযা বর্ষায ত বড স্রোত যায়। ঐ রকম পাতলা মিশাল ভাসি যাবে। এইটা কি আপনাদের কানে যায নাই?'

'হ্যাঁ। আমবা শুনেছি, কিন্তু স্পেসিফিক কমপ্লেন ত ছিল না, তাই—'

'মিশালেব—।'

ফুলবাডি বস্তির ভিড থেকে কেউ-একজন বলে, 'মশলাব।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মশলাব মিশাল কি আপনারা কেউ পরীক্ষা করে দেখছেন?'

'না। তা করা হয় নাই ঠিক। কিন্তু এইরকম ত কখনো করা হয়ও না। একজন কনট্রাকটার কেন ঐ-রকম কবতে যাবে—' সমবেত হাসিতে ইনজিনিয়ারের কথাট চাপা পড়ে যায়। ইনজিনিয়ার একটু অপ্রস্তুত হয়ে থেমে যায়।

'এইটি আপনি কী বললেন? কনট্রাকটাররা কাজে কেন ফাঁকি দেবে ‥ চুরি করবে তা আপনি জানেন না?' মণি খুব হেসে সিগারেটে টান দেয়।

'ঠিকাদাব আর ইনজিনিযাব
দ্যাশখান কইরল ছারখাব

এই বর্ষাকাল আইল, কুথায় কুন ফরেস্টের মধ্যে কুন নদী ভাঙল, ব্যাস, ফেল পাথর। কার পাথর, কেডায় ফ্যালে আর কেডায় হিশাব রাখে, কন! এক-একডা পাথর জলে পইড়লে ঠিকাদারের বার আনি আর সাহেবের চার আনি। আর যে-পাথরডা তুলাও হয় না, ফেলাও হয় না—সেই পাথরের চোদ্দ আনি সাহেবের, দুই আনি ঠিকাদারের।'

'এই বকম কথা হলে ত মুশকিল।'

'কাকা, চুপ কবেন, এই সব কথা বলবেন না, যদি ধরতে পারেন স্যালায কহিবেন', এম-এল-এর কথায ফুলবাড়িব কাকা হো-হো কবে হেসে ওঠে, 'এইডা ভাল কইছেন, তা হালি ত তিস্তাবুড়ির তানে হিশাব লইতে হয়, কী, না, বুড়ি কযডা পাথর পাইছ?'

'আজকা সকালে ঢালাই হল। আমি, ধরেন, সন্ধ্যার মুখে বা তার আগেই পৌঁছাই। আমি পরীক্ষা করার জন্য পা দিযা একটা ঝাঁকি দিছি। আপনাদের মিস্টার মণ্ডলও ছিলেন। কিন্তু পুরা রেলিং ঝর ঝর করি পড়ি গেল। এইটাও কি প্রমাণ না? আপনার মিস্টার মণ্ডল তখন আমাকে বুঝান যে সব জাযগাতেই নাকি এ-রকম হয়—' এম-এল-এ বলে।

মিস্টার মণ্ডল কিছু বলতে ওঠে কিন্তু ইনজিনিয়ার হাত তুলে তাকে থামিয়ে দেয়, 'কোনো ঢালাইই ত

চব্বিশ ঘণ্টা না গেলে জমে না, সে যত সিমেন্টই দেয়া হোক। বার ঘণ্টার মধ্যে পা দিয়ে ধাক্কা দিলে হিন্দুস্থান কনস্ট্রাকশনের বানানো রেলিঙও ভেঙে যাবে—', ইনজিনিয়ার এতক্ষণে হাসার সুযোগ পায়। ইনজিনিয়ারদের অন্য কারো হাসি তার সঙ্গে মেশে না বটে, কিন্তু বোঝা যায়, ঐ দলটাতে একটা সমর্থনের নড়াচড়া ঘটে। এতক্ষণ এম-এল-এ যে-রকম ঠাণ্ডা গলায় কথা বলছিল, ইনজিনিয়ারের গলায় এতক্ষণে সেই ঠাণ্ডা ভাবটা আসে। তার কথা বলার ভঙ্গিতে বোঝা যায়, এই বিষয়টা তার জানার সীমার মধ্যে আর এ-বিষয়ে তার কোনো ইতস্তত নেই।

এম-এল-এ জানত তার জন্যে এই বিপদটা অপেক্ষা করে আছে আর কথাটা এখানে আসবেই। তার অভিজ্ঞতায় সে জানে, এই নিয়ে আলোচনা যত এগবে, ইনজিনিয়াররা তত বেশি সুবিধে পাবে। আর, এই এম-এল-এ তার কাজকর্মে বারবারই এখানে এসে ঠেকে যায়। তার ঠেকে যাওয়ার আরো অনেকগুলো জায়গা আছে, কিন্তু সে সব কিছুর ভেতর এই জায়গাটা এলে যেন পুরো আটকে যায়। এম-এল-এ মাথা ঠণ্ডা রেখে বলে, 'শুনেন, এইটা ত তর্ক করি মীমাংসা হবে না। আমাদের সন্দেহ ঠিক কি বেঠিক তার ত একটা পরীক্ষা হওয়ার নিয়ম আছে। সেই নিয়মটা আপনি বলেন আমরা শুনি।'

ইনজিনিয়ার ঠাণ্ডা গলাতে জবাব দেয়, 'ঐ মিকশ্চারের স্যাম্পল নিয়ে স্টেট টেস্টিং ল্যাবরেটরিতে পাঠাতে হবে। তারা রিপোর্ট দেবে।'

'এই কেসটাতে আপনারা সেটা করতে রাজি আছেন?'

'আমাদের রাজি-অরাজির ত কোনো কথা নেই। আপনারা যদি করতে বলেন আমরা পাঠাব। কিন্তু তা হলে ত যতদিন রিপোর্ট না আসে ততদিন কাজ বন্ধ রাখতে হবে?'

'কাজ আর বন্ধ থাকবে কী? রেলিংটা আর বানাবেন না, এই ত? কী? আপনাদের কি রেলিং ছাড়া খুব অসুবিধা হবে?'

'ঐ ব্রিজ তুমি নি গেলেও হামরালার কুনো অসুবিধা নাই, আজি বাদে কালি ত ভাঙি পড়িবেই, অ যতই ইনজারি বলেন না কেন', ফুলবাড়ির দলের ভেতর থেকে কেউ বলে।

এম-এল-এ ধমকে ওঠে, 'আজেবাজে কথা ছাড়েন, যা শুধাছি সেইটার জবাব দেন।'

এর ভেতর ইনজিনিয়ারদের ভেতর কিছু কথা হয়। ইনজিনিয়ার বলে, 'আপনি শুধু রেলিং বলছেন কেন, প্ল্যাটফর্ম আর বোর্ডের মধ্যে আর্থ ওয়ার্কও বাকি আছে, সেটাও হবে না। মানে ব্রিজটা ইউজ করা যাবে না। তা ছাড়া স্যাম্পল ত শুধু রেলিং থেকে নিলে হবে না, সব পার্ট থেকেই নিতে হবে।'

'খাড়ান, একে একে কন। মানে রাস্তা আর ব্রিজের মাঝখানের ফাঁকখান বুজান হবে না, এই ত?'

'হ্যাঁ।'

'আপনারা একবেলা কাম করি বুজি নিবার পারিবেন না?' ফুলবাড়ির দলটাকে এম-এল-এ জিজ্ঞাসা করে।

'হয়। কনট্রাকটার বুজালেও ত আমাগো দিয়্যাই কইরত। এইডাও আমরাই কইরব। বিনা পয়সায়।'

মণি বুঝে উঠতে পারে না, বীরেন কোন দিকে যাচ্ছে ও কেন যাচ্ছে। ফুলঝোরার এক দুই-হাতি ক্যালভার্ট নিয়ে কোথায় স্যাম্পল পাঠাবে, আর, এই সুযোগে অফিসার আর ঠিকেদার মিলে এদিককার সব কাজ বন্ধ করে দেবে। তা ছাড়া এই ব্যাপারটা নিয়ে এতদূর কেন যাওয়া হবে, মণি তাও বুঝে উঠতে পারে না। ফুলবাড়িতে তাদের পার্টির লোকজন কোনো কালেই নেই, এই সরকার হাওয়ার পর হয়েছে, সরকার চলে গেলেই চলে যাবে। আর বীরেন এতদূর যাচ্ছেই-বা কেন। এর সঙ্গে ত নীতির প্রশ্ন জড়িত। পার্টির ভেতরে বারবার আলোচনা হয়েছে, এমন কিছু কখনোই কেউ করবে না যাতে লোক্যাল থানা বা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, বা গবর্মেন্ট অফিসাররা ছুতো ধরতে পারে। মণি বোঝে, তার এবার কথা বলা উচিত। কিন্তু সে ঠিক করতে পারে না, এখানে যা হয় তা হতে দিয়ে, পরে, মানে, এখান থেকে ফিরে, মালবাজারেই, ইনজিনিয়ার আর বীরেনকে নিয়ে বসে একটা মিটমাট করে দেবে, নাকি, এখানেই সে কথা বলবে। কিন্তু বীরেনের সঙ্গে আগে ত কথা বলে নি। সে জানে না, বীরেন এতটা রেগে আছে কেন।

তা হলে আজ রাত্রিতে বীরেনের সঙ্গে কথা বলে, কাল সকালে ইনজিনিয়ারকে আসতে বলতে পারে।

আর-একটা কথা কী বলছিলেন ?'

'স্যাম্পল ত সব জায়গা থেকেই নিতে হবে, সেই কথা।'

'তার জন্যে কি পুরা ব্রিজ ভাঙতে হবে, নাকি ?'

'না, তা কেন, একটু নিলেই হবে ভেঙে।'

'তা হলে কি তাই ঠিক হবে ?' এম-এল-এ সবার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে।

পঞ্চাশ

এম-এল-এর রাগ ও মিটিঙের শেষ

'কনট্রাকটারের পক্ষ থেকে এই লোকটি কিছু বলতে চায়'—ইনজিনিয়ার তাদের দলের মধ্যে বসে থাকা একজনকে দেখিয়ে বলে।

'হ্যাঁ, বলেন, আপনি ঠিকাদারের লোক ?' এম-এল-এ জিজ্ঞাসা করে।

লোকটি উঠে দাঁড়িয়েছিল, বলল, হ্যাঁ, স্যার। আপনারা এই মিটিঙে যা ঠিক করবেন সে আমার মালিক বুঝবে, আমি কাল জলপাইগুড়ি গিয়ে মালিককে জানাব। কিন্তু আমাদের নিয়ে ত অনেক কথা এইখানে হল। আমরাও তা হলে কিছু কথা বলতে চাই, সেইটা আপনি বলেন।'

'বলেন, আপনি কী বলতে চান, বলেন', এম-এল-এ বলে।

'আপনাবা ত কনট্রাকটার এই সব নিয়ে এত কথা বললেন। কনট্রাকটার ত আর এক রকম না। আমাব মালিক বড় কনট্রাকটাব। এই সব ছোট কাজ করেন না। সে এই সাহেবরা জানেন। মণিবাবু জানেন। এম-এল-এ বাবুও জানেন। কিন্তু হল কি, আমি ওব সঙ্গে নানা সাইটে কাজ করছি পাঁচ-সাত বছর। এই রকম ছোট কাজ আমি মালিককে বলে ওনার নামে টেন্ডার দেই। আমার ত আর লিস্টে নাম নাই। আমাব মালিকেব টেন্ডাব থাকলে সেটা ত সবাই জানবেই। আর রেট অনেক লো ছিল। কেন, না আমি নিজেই বাজেব কাজ জানি। আমার দুই ভাই আছে, ওরাও জানে। আর কিছু লোক লাগাই। তাতে আমরা লো-তে কাজ তুলে দিযে মোটামুটি লাভ করতে পারি। এখন হল কি, মালিক যদি দেখে তাব কোম্পানির নাম নিয়ে এইসব গোলমাল হচ্ছে, তাতে মালিকের বদনাম হয়ে যাবে, মালিক আমাকে ববখাস্ত কবে দেবে। মানে চাকবি যাবে না ঠিকই, কারণ আমি মালিকের বিশ্বাসের লোক। কিন্তু এই যে আমি ছোট-ছোট কাজ কবে নিজের একটা কাজ বানাচ্ছি এইটা আমার একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে.' লোকটি কথা শেষ কবে দাঁড়িযে থাকে। এম-এল-এও তার দিকে তাকিয়ে থাকে। বোঝা যায়, এই লোকটিব কথাতে অবস্থাটা আবাব বদলাতে শুরু করেছে। মণি ভাবে, এই সুযোগটা সে নেবে। সে সিগাবেটটায় টান দিয়ে কথা শুরু কবাব আগেই এম-এল-এ বলে ওঠে, 'সেটা তুমি অফিসারদের বলো। আমবা ত তাদেব কবে থিকে বলছি যে এই ব্রিজ নিয়া একখান গোলমাল পাকি যাবার ধরিছে। ত অফিসার আমাদেব কথার কোনো ত দামই দেন নাই। ত যাউক, টেস্ট-মেস্ট হইয়া আসুক—'

লোকটি বলে, 'এইটা নিযে আমাব কথা আছে। আমি এতদিন বলি নাই। কিন্তু এখন ত আমার বিপদ হয়ে যাচ্ছে। তাই বলতেই হচ্ছে। আমি কারো নাম বলব না। আপনারাও জিগেস করবেন না। আমরা যখন প্রথম এইখানকাব কাজ ধবি, মানে সাইটে আসি, তখনই এখানকার কয়েকজন এসে বলেন আমরা সবকাবের পার্টির লোক, আমাদের পাঁচ বস্তা সিমেন্ট দিতে হবে। আমি কীভাবে কাজ করি তা ত আপনারা শুনলেন। পাঁচ বস্তা সিমেন্ট দিলে আমার আর কী থাকবে। আমি বললাম, ভাই, একটু-আধটু নিতে হয় নাও, কিন্তু এত সিমেন্ট আমি কোথা থেকে দেব। কিন্তু তারা রাজি হয় না। উনি ওর একটা ঘরের বাইবের জায়গাটা ইট-সিমেন্ট দিয়ে বাঁধাতে চান। সেইটা আমি রাজি হই নাই বলেই আমার এই অবস্থা। আগে জানলে আমি দিয়ে দিতাম। কিন্তু তখন বুঝি নাই যে এত কাণ্ড হবে। আমি এতদিন এ-কথা বলি নাই। কিন্তু আজ না বললে আমার বিপদ বলেই বললাম.' লোকটি বসে পড়ে। ফুলবাড়ির

দলটার মধ্যে কথাবার্তা শুরু হয়ে যায়। কিন্তু মণি তার আগেই এম-এল-একে আস্তে করে বলে, 'আমি একটু বলছি।' তারপর দাঁড়িয়ে ওঠে।

কিন্তু, সঙ্গে-সঙ্গেই গয়ানাথ উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'মণিবাবু, আমাদের ত এইটা একখান সৌভাগ্য কিনা তোমরালা সকলে, এম-এল-এ আর এ্যানং সব ইনজিনিয়ার মোর এই ক্রান্তিহাটত আসিছেন। ত হামরালা তোমাক চা খিলাবার চাই। যদি বলেন ত এ্যালায় আনিবার কহি।'

'আনেন, চা খাওয়াবেন সে ত ভাল', বলে মণি অপেক্ষা করে, গয়ানাথ আর হাট কমিটির মেম্বার উঠে নীচে নামা পর্যন্ত, তারপর বলে, 'আমার এর মধ্যে কোনো কথা বলা উচিত না, আমি হঠাৎ এসে পড়েছি। কিন্তু আমার মনে হল কোথাও একটা ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে, না হলে এ-রকম ঘটনা কেন ঘটবে, এত ত ব্রিজ তৈরি হচ্ছে, রাস্তা তৈরি হচ্ছে। একটু আগে সাবধান হলে বোধ হয় এত গোলমাল হত না। আমাদের ইনজিনিয়ার যদি আমাদের এম-এল-এর চিঠির জবাব দিতেন বা তাঁদের ভেতর যদি যোগাযোগ হত, তা হলে অনেক আগেই এ সব মিটে যেত। কী বলেন, ইনজিনিয়ার সাহেব?'

ইনজিনিয়ার সে-ইঙ্গিত বুঝে ফেলে, বলে, 'আমার এটা নিশ্চয়ই দোষ হয়েছে। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম মিস্টার মণ্ডল—'

ইনজিনিয়ারকে থামিয়ে দিয়ে এম-এল-এ হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে, 'আপনার মানষিলার খুব প্রেস্টিজ লাগে, না, সিডিউল সিটের এম-এল-একে পাত্তা দিতে?'

মণি হঠাৎ চমকে গিয়ে বলে ওঠে, 'এই বীরেনদা, কী বলছ? এম-এল-এ মণিকে বলে ওঠে, 'আপনি চুপ করেন, আপনারা এইসব বুঝবেন না, আপনাদের সঙ্গে ত এরা এ-রকম করে না। আপনারা ইংরাজি কহিলে ইংরাজি কহিবার পারেন। আমিও এই সব বুঝিতাম না, এম-এল-এ না হইলে। না-হইলে উনি মালবাজারের এক এ্যাসিস্ট্যান্ট ইনজিনিয়ার, উমরার সাহস হয় কী করি, মোর চিঠি আগত পাইছেন তবু ঐঠে হাজির না থাকিবার? আর এ্যালায় যদি জলপাইগুড়ি কি ধূপগুড়ির এম-এল-এ চিঠি দিত তার বাদে দশবার গিয়া স্যার স্যার করিতেন। ত হউক কেনে, বিচার হউক। যাউক মশলা টেস্ট করিবার। কিন্তু যদি দোষ বাহির হয়, তবে ঐ একখান গরিব ঠিকাদার আর ঐ আর-একখান সিডিউল-কাস্ট মণ্ডলের উপর দোষ চাপানো চলিবে না; ইনজিনিয়ারক দায়ী হওয়া লাগিবে।'

এই কথাব জবাবে ইনজিনিযাব বুঝি কিছু বলতে চায়, কিন্তু মণি হাত তুলে থামায়। মণি দাঁড়িয়েই থাকে। সে দাঁড়িযে আছে একমাত্র এই কারণে যদি বীরেনদা চুপ করে। মণি যে ইনজিনিয়ারকে থামিয়ে দেয় সেটা দেখে এম-এল-এ আবার বলে ওঠে, 'উমরাক থামাছেন কেনে, কহিবার দ্যান, আর নতুন কী কহিবেন? স্যালায দেখিলেন ঐ সব টেস্টমেস্ট বলিয়াও হামরাক ঘাবড়ান গেইল না, স্যালায় ঠিকাদারের মানষিক দিয়া বলিবার ধইরছে যে এই ফুলবাড়ির মানষিগিলাই চোব।'

ফুলবাড়িব দলটা একসঙ্গে ফুসে ওঠে, 'নাম কহেন, নাম কহেন, আমরা তাক ডাকি আনিব', দলের ভেতব থেকে দু-চারজন দাঁড়িয়ে উঠে ইনজিনিযাবদের দলটার দিকে চেঁচায়। মণি তাদেব দিকে হাত বাড়িয়ে বলে, 'বসি পড়েন, এই বসো।'

এম-এল-এর রাগ ঠিক সেই সময় চরমে ওঠে, 'করিবেনটা কী? ঠিকাদারের চুরি ধরিলে আপনাকে চোর বানাবে, ইনজিনিয়ারক ফাঁকি ধরিলে আপনাক ঠক বানাবে, আইন ধরি চলিবার রাজি হইলে আপনাক বেআইন বানাবে, কালি গিয়া খবরের কাগজ-এডিওতে প্রচার করি দিবে—আবার ডুয়ার্সে গণআদালত, ইনজিনিযারদেব বিচাব।'

মণি নিচু হয়ে এম-এল-একে অত্যন্ত দ্রুত কিছু বলে, তারপর সোজা দাঁড়িয়ে চিৎকার করে, 'শোনেন, আপনারা যদি না-বসেন আমি এ মিটিং এখনই ভেঙে দেব, বসেন বসেন।'

ধমকে ফুলবাড়ির দলটা বসে পড়তেই মণি চিৎকার করে বলতে শুরু করে, 'শোনেন, এমন কিছু হয় নাই যে এখানে একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামা বেধে যাবে। এখানকার ইনজিনিয়ারদের ব্যবহারে আমাদের এম-এল-এ খুব দুঃখিত হয়েছেন। এম-এল-এ আমাদের সকলের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। সুতরাং এম-এল-এর দুঃখ আমাদের সকলের দুঃখ। তার দুঃখ আমাদের দূর করতে হবে। কিন্তু তিনি ত কোনো ব্যক্তিগত কারণে দুঃখ পান নাই। দেশের একটা কাজে এ-রকম একটা গোলমাল হয়ে গেছে বলেই তার দুঃখ। সরকারি কাজকর্মের নিয়মই আলাদা। সেই নিয়মে হয়ত ইনজিনিয়ারসাহেব ভেবেছেন যে ছোট ইনজিনিয়ারই সব বুঝিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু ইনজিনিয়ারসাহেবের উচিত ছিল এম-এল-এ

সাহেবের সঙ্গে দেখা করা। কিন্তু এই সব রাগারাগি দিয়ে ত আর আমাদের এই অঞ্চলের কাজকর্ম চলবে না। তার ওপর আমরা ঠিকাদারদের কথাও শুনলাম। সেও একজন অতি ছোট ঠিকাদার। সে যদি আজ আইনের প্যাঁচে পড়ে যায় তা হলে বড় ঠিকাদার তাকে বাঁচাতে আসবে না, সেটাও আমাদের দেখতে হবে। তাই আমি প্রস্তাব দিচ্ছি যে, এই সভায় ত সব খোলাখুলি আলোচনা হল। এখন এইটুকু একটা ব্রিজ নিয়ে হিল্লিদিল্লি করার দরকার নেই। মালবাজারে একদিন এম-এল-এ, ইনজিনিয়ার, ঠিকাদার ও আপনাদের ফুলবাড়ির দুইজন লোক মিলে বসে সব মীমাংসা করে নেন। তাতে ব্রিজের কোনো অংশ ভেঙে যদি আবার তৈরি করতে হয়, তৈরি করে দিতে হবে। আর দুটো-একটা বর্ষায় ব্রিজের কোনো ক্ষতি হয় কিনা সেটা পরীক্ষা করার জন্যেও সময় দিতে হবে।'

ঠিক এই সময়, গয়ানাথ আর হাট কমিটির মেম্বার আগে-আগে ও তাদের পেছনে-পেছনে একটি ছেলে একটা বড় কেটলি, আর-একটি ছেলে একটা ঝুড়ি, আর-একটি ছেলে আর-একটা ঝুড়ি নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে বারন্দায় উঠে একেবারে শতরঞ্চির মাঝখানে চলে এলে, মিটিংটা যেন ভেঙে যাবার মত হয়। সেই ভাঙা মিটিঙের ওপর দুটো হাত তুলে মণি জিজ্ঞাসা করে, 'তা হলে এইটাই ঠিক ত ? তা হলে এইটাই ঠিক থাকল ?'

গয়ানাথ আর মেম্বার মিলে চা দেয় হাতে-হাতে, চা নয়, চায়ের গ্লাশ। আর কেটলি হাতে ছেলেটি গ্লাশগুলোতে চা ঢালে, 'হেই দেখির্স কেনে, ফেলিস না গাওত্।' ঐটুকু ছেলের অত বড় কেটলি নাড়ানোর অভিজ্ঞতা এমনই যে সে কোনো গ্লাশেই এতটা চা ঢালে না, যাতে উপচে যায়। গ্লাশ দেয়া হয়ে গেলে গয়ানাথ আর মেম্বার মিলে আর-এক ঝুড়ি থেকে প্রত্যেককে একটা করে সিঙাড়া আর একটা করে মিঠা নিমকি হাতে-হাতে দিতে শুরু করে।

এইসব মিটিং যেমন ভাঙে, এই মিটিংটাও তেমনি ভাঙতে শুরু করে। কথাবার্তা, ঝগড়াঝাঁটি, রাগারাগি, মিলমিশ এই সবের ভেতর দিয়ে বেশ একটা তৃপ্তির ভাব আসে। খুব বিশেষ-বিশেষ উপলক্ষ ছাড়া এত রাতে এতগুলো মানুষ একই সঙ্গে এক জায়গা থেকে বেরচ্ছে এমন ঘটনা ক্রান্তিহাটে খুব হয় না। ফলে, মিটিং ভাঙার মধ্যে একটা নতুন অভিজ্ঞতার আরামও জোটে।

গাড়ি করে যারা মালবাজারে ফিরে গেল, মণি, এম-এল এ ও ইনজিনিয়ার, ঠিকাদার, আর, এখানে সুহাস, এই আরামের ভাগিদাব নয়। আর নয় গয়ানাথ, কিছু পরিমাণে।

একান্ন

এক মিটিঙের তিন ফল

চা-সিঙাড়া খেতে-খেতে মিটিংটা ভাঙার পর সবাই নানা দলে ভাগ হয়ে যায়। ক্রান্তিহাটের দল মালবাজারের গাড়ি চলে গেলে যে যাব বাড়ি চলে যাবে। গয়ানাথ আর হাট কমিটির মেম্বারকে এম-এল-এ বলে, শতরঞ্চিটা বেখে দিতে যাতে ফুলবাড়ির ওরা রাতটা ঘুমতে পারে, আর সুহাসকে বারবার দুঃখ জানায় তার ঘাড়ে এসে মিটিঙটা করল বলে। মিষ্টির দোকানদার হ্যাজাক নিয়ে যেতে লোক পাঠায়। সেই লোকটি হ্যাজাক ধরে পথ দেখিয়ে এম-এল-এ, ইনজিনিয়ার ও মণিবাবুকে জিপ গাড়ির সামনে নিয়ে যায়। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে তৈরিই ছিল বলে বিদায় নিতে দেরি হয় না।

গাড়িটা মিনিট দু-এক চলার পরই ইনজিনিয়ার এম-এল-একে বলে, 'বীরেনবাবু, আমি না বুঝে আপনার সেন্টিমেন্টকে আঘাত দিয়েছি। বিশ্বাস করুন, সত্যি আমি ও-রকম কিছু ভেবে কিছু করি নি। আপনি কিছু মনে করবেন না। আর এই ব্রিজের ব্যাপারটা আপনি ভাববেন না, আমি দেখব।'

'আপনি আগে দেখলেই ত এত গোলমাল হত না। আমিও জানি লোক্যাল ঘটনা সব আছে। ধরেন, ঐ জব্বরের দাদারাই ত কনট্রাকটরি করে। ওরা সব যেই দেখছে এদিকে এই সব কাজ শুরু

হইছে—অমনি বলা-কওয়া শুরু করে দিছে যে লোক্যাল কনট্রাকটারদের দিয়া কাজ করিবার লাগবে। এই মিটিঙেই সেই কথা তুলত, নেহাত সুযোগ পায় নাই। আবার এই ভদ্রলোক ঐসব বললেন, এই নিয়ে সাত কথা হবে।'

'আমি স্যার বুঝি নাই, ঝোঁকের মাথায় বলে ফেললাম।'

'না ঐ কথাটা তুমি বলতে গেলে কেন, তুমি ত আর নামধাম বলবে না, সে-কথা কি আর দশ জনের সামনে বলা যায়', সাব-এ্যাসিস্টান্ট ইনজিনিয়ার মণ্ডল বলে।

'যাক, ছেড়ে দিন। আসলে এ-সব লোক্যাল ইস্যু বাড়তে দিলেই বাড়ে। তার ওপর নানা রকম ইন্টারেস্ট আছে। পলিটিক্যাল ইন্টারেস্টই কি কম। আপনারা একটু ট্যাক্টফুলি চলবেন। বীবেনদাও যদি আপনাদের ওপর রাগ করেন, তা হলে আর আপনারা কাজ করবেন কাকে নিয়ে? বীবেনদাই-বা অত রেগে গেলে কেন? আরো যাও লাথি মেরে রেলিং ভাঙতে, এখন পা-ব্যথা করছে?'

'আরে না, না, আমি কি আর জোরে লাথি মাবতে গেছি? তবে আপনারা যাই বলেন, ঐ-রকম পাটকাঠির মতন রেলিং কোনো ব্রিজের থাকে না।'

আপনি ও নিয়ে ভাববেন না স্যার, আমি কাল সকালে ঠিকাদার আর মণ্ডল দুজনকে নিয়ে গিয়ে দেখে কী ভাবে কী করা যায় ঠিক করে আসব। আমি আপনাকে জানিয়ে দেব।'

সে শুধুই দর্শক আর শ্রোতা ছিল যে-মিটিংটাতে, তার অভিজ্ঞতা সুহাস নিজের কাছে ছকে নিতে চায় কিন্তু পারে না। শেষ পর্যন্ত ত ধরা পড়ে যায় গ্রামের ভেতরের কোন-একটা ছোট নদীর ওপর তৈরি ক্যালভার্টে নিয়ম অনুযায়ী সিমেন্ট-বালি-লোহা এই সব ব্যবহার করা হয়েছে কি না তা নিয়ে এম-এল-এর এত গভীর উদ্বেগের আসল কারণ তার চিঠি পেয়েও এ্যাসিস্ট্যান্ট ইনজিনিয়ার না এসে সাব এ্যাসিস্ট্যান্ট এসেছে কেন, আর তাকে 'স্যার' বলা হয না কেন। যদি ইনজিনিযাবটি ফুলবাড়িতে যেত, তা হলে ত আব এ-বকম একটা মিটিং হত না। যদি কোথাও কোনো গোলমাল থাকত তা হলে সেটা ঐ ইনজিনিযাবেব অফিসেই মিটমাট হত—যেমন এখনো হবে। যে-নিয়ম ও আইনকানুনের কথা বারবার ইনজিনিয়ার ভদ্রলোক বলছিলেন, সুহাস তা মেনে ন নিয়ে পারে না, শুধু এই নেহাত ব্যক্তিগত কাবণে যে তাব কাজেব ভেতব এ-বকম হস্তক্ষেপ হলে তাবও ত একমাত্র বক্ষাব্যবস্থা সবকাবি ঐ আইনকানুনই। আব এত মিটিং-টিটিং সত্ত্বেও সকলের চোখেব সামনেই ত ইনজিনিযাব ওদেব কৃষক সমিতির সম্পাদককে গাড়ি কবে নিয়ে এল। এটা আব কে না বুঝবে ঐ ভদ্রলোক ইনজিনিযাবদেব নিরাপত্তার গ্যারান্টিই শুধু ছিলেন না, এমন-কি এম-এল-এব সঙ্গে ঝগডাবও একমাত্র মীমাংসাকর্তা ছিলেন তিনিই।

এই সরকারি চাকবিতে ঢোকাব আগে সুহাস গ্রাম ও কৃষক নিয়ে এক জাগবণেব অনির্দিষ্ট অথচ যেন সম্ভাব্য চিন্তায মগ্ন ছিল। অনির্দিষ্ট বলেই তাতে এমন সব নেহাত বাস্তব ঘটনাব জাযগা কবে দিতে পাবে না সুহাস যে সরকারি পার্টির লোক হবার সুবাদে কনট্রাকটারেব কাছ থেকে কিছু সিমেন্ট আদায কবাব চেষ্টা আর ঠিকেদারদের কাজের ওপর এমন নজব রাখা একই সঙ্গে ঘটতে পারে। বাস্তবে, ঘটনাব গায়ে ঘটনা, কার্যকারণের শৃঙ্খলা ছাডাও যে লেগে থাকে, আর সেই একটি ঘটনার ভূমিকা যে অন্য ভূমিকার ওপব নির্ভবশীল থাকে না সব সময, কোনো-কোনো সময় আলাদা ও স্বাধীন হয়ে যেতে পাবে, এমন সম্ভাবনার কথা সুহাস ত জানে না। তাই তাব ব্যক্তিনিবপেক্ষ মহত্তব-বৃহত্তব কামনাবাসনায গ্রহণই লেগে থাকে সুহাসেব। বীরেন্দ্রনাথ রায়বর্মনেব মত এক স্থানীয এম-এল-এ-ব সঙ্গে সবকাবি চার্কবিব ঐতিহ্যবান ইনজিনিয়াবদেব এই মোকাবিলায এম-এল-এ যে ইনজিনিযাবকে তাদেবই খেলাব নিযমে প্রায় হাবিয়ে দিচ্ছিল টেস্ট হাউসে পরীক্ষা কবতে পাঠানোয় আরজি হয়ে গিয়ে, সেটা ত সুহাসের কাছে একটা কৌশলমাত্র। সেই কৌশলটা যে এম-এল-এ আয়ত্তব করতে পেরেছে এটা তাব কাছে ধরা পড়ে না। এতটা পরিবেশনিরপেক্ষ হলে সুহাসকে নিজেরই চারপাশে পাক খেতে হবে। সুহাস নিজেকে ঘিরে আর-একটা পাক জড়ায়।

গয়ানাথ তার বাড়িব বাইরে উঠোনে ঢুকতে-ঢুকতেই চেঁচায়, 'হেই বাঘারু, বাঘারু, হেই বাঘারু।' গয়ানাথের গলা শুনে ভেতর থেকে একজন একটা লণ্ঠন নিয়ে আসে। সেই লণ্ঠনের আলোতে

গয়ানাথের এই বাড়িঘর সব লম্বা হয়ে মাটিতে দোল খায়।
গয়ানাথের বৌ ভেতরে চিৎকার করে ওঠে, 'নিজের বাড়িত কি ডাকাতি করিবার আইচছেন ?'
আসিন্দির মোটর সাইকেলটা ঠেলতে-ঠেলতে ভেতরে নিয়ে রাখে। চেঁচায়, 'এই, কায় আছিস, লণ্ঠনখান ধর এত্তি।' যে লণ্ঠন নিয়ে আসছিল সে দাঁড়িয়ে পড়ে, তারপর পথ দেখাতে উঁচু করে ধরে।
গয়ানাথ আবার চিৎকার করে ওঠে, 'হে-ই বাঘারু, বাঘারু।' তার পর হঠাৎই তার একেবারে সামনে, প্রায় তার ওপরে, বাঘারুকে দেখে চমকে ওঠে, 'শালো বলদ, জবাব দিবার পারিস নাই ? শালা, বোবা ত হাম্বা ডাক্ কেনে। যা, দূরত যা, দূরত যা।'
বাঘারু একটু দূরে সরে যায়। কিন্তু তখনো গয়ানাথ তার চোখের দিকে তাকাতে পারে না। 'বস ঐঠে, শালো বলদ, বস কেনে, খাড়া হইছে য্যান ফরেস্টের শালগাছ।'
গয়ানাথের কথা শুনে বাঘারু বসে পড়ে, মাটির ওপরে। হয়ত রাত্রি বলেই, বসার পর বাঘারুর সামনে গয়ানাথকে যেন আরো ছোট দেখায়। গয়ানাথ তার ফাটা বাঁশের মত চেরা অথচ সরু গলায় চিৎকার করে ওঠে, 'কী কহিছিস এম-এল-অক ?'
বাঘারু জবাব দেয়, 'কিছু কহ নাই।'
'কহ নাই ? যেইলা উমরাক ফুলবাড়িতে নিয়া গিছিস, কী কহিছিস ?'
'মোর নামখান কহিছু।'
'খুব নাম চিনবার ধইচছিস, না ?'
'মোর জন্মকথাখানা কহিছু।'
'তুই শালো অবতার হবার ধইচছিস, না ? নিজের জন্মকথাখান নিজেই শুনাবার ধইচছিস মানুষক ? আধিয়ারির কাথা কহিস নাই, এম-এল-অক ?'
'কী কাথা ?'
'আধিয়ারির কাথা। এম-এল-এ হামাক কহিল, তুই কহিছিস আধিয়ারির কাথা। এম-এল-এ হামাক কহিল, উমরাক একখান আধিয়ারি দ্যান কেনে। শালো, জমিন মোর, না তোর এম-এল-অর ?'
'মুই কহ নাই।'
'কহিছিস কি কহিস নাই, বুঝিবু এ্যালায়। তুই কালি সূর্য উঠিবার আগত এই তিস্তাপার ছাড়ি চলি যাবি। হু-ই নাগরাকাটাত ডায়না নদীর চরত মহিষের বাথান আছে, ঐঠে থাকিবু। বুঝলু ? আর কান্দুরা ঐঠে আছে। পাঠাই দিবি। বুঝলু ?'

বাহান্ন

বাঘারু ও চাঁদ

পরদিন, রাত না পোহাতে বাড়ি থেকে নেমে বাঘারু দেখে, আলো সবে ফুটতে শুরু করেছে, আকাশ ঝকঝকে সবুজ, সেখানে একটা শাদা চাঁদ।
বাঘারু ডাঙা থেকে লাফ দিয়ে নীচে নামে। আর চাঁদটাও তড়াক করে লাফ দিয়ে আপলচাঁদ ফরেস্টের মাথা থেকে তার মাথার ওপর এসে পড়ে। লাফ দিয়ে নেমে বাঘারুকে দাঁড়াতে হয়। চাঁদটাও আকাশে আটকে যায়। বাঘারু মাঠ দিয়ে চলা শুরু করে দক্ষিণ হাঁসখালির দিকে। চাঁদটাও গড়িয়ে-গড়িয়ে চলে। চাঁদটা টাকার জলছাপের মত। চার পাশে আলো ফুটলে আর দেখা যাবে না। আকাশটা এত ঝকঝকে সবুজ, আলো ফুটতে দেরি হবে না।
তিস্তা এখন তার পেছনে। তাকে তিস্তা পার থেকে চলে যেতে হচ্ছে। দেউনিয়া এখনো ঘুম থেকে ওঠে নি। আসিন্দিরজোয়াইও ওঠে নি। ওরা উঠে দেখবে বাঘারু নেই। জানে, বাঘারু থাকবে না। বাঘারুকে ডাকবে না।

এখন নিজের চোখের সামনেটা পরিষ্কার। বিঘাখানেক দূরের জায়গা নজরে আসে না। দূরে, বাড়ি-টাড়ি জলছিটানো কুয়াশায় ঢাকা। এই ধোঁয়া ধোঁয়া ভাবটা কাটতে সময় নেয়। সারা দিনই কিছু-না-কিছু লেগে থাকে গাছের মাথায়, নদীর ওপরে। এগুলো আকাশের কুয়াশা নয়—বনের বা নদীর কুয়াশা। সোজা তাকিয়ে হাঁটলে মনে হয় চাঁদের আলোয় হাঁটছে, সামনে কী আছে জানে না। আকাশের দিকে তাকিয়ে হাঁটলে বেশি দূর দেখা যায়। বাঘারু ঘাড় কাত করে আকাশেই তাকায়।

গোচিমারি থেকে হাঁসখালি পর্যন্ত অনেকখানি ঢাল জমি—তিন পাশের সব জমিই উঁচু, কোনো-কোনোটা ত বেশ উঁচু। এই ঢালটার ওপরে, এই সবুজ আকাশ যেন ঢাকনা। গোচিমারির ঢালের মাঝখানটা কড়াইয়ের মত। সেখানে নামতেই চাঁদটা এক লাফে তার মাথার ওপর এসে পড়ে। চার পাশে উঁচু ডাঙার জন্যে আর-কিছুই দেখা যায় না। দূরে ফরেস্টের গাছগুলোকে মনে হয় পাহাড়ের গায়ে জঙ্গল। সেই খাদের ভেতর বাঘারু আকাশের চাঁদের মুখোমুখি।

বাঘারু চাঁদের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে। হেসে বাঁ দিকে মুখ ঘোরায়—চাঁদ ডাইনে সরে। ডাইনে মুখ ঘোরায়, চাঁদ বাঁয়ে সরে। বাঘারু একটা ঢেলা কুড়োয়। সেটা চাঁদের দিকে ছোঁড়ার জন্যে কয়েক পা দৌড়তেই চাঁদটাও তাড়াতাড়ি গড়িয়ে সরে যায়। ঢেলাটা ছুঁড়ে বাঘারু দাঁড়িয়ে পড়ে। চাঁদটাও থেমে যায়। একটু দূরে ঢেলাটা পড়ে যাওয়ার ধুপ আওয়াজ হয়। চাঁদটার দিকে একটু ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে বাঘারু আবার হাঁটতে শুরু করে হাঁসখালির বাঁধের দিকে। চাঁদও গড়াতে থাকে আপলচাঁদের দিকে। এখন বাঘারুকে আবার একটু-একটু করে উঁচুতে উঠতে হচ্ছে—কড়াইয়ের গা বেয়ে। চাঁদটাও একটু-একটু করে ওপরে উঠে যেতে থাকে—আরো উত্তরে। এখন আবাব ডাঙার ওপরের গাছগাছড়া দেখা যাচ্ছে। ফরেস্টটা মাটিতে নেমে আসছে। সেই ফাঁকে চাঁদটা আড়ালে সবে যায়। বাঘারু বোঝে, দেখা না-গেলেও কোথাও আছে। সে হাঁসখালির বাঁধে উঠে পড়ে। আর দেখে, বাঁধ বরাবর সোজা উত্তরে-পুবে, একেবারে তার সামনাসামনি, চাঁদটা আকাশের গায়ে সেঁটে আছে। এই হাঁসখালির বাঁধ বা হাতির রাস্তাটা সোজা আনন্দপুর বাগানে ঢুকে গেছে। আপলচাঁদের ভিতব দিযে যে রাস্তাটা ওদলাবাড়ির দিকে গেছে, সেটা বাঁয়ে রেখে বাঘারু সিধে হাঁটে। চাঁদটা আরো বাঁয়ে ফরেস্টের মাথায় চলে যায়। বাঘারু ফরেস্টেব মাথার ফাঁক দিয়ে-দিয়ে চাঁদটাকে দেখে। ফরেস্টের ভেতরটায় এখনো অন্ধকার—শেষ রাত্রি। সেই অন্ধকারের ভেতর দিয়ে আকাশটা আরো সবুজ ও চাঁদটা আবো স্পষ্ট দেখায়—সকালের শাদা চাঁদ নয়, রাত্রির জ্বলজ্বলে চাঁদ। এখন, এই হাতির রাস্তাটা ছেড়ে ফরেস্টের ভেতর ঢুকলে চাঁদের সেই আলো পাওয়া যাবে। ফরেস্টের ভেতরের এই বাত্রির আড়ালে-আড়ালে চাঁদটা অনেকখানি এগিয়ে যেতে পারে। মাঝখানে একটা আগুনলাইনের সড়ক—ফরেস্টটাকে দু-ভাগ করছে। বাঘারু বাঁয়ে ঘুরে, দাঁড়িয়ে পড়ে। ফরেস্টের ভেতরের রাত্রির ওপরে চাঁদটা ডাইনে লেগে আছে। যে-আগুনলাইনের দিকে মুখ করে বাঘারু দাঁড়িয়ে সেটাতে গাছপালা নেই। তাই একটু আলো আছে। কিছুদূর গিয়েই সে আলো আবার আবছা। এখনো আকাশে দিনের আলো এত জমে নি যে এই আগুনলাইনটা পুরো দেখা যাবে। মাঝখানের সেই অন্ধকারের পরে ঐ আগুনলাইনের শেষের আভাস দেখা যায়—আকাশের সবুজ আর নদীর বালির শাদায়। মনে হয়, সেখানে আরো বেশি সকাল হয়ে আছে।

বাঘারু যে-ভাবে আগুনগলির সামনে দাঁড়িয়ে, সে-ভাবে সাধারণত বনের পশুবা দাঁড়ায়, যেন পথ ঠিক করতে পারছে না। লম্বা হাত দুটো নাড়িয়ে ফরেস্টের বাতাস কেটে বাঘারু গন্ধ শোঁকে—ফরেস্টেব। একবার ডাইনে ঘাড় ঘুবিয়ে হাতির রাস্তা ধরে আনন্দপুরের দিকে তাকায়। আবার, ঘাড় কাত করে আকাশের চাঁদটাকে দেখে। তার পর, ফরেস্টের ভেতরটা একবার দেখে। শেষে, ডাইনে ঘুরে সোজা হাঁটতে শুরু করে বাগানের দিকে।

এখন, বাঘারু যতই বাগানের দিকে এগয়, চাঁদটা ততই গাছের ডালে-ডালে তিস্তার দিকে পেছয়। মাঝেমধ্যেই তাকিয়ে-তাকিয়ে বাঘারু দেখে নেয়। ঘাড়টা তাকে বারবারই বেশি ঘোরাতে হয়। আনন্দপুরে ঢুকে যাওয়ার পর ঘাড ঘুরিয়েও চাঁদটাকে হয়ত আর দেখা যাবে না। আরো খানিকটা সকাল ত হল— বেশিক্ষণ আকাশ সবুজ থাকবে না। আলো পড়লেই প্রথমে নীল, তার পর শাদা হতে শুরু করবে। তখন ঐ জলছাপ চাঁদ আর দেখা যাবে না। বাঘারুর হাঁটার বিপরীতেই যখন ঐ চাঁদের গতি আজ, তা হলে চাঁদটা তিস্তার ওপর গিয়ে পড়বে। ওপরে নীলচে শাদা আকাশ, নীচে তিস্তার শাদা

ঘোলাটে জল—ও চাঁদ তখন কোথায় মিশে যাবে।

এখন এই ফরেস্ট, খেতব্যাড়ি, নদী, হাট, বাড়ি-টাড়ি-বস্তি, এই বাতাস, ভেজা ঘাস, আলপথ, বাঁশ-ঝাড়, চা-বাগানের ফ্যাকটরির নল, এই-সব কিছু নিয়ে একটা নতুন দুনিয়া তৈরি হয়ে উঠেছে আবার একটা দিনের জন্যে।

সেই নতুন দুনিয়ার এখন পর্যন্ত এক বাঘারু আছে আর ঐ চাঁদ আছে।

তিপান্ন

ভোরের আগে চা-বাগান

মাঠে-মাঠে খেতবাড়িতে, জঙ্গলবাড়িতে, ধানবাড়িতে যেমন হাঁটে বাঘারু, তেমনি হাঁটছে, এখন। নদীর বা ফরেস্টের জঙ্গলের ভেতর আলাদা হাঁটা—ঠেলে-ঠেলে। আর-সব হাঁটাই এক রকম—আকাশের অনেক ওপরে পাখির ডানা-ভাসানো ওড়ার মত ভেসে-ভেসে হাঁটা, পায়ে-পায়ে খুব বেশি ধুলো ওড়ে না, খুব বেশি দাপাদাপি হয় না—মাটির ওপর নিজের ওজন ছাড়া। তিস্তার খুব টান-টান স্রোতে শালগাছ যেমন হালকা হয়ে যায়, এই বহুদূর পর্যন্ত ছড়ানো মাঠের টানে বাঘারুর লম্বা শরীর, চওড়া বুক-পিঠ, লম্বা-চওড়া, বাহু-কব্জি, শক্ত কাঁধ আর লম্বা পা দুটোর তেমনি সব ভার চলে যায়।

কিন্তু মাঠেরও স্রোত আছে আর বাঘারুও শালগাছ বলে হাঁটাটা মাটির ভেতর গেঁথে যায়। এতটাই, যেন মাটিটা হাঁটে—ফরেস্ট, হাট, টাড়ি-বাড়িসহ এই মাটিটাই। তখন সামনে যাই আসুক, গতি প্রতিহত করা যায় না। হয় বাঘারুকে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গিয়ে নামতে হবে, নয় সামনের বাধাটাই ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়।

বাঘারুর ত আর রাস্তা দিয়ে যাওয়া নয়। রাস্তায় সামনে অনেকখানি দেখা যায়, রাস্তাটাও দু-পাশের সঙ্গে মিশে যায় না, আলাদা থাকে, দু-পাশটাই বদলায়।

কিন্তু তাই বলে ত মাঠজঙ্গল ভেঙে হাতির পাল, মোষের পালের মত যাওয়া বাঘারুর নয়। তার পায়ের একটা আন্দাজ আছে—নির্ভুল। তাকে যদি চালসার পুবে ডায়না নদীর চরে পৌঁছতে হয় তা হলে তাকে প্রায় সিধে উত্তর-পুবে হাঁটতে হবে। এখন থেকে সিধে কোনাকুনি চললে রাস্তা ছোট হয়ে আসবে। কিন্তু রাস্তা ছোট করার জন্যে বাঘারু ত আর তার চেনা লাইন, চেনা জায়গা ছাড়তে পারে না।

আনন্দপুর চা-বাগানে ঢোকার একটা গেট আছে। গেটের আগে জলনিকাশী বড় নালার ওপরে লোহার পাইপ একটু-একটু ফাঁক করে সাজিয়ে তৈরি করা ক্যালভার্ট। গরু-ছাগলে ঢুকতে পারে না, পাইপে পা পিছলে ফাঁকে আটকে যায়। চওড়া বেঁটে গেটের পাশে লোহার খুঁটি 'সানজি'র। [দুই আঙুলের মাঝখানের ফাঁক] মত—যাতে মানুষজন যাতায়াত করতে পারে, গেট বন্ধ থাকলে। ওখান থেকেই বাগান ঘেরা তারের বেড়া।

আনন্দপুরের গেটটা পার হতেই সকালটা যেন শুরু হয়ে যায় কেন, বাঘারু বোঝে না। এতক্ষণ যে বাঘারু হেঁটে এল আকাশ আলো-গাছপালা-হাওয়া সব এক হয়ে মিলেমিশে ছিল। আনন্দপুরে সবই সাজানোগোছানো, আলাদা-আলাদা। দু-পাশে চা-বাগানের কাটাছাঁটা সমান বেড। সেগুলোর মাথার ওপরে ছায়া-দেয়া গাছের সমান মাথা। মাঠের মত সমান চা-বাগানের বেডের ওপরে ছাতির মত সমান গাছের মাথা। বেডগুলো তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা, ওপাশে গভীর নালী। জল যা যাওয়ার যায়, কিন্তু বেডের ভেতর হাতি ঢুকতে পারে না ঐ নালীর জন্যে। মানুষজনের যাতায়াতের জন্যে মাঝেমধ্যে ইটের সিঁড়ি, কোথাও-বা কাঠেরও সিঁড়ি, দুই-এক জায়গায় আবার আঙুলফাঁক লোহার খুঁটি।

মাঠঘাট বনবাদাড় পেরিয়ে এসে বাঘারুকে এই চা-বাগান আনন্দপুরে শুধু রঙ দেখতে হয়। বাবুদের বাড়ির টিনের চালের সবুজ বাংলোর দোতলা চালের সবুজ, জানলা-দরজার সবুজ—চার পাশের এত

সবুজের মধ্যেও এই সবুজগুলো আলাদাভাবেই চোখে পড়ে। রাস্তার মোড়ে-মোড়ে লাল-শাদা রঙের খুঁটিগুলোর বাঁক অনেক দূর থেকে দেখা যায়। আর, মোড়ের যেন শেষ নেই। একটা মোড় পেরনোর সময় ডাইনে-বাঁয়ে সামনে-পেছনে তাকালেই দেখা যায় চারদিকে লাইন বেঁধে মোড়ের পর মোড়, মোড়ের পর মোড়। আর মোড় মানেই ত রাস্তা, রাস্তার পর রাস্তা। একই রকম শিরীষ গাছের তলায়, একই রকম চা-বাগিচায়, একই রকম রাস্তায়, তার পর একই রকম মোড় হয়ে হয়ে যাওয়ায় সোজাসুজি রাস্তারই একটা গোলক ধাঁধা তৈরি হয়। এত রাস্তা দিয়ে কত লাক হাঁটে। এত রকম বাড়িতেই-বা কত লোক আঁটে। ছোট-ছোট বারান্দার বাড়ি, লম্বা-লম্বা বারান্দার বাড়ি, ছাদের বাড়ি, টিনের বাড়ি, ভামনির বাড়ি, কাঠের বাড়ি, দালানের বাড়ি, বেড়ার বাড়ি।

আনন্দপুরের লোকজন এখনো ঘুম থেকে ওঠে নি, অন্তত ফ্যাক্টরি আর অফিসের এই রাস্তায় আসে নি। কিন্তু গোচাবাড়ি থেকে বেরবার পর মাঠে, হাঁসখালির বাঁধে, হাতির রাস্তায়, আকাশের আর মাটির রঙে সকালটা যে-রকম হচ্ছিল আনন্দপুরে তা বদলে যায়। শিরীষ গাছের ছাউনি আর চা-গাছের মাথার মাঝখানে ত আর-কিছু নেই—সমস্তটা ফাঁক। আকাশ নয়, মাটি নয়, আকাশ-মাটির মাঝখানের ঐ জায়গাটা ফাঁকা। আর চা-বাগানে ত ঐ মাঝখানের জায়গাটাই আসল। ঐ ফাঁক দিয়ে আলো, আকাশের মতই, ছড়িয়ে পড়তে পারে।

বাঘারু সেই বানানো সকালের মধ্যে, ডাইনে-বাঁয়ে করতে-করতে, বাগানের পুর সীমার দিকে চলে—বেরিয়ে যেতে। বাঘারু ভেবেছিল পুবগেট দিয়ে বেরিযে ডাইনে বেঁকে মাঠ-বরাবর বারঘরিযায় উঠবে। কিন্তু একটা মোড় থেকে ডাইনে তাকিয়ে সে বেঁকে যায়—মনে হয়, এদিককাব বেড়া গলে ওদিকের মাঠে নেমে যেতে পারবে।

কিন্তু এগিয়ে দেখে গলতে হবে না, বেরবার একটা রাস্তা আছে, দু-আঙুলের ফাঁকের মত লোহার খুঁটি।

বাইরে যাবার রাস্তা, এত বর্ষাব পরও শক্ত। পায়ে চলা রাস্তাতেও ঘাস গজায় নি। বাস্তার পব রাস্তা, মোড়ের পর মোড়, মোড় থেকে মোড দিয়ে ঘেবা ছক, ছকেব ভেতর মাঠের মত সমান চা-গাছ আর ছাতার মত সমান শিরীষ গাছ—এমন চা-বাগান ছেড়ে বাঘারু এখন, আল বেয়ে, আবো-আরো আল দিয়ে-দিয়ে ছক কাটা, অসমান, নানা আল দিযে নানা অসমান ছক-কাটা মাঠে নামে। এই সামান্য একটু উঁচু থেকে বাঘারুর মনে হয়, মাঠটার আলগুলো শীতকালেব নদীর মতন, কোথায় শুরু, কোথা দিয়ে বয়, কখনো সরু, কখনো মোটা।

মাঠের ভেতর নেমে এলে আর তেমন লাগে না। তখন মাঠেরই দূরেব কোনো অংশ তার থেকে উঁচুতে, আবার সামনেব আলটাই ছোট্ট একটা গাছ বেয়ে ওপবে উঠেছে। বাগানের গা-লাগা জমিটা একটা ঢাল। তার পরই ডাঙা। ঢাল জমিটাতে ভাল ধান হযেছে। কিন্তু তার পরই পাথুরে বরমতল। এখন ত চা-বাগান আর ফরেস্ট শুরু হবে। ধানি জমি কমে আসবে। খেতবাড়ি তিস্তাপারেই ভাল।

সেই নিচু জমির আলটা দিযে চলতে-চলতেই বাঘারু দেখে, সামনের ডাঙারও ওপাবে আকাশটা লাল হয়ে উঠছে, যেন ঐ ডাঙাটা আকাশটাবই ঢাল। বাঘারু খুশি হয়ে ওঠে। গোচামারিতে বাড়ি থেকে বেরতে-বেরতেই যদি সূর্যটা উঠত, তা হলে তাব পেছনে পড়ত, সে সূর্যোদয় দেখতে পেত না, অবিশ্যি আকাশটাও অনেকক্ষণ তার মাথার ওপর ছিল—সেখানে রঙের খেলা দেখতে পেত। কিন্তু এখন ত তার মুখোমুখি সূর্যোদয়, এই ঢাল পেরিয়ে ঐ ডাঙায় উঠলেই। যেন এই সূর্যোদয়ের কারণেই এই বারঘরিয়ার মাঠে বাঘারুর আসা—এমনই লাফিয়ে-লাফিয়ে সে ডাঙাটার দিকে ছোটে।

ডাঙাটাতে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে। তার সামনে কোণাকুনি বারঘরিয়ার মাঠটা ছড়িয়ে গেছে সেই পুব-দক্ষিণে কান্তদিঘি-কুমারপাড়া পর্যন্ত। কান্তদিঘি-কুমারপাড়ার ঐ দিক থেকে সূর্য উঠছে। এখন, বাঘারুকে যেতে হবে এই সূর্যটাকে ডাইনে রেখে একটু উত্তর বরাবর। কিন্তু, এমন সূর্যোদয়ের মুখোমুখি পড়ে বাঘারু যেন আর নড়তে পারে না। ডাঙার ওপরে উঠেই সে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর, যেন একটা ভাল জায়গা বেছে, শ্যাওড়া গাছটার নীচে গিয়ে দাঁড়ায়। তার সামনে, অর্ধবৃত্তাকার প্রান্তরের শেষে দিগন্তে সূর্যোদয়েব দৈনন্দিন ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে গেছে।

চুয়ান্ন

বাঘারু ও সূর্যোদয়

কান্তদিঘি-কুমারপাড়ার দিকে মুখ করে বাঘারু দাঁড়িয়ে। তার পুবে কুমলাই, তার পুবে মাথাচুলকা, মাথা চুলকার পুবে ধূপঝোরা। এই সূর্যোদয়ের ভূগোল বাঘারুর এই পর্যন্তই জানা। সে যেখানে যাচ্ছে, সেই ডায়না নদীর জঙ্গলে ত পুব দিক আছে। সেই সব পুব দিকের নাম তার জানা নেই। সূর্য ত সেখান দিয়েও উঠছে। পুবের রাস্তা, সেখানে, আরো পুবে, আসামের দিকে গেছে। সেই সব পুবদিক দিয়েও এই একই সূর্যোদয়। এখন বাঘারু সেই না-জানা পুবদিকেই চলেছে বলে এই সূর্যোদয় আকাশময় ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে সেই জানা-অজাা মেশানো সারাটা পুবদিকই বাঘারুর সামনে খুলে যাচ্ছে।

কান্তদিঘি-কুমারপাড়া আর কুমলাইয়ের আকাশটা আগুনরাঙা। সেই আগুন ফরেস্টের বড়-বড় গাছগুলোর মাথা ছুঁল। এতদূর থেকে ফরেস্ট ত সবুজ না, ছাই-ছাই। যেখানে-যেখানে আগুন লাগছে, ছাই ফেটে অন্য রঙ বের হচ্ছে। দূর থেকে দেখায়, ফরেস্টের ভেতর এক-একটা আলগা-আলগা গাছে আগুন লেগেছে, এক-একটা গাছে যেমন বাজ পড়ে।

ফরেস্টের ছাই-ছাই রঙ আর নদীর ওপরে বা মাঠের শেষে দিগন্তের ছাই-ছাই এমনই মিলে গেছে, কোনটা ফরেস্ট বোঝা যাচ্ছিল না, এখন বহু দূরে-দূরে ঐ আগুন রঙ লেগে যাচ্ছে বলে বাঘারুর চোখের সামনে, গাছগাছড়া জলজঙ্গলেব রঙগুলো আলাদা-আলাদা হয়ে যায়।

কিন্তু সূর্যের সেই আগুনরাঙা আলো সারা আকাশে ত একই রকম লেপে যাচ্ছে না। গয়ানাথের বাড়ি থেকে তার মাথায়-মাথায় চলে আসছে যে-আকাশ, 'সবুজ নাগান', সেই আকাশের বহুদূর পর্যন্ত আগুনরঙেব ফালি চলে গেলে তার ভেতব থেকে সবজে ফালিগুলোও বেরিয়ে থাকে। আকাশের সবুজেব নীচে, কোথাও-কোথাও কিছু-কিছু মেঘ ছিল। সেই সব জায়গায় আব।শের বঙ, মেঘের রঙ, আলোর বঙ মিলে আর নানা বকম বঙ তৈরি হচ্ছিল।

কুন অং [রং] কুখন ফুটে উঠে আব মিলি যায, না-দেখা যায়, না-বোঝা যায়। চক্ষুর পলকখান একবারে ফেলিবার মধ্যে আকাশখান আর-এক ঝলক বদলি গিছে। আগুনের নাখান অংটা দূরত-দূবত চলি যাছে, হু-ই পচিম পাখত তিস্তানদীর পারত, তাব পচিমে জলপাইগুড়ি সদরত, তাব পচিমে কোটত কোটত আজগঞ্জ—সবখানের আকাশ নাল [লাল] টকটকা হবা ধবিছে হে। এ্যালায় কুমলাইযেব পুবত অংখান পাতলা হবা ধরিছে। কায় য্যান ঐ লাল অংটা ধুইবার ধইচচে। আর-হু-ই তিস্তাপারের পচিম পাখ তক পাতলা হয়্যা যাছে। কোটত আলো কোটত যায়।

বন্যাব তিস্তায ঝাঁপ দেওযার আগে যেমন সামনে পাশে ঘাড ঘুরিযে-ঘু.. বাঘাব স্রোতেব ছক বুঝে নেয, জলেব ঢক দেখে নেয আব নিজেব মনে-মনে একটা নকশা ভেবে নেয়, তেমনি করে ডাইনে আপলচাঁদেব দিকে তাকায়—'উচা উচা গাছাব মাথত আগুন লাগি গেইসে'—পেছন ফিবে মাথার ওপবে শ্যাওড়া গাছটাকে দেখে —'পাতাগিলা ঝলঝল করিবাব ধইচছে য্যান বিষ্টি হবা ধবিছে,'—বাঘাক তাব নিজেব শবীবেব দিকে তাকায—'সাবা শবীলখান কায় অং মাখাছে'—বাঘারু পাযেব তলার ঘাসেব দিকে তাকায—'ঘাস গিলা সব আয়না হয্যা যাছে— ।'

আলোব সেই নিমজ্জনে বাঘারু দাঁড়িয়ে থাকে, খাড়া। এতটা এমন বেগে হাঁটার পর তার গা জুড়ে ঘাম ফুটে উঠতে শুরু করে। সেই ববমডাঙাব [ব্রহ্মভাঙা] এক সীমায দাঁড়িয়ে আর-এক সীমাব অদৃশ্য পেছন থেকে ঘটে যাওযা সূর্যোদয দেখতে-দেখতে বাঘারু ঘামে। এই বারঘবিযাব মাঠটায ঠিক এই সময উঠতে না পাবলেই ত বাঘাক আব এই সূর্যোদয পেত না। গোচিমাবি থেকে হাঁসখালিব পথে ঘটে গেলে ত পেছনে থাকত। হাতিব রাস্তা ঘটে গেলে ত কোনাকুনি থাকত। আনন্দপুর বাগানের ভেতর ঘটলেও ডান কোনায় পডত। এই বারঘরিয়র মাঠে সে কখন পৌঁছবে তার জন্যেই যদি সূর্যোদয় অতক্ষণ ঠেকে থাকে, তা হলে ত বাঘারুকে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখতেই হয়, দেখার জন্য দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ঘামতেও হয়।

সেই দেখা আর ঘামার মধ্যেই বাঘারুকে এক সময় এইটা বুঝতে হয়, 'মুই খালি-খালি খাড়া আছি। আব সত্যি যে শুধু তার এই উদোম ঢ্যাঙা শরীরটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেটা তার শরীবেব ভারহীনতা

দিয়ে তাকে বুঝে নিতে হয়। তার কাঁধে লাঙল নেই—গয়ানারে লাঙল। 'মোর কাঁধত গাছ নাই—গয়ানাথের গাছ'। বাঘারুকে গয়ানাথ নির্বাসন দিয়েছে। ডায়না নদীর জঙ্গলে তার মহিষের বাথান আছে—বাঘারু সেখানেই যাচ্ছে। কিন্তু যাচ্ছে ত তার এই শরীরটা নিয়েই শুধু। বরমতলায় সেই সূর্যোদয়ের সামনে নির্বাসনের পথে বাঘারুর শরীরে-মনে কেমন মুক্তির বোধ এসে যায়। আর সেই বোধটাকে নিজে-নিজে বুঝে নিতে, নিজেই নিজের শরীরের দিকে ফিরে-ফিরে তাকায়।

কোনো অদৃশ্য আড়াল থেকে উৎক্ষিপ্ত রঙের এই আকাশমাটিব্যাপী বিস্ফোরণে আর নিজের এই শরীরটার এমন মুক্তিতে বাঘারু হাসে। বাঘারু ত তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোকে দিয়ে আলাদা-আলাদা কাজ করতে পারে না। সে যা করে তার সারাটা শরীর দিয়েই করে। শুধু ঠোঁট দিয়ে হাসতে পারে না ত বাঘারু, তাই সেই আলোর রঙের ধাক্কায় বাঘারুর সারাটা শরীরই হেসে উঠে কাঁপতে থাকে—বাতাস লাগা শিরীষ গাছের মত। বাঘারুর ত শরীর ছাড়া কিছু নেই—তাও আবার এত বড় একটা শরীর যে, শুধু শরীরটাই আছে বললেও তাকে যেন ততটা সর্বস্বহীন বোঝায় না। অত বড় শরীরটা রঙিন আলোর আঘাতে শিহরিত হতে থাকে।

শরীরের এই শিহরণ ত বাঘারুর চেনা নয়। বা, এমন কিছুই ত তার চেনা নয়,.যা এই শিহরণের মত ব্যক্তিগত। তাই বাঘারু তার নিজের শরীরের কম্পনে নিজেই হে-হে হাসে। এমন একা-একা হাসা নিজের হাসির আওয়াজে বাঘারু আরো হেসে ওঠে। আর তাতেই তার আরো হাসি উঠে আসে। নিজের হাসির আওয়াজ বাঘারুর ত খুব চেনা নয়।

দুহাতে মুখ ঢেকে বাঘারু হাসিটা ঢাকতে চায়। তার হাত এত শক্ত যে এখন আর আঙুলগুলো বেঁকানো যায় না। তবু, হাত যখন, একটা তালু থাকে। আর তালু যখন, তখন আঁজলা হয়। বাঘারু মুখ ঢাকতে দুই হাত তুললে, হাতের তালু আলোতে, রঙে ভরে যায়, যেন বাঘারু নিচু হয়ে মাঠ থেকে আঁজলা ভরে আলো আর রঙ তুলে আনল। এখন তার চোখের সামনে দুই অঞ্জলি থেকে সেই রঙিন আলো ঝরঝর ঝরে পড়ে শরীরে।

নিজের হাতের আঁজলায়, নিজের শরীরে, এই প্রথম রঙ-আলো ঢালছে বাঘারু। শরীরটা এই প্রথম তার নিজের হয়ে উঠছে যেন।

হাত দুটো মাথার ওপরে, বাঁ হাতে ডান হাতের 'মগরা' [কব্জি] চেপে ধরে বাঘারু পিঠটা ধনুকের মত বাঁকায়, পেছনে। কাঁচা বাঁশের মত তার শরীরটা ঐ রকম হেলে থাকে আর হেলানোর ভার বইতে তার পায়ের 'মচকা' [বাটি], থলমা [উরু] আর পেটের-বুকের পেশিগুলো টুকরো-টুকরো হয়ে ফুলে-ফুলে ওঠে। আড়মুড়ি ভাঙছে বাঘারু। আবার, পেছন ফিরে দুই হাত মাথার ওপর তুলে ধনুকের মত বাঁকায়, সামনে। তার পাথরের চাঙাড়ের মত পিঠটার ঢাল মাটিব দিকে নেমে গেলে 'নডডারু'-র গিঁঠগুলো প্রখব জাগে, যেন ঐ শিরদাঁড়া বেয়ে এখনই কোনো ঝরনা ঝাঁপাবে। কাঁধে, ঘাডে. পিঠে, বাহুতে, কোমরে, উরুতে, কটিতে আলোর স্বাদ পেতে ভালো লাগে বাঘারুর—আলোর উষ্ণ স্বাদ। সে একটু ঘুরে দাঁড়ায়, বাঁয়ে,আলো তার বাঁ পাঁজর দিয়ে, বাঁ তলবুক থেকে বাঁ তলপেটে চলে যায়। খানিকক্ষণ ও-রকম থেকে বাঘারু ডাইনে ঘোরে, আলো তার ডান পাঁজর থেকে ডান তলপেট পর্যন্ত লেপটে যায়।

খাড়া হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বাঘারু দেখে, সূর্যের প্রথম আলো তীক্ষ্ণ রেখায় প্রান্তরের অপব প্রান্ত থেকে বাঘারুর দিকে ছুটে আসছে সাঁ সাঁ। বাঘারু আলোর দিকে ছুটে যায় কিন্তু সে পৌঁছনোর আগেই আলোর তীক্ষ্ণ সূচিমুখটা ফেটে যায় আর আলো ছড়িয়ে পডে মাঠময়। বাঘারু মাটিতে গড়িয়ে পড়ে মাটি থেকে আলো সর্বাঙ্গে মাখতে থাকে।

পঞ্চান্ন

বাঘারুর সঙ্গীতলাভ

বারঘরিয়ার মাঠ ছেড়ে বাঘারু নিপুছাপুরের দিকে চলতে শুরু করে। ডান দিক জুড়ে সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পরের মাঠের দিকে তাকিয়ে বাঘারু বিড়বিড় গুনগুন করে। আর, একবার করেই থাকেম

না। বার বার ঘুরেফিরে করে। করে, আর হাঁটতে-হাঁটতেই দোলে।

উঠেন উঠেন বেলা ঠাকুর চিকচিক্যানি দিয়্যা
উঠেন উঠেন বেলা ঠাকুর আগুন-টকটক হয়্যা
খুলি দিছু দেহবাড়ি ছ্যাকা দিয়্যা যান
জল যাউক, হিম যাউক, খাড়াউক শরীলখান।

কোলের বাচ্চাদের চপচপ করে তেল মাখিয়ে সূর্যের দিকে ধরে দোলাতে-দোলাতে এই গান মায়েরা গায়। বাঘারুর দুই হাতে কখনো কোনো শিশু দোল খায় নি। আর এখন সূর্যের দিকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দোলানোর মত শিশু যখন বাঘারুর হাতের মধ্যে নেই, তখন বাঘারু নিজেকেই দোলাক। এই রকম হাঁটতে-হাঁটতে যতটা দোলানো যায়, দোলাক। আর যতটা বিড়বিড় গুনগুন করা যায়, করুক। বাঘারু এখন তার নিজেরই শিশু।

কিন্তু একবার বলেই ত আর থামতে পারে না বাঘারু, এমন কি, বারকয়েক বলেও না। এই ছড়া একবার মাথার ভেতর সেঁদিয়ে গেলে আর বেরতে চায় না। তার ওপর আবার হাঁটার দোলনটাও ছড়ার সঙ্গে মিশে গেছে। হাঁটা না থামালে আর এই বিড়বিড়-গুনগুন থামবে না। এই দোলানি আর ছড়ানি কবে সেই জন্মকালে বাঘারুর মাথার ভেতর সেঁদিয়ে আছে—তার ব্যস্ততাহীন নির্জন মাথায়। তারপর পাখির ডাক, জীবজন্তুর মুখ আর আলো-হাওয়ার গতি যেমন চেনা হয়ে যায় মুহূর্তের মধ্যে, যখনই তেমন সময় আসে, তখনই, এই 'ছড়ানিগিলা চলি আসিবার ধরে এ্যানং নাম্বা [লম্বা] হাঁটনে, কামছাড়া গাওছাড়া এ্যানং নাম্বা হাঁটেন, ছড়াগিলা গানগিলা পিপিড়ার মত চলি আসিবার ধরে এক্কারে লাইন বান্ধি, একোটার পর একোটা, কোটত আসে কোটত যায় কায় জানে।'

বাঘারু চলতে-চলতে দোলে আর দুলতে-দুলতে বলে—

বেলা ঠাকুরের মাই গে
সিন্দুর ফেল্যান কেনে, সিন্দুর ফেল্যান কেনে ?
না ফেলিছু, না ফেলিছু, কৌটা উলটি গেইছে
দাওয়া লালাইছে তায়।

সূয্যি ঠাকুরের মা, সিঁদুর ফেলেন কেন ? ফেলি নাই, সিঁদুর ফেলি নাই, সিঁদুরের কৌটো উল্টে গেছে। আকাশ তাই লাল।

বেলা ঠাকুরের মাই গে
জল ঢালিছেন কেনে. জল ঢালিছেন কেনে ?
না ঢালিছু, না ঢালিছু ছোয়াক নোহাইছু
মাটি ভিজেন তায়।

সূয্যি ঠাকুরের মা, এত জল ঢালেন কেন ? ঢালি নাই, জল ঢালি নাই, ছেলেকে নাইয়েছি, সেই জলে মাটি ভেজা।

বেলা ঠাকুরের মাই গে
ঝাঁটা ঝাড়িছেন কেনে, ঝাঁটা ছাড়িছেন কেনে ?
না-ঝাড়িছু, না-ঝাড়িছু, ছোয়াক শুকাইছু
বাও উঠেন তায়।

সূয্যি ঠাকুরের মা, সকালে এত ঝাড়েন কেন, হিমেল বাতাস দেয় কেন ? ঝাড়ি নাই, ঝাড়ি নাই, আঁচলের বাতাস দিয়ে, ছেলের গায়ের জল শুকাই, তাই বাতাস ওঠে।

বেলা ঠাকুরের মাই গে
ঘর ধোয়া কইচছিস কেনে, ঘর ধোয়া কইচছিস কেনে ?
না করিছু, না করিছু ছোয়াক ছাড়ি দিম
এগিনা ধুছি তাই।

সূয্যি ঠাকুরের মা, ঘরদোর এত ধোয়া-মোছা করছেন কেন আকাশ নীল ঝকঝকে ? মুছি নাই, ঘর মুছি নাই ছেলেকে ছেড়ে দেব বলে আঙিনা, আকাশ, ধুচ্ছি।

বেলা ঠাকুরের মাই গে
ছোয়াক ছাড়েন কেনে, ছোয়াক ছাড়েন কেনে ?
মোর ছোয়াটার ছ্যাঁক নাগিলে তোর ছোয়াটা উঠে
ছোয়াক ছাড়িছু তাই।

সূয্যি ঠাকুরের মা ছেলেকে ছেড়ে দিচ্ছেন কেন ? আমার ছেলের ছ্যাঁকা খেয়ে তোর ছেলে উঠবে, তাই।

হেই গে মোর বেটাখান
হেই গে মোর ছোয়াখান
হেই গে মোব ছাওয়া-ছোটর ঘরখান
নিন্দ্‌ ভাঙ্গি উঠি গেইছে
হাঁ করিছে, ভ্যাঁ করিছে
আর তোর ছোয়াখানেক দেখি পুটপুটাইয়া হাসিবার ধইরেছে···

আমার ছেলে উঠে গেল, আমার বেটার ঘুম ছুটল, হাই তুলছে, কাঁদছে আর তোমার ছেলে সূর্যের দিকে তাকিয়ে হাসছে।

উঠেন উঠেন বেলা ঠাকুর চিকমিক্যানি দিয়া····

বাঘারুর কবিতার সঙ্গতিতেই আকাশের লাল রঙ ধুয়ে ঝকঝকে নীল রঙ বেরিয়ে পড়ে। আর কান্তদিঘি-কুমারপাড়া, কুমলাই, মাথাচুলকার আড়ালে-আড়ালে যে সূর্য উঠছিল সেটা যে এখন সারা দুনিয়াতেই উঠে গেছে, অন্তত বাঘারুর সারা দুনিয়াতে, নিপুছাপুরের ফ্যাক্টরির টানা লম্বা বাঁশিতে তা রটতে থাকে।

সেই দুনিয়ার এক সীমান্ত থেকে আরেক সীমান্তের দিকে বাঘারুব এই চলার সামনে এখন এই বারঘরিয়ার প্রান্তরেব ঢাল। ঢাল বেয়ে শিশুর মত গড়াতে গিযে বাঘারু তার শবীরেব দোলা আব ছড়ার দোলা হারিয়ে ফেলে।

ছড়ায় শিশু ছাড়া সকাল নেই। শিশু ছাড়া কবিতা নেই। বাঘারু এখন তাই নিজেই নিজেব শিশু।

ছাপ্পান্ন

শ্রমিকদের দৈনিক উৎসব

বাঁশি শুনে নিপুছাপুর চা-বাগানের লাইনগুলো থেকে সবাই বেরিয়ে পড়েছে। সবাব কাঁধে একটা ছাতা। কাঁধে-কাঁধে রুমালের মত থলি, লম্বা ডাণ্ডির মাথায় ছোট চ্যাপ্টা কোদাল, হাতের আঙুলেব মত কাটা কোদাল, বাঁকা দাও, লম্বা কলম ছুরি। যার কাঁধে যেমন ঝোলানো বা আটকানো সে তেমন হাঁটছে। যার কাঁধে রুমাল দোলে সে নিজে যেমন খুশি দুলতে পারে। কোদালগুলো যাদেব কাঁধে তাবাও খানিক হেলতে পারে। কিন্তু দাও আর ছুরি যাদের কাঁধে লাগানো তারা সেই কাঁধটা নাড়ায় না।

মরদদের বেশির ভাগেরই পরনে উরু কামড়ে থাকা ছোট হাফ প্যান্ট—সামনে পেছনে অনেক সেলাই ও পকেট। আর গায়ে নানা রকমের গেঞ্জি-গোলগলা, কলাব, ভি-কলার, কলারের সামনে-পেছনে দাগ, বুকে-পিঠে নকশা। গেঞ্জির রঙ নানা রকম। কিন্তু সব রঙই মবে গেছে, মাঝে-মাঝে আচমকা এক-একটা টাটকা রঙ ছাড়া। বয়স্ক কারো-কারো পরনে ধুতি—হাঁটুর ওপর টেনে তোলা, ও গেঞ্জি। কারো-কারো খাকি প্যান্টের ভেতর হাফশার্ট গোঁজা। বেশির ভাগই খালি পা। আচমকা দু-একজনের পায়ে মোজাসহ বুটজুতো, চকচকে। তেমন দু-একজনের হাতে ছোট স্টিকও আছে। কেডস-পরাও আছে কয়েকজন। তারা এমন হাঁটে, যেন খেলতে যাচ্ছে। তেল চকচকে কাল চুল পাট-পাট আঁচড়ানোর নানা বাহার—পেছনে বাবরি, দু-পাশে বাবরি, সামনে সিঙাড়া, মাঝখান দিয়ে চিরে চিরে দু-পাশে সিঙাড়া, মাঝখান দিয়ে সমান চিরে আবার মিশিয়ে দেয়া, কপালেব ওপর একটু এগনো—ফেল্ট ক্যাপের মত, আবার কপালের ওপর একেবারে ভুরু পর্যন্ত লেপটিয়ে নামিয়ে গোল করে তুলে দেয়া। কিন্তু বাহার শুধু সামনের নয়, পেছনেরও। কোনো ঘাড় বাবড়ি, কোনো ঘাড় বব,

কোনো ঘাড় মোটা ভাবে ছেঁটে তোলা, কোনো ঘাড় ইংরেজি ইউ-এর মত, কোনোটা ইংরেজি ভি-এর মত, কারো দু-কান সম্পূর্ণ ঢাকা, কারো অর্ধেক, কারো পেছনটাও সিঁথির মত চেরা। এরই ভেতর দু-একজন আছে, সম্পূর্ণ ন্যাড়া।

মেয়েদের শাড়ির চড়া বঙ। শাড়িগুলো একটু উঁচু কবে পরা। আঁচল নেই। সামনের দিকটা একটু বেশি তুলে আঁচলটা বুক থেকে নেমে এসেছে। কারো-কারো আঁচল নেই-ই, পুরো শাড়িটাই বুকের ওপর থেকে গোল হয়ে নেমে এসেছে। চুলের বাহার পরনের বাহারকে হাব মানায়। কারো চুল মাঝখানে সিঁথির দু-পাশে পাট করা। কারো-বা দুই বেণী মাথার ওপর তুলে গিঁঠ দেয়া। কারো আবার ছোট চুল, ঘাড়েব কাছে গিঁঠ। কারো একটু উঁচুতে খোঁপা বাঁধা। প্রায় সবার চুলেই ফুল। সকালে যে যা হাতের কাছে পেয়েছে, সেই ফুলই গুঁজে দিয়েছে। দু-একজনের মাথায় বড়-বড় গাঁদা। কাল রাত্রিতে বাংলো থেকে তুলে এনে রেখেছে। বেগনি রঙের ছোট-ছোট ঘাস ফুলও কেউ-কেউ ঝাঁটার কাঠিতে গেঁথে গুঁজে দিয়েছে। ফুলের কাঠি মাথার ওপব উঠে আছে, চলার সময় কাঁপছে।

মেয়েদের অনেকেরই পিঠের ঝোলায় বাচ্চা। ঝোলার বাইরে বাচ্চার ন্যাড়া মাথা বেবিয়ে আছে। চলার তালে দোলে। পা আর হাত দুটোও বেবিযে ঝোলে। বোধহয় চলার দুলুনিতেই, সব বাচ্চাই প্রায় ঘুমিয়ে।

মেযেরা এত রঙিন বলেই হয়ত শাদা শাড়ি আর জামায় দু-একজন মাঝবয়সিনীকেও রঙিনই দেখায় মাঝে-মাঝে।

কিন্তু মেয়েমরদ, বুড়োবুড়ি, ছোকরাছুকরি—এইরকম ভাগ-ভাগ করে দেখলে কুলি লাইনের রাস্তাটা ধরে এই যে সবাই এক সঙ্গে সকালের বাঁশি শুনে কাজে চলেছে, সেই এক সঙ্গে যাওয়াটাকে ঠিক বুঝে ওঠা যায় না। এখন এই বাঁশি শুনে. এই সকালে, এক সঙ্গে যাওয়াটাই সব চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। তাতে কাউকে আলাদা করা যায় না, সব মিলেমিশে একটা ঘটনা ও একটা দৃশ্য হয়ে ওঠে। পোশাকেআশাকে চলনেবলনে কেউ যদি আলাদা হয়েও যায় সেটাও যেন এই সমগ্রতাকেই স্পষ্ট করে। কত রকমের হাঁটাতেই না এই চলাটা তৈরি হযে উঠেছে। তাডাতাড়ি পা চালাতে গিযে কেউ প্রায় দুলে-দুলে চলে, কেউ কোমরটা বেশি নাচিযে ফেলে, চুলেব গোছাব দোলায কাবো হাঁটাব ছন্দও অন্য রকম দেখায়, কোনো আধবুড়ো হাঁটুর কাছে ঝোলা হাফ প্যান্টে মাটির দিকে তাকাতে-তাকাতে ছোট-ছোট পায়ে এগিয়ে চলে। এত বিচিত্র হাঁটা সত্ত্বেও কাজের জায়গাতে পৌঁছবাব তাড়া যে-গতি আনে সেটাই প্রধান হয়ে ওঠে—সব বৈচিত্র্য সত্ত্বেও।

দুটো নতুন সাইকেল ঠেলে-ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে—অত ভিড়ের মধ্যে। মাঝে-মাঝে বেল বাজাচ্ছে। সাইকেলের হ্যান্ডেলে প্লাস্টিকের দড়ির গুচ্ছ—চালালে ওড়ে। এইটুকু রাস্তা ত পড়লেই ফুরিয়ে যাবে। তার চাইতে সবাইয়ের সঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে সাইকেলটা টেনে নিয়ে যেতে ত অনেকটা সময় লাগবে। এতটা সময়ই তো সাইকেলটা নতুন থাকবে। এখন কিছুদিন চলবে—ঠেলে-ঠেলে কাজেব জায়গায় নিয়ে গিয়ে আবার ঠেলে-ঠেলে ফিরিয়ে আনা। সাইকেল আছে বলে বাবু তাকে কোনো জরুরি কাজে পাঠাতে পারে। তেমন হলে, পুরো বাগানটাই টহল দিয়ে আসতে হতে পারে। তখন, একা-একা সাইকেলটা চালাতে খুব ভাল লাগে। দু-পাশের বেডে বা রাস্তায় কাজ করছে যারা, তারা তাকিয়ে দেখে, কে সাইকেল কিনল। চেনাজানা লোক আওয়াজও দেয়। মেয়েগুলো খিলখিল হাসে। আর এই সবে প্যাডেলের জোর বেড়ে যায়। দু-পাশের ঘন সবুজ চা গাছের ভেতর দিয়ে চকচকে সবুজ সাইকেলটা চলে। শুধু রঙের জন্যে পঁচাত্তর টাকা বেশি। হ্যান্ডেলের লাল ঝালরগুলো বাতাসে ওড়ে দু-পাশে। হ্যান্ডেলের সঙ্গে লাগানো দু-দুটো আয়নায় পেছনের চা-বেডগুলো সাঁ সাঁ সামনে ছড়িয়ে যাবে। দুটো আয়নার জন্যে পঞ্চাশ টাকা বেশি। পেছনের লাল আলো চার পাশের সবুজের ভেতর জ্বলজ্বল করে। যেন আলো দেখেই চিনে নেয়া যায় কার সাইকেল। চালাতে হলে সাইকেল ঐ-রকম চালানোতেই সুখ—যেন সার্কাসের খেলোয়াড় খেলা দেখাচ্ছে, চার পাশে গ্যালারি. আওয়াজ, হাততালি। আর, যদি এমন হয়, যেখানে চালাচ্ছে, তার দু-পাশে কেউ নেই, তা হলেও ত নিজের কানের দু-পাশে নিজেরই ছোটার হাওয়া লাগে, যত লাগে সাইকেলের গতি তত বাড়ে। চালাতে হলে ঐ রকম সাইকেল চালাতে হয়, না-হলে, ভোঁ শুনে সবার সঙ্গে হেঁটে যাওয়াই ভাল, সাইকেলটাও যেন কাজে যাচ্ছে।

সারাটা মিছিল জুড়েই ট্র্যানজিস্টার বাজে। চামড়ার ব্যাগে কারো কাঁধে ঝোলানো, ব্যাগছাড়া কারো

হাতে ঝোলানো, কারো হাতের পাতায় আঁটা, কানে কানে সাঁটা। যে যার মত সেন্টার ধরে আছে—বিবিধ ভারতী, সিলোন, করাচি। রাশি-রাশি গান বাজছে। এক-একটা গানের পাশে জোট বেঁধে সেই শ্রোতারা ছুটছে। কেউ-কেউ সঙ্গে-সঙ্গে গায়। কেউ হাততালি দেয় তালে-তালে। দু-হাত ওপরে তুলে কেউ-বা দুই হাতেই তুড়ি বাজায়।

এত গান এত জোরে একসঙ্গে বাজছে যে সেই সব মিলে একটা অর্থহীন কোলাহলেব আওয়াজ ক্রমেই বেড়ে ওঠে। এতগুলো লোকের-একসঙ্গে ছোটা, কথা বলা, গান গাওয়া, হাসাহাসি ইত্যাদির ফলেও সেই আওয়াজ ক্রমেই বেড়ে ওঠে। চোখ বুজে শুনলে মনে হতে পাবে একটা অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন কোলাহল বাগানের এই রাস্তাটা ধরে ছুটে চলেছে। সেই আওয়াজের কোনো উদ্দেশ্য নেই বলেই তাতে কোনো আকস্মিকতা থাকে না। আর থাকে না বলেই মাঝে-মাঝেই কৃত্রিম নাটকীয়তায় উচ্চগ্রামে উঠে আবার আচমকা নেমে যায়।

কিন্তু যারা এই কোলাহলের মাঝখানে আছে তারা যে-যার মত গান শুনছে, অথবা শুনছে না। যে-যার পছন্দমত গান বেছে নিতেও পারছে। এক গান শেষ হলে, অন্য রেডিয়োর অন্য গান ভাল লাগলে একটু সরেও যাচ্ছে। আর নিজেদের এই ভাল লাগাটা কোনো-না-কোনো ভাবে জানিয়েও দিচ্ছে—গেয়ে, বা হাত-তালিতে, বা তুড়িতে, বা উল্লাসে। যে-ভাললাগাব বিষয় নিজেবা কোনো-না-কোনো ভাবে তৈরি করে নি, সে-ভাললাগার ওপর এদের যেন পুরো স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না।

এত কিছুর পরেও এই এত মানুষের ভিড়ের এমনি ছোটার ভেতব অভ্যাস আর দৈনন্দিনেব এক ছন্দ থাকে। কখনোই মনে হয় না—এটা ছুটির দিন। এটাও কখনো মনে হয় না—কাজে যাবাব আগের শেষতম মুহূর্তটি পর্যন্ত নিজেদের জীবনযাপনের স্বাভাবিকতাটা আস্বাদ করে নেযাব শ্বাসরুদ্ধকর এক তাড়াতেই এমন হৈ-হল্লা। চা-বাগানের কাজকর্মের ভেতর অনিবার্যতই কৃষিকাজের অবকাশ ছড়ানো থাকে কিছু। তাই বাগিচার পাশেই এই সাইকেল দাঁড় করানো থাকবে, বেডিও চা-গাছের ওপব শোযানো থাকবে। এই রঙ, এই সাজগোছ, এই গান, এই তালের ভেতর দিযে এবা সবাই কাজে চলেছে—রোজকার কাজে, বাগানের বাঁশিব সঙ্গে-সঙ্গে। যেন উৎসব। কাজে যাওযাটা ত শ্রমিকদেব রোজকারই উৎসব।

সাতান্ন

বাঘারু ও শ্রমিকশ্রেণী

বাঘারু এই উৎসবের কেউ নয়। বাবঘবিযাব মাঠ থেকে নেমে নিপৃছাপুবে ঢুকে সে এই উৎসবেব পথে, উৎসবের ভেতর আটকা পড়ে গেছে। বাবঘরিযাব মাঠ নিচু হযে ঢলে পড়েছে নিপৃছাপুরেবই বাগিচাব বাইরের জমির ওপর। কোম্পানি এগুলো অল্পস্বল্প আধিতেও দেয কুলিদেব। সেই ধানি জমিগুলো দিয়ে তারের বেড়া টপকে কুলি লাইনের ভেতরেব বাস্তায বাঘাক পড়ে। প্রথমে সে বোঝে নি আটকা পড়ে যাচ্ছে। ভোঁ শুনে যে যার মত হাঁটছে, বাঘারুও হাঁটছে। কিন্তু অমন কয়েক পা হাঁটতে-হাঁটতেই রাস্তায় দু-দিকের বাড়িঘর, ফাঁকফোকর, ওদিকেব বাড়িঘব, ভেতবেব ফাঁকফোকব এই সব কিছু থেকে কিলবিল কবে মানুষজন বেরতে থাকে। জানলে, তখনো বাঘারু সরে দাঁড়াতে পারত। এরা চলে গেলে, নিজের পথে যেত। কিন্তু ততক্ষণে এই ভিড়টা তৈরি হয়ে গেছে আব ভিড়টা ছুটে চলেছে নিজেব বেগে, নিজের নিয়মে। আব বাঘাক নিজে টেব পায়, সামনেব ও পাশেব লোকটি যে-গতিতে ছুটছে, যেমন করে পা ফেলছে, তাকেও সেই গতিতে ছুটতে হচ্ছে ও সেই মত পা ফেলতে হচ্ছে। বাঘারু দু-একবাব থেমে পড়তে চেয়েছে। কিন্তু পারে নি। এমন নিজে ভেবে থেমে যেতে সে শেখে নি। পারে না। যদি পড়ে যেত আর তার ওপর দিয়ে এরা চলে যেত, বা যদি সবাই মিলে ধাক্কিযে তাকে বেব করে দিত যে সে এই লাইনের লোক না, তা হলেই বাঘারু এই মিছিল থেকে আলাদা হতে পারত। কিন্তু বাঘারু ত কোনোদিনই ঘটনা ঘটিয়ে উঠতে পারে না, তাকে নিয়ে ঘটনা শুধু ঘটে যায়। যতক্ষণ তা না ঘটে,

ততক্ষণ বাঘারুকে এই ভিড়ের আর এই মিছিলের চলার সঙ্গে ছুটতে হচ্ছে, এরা যেদিকে যায় সেদিকেই।

তাতেও কিছু হত না। বাঘারু ত মিশেই যেতে পারত এই বিচিত্র মিছিলে। বাঘারু যদি একটু ছোটখাট হত কারো নজরই পড়ত না তার ওপর। বা, বাঘারুর অত বড় শরীরটা যদি একটু ঢাকা থাকত। বাঘারু ঐ ভিড়ের মধ্যে পড়ে গিয়ে যখন ভিড়েরই বেগে ছোটে, তখন, তাকে দেখায় যেন ঐ ভিড়েব মাস্তুল। বহু পেছনের মানুষও বাঘারুর মাথা দেখেই দিক ঠিক করবে। কিন্তু সত্যিকারের মাস্তুলেব গায়েও অন্তত আলকাতরার বা রঙের যে আবরণটুকু থাকে, বাঘারুর তাও নেই। একটি ছোট নেংটি তার কোমরের সামনে বাঁধা। গাছের পাতাতেও এর চাইতেও বেশি ঢাকে। ফলে, সেই একমুখো ভিড়ের সঙ্গে স্রোতের বেগে ছুটলেও বাঘারু স্রোত হয়ে যেতে পারে না। সে স্রোত নয়, স্রোতোবাহিত—তিস্তার স্রোতের টানে যেমন ওপড়ানো শালগাছ ছোটে। মেয়েদের যে-দলটা বাঘারুর ঠিক পেছনে গিয়ে পড়ে, তারা বাঘারুকে হঠাৎ দেখে ফেলেই হাসতে শুরু করে দেয়। এমন উৎসবের পথে হাসি ত সংক্রামক, দেখতে-দেখতে হাসিটা ছাড়িয়ে পড়তে থাকে। যারা কাছাকাছি তারা ত হাসির কারণ চোখের সামনেই দেখতে পায়। আব-একটু ভাল করে দেখতে তারা কাছে আসতে চায়। মেয়েদের ভেতর একটা হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। এ ওকে ঠেলে এগতে চায়, পারে না। বাঘারুর পেছনে যাবা প্রথম সারিতে ছিল, তারা কিছুতেই জায়গা ছাড়ে না। পেছন থেকে ক্রমে কেউ-কেউ তার ভেতবেই ঠেলেঠুলে ঢুকে পড়ে। দেখতে-দেখতে বাঘারুকে ঘিরে একটা ঘের-মত হয়ে যায়; প্রধানত মেয়েদেব।

জলে একটা ঢিল পড়লে যেমন জলেব কাঁপন চলতেই থাকে, এই ভিড়ে বাঘারুকে নিয়ে হাসির কাঁপন তেমনি ছড়িয়ে পড়তে থাকে। যাবা বেশ দূবে তাবা বাঘারুকে ভাল কবে না দেখেও হাসতে থাকে। কেউ-কেউ আঙুল তুলে বাঘারুকে দেখায়। আর হাসিটা আরো দূরে-দূরে ছড়ায়। শেষ পর্যন্ত বাঘারু এই সম্পূর্ণ অথচ ক্রমবর্ধমান মিছিলেব অন্তর্গত চলমান দৃশ্য হয়ে পড়ে।

প্রতিদিন কাজে যাওয়া মানুষজনেব এই মিছিলের ভিড়ের ভেতব পড়ে গেছে বলেই যেন বাঘারুকে কেমন আউলাভাউলা দেখায়। তার চুল জটপাকানো—ধুলো-মাটিতে। সারা গায়ে ধুলোমাটিরই রঙ। যেন ধুলোমাটি থেকে উঠেই সে এমন লাইনে ঢুকে গেছে। এত বড় একটা লাইনের এত মানুষজন বাঘারুতে যেন একটা খেপা-বাউড়া পেয়ে যায়। মিছিলের একটা অংশ তাকে ঘিরে খেপাতে-খেপাতে চলছে।

একটা লোক বেশ লাফিয়ে-লাফিয়ে চলছিল। টাইট ছোট প্যান্ট আর টাইট গোল গলার গেঞ্জি, পায়ে মোজাসহ কেডস, হাতে একটা মাথা-বাঁধানো স্টিক। সে মাঝে-মাঝেই স্টিকটা দিয়ে কেডসটাতে মারছিল আব নিজেই লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠছিল। সেই লোকটি যেন তার স্টিকটার আরো ভাল ব্যবহার খুঁজে পায়, বাঘারুর সামনে এসে দাঁড়ায়। তাব পব যেন পেছনে পা ফেলে মার্চ করে-করে চলছে এই রকম কবে পা তুলে-তুলে হাঁটে। বাঘারুব সারা শরীরে তখন মিছিলের হাঁটা বা ছোটার গতি ধাক্কা দিয়েছে। এমন দলবদ্ধ ছোটায় ত সে অভ্যস্ত নয়। আর তার এত বড় শরীরে ছোটার একটা গতি এসে গেলে, শরীরটার ভারও সেই গতিটাকে ক্রমেই বাড়িয়ে দিতে থাকে, পাথরের পাহাড় গড়ানো যেমন। মাথায় লোকটি বাঘারুর কোমরের কাছ পর্যন্ত। সে যখন বাঘারুর সামনে ঐ-রকম কদমে-কদমে পেছনে পা ফেলে, তখন মনে হয়, বাঘারু যেন কোনো উঁচু মূর্তি, লোকটি তাই দেখছে। আর সেই দেখার যুক্তিতেই সে তাব বাঁধানো স্টিকটা তুলে বাঘারুর বাঁ বাহুতে মারে। হাতে পেলে টিপে দেখত, পাচ্ছে না বলে স্টিক দিয়ে টিপছে। ডান বাহুতেও একই রকম মারে। বাঘারুর পেটে একটা খোঁচা-মত দিতেই যে মেয়েদের দল বাঘারুকে ঘিরে ফেলেছিল তারা হাতগুলি দিয়ে নেচে উঠে কৌতুকে দুই হাত একসঙ্গে ঠোঁটের কাছে তুলে ধরে, আচমকা, বাতাসে-হেলা গাছের মত, হাসির দমকে হেলে পড়ে।

মাথায় ফুল গোঁজা, বঙচঙে শাড়ি পরা, এমন একদল মেয়ে যদি সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ে আর এক দিকে হেলে যায়, তা হলে তাদের হাতে-হাতে ধরতেই হয়। আর তেমন ধরলেই, নাচের তাল এসে যায় পায়ে। নিজেরাই বুঝে ওঠার আগে বাঘারুকে ঘেরা এই মেয়েদের সারি পরস্পরের কোমরে হাত দিয়ে নাচেব তালে-তালে পা ফেলে দেয় আব আপন মনেই খিলখিল হেসে সেই নাচের সঙ্গত দেয়।

'আরে ও রাখোয়াল, তাড়াতাড়ি এসো,
পাহাড় থেকে এক বুনো ভালুক নেমে এসে
আমাদের নাচের সারি ভেঙে দিল'

এই গানের সঙ্গতিতে ঐ লোকটি চট করে বাঘারুর পেছনে চলে আসে, বাঘারু আর মেয়েদের সারির মাঝখানে। মেয়েদের গানের তালে-তালে পা ফেলে সে বাঘারুর পেছনে-পেছনে চলে। বাঘারুর অত বড় শরীরটার পেছনে লোকটির অতটুকু শরীর আর টাইট ছোট প্যান্টে তার কোমরের অত ঘন-ঘন দুলুনি, কেমন নাচে-গানে অভিনয়ে নটঙ্গী তামাশা-মতই জমে ওঠে। লোকটি তার স্টিক তুলে বাঘারুর পেছনে-পেছন চলে, একবার বাঁ পায়ের বাঁয়ে ডান পা ফেলে, আবার ডান পায়ের ডাইনে বাঁ পা ফেলে। লোকটি স্টিকটা দিয়ে বাঘারুর পায়ের বাটিতে মারে, ডাইনে-বাঁয়ে, উরুতে মারে, ডাইনে-বাঁয়ে, পেছনে মারে, ডাইনে-বাঁয়ে। আর শেষে পেছনের ফাঁকটাতে, কানিটার ওপরে, লাঠিটাকে সোজা করে ধরে, যেন সেটা বাঘারুর পাছার ভেতরে ঢোকাবে।

এতে হাসি সামলানোর জন্যে হাতগুলো মেয়েদের দরকার হয় বলে নাচের সারি ভেঙে যায়, গান থেমে যায়, আর এই লোকটির পেছনে সারাটা মিছিল হো হো হাসিতে, খিলখিল হাসিতে, ফেটে পড়ে। বাঘারু ত মিছিলটার মাঝখানে পড়ে গেছে, তার সামনেও ত লোকজন আছে। তারাও ফিরে তাকায়, আর বাঘারুকে দেখেই বুঝে নেয়, পেছনের অত হল্লার কারণ কী।

তাকে ঘিরে এই মিছিলটা মেতে উঠেছে—বাঘারু টের পায়। তাকে ঘিরে সারাটা মিছিলে হাসি উঠেছে—বাঘারু বোঝে। তাকে ঘিরে মেয়েদের দল নাচতে শুরু করে—বাঘারু দেখেও খানিকটা। ঐ বেঁটে লোকটা এসে তাকে খোঁচায়। সামনে থেকে আবার পেছনে চলে যায়। কিন্তু বাঘারু বুঝে উঠতেই পারে না, সে কী করবে। বাঘারু এই ভিড়টা থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে পারে, কিন্তু যাবে কোথায়। এই মিছিলের পাশেই ত ঘরবাড়ি, ঘরের দুয়োরে বাচ্চারা ও মুরগি-ছাগল। মিছিলটাকে তছনছ করে দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে সে দাঁড়াবে কোথায় ? মিছিলের বাইরে ? মিছিলটা চলে যাওয়ার অপেক্ষায় ? বন্যায় উৎপাটিত শালগাছের মত বাঘারু অগত্যা মিছিলের টানে চলে—তাকে ঘিরে হাততালি আর নাচগানার হুল্লোড়ের সঙ্গে-সঙ্গে।

তাকে ত এক পলক দেখেই বোঝা যাচ্ছিল সে এ-ভিড়ের কেউ নয়। এই সাতসকালে কাজের মিছিলে বাঘারুর শরীরটা বড় বেশি নগ্ন হয়ে গেছে। এতটা নগ্নতা এই মিছিলেরও সয় না। হুল্লোড় বাধিয়ে মিছিলটা তাই বাঘারু থেকে নিজেকে আলাদা করে নিচ্ছে, বাঘারুর এই নগ্ন শরীরটা থেকে নিজেকে তফাত করছে।

অথচ বাঘারুর পায়ের পাতা দুটো এমনই লম্বা-চওড়া, যে মনে হয় এই মিছিলেই প্রোথিত, মাটির ভেতর থেকে উঠে মাটিসহ চলছে। তার শরীরময় শুধু ত সেই নেমে যাওয়া শিকড়ের টান। কয়েক দশক ধরে বেড়ে ওঠা মহীরুহের কাণ্ডের মত তার পিঠটা কোথাও পিছল, কোথাও শ্যাওলাধরা, কোথাও রুক্ষ। অথচ মেরুদণ্ডের দু পাশের পেশিপুঞ্জ এমন ঝরনার মত নেচে-নেচে ওঠে-নামে যে বোঝা যায়, এ-শরীরে বৃক্ষের প্রাচীনতা আছে অথচ স্থাণুতা নেই। ঐ কোমর থেকে পায়ের সরল অবতরণ, মূর্তির আকার নেয়, কোথাও কোনো ঢাকা নেই বলেই। যেন, নির্মীয়মাণ কোনো ব্রিজের সদ্য তৈরি দুটো পিলার নদীখাত থেকে উঠে এসে এই মিছিলে ছুটছে। অথচ এই মিছিলে প্রোথিত এই শরীর এই মিছিলের নয়। বাঘারুর শরীর এখন বাঘারুর বৈরী।

বাঘারুকে ঘিরে নাচতে-নাচতে, গাইতে-গাইতে, বাঘারুকে খোঁচাতে-খোঁচাতে এই মিছিলটা একটা চড়াই ভেঙে ওঠে। বাঘারু চড়াইটা দেখতে পায় নি—তার আগে এত লোক। কিন্তু পায়ে-পায়ে পায়ের বাটির পেশির টানে, আঙুলের ভরে, টের পেয়ে যায়। চড়াইটায় উঠতেই এই মিছিল থেকে একটা ভিড় আলাদা হয়ে ডাইনে বেঁকে। বাঘারু সরে দাঁড়াতে গেলে আবার সেই মিছিল তাকে সোজা টেনে নিয়ে যায়, সে আর বেরতে পারে না। ফ্যাক্টরি ডাইনে পড়ে থাকে। পাতা শুকোবার শেড পড়ে থাকে। বাঘারুকে নিয়ে মিছিলটা এগিয়ে যায় আর মিছিল থেকে গোছা-গোছা লোক খসে পড়ে, যে-যার কাজের জায়গায়। এখন বাঘারু দেখতে পায় তার সামনে আনন্দপুরের গেটের মতই একটা গেট আর তার ওপরে চা-বাগিচা। সাইকেল আর ট্র্যানজিস্টার নিয়ে ঐ বাকি মিছিলটা চা-বাগিচায় নামে।

এখন বাঘারুকে নিয়ে মিছিলটা আর ব্যস্ত নয়, কিন্তু বাঘারু মিছিলটাতে আটকা পড়ে গেছে। এই উঁচু থেকে বাঘারু দেখতে-দেখতে নীচে নেমে যায়—তারের বেড়ার ঘের দেয়া চা-বাগান, রাস্তার পর রাস্তা, মোড়ের পর মোড়, মাঠের মত সমান চা-গাছের মাথার ওপরে ছাতার মত সমান শিরীষ গাছের মাথা। আর সেই বাগিচা জুড়ে নানা রঙের মানুষ কাজ করছে।

কিন্তু, দেখতে না-দেখতেই মিছিলটা বাগিচার ভেতর নেমে পড়ে বলে বাঘারু আর দেখতে পায় না। সে সমান বেগেই ছোটে—তার শরীর ঘেরা মিছিলটা খসাতে-খসাতে।

আটায়

বাঘারু ও বাবু

দুই পাশে চা-বাগিচার সারি, মাঝখানে চওড়া সবুজ রাস্তা, বাঘারু দাঁড়িয়ে থাকে, একলা, বাকল খুবলে নেয়া অর্জুন গাছের মত, মিছিলটা যে সম্পূর্ণ ঝরে গেছে, বুঝতে।

বাঘারুর সামনে সব জায়গাতেই কাজ। চা-ঝোপে মেয়েদের বুক পর্যন্ত ঢাকা—যেন স্নানে নেমেছে। মেয়েরা টুকটুক করে পাতি ভেঙে হাতের ভেতরই রাখছে। হাত ভরে গেলে কাঁধে ঝোলানো থলিটাতে ফেলে। আঙুলগুলো আবার গাছের ওপর নেমে আসে। খোঁজাখুঁজি নেই। আঙুলগুলো জানে, কোথায় পাতা। মুহূর্তে-মুহূর্তে পুটপুট আওয়াজ। ধানখেতের গোড়া নিড়নোর সময় এ-রকম আওয়াজ খেতময় ছড়িয়ে পড়ে। ধানখেতের কথা মনে হতেই বাগিচার এই কাজ আর তার নিজের কাজের ভেতর কেমন মিল খুঁজে পেয়ে যায়, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই, আর নিজের হাত দুটো নিজের চোখের সামনে মেলে ধরে। তাকে যদি পাতি তুলতে হয়, সে কি একটি পাতিও তুলতে পারবে? নাকি, তার আঙুলগুলো, ষাঁড়ের জিভের মত, এক গোছা পাতা মুচড়ে আনবে? ডান হাতটা চোখের সামনে মেলে, বুড়ো আঙুলটা বাঁকিয়ে, ভেতর দিকে আনার চেষ্টা করে। আঙুল বেঁকে না। বুড়ো আঙুলের তলার মাংসতে দুটো-একটা দাগ পড়ে মাত্র। বাঘারু তখন তার বুড়ো আঙুলটা দিয়ে বাকি চারটি আঙুলের মাথা ছুঁয়ে যায়। বোঝার চেষ্টা করে, ছোঁয়াটা সে বুঝতে পারে কি না।

বাঁ-পাশে একদল মরদ বাঁকানো দা নিয়ে চা-গাছগুলোর ডাল কাটছিল। দা-টা ছুরির মত পাতলা, হাতলটা ছোট্ট। বাঘারু কি তার হাতের মুঠোয় ঐটুকু হাতল ধরতে পারত? বাঘারু আবার তার ডান হাতটা তুলে চোখের সামনে পরীক্ষা করে। অভিজ্ঞ চোখে ধরা পড়ে, তার মুঠোর ফাঁকাটা এতই বড় যে কুড়োল, কোদাল বা লাঙল ধবা যায়, কিন্তু ছুরির মত দায়ের বাঁট আলগা হয়ে খসে যাবে। বাঘারু ডান হাতটা মুঠো পাকায়। অবলম্বনহীন তার আঙুলগুলো গেঁথে বসতে পারে না, আলগা থাকে। বাঁ দিকে একদল মরদ নালীর মধ্যে নেমে কোদাল দিয়ে নালীর গা থেকে ভেজা মাটি তুলে-তুলে ওপরে ফেলছিল। মাথার ওপর কোদাল তুলে ধরার ভঙ্গি বাঘারুর চেনা। উৎপাটিত সেই মাটির কাল বাঘারুর চেনা। বর্ষার জঙ্গলে বন্ধ নালীটার একটা ছোট অংশের ধীরে-ধীরে পরিষ্কার হয়ে ওঠাটা বাঘারুর চেনা।

সামনে তাকিয়ে দেখে, মোড়ে কয়েকজন বাবু। মিছিলটা তাকে এখানে রেখে ঝরে যাওয়ার পর, আবার তার নিজেরই কাছে নিজের গ্রাহ্য হয়ে উঠতে বাঘারুর সময় লাগে। চা-বাগিচার চারপাশের এই সব আধোচেনা কাজকর্ম আর সে-সবের সঙ্গে তার নিজের কাজ করার অভিজ্ঞতার বিনিময়—এই সবের ভেতর দিয়ে বাঘারু তার নিজের কাছে ফিরে আসে।

সামনে বাবুদের দেখতে পেয়ে যেন যাওয়ার একটা জায়গা পায়। বাবুরা ছিল না বলেই বাঘারু এতক্ষণ মিছিলবন্দী হয়ে ছিল। বাবুরা আছে বলেই এখন ত বাঘারুর একটা কাজও জুটে যেতে পারে—এ-রকম নালী কাটা বা কোদাল-কুড়োল চালানো কাজ। কাজ থাকলে মিছিলটা তাকে এ-রকম তাড়া করে ফিরত না, তার পর তাকে একা ফেলে খসে যেত না। বাঘারু কি মিছিলেই ঢুকতে চায়? বাবুদের সামনে বাঘারু পৌঁছে যায় বটে কিন্তু তার পরই মুশকিল বাধে। বাঘারু এমনি ত যেখানে-সেখানে একা-একা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে কিন্তু এখন যে তাকে এত উঁচু থেকে চোখ নামিয়ে

বাবুদের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে হয়—সেটাই বড় কষ্টের । শরীরটাই এমন বাঘারুর যে শুধু দাঁড়িয়ে থাকলেও না-দেখে উপায় নেই। বাবুই জিজ্ঞাসা করেন তাকে, 'কী ? কিছু বলছ ?'

'না হয় বাবু', বলে ফেলে তার মনে পড়ে যায় সে ত এইটুকু বলতে চেয়েছিল যে কোদাল-কুড়োল চালানোর কাজটা সে পারে। সে তাড়াতাড়ি বলে, 'হয় বাবু—'

বাবুর বোধহয় একটু সময় ছিল, বাবুদের হাতে যেমন থাকে। জিজ্ঞাসা করেন 'কী হয় ?'

বাঘারু আবার ফাঁপরে পড়ে। বাবুরা প্রায় কোনো সময়ই বাঘারুকে কিছু জিজ্ঞাসা করে না। কিন্তু অন্যদের করলে সেটাও ত বাঘারু শুনতে পায়। কখনো-কখনো কোনো-কোনো বাবু তার সঙ্গে কথা বলে, যেমন এমেলিয়া বাবু। কিন্তু কখনো কোনো বাবুর কথার কোনো জবাব তার মাথায় এল না। বাবুরা কী জানার জন্যে কী জিজ্ঞাসা করে, বাঘারু, তার আন্দাজ পায় না। তাড়াতাড়ি বলে, 'না হয় বাবু।'

জবাবটা শুনে বাবু খুশি হয়েছেন বোঝা যায়। হাসেন। যেন এই জবাবই তিনি চাইছিলেন। বাঘারু বলতে চায়, সে পাতি তোলার কাজ জানে না, ছুরি চালানোর কাজ জানে না। এর পর সে বলতে চায়, সে কোদাল চালানোর কাজ জানে, সে কুড়োল চালানোর কাজ জানে। এরও পর সে বলতে চায়, বাবু তাকে একটা কোদাল বা কুড়োল দিক।

কিন্তু এই তিনটি কথার কোনটা আগে আর কোনটা পরে বলবে তা নিয়ে বাঘারুর সংশয়ের শেষ নেই। মনেও থাকে না তার, কোনটা আগে আর কোনটা পরে—যদিও সেই ক্রমটা বাঘারুই ঠিক করেছে। বাঘারুর নিজের কাছে কথাটা যেমন পরপর আসে, বাবুর কাছে সে-রকম পরপর হয়ত আসে না। এই একটা 'হয়ত'-তে বাঘারু বিপর্যস্ত হয়ে যায়।

'বাবু, মুই পাতা তুলিবার না পারি।'

শুনে বাবু মুখ তুলে তাকায়। বাঘারু ঘাড় ঘোরায় সেই জায়গাটা খুঁজতে, যেখানে মেয়েরা পাতি তুলছিল, এমন ভাবে যেন বুকজলে নেমে আছে। সে জায়গাটা দেখতে পায় না। ফলে বাঘারুকে ঘুরে দাঁড়াতে হয়, বাবুকে সম্পূর্ণ ভুলে, অথচ, তার কথার প্রমাণের জন্যে বাবুর সামনে ঐ পাতিতোলা কাজটা দেখাতে। বাঘারু কথা দিয়ে কাজ বোঝাতে পারে না, কাজ দিয়ে কথা বোঝায়।

সেই মেয়েদের দেখতে পেয়ে আঙুলটা তুলে বলে, 'ঐ যে বাবু।'

'কী ?'

'পাতা তুলিছে বেটিছোয়ার ঘর। মুই না পারি।'

'হুঁ', বাবু চোখটা ঘুরিয়ে নেন। সেই চোখ ঘোরানোতে কোনো অবজ্ঞাও থাকে না, মাতাল কুলিকামিনের এমন দার্শনিক সংলাপে তাঁর অভিজ্ঞতারই একটা প্রকাশ থাকে মাত্র।

'বাবু'

'হুঁ'

'মুই ডাল কাটিবার না পারি', বলে বাঘারু বাবুর সামনে তার হাতটা তোলে, বাবুকে ছাড়িয়ে হাতটা বিঘত খানেক এগিয়ে যায়—তার হাতটা এতই লম্বা, 'ঐ *ঠে* বাবু।'

'হুঁ'

'ঐ *ঠে* ছুরিখান চালাছে। মুই না-পারি বাবু।'

'হুঁ'

ডাল কাটতে পারে, কিন্তু ঐ কলম ছুরি তার হাতে ধরবে না এত জটিল কথা কী ভাষায় বোঝায় বাঘারু ?

বাঘারু চুপ করে যায়। তার আর-কিছু মনে পড়ে না। কিন্তু এটা বোঝে তার কথাটা বাকি আছে। বাঘারুর সাইজের একটা মানুষ এত কাছে দাঁড়িয়ে থাকলে তার ছায়া পড়ে। বাবু যেন অপেক্ষায় ছিলেন, সেই ছায়াটা সরে যাবে। যায় না দেখে মুখ ঘুরিয়ে বলেন, 'ত হয়েছে ত, এবার যাও।'

'কোটত বাবু ?'

'যেখানে যাচ্ছিলে।'

'কোটত বাবু ?'

'সেটা আমি বলব কী করে বাবা, এখানে পাতিটেপা ফাড়ুয়ামারা এই সব হচ্ছে, এ-সব ত তোমার

কাজ না, এখন যাও।'

বাবুর এই কথাটিতেই বাঘারুর আবার মনে পড়ে যায়, সে তাড়াতাড়ি বলে ফেলে, মনে পড়ার আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে, 'মুই কোদাল চালাবার পারি বাবু, কুড়িয়াল চালাবার পারি।' যা পারে সেটা বলে ফেলতে পেরে এবার তার প্রমাণ দিতে দুই পা ফাঁক করে বাঘারু হাত দুটো ওপরে তুলে কুড়োল-কোদাল নামানোর ভঙ্গিতে বলে, 'এ্যানং, বাবু।'

'হুঁ'

'এই, এ্যানং', যেন কোদাল-কুড়োল চালানোটা কথা দিয়ে বাবুকে বাঘারু সম্পূর্ণ বুঝিয়ে উঠতে পারছে না, তাই তাকে দেখিয়ে বোঝাতে হচ্ছে।

'পার ত চালাও।'

বাঘারু মুহূর্তে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। তার পর তার চোখ স্থির করতে হয় সেই ফাড়ুয়া-চালানো দলটার কাছে নালীর মাটি যারা তুলছিল তাদের ওপর। বাঘারু তাদের দিকে ছুটে যায়।

বেড় ও রাস্তার মাঝখানে সরল নালীটা এতটাই গভীর যে সেখানে নেমে যারা কাজ করছিল তাদের ঘাড়টুটু শুধু ওপরে আছে, এতটাই চওড়া, যে লাইন বেঁধে এই দলটির কোদাল চালাতে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না, এমন কি, ঘুরে দাঁড়িয়ে দেয়াল চাঁছতেও পারছে। কিন্তু গভীরতা এত বেশি বলেই চওড়াটা চোখে পড়ে না। অভ্যস্ত কাজের ব্যস্ততাহীনতায় ভেতরের জংলা কাল মাটি চেঁছে ওপরে তুলে রাখা হচ্ছিল আর কোদালের ঝিলিক তুলে আবার মাথার ওপর থেকে নামানো হচ্ছিল গর্তের অন্ধকারে।

বাঘারু সরাসরি অনেকটা চলে যায়। যেন তার জন্যে একটা কোদাল বাইরে রাখাই আছে, নিয়ে গর্তে নেমে যাবে—এমন নিশ্চয়তায় সে কোদাল খুঁজে যায়। বেশ খানিকটা গিয়ে আবার ফিরতে-ফিরতে বলতে শুরু করে, 'মোর কোদালখান কোটত, বাবু কহিল মোক, মোর কোদালখান— ?'

ততক্ষণে বাবু তাকে একটু জোরেই ডাকেন, 'এই, এই এখানে কী, এই, এদিকে এসো, আরে এ—ই।'

মুখ ফিরিয়ে দেখে বাবু তাকেই ডাকছেন, 'এদিকে এসো, ওখানে কী ?'

আবার বাবুর কাছে ফিরে যেতে শুরু করে। কাছাকাছি আসতেই বাবু রেগে উঠে বলেন, 'ওখানে কী করছ ? কাজ হচ্ছে, যাও', বাবু বাঁ-হাতটা তুলে বাঁ-দিকটা, বাঘারুর দাঁড়িয়ে থাকা রাস্তাটাই সোজা, দেখিয়ে দেন, সেটাই বাঘারুর বেরবার একমাত্র রাস্তা, আর, বাঘারু সেই রাস্তা ধরে সঙ্গে-সঙ্গে চলতে শুরু করে—এমন নির্দেশ পালনের শারীরিক অভ্যাসে ! বাবু পেছন থেকে বলে ওঠেন, 'এ ত বুলডোজার, বাবা—।'

বাবুর কাছ থেকে বাঘারু একটু সরে যেতেই সে আবার ঐ ঝোপঝাড় আর গাছ-পালার অংশ হয়ে যায়। চা-বাগানটায় ঝোপঝাড় আর গাছপালাই ত বেশি, ক-টা জায়গাতেই-বা কাজ হয়। কিন্তু এত সাজানো-গোছানো ঝোপঝাড় আর টানা সোজা চওড়া রাস্তায় বাঘারুর এই এত লম্বা শরীরটা এত উদোম হয়ে থাকে !

উনষাট

মাথা-ছাউনির পাতা

সামনে, কিছু দূরে চা-বাগানের শেষে টানা ঝোপের লাইন শুরু, রাস্তার শেষে। ওদিকে নিশ্চয়ই ঝোরা। বা, গর্তের লাইন। বাগিচার সীমানা শেষ। ঐ ঝোপের ফাঁক দিয়ে বাঘারু বাইরে বেরিয়ে যেতে পারবে। বড় জোর একটু এদিক-ওদিক করতে হবে।

ভিড়ের মাঝখানে আচমকা পড়ে, ভিড়ের টানে-টানে এতটা চলে আসতে হয়েছে বাঘারুকে, এই, একেবারে চা-বাগানের মাঝখানে। তার পর সেই ভিড় বাঘারুকে আবার একলা ফেলে খসে পড়েছে।

এত ঘন আর এত লম্বা একটা ভিড় তাকে ঘিরে টেনে এতদূর নিয়ে এসে ফেলেছে বলেই কি বাঘারুর, এখন এই চা-বাগানের এমন নির্জনতাতেও, নিজেকে 'ন্যাংটিয়া' লাগে। মাঠে, ফরেস্টে, নদীতে, নদীর পাড়ে ত বাঘারুর এমন লাগে না। সেখানে ত তার শরীরটা একটা গাছের মত, নাগিন (চাঁপা) গাছ, বাতাসটা ধরার জন্যে, খাড়া। ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে বাতাসের ইশারা দেয়ার জন্যে, খাড়া। বা স্রোতের ইশারা দেয়ার জন্যে, শোয়া। বাঘারুর শরীর যেন সেই ইশারা হারিয়ে ফেলে—মানুষের হাতে পোঁতা এই হাজারে-হাজারে চা-গাছ আর সারে-সারে শিরীষ গাছ আর ঝোপঝাড়ের মাঝখানে! মাঠের মত সমান চা-গাছের মাথা আর ছাতার মতন সমান শিরীষ গাছের মাথার মাঝখানে মানুষের বানানো আকাশ দিয়ে হাওয়া এসে বাঘারুর গায়ে লাগলে সে কুঁকড়ে যায়—তার শরীরটা আর-একটু ছোট হলে পারত, বা তার নেংটিটা আর-একটু বড়, এই চা-বাগানের ভেতর দিয়ে চলার মত ছোট, বা বড়।

ডাইনে বাঁয়ে না বেঁকে বাঘারু সোজা ঐ ঝোপঝাড়ের দিকেই চলে। ঐ মিছিলটা তাকে অনেকখানি উত্তরে সরিয়ে এনেছে। বেরিয়ে একটু দক্ষিণে গিয়ে তাকে ডেমকাঝোরার রাস্তাটায় উঠতে হবে। দিকের নিশানা ঠিক থাকলে ঐ রাস্তাটাতে গিয়েই ঠেকবে।

সামনে এসে দেখে তরিকা গাছের সারি দিয়ে বেড়া। আনারসের মত মোটা, শক্ত, অথচ অনেক বড়, চ্যাপ্টা পাতা ছড়ানো! বড়-বড় গাছগুলোতে আবার একটা ডাল থেকে আর-একটা ডাল বেরিয়েছে। মাথা নিচু করে বাঘারু ফল খোঁজে, ছিঁড়ে নেবে। একটু এদিকে-ওদিকেও তাকায়। এখন ফলের সময় না। তবু গাছ দেখলেই ফল খুঁজতে হয়। 'গাছো দেখিবেন, ফলো খুঁজিবেন।'

ফল না পেয়ে বাঘারু এবার পাতাগুলো দেখে। এখানে কেউ এ পাতা কাটে না। লাগেও না হয়ত কারো। এখানকার কুলিদের ত ঘর আছে। তা হলে ঐ পাতা দিয়ে আর ছাওয়াবে কী? আর এ ত এমনিতে হয় নি, লাইন বেঁধে। চা-বাগানের সীমানা দিয়ে পোঁতা হয়েছে—কাঁটাবেড়া দেয়ার জন্যে।

—বাঘারুর ত এই পাতাগিলান নাগে। যেইঠে যাছে বাঘারু, ঐঠে যদি এইলা বড়-বড় তরিকা পাতা না মিলে? এ্যানং টিনের নাখান তরিকা পাতা দেখি ক্যানং করি ছাড়ি যাবে বাঘারু? ছাড়া যায়? এ্যানং সাইজের পাতাগিলা, এ, ধর কেনে একখান হবা ধরিবে সিকিখান দশ ফুটি টিন। তা, ধর কেনে, চারখান পাতা জোড়া লাগিলে একখান টিন হয়্যা যাবে। আর দুইখান টিন পাশত দিবে—ব্যাস, বাঘারুর এই ঠ্যাং দুটা বাদ দিয়া বাকি শরীলখানের উপরে চালা উঠি যাবে—

নিজের শরীর আধাআধি ঢাকার মত এমন ছাউনি হাতের নাগালে পেয়ে ছাড়ে কী করে বাঘারু?

কিন্তু এত মোটা, লম্বা পাতা ত আর মুচড়ে ছেঁড়া যাবে না, কাটতে হবে। দা বা কুড়োল পাবে কোথায়? নিচু হয়ে ঝোপঝাড়ের তলায়-তলায় সুবিধেমত পাথর খোঁজে। এই পাতার ডালগুলোতে রস থাকে। চ্যাপ্টা ধারালো পাথর পেলে সেটা দিয়ে মেরে-মেরে থেঁতলে-থেঁতলে কেটে নিতে পারে। কিন্তু তেমন একটা সুবিধেমত পাথর পায় কোথায়? আর, তাও আবার এদিকে? বাগানের ভেতরে? এখানে পাথর আসবে কোত্থেকে? এলেও ত কুড়িয়ে ফেলে দেবে—বাগান পরিষ্কার রাখতে। বেড়ার ওদিকটায় গেলে পাথর পাওয়া যেত, হয়ত, চ্যাপ্টা ধারালো পাথর।

বাঘারু ঝোপের ফাঁক খোঁজে—বাইরে গলে যাওয়ার ফাঁক। বর্ষায় জল আর মাটির রস খেয়ে গাছগুলোর গোড়া এত ফোলা যে ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে গেছে। তলায় ফেঁকড়িও বেরিয়েছে অনেক। গাছের গোড়ায় মাটি আগের মত উঁচু করে সাজানো—যাতে কোনো ফাঁক না থাকে। অথচ বাঘারু তেমন একটা ফাঁকই খোঁজে—শেয়ালের তৈরি করা ফাঁক। শেয়াল সামনের দুই পায়েব নখে মাটি সরিয়ে-সরিয়ে, পরে চার পায়ের নখে বেড়ার তলায় গর্ত বানায়। গর্তের পেছনে টান-টান হয়ে শুয়ে আর ঘষে-ঘষে গলা গর্তের মধ্যে নামায় 'মাটিরা নিন্দুরের (মেটে ইঁদুর) নাখান।' তার পর গর্তের ঢাল বেয়েই বেড়ার অন্য দিকে গলা তুলতে থাকে, যেন শিয়াল কোনো চার পেয়ে খাড়া জন্তু নয়, লেপটানো জন্তু। পেছনটা একবার পেরিয়ে গেলেই লাফিয়ে চার পায়ের ওপর খাড়া হয়ে, গা ঝাড়া দিয়ে ধুলোমাটি ঝরিয়ে নেয়। শিয়ালের খোঁড়া তেমন গর্ত পেলে বাঘারু নিজের দুই হাতে তাকে আরো কিছুটা গভীর করে, গলে যাবে? এই একটু আগে যে-বাঘারু নিজের শরীরের বিশালতা ও নগ্নতা নিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে কুঁকড়ে যাচ্ছিল সে এখন একটা বেড়া টপকানোর জন্যে নিজের শরীরকে শেয়ালের মত নরম ও নমনীয় ভেবে নিতে পারছে?

কিন্তু বাঘারু করে বসে উল্টোটা। পাথর বা ফাঁক খুঁজতে কোমর ভেঙে ডানদিকের ঝোপটার তলায়

অকাতে-ভাকাতে যাচ্ছিল—যেন তার পয়সা হারিয়েছে। একটা জায়গায় এসে দেখে, গাছগুলোর গোড়া তেমন বড় ও মোটা নয়। তা হলে মাথায়ও বাড়ে নি নিশ্চয়। উঠে দাঁড়ায়, দেখতে। কিন্তু, দাঁড়িয়েই, দুই হাতে পাতাগুলোকে দুদিকে একটু কাত করে, নিজে কাত হয়ে প্রথমে বাঁ পা বাইরে দেয়, তার পর ডান পা টানে। হাতি এই রকম ফাঁক বুঝে কাঁটাগাছ পেরোয়, তলায় কাঁটাগাছের ঝোপ একটুও না ছুঁয়ে।

বাঁ পা-টা বাঘারু গাছের নীচে উঁচু করে দেয়া আলগা মাটির ওপর রেখেছিল। কিন্তু তখনো শরীরের ওজন তার ডান পায়েরা ওপর, বাগানের ভেতরে। যেই ডান পাটা তুলে বুকটাকে ঝোপের ফাঁকে গলিয়ে দিয়েছে, অমনি নিজেরই শরীরের ভারে পায়ের তলার মাটি খসে যায়, আর, নদীর পাড়ভাঙার মত, বাঘারু একেবারে হুড়মুড় করে ধসে যায়।

পাক খেয়ে-খেয়ে গড়াতে-গড়াতে বাঘারু এক জায়গায় আটকে যায়। ঘাড়টা তুলতে গিয়ে আবার একটু গড়ায়, কিন্তু ততক্ষণে লতার মত লম্বা আর পাথরের মত শক্ত পায়ের গিরগিটির মত আঙুলগুলো মাটি পেয়ে গেছে।

সেই পায়ের ভর দিয়ে বাঘারু প্রথমে উঠে বসে। চারপাশে দেখে। এমন কিছু নয়। চা-বাগানটা খাড়াইয়ে, মাটি ভেঙে ঢাল বেয়ে বাঘারু নীচে পড়ে গেছে। এই ঢালটার সামনে খোলা মাঠ।

আর-একবার তাকিয়ে বাঘারু আবিষ্কার করে ঢালটা পাথরে-পাথরে বোঝাই। এই এত পাথর দেখে তার মনে পড়ে, সে পাথর খুঁজছিল। আচমকা পড়ে যাওয়ায় সে ভুলে গিয়েছিল। মনে পড়ার পর পতনটাই ভুলে গিয়ে বাঘারু খাড়া দাঁড়ায়। বাঘারুর চুল থেকে গোড়ালি পর্যন্ত অসংখ্য কুচো পাথর লেগে আছে, যেন সে আর বাঘারু নয়, বাঘারুর পাথুরে মূর্তি। শরীর তার পেশিতে পেশিতে এমনই খাঁজময় আর ঘাম-ঘামভাবে এমনই আঠালো যে পাথরকুচি তার সারা গায়ে লেগে, ফুঁটে, থেকে যেতে পারে।

দাঁড়িয়ে উঠে, মাটিতে চোখ ফেলে বাঘারু পাথরগুলোকে একবার দেখে নেয়। পাথর যা আছে, এই ঢালটারই গায়ে। বড়-বড় পাথরগুলো ঢাল বেয়ে নিচুতে। তা ছাড়া বোল্ডার আর বড় সাইজের পাথরই বেশি। সেই ফাঁকগুলো পাথরকুচিতে ভরা। বড় পাথরগুলোতে তলার দিকে শ্যাওলা, অনেকদিন ধরে পড়ে আছে। ছোট পাথরগুলো হলদেটে বেশি। কিছু শাদা। চা-বাগানের সীমানার ঢাল। জমিটা হয়ত চা-বাগানেরই, কিন্তু চায়ের খেত হয়ত ঐখানেই শেষ। মাটি যাতে না ভাঙে সেইজন্যে কোম্পানি প্রতি বছরই পাথর ফেলে।

ষাট

বাঘারুর পাথর খোঁজা

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে চোখ দিয়ে বাঘারু তার পাথরটা খোঁজে। যে-কোনো একটা পাথর, হাতে ধরা যায় এমন ছোট, আর কাটা যায় এমন ধারালো। লম্বাটে একটা পাথরের টুকরো তার চোখে পড়ে—কাঠের টুকরোর মত, ধরার সুবিধে। কিন্তু চকচক করছে। তার মানে বালি-পাথর। ভেঙে যায়।

সেটা থেকে চোখ সরিয়ে এপাশ-ওপাশ দেখতে-দেখতে আবার সেটাকেই ফিরে দেখে ফেলে। এখান থেকে দেখে, তার কাজের পক্ষে সবচেয়ে ভাল পাথর ওটাকেই মনে হয়। কিন্তু এত চকচক করছে যখন, বাঘারু জানে, ওটা বালি-পাথর। তবু, একবার যাচাই করে ফেলে না দিলে চোখটা বারবারই ওদিকে যাবে। বাঘারু পাথরটার দিকে পা ফেলে। তার পা ফেলার দোলায় শরীরে লেগে থাকা পাথরকুচি পাথরে ঝরে পড়তে থাকে।

পাথরটা তুলে দেখে—গোটা নয়, একটা দিকে কোনাকুনি ভেঙেছে আর সেই দিকের খানিকটা চটে গেছে। তার ফলে ঐ দিকটাতে একটা ধার আছে। মারলে কেটে যাবে। কিন্তু ধরার জায়গা নেই। সে

না-হয় দুই হাতেই ধরল। দুই হাতে ধরে দেখে বাঘারু। মনে হয় পাথরের ওপরটা কে যেন খুঁটে রেখেছে। বালি-পাথরগুলো তুললেই এ-রকম মনে হয়। বোল্ডার পাথরগুলো একেবারে চকচকে গোল। কোনো জায়গায় একটু ওঠা-নামা নেই।

দুই হাত তুলে গাছের গোড়ায় মারলে পাথরটা ভেঙে যাবে কিনা পরীক্ষা করতে বাঘারু দুই হাতে ধরে দুই দিকে চাপ দেয়। বাঁ হাতে পাথরটা লম্বালম্বি ভেঙে যায়। বাঘারু দুই হাতই সরিয়ে নিলে পাথরটা তার পায়ের কাছেই পড়ে। তাতে আবার একটা ছোট লম্বা টুকরো হয়। বাঘারু দেখে, তার পায়ের কাছে পড়ে আছে একটা ভাঙা মূর্তি, পিঠের বাঁকটার কাছে একটু খোবলানো, গলাটা লম্বা। বেটিছোয়াদেও। বাঘারু তার মূর্তি থেকে চোখ সরিয়ে নেয়। বাঘারু ত গাছতলায় বসাবার পাথর খুঁজছে না, সে ডাল কাটার অস্ত্র খুঁজছে।

আর-একটা পাথর দেখে এগয়। তার শরীর থেকে পাথরকুচি পাথরে পড়ে ঝুরঝুর। কাছে গিয়ে দেখে, বোধহয় গেড়ে আছে। পা দিয়ে পাথরটা নাড়ায়, নড়ে না, তার মানে মাটির অনেকখানি ভেতরে সেঁদিয়ে আছে। বাইরে যেটুকু দেখা যাচ্ছে, তাতে কিছুই বোঝা যায় না। পা ঐ পাথরের ওপরই রেখে আবার পাথর খোঁজে বাঘারু।

পায়ের কাছে একটা ছোট জাম্বুরা [বাতাবি] সাইজের পাথর পড়ে ছিল, কুড়িয়ে নেয়। দুই হাতের চেটোতে সেই গোল, নিটোল পাথরটাকে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখে। দেখতে কী সুন্দর! 'হেই এটুস ময়লা-ময়লা শাদা, ঠাণ্ডা নাখান, আর ডিমের নাখান একটা দিক গোল, আরেকখান চুখা।' বাঘারু চোখা দিকটা এক হাতে ধরে সোজা করে। 'মানষির মাথার নাখান।'

সেটা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে বাঘারু দেখে এটা থেকে কত ভাল একটা টুকরো বের করা যেত। করাত দিয়ে কাটলে, মাঝখানের টুকরোটা একেবারে আস্ত একটা দা হয়ে যেত। বাঘারু পাথরটাকে তার হাতের সমস্ত জোর দিয়ে সামনের একটা বড় পাথরের ওপর মারে। আগুনের ফুলকি ছোটার সঙ্গে-সঙ্গে কয়েকটা বন্দুকের আওয়াজ একসঙ্গে হয়। বারুদের গন্ধটা বাঘারুর নাকে এসে লাগে যখন, প্রতিধ্বনিটা তখন আসে বাগানের দিক থেকে। পাথরটা তখনো গড়িয়ে যাচ্ছে।

বাঘারু দেখে, বা দেখেছিল আগেই, এখন ভাবে, বরং এই এত পাথরের মধ্যে খুঁজে বের করার চাইতে, আর-একটু নীচে নেমে, যেখানে ঢাল শেষে হয়েছে, সেখানে ছড়ানো-ছিটনো পাথরগুলোর ভেতর খুঁজে বের করা বোধ হয় সহজ। বাঘারু তাই নীচে নামতে থাকে। একটা বড় পাথর থেকে আর-একটা বড় পাথরে লাফিয়ে, নুড়ি পাথরগুলোর ওপর একটা পা দিয়ে আর-একটা বড় পাথরে উঠে, বাঘারু লাফিয়ে, ঢালটার তলায় নেমে যায়। তার পায়ের ধাক্কায় আর তার এক-একটি লাফে নুড়িপাথর আর ঢিল পাথরগুলো ঝুরঝুর গড়গড় করে গড়িয়ে যেতে থাকে আর যে-দুই জায়গায় সে পা রাখে, সেখানকার পাথর মাটিতে গেড়ে যায়।

যেখানে লাফিয়ে নামে, সেখানে, তার সামনে, বাঘারু দেখে একটা বিরাট উঁচু মানুষের মাথা এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে। ঘাস, বালি আর বুনো ঝোপের মাঝখানে, যেন কেউ ফেলে রেখে গেছে। বাঘারু নিচু হয়ে মাথাটাকে সোজা করে দিতে চায়, পারে না, এত ভারী। তখন দুই হাতে পাথরটাকে টানে। মাটি আর পাথরের রেখায় বাঘারু বোঝে, এখানে বর্ষার জল নেমে, জমে, আবার বেরিয়ে যায়। আর সঙ্গে নিয়ে আসে ছোট-ছোট পাতলা নুড়ি। মাটির সঙ্গে মিশে শক্ত হয়ে-হয়ে এই মানুষের মাথাটা তৈরি হয়েছে। এখন বাঘারু ওটাকে উল্টে দেয়ায় মানুষের মাথা বলে মনে হচ্ছে না। বাঘারু দুই হাতে ওটাকে তুলে সামনের উঁচু পাথরটার ওপরে বসিয়ে দেয়। দেখে-দেখে হেসে ওঠে। 'ছিলু মাঠত, শুইয়া, এ্যালায় থাকেন পাথরের ওপর বসিয়া।' বাঘারু যেন জানে, ঐ মূর্তিটা সে ওখানে চিরকালের জন্যই গড়ল।

একষট্টি

পাথর বা ধাতু বা....

এই যে এতক্ষণ বাঘারু গাছের দিকে পেছন ফিরে, নিচু হয়ে পাথর খুঁজে ফিরছে তাতেই তার মনে হতে শুরু করে দেয়, সে মিছিমিছি পাথর খুঁজে যাচ্ছে। তরিকা গাছের ডাল আর কত মোটা হতে পারে—সেটা মুচড়ে ছেঁড়া যাবে না, বা টেনে তুলে ফেলা যাবে না ?

সে এই তলা থেকেই চা-বাগানের বেড়াটার দিকে তাকায়। এখান থেকে যেন আরো ভাল দেখা যাচ্ছে, বুনো ঝাড় নয়, যত্ন করে লাগানো লাইন বাঁধা ঝোপ। আর-কেউ কোনোদিন এই ঝোপগুলো থেকে পাতা কাটেনি বোধহয়। গাছেব পাতাগুলো টিনের চালের মত ছাউনি তৈরি করেছে, 'বেড়াছাড়া ছাউনি, বারান্দার নাখান।' এখান থেকে পাতাগুলোকেই প্রধানত দেখা যায় বলে, মনে হচ্ছে, ঐ পাতাগুলোর নীচে ঘর-সংসার পাতা যায়। দুটো পাতা দু-দিকে দুই ছোট বাঁশের মধ্যে বেঁধে দিলে ছোট বাচ্চাকাচ্চার ঘর হয়ে যাবে। 'ওদ নাগিবে না, বৃষ্টির ছাঁট নাগিবার পারে।' দুটো লম্বা আর দুটো আড়াআড়ি দিলে একখান বেটিছোয়া ঢাকি যাবে।' আর তার সঙ্গে আরো দুটোপাতা লম্বা করলে বাঘারুর কোমর পর্যন্ত পুরো ঢাকবে। তা হলে কি বাঘারুকে এখন তরিকা গাছের ছ-ছটা পাতা কাটতে হবে ? একটা নয়, দুটো নয়, ছ-ছটা ?

পাতার সাইজ দেখে, হিশেব করে বাঘারুকে নিশ্চিত হতে হয়, এই পাতাগুলো কাটার জন্য তার দা বা ছোট কুড়োল দরকার, মুচড়ে নেয়া অসম্ভব। পাথর তেমন একটা পেলে হয়ত চেষ্টা করা যায় কিন্তু তাতে কতক্ষণে কটা কাটা যাবে তার আন্দাজ এখন চলে না। অর্থাৎ মুচড়ে নেয়া ত সম্ভবই নয়। পাথর হল সর্বশেষ অস্ত্র। সুতরাং বাঘারুকে পেছন ফিরে ঐ মাঠের ভেতর একটু এগিয়ে পাথর খুঁজতে হয়।

বাঘারু একটু উদাসীনই এগিয়ে চলে। পাথরটা যে সে পেল না, এই ঘটনাটা যেন কোনো জায়গাতেই শেষ হয় না। সে খুঁজতে-খুঁজতে এ-রকম পা ফেলে চলবে। তার চলার সঙ্গে এই খোঁজট মিশে যাবে। তার পর সেই চলার নিয়মেই, কোনো এক সময়, খোঁজাটা শেষ হয়ে যাবে। তখন চলবে কিন্তু আর খুঁজবে না। তার আগেই সে খোঁজার নিয়মে পেয়ে যেতে পারে কিন্তু আর ফিরবে না। সেখান থেকে ফিরে আর কাটা চলে না।

বাঘারু লোহার পাতের একটা বান্ডিল, ছোট, দেখতে পায়। চায়ের বাক্স বাঁধা হয় এই পাতগুলো দিয়ে মুড়ে। সে দৌড়ে গিয়ে তোলে। তার হাতে উঠে আসতেই কিছুটা ঝরে পড়ে যায়। মরচেতে ঝুরঝুরে হযে গেছে। তবু বাঘারু দাঁড়িযে-দাঁড়িয়ে বান্ডিলটা খুলতে থাকে ানিকটা অংশও যদি ব্যবহার্য থাকে।

ছোট পাতের বান্ডিলের একটা মাথা আগে খসে গেছে। কয়েকটা গিঁঠে গোল-পাকানো আর-একটা মাথা ভেতবে। বাঘারু প্রথমে গিঁঠগুলো খুলে সোজা করে, তা থেকে একটা টুকরো, সে যত ছোট· টুকরোই হোক—লোহা ত, বের করতে চায়। কিন্তু গিঁঠের দু-দিকের পাত ধরে টান দিতেই ঝুরঝুরিয়ে খসে যায়। তখন বাঘারু গিঁঠ না খুলে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখে যে ভেতর দিকের কোনো-একটা অংশ একটু আস্ত আছে কিনা। নেই। তখন তাব এক হাতের মুঠোব ভেতর লোহার সেই পাতটা গুঁড়ো-গুঁড়ো ধুলো করে ফেলে দেয়।

কিন্তু মরচে ধরা লোহার পাতই যদি এমন জুটে যায়, এখানে, তা হলে ত মরচে না ধরা খানিকটা তারও অন্তত বাঘারু পেযে যেতে পাবে। বা, আর-একটা ভাল পাতই, বা পাতের টুকোরই। বাগানের সীমার জমিতে বাগানের ময়লাটয়লা ফেলে হয়ত কখনো-কখনো। তাতে একটা ছোট, আস্ত, লোহার পাত কি আর মরচে না পড়ে, এখন পর্যন্ত, বাঘারুর জন্যে থেকে যেতে পারে না ? বা অন্তত তার ? দড়ির মত এক টুকরো তার ?

তারের কথাটা মনে হতে, পাতের চাইতে তারটাই তার কাছে বেশি কাজের লাগে। শক্ত, নতুন তার যদি হয়, গাছের গোড়ায় গোল করে লাগিয়ে দু প্রান্ত ধরে বাঘারু যদি টানে, গাছের নরম কাণ্ডের ভেতর তারটা বসে যাবে আর গাছটা কেটে আসবে। যদি কাণ্ডটা বেশি মোটা হয়, তা হলে একটা-একটা করে পাতা কেটে নিতে পারবে।

পাথর শেষ হয়ে এখন ঘাস ঝোপঝাড় চলছে। বাঘারু লোহার পাত, আর তারের সঙ্গে-সঙ্গে কাচের টুকরোও খোঁজে! বাগানের মানুষরা কাচ ব্যবহার করে। তা হলে এখানে ভাঙা কাচের টুকরোও পাওয়া যেতে পারে। বোতলভাঙা কাচের কোনাটা সব সময়ই ধারালো হয়। বোতলের কাচ ত লম্বালম্বিই ভাঙে। একটা দিক ধরে, আর-একটা দিক দিয়ে কাটা যায়। যদি গোল করেও ভাঙে তা হলেও ঘষে-ঘষে কাটা চলে। সুতরাং বাঘারু কাচও খোঁজে।

লোহার পাত, বা তার, বা কাচ—কোনো কিছুতেই বাঘারুর কোনো অসুবিধে নেই যেন। টানতে, বা ঘষে-ঘষে কাটতে, সেই তার বা কাচ তার হাতের তালুতেও কেটে বসে যেতে পারে না যেন!

পাথর শেষ হয়ে যায়।

বাঘারু ক্রমেই মাঠের মাঝ-বরাবর চলে আসে। মাঝেমধ্যে ঝোপঝাড়। কিন্তু কোথাওই এমন-কিছু নেই যা মানুষ ব্যবহার করে ফেলে দিয়েছে, এবং এখন বাঘারু ব্যবহার করতে পারে। বা, একটা পাথর, যা বাঘারুই প্রথম ব্যবহার করবে।

বাষট্টি

বাঘারুর অস্ত্রলাভ

কিন্তু বাঘারু তার পাথরটা পেয়ে যায়, তারই জন্যে তৈরি পাথরটা। নাকি পাথরটাই বাঘারুকে পায়।

এই পাথরটা পাবে বলেই পাথর দিয়ে বাঁধানো ঢালে কোনো পাথর মিলল না! ঢালের শেষেও মাঠের ভেতর পাত, বা তার, বা কাচ মিলল না! বাঘারু তখন পায়ে-পায়ে চলে আসছে। চলে আসছে আর মনে-মনে ছকতে শুরু করেছে মাঠটা কোনাকুনি যাবে, যেখানে পাবে ডেমকাঝোরা সেখানেই পার হবে, তার পর, ওপারে উঠে নিজের রাস্তা ধরবে। এ-রকম ছকে নিতে তাকে দু-একবার ঘাড় তুলে মাঠের শেষটা দেখতে হয়েছে। বোধহয়, পাথরখোঁজা, আর পথখোঁজা, মাঠদেখা আর মাঠ শেষদেখা—এই সবের ভেতর সে ধীরে-ধীরে একটু ভাগ হয়ে যাচ্ছিল বলেই তার বাঁ-পায়ের বাঁ-দিকটা হঠাৎ খাড়া ধারালো কিছুর ওপর পড়ে! মনে হল, তার পায়ের মাংসের ভেতর ধারটা একেবারে বসে গেল। তাও আবার বাঘারুর পা, যার চাপে পাথর গুঁড়ো হয়ে যায়। যদিও বাঘারুর মনে হয়, তার পায়ের মাংসের ভেতর শান-দেয়া কোনো লোহার ধার বসে গেল, তবু, ব্যথায় বসে পড়েও, সে প্রথমে পা দেখে না, কিসে কাটল, সেটা খোঁজে।

কুড়োলের আগার মত ছড়ানো একটা পাথরের ধারালো দিক মাটির ভেতর থেকে উঁচিয়ে আছে। ঠিক ওপরে তার পা পড়েছে। বাঘারু পা দেখে, কাটে নি। কিন্তু ব্যথা তখনো আছে। পা ছেড়ে দিয়ে বাঘারু দুই হাতে পাথরটাকে নাড়ায়, ঢিলে করে নিয়ে মাটির ভেতর থেকে টেনে তুলে ফেলবে বলে। পাথরটা বেশি গাড়া ছিল না। বাঘারু যে-জোরে নাড়া দেয়, তাতেই উপড়ে যায়, আর বাঘারু হুমড়ি খেয়ে পড়ে সামনে। সামলে, দুই হাতে পাথরটাকে নিয়ে দেখে বাঘারু। তারপর, উঠে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পাথরটাকে আরো ভাল করে দেখে সে, যে-দিকটা মাটির ভেতর ছিল, সেই মোটা অংশটা ভেজা ও মাটি লাগা। ওপরের দিকটা চকচকে ধারালো, পাথরের পক্ষে যতটা ধারালো হওয়া সম্ভব—মানুষের হাতের ঘষা ছাড়াই। মানুষের হাতের ঘষা পড়লে এ-পাথরে লোহার শান আসে।

বাঘারু পাথরের আকারটাকে বুঝতে চায়। 'হাত-দাওয়ের নাখান? গর্তখান নাই ত? কাটিবার গর্তখান?' বরং সে দিকটা ভরা। কিন্তু আকারটা যেন তার চেনা-চেনাও ঠেকে। তলার দিকটা সরু। এক মুঠোতেই ধরা যায়। ডান হাতের মুঠোতে পাথরটা ঝুলিয়ে হাতটা দোলায়। পাথরটা দোলে। দোলাতে-দোলাতে হাতটাতে গতি আনে। তার পর, পাথরসহ হাতটাকে বেগে মাথার ওপর তোলে। যেন, কোনো কিছুর ওপর নামাচ্ছে এমন ভাবে পাথরটা যখন বাতাস কেটে খাড়া নামায়, তখন বাঘারুর মনে ঝিলিক দেয়, 'পাহাড়ি মানষিলার খুরকির নাখান?'

বাঘারুর নামানোর বেগে হাতটা পাথরসহ আবার দোল খায়। দুলুনি থেমে এলে দুই হাতে পাথরটাকে ধরে। তার পর আবার পাথরটাকে দেখে, এই পাথরটা হলেই চলে যাবে বাঘারুর, পাতা না-হলেও। কত ভাবেই না পাথরটাকে ব্যবহার করবে সে, ভেবে, দুই হাতে পাথরটাকে মাথার ওপর টান-টান তোলে। তুলে দেখবার জন্যে নিজেই ঘাড় ভেঙে তাকায়।

ঘাড়টা এতই হেলানো বাঘারুর, আকাশের টলটলে নীলটাই শুধু দেখতে পায়, ওপর থেকে তাকে ঢাকা দিয়ে ফেলেছে যেন। দুই হাতে ধরা পাথরটা সেই নীলে উৎক্ষিপ্ত। বাঘারু দেখে, ঐ পাথরের মাথা থেকে, বাঘারুর মুষ্টি, কব্জি, পুরোবাহু ও বাহু পর্যন্ত একটাই পাথর যেন। দেখাটা এমন ঘটে যায় বলেই ঐ নীলে ক্ষোদিত পাথরেব আকারটাকে চিনে নিতে পারে বাঘারু—তার বাহু, পুরোবাহু, কব্জি আর দুটো হাত নমস্কারের মত জোড়া করা একটা পাথর যেন! 'পরনামিয়া পাথ্থর।'

বাঘারু পাথরসহ হাত দুটি নামিয়ে আনে। তার পর, এক হাতের মুঠোতে যেন এক জোড়া হাত ধরে নাড়তে-নাড়তে তরিকা গাছের ঝাড়ের দিকে ছোটে।

ঢাল বেয়ে ওপবে উঠতে বাঘারুব একটু অসুবিধা হয়। সে যেমন তার শরীরের ভারে নেমে আসতে পারে, সহজে, তেমনি, সেই ভাবের জন্যেই, নুড়ি আব কুচি পাথরে ভরা ঢাল বেয়ে উঠতে পারে না, পাথবগুলো গড়িয়ে যায়। ঢালের মাথায় পৌঁছে একটা কিছু ধরার দরকার হয়। না হলে, তরিকা গাছের গোড়ায় একটা পা তুলতে আব-একটা পায়ে যে ভর দেবে, তাতেই হড়কে পড়ে যাবে। বাঘারু ঢালের মাথায় পাথবটা রাখে। তার পর মাটির একটা খাঁজ ধরে, হেঁচড়ে ওপরে উঠে পাথবটা নিয়ে দাঁড়ায়।

বাঘারু পাতা বাছতে শুরু করে। পাতা বড় হলেই হবে না, সোজা হওয়া চাই। তরিকা পাতার মজাই এই, টিনেব মত খাঁজ কাটা। একটা পাতাব খাঁজের ওপর আর-একটা পাতা বসে যেতে পারে। বৃষ্টির জল ঐ খাঁজ দিযে গড়িয়ে যায। পাতা যদি বাঁকাচোবা হয়, খাঁজে-খাঁজে না মেলে, জল ভেতরে গড়িয়ে পড়ে। পাতা খুব বেশি বড় হলে, পাশের দিকটা ছড়িয়ে যায়—কলাপাতার মত। আব নিজের ভাবে-ভাবে বেঁকে চুরে যায়। বাঘারু তাই এমন একটা পাতা খোঁজে যেটা বড় কিন্তু বুড়ো নয়, কলাপাতাব মত দু পাশে ছড়িয়েছে কিন্তু বেঁকে যায নি। এমন একটা পাতা, যার মাঝখানেব খাঁজটা গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত, নিটোল।

তবিকা গাছের এমন সারিতে, এমন তরতবিযে বেড়ে ওঠা পাতার বাশির মধ্যে বাঘারু তার পাতাটি বা পাতাগুলো খুঁজে পায় না, খানিকটা যেন দিশেহাবা হযেই, আব খানিকটা যেন ইচ্ছে করেই, এমন বাছাইযেব স্বাধীনতা তার আছে বলেই।

দিশেহারা ভাবেই হোক আব স্বাধীন ভাবেই হোক, বাঘারুব এমন বাছাবাছিব ভেতর আবার একটা সভয় তাড়াও ছিল।

এই বেড়ার ওপাশেই চা-বাগান। মাঠেব মত লম্বা-লম্বা রাস্তা, বাস্তায়-রাস্তায মোড, মাঠেব মত সমান শিবীষ গাছের মাথা। সেখানে পাতি তোলে, নালী কাটে, ডাল ফাডে। শেয়ালও যাতে ঢুকতে না পাবে, সেইজন্যে এই তবিকা গাছেব সাবিব তলাব মাটিচাপা দেযা আছে! হাতির পাল যাতে ভাঙতে না পারে, সেইজন্যেই তবিকা গাছের কাঁটা পাতাব সারি। পাতা যাতে বড হয, বেড়ে ছড়িয়ে পড়ে, সেইজন্যে এই গাছগুলোব ত দেখাশোনাও হয নিশ্চয। যে-পাতা এতগুলো কাজেব জন্যে রাখা, সেই পাতা বাঘারু কেটে নিচ্ছে! বাঘারুকে যদি ধবতে পাবে।

ধবতে পাবলে কী হবে, সে-বিষয়ে তাব কোনো নিশ্চিত ধারণা নেই। ভযও নেই। কিন্তু ধরতে এলে মানুষ পালায, সেই নিযমে বাঘারু ঘাড ফিরিযে দেখে নিতে চায় মাঠটার ভেতব চা-বাগানের সীমাটা কদ্দূর। যেন তার ওপবই তাকে ধবা বা না-ধরা নির্ভব কবে।

আর দেরি করে না। প্রথম পাতাটা খুঁজতেই সে এত দেবি কবছে, অথচ তাকে ত, একটা নয, ছয-ছযটা পাতা বেব কবতে হবে।

একটা পাতা বাঘারু পেযে যায। সেটা যেন কাটা পডাব জন্যেই খাড়া দাঁড়িযেছিল। কচি, কিন্তু বড়, মাঝখানেব খাঁজটা নিটোল গভীর! কিন্তু পাতাব গোডাটা গাছের ওদিকে। এদিক থেকে কাটতে গেলে হাতটা বাড়িয়ে ওদিকে দিয়ে তবে কাটতে হবে। সেটা দা-মত কিছু দিযে করা যেতে পারে। কিন্তু পাথবটাকে ত ওপর থেকে নামাতে হবে। বাঘারু ছেড়ে দেয।

বেড়াব এদিকে একটা পাতা পেয়ে যায। গোডাব দিকটা একটু ছেঁতলানো। কিন্তু বাঘারু ঠিক করে

এটাকেই কাটবে। তারপর খুঁজতে হলে, আরো পাঁচটা খুঁজবে। পাতাটা ডালের সবচেয়ে নীচে, এদিকে ছড়িয়ে পড়েছে—বাঘারুর দিকে যেন গলা বাড়িয়ে দিয়ে আছে। ডালের যে-জায়গাটা থেকে পাতাটা বেরিয়েছে সেখানে কোপটাও দেয়া যায় বাধাহীন।

পাথরটাকে একবার যাচাই করে নেয়—লোহার অস্ত্রের ধার পরীক্ষার মত। তার পর সরু দিকটা দুই হাতের মুঠোতে চেপে মাথার ওপর তোলে। দমটা টেনে পুরো ধার আর ভারটা নামিয়ে আনে পাতাটার ওপর—নিজের শরীরের ভার যোগ করে। পাতাটা ভেঙে নেতিয়ে যায়। বাঘারু দেখে, গাছেব কাঁটার ধারও কমে গেছে অনেকখানি। পাথরের গা থেকে রস, গাছের কাঁচা চামড়া মুছে নিয়ে বাঘারু আর এক কোপ তোলে।

তেষট্টি

কুকুরের তাড়া

এখন বাঘারুর মাথায় তরিকা পাতাগুলো, একটার পর একটা,লম্বালম্বি। খাঁজে-খাঁজে মিলে আছে। তার পরে, ঠিক বাঘারুর মাথার ওপবে পাথর। পাথরটা একটু এদিক-ওদিক হলে পাথরের ভারে যাতে পাতাগুলো ভেঙে না যায়। এতক্ষণ এক হাতেই পাতাগুলো ধরে হাঁটছিল। এখন, দুই হাতে ধরে ডেমকাঝোরায় নামছে।

ডেমকাঝোরা ছোট খালের মত নদী, কিন্তু পাড় বেশ উঁচু। মাথায় পাতা আর পাথর নিয়ে বাঘারুকে পা টিপে-টিপে নামতে হয়। জলে নামার আগে মাটিতে বসে পড়ে। ডান পা দিয়ে জলে নামার জায়গা পরখ করে, ঘুরে দাঁড়িয়ে বাঁ হাতে পাড় আব ডান হাতে পাতা ধরে বাঁ পাটা ধীরে-ধীরে নামিয়ে, ঘুরে যায়। জলে একবার নেমে পডার পর দু হাতে পাতাগুলো ধরে বাঘারু ধীরে ধীরে এগয়।

যদি একটা গামছা বা ত্যানা থাকত, বা রাস্তায় যদি কিছু পোয়াল পেয়ে যেত, তা হলে একটা বিড়ে পাকিয়ে, মাথার ওপর পাতা আর তার ওপর পাথর দিয়ে, দু হাত ছেড়েই হাঁটতে পারত। এক হাতে পাতা, আর-এক হাতে পাথর ঝুলিয়ে হাঁটা যায় না—দুই হাতই আটকে যায়। পথে যদি কোনো ভামনি বন পায়, তা হলে একটা বিড়ে পাকিয়ে নেবে।

জলটা যদি আচমকা কোথাও বেশি হয়ে যায়, তা হলেই বিপদ। সে জন্যেই বাঘারু দুই হাতে পাতাগুলো শক্ত করে ধরে রাখে, যাতে তেমন হলে পাতাগুলো নামিয়ে সামনে ভাসিয়ে, পাথরটাকে এক হাতে নিয়ে সে একটু সাঁতরে যেতে পারে।

এইবার জলটা কোমর পর্যন্ত ওঠে। বাঘারু এক-পা, এক-পা করে এগয়। আচমকা পাথরটা যদি জলে পড়ে যায় তা হলে ডুবে-ডুবে তুলতে হবে। পাড় সামনে এসে গেছে। এর মধ্যে জলটা আর আচমকা বাড়বে না। তবে জলকে বিশ্বাস নেই। হয়ত পাড়ের কাছেই একটা গভীর গর্ত হয়ে আছে। সামনের পাড এসে গেল।

বাঘারু আগে পাতা আর পাথর নামিয়ে রাখে, তার পর নিজে ওঠে। সে উঠে দাঁড়াতেই তার গায়ের জলে জায়গাটা কাদা হয়ে যায়। বাঘারু দু হাতে শরীরের জল কাচে। এদিক-ওদিক তাকায়। সে আরো একবার তার গায়ের জল কেচে ফেলে। তার পর পাতা আর পাথর মাথায় তুলে, দু হাতে একটু ঠিক করে নিয়ে, আবার হাঁটতে শুরু করে।

হাটের লোকজনের যাতায়াতে ডেমকাঝোরা থেকে হায়হায়পাথার যাওয়ার একটা ছোট কাঁচা রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে। সেই রাস্তায়, সামনে একটা বড় টাড়িও দেখা যায়। তা হলে কি বাঘারু সেখান থেকে একটু দড়ি চেয়ে নেবে, পাটের? না হয় ত, কিছু পোয়াল? পাতা আর পাথর বেঁধে নেবে, বিড়ে পাকাবে।

যে-কাঁচা রাস্তা দিয়ে বাঘারু ঐ টাড়িতে ঢুকছিল, তার ওপর একটা কুকুর শুয়ে ছিল। সামনেই একটা টিনের চালের বড় বাড়ি। ঐ বাড়িতেই ঢুকবে বাঘারু।

বাঘারুর পায়ের আওয়াজ শুনে কুকুরটা শুয়ে থেকেই, চোখ না খুলেই, একবার ডেকে দিল, 'ঘেউ'। তার আওয়াজে বাঘারুর পায়ের আওয়াজ থামে না দেখে, সে আবার ডাকে, 'ঘেউ'। বাঘারু তার পাশ দিয়ে হনহনিয়ে চলে যায়। বাঘারুর মাটি-কাঁপানো চলনে কুকুরটা চমকে ঘাড় ঘোরায়। তার পরই ঘেউ-ঘেউ আওয়াজে আকাশ ফাটিয়ে বাঘারুকে তাড়া করে। কুকুরটা বাঘারুর পাশ দিয়ে ছুটে সামনে গিয়ে দাঁড়ায় আর তাব পথ আটকে আকাশ-ফাটানো চিৎকার জুড়ে দেয়। বাঘারু তার গতি একটুও না কমিয়ে হনহন করে এগিয়ে যাওয়ায়, কুকুরটা দৌড়ে সরে যায়, আবাব ফিরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে। সামনে ডান হাতে সেই বড় বাড়ি, বাঘারু ঢুকবে। কিন্তু প্রথম কুকুরটার ডাকাডাকিতেই হোক, আর বাঘারুর চলার গতিতেই হোক, ঐ বাড়িটা থেকেই দশ-বারটা কুকুর একসঙ্গে বেরিয়ে এসে বাঘারুকে ঘিরে ধরে এমন চেঁচানো শুরু করে, যেন অন্ধকার রাত্রিতে পাড়ায় ডাকাত পড়েছে। কুকুরগুলো বাঘারুকে এমনই ঘিরে ফেলে কিছুতেই এগতে দেবে না। এখন যদি বাঘারুকে ঐ বাড়ির বাহির এগিনায় ঢুকতে হয় তা হলে কুকুরগুলোকে ঠেলে এগতে হবে। বাঘারু আব ঐ হাঙ্গামায় না গিয়ে সোজা হাঁটতে থাকে, একই গতিতে। বাঘারু চলার গতি একটুও কমায় না দেখে কুকুরগুলো সামনের পথটা ছেড়ে দিয়ে তাকে তিনদিক থেকে ঘিরে চেঁচাতে থাকে। টাড়িটাব শেষে বাঁশঝাড়। ডাইনে রেখে রাস্তাটা বাঁয়ে বেঁকেছে। তার বাঁয়ে টাড়ির বুড়িঘর পাটকাঠি দিয়ে তৈরি। কুকুবগুলো ঐখানে দাঁড়িয়ে পড়ে আর বাঘারু বাঁক নেয়। একটা কুকুর তবু ডেকে-ডেকে ওঠে। বাঘারু বাঁশঝাড়কে ডাইনে রেখে ডাইনে বাঁক নিয়ে আড়াল হয়ে গেলে, একটু পরে শুনতে পায় কুকুবগুলো আবাব একসঙ্গে অলস ডেকে উঠে, ধীরে-ধীবে একে-একে থামতে শুরু করে। মাঝেমধ্যে একটা কুকুরেব ঘেউ-ঘেউ ডাক ওঠে। তাব পব সেটাও থেমে যায়।

বাঘারু দাঁড়িয়ে দু হাতে মাথাব পাতাটা একটু সরিয়ে দেখে, বাঁয়ে তাব পেছনে হায়হায়পাথার চা-বাগানের সীমা। একটু বুঝে নিতে, আবো একটু দেখতে হয় বাঘারুকে। ডেমকাঝোড়া নদী নিশ্চয়ই ঐখানে একটা বাঁক নিয়েছে। নদীটাকে বাঁয়ে বাখতে এই বাস্তাটা ডাইনে ঘুবে, আবাব বাঁয়ে ফিরে, চা-বাগানের দিকে গেছে। বাঘারু আব-কিছুতেই চা-বাগানে ঢুকবে না। সে বাস্তা ছেড়ে মাঠে নেমে পড়ে। সোজা গিয়ে হাযহাযপাথারেব ডাঙা পাব হয়ে উত্তরে হাঁটলে শালবাড়িতে উঠবে। শালবাড়িতে না-ও উঠতে পারে, দক্ষিণ দিয়ে ফরেস্টে ঢুকে ফবেস্টেব ভেতব দিয়ে-দিয়েই হাইওযেতে উঠবে। তার পর হাইওয়ে ধবেই চালসা হয়ে নতুন বোড ধবত পাবে। আবাব, ফবেস্টেব ভেতব দিয়েও যেতে পাবে। সে, তখনকাব কথা তখন। এখন, সামনে মাল নদী। পাতা আব পাথবটা তার আগে বেঁধে ফেলতে হবে।

বাঘারু উঁচুতে উঠছে। হাযহায়পাথাবেব সেই নিধুয়া ডাঙা যেন বিশাল একটা খেপা শুযোব—লেজটা মাটিতে লাগিয়ে মাথাটা সিধে নিয়ে উত্তবেব পাহাড়ের দিকে ছুটে যাচ্ছে। ঘাস নাই, গাছ নাই, চাষ নাই, বাড়ি নাই। শুযোবেব বাঁ পেট বেয়ে বাঘারু উঠছিল, পেছনেব বাঁ পাযেব পাশ দিয়ে।

বাঘারুব চোখ এখন পায়ের দিকে লাল-লাল পাথবে ছাওযা চড়াই। এই বকম পাথব এদিকে দেখা যায় না। এ-পাথর পাহাড় থেকে নদী বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে গোল হযে নামে নি। মনে হয যেন খুব একটা ভাঙাভাঙি হয়েছিল এখানে। সব পাথবই চোখা। বাঘারু ভাবে, এখানে ধাবালো পাথব বোধ হয় খুঁজতে হয় না, হাত দিলেই মেলে। পাথর কথাটা মনে হতেই তাড়াতাড়ি তাব নিজেব পাথরটা মনে আসে। 'যেইলা একখান পবনামিয়া পাথথর মোর জুটি গেইছে, ঐলা পাথর কোটত মিলিবে ?'

শুয়োবের ভাঙাব পিঠটা ডান দিকেব ঢাল বেয়ে নদীব দিকে নামাব সময় বাঘারু পা দিয়ে-দিয়ে দু-একটা পাথর গড়িয়ে দিতে চায়, দেখে মজা পেতে। কিন্তু প্রায় কোনো পাথবই নাড়াতে পারে না, দুটো একটা আলগা পাথর ছাড়া। 'এইলা সব কি পাথরেব গাছ ? সব মাটির ভিতরঠে মাথা তুলিছে…!' উঁচু থেকে নামছে বলেই বাঘারু এখন অনেকটা দৃশ্য দেখতে পায—এই পাথরের শেষ, সবুজের শুরু, জলের রেখা, চা-বাগানের সীমা, টাড়িবাড়ির গাছগাছড়া। আবমাল নদীর ওপারে ফরেস্টের ছাইরঙা দেয়াল, দূব থেকে সব ফরেস্টকেই যেমন লাগে, মনে হয় ঢোকা যাবে না। মাল নদীর ওপারে এই যে-ফরেস্ট শুরু হল, এব আব শেষ নেই। মাঝে হাইওযে আছে, চা-বাগান আছে, রেল লাইন আছে, নদী আছে, নদীব চরও আছে—কিন্তু সে সবই ফরেস্টের মধ্যে। এই ফরেস্টের ভেতবেই একটি

জায়গায় গিয়ে বাঘারুকে পৌঁছতে হবে। ডায়না ফরেস্টে।

নামতে-নামতে আবার দৃশ্য কমতে শুরু করে। কিন্তু বাঘারুকে একটা কিছু খুঁজতে হবে, এই পাতা আর পাথর বাঁধতে। তাকে একটু দেখতে হবে, কোথাও দড়ির মত কিছু পাওয়া যায় কিনা।

বাঘারু দাঁড়িয়ে মাথা থেকে পাথরটা ডান হাতে নামায়। বাঁ হাতে পাতা আর ডান হাতে পাথর ঝুলিয়ে সে নামতে শুরু করে।

চৌষট্টি

কুকুরের সাড়া

নদীর একটু ওপরে, ঢালের গায়েই বাঘারু মাটির ওপর পাতাগুলো রেখে পাথর চাপা দেয়। তার পর খালি হাতে নামে। ঘাড় ঘুরিয়ে একটু দেখে নেয় পাতা-পাথর ঠিক থাকবে কি না। দড়িদড়া বা পোয়ালা বা লতাগোছের কিছু পায় কি না দেখতে বাঘারু এদিক-ওদিক ঘুরবে। এগুলো বেঁধে না-নিলে মাল নদী পেরনো যাবে না।

নীচে নেমে ফিরে তাকিয়ে বাঘারু দেখে, শুয়োরের ডাঙার এই ঢালের ওপরের দিকে একটা কুকুর দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ছে। ডাঙার মাথার দিকে কুকুরের লেজ, ডাঙার লেজের দিকে কুকুরের মাথা। মুখটা এখন এদিকে ঘোরাচ্ছে-ফেরাচ্ছে—ফরেস্টের দিকে ওপারে, বাঘারুর দিকে এপারে, এমন-কি, এই দুইয়ের মাঝখানে নদীর টুকরোটার দিকেও।

বাঘারু তাকে দেখল এটা সে বুঝেছে—জানাতে কুকুরটা ঘাড়ের সঙ্গে সামনের পা দুটোও এদিকে সামান্য একটু ঘোরায়, নদীর দিকে চোখ রেখেই। লেজটাও একটু নাড়ায়। ভাবটা, তারও ওপারেই যাওয়ার কথা।

কিন্তু এই ডাঙার ওপর কুকুর আসবে কোত্থেকে? পথ হারিয়ে ফেলেছে? 'কুত্তায় আস্তা (রাস্তা) হারায় না।' বাগানের দিক থেকে এসেছে? 'আসিবা পাবে, কিন্তু কেনে?' তা হলে কি বাঘারুরই পেছন-পেছন কোথাও থেকে চলে আসছে? 'কোনঠে?' বাঘারু ত টের পায় নি। মাথায় পাতা থাকায় বাঘারু অবশ্য পায়ের সামনেটুকু ছাড়া কিছু অনেকক্ষণ ধরে দেখতেই পাচ্ছিল না। কিন্তু কুকুরটা কি একবারও তার সামনে আসে নি। আওয়াজও ত পায় নি। 'ভোখিবার ধরে নাই, একবারও?' না-ও ডাকতে পারে। পেছন-পেছন এসেছে, ডাকতে যাবে কেন। বাঘারু কি একবারও পেছন ফিরে তাকায় নি? 'পাছত চাও নাই?' শেষ কখন পেছনে তাকিয়েছে বাঘারু?

এতটা দূর একা হেঁটে এসে, এমন ডাঙায় ফরেস্টে ঢোকার আগে শেষ নদীটায় ও ওপারে ফরেস্টের গভীর নির্জনতার সামনে বাঘারুর যেন বড় দরকার হয়ে পড়ে, কুকুরটা যে তারই পেছু-পেছু এসেছে, নিজের কাছে সেটা প্রমাণ করার। 'কুত্তা আর গাই, যা কওয়াবেন তাই।'

ডেমকাঝোরা পার হয়ে, পাড়ে পাতা আর পাথর রেখে, বাঘারু চার পাশে তাকিয়েছে। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে। তার পর, আবার মাথায় নিয়ে রওনা দিয়েছে। 'হাটি আসিছে। হাটি আসিছে।' আর ত পেছন ফিরে তাকায় নি। 'আর ত পাছত না তাকাই।' সেই টাড়িটায় একটা বিরাট কুকুরের দল বাঘারুকে ঘিরে ধরল।

এই পর্যন্ত ভাবতেই বাঘারু যেন থই পেয়ে যায়। তখনই এই কুকুরটা তার পেছনে ছিল? সেই জন্যেই টাড়ি-বাড়ির কুকুরের পাল এত খেপে গিয়েছিল?— 'না-হয় তা বাঘারুক দেখি এ্যানং ভোকিবার ধরিবে কেনে? বাঘারু সাহেব না-হয়, বাঘারুর মাথাত্ টুপি নেই, বাঘারুর ভটভটিয়া নাই, বাঘারু ত নিজের এই দুইখান পায়ের উপর খাড়া একখান মানষি। কুত্তালা ত চিনিবার পাবে। ত স্যানং ভোকিবার ধরিল্ কেনে?

নিশ্চয়ই এই কুত্তাটাও তখন পেছনে ছিল আর টাড়ির দল এই দলছুট কুত্তাকে তাড়া করেছিল। —'এইখান ত একবারও ভোকে নাই? তাড়িখোয়া কুত্তার ভোকাভুকি নাই। এইখান ত একবারও সমুখত আসে নাই? সমুখত কায় আসিবে? দুই ঠ্যাঙের ভিতর ন্যাজখান ঢুকাই মোর দুই ঠ্যাঙের

ভিতর সিন্ধাইছে ? ত মুই দেখ নাই ? কোন কুত্তা তাড়িছে আর কোন কুত্তা তাড়ি খাছে ? কায় জানে ? দেখিছু কিন্তু বুঝিবার পার নাই।'

নিজের সঙ্গে এই কথাবার্তার শেষে বাঘারু হায়হায়পাথারের এই শুয়োরের ডাঙার তলা থেকে কুকুরটার দিকে তার লম্বা হাত বাড়িয়ে ডাকে, 'সিও সিও।'

মুহূর্তে কুকুরটা সোজা হয়ে যায়, যেন যাচাই করতে চায় ডাকটা সত্য কি না। সোজা হয়ে লেজ-কান-নাড়ানো বন্ধ করে ওপারের ফরেস্টের দিকে ঘাড় তুলে তাকায়। 'মোক ঢক দেখাছে ?' চেহারা দেখাচ্ছে, বাঘারুকে। বাঘারুর অবিশ্যি দেখতে ভালই লাগে—কান খাড়া, ঘাড় সিধা, ঠ্যাং সরু-লম্বা, বুক বড়। 'শালো, ঝাঁপিবার পাড়িবে।' ঝাঁপাতে পারবে। কিন্তু দৌড় ? বাঘারু ত এখনো ওর পিঠ আর পেছন দেখে নি।

বাঘারু আবার তার ডান হাতটা তুলে দেয়, 'সিও, সিও।' এই দ্বিতীয় ডাক শুনে কুকুরটা আর না-নড়ে পারে না। দু পা নেমে দাঁড়িয়ে পড়ে। অন্য দিকে তাকিয়ে লেজ নাড়ায়। যেন, এখন বাঘারুরই এগিয়ে আসার কথা। এই বাঘারু আর এই কুকুরের ত একবারও চোখাচোখি হয় নি, তাদের চামড়ায়-চামড়ায় একবারও ঘষাঘষি হয় নি। এখনো ত তাবা দুজন দুজনেব ভাষা জানে না। অন্তত একবাব জেনে নেয়া দরকাব। মাত্র একবারই। 'কুত্তা আর গাই, যা কওযাছেন তাই।'

বাঘারু কুকুরটার দিকে উঠতে শুরু করে।

কুকুরটা অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। একটা নতুন মানুষ তার দিকে উঠে আসছে আর সে দাঁড়িয়েই আছে এই অনিশ্চয়তা তার পক্ষে অসহ্য বলেই যেন ঘাডটা ফেবানো। কিন্তু বাঘারু মাঝামাঝি পর্যন্ত উঠে এসেছে দেখে সে একবার বাঘারুকে না দেখে পাবে না। ততক্ষণে লেজ-কান ঘাড় নাড়ানো শুরু হয়ে গেছে। খুব দুর্বল ভাবে একবাব দেখে নেয় শুয়োরের ডাঙার পিঠটা—পালিয়ে যাওয়ার পথ। বাঘারু কুকুবটাব কাছে চলে এসেছে। কুকুর তার গলাটা মাটির ও বাঘারুর দিকে লম্বা করে দু-পা পেছিয়ে যায়। বাঘারু আর দু-পদক্ষেপেই তার একেবারে কাছে এসে পড়ে।

এখন বাঘারু কুকুরটাকে ধবে ফেলতে পাবে। কিন্তু ধবে না। এখন কুকুবটা লাফিযে পালিযে যেতেও পাববে না। লেজটা ঠ্যাঙেব মধ্যে দিযে কুকুবটা কুঁই কুঁই শুরু কবে। না-নড়ে, শুধু হাত বাড়িযে ওর গলটা বাঘারু ধবতে গেলে, কুঁই কুঁই কবতে-কবতে একটু সবে যায। বাঘারু আব এগয় না। সে সোজা হযে দাঁড়িয়ে, দুই হাত সামনে বাড়িয়ে ডাকে, 'সিও, সিও।' ডাকে, ফিসফিস করে।

ঘাড় লেজ নিচু রেখেই কোনাকুনি তাকিয়ে কুকুরটা যেন বুঝে নিতে চায়, শেষ বারের মত স্বাধীনভাবে, বাঘারুকে। এখন ত সে সবটাই বাঘারুর হাতেব সীমানায়। কিন্তু বাঘারু আর এগচ্ছে না। কুকুরটা একবার এগিয়ে ধরা দিয়ে ফেললে তার ফেবার আব-কোনো পথ থাকবে না। তার গৃহহীনতার টান কুকুরটা শেষবারের মত বোধ করছে। বাঘারুকে সে যে চেনে না, সেই [illegible]ও তাব এখন চবমে। দুটো একসঙ্গেই ছিঁড়বে। ছেঁড়াব সেই শেষতম মুহূর্তেব টানে কুকুবটা মাটিব সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল।

কিন্তু কুকুরটা জানতই তাকেই একটি পা বাড়িযে দিতে হবে এবার—যত ভযে-ভয়েই হোক। গলাটাও বাড়িয়ে দিতে হবে এবাব—মাটিব সঙ্গে লেপটে হলেও।

কুঁই-কুঁই কবতে-কবতে দুপা আসে। বাঘারু কোমবে হাত দিযে দাঁড়িযে। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িযে কুকুরটা লেজ নাড়ে। বাঘারু তাকে ছোঁয না। কুকুরটা বোঝে, ছোঁযার সময পাব হযে যাচ্ছে। তখন সে অতি ধীরে-ধীরে তাব মুখটা তুলতে থাকে। প্রথমে বাঘারুব দুই পাযের ফাঁক দিযে সেই নদী-ফবেস্টেব চেনা দৃশ্যের দিকে। তার পর, তাব সম্মুখতম অচেনা দৃশ্যেব গাযে। কিন্তু তখনো বাঘারু তাব হাত অথবা পা কুকুরটায় গাযে ছোঁযায না। কোনো পশুব পক্ষে এতটা সময নিজেব ক্ষমতা-প্রযোগসীমার সম্পূর্ণ বাইরে থাকা সম্ভব নয়। লেজ নাড়ানো বন্ধ কবে কুকুরটা বাঘারুব কোমরেব দিকে মুখ তোলে। পেছনের পা দুটো দিযে মাটি আঁচড়ায। কিছু নুড়ি-পাথব ঝুবঝুব ঝরে যায। কুকুবটাব মুখেব দিকে হাসি-হাসি মুখে একটু তাকিয়ে বাঘারু ডান হাতে খুব নবম কবে কুকুবেব মুখটা চেপে ধরে। হাতেব তালু কুকুরটার ঠোঁটেব ওপবে।

সে এই ইঙ্গিতটুকু পাওয়ার অপেক্ষায ছিল, তাব ভেজা ঠোঁট আবো একটু ঢুকিযে দেয বাঘারুর মুঠোব মধ্যে। বাঘারুর হাতের তালুতে কুকুবেব ঠোঁটেব জল লাগে। বাঘারু এই ইঙ্গিতটুকু পাওয়ার অপেক্ষায় ছিল। সে দু হাতেই কুকুরেব দু গালে আদবেব চড় মাবে।

পঁয়ষট্টি

বাঘারুর সঙ্গীলাভ

এতটা সময় যে তাকে ঘাড়-ব্রেজ নামিয়ে মাটির সঙ্গে লেপটে থাকতে হয়েছে, সেটা ভুলে যেতে, মুহূর্তের মধ্যে কুকুরটা বাঘারুর মুঠোর ভেতর থেকে ছিটকে সরে যায় আর পেছনের দুই পায়ের ওপর ভর দিয়ে সামনের পা দুটো বাঘারুর বুকের ওপর তুলে মুখটা বাড়িয়ে দেয় বাঘারুর মুখের দিকে। বাঘারু মাথাটা সরায়। নাকে কুকুরটার গায়ের গন্ধ লাগে। কুকুরটা বাঘারুর গলার কাছাকাছি নাকটা নিয়ে গিয়ে বাঘারুর গায়ের গন্ধ তার ছোট-ছোট শ্বাসে টেনে নিতে থাকে।

কুকুরটা তার বুকে ভর দিয়ে দাঁড়ানোয় বাঘারুর পা হড়কে যেতে শুরু করে। সে কোমরটা আর বাঁ-পাটা একটু এগিয়ে দিয়ে শরীরের ভর ঠিক রাখে।.উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা থেকে এতক্ষণ পর ছাড়া পেয়ে কুকুরটা তার বশ্যতার সম্পূর্ণ শারীরিক তৃপ্তি ছাড়া শান্ত হবে না।

বাঘারু তাড়াতাড়ি কুকুরটার সামনের দুই পায়ের নীচে দুই হাত দিয়ে একটু সামাল দিতে.চায়। তারপর বাঁ হাতটা কুকুরটার ঘাড়ের লোমের ভেতর সম্পূর্ণ ঢুকিয়ে দিয়ে ঘাড়ের চামড়ার কাছে নখগুলো বেঁধায়। 'হয়, হয়, সিও, সিও'—এই শান্ত করার ধ্বনিতেও বাঘারুর শ্বাসের উষ্ণতা লাগে।

বাঁ হাতটা কুকুরের ঘাড়ে ঢোকানোয় বাঘারুর বাঁ বাহু ও ঘাড় ওর মুখের নাগালের ভেতর চলে আসে। কুকুরটা বাঘারুর বাহুটা হাঁ করে কামড়ে ধরে। বাঘারু তার বাহুতে দাঁতের ধার টের পায়। ডান হাতটা দিয়ে একটু ঠেলে রেখে তপ্ত শ্বাসে বাঘারু বলে, 'খাড়ো, খাড়ো কনেক, খাড়ো।' ডান পাটা একটু সরাতে হয় বাঘারুকে। আর তখনই কুকুরটা এমন তীব্রতায় ডান থেকে বাঁয়ে তার ঘাড ঘোশায় যে বাঘারুকে পা হড়কে চিৎপাত পড়ে যেতে হয় মাটিতে। কুকুবটা পাশে পড়ে যায় কিন্তু চাব পায়েব ওপর ঠিক দাঁড়িয়ে পড়ে। আর এইবার যেন ভাল বাগে পেয়েছে এমন ভাবে বাঘারুর ঘাডের খাঁজটাব দিকে হাঁ করে মুখ এগিয়ে দেয়। 'খাড়ো, খাড়ো,' বলে বাঘাক ওকে ঠেকাতে চায়। কিন্তু তবু ও জোব খাটায় দেখে, হেসে ফেলে, বাঘারু দু হাতে ওর ঘাড ধবে, 'শা-লো' বলে ছুঁডে ফেলে দেয।

কুকুরটা বাঘারুর পায়ের দিকে গডিযে যায়। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁডায। ততক্ষণে, বাঘারু উঠে পড়ার জন্য মাথা থেকে পা পর্যন্ত আকাশেব দিকে ধনুকের মত তুলে দিয়েছে। সেই ভঙ্গিকে আহ্বান ভেবে তার দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে কুকুরটা বাঘারুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু ও নিচু থেকে ঝাঁপ দেয বলেই ধপ করে বাঘারুর বুকের ওপর পড়ে যায় আর বাঘাক আবাব চিৎ হযে পডে। এবাব কুকুবটা তার ওপরে।

'শালো, বাব বাব কছি খাডো, তা শুনিবার চাহে না', বাঘাক তার শক্ত দুই হাতে জডিযে ধবে কুকুরটাকে পাশে কাত করতে নেয়। কুকুরটাও তার শরীরের ওজনে বাঘারুকে চেপে রাখতে পারে খানিকটা। বাঘারু তার দুই হাঁটুকে সাঁড়াশির মত করে নিয়ে কুকুরটাকে কাত করে ফেলে। তাব পব সেই ঝোঁকেই ওটাকে আবো শাস্তি দিতে চিৎ করে ফেলে। কুকুরটার পাশে উপুড হযে বাঘারু হাত আব পায়ের জোরে কুকুরটাকে চিৎ করে ঠেসে রাখে। আকাশের দিকে চার ঠ্যাং তুলে আর মুখটা একবাব ডাইনে আর একবার বাঁয়ে ঘোরাতে-ঘোরাতে কুকুরটা কুঁই-কুঁই শুরু করে, ছাড়া পেতে গাযে ঝাঁকি দেয়। 'শালো, বার বার কছি, খাডো, খাড়ো, শুনিবার চাহে না। বড় গরম দেখাছিস্ ? এ্যালায় থাক কেনে এ্যানং চিৎ হয়্যা—'

যেন তার জবাবেই কুকুরটা কুঁই কুঁই করে ওঠে—'অ্যালায় কুঁই কুঁই করিবার ধইচছিস— !' বাঘারু বাঁ হাতের আর বাঁ পায়ের চাপে ওকে চিৎ রেখে, নিজে যেন বিশ্রামের জন্য নিজের ডান কনুইয়েব ভাঁজে, কপাল ঠেকায। কুকুরটা আরো করুণ কুঁই কুঁই শুরু করে আর গা ঝাডা দিয়ে উঠে পডতে চায। 'শালো', বলে বাঘারু হাত আব পায়ের চাপটা শিথিল করতেই কুকুরটা এক ঝটকায সবে যায। বাঘারুর হাত আর পা ওখানেই পডে থাকে। সে আর চোখে খোলে না। মাথা গুঁজে উপুড হযে পডে থাকে।

ছাড়া পেয়ে কুকুরটা প্রথমে কয়েকবার গা ঝাড়া দেয়। একবাব ঘেউ ঘেউ করে ডেকে ওঠে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে, যেন বাঘারু ওখানে নেই। শেষে বাঘারুর দিকে তাকায়। বাঘারু অমন চুপচাপ উপুড় হয়ে শুয়ে থাকায, নডাচড়া না করায় আব তার বাঁ-হাত বাঁ-পা ঐ রকম ছিটকে থাকায় কুকুরটাব

যেন কেমন সন্দেহ হয়। সে নরম গলায় ঘেউ ঘেউ ডেকে ওঠে, বাঘারুকে ডাকতে। তবু বাঘারু নড়ে না দেখে মাটি শুঁকতে-শুঁকতে বাঘারুর হাতের কাছে আসে। হাতটা শোঁকে। বাতাসটা শোঁকে। আর দু পা এগিয়ে এসে বাঘারুর পিঠটা শুঁকতেই থাকে। ওব ঠোঁটের ভেজা ছোঁয়া বাঘারু সারা পিঠময় পেতে থাকে!

তার পর হঠাৎ কী-একটা দেখে কুকুরটা বাঘারুর পিঠ থেকে মুখটা তুলে ফেলে, যেন ভয় পেয়েছে এমন গলায় চাপা গর্-র্-র্ আওয়াজ করে। তার পর আবার বাঘারুর ডান পিঠের ওপরের জায়গাটা শুঁকতে থাকে। শুঁকতে-শুঁকতে গর্-র্-র্ আওয়াজ করে। তার পর ঠোঁটটা ছোঁয়ায়, আওয়াজ বন্ধ হয়। পেছনের পায়ের নখে মাটি আঁচড়ায়। ঘন-ঘন শ্বাস পড়ে কুকুরটার। বাঘারু বোঝে, কুকুরটা তার পিঠে বাঘের থাবার দাগ চিনতে পেরেছে।

বাঘারু টের পায়, এইবাব চাটতে শুরু করল। গরম কর্কশ সেই চাটায় বাঘারুর আরাম লাগে। জিভের টানে পুরনো জখমেব জায়গাটা শিবশির করে ওঠে। আর লালায় ভিজে যায়। চেটে-চেটে পরিষ্কাব করে নিযে কুকুবটা আর-এক জন্তুর পুবো থাবাটার দাগ থাবাহীন মানুষটার শরীরে চিনে নিতে চায।

নির্বাসনের দিকে

কুকুরটাকে দেখার আগে ব'ঘারু যেদিকে যাচ্ছিল, এখন কুকুবটাকে নিয়ে সেই ঝোপঝাড় গাছপালার দিকে যায। কুকুরটা বাঘারুব পায়ে-পায়ে চলছিল না ; নিজেব মত চলছিল। মাঝে-মাঝে নিজের লেজ ধবাব জন্যে নিজের চাবপাশে পাক দিয়েও নিচ্ছিল।

পাতা আব পাথরগুলো বাঁধার কিছু একটা পেলেই হয়—নদীটুকু পেরুতে। ওপারে উঠলেই ত ফবেস্ট। একটা ঝোপেব ওপরে লতানো একটা পাতা দেখে বাঘারু টান দিয়ে দেখতে গেলে, ছিঁড়ে যায। এত কিছুর দবকারই ছিল না, একটু পোয়াল পেলেই হত। সেই একটু পোয়াল পাওযা গেল না। বা, সারা বাস্তায একটা ভামনি বন পডল না।

একটা পাকুড় গাছ থেকে সরু ঝুরি নেমে এসেছে। দেখে বাঘারু দাঁড়ায়। শুকনো। শক্ত হবে। প্যাঁচ লাগে নি। তা হলে হযত ছেঁড়াও যাবে।

ছেঁড়া যায কি না পবীক্ষা কবতে বাঘারু এক হাতে ঝুরিটা ধবে হেঁচকা টান দেয়। টানটা পুরো তার হাতেই লাগে। বাঘারু আবাব তার হাতে প্যাঁচায়। টেনে ছিঁড়তে না-পাবলে ঐ পাথরটা এনে থেঁতলে কেটে নেবে। আব-একটা পাথর এনে, তাব ওপর ধবে।

বাঘারু এবারের টানটা আরো হ্যাঁচকা মারে। তাতে তার মনে হয়, ছেঁড়া যেতেও পারে। এতক্ষণ পর অন্তত এতটা শক্ত একটা লতা যখন পাওযা গেছে—বাঘারু ছাড়ছে না।

বাঘারু এবাব দুই হাতে ঝুরিটা ধরে পেঁচিযে, হাত দুটো মাথার ওপব তোলে। ফলে ঝুরিটা ঢিলে হয়ে যায়। এখন আচমকা একটা হ্যাঁচকা টান মেরে প্রায ঝুলে পড়ে। ওপারে পটপট আওয়াজ ওঠে। বাঘারু বোঝে, একটু নেমেও এল। আব দু-একটা টানেই ছেঁড়া যাবে। বাঘারু ঢিলে দেয়।

আবার দু হাতে পেঁচিযে নিয়ে, হাতটা মাথার ওপব তুলে, আচমকা হ্যাঁচকা টান মেরে, বাঘারু ঝুরিটাতে ঝুলেই পড়ে। তার শরীরেব ভাব দিয়ে বুঝতে পারে ঝুরিটা নেমে আসছে। বড় জোর আর দু-এক টান লাগবে। কিন্তু বাঘারু ঝুরি থেকে নামে না। সে তার শরীরের ওজনটা দিয়ে ঝুলে থাকে। পটপট আওযাজ তুলে ঝুরিটা ডাল থেকে খসতে শুরু কবে। কিন্তু খসে পড়ার আগেই ছিঁড়ে যায়, আর বাঘারু সেই ঝুরিসহ মাটিতে ধপাস করে পড়ে। বাঘারু আগে মাটিতে পড়ে, ঝুরিটা তার ওপর পড়ে। তাকে জড়িয়ে ফেলে।

কুকুরটা এতক্ষণ একটু দূরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে নীরবে লাফিয়ে-লাফিয়ে বাতাস থেকে পোকা তাড়াচ্ছিল। বাঘারুকে পড়ে যেতে দেখে, 'ঘেউ' করে ডেকে উঠে লাফিয়ে সামনে চলে আসে। 'শালো ভোখছে খালি, শালো ভোখা, খাড়া।'

বাঘারু ততক্ষণে ঝুরিসহ উঠে দাঁড়িয়ে মাথা-ঘাড় থেকে ঝুরিটা খোলে। বেশ লম্বা ঝুরি। মাঝখান থেকে ছিঁড়ে গেছে। দেখতে-দেখতে লতাটাকে বাঁ হাতের কব্জিতে ডান হাত দিয়ে পেঁচাতে থাকে। বেশ অনেকখানি হয়। বাঘারু এসে পাথর আর পাতার পাশে বসে।

বাঘারু ভাবতে শুরু করে কী ভাবে বাঁধবে। শুকনো লতা শক্ত বলেই ছিঁড়বে না, কিন্তু আবার, শক্ত বলেই জোরে গিঁঠ দেয়া যাবে না। একটু ভেবে পাথরটাকে আলাদা করে। তার পর পাতাগুলো দেখে আর হাতের লতাটা দেখে। লম্বালম্বি একটা বা দুটো প্যাঁচ দিলে জলের ধাক্কায় পাতাগুলো বাঁধনের পাশ গলিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। আড়াআড়ি বাঁধলে ত তলা দিয়ে গলে যাবে। লতাটা হাতে নিয়ে আর পাতার গোছাটা সামনে নিয়ে বাঘারু একবার হাতের দিকে আর একবার পাতার গোছার দিকে ফিরে-ফিরে তাকায়। সেই প্রক্রিয়াতেই তাব হাত যেন বাঁধনের ধরনটা তৈরি করে ফেলে। বাঘারু একবার ঘাড় ঘুরিয়ে নদীর স্রোতের দিকে তাকায়, কত জোরে ধাক্কা মারবে, সেটারও আন্দাজ পেতে।

বাঘারু পাতাগুলোয় আড়াআড়ি একটা বাঁধন দেয়—গোড়ার কাছে। এখানে পাতাগুলো সবচেয়ে কম চওড়া, তাই বাঁধনটা দেয়া যায় বটে, গিঁঠটা জোর হয় না। লতার জন্যেও বটে, পাতার জন্যেও বটে, পাতাগুলো তা হলে ভেঙে যাবে। এই বাঁধনটা দিয়ে বাঘারু কিছুক্ষণ তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখে, লতাটা কাটে না, যেন নিশ্চিত হয়ে যেতে চায়, এটাই ঠিক। তার পর পাথরটা তুলে নেয়। লতাটার নীচে একটা টুকরো পাথর এনে রাখে। এক হাতে 'পরনামিয়া' পাথরটা তুলে লতাটার ওপর মারে। বাঘারুর মুখে হাসি ফোটে। এমন ধার তার পাথরের, এক কোপেই প্রায় কেটে যয়। বাঘারু একটানে থেঁতলানো জায়গাটা ছিঁড়ে ফেলে। এবার, আর-একটা গিঁঠ দেবে আগার দিকে।

শেষ পর্যন্ত যা হয়, সেটা নিয়ে বাঘারু দাঁড়ায়! দাঁড়িয়ে, ঝোলায়। ঝুলিয়ে, দেখে নেয। আগায় আর গোড়ায় দুটো আড়াআড়ি, আব সেই দুটো গিঁঠকে যোগ কবে লম্বালম্বি একটা গিঁঠ। একটা খাঁচাব মত হয়ে গেছে। পাতাগুলো স্রোতের ধাক্কায় বেরিয়ে যেতে পারবে না। কিন্তু ঢিলে হয়েছে। এক ভরসা ঐ মাঝখানের খাঁজে-খাঁজে পাতাগুলো আটকেই আছে। আব পাতাগুলো পিছল নয়।

'কিন্তু পাতাগিলা ত ঝুলিবার নাগিবে, হাত বরাবর কাঁধত।' কাঁধ থেকে ঝোলানোর ফাঁসটা বাঘারু এবার বানায়।

পাথরটা পেঁচানোর জন্যে বাঘারুকে এত কিছু ভাবতে হয় না। সে আন্দাজমত অংশ কেটে নিয়ে চ্যাপ্টা পাথরটাকে আড়াআড়ি লম্বালম্বি পেঁচিয়ে, একটা গিঁঠ মেরে, খানিকটা ফাঁক দিয়ে, একটা ফাঁস বানিয়ে নেয়। ব্যাস, মালার মত হয়ে গেল। বাঘারু দাঁড়িয়ে ফাঁস হাতে নিয়ে ঝোলায়। 'ব্যাস, ঝুলিও নিগার পাবি।' বাঘারু ফাঁসটা গলায পরে নেয়। পাথরটা তার বুকের কাছে দোলে। সেটা দুলে-দুলে বুকে লাগবে কি না দেখতে কয়েক পা হাঁটে। 'কিন্তু নদীর ভিতর পাথরখানা দুলিবে কেনে। স্যালায় ত সাঁতাবিবার নাগিবে।' বাঘারু থেমে যায। কিন্তু তার পরই তার মনে আসে, পাড়ে উঠেও ত পাতাগুলো কাঁধে ও পাথরটা গলায় ঝুলিয়ে সে হাঁটতে পাবে। বাঘারু পাথরটা গলা থেকে খুলে ফাঁসটা আব-একটু ছোট করে নেয়, যাতে পাথর দুলে বুকে লাগার বদলে সেঁটে থাকে।

তাও বেশ খানিকটা লতা বেঁচে যায়। বাঘারু কুকুরটার দিকে তাকায়। সেটা তখন নিজেব লেজ ধরার জন্য পেছনেব দুই পাযেব ভেতব দিযে মুখ গলাতে গিয়ে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। 'শালো, ভোখা না-হয়, বোকা, হে বোকা এইঠে আয়।' কুকুর তাব কথা শোনে না। বাঘারু চেঁচায়, 'এততি আয় বোকা।' তার পব বাঁ হাতে কুকুরের ঘাড ধবে এনে তার গলায বাকি লতাটা পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে দেয়। 'থাকুক, কুখন কুন কামে লাগি যায়, কায জানে।'

এইবার বাঘারু নদীব দিকে চলে। বুকে পাথর ঝুলছে। কাঁধে পাতা। পাশে তার কুকুর, গলায় লতা পেঁচানো। বাঘারু সবাসরি নদীর পাড়ে চলে আসে। তারপর পাড় দেখতে-দেখতে হাঁটে, কোথায় নামা যায়। পাড়টা উঁচু ও ভাঙা। কিন্তু পাথব আছে—ছোট-বড় নানা সাইজের পাথর। পা দিয়ে-দিয়ে নীচে নেমে যাওয়া যায়।

তেমনি একটা জাযগা পেয়ে বাঘারু দাঁড়ায়। তার পর পাড়ের পাথরটিতে পা দিয়ে এক লাফে

জলের কিনারের পাথরের ওপর দাঁড়ায়। তার পর একটুও না দাঁড়িয়ে আরো নীচে জলের আরো কিনারের পাথরটিতে পা দেয়। তার পরেই জলে পা হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যায় আর পাতাগুলো হাতের পাশে ভেসে কাঁধে লাগে, সাঁতাব কাটতে ডান হাত নাড়াতে পারবে না। বাঘারু মুহূর্তের মধ্যে ফাঁস থেকে হাত বের করে নিয়ে ফাঁসটা গলায় পরে নেয়—পাতাগুলো পিঠেব ওপর ভেসে থাকে। চকিতে একবার ভাবে, পাথরটা কোমরে বেঁধে নিলে ভাল হত, কিন্তু তার আর সময় নেই। যে-জনপদ সে পেরিয়ে এল সে দিকে একবারও না তাকিয়ে বাঘারু জলের ভেতরে ঢুকে যায়, যেমন ঢুকে যাওয়া বাঘারুর স্বভাব, যেন সে জলের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারে, এই পাথব ভাসানো স্রোতের ওপর দিয়ে। ওপারে অরণ্যপদ। সে-অরণ্যের শেষ বাঘারু দেখে নি, জানে না। সেখানে তার নির্বাসন। মাল নদীতে স্রোত ছিল। স্রোত এসে বাঘারুর গায়ে ধাক্কা লাগায়। বাঘারু সে স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়। বাঘারু পেছন ফিরে দেখে নি, সেই তাব কুকুর, জলে নামল, কি নামল না। ভাসতে-ভাসতে বুঝতে পারে, কুকুরটা—ভোখাবোকা—তার পাতলা শরীরে স্রোতেব ধাক্কায় বাঘারুকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল। তার পরই সামনে দেখতে পায়, ভোখাবোকা মাথাটা স্রোতেব ওপর ভাসিয়ে রেখে ডাইনে-বাঁয়ে ঘোরাচ্ছে। বাঘারুর মাথার পেছনে পিঠেব ওপবে পাতাব গোছা ভাসে, গলায় পাথব ডোবে আর ভোখাবোকার মতই স্রোতে ভেসে থেকে বাঘারু ওপারে, ফরেস্টে, তাব নির্বাসনে চলে যায়।

সাতষট্টি

অর্থনীতির কিছু প্রক্ষিপ্ত

সবকারি ফরেস্টে গরুমোষ চবাবাব একটা ব্যবস্থা আছে। তাব জন্যে গরুমোষপিছু একটা পয়সা দিয়ে লাইসেন্স নিতে হয়।

শীতেব শেষে আগুন লাগিয়ে জঙ্গল সাফ কবা হয়, যাতে বর্ষাব আগে নতুন গাছ পোঁতা হয়। কোনো-কোনো জায়গায় মবা গাছ কেটে বাদ দেয়া হয়। কোনো-কোনো গাছ এতই মবা যে কাটার খরচ পোষায় না। সে-সব গাছও পুড়িয়ে দেয়া হয়।

এই সব আগুনটাগুন লাগিয়ে যখন ফরেস্ট সাফসুবত কবা হয় তখনই গরু মোষ চরাবাব লাইসেন্স করে বাখতে হয়। এ-সব লাইসেন্স দেয় বিট অফিস। তবে, সেখান থেকে রেঞ্জ অফিসে গিয়ে সিল লাগিয়ে আনতে হয়।

আগুন লাগানোব পব সাবাটা ফরেস্ট কেমন খালি-খালি লাগে। তলায়-তলায় বহুদূব পর্যন্ত চোখ চলে যেতে পারে—এক নদীব পার থেকে আব-এক নদীব আব-এক পার। বর্ষাব প্রথম কদিন যায় ফরেস্টের পোড়া দাগটা ধুয়ে যেতে। দেখতে দেখতে পবিষ্কাব হয়ে যায়। বেশ তকতকে ঝকঝকে লাগে পুরো ফরেস্টেব আঙিনা ঐ আকাশ-ছাওয়া গাছগুলোর তলায়।

কখন এক সময় নতুন ঘাস গজানো শুরু হয়ে যায়। ফরেস্টের মাটি দেখতে-দেখতে কচি-কচি ঘাসে ভরে যায়। দেখতে-দেখতে পোড়া জঙ্গল জুড়ে এই সবুজ নতুন ঘাস লক লক করে ওঠে। সেই সময় গরু আব মোষের বাথানে বিভিন্ন এলাকা ভবে উঠতে থাকে।

বাথানদার প্রায় সাবা বছরই ফরেস্টে কাটায়। শীতেব শেষে বসন্তের শুরুতে তাদেব লাইসেন্সের মেয়াদ আইনত পার হয়ে যায়। তাদেব বাথান নিয়ে ফরেস্টের বাইরে চলে আসতে হয়—এটাই আইন। কারণ, তখন জঙ্গল সাফ করার সময়। কিন্তু বাথান নিয়ে বেরিয়ে আসা প্রায় অসম্ভব। পঁচিশ-পঞ্চাশ-একশ গরুমোষ নিয়ে কি ফরেস্ট থেকে বেরিয়ে আবার গাঁয়ে ফিরে যাওয়া সম্ভব? এ-সব গরু-মোষের সঙ্গে গাঁয়েব কোনো সম্পর্কই নেই। বাথানদাররা তাই ঐ সময়েও ফরেস্টের ভেতরেই থাকে। বাথানদাররা জানতেই পাবে, কখন কোন জঙ্গল সাফ হবে। সেই অনুযায়ী সরে-সরে যায়। তেমন সুযোগ থাকলে, ফরেস্টের ভেতরে ফরেস্টেরই খোলা খালি জমিতে, বা নদীর চরে, বা কোনো

চা-বাগানের বড় মাঠে ঐ কটি দিন কাটিয়ে দেয়। ফরেস্টের মধ্যেই চা-বাগানের তেমন-তেমন খোলা জমি থাকলে সেখানে এই কয়েক দিনের জন্যে বিরাট গো-হাটা মোষ-হাটা বসে যায়। কয়েকটা বাথান একসঙ্গে কয়েকদিন থাকে। তেমন সুযোগ থাকলে মালিকরাও এই সময় এসে তাদের বাথান দেখে যায়। কিছু-কিছু বেচাকেনাও চলে। বছরের পর বছর এই একই নিয়মে চলতে-চলতে এখন সবটাই সকলের জানা হয়ে গেছে, কখন কোন বাথান কোথায় থাকে।

সারাটা বছর জুড়েই কেন এই বাথান-বাথান গরুমোষ ফরেস্টের ভেতরে-ভেতরে থাকে?

তার দুটো কারণ আছে দু-দিক থেকে। একটা কারণ ফরেস্টের। এত গরুমোষ খাওয়ার পরেও ফরেস্টে এত আগাছা জন্মায় যে নতুন চারার বাড় নষ্ট হয়, পুরনো গাছের শরীর খাক হয়ে যায়। বিশেষত, জলপাইগুড়ির এই ফরেস্টে, যেখানে বার মাসের সাত মাসই বৃষ্টি। এই কারণের ভেতর আরো অনেক ছোট ছোট কারণ জন্মে গেছে, অনেক দিন ধরে। সারা বছরের জন্য গেরুমোষ চরাবার লাইসন্স-ফি মাথা পিছু দশ-বিশ পয়সা। যার বিশটা সে দশটার জন্যে, যার পঞ্চাশটা সে পঁচিশটার জন্যে, যার একশটা সে পঞ্চাশটার জন্যে, লাইসেন্স ফি দেয়। এর অতিরিক্ত গরুমোষের জন্যে ফরেস্ট গার্ড, বিট অফিসার, তেমন বড়-বড় বাথানের বেলায় এমন কি রেঞ্জ অফিসারও, একটা পয়সা পায়। সুতরাং ফরেস্টে গরুমোষ চরানোয় ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের স্বার্থ যেমন, কর্মচারীদেরও তেমনই স্বার্থ।

ফরেস্টে বাথান রাখার একটা কারণ আছে বাথানের মালিকদের। ফরেস্টের ভেতর বাথান রেখে দেয়াটা অনেক শস্তা পড়ে। গরুমোষের খাবার খরচই যে বাঁচে তা নয়, এতগুলো গরুমোষ রাখতে যে-পরিমাণ জমি নষ্ট হত, গোয়ালঘর রাখতে আব প্রতি বছর ছাইতে যে-খরচ পড়ত, সেটা বেঁচে যায়।

কিন্তু এই মালিকদের বেলাতেও এই প্রধান কারণটার সঙ্গে আরো অনেক ছোট-ছোট কারণ জড়িয়ে আছে, অনেক দিন ধবে। অনেক ক্ষেত্রে সেই ছোট কারণগুলোর যোগফল, প্রধান কারণের চাইতেও বেশি।

ফরেস্টের জমি ত সর্বত্রই ছড়ানো। গাছগাছড়ার জঙ্গলে বাইবে অনেক জায়গা পড়ে থাকে। কোথাও-কোথাও ত ফরেস্টেব ব্লকটার চাইতে এই খালি জায়গাটাই বড়। বাথানের মালিক ঐ বকম মাঠওয়ালা ব্লকেব লাইসেন্স জোগাড় করতে পারলে বাথানদার হাল-বিছনও নিয়ে আসে। বাথান বাথানের মত থাকে আব বাথানদার ফরেস্টের জমিতে জোতদারের জন্যে চাষ-আবাদ করে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের যারা এই দিকে থাকে তারাও চাষে সাহায্য করে। কারণ ফসলের একটা অংশ তারাও পায়।

ফরেস্টের জমিতে চাষ লাগানোর, অর্থাৎ জমি ফরেস্টের আর হাল-বলদ-বিছন জোতদারেব, আর-একটি পদ্ধতিও আছে। ফবেস্টেব ভেতরে 'ফরেস্ট-ভিলেজার' বলে এক-একটা দলকে থাকতে দেয়া হয়। তারা শুকনো পাতা, কাঠকুটো আর হাতের মুঠোর জমিটুকুতে কিছু চাষ করা আর থাকার অধিকাবের বদলে ফরেস্ট পাহারা দেয়—প্রধানত পোচার ও চোরা কাঠকাটুনিদের খবর বিট অফিসে পৌঁছে দেয়। এরা সারাধারণ এত গরিব যে গরিব রাজবংশী গ্রামেও এদের জাযগা জোটে না। কিন্তু ফরেস্ট ভিলেজার হিশাবে এখন এদের কদর বাড়ছে বাইরের জোতদারদের কাছে। এই ফরেস্ট ভিলেজারদের সামান্য আইনি অধিকার আছে ফরেস্টের জমিতে। কিন্তু সেইটুকু অধিকারের সুযোগেই যদি তাদের হাল আর বিছন দেয়া যায়—বাথানদারদের হাত দিয়ে, আর তাদের ঘরের লাগাও জমি চাষে দেয়া যায় তা হলে ত সেটা আইনসঙ্গত চাষই হয়। জোতদার-দেউনিয়া তার ন্যায্য ভাগটুকু নিলে সেটাও আইনসঙ্গত ভাগই হয়।

এটাকে দুদিক থেকেই দেখা যায়—ফরেস্টের জমিতে জোতদারের আধিয়ারি, বা ডুয়ার্সের গভীর অরণ্যে কৃষিকর্মের বিস্তার।

নানা ভাবে এই প্রক্রিয়া ভারতের সব বনাঞ্চলেই শুরু হয়েছে। ফরেস্টের চাষযোগ্য জমিতে ফরেস্ট আর দখল রাখতে পারছে না। পুলিশ-টুলিশ দিয়ে এই সব 'জবরদখলকারীদের' তুলে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু দেখতে-দেখতে গত কয়েক বছর খবরের কাগজে 'ফরেস্ট স্কোয়াটার্স' শব্দটা তৈরি হয়ে গেছে।

ফরেস্টে গেলেই রাশি-রাশি জমি আর ফসল—ব্যাপারটা যদি এই হত তা হলে ত ফরেস্টেই গ্রাম বসে যেত। হয়ত যেত। কিন্তু এখন ত আর তা সম্ভব নয়। এখন ফরেস্টের ব্যবসা জোতদারের চাষের ব্যবসার চাইতেও অনেক-অনেক গুণ লাভের। জোতদার, বা যে-কোনো ব্যবসায়ীর কাছেই, যে-ব্যবসার

টাকা তার ঘরে আসে না, সেই ব্যবসাটাই অর্থহীন। 'কী বা হছে, এ্যানং পাহাড়-পাহাড় আর জিলা-জিলা জঙ্গল রাখি? আবে মানষি থাকিবার পারে না, ত গাছ! তার আবার বাঘক বাঁচাবার নাগে, কুমিরক বাঁচাবার নাগে। তা বাঁচা কেনে, বাঁচা। মানুষজনক ধরি-ধরি বাঘক দে কেনে। বাঁচুক তর বনজঙ্গল আর বাঘ-হাতি।'

নিজেদের ফরেস্ট বানাবার আর কাঠ বেচবার যদি আইন থাকত, তা হলে এরাই ধানগম চাষ তুলে দিয়ে শুধু বনচাষ করত।

কিন্তু উল্টোদিকে আবার ব্যাপাবটা অর্থনীতির এমন সরল অঙ্ক নয় যে বাথানের ছুতো করে বন ঢুকে নানা কায়দায় বেআইনি জোতদাবি করাটাই এত সব বাথানেব উদ্দেশ্য। বাথান রাখার সরাসরি খুব কারণ আছে—দুধ বেচে বিনি খাটুনি বিনি খবচায় দৈনিক লাভের কারণ। কিন্তু তার সঙ্গে কখনো-কখনো এই বেআইনি জোতদারিও মিলে যায়। আবাব অনেক সময় যায়ও না, নেহাত বনের ভেতর বাথান রেখে দেযার সুবিধে বলেই বেখে দেযা হয। কথাটা শুধু এই যে বনের জমিতে গরুমোষেব বাথান বাখা যেমন একটা ব্যবসা বা বীতি, বনেব জমিতে বেআইনি জোতদারিটাও একটা রীতি। প্রথমটা অনেক প্রাচীন বীতি—এখন আবাব নতুন ভাবে শুরু হয়েছে। দ্বিতীয়টা একেবারেই নতুন রীতি—এতটাই নতুন যে এখনো বীতি হিশেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে বলা যায না। ফরেস্টের ভেতরে এত পশুর খাদ্য থাকে, যা বাইবে জোটে না, আব, বাথান নিয়ে থাকা লোকগুলোব পেটে এত সামান্য খিদে থাকে, যা বাইবে মেটে না। তাই বাথান, আব বাথানদাব, গাছ-গাছড়া-পশুপাখি, এমন কি, বাঘ-হাতিব মত পশুও, একটা সুসঙ্গতিতে থেকে যেতে পাবে। সেই সঙ্গতিটাই জোবদাবিক ফলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

আটষট্টি

কৃষিবিজ্ঞানেব কিছু প্রক্ষিপ্ত

সঙ্গতি নষ্ট হচ্ছে কৃষিকাজেব আধুনিকতাব ফলে।

শুধু হালবলদে চাষ হতে পারে, বিছন হলেই ফসল হতে পাবে। ফসল হলেই ত আব ফলন হয না। পাকা ও কাটা পর্যন্ত ত সেই ফসল মাঠে বাখতে হয।

ফবেস্টেব ভেতবেব জমিতে ফবেস্ট-ভিলেজাববা আগে লাঙল ছাড়া, বলদ ছাড়া, যেটুকু জমি দুই হাতে চষতে পাবত, সেটুকুব ফসল দুই হাতে ফলন পর্যন্ত বাখতে পাবত। কিন্তু ফবেস্টেব ভেতর হালবলদেব চাষেব বিছন-ছড়ানো ফলন দুই হাতে বক্ষা কবা যায না। প্রধান বিপদ দু-দিক থেকে আসতে পাবে।

এক ঃ বনেব পাখিবা এতটা খোলা জাযগায এত ঘন ধানেব এত ফলন দেখে নি। ফসল ফলল কি ফলল না, তাবা ঝাঁকে-ঝাঁকে নেমে এসে কযেক দিনেব মধ্যেই ধানগুলো খেযে ফেলে। ধানছাড়া গাছগুলো দাঁড়িযে-দাঁড়িয়ে কযেক দিনেব মধ্যে পোযাল হযে গেলে ওডাউডিব তাতে কোনো অসুবিধে হয না।

দুই ঃ ধান গাছও আগুনের মত—নিজেব পোকা নিজেই টেনে আনে। দু-হাতেব মুঠোয এঁটে যায় এমন ফলনে সে-পোকা দু-আঙুলে টিপে মেবে ফেলা যায। কিন্তু হালবলদেব চাষের বিছন-ছড়ানো ধানেব পোকা মাবতে ওষুধ লাগে। সেই পোকা মাবাব ওষুধেব কোনো অসুবিধেও নেই আজকাল। দেউনিযা জোতদাবদেব ঘবে কৌটোয, জেলিক্যানে, প্লাস্টিকেব বস্তায তোলা থাকে। পাট, ধান আর আলুব পোকা মাবা ছাডা সে-ওষুধ জোতদাববা অন্য কাজেও লাগায কখনো-কখনো। ঘবেও লাগায, বাইরেও লাগায। তা-ছাড়া আছে চা-বাগান। সেখানে ত এই সব ওষুধেব গুদাম। চা-গাছেব পাতার দাম ধানগমেব চাইতে অনেক বেশি। সে পাতা বাঁচানোব ওষুধেব দামও অনেক গুণ। তেমন দবকারে, ফরেস্টেবই ভেতব ছড়ানোছিটনো চা-বাগানগুলো থেকে এ-সব সব ওষুধ আনা যায। আনা হযও।

ফরেস্টের ভেতরে হালবলদে চষা বিছনছেটানো খেতে, এই সব ওষুধ ছিটিয়ে দেয়া হয়। কতটা ওষুধ কী ভাবে ছেটাতে হয়, সে-সবই আন্দাজ মাত্র। কোনোটাই জানা নয়।

হরিণ, হাতি, গণ্ডার, এরা ধান খেতে ভালবাসে। ধানের খোঁজে পাল বেঁধে ফরেস্টের বাইরেও চলে যায়। ফরেস্টের ভেতরে, হয়ত তাদের যাতায়াতের পথের পাশেই, এমন ধানখেত দেখলে তারাও আসে। হরিণেরা পাল বেঁধে, হাতিরা দল বেঁধে আর বেশির ভাগ গণ্ডার একা-একা।

ওষুধ ছিটনোর পরপরই যদি তারা আসে তা হলে ধানের সঙ্গে-সঙ্গে এই সব ওষুধও গিলতে থাকে রাশি-রাশি। ফলে, এই পশুর দল বনে ফিরে যাওয়ার পর এই ওষুধের বিষক্রিয়া শুরু হয়। এরা কতটা বিষ খেয়েছে সেই অনুপাতে মরে। সেই মৃত পশুদের মাংস যে-সব শেয়াল, বনকুকুর আর পাখিরা খায়—সেগুলোও মরতে শুরু করে। ফলে, নেহাতই আচমকা, এক-একটা ফরেস্টের এক-একটা জায়গায় মহামারী লেগে যায় যেন। আজকাল, এই সব মহামারী যাতে ছড়িয়ে না পড়ে, তার নানা রকম ব্যবস্থা হয়েছে—কিন্তু সে-সব ব্যবস্থাই ত কীটনাশক, জীবাণুনাশক দিয়ে। কীট আর জীবাণুনাশক খেয়েই যে-মড়ক শুরু তা প্রতিরোধের কোনো উপায় নেই। এক ভরসা, কাছাকাছি স্রোতবতী নদী না-থাকলে মড়ক বেশি দূর ছড়াতে পারে না। থাকলে, স্রোতের সঙ্গে বিষ আরো নীচে নেমে যায়। আর-এক ভরসা, যদি বৃষ্টি হয় প্রচুর, তা হলে অত জলে বিষের সক্রিয়তা কমে যায়। কিন্তু ফসল ত পাকে, বর্ষা শেষের রোদেই। তখনই ত পোকা ধরে বেশি, পশুপাখিও ধান খেতে যায় বেশি আব ওষুধও ছেটানো হয় বেশি।

দাক্ষিণাত্যের কোনো-কোনো ফরেস্টে বাথানের গরুমোষ বাঘ মেরে নিয়ে গেলে বাথানদাবেরা সেই মারা পশুটাকে খুঁজে বের করত জঙ্গলেব মধ্যে। বাঘ ত আব একবারে সবটা খেতে পারে না, পরে খাবে বলে রেখে দিয়ে যায়। সেই মড়াটার ভেতরে এই বীজাণুনাশক ও কীটনাশক ওষুধ গ্রামবাসীরা ঢুকিয়ে দিয়ে আসত। তার পর সেই মাংস খেয়ে বাঘ ত মরতই, শকুন-শেয়াল-হায়নাও মরত। নিজেদেব বাথানের গরুমোষ ফরেস্টে নিরাপদে চরাবার জন্য ফরেস্টের মাংসাশীদের সেই ওষুধেব বিষে নিকেশ করা হয়। ১৯৭৬ সালেই কেনেথ অ্যাণ্ডারসন বলেছেন, এব ফলে আজ দাক্ষিণাত্যেব এই সব বনে কোনো বাঘ নেই, শেয়াল নেই, হায়না নেই, শকুন নেই।

জলপাইগুড়ির ডুয়ার্সে অবস্থা এখনো ততটা খারাপ নয়। কিন্তু লক্ষণটা দেখা দিয়েছে। কয়েক বছর আগে ফরেস্টের এক ব্লকে একটি রাত্রিতে সম্বর হরিণের একটা পাল সারাটা সল্ট লিক জুড়ে শুকনো পাতার মত ছড়িয়েছিটিয়ে পড়ে ছিল। শরীরেব ভেতরের অনভ্যস্ত বিষক্রিয়ায় শরীরেবই কোনো এক অজানা নিয়মে জিভ বের করে নুনমাটি চাটতে-চাটতেই মরে যায়। এই মৃত্যুর তদন্ত হয়েছিল। কলকাতা থেকে বিশেষজ্ঞরা এসেছিলেন। পোস্টমর্টেমও হয়েছিল। তাব পবে আব-কিছু জানা যায় নি।

বেশ কয়েক বছর আগে ফালাকাটার কাছে যে-গণ্ডারটা মারা যায়, তারও কাবণ নাকি বিষ। কেউ-কেউ সন্দেহ করে, সে বিষ মিশিয়েছিল পোচাররাই। দুটো গণ্ডাব প্রায় নিয়মিত ধান খেতে আসত সংলগ্ন খেতে। ভোরের আগেই ফিরে যেত। জ্যোৎস্না রাতে অনেকে দেখেওছে, গণ্ডাব দুটো সীমানায় দাঁড়িয়ে আছে—দেখে মনে হয়েছে কোনো কাটা গাছের মোটা গুঁড়ি পড়ে আছে। যাবা ঐ খেত চব্বিশ ঘণ্টা দেখছে তারা ত জানে ওখানে কোনো গাছের গুঁড়ি নেই। প্রথম-প্রথম গণ্ডার দুটোকে তাড়িয়ে দেয়ারও চেষ্টা করেছে। ফল খুব একটা হয় নি। শেষে, ধীরে-ধীবে এটা অভ্যাসই হয়ে যায়—রাস্তার বা পাড়ার ষাঁড় যে-নিয়মে চেনা হয়ে যায়। আব, একবার অভ্যাসে এসে গেলে ত এই গণ্ডার দুটো ঐ রাতগুলোর জন্যে ঐ গ্রামটাবই বাসিন্দা হয়ে যায়।

কিন্তু অভ্যাসের অন্য একটা দিকও আছে। গণ্ডার দুটোর আসাটা যখন প্রায় নিয়ম হয়ে গেছে, সবার জানা হয়ে গেছে, তেমনি কোনো একদিন দেখা গেল, একটা গণ্ডার মরে পড়ে আছে। বলা উচিত, শোনা গেল। কাবণ শেষ রাতে অপর গণ্ডারটির তীব্র চিৎকারেই সবার ঘুম ভাঙে। প্রথমে কেউ চিৎকারটি চিনে উঠতে পারে নি। কিন্তু নিয়মিত ব্যবধানে একই জায়গা থেকে চিৎকারটি বার বার উঠে আসায় বাধ্য হয়ে লোকজনকে বেরতে হয়। বেরনোর পর বোঝা যায় চিৎকারটি একটি গণ্ডারের নয়, দুটো গণ্ডারের। ততক্ষণে একটি গণ্ডার খেতের ভেতর এমন ছুটছে, যেন ভূমিকম্প হয়ে চলেছে। আর-একটি গণ্ডার ছোটে না, দাঁড়িয়ে থাকে। সমস্ত দৃশ্যটা দেখতে হয় বেশ দূর-দূর থেকে। একটা গণ্ডারের মৃতদেহ বেরল সকালে। কিন্তু মাদি গণ্ডারটা তখনো দাঁড়িয়ে। শুধু তখনই নয়, দিনের পর

দিন। জায়গাটা থেকে নড়ছিলই না। প্রথম দিকে ঘন-ঘন চেঁচাচ্ছিল। পরের দিকে মাঝেমধ্যে। সে-চিৎকারে মাটি ফেটে যাচ্ছে মনে হত। মাদি গণ্ডারটাকে বনে ফিরিয়ে দিতে আর মৃত গণ্ডারটার মৃত্যুর তদন্ত করতে কলকাতা থেকে বিশেষজ্ঞরা এসেছিলেন। গণ্ডারের পেট কাটতে ইলেকট্রিক করাত আনতে হয়েছিল। সে করাত চালাতে জেনারেটারঅলা গাড়ি আনতে হয়েছিল। তার ফলে কী জানা যায়, তা জানা যায় নি।

শোনা যায়, গণ্ডারটা মরেছিল ঐ পোকামারার ওষুধ খেয়ে। সে বিষ নাকি মিশিয়েছিল পোচাররাই। তারা নাকি ঐ জমিতে এত ওষুধ ঢালে যে ঐ জায়গাটা একেবারে পুড়ে যায়। কিন্তু দুটো গণ্ডারের বদলে একটা গণ্ডার ধান খেতে গেল কেন ? সেটা ত অনেক সময় হতেও পারে। কেন হয়, তা এক পশুরাই জানে।

অনেকে বলে, যার জমি তার ভুলে এটা হয়েছে। অনেকে বলে, তারই-বা পোচার হতে বাধা কোথায় ? বা পোচারদের হয়ে এই কাজটুকু করে দিতে ?

তবে, গণ্ডারের মৃত্যু এই কীটনাশক থেকে হতে পারে কি না এই নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক আছে। কিন্তু যদি কীটনাশকে মৃত্যু না হয়ে থাকে অথচ কোনো-কোনো লোক যদি সেটাকেই মৃত্যুর কারণ মনে করে, তা হলেই ত বুঝতে হয় এটা একটা সামাজিক বাস্তবতা হিশেবে স্বীকৃত হয়ে যাচ্ছে—পশুপাখি, গাছপালা, নদীনালা, মানুষজন নিয়ে ফরেস্টের সে-সঙ্গতি তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এমনই এক সামাজিক বাস্তবতা হিশেবে।

উনসত্তর

রাজনীতির কিছু প্রক্ষিপ্ত

পুরনো জোতদারির নতুন কৃষির মত, নতুন করে বাথানদারিও শুরু হয়েছে।

জলপাইগুড়ি, ডুয়ার্স আর দার্জিলিং পাহাড়ের তলার দিকের অনেক জায়গায় নামই আছে বাথান দিয়ে। 'গরুবাথান', 'মহিষবাথান' ত বেশ চেনা নাম। ছোট অনেক জায়গায় নামও এ-রকম আছে। কেন এই নামগুলো এমন হয়েছে তা নিয়ে কিছু-কিছু গল্প আছে। এ-সব জায়গার লোকবসতি ত খুব বেশি দিনের নয়। সুতরাং সে-সব গল্পের ভেতর এখনো পর্যন্ত ইতিহাস হয়ত আছে।

কিন্তু এখনকার এই বাথান-বাথান গরুমোষ রাখা শুরু হয়েছে বড় জোর বছর পনের। ঠিক ভাবে বলতে গেলে, দশ-বার বছরও হতে পারে।

১৯৫২-তে চীন-ভারত যুদ্ধ যখন শুরু হল, সকাল-সন্ধ্যা রেডিওতে নতুন-নতুন জায়গার নাম শোনা ছাড়া, ডুয়ার্সের লোকজন যুদ্ধ কিছু বোঝে নি। হাইওয়ের কাছে যারা থাকে তারা দেখেছে, মিলিটারি গাড়ি যাতায়াতের যেন শেষ নেই। কিন্তু সবাই ত সেটাও দেখতে পায় নি। তারাও দেশের অন্যান্য জায়গার লোকের মত রেডিওতে শুনেছে, যারা পড়তে পারে কাগজে পড়েছে। সে যুদ্ধ ত কয়েক মাস পর থেমেও গেল।

যুদ্ধ থেমে যাওয়ার পর সারাটা ডুয়ার্স জুড়ে নানা ঘটনা ঘটা শুরু হল—বছরের পর বছর। সরু রাস্তাগুলো চওড়া হয়ে গেল। কাঠের ক্যালভার্টগুলো ঢালাই হয়ে গেল। ছোট-ছোট নদীর ওপর পাকা ব্রিজ হল। জলপাইগুড়ির ওপর তিস্তার ব্রিজ হল। এখন আর শিভক ব্রিজ হয়ে ঘুরে যেতে হবে না। আর, শিলিগুড়ির উত্তরে দার্জিলিং পাহাড়ের তলা থেকে আসাম পর্যন্ত, হাইওয়ের দুপাশে, বনের ভেতরের জঙ্গল পরিষ্কার করে, মিলিটারির ক্যাম্প বসল। সে ক্যাম্পের যেন আর শেষ নেই। বনের ভেতরটা পরিষ্কার করে পাকা বাড়ি, পাকা রাস্তা, অগুনতি গাড়ি আর অগুনতি মানুষজন। ফরেস্টের বড়-বড় গাছ থেকেই গেল, তলাটা সাফ করে নেয়া হল।

শুধু জঙ্গলেই নয়, কোথাও-কোথাও শহরের বাইরে আর-এক শহর তৈরি করে ফেলল মিলিটারিরা। সেই সব শহর কোথা থেকে শুরু আর কোথায় শেষ কেউ জানে না। সমস্ত জায়গাটাই কোথাও দেয়াল,

কোথাও কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে রাখা। কখনো-কখনো সেই সব ঘেরের ভেতর প্লেন নামে। তা ছাড়া, গাড়ির সারি ত লেগেই আছে। এ-রকম কত ঘেরা শহর তৈরি হয়ে আছে দার্জিলিং পাহাড়ের তলায়, শিলিগুড়ির উত্তর থেকে, হাইওয়ে ধরে, আসাম পর্যন্ত। কিন্তু এমন টানা ও প্রায় অবিচ্ছিন্ন নতুন সামরিক পত্তনের কোনো পরিচয় স্থানীয় লোকেরা না-জানলেও বহু দূর-দূর জায়গা এরই সূত্রে একত্রিত হয়ে যায়। কোথায় কোন পাহাড়ের আড়ালে কামানের গোলার শক্তি পরীক্ষায় বা কামান চালনার অভ্যাসে কতদূর পর্যন্ত কেঁপে-কেঁপে ওঠে। এতদিন সেই কম্পনে লোকজন অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কামানের গোলার ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হওয়া ছাড়া এই ব্যাপক অঞ্চলের ভেতর এই এত সামরিক ঘটনার কোনো প্রতিক্রিয়াই ঘটে না। তার একটা কারণ নিশ্চয়ই এই সারা এলাকায় জমির তুলনায় বসতি অনেক কম আর বসতির তুলনায় পাহাড়-নদী-বন অনেক বেশি। তাই এই এত দূর বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে সেনানগর গড়ে উঠতে পারে স্বাধীনভাবে। স্থানীয় কোনো ব্যাপারের ওপর তার কোনো প্রতিক্রিয়া হল না। শুধু, মালবাজারে আর হাসিমারাতে পুরনো ও বাতিল ইউনিফর্মের দুটো দোকান হল। এই দুই জায়গাতে বেশ কটি ফটোর দোকান হল। আর এই দুই জায়গায় ত বটেই, আরো কোনো-কোনো জায়গার ছোট-ছোট বই আর পত্রিকার দোকান বেশ বেড়ে গেল। মালবাজার আর হাসিমারার মত জায়গায় হিন্দি-ইংরেজি ত বটেই, তামিল, মালয়ালি, তেলেগু ভাষার কাগজ পর্যন্ত দোকানে টাঙিয়ে রাখা। এত ভাষার এত কাগজ সত্ত্বেও সব কাগজের ওপর একই মেয়ের ছবি! বীরপাড়াতে একটা বিরাট দোকান হল—তাতে ওষুধ থেকে শুরু করে জামাকাপড়, স্যুটকেস-সাইকেল-মদ সবই পাওয়া যায়।

কিন্তু সামান্য এই কটি দোকানপাট ছাড়া, এই যে এতগুলো ক্যাম্প যত্রতত্র বসে গেল—শোনা যায় বিন্নাগুড়িতে ত নাকি একটা পুরো ক্যান্টনমেন্টই হয়ে আছে, শুধু এখনো ক্যান্টনমেন্ট বলে ঘোষণা হয় নি এই মাত্র—তার কোনো প্রতিক্রিয়া স্থানীয় বাজারের ওপর হল না। অর্থাৎ বাজারে জিনিশপত্রেব বিক্রিবাটরা বাড়বে, আমদানি বাড়বে, লোকের হাতে একটু পয়সা খেলবে, সে-সব হল না। লোকেব ভাগ্যে থাকল ঐ ছেঁড়া পোশাক আর কাগজের দোকানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মিলিটাবির সুবাদে বিনি পয়সায় নানা ভাষায় ও নানা রঙে একটি মেয়েরই আধা ন্যাংটো ছবি মলাটে দেখা।

এত-এত ক্যাম্পের এত-এত খাবার, সে-সব কনট্রাক্টাররা আনে ট্রাকে করে-কবে বাইবে থেকে। শিলিগুড়িতে একটা ডিপো আছে। কাঁচা তবকারিটরকারি সেখান থেকে কিছু আসে। কিন্তু খাশি আসে বিহার থেকে, একেবারে ট্রাক-ট্রাক লাদাই কবে। এখন নাকি কিষনগঞ্জের পরে একটি জাযগায আব ওদিকে বালুরঘাটে ডিপো হয়েছে। বালুরঘাটের ডিপোর কারণ বাংলাদেশের ভেতব দিয়ে চোরাই-চালান। মিলিটাবিব কাজকারবার সাবা দেশ জুড়ে। আর এই সব মিলিটাবি কনট্রাক্টাবদেব কারবারও যেন তাই। যেন, এইখানে যে-কোম্পানি বদলি হযে আসে, তাব সঙ্গে-সঙ্গে কোম্পানিব কনট্রাক্টাররাও চলে আসে—সে ভারতেব উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকেই হোক বা ভারতের পশ্চিম সমুদ্রের পার থেকেই হোক। এতদিনে হয়ত এই-সব কনট্রাক্টাররা এখানে, বিশেষত শিলিগুডিতে, এখানকার লোকদেবও কিছু-কিছু সাব-কনট্রাক্টারি দিচ্ছে কিন্তু আসল কনট্রাক্টেব ব্যাপারে কেউ নাক গলাতে পারে না। অর্থাৎ পুরো এলাকা জুড়ে ৬২-ব যুদ্ধের পব মিলিটাবির এত কিছু কাণ্ড হয়ে যাওযা সত্ত্বেও স্থানীয় লোকজনের আয়ব্যয়ের ওপর তার কোনো প্রতিক্রিয়া হয় নি। মিলিটারি জাতীয়-ব্যাপার বলেই হয়ত তার প্রতিক্রিয়াও জাতীয়-স্তরেই হয, এত তলায আর নামতে পারে না।

কিন্তু একটি জিনিশ কনট্রাক্টারদের স্থানীয় ভাবেই সংগ্রহ করতে হত—দুধ। পাউডার মিল্ক বা ঐ-জাতীয় পানীয় সরবরাহে কোনো অসুবিধে হযত আছে। বা হয়ত, ঐ ধবনেব পানীয়, যা দূবের কোনো জায়গা থেকে একবাবে আসে, তার সঙ্গে স্থানীয় ভাবে সংগৃহীত দুধ দিযেই দৈনিক বেশনেব কোটা পূরণ করা যায়। কারণ যাই হোক, মিলিটারি ক্যাম্পের ফলে স্থানীয় ভাবে দুধের চাহিদা শুধু বেড়ে যায় বললেই হয় না, বাড়তে-বাড়তে তা ছড়িয়ে পড়ে শিভক ব্রিজ পেরিয়ে সেই পাহাড়েব তলায়, বনে, এমন কি, পাহাড়েও, ব্যাঙডুবি-মিরিক থেকে সেই আসাম সীমা পর্যন্ত। দুধের জন্যেও ত কনট্রাক্টাব আছে। তারা আবার ফড়ে লাগায়। ফড়েরা আবার লোক লাগায়। তারা সব দুধ জোগাড করে আনে বস্তির আর টাড়ির ভেতর থেকে।

প্রথম দিকে এ নিয়ে নানা কাণ্ডও হয়েছে। মিলিটারি ক্যাম্পে-ক্যাম্পে এই দুধ জোগানোর ব্যাপারে

নদী-নালা-বন-পাহাড়ের আড়ালের সব বস্তি-টাড়ি পর্যন্ত, রাজবংশী-নেপালী-মদেশিয়া যাবতীয় লোকজন, জড়িয়ে গেছে। বস্তির লোক এক জায়গায় নিয়ে যেত। সেখান থেকে আর-একজন আরেক জায়গায়। সেখান থেকে আর-একজন বড় রাস্তায়। সেখান থেকে ট্রাকে, ইত্যাদি ইত্যাদি। সে-সমস্ত প্রাথমিক স্তর কেটে গিয়ে এখন একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে।

জোতদাররা বছর তিন-চারেকের মধ্যে কিষনগঞ্জ-পূর্ণিয়াতে লোক পাঠিয়ে, মোষ কিনে এনেছে। সামরিক কারণেই বোধহয়, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টও উৎসাহ দেখায় গরুমোষ চরানোর লাইসেন্স দিতে। দেখতে-দেখতে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে এই হাইওয়ের দু-পাশে সেই শিলিগুড়ির উত্তর থেকে আসামের সীমান্ত পর্যন্ত ফরেস্টগুলো গরুমোষ রাখার বাথানে ভরে গেল। দুধের কনট্রাক্টারের সঙ্গে প্রত্যেক বাথানের মালিকের ব্যবস্থা। কনট্রাক্টারকে যে-বা যে-যে ক্যাম্পে দুধ সাপ্লাই করতে হয়, সেই ক্যাম্পের রাস্তার কাছাকাছি ফরেস্টে বাথান রাখতে হয় যাতে গাড়ি করে সাতসকালে দুধ সংগ্রহ করে আনা যায়। তাতে অবশ্য অসুবিধে হয় না, কারণ এক মালিকের যেমন একাধিক বাথান থাকে, তেমনি এক কনট্রাক্টারেরও একাধিক ক্যাম্প থাকে। ফরেস্টের ভেতব বড় রাস্তাগুলো জুড়ে সকালে ট্রাক-ট্রাক দুধ ভরে ছোটাছুটি চলতে থাকে। ফানেল আটকানো লম্বা-লম্বা নল গরুমোষের বাঁটে লাগিয়ে যন্ত্র দিয়ে পাম্প কবে দুধ দোযা হযে যায়। ডায়না নদীর ব্রিজের নীচে, ল্যাটারাল রোডের পাশে, গয়ানাথের এমনই এক বাথান।

সত্তর

নির্বাসনভূমি

বাঘারুব এই নির্বাসনভূমি দিগন্তজোড়া ধনুকেব মত বাঁকা ও নদীব এক পাব থেকে অন্য পাবেব মত ধূসব।

কলকাতা থেকে আসাম ন্যাশনাল হাইওযে চালসাব কাছে দক্ষিণে নেমে, আবাব ময়নাগুডি দিয়ে উত্তবে উঠেছে। যে বিশাল ফবেস্টটা এই প্রায মাইল পঞ্চাশ লম্বা U-এব বিচ্ছিন্ন দুই প্রান্ত ঘিরে বেখেছে, ফবেস্টেব ম্যাপে তাব নানা জাযগাব নাম আছে—ওপর-চালসা আর নীচ-চালসা, ওপব আর নিচু তণ্ডু, ডাযনা রেঞ্জ, ডাযনা চব, গকমাবা, খুঁটিমাবি। ফবেস্টেব ম্যাপেব ৲ নানা নামেব ভেতরে একটা নিযম আছে—বড় থেকে ছোট হযে আসা নাম। ঐ চালসা থেকেই একটা ল্যাটারাল রোড বেবিযে এই পঞ্চাশ মাইল 'U'-টাব ওপবেব দু-মাথা যোগ কবে প্রায় সত্তর আশি মাইল বড় একটা গোল O বানিযে দিযেছে।

বাঘারুব নির্বাসনভূমি যে-ধনুকেব মত বাঁকা, এই ল্যাটাবাল বোডটা সেই ধনুকেব ছিলা। ডাযনা নদীব ব্রিজটা সেই ছিলাব মধ্যবিন্দু। ছিলা আব ধনুকেব মাঝখানেব শূন্যতা জুডে ডাযনা নদী। ডাযনা-চব ও জঙ্গল। তাব পেছনে পাহাডেব গা বেযে ফবেস্ট উঠে গেছে খাডা ও ধনুকেব মত বাঁকা। তাব ওপাবে ভূটান পাহাড়। এই ডাযনা নদীব কোনো পাড নেই, নীচে তিস্তাব যেমন আছে। এই নদীর তিন দিক জুডে পাহাড—আপলচাঁদেব তিস্তাব তেমন নেই। এই নদীব চাইতে আপলচাঁদেব নদীব বুক বড। এই ডাযনাব খোলা বুকেব মাত্র একটা অংশ দিযে পাথবে-পাথবে ধাক্কা খেযে-খেযে এই নদী এমনই বেগে ছুটছে—জল মাটি ছুঁতে পাবে না। এত পাথবে ধাক্কা খেযে এত মুহুর্মুহু বাঁক নিযে এই ডাযনা নদী নামে আব ছোটে যে মনে হয নদীতে জল নেই, শুধু বুদ্বুদ আছে। বাঘারুব তিস্তায ফেনা নেই বুদ্বুদ নেই—মাটিব কোন অতল পর্যন্ত জল, তিস্তাব বুকেব ভেতব জল আঁটে না, ফেটে যায। তিস্তাব মত এপাব-ওপাব কবে নয, ডাযনাকে দেখতে হয লম্বালম্বি, তলা থেকে ওপবে। কিন্তু লম্বালম্বিও ডাযনাব অনেকটা একসঙ্গে দেখা যায না, পাথব ও পাহাড়ে নদী এমনই হামেশা আড়াল হয।

নদীর বুকের কিছু অংশে, জলের দু পাশে, বালি। তারপর অনেকটা জুড়ে শুধুই পাথর, যেন মনে হয় পাহাড়কে পাহাড় ভেঙে হঠাৎ ওখানে ছড়িয়ে আছে। ছোট-ছোট পাহাড়ের সমান এমন বড়-বড় পাথর নদীর মাঝখানে আলগা পড়ে আছে, যার মাথায় উঠতে মানুষের বুদ্ধি, আর বাঘ বা কুকুরের নখ, দরকার। এমন বড় পাথরের খাড়া মাথা মাটির ওপর ঝুঁকে নিজেরই শরীরের ভেতরে এমন গর্ত তৈরি করে, যেখানে ঝড়বৃষ্টির সময় মানুষ ও পশু আশ্রয় নিতে পারে। কোনো-কোনো পাথর আকাশে সূচ্যগ্র জেগে থাকে। চড়াইয়ে গড়াতে-গড়াতে ঝুলে থাকে কোনো পাথর, যেন এই মুহূর্তে গড়িয়ে নেমে আসবে। কিন্তু সেই পাথরের আড়াল থেকে নামা স্রোতের ধাক্কায়-ধাক্কায় তার তলায় শ্যাওলা পুরু হয়ে আছে। কোথাও-কোথাও কোনো এমন পাথর ঘিরে মানুষ-ডোবা ঘাসের জঙ্গল। সমান পাথরের বেদিতে কোনাকুনি খাড়া হয়ে আছে শাদা পাথরের স্থাপত্য—ধূসর সবুজের সামনে, স্রোতস্নান ফেনপুঞ্জের পেছনে, বালি আর নুড়ির মাঝখানে।

পাহাড়ের মত এত-এত পাথর, নুড়ির মত ছড়িয়ে আছে বলেই চট করে বোঝা যায় না, নদীর সারাটা বুক বোল্ডারে ঠাসা কেন, যেন বাঁধানো। বালিভূমি আর নদীখাত জুড়ে এত বোল্ডার পড়ে, মনে হতে পারে, এই পাহাড়-পাহাড় পাথর দিয়ে নদীটাকে বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে।

এই বড় পাথর আর বোল্ডার ছাড়া প্রায় বালির মতই ছড়ানো নুড়ি পাথর। নানা আকারের, নানা রঙের। ডায়না দিয়ে বান বয়ে যাওয়ার সময় এই সব নুড়ি পাথরের ওপর দিয়ে জল নেমে যায় প্রায় ভাঙনেরই টানে। তার পর, জল কমতে শুরু করলে জলের ভেতরে বামধনুব রঙে চমকে-চমকে ওঠে নুড়ি পাথরের এই প্রান্তব। ডায়নার সহসাবিস্তৃত সেই জলরাশিতে মনে হয় আকাশেব ছায়া পড়েছে—এত গভীর আর এত রঙিন সেই নুড়ি-পাথরের জলপথ।

আপলচাঁদের তিস্তায় পাথরের এই বিস্তার নেই। সেখানে মধ্যরাত্রিতে তিস্তার গভীর থেকে কামানেব গর্জন উঠে আসে। লোকে বলে, তিস্তাব কামান। তিস্তার তলার মাটিতে পাথরে-পাথরে ধাক্কা লাগে। জল এত গভীর, নদী এত ছড়ানো, পাথর মাথা তুলতে পারে না। আপলচাঁদ ত নীচে, সমতলে, সেখানে মাটির ঢাল এত খাড়া নয়।

ডায়না নদীর ঠিক এই জায়গাটিতেই এমন ঘটছে, কারণ এখানেই পাহাড় থেকে নেমে এসে, ডায়না একটু বাঁয়ে বেঁকে, সমতলে চলে গেছে! পশ্চিমে গাঁটিয়া, আরো কিছু পশ্চিমে জলঢাকাও, গিয়ে নীচে ডায়নায় মিশেছে। ডায়নার ব্রিজে দাঁড়িয়ে দক্ষিণে তাকালে সেই সমতলটা দেখা যায়। বেশ কিছুটা পর্যন্ত ডায়নার চর। তার পর থেকেই লোয়ার তণ্ডুর ফরেস্টের নদীসীমা গাছের দেয়াল দিয়ে গাঁথা। ডায়নার বুক ক্রমেই চওড়া থেকে চওড়া হয়ে নীচে নেমে গেছে—তিন-তিনটি বড় নদীর জল, আরো অনেক ঝোরা-নালীর জল ঐ বুকে এঁটে যায়। ওখান থেকেই জলঢাকা-গাটিয়া-ডায়না, তিস্তা থেকে পুবে, আরো পুবে সরে-সরে গেছে, শেষে, আরো পুবে কোচবিহারের পাশ দিয়ে। তার নীচে দক্ষিণ-পুবে মোড় নিয়ে রংপুরের কাছে তোর্সার সঙ্গে মিশে তিস্তায় গিয়ে পড়েছে। ডায়নাব পুবে আব-কোনো নদী নীচে তিস্তায় পড়ে নি। পশ্চিমে তিস্তা আর পুবে ডায়না—এই ত সম্ভাব্য বিস্তৃততম তিস্তাপার।

ডায়নার এই চরে গয়ানাথের বাথান। এই চবেব বাথানটুকু পেতে গয়ানাথকে, তার জোয়াই আসিন্দিরকে লাগিয়ে, ফরেস্টের অফিসে তদবির কবতে হযেছিল। বাথান তাকে রাখতেই হবে, এদিকে। তার কনট্রাক্টার দুধ সাপ্লাই দেয় এই ল্যাটারাল রোডের ওপর, বিন্নাগুড়ির দিকে। সে ত আর ট্রাকেব তেল পুড়িয়ে আপলচাঁদে গিয়ে দুধ দোয়াত না। অবিশ্যি উল্টো দিকে, আপলচাঁদে বাথান থাকলে গয়ানাথ ওদলাবাড়ির দিকের কোনো কনট্রাক্টারের সঙ্গে বন্দোবস্ত কবত। কিন্তু সেদিকেও যে গয়ানাথের বাথান নেই, তার নিশ্চয়তা কী? তিস্তাপারের পুব সীমা শিভক আর পশ্চিম সীমা এই ডায়নার মধ্যে কোথায় গয়ানাথ আছে আর কোথায় নেই, তা কি সব সময় গয়ানাথেরই জানা?

ডায়নার এই চরটাই বাথানের জন্যে বাছার কারণ একসঙ্গে এতগুলো যে তার ভেতর কোনটা আগে কোনটা পরে বিচার করা শক্ত।

এখানেই, ডায়না, পাহাড় থেকে নেমে, সমতলে চলে যায় বলে ব্রিজেব পরে জলটা যেন ফেটে ছড়িয়ে পড়ছে। অথচ বালি আর পাথরের জন্যে এত বড় বুকটাও ত অসমান। ফলে, ডায়নার চরটাকে মাঝখানে রেখে অনেক দূর-দূর দিয়ে দুটো বড় ধারা গড়িয়ে গেছে। কিছু-কিছু ধারা আবার চরের মধ্যেও ঢুকে গেছে। এই মাঝখানের চবটাতে যদি বাথান থাকে, তা হলে দু ধারের জলই বাথানটাকে

অনেকখানি বাঁচায়।

এই মাঝখানটাতে থাকার ত অন্য অসুবিধে নেই, কারণ, চরটা উঁচু ঘাসের জঙ্গলে ছাওয়া। যদি নানারকম ঘাস খাওয়াতেই ইচ্ছে হয়, চরটার ভেতর ঘুরতে দিলেই গরুমোষ নিজেই পছন্দমত ঘাস জোগাড় করে নেয়। তার ওপর, এই ঘাসবনের পরেই জঙ্গলবাড়ি। সেখানে ছোটখাটো নানা রকম ঝোপঝাড়, লতাপাতা, গাছগাছড়া। ঘাড় নুইয়ে ঘাস খেতে-খেতে গরুমোষের যদি একটু একঘেয়ে লাগে, তা হলে তাকে জঙ্গলে এক পাক ঘোরানোও যায়। তারও পরে পাথর আর বালি পার হয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে ফরেস্ট শুরু। পুরো বাথান নিয়ে সেই ধনুকাকার ফরেস্টের বাঁ দিক দিয়ে সকালে ঢুকে, ডান দিক দিয়ে বেরিয়ে বিকেলের ভেতর চরে ফিরে আসা যায়।

ফরেস্টের কতকগুলো জায়গা যেমন কতকগুলি কাজের জন্যেই নির্দিষ্ট থাকে, এই জায়গাটি তেমনি যেন বাথান রাখার জন্যেই ঠিক করা। এই সব চরের জঙ্গলবাড়ি—ঘাসবাড়িতে একমাত্র ভয় গো-বাঘার। কিন্তু তেমন কোনো বাঘ আছে কি না, এ খবর আগেই পাওয়া যায়। তা ছাড়া এতগুলো মোষ নিয়ে গো-বাঘার মুখোমুখি হওয়াব সাহস না থাকলে তার আর বাথান রাখার দরকারটা কী? ল্যাটারাল রোডটা মাঝখান দিয়ে চলে গেছে বলে গাড়িঘোড়ার আওয়াজে বাঘ এদিকে আসে না। অথচ এই রাস্তা আছে বলেই সকালে কনট্রাক্টারের গাড়ি এসে দাঁড়াতে পারে।

একাত্তর

পাখি জাগে, বাঘারু জাগে

এই ইতিহাস ও ভূগোলের মধ্যে নির্বাসিত বাঘারু, এখন, কোনো এক রাত শেষে, ঘুমিয়ে আছে পাহাড় আব ব্রিজের মাঝখানের ফাঁকাটাতে, নদীব বুকে, একটা ছোট টিলাব মত একলা-পাথরেব ওপরে।

তিন দিক থেকে তিনটি বনমোবগ একসঙ্গে ডেকে উঠে রাত্রিব শেষ ঘোষণা কবে দেয়। মোরগ তিনটিব একটি বাঘারুব ডাইনে, আব-একটি বাঁয়ে, জঙ্গলেব ভেতব। তাদের ডাক দুটো মিশে যায়, কিন্তু প্রতিধ্বনি দুটো মেশে না। আব-একটা মোরগ ডাকে ব্রিজেব দক্ষিণে চরেব মাঝখান থেকে। তাব ডাকটাই হালকা আসে, প্রতিধ্বনি ওঠে না। ফলে, তিনটি মাত্র বনমোরগেব ডাকের সাত-আট বকম আওয়াজে জায়গাটা হঠাৎ ভরে ওঠে। আওয়াজগুলো ধীবে-ধীবে মিলিয়ে যেতে অনেকটা সময় নেয। নিঃশেষিত মিলিয়ে যাওযাব আগেই চবেব আর ফবেস্টেব ভেতবেব নানা আওয়াজ তার সঙ্গে মিশে যায়।

কোনো-কোনো পাখি পাখা নেড়ে ঘুম কাড়ে, গাছেব পাতায়-পাতায় মর্মবধ্বনি ওঠে, সে-ধ্বনি গাছ থেকে গাছে চলে যায়। কোনো-কোনো পাখি ডেকে ওঠাব অপেক্ষায় গলায় একটা স্বগত ধ্বনি তুলতে থাকে—গলায় উঠে সে ধ্বনি গলাব ভেতবে চলে যায়। মহিষেব বাথানেব এক দিক থেকে আব-এক দিকে কান আব লেজ ঝাপটানোব আওয়াজ ওঠে। ঘাসবনে শিব শিব আওয়াজ টানা চলে যায় দূবে, মাটি ঘেসে—বাতাসেব বা শ্বাপদেব। ঝিঁঝিব আওয়াজ থেকে-থেকে থেমে গিয়ে সেই নৈঃশব্দ্যকে আবো নিঃশব্দ কবে তোলে।

সেই পাখিটা জেগে ওঠে—ডায়নাব ওপবে, জঙ্গলের ভেতবে, কোনো উঁচু ডালে। তার পাখাঝাড়ার বেশ জোব আওয়াজ নদীপথ ধবে নেমে আসে। পাখিটা ডাল বদল কবে। গাছের কয়েকটা পাতা অনেক শব্দ তুলে খসে যেতে থাকে। পাখিটাব গায়েব সঙ্গে পাতার ঘর্ষণেব আওয়াজও নদীপথ ধরে নামে। সে বসে-বসেই আবো একবাব পাখা ঝাপটায়। তাব পব, সেই আধো অন্ধকাবে, একটা কাতর 'ক—অ—অ—ক'-ধ্বনি তোলাব সময জুড়ে, নদীপথেব আকাশ জুড়ে তার পাখনাটার প্রবল আলোড়নে, উড়ে আসে, এই ফাঁকাব ওপরে। এই ফাঁকাটায সে দু-বাব পাক খায়, বাঘারুর পাথরটাকেও ঘোরে। তাব পব ঝুপ কবে নদীব ওপবেই যেন নেমে যায়। কিন্তু উল্টো টানে উঠে এসে বসে বাঘারুবই পাথরেব কিনাবায়। এই পাথরটায় উড়ে আসার জন্যেই যেন তাব নদীতে ঝাঁপ দেযাব দবকাব ছিল।

কিন্তু এসে বসেই বাঘারুকে দেখে, পাখা আর গোটায় না, যেন আবার উড়ে যাওয়ার জন্যেই কাঁপায়, কিন্তু ওড়ে না। ঐ উঁচু পাথরের কিনারায় পাখাটা মেলে রেখে দুটো সরু ঠ্যাঙের ওপর বসে। পাখা-মেলা সেই শরীরের ভারে পা-দুটো কাঁপে, পাখিটা দোলে। কাঁপুনি আর দুলুনি থামাতে পাখি ঘোরে। পায়ে-পায়ে এক পাক দু পাক। তার পর পাখা মেলে রেখেই দুটো ছোট-ছোট লাফে সে বাঘারুর দিকে ঘোরে। ঘুরেও পাখাটাকে বন্ধ করে না। খোলা পাখা নিয়ে স্থির হয়ে বাঘারুকে দেখতে চায়। ঐ স্থিরতার প্রয়োজনেই পাখাটা আস্তে বন্ধ করে মিশিয়ে নেয় নিজের শরীরের সঙ্গে তার পরে লম্বা শরীরটাকে দুলিয়ে বাঘারুর দিকে দুপা এগয়। আগে পাখাটা শরীরের সঙ্গে সম্পূর্ণ মেলে নি, তখন মেলে। ডালের ওপর বসলে যে লেজটা ঝুলে থাকতে পারে, এখানে পাথরের ওপর সেটাকে খাড়া রাখতে হয়।

পাখাটা সম্পূর্ণ গুটিয়ে নিয়ে পাখিটা নিজের শরীরের দৈর্ঘ্যকে স্পষ্ট করে বাঘারুর শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকে। পাথরেরই ওপর আর-একটা পাথরের মত শুয়ে আছে বাঘারু। বাঘারুর মাথার ওপর দিয়ে পাখিটার গলা উঁচু করা ; ফলে বাঘারুর মাথার রেখা, পাখির শরীরের রেখার সঙ্গে মিশে যায়। যেন বাঘারুর মাথাটাই উঁচু রেখায় পাখিটার গলার নবম ঢাল হয়ে ঠোঁট পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এসেছে। সেই রেখাটা ভেঙে দিয়ে পাখি ডাইনে ঘাড় ঘোরায়। দু পা ঘোরে। তারপর কিনারায় সরে এসে বাঘারুব বিপরীতে পাহাড়েব দিকে মুখ কবে। লেজটা বাঘারুর মাথায় ঠেকে গেলে উঁচু কবে। বুকটা এমনই নিচু হয় যেন তখনই উড়ে যাবে। কিন্তু ওড়ে না। লেজটা বাঘারুব কপালের ওপর ফেলে রেখে ওড়াব ভঙ্গিতে স্থিব হয়ে যায়।

বাঘারু জেগে যায়, চোখ খোলে, কিন্তু নড়ে না। পাখিটার লেজ তার কপাল ছাড়িয়ে চোখেব ওপর পড়েছে। তবু এত অস্পষ্টতায় বাঘারু বুঝতে পাবে না লেজটা কত বড়, কী বকম, শেষে চেরা, না গুটনো, লেজের শেষ দিকে কি অন্য কোনো বঙের ঘের আছে ? পাখিটা তাকে যেবকম নিষ্প্রাণ ভেবে কপালের ওপর লেজটাব ভব বেখে দিয়েছে, বাঘারু সে-বকম নিষ্প্রাণ হয়ে থাকে। নইলে পাখিটা মুহূর্তে উড়ে যাবে। আর যদি বাঘারু পাথবেব ওপব পাথবেব মতই পড়ে থাকে, তা হলে পাখিটা ঘুরে এমন কোথাও দাঁড়াতে পারে যে বাঘারু তাকে সম্পূর্ণ দেখতে পাবে। তিন দিন ধরে বাঘারু পাখিটাকে একবাব দেখতে চাইছে, পাবছে না।

বাঘারুর কপালেব ওপর লেজটা একটু নড়ল, সুড়সুড়ি লাগল। তা হলে পাখিটা একটু ঘুরল। সুড়সুড়ি লাগছে। লেজটা এখন বাঘারুব ডান চোখটা ঢেকে দিয়েছে। বাঁ হাত দিয়ে এক ঝটকায় বাঘারু পাখিটাকে ধরে ফেলতে পারে। লেজটা বাঘারুব কপাল থেকে উঠে যায়।

বাঘারু পাখার কোনো আওয়াজ পায় না। তা হলে উড়ে যায় নি। বাঘারু তাব এই পাথবে পাখিব পাতলা নখেব কোনো স্পর্শ শোনে না। তা হলে কি নড়ছে না ?

তারপবই, বাঘারুব মুখেব ওপব পাখাব একটা ঝাপটা মেবে পাখিটা উড়ে চলে যায় বাঘারুব পায়েব দিকের আকাশে, ব্রিজেব কাছটাতে। বাঘারু আবছায়া শুধু উড়ে যাওয়াটুকু বুঝতে পাবে। দুই চোখ মেলে রেখে বাঘারু দেখে আকাশে কোনো তাবা নেই। সে অপেক্ষায় থাকে প[illegible]টা আবাব কখন উড়ে যাবে। ততক্ষণে পাখিটা বাঁয়ে মোড় নিয়ে আবার নদীব ওপবেব ফাঁকাটায় চলে গেছে। বাঘারু উপুড় হয়ে যায়। দেখে, তাব উল্টো দিকে, জলের ওপাবে, ছুঁচলো বড় পাথবটাব মাথায় গিয়ে বসল।

পাথবটা ছুঁচলো বলেই, 'পাখিব ছায়াখান দেখা যাছে—য্যান একখান পাথবেব পাখি। ঘাড় ঘোরাছে। স্যালায় বুঝা যায়, পাথব না হয়, পাখি। ছায়াখান মোরগের নাখান টানটান। বুকখান চিতানা। মাথাত ঝুটি আছে কি নাই, বুঝা না যায়— ।' উপুড় হয়ে দুই হাতেব ওপরে থুতনি রেখে বাঘারু তাকিয়ে। বাঘারু একবাব পাখিটাকে দেখতে চায়, পুরোটা দেখতে।

পাখিটা ঐ পাথর থেকে উড়ে আবাব এই পাথবে আসতে পারে। বা, আবার, 'নদীখান ধবি ফিরি যাবার পারে জঙ্গলে।' পেছনের ঘাসবনেও নেমে যেতে পাবে। 'না-হয়, না-হয়। ঐ পাখিটাব এ্যালায় খোয়ায় মন নাই। দোসব চাহে, দোসর চাহে।'

•তা হলে ত ডেকে উঠতেও পাবে, এখন বাঘারুর সামনে ঐ ছায়ামূর্তিতেই। তা হলে বাঘারু অন্তত একবার বুঝতে পারবে, গত তিন দিন যে-ডাকটা এই বাতশেষে আব সেই দিনশেষে 'পাগল করি দিবার ধইচেছে, সেউ ডাকটা এই পাখি কেনং করি ডাকে।' তিন দিন ধবে পাখিটাব ডাকেব সাড়ায় বাঘারু

ডেকে ওঠে। বাঘারু ডেকে উঠলেই পাখিটা চুপ করে যায়। তার পর চুপ করে থাকে অনেকক্ষণ। সেই অনেকক্ষণ কেটে যাওয়ার পর, রাগে জ্বলতে-জ্বলতে তীক্ষ্ণতর স্বরে, ঘন-ঘন ডেকে ওঠে। 'পাখোয়াল (পাখি) বুঝিবার ধইচছে, অর দোসর এইঠে আছে, ডাকিবার ধইচছে, কিন্তু আসিছে না কেনে?' পাখিটার সারা শরীরে সঙ্গীর জন্যে ডাক উঠেছে। যখন ও ডাকে তখন ওর ডাকের কাঁপনে ওর শরীরে কাঁপন' বোঝা যায়। শরীরের সেই কাঁপনে এমনই বিহ্বল যে বাঘারুর ডাককেই ভাবে সঙ্গীর ডাক?

কিন্তু সত্যি কি তাই ভাবে ? বাঘারুকে যদি সত্যিই সঙ্গী ভাবত তা হলে 'আরো আউরায়-বাউরায় চলি আসিত বনের ভিতরঠে।' বাঘারু যে ওর সঙ্গী নয়, সেটা বুঝতে পেরেই কি বাঘারুর ডাকের শেষে অত চুপ করে থেকে অত তীক্ষ্ণতর ঘন-ঘন ডেকে ওঠে ?

রাত ভাঙতে না-ভাঙতেই পাখি এসে এই ফাঁকটায় উড়ে-উড়ে বেড়ায়। ফরসা হওয়ার আগেই পাখা ঝটপটিয়ে চলে যাবে, জঙ্গলেব ভেতর থেকে আরো ভেতবে যেখানে সব সময়েই অন্ধকার। বিকেলের রোদ সরে গেলে আবার পাখি ঝটপটিয়ে উড়ে আসবে এইখানকার আঁধারে। জঙ্গল থেকে নদীতে, পাথরে, আঁধারে-আঁধারে, পাখি তার সঙ্গীতে খুঁজছে। বাঘারুর ডাকে সেই সঙ্গীর ইশারা পেয়ে, খোঁজে ?

বাঘারুর গলার ভেতবটায় একটা ডাক গুবগুর উঠে আবার ভেতরে চলে যায়। 'ডাকি উঠিবে ?' বাঘারু ভাবে, পাখি কি তাকেই সঙ্গী ভেবেছে, পাখি ভাবে নাকি তার সঙ্গীটা ডাকে অথচ আসে না কেন ? 'ঐ বাঁশের নাথান চোখা পাথরের মাথায বসি নদীব পাথর বুকখান দেখিবার ধইচছে—কতক্ষণ ধরি ধবি—' ঐ বড পাথবটার পুবো শরীব একটা পাখিব। উডে গেলে ঐ জায়গাটা ফাঁকা পড়ে থাকবে।

পাখিটা এখন সোজাসুজি বাঘারুর এই পাথরটার দিকে তাকিযে। তাই ওর ঠোঁট-মাথা-ঝুঁটির আভাস আব আলাদা-আলাদা চেনা যায় না। পাখিটার পাথরটা থেকে বাঘারুব পাথরের মাথাটা সম্পূর্ণ দেখা যাবে না। তা হলে পাখিটা বাঘারুকে দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু পাথবটাকে দেখছে। এখন হঠাৎ উডাল দিযে এই পাথবটাতে এসে যেতে পারে। বাঘারু স্থিব হযে থাকে, নডে না। থুতনির নীচে তার হাত দুটো। কনুই পর্যন্ত দুই দিকে সমানভাবে ছড়ানো। বাঘারু ধীরে-ধীরে তার শ্বাসপ্রশ্বসটাও কমিয়ে আনে। আব সেই স্থিবতাব অপেক্ষা কবে, শবীবটাকে কেমন এগিয়ে, গলাটাকে বাড়িয়ে, পাখা দুটো ছড়িয়ে, মাঝখানেব এই ফাঁকটুকু ভবে, পাখিটা ঐ পাথর থেকে এই পাথবের মাথায কোনাকুনি উড়ে এসে বসবে। বাঘারু তাব সেই পুবো ওডাটুকু দেখতে পাবে—এই প্রথম। পাখার ছড়ান দেখে বুঝতে পারবে কত লম্বা, ঠোটের চোখ দেখে বুঝতে পাববে পাতলা না মোটা। আর যদি এই পাথরের ওপর বাঘারুব চোখেব সামনে এসে বসে—ঘুবে-ঘুবে দাঁডায। বাঘারু পাথবেব মত স্থিব থেকে যেন, পাথরের চোখ দিযে পাখিটাকে সম্পূর্ণ দেখে নিতে পাববে। সেই দেখে নেয়া শেষ হওয়ার পরও যদি পাখিটা বাঘারুব চোখেব সামনেই বসে থাকে, তা হলে, বাঘারু খুব নিচু গলায় সেই ডাকটা ধীরে-ধীরে 'ডাকি উঠিবে। দেখিবাব পাবে, তাব ডাক শুনি পাখিটা কী কবি, ক্যানং কবি চুপ কবি থাকে, কোন দিকে তাকায, ঘাডটা ক্যানং হেলায়।' বাঘারু বুঝতে পাবে, গুবগুব একটা ডাক তার গলার ভেতরে উঠে শবীবেব আবো ভেতবে চলে যাচ্ছে। প্রায দম আটকে বাঘারু ভাবে—ভোখাটা এখন ভুখে না ওঠে। কোথায আছে, কে জানে। যদি বাঘারুব পাযেব দিকে নীচেব পাথবে থাকে, ডাকবে না। কিন্তু যদি এমন জাযগায থাকে, যে, পাখিটাকে দেখা যায ?

পাখিটা হঠাৎ উড়ল, কিন্তু সোজা একেবাবে আকাশে, যেন কেউ ওটাকে দড়ি বেঁধে টেনে তুলল, প্রায় বাঘারুব সমান উঁচুতে এখন। বাঘারু উপুড বলে দেখতে পায না এদিকে আসছে কি না। তার পরই বাতাসে ঝাপট তুলে নদীব ওপারটা ধবে বনেব সেই ভেতর দিকে চলে যায়—বাঘারুর চোখের সামনে ওর উডাল শরীবটা পেছনেব বনেব সঙ্গে মিশে যায। বাঘারু নড়ে না। আবার ফিরে আসবে। ভাবতে-ভাবতেই আবাব নদী ধরেই ফিবে এল। এবার যেন জলে ঝাঁপ দিয়ে, আবার উঠে, বাঘারুর বাঁয়েব ফরেস্টেব দিকে উডে, মিশে, আবার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে, বাঘারুর পাথরটার ওপর দিয়ে, ঘুরে, নেমে গেল। 'শালো। পাথবেব বনত দোসর খুঁজিবাব ধইচছিস ? মানষিক দেখিবার পারিস না ?'

বাহাত্তর

নদী জাগে

বাঘারু এতক্ষণ যেন জেগেও জাগে নি, এখন জাগছে। পাখিটার জন্যে শরীরটাকে এতক্ষণ স্থির করে রাখায় টান ধরেছিল, চিত হয়ে-পড়ে দুই হাত দুই পা পাথরময় ছড়িয়ে, তার পর দুটো হাত মুঠো পাকিয়ে. মাথার পেছনে ছুঁড়ে, ঘাড়টা একটু মুচড়ে, বুকটা পাথর থেকে তুলে, বাঘারু অনেকক্ষণ ধরে আড়মুড়ি ভাঙে। সেই আড়মুড়ি ভাঙার গড়াগড়িতে শরীরটা শিথিল হয়ে যায়। বাঘারু ডান পা-টা টেনে তুলে আনে। বাঁ-হাতটা ছড়িয়ে দেয়। বাঁ ঘাড়টা কাত হয়ে থাকে। পাখিটা যেন বাঘারুর শেষতম ঘুমের ভেতর এসেছিল ও চলে গেছে। বাঘারু নতুন করে দেখে, আকাশে একটাও তারা নেই। বাঘারু নতুন করে ডেকে ওঠে, 'ভোখা।'

বাঘারু না দেখেও বোঝে, ভোখা উঠে এসেছে, এখন তার পায়ের কাছে। ভাবতে-ভাবতেই ডান পায়ের আঙুলে ভোখার ঠোঁটের ছোঁয়া পায়। পা-টা ছুঁড়ে বাতাসে ভোখাকে খোঁজে। সেটা বুঝেই ভোখা একটু এগিয়ে আসে। আর ভোখার পিঠে বাঘারু তার বাঁ পা-টা রাখে। সেটা নিয়ে একটু দাঁড়িয়ে ভোখা বসে পড়ে। বাঘারুর পায়ের কাছে আবার কুণ্ডলী পাকিয়ে যায়। বাঘারু বহু ওপরের আকাশের দিকে তাকিয়ে খুক করে হাসে, 'শালো আলসিয়া।'

রাত্রির শেষ আর ভোরের শুরুর মাঝখানের এই সময়টাতে সব চেয়ে বেশি অন্ধকাব। চাঁদ আর তারার আলো আকাশে থাকে না। ভোরের আলো ফোটে না। ফরেস্টের বড়-বড় গাছেব মাথা আকাশে, ঝোপঝাড় মাটিতে লেপে যায়। ছায়ামূর্তিগুলোও স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে না। '—অ্যালায়ও ছায়া জাগো নাই—।' ভোখার পিঠের ওপরে বাঁ পা-টা বাঘারু নাড়ায়—'শালো, আলসিয়া। ভুখিবারও চাহে না—নিদ যাবার চাহে। এ ঘুমা। ঘুমা কেনে। শালো নিদুয়া কুত্তা, ঘুমা।'

বাঘারু পা-টা টেনে নিয়ে উঠে বসে। দুই হাতে হাঁটু জড়িয়ে বসলে সে দেখে পাখিটা দুটো পালক খসিয়ে গেছে। হাত বাড়িয়ে পালক দুটো ধরতে বাঁ পা-টা তার পড়ে যায়। এখন সে তাব ডান হাঁটুব ওপর ডান হাতটা রেখে, বাঁ হাতে পালক দুটো ধরে বাঁ পায়ের ওপর রাখে। মনে রাখা, ভুলে যাওয়া, মনে করা, ভুলে থাকা—এইসব মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় ত বাঘারু খুব অভ্যস্ত নয়। পাখির সেই অনতিক্রম্য প্রমাণের দিকে তাকিয়ে শুধু সে মনে করতে পারে 'কালিও ফেলি গেইছে দুখান, তাব আগের দিন সনঝাত আরো একখান ফেলি গেইছে।' বাঘারু সেই পালক হাতে, এবাব নদীর দিকে তাকায়। ঠিক নদীর দিকে নয়, তার বাথানেব দিকে, বা বাথানসহ নদীব দিকে। আর, এই তাকানোর সঙ্গে-সঙ্গে তার কানে আসে জলের ছুটে যাওয়ার আওয়াজ আর জলের ভেতরে নুড়ি-পাথবের টুঙটাঙ। ঠিক এই সময়টাতে এই আওয়াজ ওঠে। রাত্রিতে বনের নানা আওয়াজ কানে আসে না। দিনের বেলাও তাই। রাত আর দিনের মাঝখানে এই সময়টাতে জলস্রোতেব তলায় নুড়ি-পাথরেব ধ্বনি কিছুক্ষণ ধরে বাজতে থাকে। এই ধ্বনি অনেক সময় ঘুম ভেঙেই কানে আসে। আব কানে এলেই বাঘারু বোঝে সকাল হতে শুরু করেছে।

আওয়াজগুলো একে-একে শুনে নিয়ে বাঘারু এবার নদী থেকে চোখ সরিয়ে তাকায় তার মোষগুলোর দিকে। এই পাথরটাকে এই জন্যেই বেছেছে বাঘারু। সব চেয়ে উঁচু পাথরটার তিন পাশে মোষগুলো ছড়িয়ে থাকে বালি আর পাথরেব ওপব। তাকালেই প্রায় সবটা দেখা যায়। বৃষ্টিবাদলা না থাকলে বাঘারু এই পাথরটাতেই শোয়। বৃষ্টিবাদলার জন্যে সামনেব জঙ্গলেব ভেতবে একটা গাম্ভারি গাছের সব চেয়ে তলার ডালটার ফেঁকড়িতে বাঁশ-কঞ্চি-কাঠের টুকরো-টাকরা দিয়ে মাচান বানিয়েছে আর তার ওপরে সেই তরিকা পাতাগুলো বেঁধে-বেঁধে, ঝুলিয়ে-ঝুলিযে, জোড়া লাগিযে একটা ছাউনি বানিয়েছে। গাছটার ঠাসা পাতার ভেতবে তরিকা পাতাব ঐ ছাউনির নীচে হাত-পা গুটিয়ে বাঘারু ঘুমোতেও পারে।

মোষগুলোর দিকে তাকাতেই কানে আসে রোমন্থনের সমবেত আওয়াজ। এই আওয়াজটাও সারারাত ধরে বাড়তে থাকে বটে কিন্তু ফরেস্টের অন্য সব আওয়াজ থেমে না গেলে শোনা যায় না। আর যদি শোনা যায় তাহলে মনে হয় জঙ্গলের ভেতরে কোনো একটি জায়গাতে যেন কোনো মাটির

গর্ত তৈরি হচ্ছে। এতগুলো মোষের এই নিজের গলার ঘাস, মুখ না খুলে, নিজেই চিবুনোর আওয়াজের এমনই একটা শরীর আছে যা ফরেস্টের ভেতর মিশে থাকে, ঝিঁঝির আওয়াজের মত। যতক্ষণ বাথান বেঁধে বনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় ততক্ষণ এই বাথান ফরেস্ট থেকে আলাদা ; যখনই বনের সীমার বাইরে এই চরে রাত ভোর করে তখনই ফরেস্টের সঙ্গে মিশে যায়।

বাথানটাকেই আর-একটু ভাল করে দেখতে বাঘারু উঠে দাঁড়ায়। মনে হয়, পাথরটা আরো খানিকটা লম্বা হয়ে গেল। বাঘারু যে ছায়ামূর্তি হয়ে উঠতে পারে, তার কারণ বাঘারুকে ঘিরে আকাশ ও অবকাশ ছাড়া আর-কিছু ছিল না।

এই বনে সারাদিন সারারাত ধরে আলোকপাত বদলায়, ছায়াপাত বদলায়। পাথরের, গাছের, কখনো-বা মানুষের মাথা—যা কিছু আকাশ ফুঁড়ে ওঠে তারই আকার বদলায়। আকাশরেখার এমন বিরতিহীন বদলেই শুধু সময়ের প্রবাহ বোঝা যায়।

বাঘারু দেখে, বাথান ঠিকই আছে। ভোখা ডাকে নি মানেই, ঠিক আছে। ভোখা ঘুমোচ্ছে মানেই, সব ঠিক আছে। বাঘারু ভোখার সামনে গিয়ে ভোখার নরম পেটে তার পায়ের আঙুলগুলো ঢুকিয়ে রোমগুলো একটু নাড়িয়ে দেয়, আদরে, 'শালো, আলসিয়া, নিদুয়া।' ভোখা একটুও আওয়াজ না-করে সেই পা-টা জড়িয়ে ধরে আরো কুণ্ডলী পাকিয়ে যায়। কাদায় পা গাড়লে যেমন করে পা তুলতে হয়, সে-রকম টানতে গিয়ে বাঘারু হেসে ফেলে, ভোখা ছাড়ছে না। 'ছাড়ি দে, নামিম।' বাঘারু টের পায়, ভোখার পেটের নরম রোমগুলো তার পায়ের পাতায় নরম লাগে আর গোড়ালির কাছে ভোখার নখ।

পা-টা টেনে বের করে, পাখির পালক ধরা হাতটা মাথার ওপর তুলে, বাঘারু, পাথরের মাথা থেকে লাফিয়ে তার নীচের পাথরে নামে। সেখানে ঘুরে দাঁড়িয়ে আরো নীচের পাথরে। আকাশে বাঘারুর ছায়ামূর্তিটা ধীরে-ধীরে ফরেস্টের অন্ধকারের ভেতরে ডুবে-ডুবে যায়। সব চেয়ে শেষে ডোবে তার হাতের পাখির পালক। বাঘারুর রাত শেষ হল। বাথান এখনো জাগে নি। ফরেস্টের ভেতরে অন্ধকার এখনই সব চেয়ে ঘন।

সবচেয়ে নীচের পাথরটাতে পা দিয়ে একটা ছোট্ট লাফে বাঘারু নদীর বুকে নামে। এতক্ষণ পাথরের মাথায় যে-প্রকৃতির ভেতর বাঘারু ছিল, তা সম্পূর্ণ বদলে যায়। এখন সামনে ফেনার রাশি, নদীর কল্লোল চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

যে-পাথরটার ওপর থেকে বাঘারু নেমে আসে তার তলায় প্রায় পর-পর একটার পর একটা বড় পাথর। টিলার মত পাথটার সঙ্গে খাঁজে একটা কেমন আশ্রয়ের মত হয়েছে। বাঘারু সেই খাঁজটার ভেতর ঢুকে, নিচু হয়ে, আর-এক পাথরের সংযোগের মাঝখানের অবকাশটাতে পাখির পালক দুটো রাখে। ওখানে আরো তিনটি পালক আছে। আর, আছে, বাঘারুর সেই 'পরনামিয়া পাথর।'

এই বার বাঘারু নেমে পড়ে নদীর বুকে, পাথর আর বালির ওপরে, ও..., বাথানের মাঝখানে। মোষগুলোর পেছন, পেট, মুখ, শিঙ ছুঁয়ে-ছুঁয়ে, এঁকেবেঁকে পথ করে নিতে-নিতে, বাঘারু জলের দিকে যায়। মোষগুলো ফোঁস-ফোঁস শ্বাস ছেড়ে বাঘারুকে জানান দেয়, চিনেছে। ঘাড়গুলো দিক বদলায়, কান আর লেজের ঝাপট পড়ে গায়ে পট-পট। পাথরের তলা থেকে জলের কিনারা পর্যন্ত আওয়াজে-আওয়াজে মোষগুলোর জানা হয়ে যায়—বাঘারু উঠেছে। রাতে ফেলা গোবরে বাঘারুর দুই পা ভর্তি। নাড়া-খাওয়া গোবরের গন্ধ শেষ রাতের ভারী বাতাসে লেগে যায় কিন্তু ছড়ায় না। বাঘারুর পায়ে তার সঙ্গে ভেজা বালি। মোষের গা থেকে কিছু হাতে লেপটে যায়। ডায়নার জলের কিনারায় চলে এসে বাঘারু একটু দাঁড়ায়।

জল থাকলেই সে-জায়গাটা একটু পরিষ্কার লাগে। জলে আলো খেলবেই। আর, ডায়নার ফেনা-ওঠা জল ত নিজেই আলো ছড়ায় একরকম। বাঘারু তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখে। আরো নীচের তিস্তাপারের মানুষ সে। ওপরের এমন নদী রোজ দেখা ত তার অভ্যেস নেই। তাই ভুলে-ভুলে যায়। তিস্তা ত ফরেস্টের মত, বা একটা বড় ডাঙার মত, বা একটা আকাশের মত।—'সেটা ত ঐঠে থাকি যায়, দেখো কি না দেখো।' সেখানে ত অভ্যেস হওয়ার কিছু নেই—তুমিই ত সেই নদীর ভেতর আছো; জানো কি না-জানো। কিন্তু জলে ফেনা তুলে এ-রকম আওয়াজে ডায়নার ছুটে চলাটা এমনই, মনে হয়, যখন আমি দেখব না, তখন এই দৃশ্যটাও থাকবে না। সকাল হওয়ার আগে, রোজই, বাঘারুকে এমন একটু সময় দিতে হয় ডায়নাকে অভ্যেস করে নিতে, ডায়নার সেই ছুটন্ত ফেনরাশির দিকে তাকিয়ে

বুঝে নিতে যে ডায়না সারা রাত ধরে এমনই রয়েছে।

বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ঐ কল্লোল ও স্রোত বাঘারুর ধাতস্থ হয়। বাঘারু একটু হাসে—'ক্যানং নদীখান, ডাইনাং ? ডুবিবার চাহিলে ডুবিবার পারো না, কিন্তু জল চলিবার ধইচছে দিন-আতি, আতি-দিন।'

বাঘারু নদীতে নামে। পায়েব গোড়ালি ছাপিয়ে জল ওঠে। স্রোত পা বেয়েও খানিকটা উঠতে চায় ! বাঘারু পা-টা জলে ফেলেই স্রোতের টান বুঝতে পাবে। বাঘারুর পা-টা পেয়েই স্রোতটা একটু সঙ্কুল হয়ে ওঠে, আওয়াজ একটু বলদায়। জলের সারা রাতের উষ্ণতা বাঘারুর পা বেয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে যায়। বাঘারু পা ফেলে। পায়ে লেগে নুড়িগুলো ছিটকে যায়। নদীর মাঝামাঝি একটা চওড়া পাথরের ওপর বাঘারু দাঁড়ায়।

রোজ এই পাথরটাতেই দাঁড়ায় বাঘারু। তার পথ পাথরটাতেই ঘুরে-ঘুরে মুখটা ডায়নার মুখেব দিকে ঘোরায়। পাহাড় আর জঙ্গলের ভেতর থেকে বেবিয়ে ঠিক যে-জায়য়াটায় ডাযনা প্রায় সমকোণে বাঁযে ঘুরেছে, পাথরটা ঠিক সেই জায়গায়। স্রোতের উল্টোমুখে দাঁড়ানো বাঘারুর বাঁয়ে এখন সেই ছুঁচলো পাথর, যার ওপর পাখিটা বসেছিল আর ডাইনে, খানিকটা দূরে বাঘারুর পাথব।

জলের ভেতরের এই পাথরটা খুব স্থির নয়। নুড়িপাথরেব ওপব আছে—স্রোতের ধাক্কায সব সময়ই নডছে। বাঘাকুর মত ওজন নিযেই নড়ছে। অথচ এতগুলো দিন গেল, বোজ বাঘারু এই পাথবটাব ওপর এসে দাঁড়িয়েছে। এব ভেতব একদিন একটা বড বান গেল ঠিক প্রথম বাত্রিতে। বাঘাক পাথরটিলায় ছিল। মোষগুলোর প্রায় হাঁটু পর্যন্ত জল উঠেছিল। জলস্রোত এসে ঘা মাবছিল পাথবটিলার তলাতেও। কিন্তু তবু সকালে এই পাথবটা এখানেই ছিল ! স্রোতেব অমন ধাক্কাতেও নড়ে নি।

তার দুটো বিশাল পাযেই ভবে যাওযা পাথরটুকুব ওপর বাঘাকুব দাঁডানোটা ত খাড়া, সোজা, কোনো নড়নচডন নেই। এইখান থেকেই বাঘারু ডায়নার বেশ খানিকটা একসঙ্গে দেখতে পায়। বাঘাক দেখে, যা রোজ দেখে, কিন্তু প্রতিদিনই যেন সে প্রথম দেখছে এতটাই নতুন সে দৃশ্য তাব অভিজ্ঞতায। '—আন্ধিয়াব দ্যাওয়াত চরক খেলিবার নখান ছুটি আসিছে ডাইনাং ঝোবাখান, শাদা, ফটফটা—' অন্ধকার আকাশে বিদ্যুচ্চমকের মত উদ্ভাসিত শাদা ফেনাব একটি চলৎরেখায ডাযনা ছুটে নামছে। মাটির সঙ্গে জলের যে-ঘর্ষণে জলকল্লোল উঠছিল মনে হয, তাব পেছনে স্রোতেব এমনই প্রবল ধাক্কা আছে বোঝা যায় ডায়নার এই প্রপাতের মত নিষ্প্রমণ দেখলে। 'পাখিখান এই স্রোতেব ওপব দিয়া ওব ঘরত যায় আর ডাকো দেয়। ডাকিবু ? এ্যালায ?' বাঘাক ডাযনাকেই দেখে। ডাযনা ত বাঘারুব নদী নয়। কিন্তু প্রতিদিন এই একটি সময় ডাযনাব মাঝখানে দাঁডিযে আবো খানিকটা দেখে নিতে-নিতে বাঘারু যেন কোথায় একটা টান বোধ করতেও পাবে, সামনেব ঐ জঙ্গল-পাহাড আব খাডাপথ বাঘারুকে যেন আশ্রয় দিতেও পাবে।

তাব পাথবেব ওপর দাঁড়িযে-দাঁড়িয়ে বাঘাক জলের ওপব ঝুঁকে পড়ে। সেই ফেনবাশিতে দুই হাত ডুবিয়ে দেয। হাতে ছিটকে জল বাঘারুব চোখে-মুখে-বুকে লাগে।

তিয়াত্তর

বাথান জাগে

নদী ধরেই বাঘাক একটু ওপব দিকে ওঠে। তাব পব নদী ছেড়ে উঠে যায। সে এখন এক সীমা থেকে মোষগুলোকে একবার দেখে নেবে। শুধু দেখেই না। একটু সাজিযে নিতে হবে পুবো বাথানটাকে। দুধিয়ালগুলোকে নিযে যেতে হবে বাঘারুব পাথবটাব পশ্চিমে, বাস্তাব দিকে অনেকখানি তুলে। দুধেব গাড়ি এসে যাওযাব পব, না হলে, হাঙ্গামা লাগে। মোষগুলোবও এটা অনেকখানি জানাই। তাবা,

এখানে বাঘারুর চেয়ে পুরনো। বাঘারুকেই নতুন করে জানতে হয়েছে। এখন একটু-আধটু ধাক্কা খেলেই মোষগুলো বোঝে কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। সারাদিন বনেজঙ্গলে চরার পর বিকেলের দিকে বাথান যখন ফেরে তখন যে যেখানে ইচ্ছে দাঁড়ায়, কিংবা বসে। এখন এই সকালে তাদের লাইনবাঁধা শুরু করতে হয়। একবার পাম্প লাগানো শুরু হয়ে গেলে আর খোঁজাপাতি করা যায় না। এই জায়গাটা খুব ছড়ানো নয় বলে গায়ে গা লাগিয়ে মোষগুলো এক জায়গাতেই থাকে, বাঘারুর পাথরটাকে তিন দিক থেকে ঘিরে। জায়গাটুকুতে জঙ্গল নেই, শুধুই বালি ও পাথর, আর রাস্তার দিকের খানিকটা ঘাস। মোষগুলো বেশি ছড়াতে পারে না।

কিন্তু, তারই ফলে গায়ে গা লাগিয়ে এমন ভাবে থাকে যে ভেতর দিয়ে ঢোকার রাস্তা পাওয়া যায় না। আব বসার এই এক অদ্ভুত অভ্যেস মোষদের যে দুটো মোষ দুদিকে মুখ করে এমন ভাবে এ ওর গায়ে ঢলে থাকে যেন মনে হয় ওদের একটাই শরীর। শুধু বিপরীত মুখেই যে তা হবে, তা নয়, এক দিকেই মুখ করে এমন কোনাকুনি শরীর আর গলা রাখে যে হয় ডিঙিয়ে পেরতে হয়, না হয় ঘুরে যেতে হয়।

সারা রাত ধরে মোষগুলো যে যার ভঙ্গিতে প্রায় স্থির হয়ে থাকে বলেই কি বাঘারু এই বাথানজোড়া মোষের মূর্তিগুলোই দেখতে পায়, যেন, এগুলো মোষ নয়—পাথব। নাকি, সকালের আলো এখনো ফোটে নি বলে মোষগুলোর শুধু ছায়া আছে এখন। পুরো শরীর নেই, শরীরের আভাসটা একেবারে খোদাই হয়ে আছে। তাই তাদেব পুবো শরীবেব বাইবেব রেখা এমন প্রখর হয়ে থাকে।

বাথানেব পেছন দিকটাতে পৌঁছতে বাঘারুকে জলের কিনারা দিয়ে, তাব পর কিনারা ছেড়ে, ক্রমেই ওপরে উঠতে হয়। মোষগুলোকে একসঙ্গে দেখায় যেন একটা অসমতল পাথুরে ডাঙা। তাতে কোনো-কোনো জায়গায় দুটো-একটার শিং জেগে আছে মাত্র। মাঝখানে, একটা মোষ দাঁড়িয়ে, তার গলাটা আকাশে অনেকখানি বাড়িয়ে কোনো উঁচু গাছের ডালে মুখ দিতে চায় এমন ভঙ্গিতে। শিং দুটো পেছনে হেলে শবীবেব সঙ্গে মিশে গেছে, শুধু জেগে আছে তার হাঁ মুখটা—মনে হয়, পিঠটাই এগিয়ে হাঁ হয়ে আসে। বাঘারু চেনে—বুড়িয়ালি। 'শালো বুড়ি হচ্ছে, ঘুম কমি গেইছে।' বাঘারু চলতে-চলতে জিভ দিয়ে টাকরায় একটা আওয়াজ তোলে—'টট্ টব্-র্-র্, টট টর-র্-র।'

চলতে-চলতেই আওয়াজ তুলে চলতে-চলতেই তাকায় বলে বাঘারু বুঝতে পারে না, তার ডাকে বুড়িয়াল সাড়া দিল কি না। এখন আরো সরে এসে সে ত বুড়িয়ালের ঐ লম্বা গলার ও মুখের আর-একটা চেহাবা পায়। বাঘারু বুড়িয়ালকে একটু ব্যস্ত কবতেই যেন, আবাব আওয়াজ তোলে, 'টট্ টর-ব-ব, টট ট-র-র ট-ব-ব।' তাব পর লাফিয়ে একটা মোষের পিঠ টপকে, আর-একটা মোষের পিঠে হাতেব ভব দিয়ে একটু পাক খেয়ে সে বাথানেব শেষ মোষটার কাছে গিয়ে পৌঁছয়। এইবাব বাঘারু পুবো বাথানটাকে জাগাবে। কিন্তু তাব আগেই মাঝখান থেকে বুড়িয়াল তাব গলাটা আরো বাড়াতে থাকে, যেন ডালটা তাব মুখেব নাগালে আসছে না। আর তার পরই 'আঁ—আঁ—আঁ—গ্' করে ওর পুবনো ঘষা গলায় এক হাকার তোলে। বাঘারুকে, আওয়াজ শুনে, খুঁজছে। না পেয়ে ডাকছে।

বুড়িয়ালেব হাঁক শুনেই ঐ পাথবেব মত মোষেব মাথাগুলো একটু-একটু ঘোরে, খাড়া হয়। আর তখনই বাঘারু হাঁক দেয়, 'হে-ই, উঠ্, উঠ্, উঠ্, হেট, উঠ'। বাঘারু শেষ মোষটার পেছনে হাঁটু দিয়ে একটা গুঁতো মারে, 'হেই, উঠ্, উঠ্, হেট, উঠ', তার পর মোষটাব ঘাড়ে আর পিঠে জোরে-জোরে চড় মাবে, 'হেট, উঠ'। বুড়িয়াল সেই মাঝখান থেকে ততক্ষণে মুখ ঘুরিয়েছে বাঘারুর দিকে। গলাটা তার বাড়ানোই থাকে। বাঘারুব হাঁক শুনে নিয়ে আবাব একটা ডাক দেয়, 'আঁ আঁ—আঁ—গ।' এবারের ডাকটা আব তত লম্বা নয়। বুড়িয়ালি জেনে গেছে, বাঘারু কোথায়। বাঘারু চেঁচায়, 'খাড়া গে খাড়া, যাছি, খাড়া।' তাব পর আবাব বসা মোষটাকে পেছনে একটা খোঁচা দেয়—'হেঁট হেঁট, উঠ্, উঠ্, টর-র-ব—অ, টব-র-র-অ'। এতক্ষণে মোষটা তার পেছনের পা দুটো নাড়াতে শুরু করে। বাঘারু তার কানের পিছে জোবে-জোবে দুটো চড় মাবে। মোষটা পেছনের পা দুটো সোজা করতেই কানের ঝাপটা মাবে বাঘারুব হাতে, বুঝে নিতে যে বাঘারুই, বা সাড়া দিতে। তার পর লেজেব ঝাপটা মারে পিঠে। মোষটার পেছনটা উঁচু হতে থাকে। পেছনের পা দুটো মাঝামাঝি উঠতেই সামনের পা দুটো ঝট করে তুলে মোষটা খাড়া হয়ে যায়। মোষটা মাটি থেকে একটু উঠতেই তলা থেকে পেচ্ছাব আর গোবরের গন্ধ উঠে আসতে থাকে। কিছু যেন ধোঁয়াও। আর গা থেকে বালি আর নুড়ি-পাথর খসে পড়ে।

মোষটার মুখটা এখন বাঘারুর দিকে ফেরানো। বাঘারু তার গলাটা ধরে ঘোরাতে থাকে। একটু ঘোরাতেই মোষটা নিজেই ঘুরতে শুরু করে। এই মোষটার গায়ে গা লাগিয়ে যেটা ছিল, সেটাও, এর মধ্যে বসে থেকেই গলাটা সোজা করেছে। বাঘারু আগের মোষটার গলার তলা দিয়ে ঐ মোষটার কাছে এসে হাঁটু দিয়ে একটা গুঁতো মারে, 'উঠ্, উঠ্', আর তার পরের মোষটার পিঠে একটা চড় মারে। সঙ্গে-সঙ্গে ঐ মোষ দুটো উঠতে শুরু করে। এবার এই মোষটাই চলতে-চলতে অন্য মোষদের উঠিয়ে দেবে।

ইতিমধ্যে পরের দুটো মোষই উঠে দাঁড়িয়েছে। প্রথম মোষটার পেছন-পেছন সে দুটোও চলতে শুরু করে। বাঘারু তার ডাইনে-বাঁয়ে এই মোষের লেজ মুড়িয়ে, ঐ মোষকে হাঁটু দিয়ে গুঁতিয়ে, আর-একটাকে পিঠে চড় মেরে, 'হে-ই, উঠ্, উঠ্, ট-র-র-অ, টর-র-র-অ' আওয়াজ দিতে-দিতে এগিয়ে যায়। একটা মোষ যখন উঠছে, তখন পুরো বাথানটাই এখন দাঁড়িয়ে পড়বে। আর পেছনের মোষটা যখন চলতে শুরু করেছে, সেই চলার ধাক্কাতেই সামনের মোষগুলোও চলবে। কিন্তু তার আগে বাঘারু আগে গিয়ে দাঁড়াবে। তার পর দুধিয়ালগুলোকে আগে ছাড়বে, প্রায় লাইন বেঁধে।

এগতে-এগতে বাঘারু বুড়িয়ালের কাছে এসে পড়ে। সামনে দাঁড়িয়ে তার দুই শিঙের মাঝখানে একটু চুলকে দেয়। এমন-কি বাঘারুর অতবড় থাবাও মোষটার কপালে কেমন ছোট দেখায়। বাঘারুর স্পর্শ পেয়ে মোষটা তার গলাটা বাড়িয়ে দেয়, বাঘারুর কাঁধের ওপর তার গলাটা রাখে। নিজের মাথার পাশে মোষের মাথাটা নিয়ে বাঘারু দুই হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে আর আস্তে-আস্তে কানের পাশে গলকম্বলের নীচে দুই হাত দিয়ে মোষটাকে আরাম দিতে থাকে। বাঘারু শুনতে পায় বুড়িয়ালের গলার ভেতর থেকে একটা গুর্ গুর্ গুর্ আওয়াজ উঠে আসছে, 'খাড়া কেনে, খাড়া, এ্যালায় ত সাকালখান হইল্।' বাঘারু আবার তার কানের পিছে হাত লাগিয়ে সুড়সুড়ি দেয়।

পেছনের মোষরা বাঘারু আর বুড়িয়ালকে মাঝখানে রেখে দু-পাশ দিয়ে এগতে শুরু করেছে। বুড়িয়ালের গলায় সুড়সুড়ি দিতে-দিতেই বাঘারু দেখে, সেই ভর পোয়াতি মোষটাও দুলতে-দুলতে চলেছে—'আজি হবে কি কালি হবে।' বাথান প্রায় পুরোটাই জেগে উঠেছে। এবার চলতে শুরু করবে। বুড়িয়াল যাবে না। এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে। বাঘারুকে এবার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। বাঘারু বুড়িয়ালের ঘাড়ে দুটো চড় মেরে, 'র কেনে র, আসিছু' বলে খুব ধীরে চলমান মোষের দলের পেছন থেকে তাড়াতাড়ি সামনে এগিয়ে চলে।

কিন্তু এগিয়ে চলতে-চলতেই বাঘারু এক-একটা মোষকে গলা ধাক্কিয়ে সরিয়ে পেছনের কোনো মোষকে জায়গা করে দেয়। সেটা ফাঁকের ভেতর ঢুকে গেলে আগের মোষটাকে ছেড়ে দেয়। দুধিয়ালগুলোকে দরকার এখন। বাকিগুলো এখানেই থাক। মাঝখানে একটা বাছুর বড়-বড় মোষের ভেতরে যেন পথ হারিয়ে ফেলেছে। বাঘারু সেটার লেজ তুলে এমন মলে দেয় যে, পেছনের দুই পা তুলে এক লাফ মেরে দৌড়তে শুরু করে। আর আগের দলটা যেন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যায়। বাঘারু হেসে উঠে তালি দিয়ে বলে, 'চল কেনে, টর-র-র।'

চুয়াত্তর

দুধের ট্রাকের অপেক্ষায় গান

বাঘারু এখন ডায়না ব্রিজের ওপরে—রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। দুটো মোষও ব্রিজটার ওপরে উঠে এসেছে। ঠিক মাঝখানে, শিং উঁচু করে বাঘারুর মতই পুব দিকে সোজা তাকিয়ে। ওদিকে বিন্নাগুড়ি। ঐদিক থেকেই দুধের গাড়ি আসবে। আসার সময় প্রায় হয়ে এসেছে। সময়ের খুব একটা হেরফের হয় না।

এখন বাঘারুর কোনো কাজ নেই, গাড়ির জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া। সুতরাং তার গান আসতে পারে। বাঘারুর গানও পূর্বনির্ধারিত। সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের মত ব্যস্ততাহীন নিয়মে বাঁধা তার কাজের

ভেতরে এই গান যোগসূত্র হিশেবে তৈরিই থাকে। এক কাজ থেকে আর-এক কাজের ভেতর বাঘারুর এত বিচ্ছিন্নতা কখনোই ঘটে না যা গান দিয়ে জুড়ে দেয়া যায় না। যেমন বাঘারুর শরীর কাজ থেকে কাজে, নদী বা গাছের মতই চলে যায়, তেমনি সেই যাওয়ার ভেতরই গানটাও অবধারিত এসে যায়। কাজে-কাজে অবিচ্ছিন্নতার সেই গানে এত বিরহ আসে কোথা থেকে?

বাথান বাথান করিসেন মইষাল রে-এ-এ
(অ তোর) বাথান করিলেন ঘর
বাথান হইলেন আউলা-ঝাউলা রে-এ-এ
(অ তোর) বাথান ভরা গোবর।
অ মোর মইষাল বন্ধু রে-এ-এ—

বাঘারু সুর টান করে রাখে। বাঘারু নিজেই মইষাল, নিজেই তার বিরহিণী নায়িকার গান গায়—এখন দুধের গাড়ির জন্যে ডায়না ব্রিজের ওপর অপেক্ষার সামান্য সময়টুকুর সকালে। হাঁটা বা কথা শেখার মত করে এইসব গান জানা হয়ে গেছে—এমন সময়ে গাওয়ার জন্যে। মইষালনির এই বিরহ বাঘারুর, বাঘারুই মইষালনি। বিরহ তার, মইষাল বাঘারুর জন্যেই। বাথান বাঘারুর জানা, মোষও বাঘারুর জানা; মইষাল ত বাঘারু নিজেই। এতগুলো জানা দিয়ে আর মইষালনি-হওয়ার না-জানাটুকু পেরতে কী লাগে। বাঘারু তখন না-বাজানো দোতারার ঝোঁকে-ঝোঁকে গাইছে—

বাথানে বারোশ মইষ
ও মোর মইষাল এ্যাকেলা ঘুরেন,
ঘরত্ মোর এই যৈবনখান
কাপড়ে বান্ধি রাখেন।
অ-মোর মইষাল বন্ধু রে-এ-এ—

বাঘারু নিজেই নিজের বিরহিণী।

বাঘারুর গানের উত্তরে, নীচে, চর থেকে ভোখা জোরে-জোরে ডেকে ওঠে। বাঘারু গান থামিয়ে হেসে ফেলে বলে ওঠে, 'শালো'। বাঘারু চুপ করে গেলে ভোখা আরো জোরে ডেকে নীচে থেকে ছুটে ওপরে উঠে এসে ব্রিজটার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে সেই ট্রাকের রাস্তার দিকে তাকায়।

ভোখার দাঁড়ানোর ভঙ্গিতেই সন্দেহ হয়েছিল। বাঘারু থেমে কান খাড়া করে—বহুদূর থেকে ট্রাকের শব্দটা পাওয়া যাচ্ছে। প্রথম দিকে বাঘারু টের পেত না। কিন্তু এখন ত এই ফরেস্টের আওয়াজগুলো চেনা হয়ে গেছে। কোনটা ফরেস্টের ভেতরের আওয়াজ আর কোনটা বাইরের সে-সব এখন একবারেই ধরতে পারে। তাঁর বাঁ-পাশে হৃদয়পুর বস্তি। তার ওপরের ফরেস্টের ওপার থেকে ট্রাক আসার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। আর-কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে।

আওয়াজটা বাঘারুর যত চেনা, ভোখার তার চাইতে কম ত নয়ই, একটু যেন বেশিই। তাই ভোখাই আগে শুনতে পেয়ে ব্রিজের ওপরে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু মোষগুলোরও বোধহয় চেনা। সামনের মোষদুটো মাথাটা কেমন বাতাসে তুলেছে, যেন গন্ধ শুঁকছে, ওদের গলকম্বলটা টানটান হয়ে ওঠে।

বাঘারু তখনো দাঁড়ায় না। এখনো দেরি আছে। ট্রাকটা এখান থেকে মাইল কয়েক দূরে এই রাস্তার ওপর উঠে এই দিকে বেঁকবে। একটু আগে আওয়াজটা পাওয়া গিয়েছিল কারণ, ওদিকের রাস্তার একটা জায়গা এই কোনাকুনি—হৃদয়পুর বস্তি, একটা ছোট জলা ও ঐ দিকের পাতলা জঙ্গলটা পেরিয়ে—সোজা। আওয়াজ আসার পথে কোনো বাধা নেই। কিন্তু তার পরই আওয়াজটা বন্ধ হয়ে গেছে। এর পর আবার আওয়াজ শোনা যাবে, ট্রাকটা যখন এই রাস্তায় উঠবে। তখন অবিশ্যি আওয়াজটা ক্রমেই বাড়ে। প্রতিধ্বনিও হয় চার পাশ থেকে। যে-ভূগোল বাঘারুর দেখা নেই, আওয়াজ শুনেই সে সেটা ছকে নিতে পেরেছে।

সেই আওয়াজের পেছন-পেছন ট্রাকটা এসে প্রায় এই ব্রিজটার ওপর পৌঁছয়। ট্রাকটার থামা, দাঁড়ানো ইত্যাদি ভোখা ও মোষগুলোর এত বেশি জানা যে ট্রাকটা অত জোরে আসছে দেখেও ওরা ব্রিজ থেকে নড়ে না। একটু সরে যায় মাত্র।

ভোখা বহু আগে থেকেই ট্রাকটার দিকে তাকিয়ে ডাকছিল। ট্রাকটা যত কাছে আসছিল, তত জোরে ডাকছিল। শেষে ট্রাকটা যখন থামল, তখন ভোখা ডাকতে-ডাকতে ট্রাকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রায়।

ড্রাইভার ও দুধের লোক, সামনে থেকে একজন আর পেছন থেকে একজন, নেমে এলে ভোখা চিৎকার থামায়। তাও ব্রিজটার রেলিঙের কাছে গিয়ে আচমকা ডেকে ওঠে।

মোষদুটো সামনে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়াচ্ছিল। ট্রাকটা থেমে যাওয়ার পর ওরা ব্রিজের ওপর নেমে যায়, দুটোই প্রায় একসঙ্গে। তার পর, ঢালের দিকে চলে যায়, যেখানে অন্য দুধিয়াল মইষানিগুলোকে ঠিক করে রেখে এসেছে বাঘারু।

ট্রাকটা এসে দাঁড়াতেই সেই পাইপটা নিয়ে একজন এগিয়ে আসে। এখন ত বাঘারুই শিখে গেছে। তাকে দুধের লোকটি পাইপটা ধরিয়ে দিলেও কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকে।

'লেও, পেট্রল চালাও' লোকটি হেসে বলে।

বাঘারু না-নড়েই হেসে জবাব দেয়, 'মোর প্যাটরল্‌খান দ্যান আগত।'

'ওঃ জরুর, জরুর।' লোকটি তার প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট দিতে-দিতে বলে, 'আচ্ছা, তোমাকে আমি একটা প্যাকেটই দিয়ে যাব, ব্যস, তা হলে তোমার রোজ পেট্রল লাগবে না।'

'পাকিট ? কিসের পাকিট ?'

'এই। তোমার পেট্রলের।'

ড্রাইভার দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে, 'যা বাবা, তাড়াতাড়ি কর্। এ পুরো ট্রিপ ঘুরে আসতেই ত বেলা দশটা বাজবে।' ড্রাইভার বেলিঙের ওপর থেকে ঝুঁকে নীচের ডায়না দেখে।

'মোক পাকিট দিবেন ? পুরা একখান ? সিগরিটের ?'

'হাঁ পুরা পেটরোল।' বাঘারু একটা সিগারেট বের করে নিয়ে প্যাকেটা আটকানোর চেষ্টা করে। কিন্তু হাতের মুঠোয় সিগারেটটা দুমড়ে না ফেলে বাঘারু ঐ কাগজের প্যাকেটটা আটকাবে কী করে ? ফলে, তার যেন একটু বিহ্বলতাই আসে, বাঁ হাতে সিগারেট আর ডান হাতে প্যাকেটটা নিয়ে। লোকটি এগিয়ে এসে দেশলাই দিলে বাঘারু একটা সমাধান পায় বটে প্যাকেটটা খোলা অবস্থাতেই তাকে ফেরত দেয়ার, কিন্তু সেখানেও, দেশলাইটা আগে নেবে, না, প্যাকেটটা আগে দেবে এই নিয়ে আর-এক বিহ্বলতা দেখা দেয়। লোকটি ততক্ষণে দেশলাই থেকে কাঠি বের করে নিজেই জ্বালায়। সে যে এ-রকম জ্বালাবে, তার জন্যেও বাঘাক তৈরি ছিল না। ফলে, সে তার সিগারেটটা অত তাড়াতাড়ি মুখে দিতে পারে না। কাঠি নিবে গেলে লোকটি আব-একটি কাঠি জ্বালায়। ততক্ষণে বাঘারু সিগারেট ঠোঁটে দিতে পারে। আগুনের শিখাব ওপব নত হতে-হতে বাঘারু বোঝে বাতাসে কাঠিটা আবার নিভবে। তখন একসঙ্গে সে একটা জটিল প্রক্রিয়ায় সমাধান ঘটায়—পিঠ দিয়ে বাতাস ঠেকানো, হাত বাড়িয়ে খোলা প্যাকেটটাই ফেরত দেয়া আব শিখার ওপব নত হয়ে সিগারেট ধরানো।

সিগারেটটা ধবানোব জন্যে বাঘাক যে-টান দেয তাতে, ধরাতে গিয়েই সিগারেটটা একেবারে, শেষ হয়ে যেতে পারে যেন। সিগারেট ধরে যাওয়া ও দেশলাই কাঠি নিবে যাওয়াব পবও তাব টান চলতে থাকে। আব, তার পর, শ্বাস বন্ধ করে ধোঁযাটা ভেতরে নিয়ে সে যখন ছাড়ে, তখন মনে হয়, তাব মুখেব ভেতরে ছোটখাট উনুন আছে। ধোঁয়া বেরনো শেষ হওয়ার আগেই বাঘারু আব-এক টান দেয়। ড্রাইভার হেসে বলে, 'তোর এই টান দেখে ত আমাদের দম বন্ধ হয়ে যায় বাবা।'

বাঘারুর চোখ তখন সিগাবেটেব নেশায় বন্ধ।

পঁচাত্তর

শহুরে কিছু প্রক্ষিপ্ত

ট্রাকটাব ওদিকে ক্লিনারটা তখন ভোখাব সঙ্গে খেলা জুড়েছে। ভোখার নাকের সামনে কী একটা দোলাচ্ছে। ভোখা সেটা ধবতে গেলেই, সবিয়ে নিচ্ছে ভোখার পিঠের ওপবে। ভোখা নিজের মুখ নিজের পিঠের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে গোল হয়ে লাফাচ্ছে আর লাফাতে-লাফাতে, গোল হতে-হতে মাটিতে শুয়ে পড়ছে। ছেলেটি তখন হো হো হেসে উঠছে। তার হাসিতে, ও ঐ লাল জিনিশটার দোলা

বন্ধ হওয়ায়, ভোখা তার খেলা ছেড়ে কুকুরের সব চেয়ে চেনা ভঙ্গিতে সোজা হয়ে মাটিতে বসে। ক্লিনারটি ড্রাইভারকে বলে, 'শালা, ভাল কোয়ালিটির জিনিশ দাদা। কোথা থেকে পায় এই সব ? বলব, একটা ধরে রাখতে ?'

'ফরেস্ট থেকে নিবি ত একটা বাঘটাঘ নে। ফরেস্ট থেকে কেউ কুত্তা নেয় ? বোকা', ড্রাইভার নদীর দিকে তাকিয়েই বলে।

'আমার দাদা খুব শখ একটা অ্যালসেসিয়ানের। মালবাজারের বকুলদা বলেছে একটা দেবে।'

'কোত্থেকে ?'

'তা জানি না। তবে বকুলদা ভাই লিডার লোক। ও ঠিক কোনো বাগান থেকে জোগাড় করে দেবে।'

'ঐ আশাতেই থাক। ব্যাটা, অ্যালসেসিযানেব একটা বাচ্চার দাম জানিস ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ জানি।'

'তোর চাইতে বেশি।'

'বেশি ত বেশি।'

'তেমন জিনিশ পেলে, বকুল মিত্তিব তোকে দিতে যাবে কেন ?'

'মাঝরাত্রিতে যখন গাড়ি নিযে বাগানে যেতে হয়, তখন তুমি যাবে ?'

'আমি যাব কেন ? আমাব অ্যালসেসিযানও দবকব নেই, যাওয়ারও দবকার নেই। তুই কি ঐ সব শুরু কবেছিস নাকি ?'

'কী ?'

'বকুল মিত্তিবের সঙ্গে গাড়ি নিযে যাস ? রাত্তিবে ? গাড়ি পাস কোথায় ?'

'গাড়ি ত বকুলদাব নিজেরই আছে। অত বাত্তিরে চালানোব লোক পায না। আমি একবারই গিযেছিলাম।'

'তুই ত গাড়ি চালানোব লাইসেন্স পাস নি, এখনো, তাব মধ্যে গাড়ি নিয়ে রাত্তিরে ? যাস না।'

'বকুলদা বলেছে আমাকে একটা আলসেসিযানের বাচ্চা দেবে।'

'জেলে বসে অ্যালসেসিযান পুষিস ?'

'কেন ?'

'বকুল মিত্তিব রাত্রিতে গাড়ি নিযে মার্ডাব কেস পর্যন্ত কবে তা জানিস ?'

'কে বলল ?'

'তোব তা দিয়ে দবকাব কী ? ও-বকম বাতবেবাতে যাস না।'

ছেলেটি একটু চুপ কবে থাকে। একটা কুকুবেব কথা থেকে যে এতটা এ·· যাবে, সে ভাবে নি। তাই ভেবে নিতে তাকে একটু চুপ কবেই যেতে হয। বোঝা যায না, অ্যালসেসিযান কুকুর না-পাওয়ার দুঃখ, আব বকুল মিত্তিবেব সঙ্গে বাত্রিতে গাড়ি চালানোব বিপদ—এই দুটোর মধ্যে কোনটাতে সে বেশি চিন্তিত। ছেলেটা এই কথা থেকে সবে যেতেই যেন ব্রিজেব মাথার দিকে হাঁটতে শুরু করে। কিন্তু কয়েক-পা গিয়েই ফিরে আসে। ছেলেটিব সঙ্গে কথা বললে-বলতে ড্রাইভার রেলিঙে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল। ছেলেটি তাব কাছে গিযে জিজ্ঞাসা করে—'বকুলদা ত আমার থাকার জায়গাটা চিনে গেছে।'

'কী হয়েছে ?'

'যদি পবে আবার আসে ?'

'বলে দিবি, যাবি না।'

'বাঃ, আগেব দিন গেলাম যে—'

'বলিস, আমার লাইসেন্স নেই, বোজ-বোজ যাব না।'

'মারলে ?'

'খাবি—'

বকুলদা তাকে আলসেসিয়ান দেবে এই থেকে, বকুলদা তাকে মাঝরাত্রিতে ধরে মারবে, আর সে মাব খাবে—এই সত্যটা মেনে নেয়াব ভেতব নিজেকে ও নিজের চার পাশকে উল্টে দেখতে হয়, মাত্র

এই সময়টুকুরই ভেতর। এই ছেলেটির পক্ষে সেটা এতই কষ্টকর যে সে সেটা সহজতম করে নেয়। বকুলদা তাকে মারবেই, নিদেন একখানা চড়, এটা সে জানে। আর তাই এই মুহূর্ত থেকেই সেই চড়টা খেতে শুরু করে। পেছন থেকে ড্রাইভার আবার ডাকে, 'এ-ই।'

ছেলেটি দাঁড়িয়ে ঘুরে তাকায়।

'শোন্।'

ছেলেটিকে আবার ফিরে যেতে হয়। ড্রাইভার রেলিঙের ভর ছেড়ে সোজা হয়ে বলে, 'শোন্। বকুলবাবু এর পরে কোনোদিন এলে বলবি তোকে থানার দারোগা খুব মেরেছে লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি চালাস বলে, আর জিগগেস করেছে বকুলবাবুর গাড়ি চালাস কিনা। শুধু এইটুকু বলবি। তা হলে দেখবি তোকে আর নেবে না।'

'দারোগার কথা বলব ?'

'হ্যাঁ, ঐ বলবি, দারোগা তোকে বকুলবাবুর কথা জিগগেস করেছে।'

এবার ছেলেটি দুধদোয়ানোর জায়গাটার দিকে যায়। তার হাতে লাল রুমালটা ছিলই। সেটা একবার লোফে। দেখেই ভোখা লাফিয়ে তার সামনে চলে আসে। কিন্তু সে আর ভোখার সঙ্গে খেলে না।

ছিয়াত্তর

দুধ-দোয়ানো

প্রথম দিন পাইপ দিয়ে দুধ দোয়ানো শিখতে বাঘারুর তিন-চার মোষ লেগেছিল। পরে বোঝা গেল, শিখতে গিয়েই সে হাঙ্গামা বাধিয়েছে। আসলে শেখার কিছুই নেই, এমনই যন্ত্র যে লাগিয়ে দিলেই হয়ে যায়। হাতের মত একটা রবারের পাতা। তাতে হাতের পাঁচ আঙুলের বদলে একটু ফাঁকে-ফাঁকে চার আঙুল। আঙুলগুলোর মাথা খোলা। মোষগুলোর বাঁটের ভেতর একটু ফাঁক করে ঢুকিয়ে দিতে হয়, বেলুনের নাখান'। তারপর, ঐ ট্রাক থেকে ত পাম্প হতেই থাকে। আর, দুধের মানষিটা ড্রাম ভরতে থাকে। পাইপটা, কাচের মত প্লাস্টিকের। ভেতরটাতে, দেখাই যায়, দুধ পাইপটা ভরে চলে যাচ্ছে। যেন দুধটা জলের মত জিনিশ না, গড়ায় না। যেন, দুধটা শক্ত জিনিশ। এই বাঁট থেকে ঐ ড্রাম পর্যন্ত লেগে আছে। ঐ যে, ট্রাকের ওপর কী-একটা পাম্প করে, তাতে, বাঁটের ওপর লাগানো ঐ বেলুনের মত জিনিশটা একবার চিপে ধরে, আর-একবার ছেড়ে দেয়, ঠিক আঙুল দিয়ে দোযানোর মত।

প্রথম-প্রথম বাঘারু একটা মোষের বাঁটে পাইপ লাগিয়ে তার পরের মোষটার বাঁট একটু টানাটানি করত, দুধটা নিয়ে আসতে। এখন তাও করে না। বাছুরের চোষাতেই এসে যায়।

বাথানে বাছুর থাকে না। কারণ, টাড়িতে বাছুরের কাজ অনেক বেশি থাকে। কিন্তু বাছুর না-দেখলে, আর মাঝে-মাঝে বাছুর না-টানলে, আর মাঝে-মাঝে বাছুরের পিঠ না-চাটলে মোষের দুধ আসা বন্ধ হয়ে যায়। সে কাজ একটা বাছুরই করতে পারে। কিন্তু একটা বাছুর এতগুলো বাঁট চুষলে তার চোয়াল আটকে যাবে। আর, এতগুলো মোষ মিলে একটা বাছুরকে চাটলে তার চামড়া উঠে যাবে। তাই চারটি বাছুর বাথানের সঙ্গে থাকে।

ব্রিজের মাথায় বাঘারু রাস্তার ওপরেই বসেছে। এতে কাজের একটু অসুবিধে হয়। ওদিক থেকে একটু চড়াই হয়ে মোষগুলোকে ওপরে উঠতে হয়। অনেক মোষ তা করতে চায় না। নীচেই দাঁড়িয়ে থাকে। কোনো-কোনো মোষ আবার ঘুরে পেছনে চলে যায়। ওদিকে যদি কেউ থাকত, তা হলে এখানে বসে কাজ করাই সুবিধে—তলা থেকে পাঠিয়ে দিত, এখানে দুইয়ে নিয়ে, বাঘারু আবার তলায় পাঠিয়ে দিত। ভোখাকে দিয়ে বাঘারু খানিকটা করায় অবিশ্যি, মোষগুলোও ভোখার কথা শোনে। কিন্তু যদি কেউ গড়বড় করে তা হলে মোষ-ভোখা এই সব নিয়ে একটা হুলস্থূল কাণ্ড। সেই জন্যে বাঘারু ভোখাকেও বড় একটা ডাকে না। এই বড় রাস্তার ওপর বসে বাঘারু যে-কটাকে হাতের কাছে পায়, দুইয়ে নেয়। তার পর, একবার উঠে গিয়ে বাকিগুলোকে তুলে নিয়ে আসে। মুশকিল হয়, তখন যদি

কোনো মইষানিকে খুঁজে পাওয়া না যায়। এই জায়গাটার এটাই সুবিধে যে এদিক-ওদিক আলগা হওয়ার সুযোগ কম।

সারা দিনের ভেতরে একমাত্র এই দুধ-দোয়ানোর সময়টাতেই ত পুরো বাথানকে একটা কাজ শুরু আর শেষ করতে হয়। তাই এই সময়টাতে বাথানের ভেতর এমন একটা ভাব আসে যা সারা দিনে অন্য কোনো সময় ঘটে না। এখন দুধিয়ালগুলো সব চেয়ে আগে, তারা জানে একটার পর একটা গিয়ে দুধ দিয়ে আসতে হবে। বাথানের বাছুরগুলোর খিদে কম। বা দুধের খিদে বিশেষ কিছু আর বাকি থাকে না। এতগুলো বাঁট। প্রত্যেক বাঁট একবার করে চুষলেই চারটি বাছুরের পেট ঢাক হয়ে যায়। ফলে মইষানিগুলোর বাঁট ফুলে বোধহয় ব্যথাও করে। পাম্প করে যে দুধটা টেনে নেয় তাতে নিশ্চয়ই শরীরে একটা আরাম ছড়িয়ে পড়ে। তাই মইষানিরা যখন বুঝে যায় যে এবার দোয়ানো হবে তখন তারা কাছাকাছিই থাকে, যেন চায়, দোয়ানোটা একটু আগে হোক।

আর বাছুরগুলো ত আর খিধেয় জ্বালায় চাটে না। বাঁট টানার নেশা ত দুই-চার বাঁট টানলেই মিটে যায়। তার পর ঐ চারটি বাছুর মিলে পুরো লাইনটাতে গোলমাল বাধায়। এই দুধিয়ালের পেছনে মাথা ঢোকায়, আর-এক মইষানির পেটের তলায় ধাক্কা দেয়। এমন ছুট লাগায় যেন সামনে কোনো বাধা নেই। তার পর কোনো কিছুতে লেগে পড়ে যায়। আবার গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে, ছোটে।

বাছুর আর দুধিয়াল ছাড়া এই সময় অন্য মোষদের ত কোনো কাজে থাকে না। তাদের কেউ-কেউ, বিশেষত বুড়িয়াল, বলদখান আর দু-একটি বুড়ি মইষানি তলাতেই থাকে। কিন্তু ছোকরাছুকরি মোষগুলো কিছুটা এই রাস্তার ওপর উঠে আসে, আর, কিছুটা ছড়িয়ে যায় আশেপাশে। পিচের রাস্তার ওপর দিয়ে মোষগুলো চলতে গেলে পা ভেঙে যায়। সেই জন্যেই মোষগুলো দাঁড়িয়ে থাকে রাস্তার ওপর, কিন্তু হাঁটে রাস্তার পাশ দিয়ে।

বাঘারুর মাথা এখন মোষের পেটের তলে। আর এইখানে বসে-বসে সে পেটের তলা দিয়ে-দিয়ে অনেকখানি দেখতে পায়। পেচ্ছাব আর গোবরের গন্ধটা নাকে বেশি লাগার কথা, যদি বাঘারু ঐ গন্ধগুলোকে আলাদা করে চিনতে পারত। এখন, সেই গন্ধের মধ্যে এক বাঁটে পাইপ লাগিয়ে সে পরের বাঁটের দিকে হাত দেয়। হাত দিয়েই বোঝে বাছুরের চাট পড়েছে কি পড়ে নি, শক্ত না নরম, শুকনো না ভেজা। বাঘারু জিভের টাকরায় অন্য-রকমের আওয়াজ তোলে। আর দু-একটা বাছুর চলে আসে। বাছুরের ঘাডটা ধরে বাঘারু বাঁটের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। বাছুর বাঁট থেকে মুখটা সরিয়ে আনতে গেলে বাছুরের কানটা ধরে কাত করে। তারপর এক হাতে বাঁট আর-এক হাতে বাছুরের মাথা ধরে কাছাকাছি টেনে আনে। যার বাঁট নিয়ে টানাটানি সেই 'দুধিয়াল' জিভটা বের করে একটু গা চাটতে চায়, পায় না। ডান থেকে বাঁয়ে ঘাড ঘোরায়। বাঁটে টান পায়। তৃপ্তি জানানোর আর-কোনো উপায় না পেয়ে দুধিয়াল একটা লম্বা আঁ-আঁ-আঁ ডাক ছাডে তার স্তন্যের সেই পায়ীর জন্যে যে-এখন তার স্তনলগ্ন। দুধিয়ালটার পেছনের পা দুটো একটু ফাঁক করা—যাতে ভাল ভাবে টানতে পারে। এর ভেতর আগের মোষটার দোয়ানো শেষ হয়ে গেলে বাঘারু বাঁ হাতে সেই পাইপটা খুলে, ডান হাতে বাছুরটাকে বাঁট থেকে সরিয়ে পাইপটা লাগিয়ে দিতে যায়। বাঁটে একবার অনিচ্ছুক মুখ লাগালেও বাছুর আর মুখ সরাতে চায় না। বাঘারু এক ধাক্কায় সেটাকে সরায় ও পাইপটা লাগায়। দুধিয়াল পেছনের পা দুটো ফাঁক করেই থাকে। আর পাইপের ভেতর দিয়ে আসা স্পন্দিত টান বাঁটে বোধ করতে-করতে তার তৃপ্তি জানানোর জন্যে একটা লম্বা আঁ আঁ আঁ ডাক ছাড়ে তার স্তন্যের সেই পায়ীর জন্যে যখন সে আর তার স্তনলগ্ন হতে পারে না। দুধিয়ালের সব চেয়ে আরামের সময় এইটাই, যখন তার বাঁটে টান পড়ে তার শরীরের ভার হালকা হয়ে যায়। বাঘারু তার দুই কর্কশ হাতে তার তল পেটটা হাতিয়ে দেয়, গলাটায় সুড়সুড়ি দেয়, পেটের ভেতরটা চুলকে দেয়। দুধিয়ালটার পেছনের পা বেয়ে শিহরণ খেলে যায়। তার পিঠের চামড়াও চমকে-চমকে ওঠে। একবার পেছনের বাঁ পা মাটিতে ঠোকে। বাঘারু এতক্ষণে পরের দুধিয়ালের বাঁটে হাত দিয়ে দেখে নেয় বাছুরের চাট পড়েছে কি. না।

এ-রকম দুধ দুইতে আব কতক্ষণ লাগে। বাঘারু ট্রাকটার কাছে এসে দাঁড়ায়। সেই লোকটি একটা কাগজের পেছনে বাঘারুর টিপসই নেয়। টিপসই-এর স্ট্যাম্পপ্যাড তার পকেটেই আছে। সেই কাগজে কী হিশেব লেখা আছে আর বাঘারু তাতে কী টিপসই দিল—সে কোনো কিছুই ত বাঘারুর পক্ষে জানা সম্ভব নয়। সে এটা বোঝে কত দুধ দোযানো হল তাবই একটা রশিদ ওটা—কনট্রাক্টার জোতদারকে

দেবে। মাসের শেষে ঐ কাগজ দিয়েই হিশেব হবে। এ ত আর দু-চার সের দুধের ব্যাপার না, যে, এক পোয়া আধ পোয়া হিশেবের গোলমাল হবে। প্রত্যেক দিনই একই সংখ্যক মোষের দুধ একটা পরিমাণেরই হওয়ার কথা। এর মধ্যে দিন তিনেক বাঘারু একটা দুধিয়ালকে দোয়ায় নি। বাঁটে ঘা হয়েছিল। সেই কয়েক দিন বাঘারু ঐ রশিদের পেছনে একটা দাগ দিতে বলেছে। তার নীচে সে টিপসই দিয়েছে। সে মুখে বললে দেউনিয়া না-ও বিশ্বাস করতে পারে। কিন্তু অবিশ্বাসই বা করবে কেন? একটা মোষের দুধ না-দুইয়ে বাঘারু করবেটা কী?—'খাবে? কত খাবে বাঘারু? বেচিবে? কাক বেচাবে? পাহাড়ক?' তা ছাড়া কনট্রাক্টরের লোকটা ত রোজকার হিশেব বুঝে নেয়। সে দেখবে না যে কটা মোষ দোয়ানো হল, কটা বাদ গেল, কেন গেল। কিন্তু সে-সব ত 'কাথার কাথা। বাঘারু একখান দাগ দিয়া টিপসই দিছে যে একখান তারিখ দোয়া হয় নাই—।'

দুধ নিয়ে ট্রাকটা সোজা চলে যায়। ড্রাইভার আর সেই লোকটা হাত বাড়িয়ে বাঘারুকে বিদায় জানায়। ট্রাকের পেছনে ডালার ওপরে সেই ক্লিনার ছেলেটা বসে। তার দিকে তাকিয়ে ঘাড় উঁচু করে ঘেউ-ঘেউ করতে-করতে ভোখা ভুকতে-ভুকতে যায়। ছেলেটির লাল রুমাল এখন তার দাঁতে চেপে ধরা। সে ভোখার ডাক শুনতেই পায় না যেন, কেমন উদাসীন মুখ ঘুরিয়ে নেয়। ভোখা, ডায়না ব্রিজ, এই মোষের পাল, বাঘারু ফরেস্ট ও পাহাড় থেকে সোজা, যেদিকে ট্রাক চলেছে, সেই দিকে। এই সকালের আলোয় তার চোখে এখন মধ্যরাত্রির গোপন হত্যা লেগে গেল?

ট্রাকটার চলে যাওয়া বাঘারু আর মোষগুলো দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখে। বেশ অনেকক্ষণ দেখা যায়, এরোপ্লেনের মত ছোট হয়ে মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত। তার পরেও আওয়াজটা শোনা যায়। এদিকে পাহাড়, বন, নদী, চা-বাগান। সুতরাং এই ছোট ট্রাকের এত আওয়াজ এই সব নানা জায়গার ওপর দিয়ে, ধাক্কা খেয়ে-খেয়ে গড়িয়ে, প্রতিধ্বনিত হয়, চার পাশের আরো নানা আওয়াজের সঙ্গে মিশে-মিশে যায়।

সারা দিনের মধ্যে এই কাজটা সব চেয়ে দরকারি। আর সারাদিনের ভেতর এই একবারই ত এতগুলো লোকের মুখ দেখতে পায় বাঘারু। বাঘারু ছাড়া অন্য লোকের মুখ দেখতে পায় এই এতগুলো মোষ। তাই, তারা চলে গেলে কিছুক্ষণের জন্যে এমন একটা ভাব আসে যে আবাব আগামীকাল সকালে এই কাজটা করতে হবে। কিন্তু সে ভাবটা এতই কম সময়ের জন্যে আসে যে আওয়াজটা মিলিয়ে যাওয়ার আগেই মিলিয়ে যায়।

বাঘারু ব্রিজটার রেলিঙের পাশে বাঁধানো উঁচু জায়গাটায় বসে। সে ত এই কাল কুচকুচে বাঁধানো রাস্তা আর শাদা ফটফটে বাঁধানো ব্রিজে দিনে একবারই আসে। তাই তার মনে হয়, যেন অনেক দূরে এসেছে।

এই যে বাঁ থেকে ডাইনে রাস্তাটা এত পরিষ্কার চলে গেছে বনটাকে দুই ভাগ করে, তাতেই কেমন গোলমাল লাগে। যেন কোনো একটা দিক আটকা পড়ে গিয়েছিল, এই রাস্তাটা সেই দিকটা খুলে দিয়েছে। যদিও এই রাস্তা দিযে তাকিয়েও দিগন্ত দেখা যায় না, তবু বাঘারু বোঝে এই রাস্তার দু পাশে দুটো দিগন্ত আছে।

বাঘারু যেখানে আছে ডায়নার সেই বনে দিক বা দিগন্ত নেই। এক আকাশ আছে, আর মাটি আছে। বাঘারু যে এ-সব খুব ভাল মত বোঝে তা নয়। কিন্তু এই ব্রিজেরই তলায়, বা সামনের ফরেস্টে, বা পেছনের চরে, চব্বিশ ঘণ্টা থাকা সত্ত্বেও সকালে এই কিছুক্ষণের জন্যে এই রাস্তায় আর ব্রিজে এসে বহু দূরে কোথাও এসেছে বলে তার মনে হয়। যা কিছু আমাদের অভ্যাসের বাইরে তাই ত দূর।

সাতাত্তর

বাথান : কায়ও কারো না, সগায় সগার

বাঘারু এখন বাথান নিয়ে ডায়না ফরেস্টের ভেতর।

সেই বুড়িয়ালের ওপর বাঘারু শুয়ে। বুড়িয়াল দুলে-দুলে চলে। আর বুড়িয়ালের পিঠে বাঘারুও দোলে। দুলতে-দুলতে বাঘারু ফরেস্টটাকে উল্টো দিক থেকে দেখে—যেমনটা এমনিতে দেখা যায়

না। যেন, এই গাছের পাতার ফাঁকফোকর দিয়ে যে আকাশটা 'ছিটিয়াল' দেখা যায়, সেই আকাশটাতে গাছগুলোর পাতা-ডাল পোঁতা আর শেকড়কাণ্ড এই সব ওপর দিকে তলা। বাঘারু ত মাটির ওপরের জঙ্গলটা দেখতে পায় না। মাথার ওপরের গাছের পাতার গোল ছাউনি অনেক ওপরে। মাঝখানে নানা মাপের নানা গাছের পাতা ছড়ানো আছে বটে কিন্তু কোনো সময়েই তা মাটির জঙ্গলের মত ঘন নয়। বাথান নিয়ে বাঘারুর বেলা এমনই অলস কাটে এই ফরেস্টের ভেতর, যে সে ফরেস্টটাকেও সোজা দেখে না।

বুড়িয়াল একটা ছোট হাতি-সাইজের মোষ—বুড়ি কাছার পাড়ি (বিরাট, বুনোটে, স্ত্রী মোষ)। ওর আর বাচ্চা হবে না। দুধ দেয় না। এমনি কোনো কাজে আসে না। কিন্তু বাথানে এমন একটা পাড়ি না থাকলে, সে বাথান ত বাথানই নয়। টানা খাড়া শিং। ফরেস্টের ভেতর যখন চলে নিচু লতা-পাতা ডালপালা সেই শিঙে লেগে যায়। শিং দুটো তুলে সামনে দাঁড়ালে মনে হয়, ছোট সাইজের কোনো বাঘকে গুঁতিয়ে দুই শিঙে গেঁথে ঘুরিয়ে ফেলে দিতে পারে। গায়ের লোম লালচে। দুই চোখের মাঝখানে এতটাই জায়গা যেন ডায়না নদী বয়ে যেতে পারে। পুরোপুরি লম্বা হওয়ার আগেই মুখটা থেতলে গেছে। একবার হাঁ করে জিভ নাড়লে কাঠাখানেক জঙ্গল সাফ করে দেবে। কপালের দু পাশে চোখ দুটো নাক থেকে এত তফাতে যেন সব সময়ই একসঙ্গে দুটো জিনিশ দেখছে। একটা জিনিশই দুই চোখ দিয়ে দেখার জন্যে লাল চোখ দুটোর মণি ঘুরপাক খেয়ে নাকের পাশে চলে আসে। হাতির পাল, বা বাঘ, বা ওইকিয়া (একা) গুণ্ডা হাতি যদি এসে দাঁড়ায় তাহলে পুরো বাথানের মধ্যে এক এই বুড়িয়ালই খাড়া শিং আর পুরো বুক তুলে দাঁড়াতে পারে। বাঘারু দেখেছে, ঐ রকম করে যখন দাঁড়ায়, তখন তার গলার নীচে সামনের দুই পায়ের মাঝখানে এতটা জায়গা খুলে যায় যে পুরো বাথানটাই সেখানে ঢুকে গা বাঁচাতে পারে।

'এই বাথান ত কিনি-কিনি বনাইছে দেউনিয়া। এই বাথানের কুনো মইষ কুনো মইষের কায়ও না। কিন্তুক দেখিলে মনত খায়, সগায় বুঝি বুড়িয়ালের বাচ্চা। কায়ও না। কিন্তু বুড়িয়াল যখন খাড়ি যায়, স্যালায় মনত খায় কি, তামান মইষ ঐ বুড়িয়ালের প্যাটতঠে বাহিরত আইচচে।'

বাথানে যেমন বুড়িয়াল আছে—'কায়ও ওর বাচ্চা না-হয়, ও সগারই মাও'—তেমনি আবার দু-দুটো বুড়ো মোষ আছে, যেগুলো আগে বাপ-মহিষ ছিল, এখন বুড়ো ও বাতিল হয়ে আছে।

'—কুনো মইষানির প্যাটত ও বাচ্চা দিবার পাবে না—', তবু বাথানে থাকে। এমন বাতিল ও বুড়ো মোষ দেখলে মনে হয় বাথানটা যেন এই ফরেস্টের গাছগুলোর মতই পুরনো। ফরেস্টের ভেতরে যেমন বুড়ো জন্তুও থাকে, চ্যাংড়া জন্তুও থাকে, বাথানেও তেমনি। এটাও ত কিনতেই হয়েছে দেউনিয়াকে। এই সব মোষের দাম কম। কিন্তু বাথানে রাখতে হয়। কোনো-কোনো সময় ত কাজেও লাগে। যদি ফরেস্টের মধ্যেই কোনো বড় শালগাছ পড়ে থাকে—দড়ি বেঁধে এই সব মোষের গলায় বেঁধে দিলে সেটা টেনে রাস্তার কাছে নিয়ে যায়। আর, একটা শালগাছ যদি বেচে দেয়া যায়, তা হলে বাথানের দুধবেচার আর দরকার নেই। এখানে, এই ডায়না ফরেস্টে তার সুবিধে নেই। পহাড়ি জায়গায় গাছ টেনে নেয়া মুশকিল। টেনে নিয়ে গেলেও রাস্তার ধারে কোন ট্রাকে তুলবে? এখানে আর সারা দিনে কটা ট্রাক যায়? সে-সব সুবিধে লাটাগুড়ি-ওদলাবাড়ির দিকে। কিন্তু গয়ানাথের এই বাথান যে আগামী বছরেও এখানেই থাকবে, তা কে বলতে পারে? বা, তেমন হলে ত এই বুড়ো মোষটাকেই গয়ানাথ লাটাগুড়ি ওদলাবাড়ির কাছে নিয়ে যেতে পারে। সেখানে একটা চোরাই শালগাছ রাস্তার পাশে ফেলে রাখলে বেচতে আর কতক্ষণ লাগে? তাই বাথানে এই দু-দুটো বুড়ো মোষ—'কায়ও উমরার বাচ্চা না-হয়, উমরায় সগার বুড়া বাপ।'

বাছুর চারটে ত আছেই—নইলে বাঁট চেটে দুধ আসবে কোত্থেকে। এ চারটে বাছুরের কোনোটাই হয়ত এ বাথানের নয়। হয়ত বাছুরও দেউনিয়া কিনে এনেছে। বা, হয়ত বাড়িতে তার যে-মোষগুলো আছে তাদেরই বাছুর এই কটি। এখন বাথানে পাঠিয়েছে। বাথানে মোষ তাড়াতাড়ি বাড়ে। বাথানে বাচ্চা হলে দেউনিয়া নিয়ে যায়। বেশি বাছুর রাখার চাইতে বেচে দেওয়ায় লাভ বেশি। শুধু নিজের বাথানটা যাতে ভরে ওঠে, ভরা থাকে, তার জন্যে যতগুলো বাছুর রাখার, রেখে, বাকিগুলো বেচে দেয়।
'—এই বাছুর গিলান কায়ও বাথানের বাছুর না-হয়, কিন্তু সবগুলা মইষানির এই চারিটাই বাছুর, এই চারিটাই।'

দুধিয়াল মইষানিগিলাই ত বাথানের আসল জিনিশ। 'পুরা বাথানখানই ত উমরার তানে আছে। বাঘারুও ত উমরার তানে আছে। যত খিলায়, দুধ হয় তত ভাল।' কিন্তু দুধ হওয়ার ভেতরেও ত একটা নিয়ম তৈরি করতে হয়। সবগুলো মইষানি যদি একসঙ্গে দুধ দেয়, তা হলে দুধ বন্ধও ত হবে একসঙ্গে। তাই সবার একসঙ্গে বাচ্চা হওয়া চলে না। কিন্তু যেগুলো দুধ দিচ্ছে, তাদের চালু রাখাটাই বাথানের প্রধান কাজ। তেমন-তেমনি বিপদ হলে ত সব মোষ ছেড়ে ঐ কটি মোষকেই প্রথম বাঁচাতে হবে বাঘারুকে। বাথানের সব মোষই দুধিয়াল না, কিন্তু দুধিয়ালরাই বাথানের সব।

'—আজি না-হয় দুধিয়ালক দিয়া চালাছ, কালি কী হবে ? কী হবা পারে ?' কাল কী হবে ? বাথান ত বছরের পর বছর থাকবে, বছরের পর বছর দুধ দেবে। তোমার ত শুধু এখনকার, এই মাসের, বা এই বছরের হিশেব করলে চলবে না। দুধটা ত কোনো দুধিয়ালের একার না। দুধটা ত পুরা বাথানের। তাই যতগুলো দুধিয়াল আছে, ততগুলো, বা তার বেশিই আছে, এমন মাদিমোষ, যাদের প্রথম বাছুর এখনো হয় নি। সেই 'ডবকানি' মোষগুলো বাথানে আছেই বাথান চালু রাখার একমাত্র উপায় হিশেবে। এ সংখ্যা ত প্রায় সব সময়ই হিশেবে থাকে কটা মোষ গাভিন হল, কটা আরো হবে, তাদের বাছুর হবার দিন কবে, কবে থেকে দুধ দেবে, তার ভেতর কটার দুধ বন্ধ হবে, পরের বছর আবার কটা গাভিন হবে।

এই মোষগুলোকে গাভিন করবার জন্যে সঙ্গে আছে একটা 'ওয়ালি পাড়া'। '—সে শালোব ত আর-কুনো কাম নাই, ঘাস খায় আর ঝিমায়, ঝিমায় আব ঘাস খায়। চলিবার বলিলে, ঘুমি-ঘুমি চলে। আর য্যালায় জাগিল অমনি উমরা গিয়া একখান মইষানির পাছত দুইখান পাও তুলি দিল। শালোব ঐ তিনখানই কাম—খাওয়া, ঘুম আর—।' আর বাঘারুকে সাবধানও থাকতে হয় ঐ একটি ব্যাপারেই। সে জানে, এই বাথান কী ভাবে বাড়তে পারে—সংখ্যায় আর দুধে। আব সেই অনুযায়ী 'ওয়ালি পাড়া'কে চালাতে হয়, কখন কার পেটে বাচ্চা বানাবে।

কিন্তু সাবধানতার আর-একটি প্রধান কারণও আছে। বাথানে 'ওয়ালি পাড়া' একটাব বেশি রাখা যায় না। কিন্তু এই ফরেস্টের কাছাকাছি কোথাও অন্য কোনো বাথান থাকতে পারে। তাদের 'ওয়ালি পাড়া' এই দলে এসে ভিড়তে পারে। তাব পব একটা-দুটো মাদি-মোষকে ভাগিয়ে নিয়ে যেতে পাবে। বা, কাছাকাছি কোথাও যদি কোনো 'একোই' (একা) 'খুটা অরনা' (বুনো) থাকে, সে ত এই বাথানের মইষানিদের ভাগিয়ে নিয়ে নিজের দল বানাতে পারে। বাথানে মোষ-মইষানি একসঙ্গে থাকে—একা থাকতে ভয় পায় বলে। কিন্তু সেই সাহসটা যদি অন্য কোনো মোষ তাকে জোগায় তা হলে তাব সঙ্গেও চলে যেতে পারে। '—মহিষ যদি বাথান ছাড়ি পালবার চাহে, কুনো বাথানদারের কুনো খ্যামতা নাই উমরাক ঠেকাবার পারে।' সেই জন্যেই সতর্ক নজব রাখতে হয় কোনো মইষানিব শবীব যদি 'গবম' খায়, সে 'গরম' যেন নষ্ট না হয়।

আবার তার সঙ্গে-সঙ্গে একটা লোভও ত থাকে। তেমন 'গরমের সময়' কোনো মইষানি যদি কোনো 'অরনার' (বুনো মোষ) সঙ্গে ভাব কবে, তা হলে তার পেটে 'দোমাচা' বাচ্চা হয—তাব গায়ের জোব বেশি, দুধ বেশি। বাথানের মইষানি বাথানেই বাঁধা থাক, কিন্তু অবনাব বাচ্চা পেটে ধরুক।

এই ত বাথান—'কায়ও কারো না। সগায় সগার। যাব একোটাও বাচ্চা নাই, সেইলা সগাব মাও। যে-বাছুর গিলার একোটার মা নাই, সেইলা সগার বাছুর। যে-মইষানির এ্যালাযও বাছুব নাই, স্যায বুনাক ধরিবে কিন্তু বাথানও বাখিবে।' আব এ-সব কিছুই গযানাথেব।

এই 'ওয়ালি পাড়া' এই 'কুমারী পাড়া' এই 'অরনা', এই 'দোমাচা', সব গযানাথেব। যে-মোষ এই বাথানে, যে-মোষ ঐ হাটে, যে-মোষ গোয়ালে, সব গয়ানাথেব।

'যায়লার জন্ম হইছে, যাযলাব জন্ম হয নাই, যাযলা জন্মিবে, যাযলা মবিবে', সব গযানাথের।

আটাত্তর

বাঘারুবাড়ি

—সগায় গয়ানাথের। এই ডায়নার জঙ্গলখান গয়ানাথের। হু-ই আপলচাঁদের জঙ্গলখান গয়ানাথের। এই ডায়না নদীখান গয়ানাথের। হু-ই তিস্তা নদীখান গয়ানাথের। ঐঠে জমিগিলান গয়ানাথের। এইঠে জঙ্গলখান গয়ানাথের। এই বুড়িয়াল গয়ানাথের, দুধিয়াল গয়ানাথের, পোয়াতিখান গয়ানাথের। এই বাঘারু মইষ্যালখান গয়ানাথের—'

বাঘারু আকাশময় ফরেস্টের দিকে তাকিয়ে ভাবে। বুড়িয়ালের পিঠের ওপরে চিৎপাত শুয়ে থাকে—দুটো পা বুড়িয়ালের পেট দিয়ে ড্যাং ড্যাং করে নীচে দোলে আর এই ফরেস্টের পাতাগুলোর, মাথাগুলোর নানা নকশা চোখের সামনে-সামনে বদলে-বদলে যায়, পাতাগুলোর ভেতর দিয়ে বহু-বহু ওপরে ছিটিয়াল আকাশ দেখা যায়—বাঘারু গাছের পাতার দিকে তাকিয়ে বুঝে যায়, তারা সেই 'পোরালি বাড়ি'-র (পোড়া বন) দক্ষিণ দিয়ে যাচ্ছে। এখন যদি বাঘারু ডাইনে তাকায়, সেই পোড়া গাছগুলোর লাইন দেখতে পাবে। তার ওদিকে ডাইনাং কি বাইনাং-এর 'ছড়া' (শুকনো নদীখাত)।

'কুনোবার বানায় জল উঠি আসি ঐঠে গাছগিলানক পুড়ি দিছে হয়ত। জলত ক্ষার আছিল্। সেই জলত তামান বনখান মাটিখোলা হয়্যা গেইসে। তার বাদে ফরেস্টের মানষিলা অগুন লাগি পুড়ি দিছে। কেনে ? না, ঐঠে আর নতুন মাটি না-পড়িলে নতুন জঙ্গল গজাবে না। তা পুড়ি দাও। যেইলা বন মাটির আগুনত্ পুড়ি যায়, উমরাক আগুন লাগি পুড়ি দাও। তাই ঐঠে পোরালি বাড়ি—'

কিন্তু এই জাযগাটা ত ভরভরন্ত বন, এই জায়গাটা, যেখানে মোষের পিঠে চিৎপাত হয়ে বাঘারু আকাশেব বন দেখে মাটির বনের হদিশ পায়।

'গয়ানাথ মোক এইঠে পাঠাছে। বাথান কবিবাব। মুই আধি চাহ নাই। মোক বাথান দিছে। এইঠে মোক কাযও খুঁজি পাবেন না। মুইও কাক পাম না। মুই এইঠে আগত আসি নাই রো। মুই এইঠেকার বন চিনি নাই রো। গযানাথ মোক এইঠে পাঠাছে। মোর অচিনা জায়গাটাত্ পাঠাছে। মোক উদাস কবিবাব তানে পাঠাছে—'

বুড়িযাল বাঁ দিকে একটা নালীর মধ্যে সামনেব বাঁ পা দিয়ে ফেলায় বেঁকে যায়। বাঘারু নড়ে ওঠে কিন্তু উঠে বসে না। সে জানে, হেঁটে গেলেও এমন হোঁচট সে খেতে পারত। বুড়িয়াল জানে, বাঘারু তার পিঠে উঠে বাথানে ঘোরে, এটাই বুড়িয়ালের সব চেয়ে বড় কথা। তাই বুড়িয়াল ঠিক সামলে নেবে।

একটু দাঁড়িযে পড়ে বুড়িয়াল। পেছনে বোধহয় একটা ছোট মোষ ছিল। সেটা যখন পাশ দিয়ে যায় বাঘারুর পায়ে ঘষা লাগে। বাঘারু বাঁ হাতটা বাড়িযে মোষটাকে ছুঁতে চায় কিন্তু পারে না।

ততক্ষণে বুড়িযাল পেছনেব পা দুটো সরিয়ে এনে, সামনেব বাঁ পাটাকে তুলে এনে আবার সমান হয়েছে। আকাশজোড়া বনেব দিকে তাকিযে বাঘারুর নিজেকে নিয়ে এমন কিছু একটা কথা মনে আসে, যার ভাষা তাব জানা নেই। তবু তাকে এ-রকম ভাবতে হয়, 'এই বুড়িয়ালটা গয়ানাথের। এই বাঘারুখান গযানাথের। এই জঙ্গলখান গয়ানাথেব। বুড়িযালের পিঠত বাঘারু শুই থাকে। গাছ দেখে। আকাশ দেখে। আর দোলা খায়। দোলা। বুড়িয়ালের নাখান এ্যানং চওড়াকিয়া পিঠ আর-কার আছে ? কায়রো না। কায়রো না।' বাঘারু আকাশেব দিকে তাকিযে বনের গাছগুলো দেখে আর চেনে, এই ঠে কোশল-বাড়ি (হরিতকি গাছেব জঙ্গল) শুরু হয়্যা গেইল। তামান বনত এইঠে শুধু, ধর কেনে পঁচিশ-তিবিশখান কোশল গাছ আছে। আব কোটত নাই। কোনামারা পাতাখান, আর গুলটিমারা ডাটখান। পাতা আর ডাটা সেইঠে মিলে এইঠে একখান ছোট গোল নাখান গুলটি—'

বাঘারু ত নীচ থেকে পাতাগুলো দেখছে, পাতার তলাগুলো, 'ক্যানং লোম-লোম হয়্যা আছে'।

বাঘারু জানে সে যদি নীচে নেমে খোঁজে এত কোশল পাবে যে বাখার জায়গা খুঁজে পাবে না। শহরে নিয়ে গেলে কবরেজের দোকানে বিক্রি হয। হাটে নিযে বসলেও বিক্রি হয়—খয়েরি রঙ বানাতে। কিন্তু বাঘারুর ত তাব দবকার নেই। বাঘারু এই জায়গাটার নাম দিয়েছে 'কোশলবাড়ি।'

'হেঃ গযানাথ, মোক এইঠে পাঠাছে অচিনা দেশত্। আর মুই এইঠে একখান বাড়ি বানি নিছু। বাঘারুবাড়ি। কোটত যাছেন ? না, কোশলবাড়ি। কুন কোশলবাড়ি ? না, ঐ পোরালিবাড়িখানের

দক্ষিণে আর হুই যে বড় 'গর্জালি বাড়ি' (বর্ষার ঘাসজঙ্গল), ঐটার পচ্চিম পাখত—নদীর নাম ডাইনাং, থানার নাম নাগরাকাটা, গ্রামের নাম, বাঘারুবাড়ি।'

বাঘারু আপনমনে খিক খিক করে হাসে। আর হাসির ফুর্তিতে ডান গোড়ালি দিয়ে বুড়িয়ালের পেটে মারে খোঁচা। আর বুড়িয়াল তার জবাবে ওর লেজ দিয়ে সেই পায়েই মারে ঝাপট।

'শালো গয়ানাথক গিয়া কহিবু, হে দেউনিয়া, তোমার বাথানখান আছে, ধরো কেনে—ডাইনাং নদীর ডাইনের যে-ঘাসবন, তার পচ্চিম পাখের পাহাড়ের গা দিযা উঠি, ডাইনে ঘুরত যাবেন। তার বাদে দেখিবেন কনেক-আধেক পাতলা-পাতলা জঙ্গল, তার বাদে বাঘারুবাড়ির পাহাড়। তার মধ্যে কোশলবাড়ি, তার বাদে—'

বাঘারু এবার হেসে উঠে বুড়িয়ালের ওপর পিঠ নাচিয়ে ফেলে প্রায়। গয়ানাথের মুখটা তার চোখের সামনে ভাসে। এই ফরেস্টটা গয়ানাথের, বাথানটা গয়ানাথের, বাঘারু গয়ানাথের। কিন্তু গয়ানাথ যদি এখন এই ফরেস্টে, এই বাথানে, এই বাঘারুকে খুঁজে নিতে চায়? খ্যাঁক-খ্যাঁক করে কোমর নাচিয়ে এমন হাসতে হয় বাঘারুকে: 'শালো, কোটত খুঁজিবে মোর দেউনিয়া, মোক? আর এই বাথানক?'

এটা একবার মনে হওয়ার পর হাসি আব যেন থামতে চায় না বাঘারুর। শেয়াল ডাকাব মত খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হেসেই যায়। বাঘারু ত এমন কিছু বলতে পাবে না, যা দেখতে পাচ্ছে না। বাঘারু ত এমন কিছু ভাবতে পাবে না, যা সে দেখতে পাচ্ছে না। বাঘারু ত এমন কিছু ভাবতে পারে না যা সে তার শরীর দিয়ে করতে পারে না। তাই বাঘারুব এমন হাসি, এমন থামতে না-চাওযা হাসি। কারণ, তখন ত সে দেখতে পাচ্ছে গয়া-দেউনিয়াকে, 'হুই ডাইনাং ব্রিজেব উপব, এদিক চাহে, জঙ্গল, ঐ পাখে চাহে, নদী, হু-ই পাখে চাহে পাথর, হেই পাখে চাহে বালুবাড়ি। গয়া-জোতদার জানে এইঠে তার বাথান থাকে। কিন্তু ব্রিজঠে নামিবার পথ পায না। ত খুঁজ্ কেনে, খুঁজ্। ব্রিজেব উপব, আস্তাব উপর তোর বাথানখান খুঁজ।'

এই দৃশ্যে বাঘারুর হাসি আর থামতে চায় না যে বাথানেব সঙ্গে বাঘারু কেমন ঘুবে বেড়াচ্ছে, আব গয়ানাথ তার নিজেব 'জঙ্গলবাড়ি আর বাথানবাড়ি আব বাঘারু মাইষ্যালক খুঁজি পায় না, খুঁজি পায না।'

'খুঁজ্ কেনে, খুঁজ্, খুঁজি-খুঁজি দেখ, কোটত গেইল তোব মাইষ্যাল আর বাথান', বাঘারু দেখে তাবা তখন চালতা বনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে, 'আরে বে বে, ব-ব-ব-ব-র-ব' আওযাজ তুলতে-তুলতে বাঘারু উঠে বসে। বুড়িয়ালের পিঠে পা দু-দিকে ঝুলিয়ে বসা যায না, পেটটা এত চওড়া। বাঘারু মোষেব উল্টোদিকে মুখ কবে, তাই তাকে বাঁ পা তুলে নিতে হয। ততক্ষণে বুড়িয়াল থেমে গেছে। বাঘারু বুড়িয়ালের ওপর উঠে দাঁড়ায। আর পাকা চালতা খোঁজে। ওপবেব ডাল ধবে, 'টব র-র-র' আওয়াজ দিতেই বুড়িয়াল খুব ধীবে হাঁটে। বাঘারু তিন-চারটি চালতা পেড়ে, বুড়িয়ালেব পিঠে এবাব মুখ সোজা করে বসে, 'টর্-র্-র্' দিতেই বুড়িয়াল আবার চলতে শুরু করে। হাত বাড়িয়ে বুড়িযালেব ডান শিংটার আগায় মেবে বাঘারু চালতাটা ফুটো করে নেয়, তার পর হাত দিয়ে ছোলে। পাকা চালতাব গন্ধে তাব জিভ জলে ভিজে যায়। ডান পা মুড়ে রাখায় মোষের পিঠে যে ফাঁকাটা তৈবি হয় তার ভেতরে বাকি চালতাগুলো রেখে বাঘারু দুই হাতে পাকা চালতা তাব মুখগহ্বরে ঠেসে ধরে আব সেই রসে মুখ ভরে যায়। সেই স্বাদে ও গন্ধে হঠাৎই বাঘারুর মনে পড়ে যায় পাকা চালতা বনে হাতির পাল আসে। সে একবার চোখ তুলে তাকায় এদিক-ওদিক।

উনআশি

বাথানে গৃহযুদ্ধ

বাঘারু তার গলাটা সোজা করে সেই পাখিব ডাকটা ওঠে আচমকা—'অ-অ-অ-অ-ক্', 'ক-অ-অ-ক।' ডাকটার সবই হয, কিন্তু বাঘারুর নিজেরই মনে হয, কেউ একজন নকল কবে ডাকছে। হয়ত বাঘারু নিজেই অমন ডাকছে বলে তাব তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু বাঘারু কি আর ঐ পাখিটার মত 'কাঁপি-কাঁপি উঠিছে, শরীরের গরমত?' ভবে বাঘারুর ডাকে শবীবের সেই কাঁপন আসবে কোত্থেকে। বাঘারু আবো

একবার সেই পাখিটার ডাক ডাকে—'ক-অ-অ-অ-ক', 'ক-অ-অ-ক্' । শেষের ক'-টা যেন শোনাই যায় না, এমনই গভীর খাদে নেমে যায় । ঐখানটাতেই মনে হয়, পাখিটার শরীর 'কাঁপি কাঁপি উঠিছে' । কিন্তু বাঘারু একবার দেখতে পাবে না, পাখিটাকে, একবার দেখতে পাবে না ?

'হে-এ-ই, হে-ই, হে, হে, হে-ই', বলতে-বলতে বাঘারু সোজা হয়ে বসে আর বুড়িয়ালের পেটে গোড়ালি দিয়ে খোঁচা মারে । বুড়িয়াল হন-হন করে চলতে শুরু করে আর বাঘারু দুলে-দুলে ওঠে । 'হে-এই, হে-ই, হে-হে', বাঘারু বুড়িয়ালের পেটে গোড়ালি দিয়ে আরো এক খোঁচা মারে, তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি, সেই ওয়ালি পাড়া (ষাঁড়) সেই ভর-পোয়াতি মইষানিকে ঐ দিকের জঙ্গলটাতে এমন টুঁসাচ্ছে যে মইষানিটা পড়ে যাবে, এখুনি, আর, 'পড়ি গেলে ত ঐটা আরো খতম করিবে' । 'হে-ই ভোখা, ভোখা', বাঘারু ততক্ষণে বুড়িয়ালের দুই শিং ধরে উঠে দাঁড়িয়েছে । বুড়িয়ালের পিঠে খাড়া বাঘারুর মাথায় নিচু ডালপালা দুটো-একটা লাগছে । বাঘারু একবার ডান হাতে, একবার বাঁ হাতে সেগুলো, সরিয়ে-সরিয়ে দিচ্ছে । কখনো শিংটা ধরছে । কখনো ধরছে না । ভোখা বহু সামনে কোথাও ছিল । বাঘারুর ডাক শুনে ছুটে এদিকে আসতে-আসতেই তার নজরে পড়ে যায় সেই পোয়াতি মইষানিকে ওয়ালি পাড়াটা জঙ্গলের ভেতর এমন টুঁসিয়ে তাড়া করছে যে মইষানিটা মাটিতে পড়ে গেল আর-কি । বাঘারু দূর থেকেই ভোখাকে চিৎকার করে বলে, 'সিও, সিও' । ভোখা ঐ দৌড়ের মধ্যে মুহূর্তে থেমে যায় । আর তার পরই তার বাঁয়ে বেঁকে, ঘুরে, একটু পেছনে, সেই ওয়ালি পাড়াটার দিকে ধেয়ে যায় । জায়গাটায় পৌঁছে ভোখা প্রথমে একই বেগে ওয়ালি আর মইষানির মাঝখানে ঢুকে যায় চিৎকার করতে-করতে । কিন্তু ওয়ালি তার শিং নাড়া দিতেই মইষানির পেটের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে উল্টো দিকে গিয়ে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ার মত ভঙ্গি করে ও চিৎকার করে পাড়াটাকে ঠেকাতে চায় । পাড়াটাকে যে ভোখার দিকে দুবার শিং নামাতে হয় তাতেই মইষানি নিজের পায়ে সোজা হয়ে একটু সরে যাওয়ার সময় পায় ।

ততক্ষণে পিঠে বাঘারুকে নিয়ে বুড়িয়ালও অনেকখানি এগিয়ে এসে পড়েছে । বনের ভেতর কোনো-একটা পথ দিয়ে ত আর পুরো বাথানটা যাচ্ছিল না । একটা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে এদিক-ওদিক ঘুরছিল, খাচ্ছিল । তাই বাঘারুর চোখে যখন পড়ে ঐ পাড়াখান ঐ মইষানিকে নিয়ে কী শুরু করেছে তখন সেদিকে ছুটে যেতে ও একটা জায়গায় পৌঁছতেও ত তার সময় লাগে ।

বাঘারুর চিৎকার, ভোখার ছোটাছুটি ও চিৎকার, আর শেষে বাঘারুকে নিয়ে বুড়িয়ালের ঐ ছোটায়, কাছাকাছির সব মোষই ঘাড় তুলে তাকায় । যে-মোষগুলো দূরে বা আড়ালে চলে গেছে, দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু শুনতে পেয়েছে, সেগুলোও দূর থেকে 'আঁ-আঁ-আঁ-ক্' 'আঁ-আঁ-আঁ-ক' ডাকতে শুরু করে দিয়েছে । ফলে বুড়িয়ালের পিঠে বাঘারু সেখানে পৌঁছুবার আগেই ঐ জায়গাটাতে একটা চেঁচামেচি হৈ-হল্লা শুরু হয়ে যায় । বুড়িয়াল তার কর্তব্য অনেক আগেই বুঝে যায় । আর সে কর্তব্য শুধু তার এতদিনের অভিজ্ঞতা আর শক্তির জোরেই ঠিক করে তা নয় । তার চওড়া পিঠে যে-সওয়ার দুই শিঙের মাঝখানে শালগাছের মত খাড়া, তার সাহস, শরীর ও শক্তির জোরেও সাব্যস্ত হয়। বুড়িয়ালের এত চওড়া পিঠ, এমন খাড়া শিং আর এই চিতনো বুক এমন সওয়ার তার যৌবনে পায় নি । তার চারপাশের দুনিয়ায় এই সাহস, শরীর ও শক্তি মেপে-মেপেই ত পশুকে তার জন্ম থেকে স্বেচ্ছামৃত্যুর বার্ধক্যে পৌঁছুতে হয় ।

এত দূর থেকে ছুটে আসার ফলে তার অত বড় শরীরে যে-গতিবেগ তৈরি হয়ে যায়, তা একটুও শ্লথ হতে না দিয়ে, বুড়িয়াল বাঘারুকে পিঠে নিয়ে সেই 'পাড়া' আর মইষানির মাঝখানে ঢুকে যায় । বাঘারু চিৎকার করে চলে, তার পক্ষে যতটা জোরে সম্ভব, 'হে-ই, হে-এ-ই, হে-এ, হেট হেট, হে-ই' । বাঘারু আর বুড়িয়াল পৌঁছে গেছে দেখে ভোখাও জোর পেয়ে প্রায় পাড়ার গলার তলা পর্যন্ত চলে যায়—ঘেউ-ঘেউ করতে-করতে । একসঙ্গে এত দিক আক্রমণে পাড়াটা ওর শিং বাতাসে তুলে ঘাড়টা ঘুরিয়ে নেয়—মইষানিকে ছেড়ে দিয়ে ।

বুড়িয়াল যে এই রকম দুই মোষের মাঝখানে ঢুকে যাবে, বাঘারু তা ভাবে নি । সে ভেবেছিল, গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বুড়িয়াল তাকে নামিয়ে দেবে । কিন্তু কাছাকাছি এসেই বুড়িয়াল যখন তার গতিবেগ বাড়িয়ে দেয়, বাঘারু আর তার পিঠ থেকে নামে না । বাঘারুও বোঝে, বুড়িয়াল এই চেহারায়, আর শিঙে, তার গায়ের জোরে ছুটে দুটোর মাঝখানে যদি পড়ে, তা হলে ঐ পাড়াটাকে প্রথমে পেছুতেই

হবে। একবার পেছুলে আর এগনো যায় না। এত কিছু ভাবা সত্ত্বেও বুড়িয়ালের পিঠের ওপরে বাঘারু কিন্তু ডান শিং ধরে ডান দিকেই ঝুঁকে থাকে, যাতে, যদি ঐ পাড়া বুড়িয়ালকে আক্রমণই করে, বাঘারু ডাইনে লাফিয়ে পড়তে পারে।

পাড়াটা শিং উচিয়ে ঘাড় ঘোরাতেই ও বুড়িয়াল ওদের দু জনের মাঝখান দিয়ে পেরিয়ে যেতেই বাঘারু লাফিয়ে নীচে নামে। মাটিতে হাত বাড়িয়ে যে-ডালটা পায়, সেটাই কুড়িয়ে দুই হাতে তুলে, 'শালো' বলে, সরাসরি সেই পাড়ার বাঁ চোয়াল মারে। ডাল ভেঙে যায়। নিজের হাতের টুকরোটা ফেলে দিয়ে বাঘারু ছুটে আর-একটা ডাল তোলে। বাঘারুর ঐ হাতের পুরো একটা মার ঐ পাড়ার পক্ষেও সহ্য করা সম্ভব নয়। সে তার মুখটা আরো বাঁয়েই ঘোরায়। ততক্ষণে বাঘারুর হাতেব ডাল পুবো জোরে আছড়ে পড়ে কিন্তু চোয়ালটা তোলা ছিল বলে এবার একেবারে মুখের ওপরে। পাড়া দু পা পেছিয়ে গিয়েছিল, সামনের পা দুটো একটু উঁচু করে, গলা তুলে, মুখ বাঁচাতে। দ্বিতীয় মারটা খাওয়ার পর মুখ না নামিয়েই যেটুকু ঘুরতে পারে ঘুরে সে ছুট লাগায়। বাঘারু তার পেছন-পেছন কয়েক পা ছোটে, তার পর, 'শালো, যা কেনে, অরনার (বুনো মোষ) গুঁতা খাওয়ার তানে যা', বলে দাঁড়িয়ে পড়ে। ভোখা সেই পাড়ার পেছনে-পেছনে ছুটতেই থাকে।

বাঘারু এইবার সেই মইষানিটার কাছে আসে। মইষানিটা এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে ছিল। কোথাও জখম হয়েছে কিনা দেখতে বাঘারু শিং ধরে-ধরে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে মুখটা দেখে, চোখ দুটো দেখে। তার পা ডাইনে বাঁয়ে ঘুরিয়ে চোয়াল আর গলার সংযোগস্থলের নরম মাংসের জায়গাটা দেখে নেয়। মোষের শরীরের অন্য কোথাও লাগলে কিছু যায়-আসে না।

বাঘারুর হাতের ছোঁয়া পেয়েই মইষানিটার যেন আহ্লাদ হয়ে যায়। সে তার গলাটা ক্রমেই উঁচুতে তুলতে থাকে, আস্তে-আস্তে। ছোট মইষানি। গলা অতটা বাড়ালে বাঘারুর মাথা ছোঁয়। বাঘারু তার গলকম্বলে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে, 'হয়, হয়'।

কাছেপিঠের মোষগুলো বুঝে নেয় ব্যাপার মিটে গেছে। ততক্ষণে তারা কেউ-কেউ বসে পড়েছে, যেন এখানে অনেকক্ষণ থাকা যাবে। কেউ-কেউ দাঁড়িয়ে থাকে, চুপচাপ। কেউ-কেউ মাটিতে গন্ধ শোঁকে আর ঘাসে মুখ দেয়।

বাথান আবার বাথানের মত হয়ে গেছে।

বাঘারু একটু হেঁটে দেখার জন্য এগিয়ে যায়।

আশি

বাথান দিয়ে সমাজসেবা

আওয়াজ শুনে বাঘারু বুঝতে পারে, কোথাও খুব কাটাকুটি চলছে। ফরেস্টে আওয়াজ শুনে দিক ঠিক করা অসম্ভব। কিন্তু বাঘারু জানে, কাঠ কাটতে হলে বাঁ দিকের বনটাতেই হবে। ঐখানে একটা রাস্তা আছে, ফরেস্টের তেভরের রাস্তা যেমন হয়, পাথর বেছানো, কিন্তু তার ওপর পাতা পড়ে-পড়ে নরম হয়ে আছে। ঐ রাস্তা দিয়ে ট্রাকগাড়ি ভেতর পর্যন্ত আসতে পারে। বাঘারু সেদিকেই একটু এগয়, দেখতে।

ফরেস্টের যে-সব জায়গায় অনেক গাছ অনেক দিন ধরে কাটা হয়, সেখানে তলার জঙ্গল কেটে সাফ করে নেয় আগে। এই সব জায়গা বেশ অনেক দূর থেকে দেখা যায়। বাঘারু তেমনি দেখতে পায়, তার সামনের অনেকখানি জঙ্গল পেরিয়ে, অনেকগুলো লোক মিলে গাছ কাটছে। গাছ কাটছে না, কাটা-গাছের ডালপালা ছাঁটছে। 'হাঁই-হাঁই' আওয়াজ, কুড়ুল চালানোর, এখান থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। বাঘারু ওখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই দেখে।

দাঁড়িয়ে থাকে বলেই দেখে, শুধু ডালপালা ছাঁটা হচ্ছে না, ছাঁটার পর ঐ-রকম আস্ত গাছের গায়ে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বাঘারু একটা গাছ একটুখানি টানতে দেখে। কী ভাবে টেনে নিয়ে যায়, সে আর বাঘারু নতুন করে কী দেখবে। ওদিকে কোথাও হয়ত ট্রাকগাড়িটা আছে।

কিন্তু অত জন লোক মিলে বাঘারুকে দেখছে। প্রথমে যে-যার মত দেখে নিয়ে, এখন বারেবারে ঘুরেফিরে দেখছে। দেখারই ত কথা। এমন বনে বাঘারুর মত একা মানুষ! বাঘারুর কোনো মোষ ত তার আশেপাশে নেই। থাকলে, ওরাও অত দূর থেকেই বুঝত, বাঘারু কে।

শেষ পর্যন্ত ওরা এত বেশি দেখতে থাকে বাঘারুকে যে বাঘারু আর দাঁড়ায় না। কিন্তু ফিরে আসার জন্যে ঘুরতেই ঐ-জায়গা থেকে হাঁকাহাঁকি শুরু হয়ে যায়, 'হে-এ-ই, এই, শুনো, এই, শুনো।' ডাকটার মধ্যে এমন একটা তাড়া ছিল যে বাঘারুর মনে হয় দাঁড়িয়ে পড়াটা ঠিক নয়। বাঘারু একটু তাড়াতাড়ি হাঁটতে শুরু করতেই শোনে তার পেছনে কেউ ছুটে আসছে। বাঘারুও দৌড়বার আগে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে ফেলে, খাকি পোশাকে, ফরেস্ট গার্ড। সে দাঁড়িয়ে পড়ে।

তাকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে ফরেস্ট গার্ডটাও আর দৌড়য় না। হাঁটে। কিছুটা হেঁটে এসে, সম্ভবত যখন সে বাঘারুকে সম্পূর্ণটা দেখতে পায়, তখন, আর হাঁটেও না। ওখানেই দাঁড়িয়ে হাত তুলে বাঘারুকে ডাকে।

যেখানে কাঠকাটা চলছিল সেখানকার লোকজন তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছে। বাঘারু ফরেস্ট গার্ডের দিকে এগিয়ে যায়। ডায়নার এই জঙ্গলে আসার পর এমন একা-একা বাঘারুকে প্রায় কোনো সময়েই এত অচেনা মানুষের সামনে বিদেশীয়ার মত দাঁড়াতে হয় না। সঙ্গে ত তার বাথান থাকেই। সবাই ত তাকে দেখেই 'মইষ্যাল' বলে চিনতে পাবে। বাঘারুর নিজেব অবাক লাগে যে এরা তাকে চিনতে পারছে না। মাত্র এই কটা দিনেই এই পরিচয় তার নিজের কাছে এত পরিচিত ঠেকে! বাঘারুর কাজের পরিচয়টাতেই সে নিজে এত অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে সেই পরিচয় ছাড়া এই একজনের সম্মুখীন হতেও তার সঙ্কোচ হয়?

বাঘারু যতই তার কাছে আসে, ফরেস্ট গার্ড ততই বাঘারুকে সম্পূর্ণ করে দেখে। আর, বাঘারু তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে, দেখার আর-কিছু বাকি থাকে না। ফরেস্ট গার্ড তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে, একটু পরে জিগগেস করে 'তুমি, এইঠে কোটত আসিলেন?'

'মোর বাথান আছে, ঐঠে।'

'বাথান! কাব বাথান?'

'গয়ানাথ জোতদারেব।'

'অ। কোটে এ্যালায় তোমাব বাথান?'

'হু পাকে', বাঘারু হাত তুলে একটা নির্দেশ দেয়।

'এইঠে কী করিছেন?'

'কিছু না'।

'বাথান ওইঠে। আপনি এইঠে। কিছু না?'

'না। ঐ পাকে শুনিলাম গাছ কাটিবার আওয়াজ তাই—'

'তাই কী?'

'দেখিবার আইচছি, কায় কাটে, কী কাটে।'

'রাতিত কোটত থাকেন? এইঠে?'

'ডাইনাং নদীর চরত—'

'অয়। ঠিক আছে।' গার্ডটি যেন আশ্বস্ত হয়, 'আজ তাড়াতাড়ি চলে যাবেন এইঠে।'

'চলি যাম? এ্যালায়?'

ফরেস্ট গার্ডটি আকাশের দিকে তাকায়, 'তাড়াতাড়ি যাবেন, গিরহন (গ্রহণ) নাগিবে।'

'গিরহন? আজি? এ্যালায়?'

'হ্যাঁ। ধরো কেনে দুই দুপরের বাদে।'

'দুপুর ত হয়্যা গেইল না?'

ফরেস্ট গার্ডটি আবার আকাশের দিকে তাকায়, 'না, এ্যালায়ও বাকি আছে।'

'না, মুই এ্যালায়ই যাছি। মোর নামিবার টাইম নাগিবে। গিরহন নাগিবে? আজি?

ফরেস্ট গার্ডটির সঙ্গে বাঘারুর কথাবার্তা যখন চলছে তখন কাঠকাটার লোকজনের ভেতরে একজন

এগিয়ে আসে। তার পোশাকআশাকে বোঝা যায় কাঠকাটার লোক সে নয়, তার লোকরাই কাঠ কাটছে—কনট্রাক্টার। সে কথাবার্তা শুনে গার্ডকে বলে, 'এর কাছে ত মোষ আছে।'

'হ্যাঁ। মোষের বাথান।'

'আমাদের গাছগুলো টেনে দিক না। পয়সা যা লাগে দেব। তা হলে, কাজটা তাড়াতাড়ি হয়ে যায়।' গার্ডটা এই কথা শুনে বাঘারুকে জিজ্ঞেস করে, 'কী ? করিবু ?'

'কী ?'

'তোর মহিষ দুই-চারিখান নিগি আয়। এই গাছগিলান ঐঠে টানি দিবেন। পাইসা পাবেন। পাইসা।'

'আপনি যে কহিলেন গিরহন নাগিবে। মোর ত বাথান নিগি নামি যাবার নাগিবে, ডাইনাং-এর চরত। নীচে।

'আরে স্যালায় ত ইমরার এ্যানং তাড়াতাড়ি। ই মানষিলা গিরহনের আগত-বন ছাড়ি চলি যাবার চাহে। কাটা-গাছ গিলাকি ফেলি যাবে ? এইঠে ? কাঠচোরলা চুরি করি নি যাবে না ? তুই কাঠচোর ?'

মুই কাঠচোর না হই। ত নিগি আসিম ? মহিষ ?'

গার্ডটি এবার কনট্রাক্টারকে জিজ্ঞাসা করে, 'কী ? আনিবে ?' কনট্রাক্টার বাঘারুকে জিজ্ঞাসা করে, 'কতদূরে তোমার মোষ ?'

'ঐ ত হু পাকে, হু পাকে।'

'আনিবার পারিবু ? ঝট করি ?'

'এ্যালায় যাম। নিগি আসিম। কটা নাগে বাবু আপনার ?'

'আরে দু-চারটে আনলেই হবে। আমাদের আর বেশি গাছ ত বাকি নেই। টেনে ঐ দিকের নালীটাতে ফেলে দেবে, তার পর আমরা ঢাকাটাকা দিয়ে চলে যাব। কাল সকালেই ত আবার আসব। আজকেব রাতটার জন্যেই একটু সাবধান হওয়া।'

'ও। এইঠে টানি ঐঠে ফেলিবার নাগিবে ? ট্রাকত তুলিবার নাগিবে না ? মুই আসিছু এইঠে, খাড়ান', বাঘারু যাবার উদ্যোগ করতেই ফরেস্ট গার্ডটি বলে, 'তুই থাকি যা না আজিকার রাতটা, এইঠে, বাথান নিয়ে, কাঠ পাহারা দিবু। পাইসা পাবু।'

বাঘারুকে একটু চিন্তা করতে হয়। 'না, বাবু, মুই না পারো।'

'কেনে ? পাইসা পাবু।'

'না বাবু। গিরহন নাগিবে।-বনত মোর মোষগুলোর কী হয়, না-হয়।'

'কী আর হবে ? থাকি যা, থাকি যা।

বাঘারুকে যেন প্রায় রাজিই হয়ে যেতে হয়। তখনই তার মনে পড়ে যায় সকালেই দুধেব গাড়ি আসবে।

'না বাবু। মুই থাকিবার না পারি। সকালত দুধের গাড়ি আসিবে। দুধ দুহি দিবার নাগিবে। মুই মোর মহিষ আনিছু। টানি দিম আপনার গাছ। খাড়ন। আনিছু।' বাঘারু আর দাঁড়ায় না। ঘুরে তাড়াতাড়ি ছোটে তার বাথানের দিকে। এরা বাঘারুকে দেখতেই পায়, কেমন ছুটে সে প্রথমে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেটাও পেরিয়ে গিয়ে, আরো একটা জঙ্গলের পেছনে আড়াল হয়ে যায়। তার পরই ওরা বাঘারুর গলা শুনতে পায়—'এই, ট-র্-র্-র্-এ ট-র্-র-র্-এ।'

এই আওয়াজগুলো বারকয়েক নানা রকম হয়ে ওঠে, নামে, আবার ওঠে, আবার নামে। তার পর আর ওঠেই না। কিন্তু একটু পরেই দেখা যায় বাঘারু একটা মোষের ওপর বসে, আর তার পেছনে আরো তিনটি মোষ। বাঘারু একবার এসেছে ও একবার গেছে যে-রাস্তা বানিয়ে, সেটা যেন তার কতই চেনা হয়ে গেছে। চার মোষ নিয়ে বাঘারু সেই চেনা রাস্তায় সব দলে চলে আসে। চলে আসে একেবারে কাঠকাটাইয়ের দলের মাঝখানে।

কাঠকাটাইয়ের দলের লোকসংখ্যা কম নয়। একদল কাটা গাছের ডালপালা সাফ করে। আর একদল সেই সাফ করা গাছ টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু চার-চারটি মোষসহ বাঘারু এখানে এসে গেলে মনে হয় বাঘারুই যেন জায়গাটিকে ভরে ফেলল—এতক্ষণের লোকজনকে তুচ্ছ করে। 'বাবু, দড়ি নেন, দড়ি'—বাঘারু মোষের পিঠ থেকে নেমে বলে। আর সবাই কাজ থামিয়ে বাঘারুর কাজ দেখতে শুরু

করে।

বাঘারু সেই 'ওয়ালি পাড়া'-টাকে এনেছে, বুড়া বলদ মোষ দুটোকে এনেছে আর তাগড়া মইষানি এনেছে একটা। বাঘারু দড়িটাব একটা দিক শোয়ানো গাছের মাথায় বেশ খাঁজ বুঝে বাঁধে। আর-একটা দিক বেঁধে দেয়, দুটো মোষেব বুকের নীচে, পায়ের ওপরে। বেশি দূর ত আব টানতে হবে না। একটু দূবেই লম্বা নালীব মধ্যে ফেলতে হবে। ওব পাশে নিযে ফেললেই লোকজন ঠেলে গড়িয়ে দেবে। এখানে ত আর জোয়াল নেই। বুকের ওখানে বেধে দিলেই, যেন গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এমন ভাবে টেনে নিযে যেতে পাববে। দুটো মোষেব মাঝখানে গাছটাকে একটু উঁচু করে দিতে হয়, মাটি থেকে।

বাঘারু সেই 'পাড়া'টার সঙ্গে একটা 'বুড়া'ব, আব মইষানিটার সঙ্গে আর-একটা বুড়াব জোড় করে দেয। দুটো জোড়ের গলায গাছটা বেঁধে দিয়ে সে টর-র-র দিয়ে পেছনে দাঁড়ায়। ফরেস্টের জমির ওপব দিয়ে কোনো কিছু টেনে নেয়া অসুবিধে। উঁচু-নিচু, কাটাগাছেব গোড়া, গর্ত, এই সবে আটকে যায। বাঘারু এদের পেছনে-পেছনে থেকে একবার একটাব বাধা সরিযে দেয়, আরেকবার আরেকটা আটকে গেলে ছাড়িযে দেয।

এমন ঠেকে-ঠেকে গেলেও, দড়িব ফাঁসে ঝুলিয়ে যে-গাছ নিতে জনা ছ-আট মানুষের আধ ঘণ্টা-পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেগে যায, বাঘারু তার জোড়ামোষে তা নিয়ে যায অর্ধেক সময়ে, তাও অবার একসঙ্গে দুটো। ফলে, দুবারে চারটি গাছ সরানোর পরেই সমস্ত ঘটনাটা যেন বাঘারুর নেতৃত্বে ঘটছে এমনই দেখায।

এতক্ষণ বাঘারু আব তার মোষ ছাড়া এই কাঠ-সবানো চলছিল কী করে?

একাশি

বাথানের প্রত্যাবর্তন

বাঘারু এখন তাব পুবো বাথান নিয়ে ফবেস্টেব চড়াই ছেড়ে নদীর বুকে নেমে আসছে অতি দ্রুত। বুড়িযালেব পিঠে সে বাথানেব প্রায শেষে। হাঁটু মুড়ে বসে সে একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে, আব-একবাব সামনে; শুধু জিভ আব টাকবায আওয়াজ করে যাচ্ছে—'টব-র-ব-অ, টর-র-র-অ, টব-ব-ব-অ।' আব সেই আওযাজেব সঙ্গতিতে সমস্ত বাথান যেন একটা সৈন্যদলের মত সোজা চলে যাচ্ছে বনবাদাড় গাছগাছড়া ভেঙে, ঢাল বেযে। ওবা উঠেছিল পাহাড়ে ডান দিক বেয়ে। নামছে পাহাড়ের বাঁ ঢাল দিয়ে। বুড়িযাল বুঝে যায, বাথানকে তাড়াতাড়ি নিয়ে যেতে হবে। সে মাঝে-মাঝে গলাটা সোজা তুলে আকাশে আওয়াজ ছাড়ে—'আঁ আঁ আঁ ক, আঁ আঁ আঁ ক!' ভোখা, বুড়িয়ালের পাশে পাশে দুলে-দুলে ছুটে-ছুটে চলেছে। বাছুর চারটে মাঝে-মাঝে পেছিয়ে পড়ছে। প্রায় সব সময়ই আছে বাঘারু আর বুড়িয়ালের সামনে। আব, বাঘারু দুই হাত দুই দিকে তুলে বুড়িয়ালের পিঠের ওপর থেকে পুরো বাথানকে তাড়া দিচ্ছে, 'টর-ব-ব-অ, টর-র-অ।'

'ঝটত কবি চল, ঝটত করি, গিবহন আসিছে, গিরহন, আকাশখান অন্ধকার হয়্যা যাবে, পাখির দল সন্ঝা হইবার আগত ঘরত ফিরিবেন; বাঘা, হাতি, গণ্ডার আতির (রাত্রির) আগত বাহির হইবার ধরিবে, দিন ফুরিবার আগত বনত আতি নামি আসিবে, টর-র-ব-অ, টর-র-র-অ।'

বুড়িয়াল এগতে পারে না। সামনের মোষগুলো দাঁড়িয়ে গেছে। গলা উঁচু করে বুড়িয়াল দেখে, কী ব্যাপার। তার শিং ধরে বাঘারু উঠে দাঁড়ায়। দাঁড়াতে হল বলে ভোখা ঘেউ-ঘেউ করে ডেকে ওঠে। কিন্তু তার পরই আবার পাযে-পায়ে চলা শুরু হয়। গতিটা কমে যায়। বাঘারু বুড়িয়ালের পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে বাথানের মুখেব দিকে দৌড়ায়। ভোখা সঙ্গে-সঙ্গে তার পিছে ছোটে। বাথান একজোট হয়ে যাওয়ায় ভেতর দিয়ে চলার পথ বন্ধ। বাঘারুকে পাশ দিয়ে ছুটতে হয়।

বাথানের মুখ গিয়ে দেখে ঢালের যে-পাকটা দিয়ে বাথান ডাইনে ঘুরে এই ফরেস্ট আর তলায় নদীর বুকের মাঝখানের জঙ্গলটাতে ঢুকবে, সেখানে একটা বড় গর্ত হয়ে আছে। কিন্তু তাতে কোনো মোষ

থেমে নেই। তারা পাশের সরু জায়গাটা দিয়ে সাবধানে পা ফেলে বাঁয়ের মাটি পাথরের দেয়ালে গা ঘষে পেরিয়ে যাচ্ছে। সেই জন্যেই, যত জোরে নামছিল, তত জোরে আর নামতে পারে না। অনেকগুলো মোষ পার হয়ে গেছে। বাঘারু পেছন ফিরে একবার দেখে নেয় কতগুলো বাকি। কিন্তু যেগুলো পার হয়ে গেছে, সেগুলো যদি আলগা হয়ে যায়। আর এর মধ্যে গ্রহণের অন্ধকার শুরু হয়ে গেলে ওগুলো ভয়ের চোটে এদিক-ওদিক হয়ে যাবে। 'গিরহনের ভয়, বড় ভয়।' বাঘারু ভোখাকে সামনেব রাস্তাটায় আঙুল দেখিয়ে চেঁচায়, 'সিও সিও'। ভোখা লাফিয়ে সেই গর্ত পেরিয়ে সামনে চলে যায়। ভোখাকে দেখিলে জানিবে বাঘারু আছে।' বাঘারু গর্তটাব দুদিকে পা দিয়ে দাঁড়ায়। তার পর যে মোষ পাব হচ্ছে তার গা-টা একটু ঠেলে রাখে। তাতেই মোষগুলোর ভয় কেটে যায়—হয় বাঘারুর স্পর্শেই, আর নয়ত, ঐ গর্তের পাশে সামান্যতম সাহায্যেই ওদেব পেরনোটা সহজ হয়ে যায়। ফলে, তাড়াতাড়িই পার হতে শুরু করে দেয়। পেছনে বুড়িয়ালের হাঁকার শোনা যায়, 'আঁ আঁ আঁ ক্।' বাঘারু ঘাড় ঘুরিয়ে আওয়াজ দেয়, 'এই রো, অ-অ।'

সেই 'পাড়া'-টাকে বাঘারু আটকে দেয়। বাথানেব মধ্যে থেকে এখন যদি কোনো গোলমাল পাকায়, সরু রাস্তায়? বরং ওটাকে তার সামনা-সামনি রাখা ভাল।

কিন্তু সেই 'পাড়া' আর তার পরে বুড়িয়ালকে পার করাটা কঠিন হয়ে পড়ে। 'পাড়া'টা তাও যদি-বা ছেঁচড়ে চলে যেতে পারে—বাঘারু তাকে অন্য দিকের চড়াইটার সঙ্গে ঠেলে ধরে রাখলে, বুড়িয়াল পারে না। তার পেটটা দুদিকেই এত বড় যে ঐ গর্তেব পাশ-ঘেঁষা তার পক্ষে অসম্ভব। বাঘারু একবার চেষ্টা করে দুই হাতে সে বুড়িয়ালের একটা দিক তুলে দিতে পারে কি না। কিন্তু বুডিয়ালের ওজন পাহাড়ের চাইতেও বেশি।

সবগুলো মোষ পেরিয়ে গেছে। সেই বাঁকের গর্তের সামনে শুধু বুড়িয়াল আব বাঘারু। বুড়িয়াল তার এতদিনের অভিজ্ঞতায় বুঝে যায়—পেছনে একটা কোনো বিপদের তাড়া আছে। বাঘারুর মনে একটা হিশেব খেলে যায়—বুড়িয়ালেব ত বাথানে এমনি কোনো কাজ নেই। আর সে একা এখানে থাকলে বাথানের কোনো ক্ষতি নেই। কাল সকালে এসে বুডিয়ালকে খুঁজে নিলেই হবে। বাঘারু বুড়িয়ালের পিঠে এমন ঠাণ্ডা হাত বাখে যেন সে হিশেব জানা হয়ে যায়। বুড়িয়াল আকাশে মুখ তুলে—'আঁ-আঁ-আঁ-ক্' রবে তার সেই ডাক ছাড়ে। বুড়িয়াল আকাশে মুখ তুললে মনে হয়, আকাশই ভেঙে পড়বে।

এদিকে বাথান নীচে নেমে যাচ্ছে। বাঘারু আকাশেব দিকে তাকায়, গ্রহণ কি শুরু হয়ে গেল। সে লাফিয়ে ওপরে উঠে ছোটে—মোটা ডাল কয়েকটা পাওয়া যায় কি না। বুড়িয়াল অস্থিব পায়ে আকাশে মুখ তুলে বাঘারুর দিকে ঘোরে।

বাঘারু হাতের নাগালে যে-কটা ডাল পায়, নিয়ে দৌড়ে এসে গর্তটার ওপর ছড়িয়ে দিয়ে প্রায় শুয়ে পড়ে, দুই হাতে সেই ডালগুলোকে চেপে ধরে ক্যালভার্টের মত করে টাকরায় আওয়াজ তোলে, 'টর-র্-র্-অ, টর্-র্-র্-অ।'

বুড়িয়াল তার সামনের ডান পাটা আগে দেয়। দিয়ে একটু অপেক্ষা করে। তার পর ডান পাটাকে আরো একটু এগিয়ে নেয়। নিয়ে আবার একটু অপেক্ষা করে। তার পেছনের ডান পাটা তখন গর্তের কাছাকাছি, আর সামনের বাঁ পা মাটিতে শক্ত, পেছনের বাঁ পা, শূন্যে, আর একটু আগে। বুড়িয়াল যেন বাঘারুকে আর-একটু সময় দেয়। ডালগুলোকে আরো জোরে সেঁটে রেখে বাঘারু এবার তার শেষ সঙ্কেত দেয়, 'টর-র-র-অ, টর-র-র-অ।' সঙ্কেত শেষ হতে না-হতেই বুড়িয়ালের সামনে ডান পা-টা যেন পিছলে পেরিয়ে যায় আর পেছনের ডান পাটা ডালগুলোকে ছুঁয়ে কি না ছুঁয়ে চলে যায়।

বাঘারু লাফিয়ে উঠে আসে। বুড়িয়াল দাঁড়িয়েছিল। তার পিঠের ওপর দুই হাত দিয়ে বাঘারু শরীরটাকে ঝোলাতেই সে চলতে শুরু করে দেয়। বাঘারু তার পর বসতে পারে। বুড়িয়াল যতটা সম্ভব ছুটতে শুরু করে। বাথানের বেশি দূর যাওয়ার কথা নয়। বাঘারু একবার তারস্বরে চিৎকার করে ওঠে, 'হে-এ-এ ভোখা।' তার চিৎকার শেষ হওয়ার আগেই বুড়িয়াল তার গলা আকাশে তুলে হাঁকার দেয়—আঁ-আঁ-আঁ-ক।' জবাবে ভোখার ডাক শোনা যায়, কাছেই, বোধহয় বাঁক দুই নীচে। এখন ত জঙ্গলে নেমে গেছে। ফাঁক-ফোকর দিয়ে নদীর বুকটাও মাঝে-মধ্যে দেখা যাচ্ছে। বাঘারু আকাশে তাকিয়ে দেখে, তার সামনে পশ্চিমের পাহাড়ের ওপরে সূর্যটা আর গোল নেই, 'চাঁদের নাখান খাওয়া

গিবহন নাগি গেইল, গিবহন নাগি গেইল, টর-র-র-অ, টর-র-র-অ', বুড়িয়াল তার গতি বাড়ায়, যতটা সম্ভব।

সূর্যেব দিকে তাকানোর ফলে বাঘারু চোখে অন্ধকার দেখে, কিছু দেখতে পায় না। চোখ বন্ধ করে ফেলে, আন্দাজে বুড়িয়ালের শিং দুটো খোঁজে, ধবতে। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই মনে হয় এই সময় শিং ধরলে বুড়িয়ালেব নামাব অসুবিধে হবে। বুড়িয়াল কানের ঝাপট মেরে বাঘারুকে আশ্বাস দিতে থাকে, আর তার দুলুনি বাড়ে।

চোখ বন্ধ রেখেই বাঘারু 'আঁ-আঁ-আঁ—' ডাক শুনতে পায়। সে চোখ খুলে ফেলে। একটু অস্পষ্ট, কিন্তু দেখা যাচ্ছে। একটা মোষ ডাকছে। একটা ? নাকি পব পর ? ভোখা ? ভোখার ডাক নেই। তা হলে কি ওরাও সূর্যেব গ্রহণ দেখে ফেলেছে ? বাঘারু জানে সেটা অসম্ভব। আবার সেই 'আঁ-আঁ-আঁ—' ডাক। একাব। 'ঐকিযা (একা) কুন মহিষ ডাকিবার ধইচছে এ্যালায় ? পড়ি গেইসে ?' বাঘারু সামনে দেখতে পায ভোখা দাঁড়িয়ে, গলা উঁচু করে খাড়া, কিন্তু লেজ নাড়ছে। ভয় পায় নি। 'কিন্তু, কিছু একটা ঘটিছে, ভোখা বোবা বনি গেইছে, তয় ? তয় ?' হঠাৎ বাঘারুর সন্দেহ জায়ে, 'পোয়াতিটার বাচ্চো হওয়া ধরিল, নাকি ? এ্যালায় ?'

বিবাশি

বাথানে জন্ম

বাঁকটা ঘুবেই বাঘারু দেখে যা ভেবেছে, তাই। সেই ভর-পোয়াতি মইষানি পেছনের দুই পা ফাঁক করে দাঁডিযে আছে আব তাকে মাঝখানে রেখে দুই পাশে অন্য মোষগুলো সারি দিয়ে। কয়েকটা মোষ হয়ত আগে নেমে গেছে। এখান থেকে পবিষ্কার দেখা যাচ্ছে নদীব বুক, ব্রিজ, বাঘারুব সেই পাথর। আর দু-একটা বাঁক নামলেই তাবা নদীতে নেমে যেতে পারত।

বুডিযালেব পিঠ থেকে লাফিয়ে নামতে-নামতে বাঘারু একবার দেখে নেয় বাইরে আলোর রঙ মরে এল কিনা। সূর্যে যে গ্রহণ লাগতে শুরু করেছে তা বাঘারু দেখেইছে। আলো মরে আসবে আরো পবে। ছায়া লম্বা হতে-হতে একেবাবে কোথায় মিশে যাবে। কিন্তু এখনও শেয়াল বা মোরগ ডেকে ওঠে নি। কোনো রকমে কি ওটাকে আর-দুটো বাঁক ঠেলেঠুলে নেয়া যায় না ? অন্তত নদী পর্যন্ত ?

বাঘারু দৌড়ে মইষানিটাব কাছে ছুটে যায়। সেটা ঘাড ঘুরিয়ে আবার সেই একা-ডাক ডাকে। বাঘারু ওব গায়ে, গলায়, মুখে হাত বুলিয়ে পেছনে এসে দেখে, 'আ-আ-আ, খাইসে, খাইসে, বাছুরের মাথাখান দেখা যাছে, চাঁদিখান দেখা যাছে।' বাঘারু দৌড়ে গিয়ে কিছু গাছগাছড়া ছিঁড়ে এনে তলায় ছড়িয়ে দেয়। বুডিযাল এগিয়ে এসে উঁচু থেকে তার সেই মস্ত গলাটা পশ্চিমের পাহাড়ের মাথার দিকে বাড়িয়ে থাকে—যেন পাথরেব তৈরি। তাব নীচে সেই মইষানি মাটিতে পেছনের পা দুটো ঠুকে 'আঁ-আঁ-আঁ' করে আকাশজোড়া ডাক তোলে। বাঘারু তার সেই দুই হাতে মইষানির পা দুটো আরো ফাঁক করে দিয়ে, তার পেছনটা দুই হাতে দুই দিকে ঠেলে ধরে। সেই ফাঁকটা সম্পূর্ণ জুড়ে যায় বাছুরের ছোট গোল মাথায়। মইষানি আবার একটা ডাক দেয়; 'আঁ-আঁ-আঁ', আর তার সামনের পা দুটোতে ভর দিলে ঘুরে যেতে চায়। বাঘারুর জন্যে পারে না। ফাঁকটাকে আরো একটু বড় করে দিয়ে বাছুরের মাথাটা আরো একটু বেরোয়। কিন্তু এখন বাঘারু ছেড়ে দিলে মাথাটা আবার ভেতরে চলে যাবে। বাঘারু তার শরীরের সমস্ত শক্তি দিলে বাছুরের বেরুবাব পথটা আরো একটু ফাঁক করে দিতে চায়, যাতে, বাছুরের মাথাটা অন্তত এইটুকু বেবিয়ে আসে যে সে দুই হাতে সেটা ধবতে পারে। একবার ধরতে পারলে বাঘারু টেনে বের করে আনবে।

ততক্ষণে মইষানির দুই পা বেয়ে রক্ত, জল, আর শ্লেষ্মা গলে-গলে পড়ছে। বাঘারুর দুই হাতের কব্জি থেকে সেই তরল পদার্থ হাত গলে কনুই পর্যন্ত গিয়ে টপ টপ মাটিতে পড়ছে। বাঘারু তার দুই হাতের জোর রাখার জন্যে নিজের দুই পা ফাঁক করে মাটিতে দাঁড়ায় আর সামনে তাকিয়ে দেখে, নদী ও ফরেস্টের ওপর এখনো ছড়ানো আলোতে ছায়া লেগে গেল কি না। চকিতে একবার ভেবে নেয় বাঘারু,

বাথানটাকে ঠেলেঠুলে নীচে পাঠিয়ে দেবে কি না, দেখাই ত যাচ্ছে এখান থেকে, সঙ্গে ভোখা যাক, 'কায-কায় ত চলিও গেইছে।' দুই হাতে মইষানিব পেছনটা ফাঁক কবে ধরে রেখে বাঘারু দুই পাশে তাকায়—ভোখা পর্যন্ত চুপচাপ লেজ নাড়ায়, বুড়িযাল পর্যন্ত খাড়া, 'সারাটা বাথান সিধা গলা খাড়া কবি আছে', ঘাসেও মুখ দেয না, হাঁকাবও তোলে না। 'এ্যালায ত বাথানখান বাথান হওযা ধবিছে। একটা পোয়াতি মইষানি বাছুব দিবা ধইচছে। এইখান ত একোটা কেনা বাথান। গয়ানাথ কিনিছে। এই হাট ঐ হাট ঘুবিঘুবি কিনিছে। বুড়িযালখান কেনা। বুড়া ষাঁড় কেনা। ওযালিখান কেনা। তার বাদে ত বাথানও বাছুব হওয়া ধবিল্। বাছুব হওযা ধবিলে বাথান বাড়িবে। বাথান চালু থাকিবে। বাছুব হবা ধবিছে। বাছুব। বাথানত বাছুব—।'

ততক্ষণে মইষানিব পেছনেব ফাঁকটা বাছুবেব মাথায সম্পূর্ণ ভরে গেছে। এখন বাঘারু ছেড়ে দিলেও মাথাটা আব ভেতবে ঢুকে যেতে পাববে না। বাঘারু তাব বাঁ পা দিযে মইষানির তলপেটে একটা ছোট্ট গুঁতো দেয, 'কোঁথন দে, কোঁথন দে, দে'!

সেই গুঁতোতে মইষানি 'আঁ-আঁ-আঁ-আঁ' আর্তনাদ করে ওঠে। সামনের পা দুটো দাপায। এই মইষানিটা যত চেঁচায তাব গলাটা তত লম্বা হতে থাকে। অন্য মোষগুলো চেঁচায না, কিন্তু তাদেব গলাও ক্রমেই লম্বা হয। এখন এই জঙ্গলেব ভেতব বাঘারুর বাঁ দিকে বুড়িযালেব বিবাট লম্বা বাড়ানো গলা আর ডাইনে সারি দেয়া মোষের দলেব বাড়ানো গলার সাবি, আব সামনে তলার সেই নদীর বুক—বাঘারুব মনে হয, 'এ্যালায নাগি যাবে গিবহন, এ্যালায নাগি যাবে।' গেলে যাবে, সেটা আব তত বিপদের নয়। কারণ ফবেস্টেব ভেতব থেকে ত সে বেবিযে আসতে পেরেছে—কিন্তু এমন জাযগায মোষেব পালটা যদি এলোমেলো হযে যায।

বাছুরেব মাথা আরো খানিকটা ঠেলে এসেছে, কিন্তু এখনো বাঘারু দুই হাতে মাথাটা ধরতে পারবে না। বাঘারু তাব ডান হাতের তর্জনী দিযে মইষনির ফাঁকের চামড়াটা একটু টেনে দেখে। তাবপব দুই হাতের তর্জনী আর মধ্যমা মইষানির ফাঁকের ভেতর ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করে। চামড়াব তলাব দিকটা দিয়ে আঙুলগুলো ঢুকিযে চাপে বেঁকিযে দিতে হয। মইষানিব চামড়া ছিঁড়ে যেতে পাবে। গেলে যাবে। এখন সে-সব টের পাবে না। দুই হাতের চারটে আঙুল একবার ভেতরে ঢুকে গেলে বাইরেব দুই বুড়ো আঙুল বাছুরের মাথায লাগিয়ে বাঘারু মাথাটা সাঁড়াশিব মত চেপে ধবে।

চেপে ধরেই থাকে। টানে না। একবার পিছলে আঙুল বেবিযে এলে আবার ঢোকানো মুশকিল। সেই আন্দাজ বাঘারুকে ধীবেসুস্থে নিতে হয়, ধবা ঠিক হয়েছে কি না, পিছলে যাবে কি না।

নিশ্চিন্ত হয়ে বাঘারু এবাব ধীরে-ধীরে টানতে শুরু করে। ধীরে-ধীরে টানেব জোর বাড়ায। ধীরে-ধীরে। এখন বাঘারু হাতের দুই তালুর ভেতর মাথাটাকে পেয়ে যায়। তাই তাকে আবাব ঠাহর করতে হয় হাত পিছলে যাবে কি না। এখন হাত একবাব পিছলে গেলে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকতে হবে—যখন বেরবার বাছুরই বেবরে। বাঘারু যখন নিশ্চিন্ত হয় যে তার দুই হাতেব মুঠোর ভেতর বাছুরের ঐ একটুখানি মাথা পুরো সেঁটে আছে সে তখন ধীরে-ধীবে শবীবের সবটুকু জোব দিযে বাছুরটাকে টানে। বাঘারুর যেন হিশেব আছে, কখন, কত ধীরে, আর কখন, কত তাড়াতাড়ি, টানলে, 'পেটের ভেতরের আস্ত একখান বাছুর জলেরক্তে ভিজি বাহির হয়্যা আসি দুই ঠ্যাঙত খাড়া হবার পারে।' সেই মুহূর্তে আকাশে, লক্ষ-লক্ষ গ্রহনক্ষত্রের অসংখ্য আকর্ষণ-বিকর্ষণে তৈরি অগণন কক্ষপথের সাপেক্ষতায় সূর্যের যে আঁধারপাত ঘটে যাচ্ছিল সেকেন্ডেরও ভগ্নাংশের নির্ভুল মাপে, বাঘারুর হাতের মাপ ছিল তার চাইতেও নির্ভুল।

মাথার অনেকখানিই বেরিয়েই এসেছিল। বাঘারু এখন কপাল পেয়ে যেতে পাবে দুই হাতের মুঠোয়। বাছুরের শরীরের আর এই মইষানির পেটের প্রত্যেকটা খাঁজ বাঘারুব এমনই জানা যে সে বাঁ হাতটাতে বাছুরের ঘাড়টা ধবে একটু কোনাচে কবে নেয আব ডান হাত দিয়ে মাথাটাকে একটু বাঁয়ে ঘোরাতেই কপাল পেয়ে যায়। মাথা মানেই ত ঘাড় আর কপাল। বাঘারু বাঁ হাতে ঘাড়টা চেপে রেখে, ডান হাতে কপালটা ধরে একবার তলার দিকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে, পরের ঝাঁকুনিতেই ওপরে ঠেললে কপালের হাড়টা আরো খানিকটা বেরিয়ে আসে। বাঘারুর ঝাঁকুনিতে মইষানি পেছনের একটা পা হড়কে যেতে চায়। কিন্তু সে গেলে যাক, বাঘারু ত এখন তার মুঠো আলগা করবে না। সে মাটির ওপর দুই গোড়ালির চাপ দিয়ে তার শবীরটার ঝোঁক পেছনে ফেলে দুই হাতে ঘাড় আর কপাল ধরে বাছুরের

মাথাটা ঝাঁকিয়ে-ঝাঁকিয়ে চোখের ওপরের হাড়, চোখের পাশের হাড়টা বের করে আনতেই—এটাই মুখের শেষ বাধা—সড়াৎ করে বাকি সরু মুখটা গলা পর্যন্ত বেরিয়ে আসে আর মইষানির পেছনে বাছুরের মাথা ঝুলে থাকে। মইষানি একটু হাল্কা বোধ করে ফেলে হয়ত, সে তার পেছনের একটা পা সরাতে যায়—আর ফাঁক করে থাকতে পারে না। বাঘারু মুহূর্তের সময়ও দেয় না। বাঁ হাতে বাছুরের মাথাটা ধরে রেখে ডান হাতটা তার গলার ফাঁক দিয়ে মইষানির ভেতর ঢুকিয়ে দেয়। আঙুল নেড়ে দেখে নেয়, মইষানির ভেতরে বাছুরের সামনের পায়েব ভাঁজ ঠিক আছে কি না। তার পর ডান হাতটা দিয়ে পা দুটোকে ভেতরে চেপে দুই হাতে আবার সেই টান দেয়, ধীরে-ধীরে, কিন্তু নিশ্চিত, বাঘারু পুরো শরীরের ওজন ঝুলিয়ে যেন বাছুরটাকে টেনে বের করে আনবে।

'আড়িয়া' (এঁড়ে)-বাছুব হলে এই সামনের পা আর কাঁধের জায়গাটাই সব চেয়ে চওড়া আর 'গাই' বাছুর হলে পেছনেব পা আর কোমর। বাঘারু বাছুবের মাথাটা ছেড়ে বাঁ হাতটাও ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়, কিন্তু বেশি ভেতরে না, একটু ঢোকাতেই সে ঘাড়টা পেয়ে যায়। বাছুরের মাথাটা বাইরে ঝুল ঝুল করে। আর বাঘাক ডান হাতে মইষানির পেটের ভেতরে সামনেব পা দুটো-লেগে-থাকা বুক আর বাইরে বাঁ হাতে, ঘাড় ধবে, মাটিতে দুই গোড়ালির ঠেকনো দিয়ে, ঝুলে পড়ে। মইষানির গঁলা দিয়ে কেমন একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরয়। বাঘারুব বাঁ হাতের আঙুলের গিঁঠটা মইষানির ফাঁকটাতে ঠেকে যেতেই সে প্রায় একই সঙ্গে বাঁ হাতটা ঘাড থেকে খুলে আঙুলগুলো সোজা করে টেনে বের করে আনে আর ডান হাতে পুরো টান দেয। সড়াৎ করে ঘাড়টা বেরিয়ে আসে আর বাছুরের মাথাটা আরো ঝুলে যায়। সড়-সড করে বাছুরের ঘাড়-বুক-পা নেমে আসতে থাকে, প্রায় মইষানির হাঁটু পর্যন্ত ঝুলে পডে। কিন্তু সামনের পা দুটো সম্পূর্ণ বেরিয়ে আসাব আগেই বাঘাক বাঁ হাতে ঘাডটা ধরে আটকে দেয়—যেভাবে গড়িয়ে নামছে, পেছনেব পা যদি আটকে যায়। বাঘাক ডান হাতটা আবার ভেতরে ঢোকায়। তখন বাছুরের শরীরটাই নীচে নামার টান পেয়ে গিয়েছে। হড়-হড় করে নীচে নেমে যাচ্ছে। বাঁ হাতে সেটাকে একটু ঠেকিয়ে বাঘারু ডান হাতে বাছুরেব পেছনের পা দুটো একবারেই মুঠো করে ধরতে পারে। তার পর সেই দুই পা ধরে হিড়-হিড় করে টেনে নামাতে থাকে। কোমরের হাডটায় ঠেকে যায়। কিন্তু ততক্ষণে পেছনের পা দুটোর পাতা বেরিয়ে গেছে। একটা ঝাঁকি দিতেই বাছুরের পুরো পেছনটা বেরিয়ে সেই থলিব মধ্যে ঝুলতে-ঝুলতে নীচে ঘাসের ওপব। বাঘারু হাত দিয়ে বাছুরটাকে শুইয়ে দেয়। মইষানিব পেটের ভেতর থেকে ঝিল্লিব থলি, জল, বক্ত বেরিয়ে আসতে থাকে।

তিরাশি

বাথানে আরো একজন

মইষানি তখন থরথর করে কাঁপছে আর বারবার মুখটা পেছনে নিয়ে আসতে চায়। কিন্তু কেন যেন আনে না। বাঘারু এবার সামনের দিকে তাকায়—রোদে কি ছায়া লেগেছে? বাঘারু পশ্চিম পাহাড়ের দিকে তাকায়। পাহাডের ছায়াটা কেমন অদ্ভুত ঠেকে, যেমন বাঘারু কখনো দেখে নি। বাথানও তেমনি কিছু বুঝে ফেলে কি না, কে জানে। হঠাৎ অনেকগুলো মোষ একসঙ্গে ডেকে ওঠে। মাটিতে পা ঠোকার আওয়াজ তোলে। ভোখা এতক্ষণ পরে আকাশে মাথা তুলে একটা লম্বা টানা ডাক শুরু করে, বুড়িয়াল তার বিরাট কান দুটো দিয়ে একবার ডান, আর-একবার বাঁ পিঠ ঝাড়ে। 'গিরহন নাগি গেইল রে, মোর বাথানঠে গিরহন নাগি গেইল।'

বাঘারু আর মুহূর্ত দেরি করে না। সে দুই হাতে মইষানির পেটের ভেতর থেকে ঐ রক্ত জলময় লম্বা থলির বাকি অংশ টেনে বের করে। 'ফুল পড়িল? না, না পড়িল?' তার পর নাড়ীটা ছিঁড়ে একটা গিঁট দিয়ে বাঘারু বাছুরটাকে আলাদা করে ফেলে। ততক্ষণে বাছুর তার পা চারটে মেলে ঘাড়টা তুলছে আর ফেলছে। বাঘারু টাকরায় 'টর্-র্-র্, টর্-র্-র্-অ' দিয়ে দেয়। সামনের মোষগুলো চলতে শুরু করে দেয়। কিন্তু ওদের শিংগুলো তোলা, লেজটা শক্ত। 'ডর খাছে? ডর? মোর বাথানত গিরহন আসি

গেইল রে, আসি গেইল।' বাঘারু টাকরায় আবার আওয়াজ তোলে, 'টর্-র-র-র-অ, টর-র-র-র-অ', মুখে আওয়াজ দেয়, 'ঝট কর, ঝট কর, হেঁট হেঁট, টর্-র্-র্-অ।'

এইসব করতে-করতে বাঘারু বুড়িয়ালের গলাটা শুধু একবার ছুঁয়ে দিতে পেরেছে। তাতেই বুড়িয়াল বোঝে তার কিছু করণীয় আছে। সে কয়েক পা এগিয়ে আসে। বিয়ানি মইষানি বাছুর দেখতে না পেয়ে 'আঁ আঁ আঁ' করে কেঁদে ওঠে। 'র কেনে। কান্দিবার ধরিস বাদে।' বাঘারু দুই হাতে কিছু ঘাসপাতা ছিঁড়ে এনে বাছুরের শরীর থেকে ক্লেদটা মুছে দেয়, মাত্র একবারে যতটা পারে। তার বাথান রওনা দিয়ে দিয়েছে। বাঘারু দুই হাতে বাছুরটাকে কোলে তুলে নেয়। তখনো ত বাছুরটা গর্ভের ভেতরে যেমন ছিল, সেই ভঙ্গিতেই চার পা এক করে ঘাড় নুইয়ে গোল পাকিয়ে আছে। সবে দু-একবার ঘাড়টা তুলেছে মাত্র। এখন বাঘারুর দুই হাতে বাঘারুর বুকের ভেতরে সে সে-ভাবেই থাকে। যেন বাঘারুর বুক তার দ্বিতীয় গর্ভ। বাঘারু কোলে করে, বুকে করে, দুই হাতে উঁচু করে বাছুরটাকে তুলে নেয়। নিয়েই বুড়িয়ালকে পায়ের ধাক্কায়, 'টর্-র্-র-অ' দেয়। বুড়িয়াল চলতে শুরু করে। বাঘারু বাছুরটাকে বুকে করে বুড়িয়ালের পাশে-পাশে ছুটতে শুরু করে। ততক্ষণে বিয়ানি মইষানিটাকে ছাড়িয়ে বুড়িয়াল এগিয়ে গেছে। আর বিয়ানি মইষানি বুড়িয়ালের পাশে-পাশে পিছে-পিছে ছুটতে-ছুটতে জিভ বের করে বাঘারুর কোলে বাছুরটার গায়ের যেটুকু পাচ্ছে সেটুকুই চাটছে। তাতে বাঘারুর হাতের অনেকটা চাটা হয়ে যায়।

'টর্-র্-র্-অ, টর্-র-র-অ' করে বাঘারু বুড়িয়ালের ডান পাশ দিয়ে ছুটতে থাকে। 'পুরা বাথান নামি যাছে এ্যালায়, চল, চল, গিরহন নাগিছে, গিরহন নাগি গিসে।' চিঁ-ই-রো চিঁ-ই-রো আওয়াজে এক ঝাঁক পাখি বনের ভেতর থেকে উড়ে এসে, সামনে কোনো অনির্দিষ্ট আশ্রয়ের দিকে ছুটে যেতে গিয়ে, এই দলটাকে দেখে, আচমকা পাক খেয়ে বাঘারুর কোলে সেই নতুন বাছুরের দিকে নেমে, আবার উঠে, বুড়িয়ালের ওপরে একটু নিচু হয়ে, নদীর ওপরে চলে যায়।

'গিরহন, গিরহন, পাখিরা বাহির হয়্যা যাছে। ঠুকরিবার পাবে, বাছুরক ভোখা, ভোখা।' ভোখা পেছন থেকে বাঘারুর ছুটন্ত দুই পায়ের ভেতর মুখ ঢুকিয়ে দেয়। বাঘারু ছুটতে-ছুটতে বুড়িয়ালেব পিঠের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে ভোখাকে বলে, 'উঠ, উঠ।' বলতে-বলতে একটু নিচু হয়, হাঁটুটা ভাঁজ করে। ছুটতে-ছুটতেই ভোখা বাঘারুর নোয়ানো পিঠের ওপর সামনের দুই পায়ের ভর দিয়ে ওঠে, আর বাঘারু সোজা হতে-হতে ভোখা টক করে বুড়িয়ালের পিঠের ওপর উঠে যায়। নিজের পেছনের পা দুটোর ওপর টান-টান বসে পড়ে আকাশে মুখ তুলে ঘেউ-ঘেউ করে পাখি তাড়াতে শুরু করে দেয়। 'টর্-র্-র্-অ-অ-অ', 'টর্-র্-র্-অ-অ-অ' বাথানের একেবারে শেষে বাঘারু, 'গিরহন নাগি গেইসে, গিরহন নাগি গেইসে, নামি চলো, নামি চলো, টর্-র্-র্-অ-অ-অ, টর্-র্-র-অ-অ-অ।'

বাঘারু প্রায় যেন পৌঁছে যায়। সোজা নেমে গেলে ত আর-কয়েক পা। তাব পব নদীব ভেতব দিয়ে হেঁটে সেই তাদের বাথানের জায়গাটায় পৌঁছতে পারে। কিন্তু বাঘারুদের আর নদীব মাঝখানে এখন সেই 'খোপ' (ঘন ঘাসের জঙ্গল), 'এ্যালায় তাড়াহুড়ায়, বাথান নিয়া নামা না যায়', হয়ত ভেতরে কোথাও কোনো পাথর আলগা হয়ে আছে, পা দিলেই পিছলে যাবে, বা, ঘাসে ঢাকা গর্তে পা আটকে যাবে। তার চাইতে সোজা যাওয়া ভাল, কে বাঁক ঘুরে। 'টর-র্-র্-অ-অ-অ', 'টর-র্-র্-অ-অ-অ।'

আলোতে কতটা গ্রহণ লাগল মাপতে বাঘারু ছুটতে-ছুটতে তাকায়। অকাল-গোধূলিতে পশ্চিম পাহাড়ের এক অচেনা ছায়া ডায়না নদীর চরটাকে কোনাকুনি অন্ধকার করছে। 'সেই দুধের গাড়ি আসে দক্ষিণ-পচ্চিম পাকের যে-জঙ্গল দিয়া', এই একটু উঁচু থেকে দেখা যায়, 'সেই জঙ্গলের মাথাখান জুড়ি হে-ই মাইল-মাইল ছায়া ছড়ি যাছে হে, ছড়ি যাছে। আলোতত্ কালি নাগি গেইসে, নাগি গেইসে, আন্ধার, আন্ধার, গিরহন, গিরহন—'

বাঘারু শেষ বাঁক নেয়।

পাশে বুড়িয়াল! বাঘারুর কোলে নতুন বাছুর—জলে-রক্তে-শ্লেষ্মায় জড়ানো। একবার ঘাসটাস দিয়ে বাঘারু মুছিয়েছিল বলে ঘাস-লতা-পাতা শরীরে সেঁটে আছে, যেন সে-সব জন্মচিহ্ন, 'ছিটোয়াল মহিষ।' বুড়িয়ালের পিঠে খাড়া বসে ভোখা টানা ঘেউ-ঘেউ ডেকে যাচ্ছে। বুড়িয়ালের বাঁয়ে সেই বিয়ানি-মইষানি—যার বাছুর। বুড়িয়ালের একটু পেছনে, গা ঘেঁষে ছুটতে-ছুটতে চলেছে, তার গলাটা লম্বা বাড়িয়ে বাছুরটাকে যতটুকু পারে চাটছে। মইষানির পেছন, পেছনের দুই পায়ের ভেতর দিক, রক্তেজলে থকথক করছে। বুড়িয়ালের ডাইনে বাঘারু। ছুটতে-ছুটতে কখনোও বুড়িয়ালের গায়ে, ধাক্কা

লাগে। বুড়িয়াল যেন নতুন বাছুরসহ বাঘারুকে চলমান ঢাকা দিয়ে রেখেছে। ওপর থেকে কিছু, পাশ থেকে কিছু নতুন বাছুরের ওপর চাপ পড়ে। বাঘারুর থুতনি গলা-বুক-পেট, আর বগল থেকে আঙুল পর্যন্ত দুই হাত রক্তেজলে ল্যাদল্যাদ করছে। এই রকম করে ছুটতে ছুটতে ওরা নদীর পাথুরে বুকে ঢুকে যায়।

চুরাশি

পাখোয়াল পর্ব : আর-এক বৃত্তান্তের শুরু

সূর্যের আলো ধীরে-ধীরে কমে আসে। জঙ্গল, পাহাড়, পাথরের ছায়াগুলি বদলে যেতে থাকে। আলোতে নরম রঙ লাগে। ডায়নার বুকে অসংখ্য নুড়ি-পাথরের অজস্র রঙের ছায়া লম্বা থেকে লম্বা ছড়িয়ে যায়। কোনো সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তে রঙের এমন কৌণিক প্রপাত ঘটে না। ডায়নার বুকে নুড়ি-পাথরের এইসব রঙিন ছায়ার ওপর বিরাট ছায়াবান পাথরের কালো ছায়া পড়ে।

বাথান এখন বাথানের জায়গায়। কিন্তু কোনো মোষই বসে নি। গায়ে গা লাগিয়ে, গলায় গলা বাড়িয়ে সবগুলো মোষই থমথমে দাঁড়িয়ে যেন নিশ্চিন্ত নয়, তারা ফিরেছে কি না। যেন, তখনই তাদের আবার এখান থেকে সরে যেতে হতে পারে।

বাছুরটা ঐ বাথানের মধ্যে নড়বড়ে পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে আর পা ভেঙে-ভেঙে পড়ে যাচ্ছে।

আলো আরো কমে, প্রায় অন্ধকার হয়ে এল। বড়-বড় গাছের পাতা কোনাচে। আবছায়া গাছগুলো হঠাৎ লম্বা হয়ে যেতে থাকে। সূর্যের আলোর অভাবে বাঘারুর ঠাণ্ডা লাগতে শুরু করে। সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখে, প্রায় পুরো সূর্যটাই অন্ধকার হয়ে আছে, সুতোর মত এক ফালি বাকি। 'গিরহন, গিরহন।'

পূর্ণ গ্রহণের মুখে মোষগুলো গলা তুলে 'আঁ আঁ আঁ' ডাকতে শুরু করে। লেজ-মাথা দুইই মাটির দিকে নামিয়ে ভোখা কান্নার টানা সুর তোলে।

শুধু সেই নতুন বিয়োনি মইষানি তার বাছুরের গা চেটেই যায়। আর বাছুরটা ঘাড় নড়বড় করতে-করতে উঠে দাঁড়ায়। তারপর পা ঘাড় দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙে পড়ে। আবার সোজা হতে শুরু করে। এই, এখনই ঘাড় তুলে কয়েক পা ছুটে যেতে না-পারলে যেন ও[illegible]ন্ম সম্পূর্ণ হয় না।

বনের ভেতরে ডাল থেকে পাখিদের ওড়ার পাখসাট। ঘাসবনে এক সার জোনাকি জ্বলে জলের মত ঘুরপাক খেয়ে যায়। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হরিণের মত কিছু একপাল ছুটে যায়। গ্রহণের আকাশের অন্ধকার থেকে ঝুপঝুপ নেমে আসে বাদুড়, উড়ে চলে যায়। শেয়াল আর বনমোরগ একসঙ্গে প্রহর ঘোষণা করে দেয়। তাতে, ভোখা মাটির দিকে মুখ নামিয়ে আবার কান্না শুরু করে। আওয়াজটা যেন মাটি খুঁড়ে ভেতরে চলে যাবে। 'গিরহন, গিরহন, গিরহন পুরা হয়্যা গেইল, পুরা হয়্যা গেইল'—তারই পাথরের নীচে, বাথানের মাঝখানে বাঘারু তাকিয়ে আছে, দ্বিতীয় সূর্যোদয় শুরু হয় কখন তার অপেক্ষায়।

প্রথম বার বাঘারু খেয়াল করে না। দ্বিতীয় বারও, অত আওয়াজে যেন পরিষ্কার হয় না। কিন্তু তার পরের বার একেবারে স্পষ্ট, যেন বাঘারুর শোনার জন্যেই, তীক্ষ্ণও। সারাটা শরীর দিয়ে পাখিটা ডাকে, 'ক-অ-অ-ক্', 'ক-অ-অ-ক্।' শেষেরটুকু শোনাই যায় না। গলা বুজে আসে। 'পাখোয়ালখান জঙ্গলের অনেক ভিতরত আছিল্। এ্যালায় গিরহনের আন্ধার দেখি ছুটি-ছুটি আসিবার ধইচছে। গাওখান ধোকপোকাছে'—বাঘারু তার না-দেখা পাখির শরীরের সেই বেপথু দেখতে পায়। পাখিটা আবার গাঢ় ও স্পন্দিত স্বরে কুহর দিয়ে ওঠে, 'ক-অ-অ-ক্।'

বাঘারুর শ্বাস তখনো স্বাভাবিক হয় নি, ঘাম তখনো মরে নি। হাতপায়ের রক্তক্লেদ তার ধোয়া হয় নি। দুটো রক্তমাখা হাত মুখের কাছে তুলে বাঘারু খুব চাপা স্বরে, গলা না তুলে পাখিটার ডাকে সাড়া দেয়। একবার।

পাখিটা আর সাড়া দেয় না। 'এ্যালায় চুপ করি গেইসে। চুপ করি বসি থাকিবে।' বাঘারু আরো একবার ডেকে ওঠে, চাপা, তার ক্লান্ত শ্বাসটায় সেই চাপা খাদের স্বরটা কেঁপে-কেঁপে ওঠে। গলা দিয়ে নয়, বাঘারু শরীর দিয়েই ডাকছে, শরীরের স্বেদ আর শ্বাস দিয়ে। পাখিটা এবার চুপ করে যাবে।

বাঘারু প্রথমে শুনতে পায় না, কিন্তু তার পরই শোনে, চার দিকে গ্রহণের সেই আওয়াজের ভেতর পাখিটার আরো নরম জবাবি ডাক উঠেছে—'ক-অ-অ-অ-ক্', 'ক-অ-অ-ক্।' এখন যেন আর পুরোটাও ডাকতে পারে না। ডাকটা তুলতেই গলাটা খাদে নেমে যাচ্ছে। বাঘারু যেন দেখতে পায়, পাখিটা সেই ডালের ওপর দুই পায়ের ভেতর শরীরটা ডুবিয়ে আর ঘাড়ের ভেতর গলাটা টেনে নিয়ে তার দোসরের জন্যে, অপেক্ষায়। কোথায় সে আছে তার সঙ্কেতটুকু জানতে গলা দিয়ে শুধু আওয়াজটা বের করে যাচ্ছে। একবার সে সঙ্কেত জেনে এই অন্ধকারে উড়ে চলে আসবে।

বাঘারু দুই হাত মুখের কাছে এনে চাপা স্বরে, খাদে, আবার সেই আওয়াজটা তোলে, বুদ্বুদ তোলার মত। বাঘারু আবার ডেকে ওঠে। বাঘারু আবারও ডেকে ওঠে।

দুই হাত মুখের কাছে ধরে ডাকতে-ডাকতে বাঘারু একটু এগিয়ে যায় ডায়নার দিকে। গ্রহণের অন্ধকারে ডায়নার ফেনা পাথর থেকে ছিটকে-ছিটকে উঠছে বাঘারু জলে পা দিয়ে ডাকতে-ডাকতে একটু এগয়।

যে-বাঁকে নদী ফরেস্টের অন্ধকারের ভেতরে সেঁদিয়ে গেছে—উজানে, সেইখানে, বাঘারু দাঁড়ায়। ডায়নার জলের সঙ্গে মিশে, ডায়নার ওপর দিয়ে সেই পাখির কুহর চলে আসতে থাকে। পাখির পুরো শরীরটাই যেন ডাকছে এমন গহন সেই কুহর। বাঘারু তার শুকনো রক্ত-লাগা দুই হাত ঠোঁটের কাছে এনে ডেকে ওঠে গভীর খাদে। সেই ডাকের ভেতর হাঁপ এসে যায়। বাঘারুও যেন, পাখিটার মতই, পুরো ডাকটা ডেকে উঠতে পারে না। পাখি আর বাঘারুর ডাকাডাকি ঘিরে গ্রহণের অকাল-আঁধার বনজঙ্গলের আওয়াজে ভরে-ভরে ওঠে। এখনই গ্রহণ শেষ হয়ে আবার সূর্যোদয় ঘটবে।

পঁচাশি

বনপর্বের শেষ অধ্যায়

সেই সকালে বাঘারু তার বাথান নিয়ে পাহাড়ে উঠেছিল পশ্চিমের চড়াই দিয়ে। এখন বিকেল, বা সন্ধ্যায়, পুবের ঢাল দিয়ে নেমে এল। সূর্যে হঠাৎ গ্রহণ লেগে যাওয়ায় বিকেল বা সন্ধ্যেটা একটু দুবার ঘটে যাচ্ছে, এই যা। নদীর বুক থেকে বাথান নিয়ে বেরিয়ে বাঘারু আবার নদীর বুকেই ফিরে আসে—মাঝখানে তার বাথানে মোষ বাড়ে একটা। এই মিলে বেশ একটা সম্পূর্ণতার ভাব আসে।

এমন কোনো ঘটনাও ত বাঘারুর নেই, যা একটা কোথাও আরম্ভ হয়ে একটা কোথাও শেষ হয়। প্রাকৃতিক কোনো কিছুই ত তেমন হয় না।

বাঘারুর সব ঘটনাই তার আগে থাকতে ঘটে আসছে, আর তার পরেও ঘটে যেতে থাকে। মানবিক সব ঘটনা ত এমনই ব্যক্তিনিরপেক্ষ।

বাঘারুর সব দিনই ত হুবহু এক। সে ত আর দিন কাটায় না যে একটার পর একটা দিন মিলে তার জীবন তৈরি হবে। বাঘারু জীবন কাটায়, পুরো আস্ত একটা জীবন। একটা দিন ত সেই জীবনের অতি তুচ্ছ একটা মাপ মাত্র।

বাঘারুর প্রতিটি দিনই এক-একটা পুরো জীবন। প্রতিটি ভঙ্গিই ত বীরত্বের ভঙ্গি—সে নদী সাঁতরানোই হোক আর পাথরে শুয়ে থাকাই হোক, ভোখার সঙ্গে খেলাই হোক আর বুড়িয়ালের পিঠে দাঁড়ানোই হোক। সে মোষের বাচ্চা বের করাই হোক, আর পাখির ডাক ডাকাই হোক।

ভাষা মানেই ত অর্থ। বাঘারুর ত কোনো অর্থ নেই। বাঘারু ত শুধু বাঁচা আর বাঁচা, সে ত শুধু জীবন আর জীবন।

ভাষা মানেই ত কিছু-না-কিছু অলঙ্কার। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত বাঘারুর সারা গায়ে, মাঝখানে একটা নেংটি ছাড়া, সামান্যতম ঢাকা নেই। বাঘারুর তুল্য এমন নগ্ন ভাষা পাওয়া যাবে কোথায় ?

ভাষা মানেই ত নাম। বাঘারুর ত কোনো নাম নেই। সে ত শুধু কাজে-কাজে বদলে-বদলে যায়—কুড়ানিয়া, বাঘারু, পাথরিয়া, মইষাল…, তাব এই হয়ে ওঠাব ত আর শেষ নেই।

চ র প র্ব

নিতাইদের বাস্তুত্যাগ ও সীমান্তবাহিনীর সীমান্তত্যাগ

ছিয়াশি

ব্রিজে আলো কেন ?

নরেশ ওর লাল টর্চটা জ্বেলে হাতের ঘড়ি দেখে। টর্চের আলো ভেজা এঁটেল মাটিতে গোল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। সেই আলোর বৃত্তে শুধু পা—মাথাছাড়া, ধড়ছাড়া পা ; হাঁটু পর্যন্ত, কুচকি পর্যন্ত খালি পা ; জলেকাদায় বেশির ভাগ পায়েরই হাঁটু পর্যন্ত লেপ্টানো।

নরেশ টর্চ নিবিয়ে দেয়। তাতে মাটির ওপরটা অন্ধকার হয়ে যায় কিন্তু সেখানে টর্চের আলো পড়ে নি। সেই আবছা কুয়াশার মত উজ্জ্বলতার ভেতর দিয়ে নরেশ তিস্তা ব্রিজের দিকে তার নেবানো টর্চটা তুলে দেখায়, নেবানো টর্চটা সহ হাতটা টানটান তুলে দেখায়, যেন ওটা টর্চ নয়—বন্দুক, বা অন্তত রিভলভার, হিন্দি ছবিতে ভিলেইনের হাতে একমাত্র দেখা রিভলভার। রিভলভারের কথা একবার মনে এলে তখন নরেশের টর্চটাকে সত্যি-সত্যি রিভলভারের মতই দেখতে লাগে যেন ; সিনেমায় দেখা রিভলভারের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা মনে-মনে একবার শুরু হলে তখন আবার মনে হয় নরেশের টর্চটা বরং উল্টনো রিভলভারের মত দেখতে—নলটা নরেশেরই বুকে, টর্চের হ্যান্ডেল আর ঘোড়াটা হচ্ছে কাচে ঢাকা বাল্ব। কিন্তু সেই উল্টনো টর্চ থেকে এখন অন্ধকারই ছোঁড়া হয় তিস্তা ব্রিজের দিকে।

নরেশ বলে—'রাত্তির বাজে দশটা, এখনো তিস্তা ব্রিজের আলো নিবায় না ?'

সবাই তখন তিস্তা ব্রিজের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়।

নরেশের টর্চের ইঙ্গিতে এরা সবাই তিস্তা ব্রিজের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। ঘুরে দাঁড়ানোর দরকার ছিল না, শুধু ঘাড়টা ফেরালেই দেখা যেত, আর দেখার জন্যে ঘাড় ফেরানোরও কোনো বাধ্যতা ছিল না, একেবারে উল্টো দিকে তাকিয়েও ত বোঝা যায় পেছনে তিস্তা ব্রিজে আলো জ্বলছে। কিন্তু, এখন, নরেশের কথায়, আবার খানিকটা যেন রিভলভারের মত উদ্যত নরেশের টর্চের নেবানো নির্দেশেই, ওরা ঘুরে দাঁড়ায় এবং দেখে, তিস্তা ব্রিজের আলো নেবে নি। ঘড়ি দেখার জন্যে নরেশের টর্চের আলো একটু আগে ভেজা মাটিতে গোটা-গোটা এত পা মাটি থেকেই খুঁড়ে তুলেছিল আর সেই পাগুলোর লম্বা, কোনাচে, খাটো ছায়াগুলো পরস্পরকে কাটাকুটি করে মাটিতে এমন জট পাকিয়ে-পাকিয়ে গিয়েছিল বা গা বেয়ে উঠে শরীরের ওপরের অন্ধকারে এমন মিশে গিয়েছিল, যেন, তখন, নরেশের টর্চের চৌহদ্দিতে, মানুষের বন যদি নাও হয়, অন্তত দিগন্ত-আকাশে, মানুষের ভিড়। কিন্তু এখন, এই নদী থেকে আকাশজোড়া কুয়াশার মত আচ্ছন্নতার নীচে, দেখা যায় এরা মাত্র গুটিকয়েক মানুষ, যেন আকাশ-মাটি বিস্তৃত এই কুয়াশায় পথ হারিয়ে ফেলেছে, যেন, যেখানে তারা দাঁড়িয়ে সেটা কোনো মাটি নয়, চর নয়, বরং একটি নৌকো, মোহানায় পথহারানো নৌকো। তেমন একটি নৌকোয় যাত্রীরা, মাঝিরা, যেমন ও-রকম একটা ছোট কাঠের টুকরোর ওপরে কোনো রকমে দাঁড়িয়ে থেকে [illegible] দিয়ে তীর খোঁজে, শুধু চোখ দুটো দিয়ে, আর সেই জলপ্রান্তরে তাদের ভেসে থাকাটাকেই সবচেয়ে অপ্রাসঙ্গিক ঠেকে, এরা, এই চরের এই গুটিকয়েক মানুষ তেমনি সামনে তিস্তাব্রিজের আলোর দিকে তাকিয়ে থাকে—চরটা ভাসতে-ভাসতে ঐ ব্রিজে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে যাবে এমনই এক আতঙ্কে। তখনো, ওদের এই চরের উত্তর পাড়ে তিস্তার জল এসে ধাক্কা খেয়ে, ডাইনে ঘুরে, শহরের দিকের পাড়ে গিয়ে আছড়ে পড়ছে। কিন্তু এখন আর ওদের কানে সেই আওয়াজটা আসছে না—জলের সেই লোহা-গুঁড়ানো আওয়াজ, কারণ গত তিনদিনে এই আওয়াজটা ওদের অভ্যাসে ঢুকে গেছে। এখন তাদের গলা তুলে কথা বলতে হয়, নইলে শোনা যায় না। বাতাস ত উড়িয়ে নিয়ে যায়ই, জলের সেই আওয়াজেও চাপা পড়ে যায়। কথা বলার সময় নিজেদের স্বরগ্রাম তুলে ওরা নদীর বন্যার আওয়াজকে চাপা দিতে চাইছে, এই ক দিন।

কেউ একজন বলে—'ভুলি গেইসে।'

'ভুলে ত রুজ সন্ধ্যায়, আইজ একিবারে মাঝরাত্তির পর্যন্ত ভুইল্যা থাইকল ?'

'সিনেমা দেখিবার গেইসে, ফিরে নাই'—ভঙ্গিতে রাবণকে চেনা যায়।

'শ্বশুর বাড়ি গিছে, শালা, তিন রাত্রির ধইর‍্যা বিচি কপালে উইঠছে, কয় সিনিমায় গিছে ?'—জগদীশ বারুই খেপে উঠে বলে। একটা সামান্য হাসির আঁচ পাওয়া যায়। রাবণ জগদীশকে খেপানোর জন্যেই

বলেছিল। জগদীশও খেপে উঠেছে। 'চুখ ভাল কইর‍্যা মেইল্যা দ্যাখ, ব্রিজের উপর গাড়িটাড়ি আছে, নি নাই ?' নরেশ বলে আর ডান পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে সোজা হলেই চোখের দৃষ্টি বেড়ে যাবে, এমন ভাবে সে ব্রিজের দিকে তাকায়।

'আওয়াজ পাও নি ? ট্রাকের ?' জগদীশ এবার মাটির ওপর উবু হয়ে বসে বিড়ি ধরায়। তার চোখে ছানি পড়েছে, দিনের বেলাতেই এখান থেকে অত বড় ব্রিজটাকে মনে হয় ওপারের গাছগাছালি। দেখতেই যখন পারছে না, মিছিমিছি খাড়া দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কী ? বরং, এই ভিড়ের মধ্যে বসে পড়লে, যেন তিস্তা ব্রিজের আলোজ্বলা বিপদ কিছুটা কাটবে।

সেই ভিড়ের তলা থেকে জগদীশের চিৎকার, 'কী ? দেখা যায় কিছু ? নড়াচড়া ?' একটু সময় কাটে, যেন জগদীশের নির্দেশমত ওরা ভাল করে দেখছে, সত্যিই কিছু দেখা যায় কি না। তারপর চীৎকার করেই বলে, 'অয়, অয়, দেখা যায়, দেখা যায়।' আরো একটু সময় কাটে, তর্জনী আর মধ্যমার মাঝখানে বিড়ি আঙুলের গোড়াব দিকে। মুঠো পাকিয়ে রেখেও জগদীশ টানে না, উত্তেজনায়। তারপর রেগে ওঠে, 'হালা শুয়াবেব বাচ্চা, দেখা যায ত কওয়া যায় না ?'

সকলে আবারও হেসে ওঠে। কথাটা জগদীশকে খেপানোর জন্যে গজেন বলেছে, আর জগদীশও খেপেছে।

'এ জগদীশ, তুই আয় কেনে এইঠে, দেখ ত, নজর করি দেখ, ব্রিজটা আছে কি নাই, মোর মনত খায় কি ব্রিজটা নাইবো—', জগদীশের প্রায সমবযসী বাবণেব গলা আবাব শোনা যায়। কিন্তু জগদীশের ছানি নিয়ে এই ঠাট্টাতেও সে চটে না, মনে-মনে চটে উঠলেও মুখে কিছু বলে না। একটু সময় কেটে গেলে নরেশ তার টর্চটা মাথার ওপর তুলে, ব্রিজের দিকে ফেলে, জ্বালায়, যেন, সে এতক্ষণ ধরে এই হিশেবই কষছে যে টর্চটা জ্বালালে কত দূর যাবে।

নরেশের সন্দেহ হয়, টর্চটা বোধ হয জ্বলে নি। সে সুইচটা অফ করে আবার জ্বালায। কিন্তু আবারও তাকে অফ করতে হয়। এবার নীচে নাবিয়ে একটা ঝাঁকি দিয়ে টর্চটা নিজের মুখের দিকে ঘুরিয়ে অন করে আর সঙ্গে-সঙ্গে চোখ বোজে—আলোতে তাব চোখ ঝলসে যায়।

'আরে নবেশুয়াক দেখি উমরার টর্চখানও নাজ্জা পাইসে হে,' রাবণের এ কথায় সকলেই হেসে ওঠে। ভিড়ের মাঝখানে জগদীশ বাকই যে হঠাৎ মাটির কাছাকাছি থেকে কেশে ওঠে তার কাবণ, এক হতে পারে, সে-ও হেসে ফেলেছিল, তারপব বিড়িব ধোঁয়ায় কেশে ফেলেছে, আব, নয ত, এত হাসিব মাঝখানে সে একটু কেশে জানান দেয়, সে-ও আছে, কিন্তু বসে।

নরেশ আবার মাথাব ওপব তুলে ব্রিজ লক্ষ করে টর্চটা জ্বালে। এবাব বোঝা যায, তার টর্চেব আলো জ্বলছে কি না টেব পাওযাই যায না—কুয়াশা আব হাওয়া এতই জমাট। যেন, বাতাস সেই টর্চের আলোটাকেও মুহূর্তে মুছে ফেলছে। তাব টর্চের আলো যে এই ঝড়-জল ভেদ করে একটুও যেতে পারে না, এতে যেন নরেশেব একটু অপমান ঘটে, নিজেব কাজে নিজের অপমান। খানিকটা আশঙ্কাও বটে। কারণ, এই টর্চটাই ত গত কদিন ধরে তাকে একটু মর্যাদা দিচ্ছিল, অন্তত রাতটুকুতে তাকে ছাড়া চলছিল না। কিন্তু এখন চোখের সামনে তিস্তা ব্রিজের লাইন বাঁধা আলো সত্ত্বেও, এখানে সে যে তার টর্চ দিয়ে একটু বিঁধতেও পারল না চারপাশের জল মেশানো বাতাস, তাতে ত তার ওপর সকলের সেই আগেকার নির্ভরতা একটু কমে যেতে পারে। নিতাই চিৎকার করে ওঠে, 'এই কায় আছিস, যা ত চট করি দেউনিয়ার রেডিও ধরি নিয়া আয়।'

জগদীশ 'রে-রে' করে দাঁড়িয়ে পড়ে—'এই এই, বৃষ্টির জলত ব্যাটারি ডাউন হয়্যা যাবে, ডাউন হয়্যা যাবে, একখান রেডিওই এখন ভরসা, কানকাটু মাস্টারেরটা ত আগেই গিছে, রেডিও আনবা না, রেডিও আনবা না।'

জগদীশ তারপরে দুই হাত সামনে দুলিয়ে বলে, 'কই ? কেউ যাও নাই ত ? অ্যাঁ, কথা কয় না কেন্ কেউ ?'

নিতাই চিৎকার করে ওঠে, 'কথা আবার কী কবে নে ? তোমার সব তাতেই পুতুপুতু। ব্রিজের উপর এত রাত্তিরে আলো জ্বলে, তা হালি কি এক্কেরে লাল সিগন্যাল দিল নাকি, রেডিওতে শুইনতে হবে না ? নাকি কাকির সঙ্গে সিনেমার গান শুইনব্যা নে ?'

'চুপ যা হারামজাদা', জগদীশও চিৎকার করে ওঠে, 'শুইনব্যার হয় ত বাড়িত গিয়্যা শুইন্যা আয়, তা

আবার এইখানে রেডিও আননের কী আছে, এহন কি 'পতিঘাতিনী সতী' পালা হব নাকি ? যত্ত সব—'

জগদীশ দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সে প্রায় কিছুই দেখতে পায় না বলে দাঁড়িয়ে একটা দিকে মুখ রেখে চেঁচায়। তার ঘাড় ফেরানোর ভঙ্গিতে একটু অনিশ্চয়তা ছিল যে যার উদ্দেশে বলছে, সে তার সামনেই আছে, কি না। কথার শেষে জগদীশ হাত মুঠো করে একটা খুব জোরে টান দেয়, কিন্তু বুঝতে পারে আগুন নিভে গেছে। সে হাতটা ঝাঁকিয়ে বিড়িটা ফেলে দেয়। বিড়িটা পড়ে না, তার হাতেই লেগে থাকে। জগদীশ মাথায় হাত দিলে বিড়িটা তার মাথার চুলে গেঁথে যায়। 'তো যা না নকু, রেডিওটা শুনি আয়, বানার সিগন্যালটা শুনিই চলি আসবি—' জগদীশ বলে।

নকু বলে, 'এইঠে খাড়ি-খাড়ি গাব না পাকি চলো কেনে সগায় যাই, এ্যালায় ত সিগন্যাল দিবারই নাগিসে, মুই আসার বাদে যদি আবার দেয় ?'

'ত্যামন হলি ত তর জেঠি নোক পাঠাইবে, কাথা আছে, যা বাবা, আমরা এইখানে খাড়াইয়্যা-খাড়াইয়্যা ব্রিজের আলোর বৃত্তান্তটা দেখি', জগদীশ বলে।

'অয়, অয়, জগদীশের আঁখতৎ ত ফোকাচিং লাইট', রাবণ আস্তে কবে বলে। নকু চলে যায়। জগদীশ তার ধুতির খুঁট থেকে দুটো বিড়ি আর দেশলাই বের করে। একটা বিড়ি বাড়িয়ে ধরে বলে, 'কায় খাবে ? নে।'

রাবণ বিড়িটা নিয়ে বলে, 'বাপের তালই বসি আছে, দেখিবাব পাস না ?'

জগদীশ দেশলাইটা জ্বালাতে যায, পারে না। তারপর, আবার সে সেই ভিড়ের মধ্যে বসে পড়ে। এবার আঁজলার মধ্যে আগুনটাকে বাঁচিয়ে বিড়িটাকে ধবাতে পাবে। রাবণও উটকো হয়ে বসে তার হাতের স্পর্শ দিয়ে বোঝায় সে আগুন চাইছে। জগদীশ আগুনটা এগিয়ে দেয় না, কিন্তু আঁজলার ওপর থেকে তার মুখটা সরিয়ে রাবণকে জায়গা কবে দেয়। দেশলাই কাঠির আগুন থেকে জগদীশের কোঁচকানো চোখ, নাকের দুপাশ আর গলাটাতেও আলো পড়ে। সেটা মুছে রাবণ তার মুখ এগিয়ে দেয়।

সাতাশি

জগদীশের রাগ

ওরা বিড়ি খাচ্ছিল বিড়িটাকে হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে। এর মধ্যে আরো দ্-একজন জগদীশ আর রাবণের আশেপাশে বসেও পড়ে। তাদেরও মধ্যে দু-একজন বিড়ি ধরায়। ...ক্ষণ এরা সবাই দাঁড়িয়ে ছিল তিস্তা ব্রিজের আলোর-দিকে তাকিয়ে ততক্ষণ বাতাস ও জলের ছাটের কথা যেন ওদের খেয়াল হয় নি। কিন্তু মাটিতে উবু হয়ে বসার পর বাতাস ও জল থেকে শরীর বাঁচাতে মাথাটা বুকের ওপর ঝুলিয়ে দেয়। যেন, ঘাড় ও পিঠটা তাদের শরীরের অংশ নয়। যেন, ঘাড়ে ও পিঠে বোঝা বইতে-বইতে, সেখানে একটা প্রতিরোধ ক্ষমতা স্বতই জন্মে আছে।

নরেশের টর্চের আলোতে পায়ের স্থাপত্য দেখা গিয়েছিল। তিস্তা ব্রিজের দিকে তাদের সমবেত তাকানোতে, পটভূমির সঙ্গে মিশে যাওয়া এই বর্ণভঙ্গতে, গায়ে-গা-লাগানো তাদের দেখা গিয়েছিল ; এখন তাদের দেখায় যেন মূর্তির ধ্বংসস্তূপের মত— সেখানে বাতাসের জোর এতই যে মূর্তির ভঙ্গি বদলে যায়। নকু যখন জগদীশের বাড়িতে রেডিওর খবর শুনতে গেছে, তখন ওদের অপেক্ষা করতেই হবে। রাত দশটার পরও তিস্তা ব্রিজের বাতি জ্বলা দেখে একবার রেডিও না শুনে থাকে কী করে। রেডিও বন্ধ হওয়ার পবও সারাটা রাত থাকে বটে কিন্তু শিলিগুড়ি থেকে শেষ খবরেও নতুন কিছু না বললে, কেমন একটা আশ্বাস জোটে, বোধহয় নতুন কোনো বিপদ হবে না। কিন্তু নতুন বিপদের দরকারই-বা কী ? পুরনো বিপদই যদি আর-একটু এগিয়ে আসে তাহলেই সেটা এদের পক্ষে চরমতম ও নতুনতম বিপদ হয়ে উঠতে কতক্ষণ।

'হে নিতাই, তোমরালার পার্টিত কী কহিল বানার কথা, আসিবেক, না, না আসিবেক ?' নিতাই তার পার্টি থেকে এই চরের গ্রামসভার সদস্য। এই চরকে যুক্ত করে দেয়া হয়েছে ওদিকে দোমোহনির গ্রামসভার সঙ্গে। একটা গ্রাম এই চর, আর-গুলো আছে ডাঙাতেই। পঞ্চায়েতের অফিসও সেখানেই।

'কহিল্ যে কমোরেড, বানা আসিলে কিন্তু আসিবেন না, না আসিলে কিন্তু কুনোভাবেই আসিবেন না', গজেন আস্তে বলে। এখানে এত আস্তে বলা কথা শোনা যাচ্ছিল না। কিন্তু ওরা সবাই মাথা নিচু করে বসেছিল বলেই বোধহয় শোনা যায়। যেন, যদি ওরা মাথাটা বুকের ওপর হেলিয়ে ও-রকম চুপচাপ কথা বলে যায়, তাহলে পরস্পর ভালই শুনতে পাবে। গজেনের কথার জবাব না দিয়ে নিতাই বলে, 'পার্টি আবার কবেডা কী, অ্যাঁ, পার্টি কবেডা কী? বৃষ্টি হবার ধরছে পন্দর দিন ধইর‍্যা, আর সঙ্গে বাতাস, পাহাড়ঠে বানা নামিছে, তা পার্টির এইঠে কী কহার আছে, কহেন দেখি—'

'এইডা একটা কথা হইল রে নিতাই। এত বড় একখান পার্টি তর, তক না পুছি পাহাড়ঠে বানা আসি ঠেলা মারিবে বানাব এ্যানং সাহস? বদলি করি দে বানাক, ট্যানেসফার করি দে।'

নিতাই একটু চুপ করে থাকে, যেন কথাটার একটা জবাব খোঁজে। তারপর বলে, 'মুই কহি আসিছু। আমিই কয়্যা দিছি পার্টিক।'

'কী? কী কহিছিস?'

'কয়্যা দিছি, আমাগো চরখান যদি ভাইস্যা যাব্যার দ্যাখেন আমাগো জন্যে মিলিটারি পাঠাইবেন না, ক্যাম্প বসাইবেন না, রিলিফ দিবারও নাগবে না—কয়্যা দিছি।'

'রাগিস ক্যান বোকা, চুপ যা', জগদীশ যেন গোপন পরামর্শ দেয়।

'আরে আমি ত চুপই আছি, দ্যাহ না, মুখ চাইপ্যা ধইরলে সব পাছা দিয়া কথা কয়—' নিতাই জবাবে বলে।

'পাছার কথায় ত গন্ধ বাড়ায়, ঐ কথা শুননের কামডা কী?' জগদীশ মাটির দিকে তাকিয়ে বেশ চেঁচিয়ে বলে, যাতে সবাই শুনতে পায়, তারপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সবার হাসি শোনার জন্যে। কিন্তু কেউ হাসে না, এমন কি নিতাইও না। জগদীশের নিজেরও হাসার সময় পেরিয়ে যায়। তা হলে এখন, আবার বলে, আবার হাসতে হয়। শালা নিতাই, সকলের লাথথি খায় তাই ভাল, উয়্যার পক্ষে কথা কইলাম—শালা চুপ মাইর‍্যা থাইকল।

জগদীশ রেগে হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে থুতু ফেলে—কারো গায়ে লাগলে সে খুশিই হয়। সে যে রাতে প্রায় কিছুই দেখে না তা সবাই জানে, আর তাই নিয়েই এতক্ষণ তাকে ঠাট্টা করছিল। এখন সেই সুযোগটা নিতে পারে—সে ত দেখতেই পায় না, কার গায়ে লাগল কী করে দেখবে?

কিন্তু তবু কেউ কোনো আওয়াজ করে না। জগদীশের ইচ্ছে হয় উঠে একটা লাথি মেরে দেখবে কেউ আছে কি না, বেশ টানা একটা লাথি।

জগদীশের মাথায় এই ইচ্ছেটা জাগার সঙ্গে-সঙ্গেই হঠাৎ সকলে হো হো করে হেসে ওঠে। নিতাই হাসতে-হাসতে চিৎকার করে, 'এই নরেশ, খোঁচা মারিস কেন তর হাতুড়ি দিয়্যা।'

নরেশও হাসতে-হাসতে চিৎকার করে, 'আমারে গজেন ধাক্কাইছে', কিন্তু হাসির ধাক্কায় আর বলতে পারে না। বলার যেন দরকারও ছিল না, তার সঙ্গে-সঙ্গেই গজেন চেঁচায়, 'আমারে আষাঢ়ু ধাক্কাইছে।' গজেনের কথা শেষ হওয়ার আগেই আর-কেউ যেন বলে ওঠে, 'আরে, ষাঁড়খান গরম হইছে, ফোঁস ফোঁস করিবার ধইরছে, থুতু ছিটাবার ধইরছে।'

অনেকে মিলে চেঁচায়, 'গাই আন, গাই আন।'

আর, জগদীশ উঠে দাঁড়ায়, 'শালারা আসিস এর বাদে, কোন তালই তগ খাওয়ায় দেখি' বলে সেই ভিড় থেকে ছিটকে বেরিয়ে যায়। বেরিয়ে গিয়েও দাঁড়ায় না, হনহন করে হাঁটতে থাকে। বাতাসের বেগে সে ধাক্কা খায়, একটু পেছিয়ে আসে, কিন্তু পা ফেলে এগিয়ে যায়। তার পা ফেলার নিশ্চয়তার চাইতেও প্রধান হয়ে ওঠে বাতাস, এই বাতাসের ঠেলা সামলে তার এগিয়ে যাওয়া। সবাই মাটির ওপর উবু হয়ে, মাথা বুকের ওপর ঝুলিয়ে—ঘাড় আর পিঠটা বাতাস আর জলের ঝাপটের জন্যে খুলে এমন বসে ছিল যেন পাথরের চাঁই। তা থেকে জগদীশের ছিটকে যাওয়াটায় এখন দেখায় যেন এই পাথরের চাঁই পড়ে আছে আর সেটা বেয়ে একা একজন মানুষ মেনে যাচ্ছে তিস্তার স্রোতের চাইতেও প্রবলতায়। তিস্তার স্রোতের ধাক্কা একই রকম, সেই ধাক্কা ঠেলতে-ঠেলতে এগতে হয়, যেন মাথার ওপর বিশমণি পাথর, মাথার ওপর নিলে নিয়ে যেতেই হবে অথবা ঐ পাথরের চাপে বসে পড়তে হবে। আর এই বাতাস যেন শিলাবৃষ্টি—কোথায় যে লাগবে তার আন্দাজ করাও যায় না।

রাবণ এই দঙ্গলের ভেতর থেকে উঠে দাঁড়ায়, তারপর জগদীশের দিকে হাঁটতে শুরু করে। সে

একবার চেঁচায়ও, 'হে-এ জগদীশ' কিন্তু তার ডাকটা উল্টো দিকে উড়ে যায়। রাবণ আর ডাকে না কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে জগদীশকে ধরতে চায়। বাতাসের ধাক্কায় তারা পরস্পর থেকে একই দূরত্বে থেকে যায়। জগদীশকে ডাকার জন্যেই বোধহয় রাবণ একবার হাত তোলে। বাতাসের ধাক্কায় তার হাতটা যেন ভেঙে নেমে আসে। এখন যে-রকম বাতাস আর বাতাসে জলের কণা, তাতে জগদীশ আর রাবণকে দেখতে পাওয়ার কথা নয়, তাদের এই জলকুয়াশার আড়ালে চলে যাওযাব কথা। কিন্তু এখনো যে তাদের দেখা যাচ্ছে, যেন দুটো গাছের মত দাঁড়িয়ে আছে আর বাতাস তাদের উপড়ে ফেলতে চাইছে, তাতেই বোঝা যায় তারা বেশি দূর এগতে পারে নি আর দু-জনের মাঝখানেব দূবত্ব বাতাসে অপরিবর্তিত থাকছে। রাবণ আবারও হাত তোলে, যেন বাতাসই এক ধাক্কায় তার হাতটাকে পেছন থেকে মুচড়ে ওপরে তুলে সঙ্গে-সঙ্গে আবার মুচড়ে নীচে নামিয়ে দেয়। রাবণ হাত তোলে, কিন্তু চিৎকার করে না। তার চিৎকার বাতাসে উল্টো দিকে চলে যাবে, কিন্তু হাত তোলে কেন ? জগদীশ ত তাকে দেখতে পাচ্ছে না। বোধ হয় জলে ডুবে গেলে মানুষ যেমন হাত তুলে বাঁচতে চায়, তেমনি, এই বাতাস থেকে বাঁচতে হাত তুলে ফেলছে মাঝে-মাঝে বাবণ।

এখানে কেউ জিজ্ঞাসা করে, 'কী, খাড়ি আছে, না যাছে ?'

'যাবার দে, যাবার দে, তখন কইল্যাম, তোমার আব এই বাত্তির বেলা পাক খাওয়াব কাম কী, বসি থাকো, রেডিওটা শুনো কুনো খবব বলে কি না, তা না, কয়, ক্যান, আমিও যাব, চল্, এখন দেইখব্যারও পায় না কিছু, কিন্তু সব জাইনব্যার লাগবে। যাবার দে, যাবার দে।'

'রাবণ কাহা আবার পাছ ধইরছে ক্যান ?'

'রাবণ কাহা চলি যাবে, না, জগদীশকাহাক বুঝসুঝ করি আইনবে ?'

'আনিবার দ্যাও, আনিবাব দ্যাও, বাতাস খাবাপ, সগায একসঙ্গে থাকাই মনত লাগে।'

বৃষ্টি এখন জোরেই বইছে, বেশ জোরে, বাতাস না থাকলে সারা শরীর-মাথা ভিজে যেত। কিন্তু এখন বাতাসের বেগে বৃষ্টি সোজা নেই, বেঁকে গেছে। সেই জলেব তীর এই দঙ্গলটাব পিঠেঘাড়ে।

আটাশি

একটা নদীর ভেতর অনেক নদী

এই ঝোড়ো বাতাস, এই বৃষ্টি, এই বন্যার মধ্যেও আকাশ থেকে আলো ছিটক‍্ছে একটা—এমন আলো যা দেখা যায় না। কিন্তু অনেকক্ষণ এই আকাশের নীচে নদীর পাড়ে ঘোরাঘুর করলে বোঝা যায়। সে আলো এমন নয় যে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাবে, বরং উল্টো, সে আলো এমনই, যা চোখের সামনে একটা আড়াল তৈরি করে, এমন ঘের, যা কিছুতেই ভেদ করা যায় না। সে আলো এমনই, যাতে কিছুই স্পষ্ট হয় না, অথচ সব কিছুরই বাইরের রেখাটা দেখা যায়। সব কিছুরই মানে, একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিসীমার ভেতরে সব কিছুর। সে আলোতে মাটি দেখা যায় না, অথচ মাটির অস্তিত্ব বোঝা যায়, পায়ের তলার মাটির অস্তিত্বটুকু, বড় জোর সামনে পা ফেলার জায়গাটুকুরও। সে আলোতে চোখেব সামনে টেনে আনলেও মানুষের মুখের রেখাগুলো স্পষ্ট হয় না, অথচ তীরের ফলার মত বৃষ্টির ছাঁটগুলো এসে ঘাড়ে আর পিঠে বিঁধে থাকলে সেই জলবিন্দুগুলি নিষ্প্রভ এক উজ্জ্বলতায় পিঠটাকে, ঘাড়টাকেও আবছা স্পষ্টতা দেয়। এখন, পিঠঘাড়জোড়া আবছা উজ্জ্বলতায় এই দঙ্গলটা অনেকটা যেন স্পষ্ট, জলে ধুয়ে-ধুয়ে যেমন পাথর স্পষ্ট করা হয়। কিন্তু, তার মধ্যেও, যারা বৃষ্টির ছাঁটটার দিকে পেছন ফিরে বসেছিল—পুবের আর দক্ষিণের সেই লোকগুলির পিঠ ভিজে গেছে বেশি, উল্টো দিকের মানুষজনের পিঠ প্রায় শুকনো।

আলোটা আসছে আকাশ থেকেই, গত তিন দিনের সম্পূর্ণ লোপাট আকাশ থেকে। প্রথম থেকেই বাতাস দিয়ে শুরু, পরে বৃষ্টি এসেছে। যেন, দিন তিনেক আগে বুধবারে, এখানকার আকাশে, বাতাসই কোথাও থেকে খেদিয়ে নিয়ে এল মেঘ। তারপর বাতাসই সেগুলোকে নাড়িয়ে-চাড়িয়ে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আকাশ আর তিস্তার মাঝখানের ফাঁকটা সম্পূর্ণ ভরে দিল। দিনের বেলা সূর্য দেখা যাচ্ছে না—আলোও

মাঝেমধ্যে এত কমে আসছে যেন প্রায়ই অকালে সন্ধ্যা ঘনিয়ে উঠছে। আর ওপরে মেঘ, নীচে নদীর জলের মাঝখানের আকাশ জুড়ে বাতাস একেবারে দাপটে বেড়াচ্ছে। এই বাতাসে জল বাড়ে। এ বাতাস এখানকার বন্যার বাতাস না। ওপরে, পাহাড়ের ভেতরে কোথাও বর্ষা শুরু হয়েছে—সেই বর্ষা, যা মাটির তলায় ঢুকে যায়, তারপর সেখান থেকে মাটি ফুঁড়ে, গাছ উপড়ে, পাথর টলিয়ে নেমে আসে নদীকে একেবারে দ্বিগুণ, তিনগুণ চওড়া করতে-করতে। এখন ত তিস্তার প্রায় মাথা থেকে শেষ পর্যন্ত বাঁধে মোড়ানো। কিন্তু, বাঁধ ত আর মাটিকে গভীর করে তুলতে পারে না। খাত-না-পাওয়া জল ফুঁসে উঠে বাঁধের গায়েই ধাক্কা মারতে চায়। তারপর আবার বিপরীত আক্রোশে ফিরে আসে কিছু মাটি খুবলে নিয়ে। সেই জন্যে বাঁধ থেকে লম্বা-লম্বা স্পার নদীর মধ্যে চলে এসেছে, জল যাতে সোজা পাড়ে গিয়ে ঘা না মারতে পারে।

বর্ষার তিস্তায় ত এ-রকম কোথাও না কোথাও হবেই। কোথায় হবে সেটা নির্ভর করে পাহাড়ে কোথায় বৃষ্টি হচ্ছে। এখানে না হয় এই একটা নদীকেই তিস্তা বলে, এখানে—এই সমতলে। কিন্তু ওপরে, পাহাড়ে, তিস্তা ত আর একটা নদী নয়। কোথা থেকে কত ঝোরা, কত ছোট নদী নেমে এসে তিস্তায় মেলে।

এত জায়গায় এত স্রোত তিস্তা দিয়ে যায় বলেই তিস্তাও যেন নিজেকে এমন ছড়িয়ে দেয়। এমন-কি এই সমতলে, যেখানে তিস্তা তিস্তাই, সেখানেও পশ্চিম পারে বোদাগঞ্জ-রংধামালি-জলপাইগুড়ি-হলদিবাড়ি আর পুব পারে মাল-লাটাগুড়ি-দোমোহনি-ময়নাগুড়ি- বার্নেশঘাট-বাকালি-মেখলিগঞ্জ এই দুই পারের মাঝখানে তিস্তা মাইল-মাইল ছড়ানো-ছিটনো। যাকে তিস্তা বলা হয়, যে-জায়গাটিকে তিস্তা বলে সব সময় দেখা হয়, দেখানো হয় তার সবটা জুড়ে ত আর কখনো জল থাকে না। তিস্তা কোনো নদী নয়, এটা একটা ভূখণ্ড। শীতকালে এই ভূখণ্ডের মধ্যে পাথরের টিলা জেগে ওঠে, তাকে ঘিরে সুতোর মত সরু কিন্তু স্থায়ী জলরেখা সোনা রঙের বালিকে সব সময় ভিজিয়ে রাখে, আর ভেজা বালিতে সেই টিলার জীবন্ত ছায়া সকাল থেকে সন্ধ্যা ঘুরে যায়। এই ভূখণ্ডের কোনো অংশ জুড়ে নরম সবুজ কচি ঘাসের মাইল-মাইল বিস্তারে গরুমোষের বাথান ঘুরে-ঘুরে বেড়ায় আর আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই দিগন্তের দিকে তাকিয়ে রোমন্থন করে। এই ভূখণ্ডের কোনো অংশ জুড়ে নতুন কোনো অরণ্য জেগে ওঠে। কাশফুলের মাইল-মাইল বিস্তারকে দূর থেকে শরতের রোদে জল বলে বিভ্রম জাগে।

বর্ষায় এই সব আবাব ধ্বংস হতে থাকে। তিস্তার কোন খাত দিয়ে কখন জল গড়াবে তা কেউই জানে না। কোনো বর্ষায় ডাইনে, পশ্চিম পাড় ভাঙে ত, তার পরের বর্ষায়, বাঁয়ে পুব পাড় ভাঙে। এমন-কি একই বর্ষার মাঝখানেও খাত বদলে যায়। বর্ষা জুড়ে জলের তলায় সেই অদলবদলের পর আবার শরৎ থেকে ধীরে-ধীরে তিস্তার ভূখণ্ডের নতুন চেহারা দেখা যায়। যেখানে জল ছিল না, সেখানে স্থায়ী স্রোত ভেজা বালির মধ্যে দিয়ে বইছে। যেখানে অনেকদিনের নদী বইছিল, সেখানকার জল হঠাৎ সবুজ হয়ে যেতে শুরু করে, কোথায় মূল নদীর স্রোতের সংযোগ তার আটকে গেছে, সহসা আবার জেগে উঠেছে পাথুরে টিলা—মাথার ওপরে বনের একটা ছোট টুকরো নিয়ে, সেই টুকরোর ওপরে প্রায় পঞ্চবটী বনের মত যেন বাছাই গাছ, কোথায় মাটির চর জেগে উঠেছে—হালেবলদে কলা গাছে আর ছনের ঘরে সেখানে দেখতে-দেখতে একটি জনবসতি গড়ে ওঠে, তিস্তার বড় খাতটা থেকে অর্ধেক জলই আরেক খাত দিয়ে বইতে শুরু করে দেয়, নৌকাগুলো চরে আটকে যায়, তারপর নদী বদল করে, নদীর ভেতরেই নদী বদল করে। তিস্তা ত একটা নদী নয়—একটা নদীর ভেতরেই অনেক নদী।

বছরে ছ-মাস প্রায় এই ভূখণ্ডজোড়া অনেক নদীর পারস্পরিক যোগবিয়োগ ঘটতে থাকে।

কোনো নদী, বা সোঁতা, তার বহুদিনের খাত থেকে উঠে আসে, যেন মাটির সঙ্গে লেপটে থাকা হাতি হঠাৎ তার শুঁড়টা প্রথমে আকাশে নাচিয়ে, তারপর দুই-তিন ধাক্কায় এক ঘূর্ণিঝড় তুলে, জেগে উঠল, আর নিজের এতক্ষণের ঘুমের ক্ষতি পোষাতে, যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই, খানিকটা ছুটে, আবার ফিরে আসে, তার পায়ের চাপে ধুলোর ঝড় ওঠে, তার গা থেকে ধুলোর ঝড় ঝরে, তার শুঁড়ের ঝাপটে শুকনো ঝড় মাটি থেকে আকাশে লাফিয়ে ওঠে হঠাৎ। তারপর, এমন হতে পারে, সে আবার তার পুরনো খাতেই ফিরে- যাবে, অভ্যস্ত পুরনো খাতে। আবার, এমনও হতে পারে, ছুটতে-ছুটতে খেলতে-খেলতে ঘুরতে-ঘুরতে, নিজের তৈরি ধুলোর ঝড়ে তার নিজেরই চোখে আঁধি লাগে। সে আর

তার পুরনো খাত চিনে নিতে পারে না।

কোনো নদী, বা সোঁতা, তার মূল ধারা থেকে ছিটকে চলে যায়, একটা বড় হাতির পাল বা চলমান মহিষ বাথান থেকে যেমন কোনো বাছুর একটু বেশি স্বাধীনতায় এদিক-ওদিক করতে-করতে দলছুট হয়ে পড়ে। দলছুট হওয়ার প্রথম আনন্দে সে যেন তার স্বাধীনতার স্বাদ পেতে থাকে চারপাশের আকাশবাতাস থেকে। মাটি কত রকম, কোন মাটিতে কী ভাবে হাঁটতে হয় সে-সবও দলের কাছ থেকে যার শিখে নেয়া হয় নি,·সে তার নিজের গায়ে-গায়ে মাটি চিনে নেই, ছোট্ট শুঁড় বা লালচে নাক তুলে বাতাস থেকে অজানা সব ঘ্রাণ নিতে শেখে। যেন সে জানেই, এ-রকম ভাবে আবার পালে বা বাথানে ফিরে যাওয়া যায়। কিন্তু তারপর সেই তরুণ হাতি বা মহিষ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে অদৃঢ় ঘাড় একবার পেছনে ফেরায়। তখনো সে ঘাড়ে, অতিক্রান্ত পথ দেখার অভিজ্ঞতার দাগ পড়ে নি। তখনো সেই খাটো শুঁড়ে নিজের অতিবাহিত বাতাস শোঁকার টান পড়ে নি। একবার, একবার শুধু নিজের লুপ্ত পদচিহ্নের জন্যে তীব্র করুণ ডাক দেয়। তারপর প্রতিধ্বনিকে প্রত্যুত্তর ভেবে পালে বা বাথানে ফিরে যাওয়ার জন্যে ভয়ের তাড়নায় ছোটে। সেই তরুণ পশু তখনো ধ্বনি-প্রতিধ্বনিব নিয়ম শেখে নি। সে-নদী, বা সোঁতা চিরকালেব জন্যে তার মূল খাত থেকে ছিন্ন হয়ে যায়, প্রত্যাবর্তনের সব পথ মুছে দিয়ে।

বা, তখনো পর্যন্ত নদীর মূল ধারা অবিচ্ছিন্ন গতিতে তাব বিরাট বিস্তাব নিয়ে প্রাকৃতিক নিয়মে বয়ে চলে, কোথাও কিছু ফেলে যায়—যেমন তার স্বভাব, যেন, হাতির একটা বিরাট পাল, বা মহিষেরই কোনো বিপুল বাথান। এ ত সেই পালের বা বাথানের নিয়মিত ঘোরাফেরা, চেনাজানা জায়গায়, নিজেদেরই অভ্যস্ত পায়ের ছাপ ধরে-ধরে, নিজেদেরই অভ্যস্ত গাছ-লতা পাতার গন্ধ শুঁকতে-শুঁকতে, নিজেদের ওপড়ানো বা খোঁড়া, গাছ বা মাটি, আরো ভেঙে ও খুঁড়ে, একটু বেশি রকম অসতর্ক অভ্যস্ততায়। কিন্তু হঠাৎ কোথায় যূথপতির কান দুটো খাড়া হয়ে ওঠে, আকাশে গাছেব মত উঠে যায় বিশাল মাথা, কিংবা দাঁতদুটো যেন বাতাস খুঁড়বে এমন শাণিত প্রস্তুতি নেয়, শুঁড়টা তখনো এক অনিশ্চয়তায় মাটির ওপর দোলে আর সেই দোলনেব রেখা ধরে মাটির ওপরে নিশ্বাস পড়ে, ঘাস দোলে, কুটো ওড়ে, বা নাকের গরম নিশ্বাসে সামনে থেকে পোকামাকড় উড়ে যায়, ধীরে-ধীরে সেই শুঁড়ের দোলা বাড়তে থাকে, ডান দিকের পা দুটো একটু-একটু এগিয়ে থাকে,‚ঐ বিশাল মহীরুহের মত শরীরের ঢালে এক তীব্রতা আসে, তারপর হঠাৎ সেই যূথপতি শুঁড় বাতাসে তুলে এক চণ্ড বৃংহতিতে বন কাঁপিয়ে, বা শিং বাতাসে তুলে আর্ত আহ্বানকে প্রতিধ্বনিময় করে নিজেব কান দুটোকে দু পাশে মেলে ধরে ছুটে চলে, এই বৃদ্ধের শ্রুতিতে কানে এসে পৌঁছেছে কোন সন্ততির পথ-হারানো সঙ্কেত, মুহূর্তে পুরো বাথান বা দল তৈরি হয়ে যায়, আকাশে মাঝে-মাঝেই সমবেত আহ্বানেব সঙ্কেত তুলে-তুলে সেই হারানো বাছুরের খোঁজে এই পুরো পাল বা বাথান ছুটে চলে—সংক্ষিপ্ততম ' খ, পথেব মাঝখানে যত লতাপাতা, গাছগাছড়া, সব কিছুকে মুহূর্তে ধূলিসাৎ করে, ফলে সাবা বাতাসে পিষ্ট পাতার গন্ধ মেশাতে-মেশাতে। সেই পাল, বা বাথান তার সন্ততিকে হয়ত আব-কখনোই ফিরে পায় না. কিন্তু তার খোঁজে সে তার চারণভূমিই বদলে ফেলেছে, সেই পাল বা বাথান আর পুরনো জায়গায় ফিরে যায় না।

কিন্তু শুধু নদীই খাত বদলায়, তা ত নয়, ভূখণ্ডই বদলে যায় বছরের ছ মাস জুড়ে। আর তাতে ত নদীও বদলায়, নদীরা বদলায়। অদৃশ্য জলতলে কোথায় বালুবাড়ির ওপর থকথকে পলি পড়ে যায়, একেবারে সাত-আট ইঞ্চি পুরু—এক শীতের রোদে শক্ত হয়ে পরের বর্ষাতেই সেটা ধানি জমি হয়ে উঠতে পারে। আবার সে-রকমই, দু-তিন, বা এমন-কি দশ-পনের, বছরের পুরনো ধানিজমি ও বসতি কলাগাছ-কুলগাছ ডোবানো জল বালির পাহাড়ে ঢেকে দেয়, যেন নদীর তলে কোথাও এক ধারাবাহিক মরুঝড় চলছে। জল সরে গেলে শীতে দেখা যাবে দু-একটা গাছের পাতাহীন শুকনো ডাল—যাদের শুকিয়ে যাওয়া তখনো শেষ হয় নি, দু-একটা আলগা বাঁশ—যেন বালির নিশানার জন্যে সদ্য পোঁতা কিন্তু আসলে বালির তলার মাটিতে সেগুলো পোঁতাই আছে। আর সেই বালির ওপর হুমড়ি খেয়ে থাকা কোনো বাড়ির চালের একটা টুকরো। তখন, শীতে দেখে মনে হয়, জলে নয়, ঝড়ে উড়ে গেছে, চালটা শুধু মুখ থুবড়ে আছে।

এখন, এই বর্ষার ছ-মাস তিস্তার ভেতরে-নদীগুলোর যোগবিয়োগ ঘটে চলেছে তীব্র অথচ অনিশ্চিত এক বেগে। জলের তলে তিস্তা-ভূখণ্ডের ভেতরেও সেই গতি সঞ্চারিত হয়ে গেছে—নাটকীয় ঘনঘটায়,

কিন্তু এমনই দ্রুততায় যেখানে কোনো নাটকীয় পরিকল্পনা নেই

উননব্বই

ভূগোলের ভেতরে ইতিহাস

ওপরে, সেই মালবাজার-ওদলাবাড়ির কাছে মউয়ামারির চর থেকে শুরু করে নীচে হলদিবাড়ির কাশিয়াবাড়ি পর্যন্ত তিস্তার, মানে, তিস্তা বলতে যে-ভূখণ্ড বোঝায়, তার, একেবারে মাঝখানে, লোকবসতি তৈরি হয়ে আসছে অনেক দিন হল। কিন্তু সে অনেক দিনেরও একটা ইতিহাস আছে।

রাজবংশীরা তিস্তার চরে সাধারণত বসতি গাড়ত না, গাড়ে নি। তারা বরং যেন বেশি অভ্যস্ত ছিল তিস্তার পারে—জঙ্গলের মধ্যে। সেই জঙ্গল তাদের খেতিজমি দিত, দরকারী সার দিত, ঘর তুলবার ডালপাতা দিত।

নদীর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল নদীর স্বভাবের মতই যখন যেমন, তখন তেমন। যে-নদী এমন ঘন-ঘন বদলায়, যে-নদী, নদী হিশেবে চিনতে-চিনতেই, ডাঙা হয়ে যায় আর ডাঙা, নদীর ভেতর চলে যায়, সে নদীকে নদীর জায়গা ছেড়ে দিয়ে রাজবংশীরা বনান্তরাল থেকে নদীকে ব্যবহার করত। ব্যবহার বলতে যে শোষণও বোঝায়, তেমন ব্যবহার নয়। এ যেন এই নিসর্গের মতই ব্যবহার—জলপাইগুড়ির এই নিসর্গ, যেখানে গহনতম ফরেস্ট নদীর জলপ্রান্তরকে আড়াল দিয়ে রাখে, যেখানে পাহাড়ের ঘের সেই ফরেস্টকে ঘিরে রাখে। যেন মনে হয়, এ নিসর্গকে দেখাতে পারে, পাহাড়-বন-নদী দিয়ে ঘেরা, পাহাড়-বন-নদী দিয়েই তৈরি এক রক্ষিত নিসর্গের মত। দেখাতে পারে এমন যে ঘিরে রাখা পাহাড় থেকে ধাপে-ধাপে নেমে এসেছে এই নদী বন-পাহাড়, যেন, এখানে এই ঘেরের মধ্যেই থাকবে বলে। এ ত মানসসরোবর নয়। এখানে, এই সীমার দক্ষিণে কোনো পাহাড় নেই, তিস্তা সেই মুক্তিতেই মিশে গেছে। কিন্তু তিন দিকে ত আছে। সেই তিন দিক ঘেরা এই দেশে পাহাড়-বন-নদীর যে-সহাবস্থান ভূগোলের কারণেই ইতিহাস হয়ে উঠেছে, রাজবংশীরাও এই নদীর সঙ্গে সেই সহাবস্থানের নীতিতেই চলে আসে। সেখানে কোনো আক্রমণ নেই, কোনো দ্বিতীয় পক্ষ নেই, কোনো সংঘাত নেই। সেই অর্থে, রাজবংশীদেব সঙ্গে তিস্তার সম্পর্কই নেই কোনো। কারণ, সম্পর্ক বলতেই ত দুইটি আলাদা জিনিশের ভেতরকার এক সংযোগকে বোঝায়। রাজবংশী সমাজ আর তিস্তা ত দুটো আলাদা জিনিশই নয় যে সেখানে আবার একটা সংযোগের দরকার হবে।

সেই সংযোগের দরকার হল, যখন দেশ স্বাধীন হওয়ার পর 'ভাটিয়া'রা এখানে এত বেশি সংখ্যায় আসতে লাগল যে জনসংখ্যার পুরনো অনুপাত আর টিকল না। এই 'ভাটিয়া'দের মধ্যে যারা আরো 'ভাটিয়া', তারা এল যেন গায়ে পদ্মা-মেঘনা এইসব জায়গার জলের গন্ধ নিয়ে। তাদের সঙ্গে নদীর সম্পর্ক হচ্ছে আক্রমণের, সংঘাতের, জয়পরাজয়ের, দখলবেদখলের। এই নদীকে তারা চেনে না। তারা যে-নদীকে চেনে তার তল দেখা যায় না, আর এই নদী যেন তার তলদেশের রঙিন পাথরগুলোকে ঢেকে রাখার জন্যেই বয়ে চলেছে। তারা যে-নদীকে চেনে, তার জলের রং কাল, মাটির রং কাল। আর এ নদীর জল রোদের মত ঝলকায়, বড় জোর কাদামাটিগোলা। তারা যে-নদীকে চেনে তার চৌহদ্দি অত্যন্ত চিহ্নিত ও সেই চৌহদ্দির মধ্যে মানুষের সঙ্গে নদীর মরণ-বাঁচন লড়াই। আর, এ নদীর কোনো চৌহদ্দিই নেই—কখনো গাছের মাথায় চড়ে, কখনো গাছ নদীতে মাথা ডুবিয়ে স্নান করে। কিন্তু যত পার্থক্যই থাক—নদী ত নদীই। আর, তারাও, এত উত্তরে এসেও, ঐ নদীর ভেতরে, ঐ অচেনা নদীর ভেতরেই, নিজেদের অভ্যস্ত জীবনযাত্রার অনুষঙ্গ খুঁজে পায়। জলে, জলের চেনা গন্ধ পায়।

পুব বাংলায় নমশূদ্রেরাই প্রধানত তিস্তার চরগুলোতে প্রথম বসতি গাড়ে। দলবদ্ধ ভাবে বসতি হিশাবে। এর আগে, তিস্তার চরের ভামনি বনের ভেতর বাঁশ পুঁতে সেই বাঁশের মাথায় ঘর তুলে যে দু-চারজন কখনো-কখনো থাকত, তারা কখনো বসতি গড়ে নি, বসতি গড়ার মত করে থাকেও নি। কিন্তু নমশূদ্ররা এই চরগুলোতেই আবিষ্কার করল সেই জমি, যার দখলের জন্যে তাদের কারো সঙ্গে দাঙ্গাহাঙ্গামা করতে হবে না। চরের জমি তারা চেনে—নিজেদের পছন্দমত জমি তারা বেছে নিতে

পারল। তারপর ভামনি বন কেটে নিজেদের বসতের জমি আর আবাদের জমি দুইই তৈরি করতে লাগল। তারা রাজবংশীদের মত বাঁশের মাথায় ঘর বানাল না—ভিটে গাড়ল, দাওয়া বানাল, তারপর তিস্তার চরের ছন দিয়ে আর পারেব ফরেস্ট থেকে বাঁশ এনে ভাটিয়া-বাংলার মতই চারচালা ঘর তুলল। তিস্তার চরে এত ভামনি আর তিস্তার পারে এত বাঁশ, যেন এই রকমের ঘরবাড়ি একমাত্র এখানেই হওয়া সম্ভব। নমশূদ্রেরা এক সৈন্যবাহিনীর মত স্বয়ংসম্পূর্ণতায় এমন ভাবে এই চরগুলির দখল নিল—ওপরে মউয়ামারি থেকে তলায় কাশিয়াবাড়ি পর্যন্ত তিস্তার একেবারে মাঝ-বরাবর এই চরগুলির দখল এমনভাবে নিল, যেন, তারা বরাবর এখানেই থেকেছে, সৈন্যবাহিনীর কাছে যেমন কোনো জায়গাই বিদেশ না, যুদ্ধ না করলেও ত একটা সৈন্যবাহিনী একটা অজানা-অচেনা জায়গায় তাদের প্রতিদিনের রুটিনে বাঁধা থাকে।

ভয় নিশ্চয়ই ছিল—তিস্তার ভয়। কিন্তু সেখানেও আশ্বাস ছিল আবার নতুন বসতি ও আবাদ গড়ে তোলার, কোথাও-না-কোথাও ত ডাঙা জাগবেই, সব ত আর ভেসে যেতে পারে না। আর, তখন, সেই মুহূর্তে যে-কোনো একটি জায়গায় খুঁটি গেড়ে বসাটাই ছিল প্রধান দুশ্চিন্তা। তিস্তাব মত নদীর স্বভাবকে ভয় করে চরে না-যাওয়ার চাইতেও প্রবলতর ছিল, সেই ভয়ঙ্কর স্বভাবের মুখোমুখি হওযার আশঙ্কা সত্ত্বেও, একটা কোথাও ঘব তৈবি কবা ও আবাদ বানানোর প্রয়োজন।

ঠিক যেন পুঁজিপুথি মেনেই, ১৯৫০ সালে তিস্তায় যে-বন্যা এল, তার সঙ্গে জানা ইতিহাসের কোনো কথার তুলনাই চলে না। তিস্তার চরটর কোথায় উড়ে গেল। পারের ফরেস্টকে-ফরেস্ট, স্রোতের সঙ্গে উধাও হয়ে গেল। সেই প্রথম জলপাইগুড়ি শহরেব ভেতরে তিস্তার জল ঢুকল।

এখন যদি তিস্তাব চরেব এই জনবসতির কথা ভেবে বিচার করা যায়, তা হলে, মনে হয়, ১৯৫০ সালের ঐ বন্যাটা হয়ে সব দিক থেকেই ভাল হয়েছে।

তখনো সব চরে ত বসতি হয়নি। সবে মউয়ামারির চবে কিছুটা জায়গা হাসিল করে বসবাস শুরু হয়েছে, চাষআবাদও একটু-আধটু হচ্ছে। ঠিক সেই সময়েই সেখানকার, ঐ মউয়ামাবির নমশূদ্রেরা, বুঝে নিতে পারল তিস্তার অনিশ্চয়তাটা আসলে কী বকম অনিশ্চযতা। জল যে এমন আচমকা এসে যায়, তাও আবাব এ-রকম বেগে, তা এরা ভাবতেও পারে নি। নৌকো ছিল একটা মাত্র। ওস্তাদ মাঝির অভ্যস্ত হাল নৌকোর টাল সামলাতে পারে বটে কিন্তু জলের তলায় বিরাট-বিরাট পাথবেব চাঙরের সঙ্গে ধাক্কা লেগে যে-নৌকোর তলা খসে যেতে পারে—সেটা জানা ছিল না। বন্যা নেমে গেলে ঐ চরেই আবার ঘর তোলাব ও আবাদের কাজ শুরু হল।

আর সেই প্রথম তিস্তাকে একটু সামলাবাব ব্যবস্থা হল। সব দিক খোলা তিস্তা বর্ষাকালে শেবক পাহাড়ের তলা থেকে হলদিবাড়ি-মেখলিগঞ্জ পর্যন্ত ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন। যেখান দিয়ে খুশি বয়ে যেত। পঞ্চাশ সালের বন্যার পর শহর ঘিবে বাঁধ হল। তারপর তিস্তার দুই পারেই বাঁধ বেড়ে যেতে লাগল। লম্বা হতে-হতে সেই ওদলাবাড়ি থেকে কাশিযাবাড়ি পর্যন্ত তিস্তাব দুই পারই বাঁধে বাঁধা হয়ে গেল।

এরই ভেতব তিস্তার ওপর দিয়ে দুটো ব্রিজ তৈবি হল, একটা বোড ব্রিজ, আর একটা রেল ব্রিজ। ১৯৫৮ সালে তিস্তার বন্যা এই ব্রিজের পাশেব বাঁধ ভেঙে শহরে ঢুকল। তাব আগে ওদলাবাড়ির বন উপড়েছে, ন্যাওড়া আর ধরলাব মাঝখানের ত্রিভুজটাকে মাটি থেকে খুবলে নিয়েছে, মউয়ামারির চর থেকে বোয়ালমারির চর পর্যন্ত সমস্ত জায়গায় তিস্তা তার পুরনো খাত বানে ভাসিয়ে দিয়েছে। ১৯৫৮-র বন্যা কেন হয়েছে তার কারণ নিয়ে বহুবিধ মত আছে। মতেব বৈচিত্র্য নির্ভব করে বন্যাব সঙ্গে জড়িত সবকারি বিভাগের সংখ্যার ওপরে। তাতে অন্তত এটা প্রমাণিত হয়ে যায়, প্রত্যেক বিভাগেরই বন্যা বানাবার মত যথেষ্ট কারণ ছিল। এখানে ১৯৫৮-র বন্যা আলোচ্য নয়। আলোচ্য তিস্তা ১৯৫৮-র বন্যাতে এ-রকম প্রমাণ আবার পাওয়া গেল যে তিস্তা, বাঁধ বাঁধার ফলে, আরো অনিশ্চিত হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু এটাও সত্যি যে বাহান্ন থেকে আটষট্টি ত ষোল বছর। এই ষোল বছরে তিস্তার বন্যা ত অনেকটাই সামলানো গেছে। ৫০-এর পর ও-রকম, বা ওর চাইতে বেশি বন্যার জন্যেও ৫৮ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। ৫৮-র পর নিশ্চয়ই আরো বিশ বছর কাটার আগেই তিস্তা সম্পর্কে আরো বৈজ্ঞানিক ও সংগঠিত ব্যবস্থা নেয়া যাবে। ইতিমধ্যেই তিস্তা ব্যারেজের কাজ প্রথম দফা শেষ হয়ে গেছে। যদিও এখনো অতটা নিশ্চিত করে বলা যায় না, এবং এখনো বন্যার ভয় সব সময়ই আছে, তবু তিস্তার জল যাতে পাহাড় থেকে আচমকা নেমে সমতল ভাসিয়ে দিতে না পারে তার জন্যে তিস্তার

মাঝামাঝি ত ব্যারেজ বাঁধা হয়েছে।

তিস্তার চরে যে স্থায়ীভাবে বসবাস করা যায়, চাষ-আবাদ করা যায়,সেটা পঞ্চাশ সালে প্রমাণিত ছিল না। উদ্বাস্তু নমশূদ্রেরা তখন তিস্তার চরে সবে আশ্রয় নিয়েছে। একটা বন্যা তাদের উৎখাত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। এমন-কি বাহান্ন ও চুয়ান্ন সালের বন্যাতেও তারা মরে-ভেসে আবার চরে ফিরে এল। যদিও তখনো তারা চরে শিকড় গাড়ে নি।

কিন্তু ৫৮ সালের বন্যায় চরের মাটিসুদ্ধু উপড়ে গেলেও, চরের মানুষদের চরে ফিরে আসা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। কারণ ততদিনে, প্রায় দুই দশকে তিস্তার চর, মউয়ামারি থেকে কাশিয়াবাড়ি পর্যন্ত বসতি হিশেবে প্রায় পাকাপাকি গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে চরের কৃষকদের নিয়ে কো-অপারেটিভের চুরিজোচ্চুরি যেমন হয়েছে, তেমনি, চরের কৃষকের স্বাধীন উদ্যোগে, সরকারি সাহায্যহীন স্বাধীন উদ্যোগে, ধান ও তবকারির ফলনে জেলার কৃষি-অর্থনীতি ও বিপণনের চেহারা বদলে গেছে। ৫৮-র বন্যার সময়, চরের কৃষক জলপাইগুড়ির জনবসতির একটা প্রধান অংশ, চরের ফসল ও ফলন আর্থিক জীবনের অপরিহার্য ভাগ।

তাই ৫৮-ব বন্যার পর চরেব মানুষদের আবার চরে ফিরে আসা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। বন্যায় তিস্তার ভূখণ্ড পাল্টে গিয়েছিল। বন্যার পর সেই পরিবর্তিত ভূখণ্ডে এরাও নিজেদের মত করে আবার নিজেদের পুনর্বিন্যাস করে নিয়েছে। তাতে হয়ত দেখা যাবে, কোনো চর আর নেই, আবার নতুন চর দেখা দিয়েছে। তাতে হয়ত দেখা যাবে, তিস্তার সীমার মধ্যে তিস্তা নিজেকে যেমন বদলেছে, এই কৃষকরাও নিজেদের সে-রকম বদলে নিয়েছে। কিন্তু ৫৮-র বন্যাতেও তিস্তার ভেতর থেকে যাদের উচ্ছেদ কবা যায় নি, তাবা আর উচ্ছেদ হবার নয়। ৫৮-র বন্যাই যেন তিস্তার চরকে ও সেই চরের কৃষকদের প্রধান ভূভাগেব অংশ করে দিল।

দেশ ভাগ হওয়ার পর পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু নমশূদ্র চাষী, উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি এ- নদীকে এক বকম করে জিতে নিল। ভূগোলেব ওপর ইতিহাসের জয় ঘটল।

নব্বই

চরের ভেতরে চরুয়া

তিস্তার এই চর প্রধানত পূর্ববঙ্গেব নমশূদ্র কৃষকবাই হাসিল করেছে, আবাদ করেছে। সরকারি আইন অনুযায়ী চরের জমির ওপর সাধারণ আইনকানুন খাটে না। কারণ নদীর চরকে, এ-রকম অনিশ্চিত চরকে, জনবসতির জায়গা হিশেবে সরকার মেতে নিতে পারে না। তাতে অবিশ্যি কোনো অধিকার থেকে এরা বঞ্চিত হয় নি। প্রতিটি নির্বাচনে ভোট দিয়েছে, এবার এমন-কি পঞ্চায়েতে সদস্যও পাঠিয়েছে। সরকারি আইন থেকে আইনতই মুক্ত থাকার ফলে চরে প্রায় সবাই জোতদার, কেউই শুধু হালুয়া নয়। বা এই কথাটাই উল্টে বলা যায়, চরে সবাইই হালুয়া কেউই কেবল জোতদার না। জমির মালিকানা থেকে জমির ওপর, চাষের ওপর, ফসলের ওপর সমস্ত পুরুষানুক্রমিক ও আইনমাফিক স্বত্ব তৈরি হয়, চরে ত আর তেমন কোনো স্বত্বভোগের সুযোগ নেই। সুতরাং দেউনিয়া-জোতদারির কোনো ব্যাপার চরে যেন থাকতে পারে না।

থাকতে পারে না, কিন্তু আবার একরকমভাবে থাকেও বটে। সবার আর্থিক ক্ষমতা সমান না, সব বাড়িতে কাজের লোক সমান না। কখনো-কখনো অনেককেই টাকার ধার করতে হয়। কাউকে কম সময়ের জন্যে, কাউকে বেশি সময়ে জন্যে। সে সময় টাকার ধার দেয়ার দেউনিয়া দরকার হয়। চরে এ-সমস্ত ধার অনেকটা নগদ টাকায় শোধ হয়। যার নিজেরও টাকার ক্ষমতা আছে, সে টাকা দিয়ে সুদসহ ধার শোধ করে। কিন্তু এরও মধ্যে কারো-কারো আবার ফসলে শোধ করলে সুবিধে হয় বেশি। তার হয়ত টাকার জোর কম। তখন, যেমন জোতদারিতে, তেমনি চরেও, যখন শোধ করা হচ্ছে তখনকার শস্তা দরে না, যখন ধার দেয়া হয়েছিল তখনকার আক্রা দরে ঋণ শোধ করতে হয়। কিছু-কিছু জমিতে কৃষক আর নিজে চাষ করে কুলোতে পারে না—সেখানে তারা কিছু-কিছু জমিতে কাজের জন্যে

লোক রাখে। তেমন লোক সহজেই পাওয়া যায়—রাজবংশীরা এসে হালের সময়, রোয়া গাড়ার সময়, ধানকাটার সময় কাজ করে দেয়। সাধারণভাবে চরের অর্থনীতিতে 'আধিয়ারি' চলে না। কিন্তু মজুরি জমা রেখে-রেখে ফলনের ভাগে মজুরি নিয়ে রোয়াও চালু আছে। এতে যেন রাজবংশী হালুয়ার অন্তত আধিয়ারির মর্যাদাটুকু জোটে।

এই চরগুলোতে একটা অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চালু আছে—উৎপাদনের ভূমিকা থেকে তৈরি গণতন্ত্র। রাজবংশীরা কোনোদিন দলবদ্ধভাবে চরে বসতি গাড়ে নি—তাই নমশূদ্রেরা চরকে বাসযোগ্য করে তোলার পর রাজবংশীরা সেখানে নিজেদের অধিকার দাবিও করে নি, সে নিয়ে কোনো ঝামেলাও হয় নি। বরং, যাকে বলা হয় কায়েম এলাকা, অর্থাৎ সরকার যে-জমি সেটেলমেন্ট মারফৎ জরিপ করতে পারে সেই আইনি জমিতে নমশূদ্ররা যেখানে বসতি গেড়েছে, সেখানে কোনো-কোনো সময় পুরনো রাজবংশী বসতির সঙ্গে দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটেছে। এ-রকম সবচেয়ে খারাপ ঘটনা ঘটেছিল বছর চোদ্দ-পনের আগে তিস্তাপারের ক্রান্তি থানার ঝাড়মাঝগ্রাম এলাকায়। সেখানে আগুন লাগানো, আগুনে পুড়িয়ে মারা, কুপিয়ে কাটা—এ সবই ঘটেছিল। কিন্তু চরে এখনো এ-রকম কোনো ঘটনা ঘটে নি, সাম্প্রদায়িক হুজ্জতহাঙ্গামার কোনো ঘটনাই নয়! আর প্রথম দিকে যদি-বা বলা যেত যে নমশূদ্রেরা চরে নিজেদের লোক ছাড়া কাউকে 'বসতে' দেয় না—তেমন কে-ই-বা 'বসতে' চেয়েছে—কিন্তু পরে, যখন চর বাসযোগ্য ও কর্ষণযোগ্য জায়গা হিশেবে সাধারণ ভাবে স্বীকৃত হয়ে গেল, তখন, প্রধানত মনশূদ্ররা হলেও, রাজবংশীদেরও বেশ কিছু অংশ একসঙ্গে চরে এসে বসতি গাড়ে, আবাদ করে।

ব্যাপারটা তখন এ-রকম দাঁড়িয়েছে যে, চরে নমশূদ্রেরাই যাবে তা নয়, চর যখন আছে, তখন সবাই মিলেই সেখানে যাওয়া যাক। এ-রকম একটা পরিবেশ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বিশেষত, তিস্তার দুই পারেই ত রাজবংশী জনবসতি আছে। তাদের সেই সব গ্রামবন্দরের ভেতর দিয়েই চরের মানুষজনকে যাতায়াত করতে হয়। এক ধরনের চেনাজানা, তার ফলে হয়েই যায়। স্বাধীনতার পরেই সেই প্রথম ধাক্কায় যা হওয়ার হয়েছে, কিন্তু তার পরে তিস্তার চরগুলিতে নমশূদ্র ও রাজবংশীদের মিশ্র জনবসতি তৈরি হয়েছে। তাতে হয়ত বেশির ভাগ জাযগাতেই নমশূদ্রদের প্রাধান্য, কিন্তু কোনো-কোনো জায়গায় রাজবংশীরাও সংখ্যাগুরু।

সামাজিক দিক থেকে, অন্তত সমাজেব বাইরে দিক থেকে, বা, বলা ভাল, এই সমস্ত চরের জনসংগঠনের দিক থেকে নমশূদ্র ও রাজবংশীদের মিলিত জীবনযাপনই প্রধান, সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর প্রশ্নটা সেখানে অবান্তর। জগদীশ বারুই-এর মত নমশূদ্র মহাজন এক-এক চরে নিশ্চয়ই আছে কিন্তু চবের কৃষকও আর পুরুষাক্রমিক খাতক নয়, সুতরাং সে বারুইয়ের ধার ধারতে পারে কিন্তু ভাত ধারে না। জনসংগঠনের এই গণতন্ত্র থেকেই বোধহয় চবের কৃষকদের ভাষাতেও পূর্ববঙ্গের আর রাজবংশী ভাষার একটা মিশ্রণ ঘটেছে। অন্ধকারে ভাষা শুনে বোঝা মুশকিল ভিড়টার প্রধান অংশ—'ভাটিয়া' না 'দেশিয়া।' এই যেমন জগদীশ বারুই যে-ভাষায় খিস্তি করে উঠে যায়, রাবণ রায়বর্মন তাকে সেই ভাষাতেই প্রায় বুঝিয়েসুঝিয়ে ফিরিয়ে আনতে যায়।

একানব্বই

ফ্লাড আসতে কতক্ষণ—চার ঘণ্টা না ছয় ঘণ্টা

কিন্তু এ-বাতাস ঠেলে জগদীশও এগতে পারে না, রাবণও জগদীশের কাছে পৌঁছতে পারে না। এরা এখানে প্রায় গোল হয়ে বাতাসের ঝাপটায় শাণিত বৃষ্টির তীর পিঠে-ঘাড়ে-মাথায় নিতে-নিতে দেখে, তাদের এখান থেকে উঠে গিয়েও জগদীশ বা রাবণ কোথাও যেতে পারছে না।

বৃষ্টিভরা বাতাসের কুয়াশার ভেতরে ওদিক থেকে বাতাসের অনুকূলতায় নকু ক্রমেই ছুটে কাছে আসে। সে জগদীশকে এ-রকম দলছুট একাকী দেখবে, ভাবে নি। ভাবে নি বলেই যেন জগদীশকে দেখেও না দেখেই ছুটে আসে। জগদীশ নকুকে চিনতে পারে না। কিন্তু তার যেন মনে হয় বিপরীত দিক থেকে জমাট কুয়াশা নড়ে চড়ে এদিকে আসছে। এখন ওদিক থেকে এক নকুই আসবে। কিন্তু

সেটা, তার কাছাকাছি হওয়া সত্ত্বেও কুয়াশার আরো ভেতরে চলে যায় দেখে জগদীশ চিৎকার করে ডেকে ওঠে, 'হে-এ নকু'। সেই চিৎকারে আহ্বানের সঙ্গে ধমকও ছিল, বা হয়ত ওটাই জগদীশের স্বরের পাকা ভঙ্গি—সে কথা বললেই একটু জোরে বলে ফেলে। কিন্তু জোরটা এখানে তার স্বভাবের চাইতে অনেক বেশিই ছিল—নইলে এই বাতাসে সে-আওয়াজ রাবণের কাছে ও তারও পেছনে ঐ দলের কাছে অমন হুমড়ি খেয়ে পড়ত না—'হে-এ নকু।'

নকু দাঁড়িয়ে পড়ে। জগদীশ চিৎকার করে ওঠে, 'কী কইল রেডিওতে ?'

এখন, এই চরে কুয়াশায় তিনটি দাঁড়ানো মূর্তি—রাবণ, নকু আর জগদীশ। একটু দূরে সেই দলটা গোল হয়ে বসে—মাথা নিচু করে। নকুকে জগদীশ ডাকতেই সেই দলের দু-একজন দাঁড়িয়ে পড়ে। নকু জগদীশের দিকে ফিরে গলার সমস্ত জোর দিয়ে চিৎকার করে—'লাল সিগন্যাল দিই দিসে, লাল সিগন্যাল'—নকুর চিৎকার ঐ বাতাসে ছিঁড়ে যায় আর আওয়াজগুলো পুব থেকে পশ্চিমে চলে যায়। আওয়াজগুলো এমন টুকরো-টুকরো হয়ে উড়ে যায় যে এরা ছাড়া অন্য কারো পক্ষে সেগুলোর ভেতর কোনো সংযোগ তৈরি করা অসম্ভব হত—সেগুলোকে বাতাসেরই শব্দ মনে হত।

তিন-তিনজন দাঁড়িয়ে থাকায় বাতাস তাদের ঘিরে আরো উত্তাল হয়ে উঠতে পারে। জগদীশ পেছন ঘুরে এই দলটির দিকে ফিরে আসতে শুরু কবে। এতক্ষণ জগদীশ বাতাস ঠেলে এগতে পারছিল না আর এখন হঠাৎ বাতাসটা তাকে পেছন থেকে ধাক্কায়-ধাক্কায় সামনে ঠেলে দেয়। তাতে তার শরীরটা কেমন হালকা লাগে। স্রোতের বিপক্ষে সাঁতার কেটে হঠাৎ স্রোতের মুখে গা ছেড়ে দেয়ার মত।

নকুর কথা ঐ দলটাকে মুহূর্তে ভেঙে দেয়। সবাই যেমন একসঙ্গে গোল হয়ে ঘাড় নিচু করে বৃষ্টি আর বাতাস থেকে বাঁচছিল—নকুর চিৎকারে বাঁচার সেই চেষ্টাটা তুচ্ছ হয়ে যায়। সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছে আর কেমন আগোছালো ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে। বাতাস এতক্ষণ এক রকম করে বইছিল, যেন জলের স্রোতের ঢালের মত, এরা যেন কোনোক্রমে সেই ঢালের নীচে মাথা বাঁচিয়ে বসে ছিল। আর, এখন ওরা দাঁড়াতেই বাতাস ওদের এতগুলো শরীরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। তাতে বাতাসের আওয়াজ যেন হঠাৎ বহুগুণ বেড়ে গেল। ঐ আওয়াজের মধ্যে ওবা খাবি খেতে লাগল।

এই দলের সবাই বাতাস ঠেলে নকু জগদীশ আর রাবণের দিকে এগতে চাইছিল। কিন্তু তার আগেই বাতাসের ঠেলায় ওরা এদের কাছে এসে পৌঁছে গেছে।

নকুই এই পুনর্গঠিত দলের ঠিক মাঝখানে পড়ে যায়, 'কহিল যে লাল সিগন্যাল দেয়্যা গেইল। সগায় রেডি থাকেন। বাঁধছাড, নদীর পারত যেইলা আছেন সগায় ছাড়ি চলি যান, ছাডি চলি যান। যেইলা মানষিক এলায়ও যান নাই, স্যালার দায়ি সরকার না নিবেক। চরত যে মানষিলা আছেন স্যালায় এ্যানং এই রাতত ডাঙায় চলি যান, ডাঙায় চলি যান। পাহাড়ঠে বান নাবিবার শুরু করিছে, শিবক পাহাড়ের তলায় রেলের ব্রিজখান ভাঙি যাবার পারে—সেই তানে আসামের সব রেল ক্যানসেল, ক্যানসেল, ক্যানসেল—' নকুর দম ফুরিয়ে যায়। সে থামার পর তার কথার বাকি অংশ শেষ করে দিতেই যেন বাতাস হঠাৎ-গর্জনে মাটি থেকে আকাশে লাফ দিয়ে ওঠে। নকুর কথাটা যে এমন আচমকা শেষ হয়ে যাবে, সেটা কেউ বোঝে নি। তাই নকুর কথা শেষ হওয়ার পরও কেউ কোনো কথা বলতে পারে না। ঐ আকাশ জুড়ে বাতাস গর্জায়, গর্জে-গর্জে লাফায়।

নরেশ ব্রিজের দিকে মুখ করে বলে—'সিগন্যাল আগেই আইসছে, ব্রিজের বাতি সারা রাত্রি জ্বালাইয়া রাইখচে—'

নিতাই বলে ওঠে, 'এই ব্রিজের তানে কিছু কইল ?'

নকু আবার পুরনো স্বরেই চিৎকার করে বলে, 'এই ব্রিজের তানে কিছু না কইসে, চরুয়া মানষি ডাঙায় যাও, ডাঙায় যাও, কায়ও নদীর কিনারাত থাকিবেন না, কায়ও থাকিবেন না—'

গজেন জিজ্ঞাসা করে, 'বান পাহাড়ত নামিবে কইসে, নাকি নামা ধরিসে, নকু ?'

যেন নকু প্রাসঙ্গিক পাহাড় থেকে এইমাত্র নেমে এল, এরা তার কাছ থেকে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ জেনে নিচ্ছে। কথাটার জবাব নকু চট করে দিতে পারে না। সে বাতাসের গর্জনের মধ্যে এক নিজস্ব নীরবতায় মনে আনবার চেষ্টা করে, এই একটু আগে রেডিওতে যা শুনেছে তার যথাযথ ভাষা।

'মনত খায়—নামা ধরিসেই বলিছে। নামা ধরিসে, শিবক পাহাড়ের রেল ব্রিজ বন্ধ করি দিয়া হইসে, হয়, হয়, নামা ধরিসে বলিছে, নামা ধরিসে, নামা ধরিসে।' নকু পুনরাবৃত্তিতে নিজের কথার সত্য নিজেই

পরীক্ষা করে যায়।
রাবণ উঁচু থেকে নীচে জিজ্ঞাসা করে, 'রাততে কি আবার নিউজ দিবা ধরিবে?'
'না দিবে। কহি দিছে—এইখানই শেষ নিউজ, এর বাদে আর কুনো নিউজ নাই, আর কহিসে সাইরেন বাজি দেয়া হইসে—'
'সাইরেন? বাজি দেয়া হইসে? শুনো নাই বো? কায শুনিছেন?' গজেন বলে ওঠে।
জগদীশ ধমকে ওঠে, 'চুপ যা বলদের দল, বাতাস কী সাইরেন বাজায়, শুনিস নাই? তর বিয়াব বাদে সানাই বাজাবার ধইববে, শালো, নিজের আওয়াজ নিজে শোনন যায় না, সাইবেন শুনব? করবা কী তাড়াতাড়ি কও, তাড়াতাড়ি কও', জগদীশ চুপ করে গিয়ে আবার হঠাৎ কথা বলে ওঠে, 'হে-ই নকু, নকু, নকু কই রে?' জগদীশ ছানিঢাকা চোখ এলোমেলো বোলায়।
'কহেন না, এইঠে আছি।'
'তর জেঠি বেডিওটা খুইল্যা বাইখল ত? বন্ধ কইব্যা থোয় নাই ত?'
'কহেন কী? এ্যালায় জেঠি গান শুনিবার বইসবে নাকি?'
'চুপ যা শুযাব। যদি আবাব নিউজ দ্যায।'
'জয়হিন্দ কয্যা দিছে, আবার নিউজ দেবে?'
'জযহিন্দ কয্যা দিছে? তা হাইলে, কী, হইব ডা কী, এই ন্যাতাই' কেউ জবাব দেয না।
জগদীশ আবাব হাঁকড়ে ওঠে, 'এই ন্যাতাই, ন্যাতাই নাই এইখানে।'
নিতাই ধমকে ওঠে, 'আবে, চুপ যান তো দেখি, শুধু চিল্লাবাব ধবেন। এই নবেশ, বাজে কযডা রে দেখ ত?'
নরেশের টর্চেব আলোয় এতগুলো লোকের শবীবের ওপব সময ঝলকে ওঠে—
'এগাবোটা বাইশ'।
'হে-এ, এককেরে বাইশ, শালো আকাশবাণী শিলিগুড়িব টাইম দিবাব ধবসে', গজেন বলে।
'ত টাইম জিগাইলি, বেটাইম কব নাকি?'
'হে-ই, চুপ যা, চুপ যা'—নিতাই এই ভিড়েব মাঝখানটাতে দাঁড়ায়। নিতাইয়েব চুলগুলো বাবরি। বাতাসে সব চুল তার মাথায় ওপরে উঠে আসে আর মাঝে-মধ্যেই ফণা তোলে। সেই চাপা আলোয নিতাইযেব মেদহীন শরীবেব রেখাটা যেন খোদাই হযে যায। এতক্ষণ এবা একসঙ্গে এখানে আছে—যেন দঙ্গলে ছিল সবাই। এতক্ষণ, এই বাতাস, এই বৃষ্টি, এই আলো তাদের ঢেকে রেখেছে। এখন কি স্পষ্ট হতে শুরু করল? নিতাই দুই হাত ওপরে তুলল, 'খাডাও, এই তালই চিল্লাবেন না, শুনেন—'
ভিড়টা একটু ঘন হয়।
নিতাই বলে; 'শুনেন, এখন বাজে রাত্তির সাড়ে এগার। ধরেন, তিস্তা বাজার থিক্যা এই খানতক্ ফ্লাড আইসতে লাগে, কতক্ষণ,' এই নবেইশ্যা, ছয় ঘণ্টা—'
'হয়, ছয় ঘণ্টা—'
'তয় ত ধর কেনে, সাড়ে এগার—'
'সাড়ে এগার ত এ্যাহেন বাজে, নিউজ হয্যা গিছে সেই পনে এগাবটায।'
'হয়, পনে এগারডায়।'
'পনে এগারডায়?' নিতাই জিজ্ঞাসা করে।
'হয়, পনে এগারডায়।'
'তা হউক গ্যা, তর পনে এগারডাই হইল, তার সঙ্গে ছয় ঘণ্টা যোগ দে—কয়ডা হয়? পনে এগারডা আর ছয় ঘণ্টা?'
'এ ধর কেনে এগারডা, হিশাবের সুবিধা তানে', গজেন বলে।
'শালো, তোর সুবিধার লাইগ্যা ফ্লাড লেট কইরা আইসবে'—জগদীশ ধমকে ওঠে।
'হেই তালই, আপনি কথা কহেন তয়, আমি চুপ যাই—', নিতাই ঠাণ্ডা গলায় জগদীশকে বলে।
'ভুইল্যা গিছিলাম ন্যাতাই, তুই ক, তুই ক, এই শালো গজেনটা সব উল্টাপাল্টা কথা কয—'
নিতাই আবার গলা তোলে, 'শুনেন, যে হিশাবই করেন, এইখানে ফ্লাড কাইল সকাল চাইড়ডার

আগে আইসব না—'

নিতাইযেব এই হিশাবেব একটা বড় তাৎপর্য আছে। সকাল চারটে মানে তারা আজ রাত্রির জন্যে নিবাপদ। এমন কি সকাল চাবটেতেও যদি চর ছেড়ে ডাঙায় চলে যাওয়ার দরকার হয়, তা হলে দিনের আলো ফুটে যাবে। নিতাই সকলেব হযে মুখ ফুটে সময়টা বলেছে। এখন সবাই সময়টা খতিয়ে দেখছে। রাবণ কিছুক্ষণ পরে বলে ওঠে, 'কহিল যে আসামের রেলগাড়ি বন্ধ করি দিসে। স্যালায় ত ফ্লাড শিবক--তক আসি গেইসে—'

রাবণের কথার জবাবে নিতাই, বা অন্য কেউ, কিছু বলে না। তারা সবাই সঙ্গে সঙ্গে আর-একটা হিশাব কবতে থাকে। ফ্লাডেব ওযার্নিং দেযার উৎস—পাহাড়ের ভেতর, কালিম্পঙের পথে তিস্তাবাজার বলে একটি জাযগা। সেখান থেকে জলেব হিশেব পেলে, সেই অনুযায়ী আন্দাজ করা যায়—তিস্তাবাজাব থেকে হলদিবাড়িব কাশিযাবাড়ি পর্যন্ত তিস্তার বুকেব ওপব দিয়ে প্রায় ষাট মাইল পথ আসতে জলের কতক্ষণ সময় লাগবে। শিবক ব্রিজ পর্যন্ত নদী নামে পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে। তিস্তাবাজাব থেকে শিবক পর্যন্ত যত তাড়াতাড়ি নামবে, শিবক থেকে জলপাইগুড়ি তার চাইতে বেশি সময় লাগে—এই জাযগাটাতে তিস্তা শুধু সমতল তা-ই নয়, তিস্তার সেই ভূখণ্ড শুরু—তার নানা খাত, নানা পথ।

নবেশ বলে, 'এ্যাহন ত তাও সগগলে জাইগ্যা আছে, রাত আডাইডা তিনডায় যদি চর ছাইড়ব্যার লাগে ত অদ্ধেকেব বেশি ভাইস্যা যাবে নে—'

বিরানব্বই

আটষট্টিব বন্যাব স্মৃতি

নরেশ কথাটা যেন কাউকে শোনানোর জন্যে বলে না। কিন্তু এই বাতাসে তাব স্বরে সেই নিভৃতি আর থাকে না, ভেঙে যায়। তার কথা শেষ হওয়ার পর তাব কথার স্মৃতিতে সকলের মনে হতে থাকে, নরেশ যেন সবাইকে সাবধান কবে দিচ্ছে। তারপবও, তাদেব ও-রকম চুপ করে থেকেই সেই সাবধান বাণীর অর্থ বুঝে নিতে হয। সেই অন্ধকাব শেষ বাতে জল চবে উঠতে শুরু করেছে। জলেব সেই চেহারা দেখেই যে যার মত মুহূর্তে ঠিক করে ফেলবে—তখনই সব কিছু ফেলে পারের দিকে যেতে হবে। কেউ কারো সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতে পারবে না—সবাই মিলে জলপাইগুড়ি শহরের পারের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কে পেছনে থাকল, কে পাবল, কে পাবল না, কে ভাসল, কে উঠল, সে-সব হিশেব হবে পারে ওঠার পর, খোঁজাখুঁজির পর, বাঁচার পর। একা-একা বাঁচার পর সবাই মিলে বাঁচা গেল কিনা সেই হিশাব হবে।

এখানে যারা আছে, তাদের প্রায় সবাই আটষট্টির বন্যায় তিস্তাকে দেখেছে। সবাই এখানেই ছিল, তা নয়। কিন্তু সকলেরই নিজের নিজের মত করে জানা আছে, কী করে বানভাসি মানুষের হিশেব বেরয়, কী ভাবে এক ধাক্কায় গোয়াল খালি হয়ে যায়, দিন পাঁচ-সাতের ভেতর ভরভরন্ত ধানিজমি হাঁটুভর বালুয়ারি হয়ে যায় কী ভাবে। প্রত্যেকে একই পদ্ধতিতে হয়ত এই স্মৃতিচারণ করছিল না, কিন্তু সেই স্মৃতিই তাদের এই সব হিশেবনিকেশকে নিয়ন্ত্রণ করছিল। আগামী চার থেকে ছ ঘণ্টার হিশেবের সঙ্গে মিলে ছিল, প্রায় পনের-ষোল বছর আগের অভিজ্ঞতা।

কিন্তু পনের-ষোল বছর আগের অভিজ্ঞতা এখন এদের মধ্যে কতটা সক্রিয় থাকতে পারে। নিতাই-এর বয়স এখন কত হবে? ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ! তা হলে পনের বছর আগে তাকে থাকতে হয় পনের-বিশ বছরে। কিন্তু তখনই ত নিতাইকে দেখাত পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের। তা হলে, এখন কি নিতাইয়ের বয়স চল্লিশ হয়ে গেল? বা চল্লিশ পেরিয়ে গেল? জগদীশের বয়স কত? পনের-ষোল বছর আগেও জগদীশকে ত এখনকার মতই পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশ লাগত। জগদীশের কি এখনই ষাট হল, না, তখনই তিরিশ ছিল।

ঠিক সেই মুহূর্তে তিস্তার ঐ চরে ঝঞ্ঝার ভেতরে বাতাসময় বৃষ্টিপাতে বিদ্ধ হতে হতে ঐ দঙ্গলবাঁধা

মানুষগুলি এক অপরিবর্তিত ব্যক্তিগতে পৌঁছে গিয়েছিল। প্রত্যেকেই নিজেব নিজেব মত করে শেষ রাত্রির হিমেল জলের পাহাড়ভাঙা বন্যার ভেতর দিয়ে নিরাপত্তাব খোঁজে সপরিবার ভাসছিল। সেই স্রোত হাতে কিছু বাখতে দেয না। সেই স্রোতে শবীরের ভিতর থেকে শরীরটা বের করে আনে। সেই স্রোত শুধু অতলে টানে. শুধু অতলে। এখন সেই স্রোত রওনা হযেছে ছ-ঘণ্টা দূবে, না চাব-ঘণ্টা দূবে, কে জানে।

সেই মুহূর্তটিতে ওরা যেন এই নদীর ভেতরে চরের লোক আর থাকে না। নদীর ভিতরের এই চরে ওদের এমনই স্বাভাবিক বসবাস যে ওরা চরকে চর বলে মনে বাখে না, নদীকে নদী বলে চেনে না। ডাঙা দিয়ে হাঁটাব মতই জল দিয়ে হেঁটে যায়। কিন্তু তখন ঐ বাতাসেব মধ্যে ওরা ভয পেয়ে যায়, নিজের-নিজেব মত কবে গোপন, একান্ত ভয, গভীর চাঁদনিতে কোনো অচেনা চবেব বালুর ওপর দিয়ে মাইলেব পর মাইল হেঁটে আসাব সময় যেমন ভয হয পাশে কেউ হাঁটছে। এই চবটা জলপাইগুড়ি শহরের কাছে, বায়পুব চা বাগানেব পাশে, তিস্তাব রোড-ব্রিজ আব বেলব্রিজেব উত্তবে; বাঁ দিকে দোমোহনি। এখান থেকে তিস্তা-ব্রিজের আলো, দেখা যাচ্ছে শুধু নয, এতক্ষণ দেখে দেখে মনে হচ্ছে তারাও ঐ আলোব অন্তর্গত। নিরাপত্তা এত কাছে। ইলেকট্রিক আলো, বাঁধ, পাকা বাড়ি, লোহাব ব্রিজ, কংক্রিটের ব্রিজ—এই সমস্ত মিলে এক নিবাপত্তা, তাদের ডাইনে-বাঁযে, তাদেব সামনে, এমনই প্রত্যক্ষ যে ছ-ঘণ্টা বা চাব-ঘণ্টা পবে মবেও যেতে পাবে এমন বাঁচতে এখন ভয হচ্ছে।

জল বাড়ছে গত বুধবার থেকেই। বৃষ্টি শুরু হয়েছিল মঙ্গলবাব রাত থেকে। কিন্তু মঙ্গলবাব বাতেব জলে ত আর এ নদীর জল বাড়বে না। ববং এ নদীব জল বাড়তে শুরু করেছিল এখানে বৃষ্টি থেমে যাবার পর। তখন বাতাস উঠেছে। এই টানা বাতাস। একেবাবে যেন নদীব ভেতর থেকে জল নিয়ে এই বাতাস উঠে আসছে আর নদীব আকাশ জুড়ে সেই জলকণা ছিটিয়ে দিচ্ছে। বাতাসবাহিত জলকণায় আকাশমাটি জুড়ে এই জলকুয়াশা স্থির হযে আছে। বাতাস থাকলে ত হিমকুয়াশা মুহূর্তে কেটে যায। কিন্তু এ জলকুযাশা বাতাসের সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ে, যত বাতাস তত ঘন হয। বাইবে থেকে বা ওপর থেকে দেখলে এই চবটাকে আব আলাদা করে বোঝা যেত না, মনে হত, নদী-আকাশ জোড়া এই জলবাত্যায় চবটাকে নদীব মধ্যে টেনে নিযেছে।

কিন্তু এত সত্ত্বেও এবা জল দেখে বুঝেছিল বিপদ নেই।

বিপদেব গন্ধ বাতাসে এল শুক্রবার, আজকেব, সকাল থেকে, বা বেস্পতিবাব, কাল শেষ বাত থেকে। সেও বেড়িয়োব ফলে, আব, পারে গিয়ে নানা জন নানা খবব নিযে আসায়। পাহাড়ে তুমুল ধস নামছে, পাহাড ভেঙে ঢল নামছে। বন্যা-ডিপার্টমেন্ট থেকে সিগন্যাল দেয়া শুরু হয়েছে।

এত সত্ত্বেও আজকের এই শুক্রবারের রাতটা, এখন, এই রাত প্রায় বারটায়, যে বকম বিপদসঙ্কুল হয়ে উঠল, তেমন না হতেও পাবত। বাতাস কমে যেতে পাবত। জল আব না বাড়তেও পারত। সে-বকম একটা হিশেব ছিল বলেই আজ বিকেল পর্যন্ত সবাই দেখেছে। আর, দেখার পর আজ রাতে এ-রকম দল বেঁধে চর ঘুবতে বেরিয়েছে, নদীর জলের ধরন-ধারণ বুঝতে। তিস্তা ব্রিজেব ওপব যদি রাত দশটাতেও আলো না দেখত, তা হলে হয়ত জলটল দেখে, সকাল নাগাদ আকাশ পবিষ্কাব হয়ে যাবে এ রকম একটি আন্দাজ নিয়ে, যে যার মত ঘবে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। তাব পব, সেই রাত আড়াইটে-তিনটেব সময় ঘুমের ভেতর বন্যা ঢুকে যেত, সেই আটষট্টির মত। কিন্তু এখন, এখান থেকে সেই পনের-ষোল বছর আগের সময়টাকে যেন সহজ ঠেকে। যেন, তখন সে-বন্যা তাও সামলানো গেছে, এখন সে-রকম বন্যা আর সামলানো যাবে না। তিস্তা ব্রিজের আলো থেকে রেডিওর সংবাদে জানা সিগন্যাল পর্যন্ত সেই বন্যা এত বেশি পূর্বজ্ঞাত হয়ে গেল যে চার বা ছ-ঘণ্টা পর গভীব ঘুম থেকে মুহূর্তে সম্পূর্ণ জাগরণে জেগে প্রায় অনিবারণীয় মৃত্যুর ভেতর থেকে বেঁচে ওঠার জন্যে প্রয়োজনীয় তড়িৎস্পর্শ শরীরেব ভেতরে আর খেলে না। বরং তার বদলে ভয় ছড়িয়ে যায় সারা শরীরে। জানা গেল, অথচ, সেই জানা থেকে কোনো উপায় হাতে এল না—এমনি এক নিরুপায়ের ভেতরে সেই মধ্যরাত্রিতে ঝড় জলের মধ্যে ওরা দাঁড়িয়ে থাকে। যেন, এই খবর, এই খবর জানার আনুষঙ্গিক ছিল—অন্তত এমন কিছু নৌকো, যা সারারাত ধরে এই চরের মানুষের সংসারকে ডাঙায় নিয়ে গিয়ে তুলতে পারে। কিন্তু এত বড় চরে ত এখন নৌকো বলতে দু-তিনটে ভাঙা ডিঙি আর একটা খেয়া নৌকো। এই খেয়াতেই সারা দিন প্রধান স্রোতটা পেরনো হয়। তার পরে হেঁটে, সাঁতরে পারে ওঠা

যায়।

তিস্তা ব্রিজে আলো জ্বলছে। তার মানে তিস্তা ব্রিজ রক্ষার কাজ শুরু হয়ে গেছে। আটষট্টির বন্যার সময় বন্যার খবরই পাওয়া যায় নি। আর এখন বন্যার খবর আসার পর সিগন্যাল দেওয়া ত হয়েইছে, সাইরেনও বোধহয় বেজে গেছে, এমন কি তিস্তা ব্রিজের আশেপাশে যাতে ভাঙন না ধরে তার জন্যে হয়ত গাড়ি গাড়ি বোল্ডার নিয়ে সারি সারি ট্রাকও দাঁড়িয়ে গেছে।

কিন্তু এখন এই দলের ভেতরে আটষট্টির বানভাসা এতগুলো লোক আটষট্টি থেকে পনের-ষোল বছর পরে বন্যার নিশ্চয়তা সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞানটুকু নিয়ে একই উপায়হীনতায় অপেক্ষা করছে। আটষট্টিতে জ্ঞানই ছিল না, অপেক্ষাও ছিল না। তখন মনে হয়েছিল—আগে জানলে বাঁচা যেত। এখন, এত আগে জেনেও বাঁচার কোনো নিরাপত্তা, এরা, এই দলের এরা, নিজেদের ভেতর থেকে সংগ্রহ করতে পারে না।

তিরানব্বই

হিন্দি সিনেমার জোকার

'বানার খবরের হিশাব ত ঐ তিস্তাবাজার থিক্যাই দেয়, ঐখান থিক্যাই ত সিগন্যাল দ্যায়, এর মইধ্যে আবার শিবক আইসল কবে থিক্যা ?' নরেশ বলে, এটা না বুঝেই সে-ই একটু আগে এর উল্টো কথাটা বলেছে।

'শুইনলি কইছে আসামের গাড়ি বন্ধ কইর‍্যা দিছে, তা রেলগাড়ি কি তিস্তাবাজার দিয়্যা যায় নাকি ?' নিতাই ঠাণ্ডা গলাতেই বলে।

'শুইনছে উপর থিক্যা বন্যা নামবার ধরছে, তাই বন্ধ কইর‍্যা দিছে, সে আবার কোন বছর দেয় না', জগদীশ বলে।

'ঐ কথাখান ত এডিওত ভাল করি শুনিবার নাগত, এলেব ব্রিজত গাড়ি বন্ধ হইয়া গিছে নাকি আগতই বন্ধ করিছে—' রাবণ বলে।

'এ্যাহন ত কথা ঝাড়ত্যাছ পুরুতের নাগান, তখন রেডিও শুইনতে গেলেই পারত্যা', রাবণের কথায় জগদীশ ঝাঁঝিয়ে উঠে রাবণের দিকে না তাকিয়েই জবাব দেয়। তাতে মনে হয় সে বোধহয় নরেশকেই বলে।

'কহসেন কী আগরবাগর, বেলা আড়াইটার গাড়ি ত এই ব্রিজ দিয়া পার হইসে', গজেনের হঠাৎ মনে পড়ে যায় আর সে সবাইকে তাড়াতাড়ি মনে করিয়ে দেয়।

হ্যাঁ, কথাটা সকলের মনে পড়ে। মনে পড়ে, গোপনে, একান্তে। এটা এমন মনে পড়া নয় যা নিয়ে লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করতে হবে। গজেন ওটা খুব ভাল কাজ করেছে যে তার মনে পড়েছে, সে মনে পড়িয়ে দিয়েছে। এখন তারা এই ট্রেনের হিশেব থেকে পেছিয়ে-পেছিয়ে হিশেব কষতে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই এই শেষ সিগন্যালের পরে শিবকের রেলব্রিজ দিয়ে ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তার মানে কাল থেকে আর ট্রেন চলবে না। তার মানে, তাহলে সিগন্যালটা তিস্তাবাজার থেকেই এসেছে। এখানে সেই জল আসতে আসতে সেই সকাল হয়ে যাবে। তা হলে আজ রাত্রিতে আর চর ছেড়ে না গেলেও চলে।

নিতাই বলে, 'ট্রেন না হয় গিছে, কিন্তু সিগন্যাল দিল কুখন। স্থানীয় সংবাদ কেউ শুইনছে ?'

'আমি ত শুনছি, বাজার দর শুনছি, না, তহন ত কিছু কয় নাই, না কয় নাই,' জগদীশ তাড়াতাড়ি বলে। একটু চুপ করে থেকে নিতাই বলে, 'তালই, ভাল করি ভাইব্যা দ্যাখেন কয় নাই ত—'

জগদীশ একটু চুপ করে থাকে। তার পক্ষে সেই সন্ধ্যার কথার স্মৃতি এই মধ্য রাতে খুঁচিয়ে তোলা খুব সহজ নয়। কিন্তু তবু সে একবার মনে করতে চেষ্টা করে যে কোন অবস্থায়, কী ভাবে সে খবরটা শুনছিল। বাজার দর শোনার সময় ত হাতের কাজ ফেলে কান খাড়া করল। কিন্তু দিন তিনেক ধরে এই

বাতাসে আর জলের মধ্যে থেকেও কি জগদীশ বন্যার খবরটা শোনার জন্যে কান খাড়া করে থাকে নি ? হঠাৎ মনে পড়ে যায় জগদীশের—'না, কয় নাই, তোর কাকি জিগ্যাইল চিক্কুর দিয়্যা, কী বানাটানার কাথা কিছু কইসে, আমি কইল্যাম, চিক্কুর দিয়্যা, না কয় নাই, কয় নাই, না, কয় নাই—'

'তয় এতক্ষণ কী নিদ্রা গিছিলেন ?' নিতাই খেঁকিয়ে ওঠে, 'ধবো রাইত আটটার মইধ্যো সিগন্যাল দ্যায় নাই, সিগন্যাল দিছে তার বাদে, দশটাও যদি ধরো, রাত্তিব চাইরডার আগে জল আইসবে না, আব ধবো, যদি একঘণ্টা আগেও ধবো, তা হলিও ত বাইত তিনডাব আগে আইসবে না'।

'তা তিনটাত আসিলে করিবেনটা কী ! স্যালায যা আন্ধাব হইবে, চান্দ ডুবি যাবে', বাবণ বলে।

আকাশের দিকে না তাকিযে তাবা সেই ছায়াহীন মরা আলোতে চাঁদেব হিবেশনিকেশ বুঝে নেয়। এখন শুক্লপক্ষ চলছে। চাঁদের আলো ঐ জলকুয়াশা ভেদ কবে মাটিতে এসে পৌঁছচ্ছে না। তাব ওপব আছে আকাশেব মেঘ। আকাশেব দিকে তাকিযে চাঁদটা কোথায, তাব হদিশও কবা যায না ! শুধু চাবদিকের এই আবছাভাবে বোঝা যায কোথাও থেকে একটা আলো আসছে, নিশ্চিতই আসছে। বাত তিনটের সময এই আলো থাকবে না। কিন্তু তখন যদি সকলে মিলে জিনিশপত্তর নিয়ে পাবেব দিকে যেতে হয়, তা হলে ? চারটের সময়, চারটে কেন, পৌনে চারটের সময়ই এই সমস্যা আব থাকবে না। কিন্তু ফ্লাডেব ঐ জল ত এক-ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট দেবি কবে আসবে না। তাহলে ?

ঘুরে-ফিরে তারা আবার সেই একই সমস্যার সামনে এসে পড়ে। ট্রেন এই ব্রিজেব ওপর দিযে শেষ কখন গেছে তা গজেনেব মনে পডা সত্ত্বেও বন্যা আসাব সময নির্ণয় কবা যাচ্ছে না।

গজেন হঠাৎ বলে, 'হবে নিতাই, ফ্লাড চাবিটায আসিলে কি তোব হাতত পাখনা গজাবে, পাখির নাখান উডি যাবি, পারত ?'

'কী হইছে ক না, শালা পালা গাবার ধবছে', নিতাই ধমকে ওঠে।

'না, কহিবাব ধইবছি কি, সকালেও ত যাবার নাগিবে, পাবত, স্যাল্যায ক্যানং যাবি ?'

'সাঁতবি যাবে, দিনের আলোয আবার কী, সব ত দেইখব্যার পাব'।

'হে-ই ধব সুখবঞ্জনেব মাও, কানকাটুর মাও, আব তালইযেব শাশুডি—সগায় সাঁতরি যাবাব পাবিবে ? 'না, উমবাত বিসর্জন দিয়া যাম—', গজেন বেশ প্যাঁচানো যুক্তি পায়।

'দে, দে, বিসর্জন দিযা দে, ঐ বুড়িক নিব্যাব জইন্যেই ফ্লাড আসিবাব দে, এ্যাহন ঘাও দিয়্যা এ্যামন গন্ধ ছাডে যে ঘরে থাকন যায না', জগদীশ বাকুই হাত তুলে বলে। তাব শাশুড়ি অসুখ নিয়ে এখানে মৃত্যু শয্যায।

'তা কইব্যাব চাস কী, কয্যা দে না', নিতাই ধমকে উঠেও যেন গজেনকে মিনতি কবে। সমস্যাব সমাধানটা এখনই দরকাব।

'এক কাম ধবো কেনে, সিগন্যাল য্যালায় দিবাব ধইচছে, ফ্লাডেব জল নামিবা ধইচছে, কী, কও, ধইচ্ছে কি ধবে নাই', গজেন প্রশ্নোত্তরে নিজেব কথা গুছিয়ে নিতে চায়।

'হয়, ধইচছে, ধইচছে,' কেউ একজন সায় দেয়, নিম্ন স্বরেই, যেন জানাই আছে, এটুকু সায়েই গজেন কথাগুলো বলে যেতে পারবে। জগদীশ মাথা ঝাঁকায় সম্মতি জানিয়ে, এমন-কি যেন গজেনের পরের কথাটাতেও সে আগাম সম্মতি জানাচ্ছে।

'সেই তোমাব রাইত তিন ঘড়িত আসুক আর ধরো কেনে কালি সকালত আসুক ?' গজেন আবার প্রশ্ন করে।

'হয়, আসুক', সেই প্রায় শোনা যায় না গলায় আবার ধুয়ো ওঠে। জগদীশ মাথা নাড়ে।

'পাহাড়ঠে যে ফ্লাড নামিবার ধইচছে, স্যালায ত আব হারি যাবাব না পাবে ?'

'না পারে—'

'এইঠেই নামিবার নাগিবে, এই ঠেই, এই তোমার চবত আসি ধাক্কা মারিবেই।'

'মারিবেই'

'স্যালায় হামাক এসকু (রেসকিউ) হবা নাগিবে ?'

'নাগিবে'

'ও এসকু হবার তানে কী নাগিবে ? নৌকা নাগিবে।'

'নাগিবে'

'নৌকা ত নাই রো—'
'নাই বো'
এক আছে বংধামালিব হাটের ভাঙা নৌকাখান—সেইটা কুনো কাজে লাগিবার না হয়।'
'না হয়'
'হামরালা যেইলা এসকু হয়্যা যাম তাব পাছত মিলিটাবির নৌকা নামিবে।'
'নামিবে'
'এ্যালায় এসখু আছে, নৌকা নাই।'
'নাই'
'স্যালায় নৌকা আছে, এসকু নাই।'
'নাই'

নিতাই দু হাতে তার পাশের লোকজনকে একটু সরিয়ে দিযে নিজে দুই পা পেছিয়ে যায়। তাবপর গজেনের পেছনে এমন জোরে লাথি কষায় যে গজেন উল্টো দিকে রাবণের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তে যায়। রাবণ সবে যেতেই সে ভেজা বালির মধ্যে গিযে পড়ে। নিতাই তার দিকে আবার ধেয়ে যায়, 'শালা, হিন্দি সিনেমা দেইখ্যা দেইখ্যা জোকার কবা শিখছে ; তব কথাডা কওয়ার নাম নাই , এইডা হয়, না হয়, এইডা না হয়, হয।' কিন্তু নিতাই ধেয়েই যায়, আব মাবে না। ততক্ষণে গজেন সোজা হয়ে গেছে, উঠে দাঁড়াতে পাবে নি। এক হাতের কনুইযে মাটির ওপব ভব বেখে আব-এক হাত তুলে, গজেন বলে, 'ছাডি দে, ছাডি দে, কহিছু, কহিছু এ্যালায ভেলা বানাবাব ধরি চল দুই চাবিখান।'

গজেনের কথায় নিতাই সোজা হয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'আব ?'

গজেন এবার উঠে বসার সুযোগ পায়, 'আর কহিছু দুই-চাবখান পাট প্যাচি মশাল বানি রাখ কেনে, যদি কামত নাগে।'

সমস্যার এমন সহজ সমাধানে নিতাই চিৎকার কবে ওঠে, 'ত, উঠ কেনে।'

চুরানব্বই

বালিয়াড়ির মাথায় কে ?

এতক্ষণ এত আলাপ আলোচনা যেন হয়ই নি এমনভাবে নিতাই রওনা দেয, যেন বহু আগে থেকেই ঠিক করা আছে যে আজ রাত্রিতে ভেলা বানানো হবে। নিতাই দু-এক পা হাঁটতেই বাকি সবাই তাব পিছন পিছন-পিছন চলতে শুরু করে।

সবাই মিলে কথাবার্তা যতক্ষণ চলছিল, ততক্ষণ যেন বাতাসটা আড়ালে-আবডালে ছিল। বা, এবা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে বাতাসটাকে এক রকম রুখে রেখেছিল, নিজেদের ভেতর কথাবার্তা সারার জন্যে। কথাবার্তার সময় তারা নিজেদের মাথা এত নাবিয়ে আনে, ঝুঁকিয়ে আনে, যে মাথার ওপর আকাশটাও যেন আকাশের মত ওপরে উঠে যেতে পারে। প্রলয়ের ভেতর আত্মরক্ষার চেষ্টায় যে এক ধরনের বিচ্ছিন্ন প্রাকার নিজের চারপাশে তৈরি করে নেয়া যায়, সেই রকম অস্থায়ী প্রাকার নিজেরাই ভেঙে ফেলে এরা হাঁটতে শুরু করলে তিস্তা থেকে আকাশ জোড়া জলকুয়াশা আর বাতাস মুহূর্তের মধ্যে এদের ঘিরে ধরে, এদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দু-চার পা যেতেই মনে হয় যেন এরা এতক্ষণ অন্য ভূমণ্ডলে ছিল, এখন এইমাত্র এখানে পা ফেলেছে। আকাশ একেবারে মাথার ওপর নেমে আসে। দুই হাতে সেই আকাশ সরিয়ে-সরিয়ে ওদের পথ করে নিতে হয়। কিন্তু বাতাসের ধাক্কায় আবার পেছিয়ে আসতে হয়, বা দাঁড়িয়ে পড়তে হয়। বাতাস যেন এতক্ষণে এতগুলো মানবশরীর পেয়ে এই শরীরগুলোর ওপরই ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এই শরীরগুলোর প্রত্যেকটিকে ঘিরে যেন আলাদা-আলাদা ঘূর্ণি, চলমান। এদের চলার সঙ্গে-সঙ্গে ঘূর্ণিগুলিও চলছে। এই শরীরগুলোকে বাদ দিয়ে বাতাসের আর কোনো অবলম্বন নেই যেন এখানে।

সত্যি করে নেইও। মাইল চারেক লম্বা আর মাইল তিন চওড়া এই চরের এই দক্ষিণ সীমা ঢালু হয়ে নদীতে মিশেছে। এই জায়গাটা বালুবাড়ি মাঝখানের উঁচু ডাঙা থেকে গড়িয়ে-গড়িয়ে জলে নেমেছে। এমন হতে পারে যে এখান দিয়েই চরটা প্রথম নদীর ভেতর থেকে সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে উঠে এসেছে। সঙ্গে নিয়ে এসেছিল নদীর ভেতরের বালি, পাথব। তারপর, এখানে বসতি হল, চাষ হল কিন্তু এর বালি আর ঘোচে নি।

ওরা এখানে এসেছিল পশ্চিম পাবের বাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে। এখন ওদের ফিরতে হচ্ছে পুবদিক বরাবর হেঁটে। ফিরতে হচ্ছে, প্রথমত, বাতাসের বাধা সঙ্গে নিয়ে। দ্বিতীয়ত, পায়ের তলায় ভেজা বালিতে পা গেড়ে যাচ্ছে ও তোলার সময় পিছলেও যাচ্ছে। তৃতীযত, এই জায়গাটা একটু চড়াই—সেই চড়াইটাই ওদের ঠেলতে হচ্ছে।

নিতাই হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলে, 'নরেশুযা আর নকু তোরা টর্চ হাতে এইঠে থাকি যা। কিছু দেইখলে দৌড় পাড্যা খবর দিবি।'

'এইঠে দৌড়াবে ক্যানং করি' গজেন চিৎকার করে হাসে, 'জল দিয়া যাস কেনে, সাঁতরিয়া।'

নরেশ আর নকু পেছনে দাঁড়িয়ে যায়, তাবপবে ফিবতে শুরু করে।

একটু দূর থেকে বা ওপর থেকে যদি এই কজনকে দেখা যেত তা হলে তেমন দৃশ্যঅভিজ্ঞ কারো মনে হতে পারত, বালিরই কতকগুলি স্তম্ভ বাতাসের টানে এগিয়ে চলেছে। জলকুয়াশার অস্পষ্টতা আর বালির অস্পষ্টতা মিলে একাকার হয়ে গিয়েছে এমন. সমস্ত দৃশ্যটাকেই একটা মাত্র দৃশ্য মনে হয। কিন্তু পায়ে-পাযে সেই দৃশ্যেব বৈচিত্র্য টেব পাওয়া যাচ্ছিল, বাতাসের ধাক্কায় অন্ধেব মত পথ চলতে চলতেও।

কাবণ, বৃষ্টিতে সমস্ত বালি ভিজে যাওয়ার আগেই বাতাসে-বাতাসে এই বালির ভূগোল পরিবর্তমান থেকেছে। জলেব তল থেকে শুশুকেব মত উঠে আসা কোনো বাতাসে নীচেব থেকে বালি আকাশে উঠে ঝুরঝুর করে জমা হয়ে গেছে একটু ওপরে বা আকাশের ভেতব থেকে চিলের মত নেমে আসা কোনো বাতাসে ওপবের কোনো স্তূপেব মাথা ঝুবঝুব কবে ভেঙে ছড়িযে গেছে। চাবদিকে বালির ডাঙাব মাঝখানে একটুখানি কালো জল টলটল কবত—বাচ্চারা সাঁতাব কাটতে পারে এ রকমই জল—এই ক-দিনের বাতাসে সে পুকুর ভরে গেছে, আর ফলে, জায়গাটিই হয়ে গেছে ফুটবল মাঠের মতন সমান। এই পরিবর্তনের পর বৃষ্টি নেমে তাকে পববর্তী কয়েক দিনেব রো পর্যন্ত একটা স্থায়িত্ব দেয়।

ফলে, এবা যেন এদের পাযেব পক্ষে অপরিচিত এক ভূখণ্ড দিয়ে হঁটছিল। সাধারণভাবে, ত এদের প্রায় চোখ বুজে চলে যাওয়া উচিত, এই চরের প্রতিটি অংশ পাযেব তলায় তলায় এমনই চেনা। কিন্তু গত মাত্র দু-তিন দিনে একেবারে পারের এই বালুবাড়ি এমন অচেনা হয়ে গেছে যে যদি বাতাস না থাকত, যদি আলো এমন ছায়াহীন ধূসব না হত, তা হলেও ওদেব পক্ষে সোজা হেঁটে যাওয়া সম্ভব হত না।

কে, বোঝা যায় না, কিন্তু, একজন ওদের চাইতে একটু বেশি লম্বা হয়ে যায়। পেছনের সবাই দেখতে পায় সে ধীরে-ধীরে উঁচুতে উঠছে। আর, একটু উঁচুতে উঠেছে বলেই হয়ত বাতাস থেকে মুখটা একটু সরাতে পেরেছে। বালিয়াড়ির চড়াই ওভাবে ভাঙায় নীচ থেকে মনে হচ্ছে যেন পুরো বালিয়াড়িটাই যেন হাঁটছে। ধূসরতায় বালি আর মানুষ একে হয়ে গেছে। শুধু মানুষের মাথার চুল, তার পদক্ষেপের ভঙ্গি, তার শরীরের বিন্যাস বুঝিয়ে দেয় ওখানে একটা শারীরিক আলোড়ন আছে, বাধার সামনে মানুষের শবীরের আলোড়ন।

ঐ বালিয়াড়িতে যে উঠেছিল, সে টের না পেয়ে উঠেছে। সব জায়গাতেই ত বাতাস ধাক্কা দিচ্ছে, সব জায়গাতেই ত পা ডুবে যাচ্ছে। সামনের পায়ের ওপর ভব দিয়ে পেছনের পা তুলতে গেলে, সামনের পা ডুবে যাচ্ছে। পায়ের বাটিতে টান লাগছে। দুই পায়ের সমতা ঠিক রাখতে না পেরে টলে যেতে হচ্ছে। আর টলে যাওয়ার ফলে দিক বদলে যাচ্ছে। এ-রকমভাবে এই আচ্ছন্নতার ভিতর পথ চলতে গেলে কারো কী আর পায়ে-পায়ে টের পাওয়ার কথা যে সে চড়াইয়ে উঠছে, তাও আবার বালিয়াড়ির চড়াইয়ের মত পিচ্ছিল চড়াইয়ে? সে টের পায় না। তাকে ঐ পুরো চড়াইটা ভাঙতেই হয়।

কিন্তু, নীচে যারা ছিল তারা ত চলমান ঐ বালিয়াড়ি দেখে বুঝতে পারে কেউ একজন বালিয়াড়ি

ভাঙছে, ওখানে বালিয়াড়ি আছে। সুতরাং তারা বাঁয়ে ঘুরে যেতে চেষ্টা করে—যতটা বাঁয়ে ঘোরা সম্ভব, যতটা চেষ্টা করা সম্ভব। বাঁয়ে ঘুরতে গিয়ে আর-একটা চড়াই ওরা ডিঙবে কী না সে বিষয়েও নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু সামনে একজন বালিয়াড়ির মাঝখান থেকে যখন জানান দেয় যে ওখানে বালিয়াড়ির চড়াই, তখন আর-সবাইকে একটু ডাইনে-বাঁয়ে সরে যেতেই হয়—বালিয়াড়ি না ডিঙিয়ে শুধু বালিযাড়িটাকে ঘের দিয়ে ঘুরলেই ওপাবে যাওয়া যাবে। ডানদিকে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না—বাতাস ওদিক থেকেই আসছে। বরং বাঁয়ে ঘুরে গেলে ঐ বালিযাড়িতেই বাতাস থেকে একটু বাঁচা যাবে। একটু হলেও সে ত বাঁচাই।

যে চরটাকে নিজেরা হাসিল করে আবাদের জাযগা বানিযেছে, বসবাসেব জায়গা বানিয়েছে, সেই জায়গাটা দিয়ে এমন অন্ধের মত হাঁটায় একটা পরাজয় আছে। সেই পবাজয় মানতে-মানতে ওদেব হাঁটতে হয়। বাতাসের ধাক্কায় নিজেদের চলাব গতিব আন্দাজ মেলে না—কতক্ষণে কতটা পৌঁছানো যায়, বোঝা যায় না। বালির পেছুটানে নিজেদের হাঁটার গতির আন্দাজ মেলে না—কতটা হাঁটলে কতটা পৌঁছানো যায় টের পাওয়া যায় না। জলকুয়াশা-দৃষ্টির গতির আন্দাজ মেলে না—কতটা এল আব কতটা যেতে হবে হিশেব পাওয়া যায় না।

যারা নীচে ছিল তাদের ভিতর একজন চিৎকাব কবে, 'সগায় মিলি ফিবিবার ধইচছি, এ্যালায ঐটা কুনটা আকাশত উঠিবার ধরিছেন হে?'

স্বরে চেনা যায়, কথাটা রাবণের। কোনো জিজ্ঞাস নেই—কেবল মন্তব্য, একজন আকাশে উঠে যাচ্ছে।

'আকাশখান এইঠে বালিত মিশি আছে, কায় জানে?' কথাটা নিতাইয়েব, বালিয়াড়ির মাথা থেকে।

'ঐঠেও কি বানা আছে হে?' বাবণ বসিকতা করে।

বালিয়াড়ির মাথায় নিতাইয়েবও হাসি শোনা যায—'এইহানে ব্রিজের নাগাল লাইট জ্বলিছেন'।

'দেইখ্যা লাভটা কী হবে হে? এতক্ষণ ত গাড়ি-গাড়ি আলো দেইখলেন না?' গজেন বলে। মনে হয়, নিতাই আরো এক ধাপ উঠেছে। এখন যদি বালিযাড়ি ভেঙে ওখান থেকে পড়ে যায়, নিতাইকে তাহলে আর পুরোটা ঠেলতে হয় না।

রাবণ বালিয়াড়ির ভিত দিয়ে একটু ঘুবতে পাবে।

সেখান থেকে মাথা উঁচু করে বলে, 'ঐ আলো দেখি ত জানলু বানা আসিবাব ধইচছে, নয ত নিন্দিব মাঝত বানভাসি হবার ধইরত'—রাবণ বোধহয় বালিয়াড়ির একটু আড়াল পায়, তার কথাগুলো স্পষ্ট শোনা যায়।

'তা ঠিক, ঠিক, ঠিক কথা', জগদীশ বারুইয়ের ছানিচোখের অবলম্বনহীনতা তাব স্ববে শোনা যায়। কিন্তু বোঝা যায় না, আরো যে-কজন বালিয়াড়ির ভিত ধরে এগচ্ছে তাব ভেতর কোনটা জগদীশ।

'সগায় ত জানে হামরালা এইঠে আছি, নৌকা আসতি পারে', গজেন বলে।

কেউ জবাব দেয় না বলে সে আরো যোগ করে, 'মিলিটাবি নামিবাব পারে, নৌকা আসিবার পারে, রিসকু করিবার তানে।'

'রিসকু আসিলে কি ফিরি যাবে না ডাকি-ডাকি তুলিবার ধইরেব?' বাবণ বলে।

'ক্যানং করি মিলিটারি মানষি বুঝিবার পারে এ্যানং বালুবাড়ি আর ধাঙ্কিনা পাথারের পাছত একখান চর আছে।'

'মিলিটারির নৌকা ত ভটভটি নৌকা, শুইন্যা ঘর থিক্যা আসা যায়,' নিতাই বলে।

'ভটভটি নৌকা চলব্যার পারে না, কাদা ঢুইক্যা যায়', জগদীশ হে হে করে আনন্দ জানায় হঠাৎ, যেন, এই জলে মোটরবোট না-চলায় তার কোনো আনন্দের ব্যাপার আছে। নিতাই বালিয়াড়ির মাথার ভেতরে হঠাৎ ডুবে যায়। তাকে আর দেখা যায় না। তারপর সম্পূর্ণ নৈঃশব্দ্যে সেই বালিয়াড়ির মাথা থেকে বালির ভেতর ডুবে তল দিয়ে বেরিয়ে আসে। নিতাই যখন দাঁড়ায় তখন তার ভেজা শরীরের মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভেজা বালি সেঁটে যায়।

'শালা,' নিতাই উঠে দাঁড়িয়ে দুই হাত ঘষে বালি ঝাড়ে, তারপর দু চোখের পাতা থেকে বালি ঝরিয়ে দেয়।

বালিযাড়ি ঘিরে সামনে দুজন এসে গেছে। নিতাই বলে, 'শালা, সিধ্যা হাটতে হাটতে উঠছি বালুবাড়িব মাথায।'

নিতাই আবার হাঁটতে শুরু করে।

পঁচানব্বই

বানা, জাগরণ ও ঘুম

'হেই, দেখ কেনে, জগদীশ আবাব তিস্তার ভিতবত সিন্ধি না যায়', বাবণ এগিয়ে যেতে-যেতে ঘাড় ঘুরিয়ে বলে।

'তুই চল না, শালো', পাহাড়েব নাগাল কুযাশা নাড়ি-নাড়ি চইলব্যাব লাগছে', বাবণেব ঠিক পেছনেই জগদীশ ছিল, এটা বাবণ বুঝতে পাবে নি।

বালিযাড়িটা পাব হতেই এদেব একটা লাইন হয়ে যায়। পায়ে আলেব মাটি পাওয়া মাত্র পায়ের আঙুলগুলো মাটি আঁকড়ে ধবতে পাবে, চেনা মাটি আঁকড়ে ধবতে পাবে যেমন অভ্যস্ত আঙুল। এই সব আলে ওদেব পাযেব চিহ্নগুলো থেকে গেছে। নিজেদেব সেই প্রাচীন পদচিহ্নেব ওপব ওবা পা ফেলে, আন্দাজে কুযাশায। এই কুযাশায় পাযেব মাটি স্পষ্ট দেখা যায না। কিন্তু পা দিয়ে মাটি অনুভব করা যায। চবেব উঁচু ডাঙা শুরু হয়ে গেছে। এখন সামনে ধানি জমি। তাতে অশ্বিনী বায ভাদই পাকাচ্ছে বিঘা পাঁচ জমিতে। এবাবেব ফলন খুব ভাল ছিল। আজ শেষ বাত্রে পাকা ধান জলে ভাসবে।

অশ্বিনী বায়েব খেতেব আগেই সরু-সরু ফালিতে সিঁড়িব মত উঠে গেছে নতুন চাষেব ধান। এখন ধান গাছগুলো তলাব জমি থেকে আল পর্যন্ত ওঠে নি। বাতাসে গত তিন দিন ধরে জলের মত উথালপাতাল খাচ্ছে। আব জলকুযাশাব ভাবে নেতিয়ে প্রায মাটিব সঙ্গে মিশে আছে। এই বাতাস আর বৃষ্টি দুটোই এই ধানেব পক্ষে ভাল। যদি এ বকমই চলে আবও দু-একদিন তাও মন্দ না। তাবপব এক বেলা বোদ পেলেই মাটিতে শোযা ধানখেত চাঙা হয়ে আকাশে, নীল আকাশেব তলায মাথা তুলবে অন্তত বিঘৎখানেকেব কাছাকাছি লম্বা হযে। ধানখেতের এই লম্বা হওযাটা বোঝা যায, এ-রকম টানা বাতাসজলেব পব ত আবও বোঝা যায। বাচ্চাবা যেমন হাত-পা ছাড দিলে কেমন লম্বা আব রোগা হয়ে যায, ধানখেতটাকেও সে-বকম লাগে। এবপর যখন টানে নুয়ে যাবে তখন মোটা লাগবে। কিন্তু এই ধানখেতগুলো আব লম্বাও হবে না, মোটাও হবে না। আজ শেষ রাতে কাঁচা খেত ভাসবে।

এদিক থেকে প্রথম পডবে—দুই নম্বব মিস্ত্রিপাডা। এখান থেকেই চরের বসত শুরু। মাঝখান দিয়ে বাস্তা আব দুই পাশে খেত। সেই বসতেব পেছনে আবাদ। মনে-মনে ভাবলে পাহাড়ের মত লাগে। নীচেব ধাপে বালুবাড়ি, পবেব ধাপে খেত, মাথার ধাপে বসত। কিন্তু তাই যদি হত, পাহাড়ের মত উঁচুই যদি হত তাহলে ত নিজেদেব বাড়িতে বসে-বসে পাকা ধান, কাঁচা খেত সব জায়গায জলঢোকা, বানভাসা দেখতে পারত। কিন্তু তিস্তার বন্যার কাছে এ উঁচুনিচুটা কোনো ব্যাপার নয়।

মিস্ত্রিপাড়ায় ঢুকে কিছুটা এগলেই কুয়াশা হালকা। দুই দিকে বাড়িঘর থাকায় বাতাস আর কুয়াশা ভেতবে ঢুকতে পারে না। কিন্তু বাড়ি ঘরের ওপবে ত জলকুয়াশা লেগেই আছে। আকাশের আলো ত আর সে-সব ভেদ করে নীচে নামতে পারে না। তবু, মিস্ত্রিপাড়াব ভেতরে খানিকটা এগিয়ে ঐ মধ্যরাত্রিতে ওরা যেন পরস্পরকে দেখতে পায়, প্রায় ভোরের আলোতেই। নিতাই দাঁড়ায়। নিতাইয়ের মালকোঁচামাবা কাপড় তার উরুতে সেঁটে আছে, তার শরীরের জল আর বালি কেমন চমকায়। নিতাই তার বাবরি চুলের গোছা সামনে আনে, তারপব এক ঝটকায় পেছনে ঠেলে দেয়। চুলের বালি আর জল ঝেড়ে ফেলে। রাবণ দাঁড়ায়। রাবণ সবচেয়ে বয়স্ক, সবচেয়ে লম্বা। তার মাথায় চুল নেই, একেবারে গোড়া ছাঁটা। তাকে ঐ আবছায়ায় গাছের মত লাগে। তার লম্বা শরীরের অতটা দৈর্ঘ্য জুড়ে জলবিন্দু চমকে ওঠে—তার পরনে শুধু একটা নেংটি। পা থেকে মাথা পর্যন্ত রাবণকে মনে হয় ঐ জলে প্রতিবিম্বিত আলো দিয়েই আবছায়া তৈরি। সে তার দুই চওড়া হাতে, মুখের, গায়ের ও হাতের প্রতিবিম্ব মুছে ফেলে।

জগদীশ সবচেয়ে খাটো যে সেটা বোঝা যায় রাবণের পরে সে আর গজেন পর পর দাঁড়িয়ে গেলে। তাব ধুতি, কোমরে খুঁট দিয়ে পরা, আবাব খানিকটা গোটানো। তার ওপর কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত অংশটা থাকে-থাকে বসানো। বড মাথা ছোট ঘাড়েব ওপর যেন আলগা করে রাখা আর সেই মাথার জাযগা করে দিতেই ঘাড় দুটো দু পাশে উঁচু হয়ে আছে, যেন হালবওয়ার মত উঁচু। জলবিন্দু সেই সব উঁচুনিচু জায়গা, চওড়া বুক, বুকের খাঁজ, ছোট মেদহীন পেট ভরে রেখেছে। জগদীশের শরীরের সবটা এই অস্পষ্টতায দেখা যায না কিন্তু জলে আলোর আবছায়া প্রতিফলনেও বোঝা যায়, তার শরীরের দৈর্ঘ্যেব অভাব, প্রস্থে সামলানো হয়েছে—পেশিবহুল প্রস্থে। জগদীশ খুঁট থেকে অনেকখানি কাপড় বের করে, ভেতরে গোঁজা ছিল। সেই শুকনো কাপড়ে সে মাথা, ঘাড়, মুখ মোছে, দুই হাতে। তার মুখ দিয়ে একটু তৃপ্তিরও আওয়াজ হয, যেন, এইমাত্র স্নান সেবে উঠল।

গজেন দাঁডিযে পড়ে এক পাযেব ওপর ভর দিয়ে, যেন ঐ ছোটখাট পাতলা শরীরের ওজন একটি পায়ের পক্ষেও যথেষ্ট নয়। সে এমন ভাবে দাঁড়ায় যেন এতটা রাস্তা বাতাস ঠেলে, বালি ঠেলে, আসে নি, যেন এই বাস্তাটুকু আসতে তার সারা শরীরের পেশিগুলো যদিও দলিত হয়েছে—সে আরো এমন অনেকখানি বাস্তা যেতে পারে। গজেনের মাথা থেকে পা খালি, শুধু মাঝখানে একটুখানি নেংটি। সে তার শরীরের কোনো জলকণা মোছে না, যেন ওগুলো জলকণা নয, তার শরীরের ভেতর থেকে বেবিয়েছে। সেই জলকণার আবছাযা প্রতিফলনে গজেন নিজের শরীরকে নিজের শরীরে খোদাই করে দাঁড়িযেছিল—তার কিশোবেব মত শবীবকে খোদাই করে।

'হগলরে আইসতে কবা, না, চিল্ল্যায়্যা কয়া দিবা ?' নিতাই জিজ্ঞাসা করে।

গজেন হেসে ওঠে, 'নিতাইচন্দ্র সরকার এ্যালায ভাষণ দিবার ধইরবেন। আপনারা দলে দলে যোগদান দ্যান।'

গজেন একটু জোরেই কথা বলে ওঠে। পাশের বাডিব ভেতর থেকে নিদ্রা ও শ্লেষ্মাজডিত গলা শোনা যায, 'কে বে ? কে ?'

জগদীশ চিৎকাব কবে বলে, 'শালো, উইঠ্যা দ্যাখ তোর বাপ আইসছে, মানষির আওয়াজ পায়্যাও উঠাব নাম নাই—।' বাড়িটা বমণী সবকারেব।

বাস্তার ওপব থেকে আওযাজে বোঝা যায়, ভেতরে রমণী সরকার উঠছে।

বাবণ বলে, 'হ্যালায কি হামবালাব মাইয়্যার বিয়া বইচছে—সাগাই কুটুমক নেমন্তন দিবার ধইচছি ? রমণীব ত উঠিবাব নাগিবে আধাঘণ্টা, তারপর বিড়ি ধরিবে তারপর লণ্ঠন জ্বালিবে, তাবপব ঘর খুলিবে, চিল্লি কহি দেন না কেনে—'

নিতাই চিৎকার করে, 'হে-এ কাহা, লাল সিগন্যাল দিয়া দিছে, শেষ রাতত্ বানা আসিবে, ভেলা বানি বাখো, হামরালা হবিসভাত আছি, এই চলো কেনে।'

ওরা আবাব রওনা হতেই ঘরের ভেতব থেকে রমণী চিৎকার করে ওঠে, 'এই খাড়া, খাড়া।'

গজেন পেছন থেকে ঘাড় ঘুবিয়ে বলে, 'আব খাড়াবেন কায়, তোমরালা আইস।'

রাবণ বলে, 'এই তোমাব লাল সিগন্যাল, মানষিলা সগায় ঘুমাছে।'

জগদীশ 'হ্যা' 'হ্যা' করে হেসে বলে, 'হালা সম্বন্ধীর বাপরা বুঝবেনে যখন ঘুমের মইধ্যে ফ্লাড ঢইকবে', বলেও জগদীশ 'হ্যা' 'হ্যা' করে হাসে, যেন সে একটা মজা দেখার অপেক্ষায় আছে।

জগদীশকে বেশ ব্যস্ত দেখায়। নদীর পাড়ে তাকে অস্থির লাগছিল, যা হওয়া উচিত তা যেন হচ্ছে না। কিন্তু যখনই জানা গেছে লাল সিগন্যাল পড়ে গেছে, পাহাড় থেকে বন্যা নামছে, শেষ রাতে বন্যা এখানে পৌঁছে যাবে, তার জন্যে এখন থেকে ভেলা তৈরি করতে হবে—তখনই জগদীশ স্থির হয়ে গেছে. সেই স্থিরতায় সে তাদের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে বড় হয়েও, প্রায় কিশোরের মত উৎসাহে টগবগ করছে। শেষ রাতে ঘুমের ভেতর তিস্তার মাঝখানে জেগে উঠে রমণীর কী হবে, তা ভেবে সে আপন মনেই খ্যাক খ্যাক করে হাসে। হাসে আর দৌড়ে-দৌড়ে হাঁটে। তাকে দৌড়ে-দৌড়েই হাঁটতে হয়, কারণ, নিতাই আর রাবণ লম্বা-লম্বা পাঁয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

মিস্ত্রিপাড়াটা মূল বসতি এলাকার বাইরে। ধানি জমির মাঝখানে এই একটা পাড়া, তারপর আবার অনেকখানি ধানি খেত, তার শেষে আবার নাউয়াপাড়া। এখান থেকে বসতি জমাট। মিস্ত্রিপাড়া থেকে নাউয়াপাড়ার মাঝখানে দুপাশে ধানখেত, তারপরে এক বিরাট বাঁশবনের মধ্যে দিয়ে রাস্তাটা, এই

রাস্তাটা, সমকাণে পশ্চিমে বেঁকে গেছে। এর পর থেকে নাউয়াপাড়া। নাউয়াপাড়ার পরে ছোট এক খাল, তিস্তার পুরনো বেনো জল আটকে গেছে, এখন জল সবুজ। সেই খালের ওপারে মাহিন্দরপাড়া, তার ডান পাশে আবাব একটা বাঁশঝাড। তার পরে সরকারপাড়া দুই নম্বর। এই ভাবে ধীরে-ধীরে চর যেন আর চর থাকে নি, হযে উঠেছে ভরভবন্ত গ্রাম, কাল শক্ত মাটির গ্রাম, বড়-বড় গাছের আড়ালে ছাযাব নীচে প্রবীণ সব গ্রাম। সে গ্রামেব ভেতব ঢুকে কারো মনে হবে না আর-মাত্র ঘণ্টা দুই-তিন পরে এই সমস্ত কিছুর ওপব দিয়ে তিস্তার ঘোলা জল তীব্র আবর্তে বয়ে যাবে আর এই গ্রামের কিছু চিহ্ন সেই জলেব ওপরে নিশানা দেবে। বাতাস এখানে কম ছিল, কিন্তু তাতে বাঁশবনের প্রায় মাটির কাছাকাছি নেমে এসে ছিলাছেঁড়া ধনুকেব মত উঠে যাওয়া ঠেকে না। বাঁশপাতাগুলো এই বাতাসে এত আওয়াজ করে যেন মনে হয় আড়ালে কোথাও জলেব স্রোত বইছে। বাঁশগুলো হেঁচকি তোলার মত মুচড়ে ওঠে—সে আওয়াজ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

নাউয়াপাড়ার বাঁক নিয়েই ওবা দেখে এক হ্যাজাক জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে দীননাথের মুদিখানায় আর তার সামনেব মাঠটুকুতে মবা মানুষের মত ফেলা কলাগাছেব ধড়। একপাশে পাতার স্তূপ। আলোতে অন্তত জনা ছয়-সাত কাজ করতে লেগে গেছে। দূর থেকে দেখে নিতাই বলে, 'আরে এগুলাও রেডিওর খবর পাইযা গিছে, যাউক বাঁচাইল, হে-এ অমূল্যা।'

ওদেব হাঁক শুনে সবাই এদিকে তাকায়। কিন্তু কেউই কিছু দেখতে পায় না, আরো ওদের মুখের ওপবই পড়ে চোখ ধাঁধিযে দিয়েছে। হাতে কারো-কাবো দা, আর-এক হাতে কলাগাছ ধরে থাকা, কেউ শুধু হাতে, কারো হাতে ছুঁচলো লাঠি, সবাই এই বাঁশবনের দিকে তাকিয়ে।

তারপব ভিড়ের ভেতব থেকে কেউ চেঁচায়, 'কে হয়।'

ততক্ষণে ওবা আলোব সীমানাব ভেতব ঢুকে গেছে। নিতাই আগে-আগে, হাসতে-হাসতে।

ছিয়ানব্বই

দক্ষিণে, পশ্চিমে—জাগো, আইস

তাও কেউ নিতাইকে চিনতে পাবছে না দেখে সে চিৎকার করে ওঠে, 'আবে, সব ভূত দেইখছে নাকি ?'

'আরে নিতাই ? জগদীশ কাহা ? আরে, তোমরা কুথায় গিছিল্যা ?' কলাগাছ ফেলে দিয়ে সবাই এগিযে আসে। ঐ আলোতে এদের চেহারা দেখলে মনে হয় অনেকদূর থেকে এল—প্রত্যেকের হাঁটু পর্যন্ত বালি। নিতাইয়ের মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত বালি। ভিজে সে বালি গায়ের সঙ্গে লেগে গেছে। তাকে দেখাচ্ছে যেন বালির তলা থেকে বালি ফুঁড়ে উঠে এল। রাবণের অত লম্বা শরীরটায় বৃষ্টি আর বাতাস যেন বেশি লেগেছে। সেই অনেক বেশি বৃষ্টি আর বাতাস বহন করে সে কুঁজো হয়ে গেছে। জগদীশ পেছন থেকে লাফিয়ে ওঠে, 'সেই ধরো উত্তর পাক থিক্যা দক্ষিণ পাক পর্যন্ত জল মাইপ্যা আসছি, তিস্তা ব্রিজে সারা রাত্তির লাইট জ্বালাইয়া থুইছে।'

'আরে বসো আগে। কও কী, ক্যান ?'

'তোমরা ভেলা বানাও ক্যান ?' নিতাই হাসে।

'রেডিওয় ত কইল, শুইনল্যাম, তা ভাবল্যাম, যা-হয় তা-হয়, কয়ডা বানাইয়্যা রাখি।'

'নিজেগারডা খুব ভাইবছ, চরের কথা কেডা ভাইবব ?' জগদীশ বলে।

'যারা ভাইব্যা ঘুইর‍্যা আ্যাল, তারাই ভাবব। ত আমাগো কাম কী আগাইয়্যা থুল, নাকি পিছ্যাইয়্যা থুল সেইডা কও। আর কী দেইখল্যা কও।'

'ঘোড়ার মাথা আর গাধার ডিম। চুপ যা। ঐদিকের পাড়ায় খবর দিছিস না দ্যাশ নাই ?' নিতাই সামনের লোকটাকে ধমকে ওঠে। নিতাইয়ের এই ধমকটাই হচ্ছে ওর সামাজিক সম্ভাষণ। সবাই একবার হেসে উঠল।

যাকে বলল সে বলে, 'আরে সারা চর ঘুইর‍্যা আইল্যা, এ্যাখন কি তোমরাই আবার খবর দিব্যার

ছুইটব্যা নাকি ? পোলাপান আছে কোন কামে ? তোমরা বসো। এই ভোলা, সাইকেল বাইর কর খানদুই, না, খানতিন—'

নিতাই দোকানের বারান্দায় গিয়ে বসে। তারপর হেসেই বলে 'আরে অমূইল্যা, তর মাথাত কী আছে একবার একস্‌রে করিঁ দেখি আসিস ত।'

অমূল্যর হাতে তখন দা। সে সেটা হাতে নিয়ে ঘোরাতে-ঘোরাতে বলে, 'ক্যান, কী কইরল্যাম ?'

'কী কইরলি মানে ? আরে, বানা আইসব তরা ত শুনছিস শেষ নিউজে।'

'হয়।'

'তা তহন আর কত রাইত ? একবার সবাইক খোঁজডাক কইর‍্যা নিস ন্যাই ? এইহানে ভেলা বানাইস আর ঐহানে রমণী কাহা এমন ঘুমাইছে ঠেলা মাইর‍্যা তুলা যায় না। বন্যাতে ভাসি গেইলেও ত টের পাইব না—'

'এই নীলমোহন, যা ত রমণী কাকাক ডাইক্যা নিয়্যা আয়', অমূল্য বলে।

'আর ডাইক্যা আইনতে হবে না, সে এতক্ষণে দৌড় দিয়্যা আসত্যাছে,' জগদীশ একটা ঘরের দাওয়ায় বসে ছিল, সেখান থেকে বলে।

সাইকেল আনতে যাকে বলা হয়েছিল সে ও আরো দুজন সাইকেল নিয়ে এসে দাঁড়ায়। অমূল্য বলে, 'দাদা, ভোলারা আইছে, কয়্যা দ্যাও কুথায় কী খবর দিবে।'

নিতাই একটু থেমে বলে, 'এক কাম কর, সিধ্যা ঘুইর‍্যা আয়। যদি দেখিস আর সব পাড়ায় সবাই জাইগ্যা আছে কয়্যা দিস আমরা এইখানে আছি, আর যদি দেখিস কুনো পাড়া চুপচাপ আছে ডাইক্যা জাগায়্যা দিস।'

জগদীশ ডাকে, 'এই ভুলা, শুন্‌।'

'কন।'

'তর জেঠিরে কয়্যা দিস, আমি এইখানে আছি।'

'ত আপনার আর থাকনের কাম কী, ভুলার সাইকেলেব পিছনে বইস্যা চইল্যা যান। ভুলারা ঘুইর‍্যা আইসলে আমরাও যাব নে', নিতাই বলে।

'তাই যাব ?' জগদীশ কিছু ভাবে।

'যাবেন না ক্যান, আপনার কি কালরাত্তির নাকি ? গেলে ত ঐ পাড়াটার একটা বিলিবন্দবস্ত দেইখবার পাইরবেন'—নিতাই বলে।

'তালি যাই, কী কস ?' জগদীশ ভোলার দিকে এগিয়ে যায়। ভোলা সাইকেলটা সোজা করে ধরে। জগদীশ সাইকেলের পেছনের ক্যারিয়ারে দুপা দুদিকে ঝুলিয়ে বসে। তার ওঠার মধ্যে এমন স্বাচ্ছন্দ্য ছিল যাতে বোঝা যায় সে এ-রকম চড়তে অভ্যস্ত। ভোলা শক্ত হাতে সাইকেলটা ধরে বলে, 'তিনজনই কি একদিকে যাব·নাকি ?'

'একদিকেই যা, দরকার হইলে একজন আইস্যা খবর দিতে পারবি নে,' নিতাই বলে।

এখানে একটা হ্যাজাক জ্বালানো হয়েছে বলে আলোর একটা কেন্দ্র দেখা যাচ্ছে মাত্র। হ্যাজাকের আলোটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে নি—গোল হয়ে স্থির আছে, যেন হ্যাজাকটাকেই দেখানোর জন্যে হ্যাজাকটা জ্বালানো হয়েছে। সেই আলোর মধ্যে এসেই সবাই কাজকর্ম করছে—তার বাইরে কিছুই দেখা যাচ্ছে না, যেন, হ্যাজাকের আলোটাই আলোর পেছনটাকে আড়াল করে রেখেছে। সেই আড়ালের দিকে তাকিয়ে নিতাই জিজ্ঞাসা করে, 'অমূল্য, কয়ডা বানাইছিস ?'

'তিনখান বানাইছি। কিন্তু গরুগুলার জন্যে একডা বড় করি বানাইব্যার ধরছি—'

'ধুর বোকা, ভেলার উপুরে খাড়াইব্যার পারব না, শুয়্যা পড়ব নে, এক-এক ভেলায় এক-এক গরু ভাইসব্যার ধরবে নে—'

'অমূল্য ওর গাই-বদলগিলাক ভাসান দিবার ধরিবে, স্যালায় উমরার পাছত-পাছত গিয়া ধরিবে, কোন চরত ঠেকিছে—' গজেন বলে।

'তোমরা কী দেইখল্যা, বানা আইসবেই ? নিতাই, কত বড় বানা ?' অমূল্য হঠাৎ কাতর হয়।

'রেডিও শুইনলি ত তুই, আমরা ত তখন ব্রিজের দিকে চাইয়্যা আছি—বালুবাড়িতে, তুইই ক না। কইছে ? কত বড় বানা ?'

'ও শালা এত গলা কাঁপাইয়্যা-কাঁপাইয়্যা কয়, মনে হয় পাহাড়গুলা সব হাঁটা দিছে এই দিকে। ক কত জল, কত কিউসেক, সেই সবের বালাই নাই।'

'সগাক সবিবার কহিছে—নদীপারঠে?' বাবণ শ্লেষ্মাজড়িত স্বরে বলে।

'হে রাবণকাকা, তুমি এড্ডু বাড়িতে যাও না, কত আব ঘুইবব্যা? বাড়িব জিনিশপত্র গুছাবেনে কেডা?' নিতাই বলে।

'সে মোর তানে ফেলি রাখিছে নাকি হে', যেন বাবণ আগে থাকতেই জানে, বা, গোছানোব কথা আগে থাকতেই ঠিক হয়ে ছিল।

'আরে কাকি খবব পাইছে কি পায় নাই, তয়?' নিতাই বলে।

'সারা চর জাগি আছে, আর তব কাকিব যদি বেউলাব ঘুম হয় ত হক কেনে?'

'এই অমুল্যা', বলে নিতাই উঠে দাঁড়ায়, 'চল ত পচ্চিম ঘাটাখান দেইখ্যা আসি, এ্যাখন জল কতখান বাইড়ছে—কম থাইকলে গরুবলদগুলাক পাব কবি দে—'

নিতাই তাড়াতাড়ি বওনা দেয়। গজেন আব বাবণ ছুটে তাব সঙ্গ নেয়।

এখান থেকে সোজা রাস্তা ধরে কিছুটা গেলে বাঁ দিকে পশ্চিমেব ঘাটে যাবাব বাস্তা। নিতাই যেতে-যেতেই 'অমূল্যা' বলে ডাক দিয়ে এগিয়ে যায়। এখানে বসে থাকতে-থাকতে হ্যাজাকেব আলোটা কেমন আড়ালেব মত লাগছিল, হ্যাজাকেব আলোটাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেলে বোঝা যায় ঐ আলো একটু ছড়িয়েও গেছে। সেই ছড়ানো আলো জুড়ে নিতাইযেব ছায়াটা ক্রমেই লম্বা হয, মাটিতে শোয়, কিছু একটা বেয়ে খাড়া হয়, ছায়াব ঘত্ব কমতে থাকে, তাবপব আকাশেব দিকে উঠে ছায়াটা মিলিয়ে যায়। রাবণেব ছায়া নিতাইযেব শবীবটা আড়াল কবে দেয়, আব বেঁটে গজেনেব ছায়া লম্বা বাবণকে ছাড়িয়ে ওঠে। মাত্র কয়েকবাব এই তিনটি ছায়ার কাটাকুটি চলতে থাকে। তাবপব অন্ধকারের ভেতর থেকে নিতাইযেব চিৎকাব ভেসে আসে—'অমূল্যা, এই অমূল্যা।'

হ্যাজাকেব কাছাকাছি থেকে অমূল্য চিৎকাব কবে বলে, 'যাই যাই, আগাও, ধইবত্যাছি।'

নিতাই অন্ধকাব থেকে হাঁক দিয়ে বলে, 'গাই-বদল-বাছুবগুলাক লাইন বাইন্ধ্যা ঘাটে নিয়্যা আইসবাব কয়্যা দে হককলবে—'

অমূল্য জিজ্ঞাসা কবে, 'এহনই?'

নিতাই গলা এত তুলে কথা বলছিল যে তাব ধমক বোঝা যায না, কিন্তু তাব কথা যাবা জানে তাবা বুঝে নেয় নিতাই ধমকই দিল, 'অহনই, অহনই।'

এই রাস্তাটা চরের ভেতবেব বাস্তা। শক্ত আল, বৃষ্টিতে ভেজা ও পিছল, কিন্তু কাদা নেই। ফলে, ওরা প্রায় দৌড়ে-দৌড়ে যেতে পাবছিল। বাতাস এখন পেছনে। মাঝে-মাঝে ধাক্কা মাবছিল। কিন্তু তখনো ওরা বাড়িঘর, গাছপালা, বনবাদাড়েব ভেতব দিযেই ছুটছে—ফলে বা... সা বেঁকে যাচ্ছে, ওদের গাযে লাগছে না। পশ্চিমঘাটে যেতে বেশি সময লাগবে না, কাজেই। কিন্তু সেজন্যে ওরা এত তাড়াতাড়ি ছুটছে না। ঐ দক্ষিণেব বালুবাড়ি থেকে যে-বাতাস ও বালি ঠেলে ওরা গাঁয়ে ঢুকেছে, তার তুলনায় নাউয়াপাড়া থেকে পশ্চিমঘাটে যাওযাটাতে যেন আবামই লাগে।

পেছন থেকে গজেন বলে, 'খাড়া কেনে নিতাই, একখান বিড়ি খা।'

গজেন আর রাবণ এসে দেখে নিতাই দাঁড়িযেছে। ওবা তিনজন মিলে গোল হয়ে দাঁড়ায়, নিতাই কাপড়ের অনেক গভীর থেকে শালাই বেব কবে। তিনজন যখন আগুনের ওপব ঝুঁকে পড়েছে, পেছনে চিৎকার শোনা যায়, 'নিতাই, খাড়া, আইসত্যাছি।'

সাতানব্বই

নদী এখনো পুরনো

নিতাই, রাবণ, গজেন আব অমূল্য পাশাপাশি দাঁড়িয়ে এখন নদীব দিকে চেয়ে। ওপারে একেবারে সামনে রংধামালি-রায়পুরের বাঁধ। এখন দেখে মনে হচ্ছে—বন্যা যদি আসে তা হলেও এইটুকু এক

খালের মত তিস্তা পার হয়ে ওপারে উঠতে আর-কতক্ষণ। এ ত এখন যা অবস্থা তাতে দুই ডুব দিলেই পার। কিন্তু ওরা জানে, বন্যার জল একবার এখানে ঢুকে গেলে আর এই খাল সহজে পার হওয়া যাবে না। পার ত হতেই হবে। এই দিক দিয়ে পার হওয়া ছাড়া ত গতি নেই। কিন্তু এখন ত এখানে নদী পার হওয়ার জন্যে কয়েক পা যেতে হবে, ওপারেও এ-রকমই কয়েক পা উঠতে হবে। তারপরই ত বাঁধের বোল্ডার। কিন্তু একবার যদি এই খালে বন্যার জল ঢুকে যায় তা হলে ঐ বাঁধ থেকে বেরনো লম্বালম্বা 'স্পার'গুলো ধাক্কা দিয়ে-দিয়ে স্রোত ঠেলে দেবে এই চরেরই দিকে, যাতে স্রোতের ধাক্কা গিয়ে বাঁধে না লাগে। তখন, এখান থেকে ওপারে যাওয়ার মানে এত বেগে ছুটে আসা বন্যার স্রোতের বিপরীতে যাওয়া, স্রোত ঠেলে যাওয়া। স্রোতের গায়ে যদি গা ভাসিয়ে দেয়া যায়, তা হলে সোজা এক টানে সেই দক্ষিণের পাকে নিয়ে যাবে—ব্রিজের দিকে। অভিজ্ঞতায় এরা একট: বিষয় জেনে গেছে—'স্পার'গুলোর ধাক্কায় স্রোতে এ দিকেই সব ছুটে আসে বলে, স্রোতে ভেসে গেলেও এই চরেব এদিকে কোথাও ঠেকে যাবে। কিন্তু সেটা কতক্ষণ ? যতক্ষণ, এই খালটা চওড়ায় মাত্র ততটুকুই থাকবে, যাতে, 'স্পার'-এর ধাক্কায় স্রোত উল্টে এই পারের কাছাকাছি পর্যন্ত আসতে পারে। কিন্তু এই খালটা ত বন্যার জল ঢোকামাত্র এমন চওডা হয়ে যাবে যে, এই এখন যেখানে নিতাইরা দাঁড়িয়ে আছে, সে-সব প্রথম ধাক্কাতেই.ডুবে জল উঠে যাবে, ঐ খানখেতের কাছে। তাতেই ত স্রোতের উল্টো ধাক্কা জলের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে যাবে। তখন সবটাই ত তিস্তা। তখন জলের একটাই স্রোত, একটাই টান। সেই স্রোতেব মধ্যে কেউ পড়লে, সেই টান থেকে সে নিজেকে বাঁচাতে পারবে না।

নিতাই, রাবণ, গজেন আব অমূল্য পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নদীটাকে মাপে, একটু কোনাকুনি। এখন গরুগুলোকে এখানে ছেড়ে দিলে কানচি মেরে ওপারে গিয়ে উঠতে পারে। কিন্তু, এখন এই আবছা আলোতে ওদেব এই সব হিশেবনিকেশে কোনো ভুল হচ্ছে না ত ?

'কয়ডা বাজে রে অমূল্যা', নিতাই আপন মনে জিজ্ঞাসা করে।

'খাইছে, ঘড়ি দেখি নাই', অমূল্য বলে।

নিতাই আকাশেব দিকে তাকায। এখানে আকাশ যেন একটু উঁচু, সেই কুযাশাব ভার যেন একটু কম। বৃষ্টি কমে থাকতেও পাবে, কিন্তু এখানে বাতাস ত আসছে অনেকটা বাধা পেয়ে-পেয়ে। যে-জোর বাতাসের বাকি থাকে, সে-জোর নিয়ে ওপারের বাঁধেব ওপর হামলে পড়ছে। ফলে, মনে হয় বাতাসটা যেন এদের মাথার ওপর দিয়ে যাচ্ছে।

সামনের বাঁধের ওপর দিয়ে ওদিকে রায়পুর-রংধামালির আকাশেব দিকে তাকালে উজ্জ্বল লাগে একটু, ওখানে ইলেকট্রিক লাইট আছে।

নিতাই কয়েক পা এগিয়ে বলে, 'গজেন, নাববি নি ?' নিতাই জলে পা দেয, তার পায়ে স্রোতের টান লাগে, একটু গরম জল, 'বানার জল ঢোকে নাই এ্যাহনও, জল গরম।'

নিতাইয়ের পেছন-পেছন ওরা একটু এগিয়ে আসে, 'টান কী রকম ?' অমূল্যও জলে পা ছোঁয়াতে-ছোঁয়াতে জিজ্ঞেসা কবে।

নিতাই হাঁটু জলে নেমে গিয়ে বলে, 'সকালে ও ত এ্যামনিই ছিল,' জলের ওপর নিচু হয়ে নিতাই পায়ের বালি পরিষ্কার করতে শুরু করে। জলের ভেতরে তাকে কনুই ছাড়িয়ে ডোবাতে হয়। মুখটা প্রায় জলের ওপর নেমে আসে। জলের গন্ধ পায়। নিতাই গন্ধ শোঁকার জন্যে নাক নামায় নি। কিন্তু নাকে জলের গন্ধটা ঠেকলে তার নিজেরই মনে আসে—এটা বন্যার জলের গন্ধ না, রোজকার জলের গন্ধ। এই জায়গার জলটা পার হতে নৌকো লাগে ঠিকই, কিন্তু একদিকে বাঁধ, আর-এক দিকে চরের মাঝখানে এই জলটায় কেমন মানুষের গায়ের গন্ধ লেগে থাকে, জলের ভেতরে মানুষের কাজের গন্ধ। এখন এই রাত্রিতে সে গন্ধ অনেকটা পাতলা, কারণ নিতাইয়ের মাথার ওপর দিয়ে সেই ঝঞ্ঝা বয়ে যাচ্ছে ওপারের দিকে ; কারণ, গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে এই খালের মত তিস্তার সোঁতার জলও কিছুটা বেড়েছে ; ফলে, গন্ধটা তরল হয়েছে। কিন্তু তবু নিতাই গন্ধ পায়, অনিবার্যভাবেই পায়। রাত এখন বন্যার দিকে অনেকটাই এগিয়ে গেছে। আর, ঘণ্টাখানেক থেকে ঘণ্টা দুইয়েকের মধ্যে পাহাড় থেকে নামা বন্যায় এই খালটা একেবারে রামকান্তর জোত পর্যন্ত উঠে যাবে। কিন্তু রামাকান্তর জোত পর্যন্ত কেন ? এই চরটা পুরোই জলের তলায় চলে যেতে পারে। পুরোটা ? এই পুরোটা চর ?

নদীর ভেতর থেকে নিতাই এই চরের দিকে মুখ করে তাকায়। ডাইনে মুখ ঘোরায়—দক্ষিণের বাঁক

পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। বাঁয়ে মুখ ঘোরায়—বেশি দূর দেখা যায় না, এই দিকটাতে মাটি জলের মধ্যে অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। নিতাই ঐ খালেব বাঁকটার দিকে তাকায়, বেশ বড় বাঁক নিয়ে ঘুরে গেছে। ঐখানটাতে আলো আর একটু পবিষ্কাব মনে হয়। নিতাই এক আঁজলা জল তুলে ঠোঁটেব কাছে ধরে। তারপর ভেজা হাত সাবা মুখে বোলাতে গিয়ে বলে, 'হে-এ, বালি এককাবে কিচকিচ করত্যাছে—'

নিতাই মাথাতেও হাত দেয়, 'হে, বালি কিচকিচায়।'

জলের ভেতর থেকে নিতাই ডাকে, 'গজেন।'

'ক কেনে।'

'নামবি ? জলে ?'

'তুই ত নামিই আছিস।'

'আমি ত এইখানে খাড়য়্যা আছি, অমূল্যা, গরুগুলাকে আইনতে কইছিস ?'

'এতক্ষণ রওনা দিয়্যা সারছে।'

'ত দ্যাখ, কোথা দিয়্যা পাব করবি ? দ্যাখ্‌'। একটু বিবতি দিয়ে নিতাই বলে, 'এ্যাহনও পুরানা নদীই আছে—'

'হয় ?'

গজেন জিজ্ঞাসা কবে।

'হয। এ্যাহনও পুবানা নদীই—' খানিকটা জল তুলে বুকেপেটে লাগায় নিতাই, যেন বালি পবিষ্কাব করছে।

'নতুন জল ঢুকে নাই ?' অমূল্য জিজ্ঞাসা কবে।

'দেখি বুঝিবার পাব না ? শুধাবার ধরছেন ?' বাবণ এমন ভাবে পায়েব ওপর বসে পড়ে যেন বন্যার স্রোতের ধাক্কায় এখনি একটা গাছ উপড়ে আকাশটা খালি কবে দিল। বাবণ নদীব দিকে তাকিয়ে দেখে আবো, আবো বুঝে যায়।

নিতাই হাঁটু জলে ছিল, একটু উঠে আসে। পেছনে বাঁ হাত দিয়ে কাছাটা খুলে খুব সাবধানে দুই পায়েব ভেতর দিয়ে সামনে গলিযে ডান হাতে ধবে। তাবপবে আবাব বাঁ হাতে তুলে কাঁধের ওপর বাখে। তার পর দুই হাত দিয়ে ধুতিটাব পাঁজা খুলতে থাকে। খোলাব পব প্রথমে দুই হাতে দুদিক থেকে গুটিযে নিয়ে, ডান কাঁধে বেখে, হাত নামিযে কোমবেব গিঁট খুলে দেয়। দুই হাতে কাপড়টাকে মাথার ওপর দিয়ে তুলে পোঁটলা পাকায়। পোঁটলাটা দুই হাতে বুকের কাছে ধরে। একটু পরেই বোঝা গেল নিতাই হিশেব কষছিল—ওখান থেকে কাপড়টা ছুঁড়ে দিলে পাড়ে পৌঁছবে নাকি বাতাসেব ধাক্কায় জলে পড়ে যাবে। নিতাই বুকের কাছে তাব কাপডটা ধরে ঐ কয়েক পা হেঁটে এসে ভেজা বালুচরে ধুতিটা ফেলে দেয়। মাটিতে পড়ার আগে ধুতিটা একটু খুলে যায়। পাড়ে এলিয়ে পড়ে থাকে।

ততক্ষণে নিতাই পেছন ফিবে জলেব ভেতবে হেঁটে যাচ্ছে।

সামনেই ওপাবে বাঁধের পটভূমি ছিল বলে, নাকি, এখানে জলকুয়াশা নেই বলে, নাকি, আলো একটু হালকা বলে—জলেব ভেতবে হেঁটে-হেঁটে আবো ভেতরে নিতাই যখন চলে যায়, তখন, নদীর মধ্যে—ঠিক নদীর মধ্যে নয়, নদী আর আকাশেব মধ্যবর্তী আকাশ জুড়ে—তার শরীরের পরিণাহরেখা ক্ষোদিত হয়ে ওঠে ছায়াময়—তার মাথার ওপরে বাবরির সামান্য ঢেউ আর কাঁধের দুপাশে সেই বাবরির ফুলে ওঠা ; তার ঘাড় বাবরিতে ঢাকা ; সেই ঢাকা ঘাড়ের দুপাশ দিয়ে কাঁধের তরঙ্গিত বয়ে যাওয়া, বাহুর গোল, বাহু থেকে কনুই পর্যন্ত ঢেউ, কনুইয়ের চওড়া ক্রমে সরু হয়ে আঙুলের বিচ্ছিন্নতায় জলের ওপর দোলে। নিতাই হেঁটে যায়। আর এই চলন্ত রেখা নীচ থেকে জলে ডুবে যায়।

নিতাই হেঁটে-হেঁটে জলের ভেতর থেকে ভেতরে চলে যায়।

এখন হেঁটে যাওয়ার একটি উপলক্ষ ত নিতাই-এর আছেই। গরুগুলো রওনা দিয়েছে। বন্যা আসার আগে সেগুলোকে ওপারে পৌঁছে দিতে পারলে অনেকটা নিশ্চিন্ত। এখনো এখানে পুরনো নদী, পুরনো জল। গরুগুলোকে চেনা পথে ওপারে নিয়ে যাওয়া যাবে। কিন্তু পথটা আগে ঠিক করা ভাল। গজেনকে তাই জলে নামতে বলছিল নিতাই। জলে নেমে নিতাইও যেন সেই পথটাই পাকাপাকি ঠিক করছে।

নিতাইয়ের এখন গলাটুকু জেগে আছে, গলা মানে বাবরিটুকু। পাড থেকে মনে হচ্ছে, প্রায়

মাঝখানে। কিন্তু অভিজ্ঞতায় জানা আছে, এটা ঠিক মাঝখান নয়, মাঝখান আরো একটু দূরে। কিন্তু, এতদূর পর্যন্তও যদি হেঁটে যেতে পারে, নিতাই, তা হলে গরুগুলোকে সহজেই পার করে দেয়া যাবে, এখনো।

অমূল্য জিজ্ঞাসা করে, 'হে রাবণ কাহা, শুইনবার পান ? গরুগুলা বাহির হইছে— ?'

রাবণ মাটির ওপর তার প্রায়নগ্ন শরীর নিয়ে বসে ছিল নদীর দিকে মুখ করে। তার বাঁ হাঁটু মাটিতে শোয়ানো, ডান হাঁটু খাড়া। দুই হাতে সেই হাঁটুটা জড়িয়ে থাকে বারণ, মুখটা পায়ের মাঝামাঝি। যেন ওটা তার নিজের হাঁটু নয়, কোনো গাছটাছ। সে নদীর দিকে মুখ করে বসে ছিল বটে কিন্তু তার ঘাড়ের ভেতর মাথাটা এমনই সেঁদানো আর তার বাহুর গোড়ার হাড় দুটো লম্বা হয়ে তার কান পর্যন্ত এমনই উঠেছে যে বোঝা যায় না সে নিতাইয়ের দিকে তাকিয়ে, নাকি নিতাইকে ছাড়িয়ে বাঁধের দিকে, নাকি সামনে, একটু দূরের, মাটির দিকে।

'হয়। বাহির হছে মনত খায়', রাবণ আস্তে বলে।

বাতাস পুব থেকে পশ্চিমে আসছে। রাবণ এখন এই রাত-পেরনো নদীর তীরে মাটিতে এমন স্থির বসে যে, সে হয়ত বাতাসের নিহিত আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। শুনতে পাচ্ছে—তিস্তার ভূখণ্ড বদলানো যে-বন্যা পাহাড় থেকে নামছে এই চর, ও এই রকম আরো অনেক চর, বা, গ্রাম, বন, ভাসিয়ে নতুন রকমে ভূখণ্ডটাকে সাজাতে, সেটা পৌঁছবার আগেই চরের প্রথম উদ্বাস্তুর পাল অনভ্যস্ত সময়ে চার পায়ে পথে নেমে প্রায় অন্ধের মত এই নদীতীরে ছুটে আসছে। এ-রাস্তায় তারা রাতে আসতে অভ্যস্ত নয়। তাদের অভ্যস্ত পথে তারা আর-কোনোদিন এই চরে ফিরে ন্যা-আসতেও পারে।

নিতাই তার ডুবজলে পৌঁছে ভেসে ওঠে। দেখা যায়, সে তার বাবরি চুল ঘাড়ের এক-এক দোলায় ঝাপটাচ্ছে। ভেজা বাবরি তার মাথার ওপরে ঝলসে উঠছে।

'জল নতুন ঢুকিবার ধইরছে ?' ঐঠে পাস ?' রাবণ তার ভঙ্গি না বদলে বলে। নিতাইকে বলে। নিতাইয়ের যেন একটা ছুতো দেওয়ার দরকার হয—কেন সে এতটা দূরে, এতটা জলে, এতটা তৃপ্তি পাচ্ছে। ওখান থেকেই সে বলে, 'সারা মাথা-গা বালি কিচকিচাছে—'

গরুর পালকে কোথা দিয়ে ওপারে তুলবে সেই পথনির্ণয়, নিতাইয়ের এই জলমগ্নতার কারণ হিশেবে যথেষ্ট ছিল না।

এই 'লেগুন'-এর মত খালটুকু তিস্তারই অন্য কোনো বন্যায় তৈরি হয়েছিল।

তিস্তার মূলস্রোতের মাঝখানে বিচ্ছিন্ন সামান্য বালুচর, তার পাশ দিয়ে জলের ছোট রেখা কখনো-কখনো বহমান থাকে। এই খালের মত তিস্তাটুকু পেরিয়েই এই চরের জীবনযাত্রাকে শহরের, বাজারের, পঞ্চায়েতের, ভোটের, সরকারের জীবনযাত্রার সঙ্গে গ্রথিত থাকতে হয়। সেই সামান্য বালুচব আর-কিছুক্ষণের মধ্যে হাজার-হাজার কিউসেক জলের আঘাতে কোথায় উবে যাবে, হয়ত, এই খালটুকু, 'লেগুন'-এর মত খালটুকু, খালের মত তিস্তাটুকু সেই প্রবল মুহূর্তে এই প্রতিদিনের ইতিহাস থেকে উপকথায় চলে যাবে, এই চর, এই মানুষজন, এই গাইবলদ, এই আবাদ, বালুচরে বসে থাকা ঐ বৃদ্ধ—যে তার শরীর দিয়েই শুধু জানে আর বোঝে, শরীরের বাইরে যার আর-কোথাও মন নেই—এই সব সহ, সব সহ।

'পুরানা, পুরানা, এইঠে সব পুরানা', মাঝনদী থেকে নিতাইয়ের গলা ভেসে আসে রাবণের কতক্ষণ আগে করা প্রশ্নের জবাবে। সে তখন স্রোতের টানে গা ভাসিয়ে দক্ষিণে যাচ্ছে। খানিকটা গিয়েই নিতাই একট সরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে—'আরে, রে, রে, অতগুলা মশাল জ্বালাইয়া মিস্তিরি পাড়ার দক্ষিণ পাকে'··· বলতে-বলতে থেমে যায় নিতাই। সে চিনতে পেরে যায়, এই খালের তিস্তার ভেতর থেকে ঐ দক্ষিণ পাড়া দেখা যাচ্ছে, ঐ তিস্তা ব্রিজ দেখা যাচ্ছে—লাইট জ্বলে আছে, ঐখানে নরেশ আর নকু বাতাসের মধ্যে, জলকুয়াশার মধ্যে পাহারা দিচ্ছে তিস্তা ব্রিজের দিকে তাকিয়ে। নিতাই চেঁচায়, 'অশ্বিনী রায়ের জমিতে পাকা ভাদই কাইটতে নামছে···'

এই চর জুড়ে তিস্তার বন্যার ছোঁয়া লেগে গেছে, এখন বন্যাটা আসাটুকুই বাকি। খেতের দাঁড়ানো পাকা ধান যতটুকু পারা যায় কেটে নেয়া।

নিতাই সেই জলের ভেতর থেকে দেখে—এই চরটার ওপর দিয়ে তিস্তা বয়ে যাচ্ছে। নিতাই সেই জলের ভেতর থেকে দেখে—আর-কোনো একটা নতুন চর তাকে খুঁজতে হচ্ছে। নিতাই সেই জলের

ভেতর থেকে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে—একটু ভেসে গেলেই ওপারে রংধামালি-রায়পুরের বাঁধে উঠে সে বসে-বসে আর-কিছুক্ষণের মধ্যে এই চব ডোবানো, এই খালেব মত তিস্তা ভাসানো, নতুন জলের ফ্লাড দেখতে পাবে।

নিতাই সেই মশালেব আলো থেকে চোখ শেষবাবেব মত সবিযে নিযে উত্তব দিকে সাঁতাব কাটে, এই খালের স্রোতটুকুর বিপরীতে, পাহাড়ের ফ্লাড ঐ দিক দিয়েই ত আসবে। এখনো এই পুরনো জলে, এই প্রতিদিনের জলে, এই জীবনযাত্রার জলের ভেতব দিয়ে সাঁতবাতে-সাঁতবাতে নিতাই হাঁক দেয, 'গজেন, অমূল্যা, আয, ফ্লাড দেইখ্যা আসি, কতদূব আইসল, আয· '

এতক্ষণে নিতাই সম্পূর্ণ উপলক্ষহীন হয়ে আত্মসমর্পণ কবতে পাবে—এই চবেব আসন্ন সম্ভাব্য ধ্বংসেব মুখে সে চরেব সঙ্গে এক আসঙ্গে লিপ্ত হয়ে যেতে চায।

সে এই চব আর জল জন্মসূত্রে পায় নি। প্রবাসী বলেই বোধহয এ জলেব টান এত বেশি, এত গাঢ। এই জল ধ্বংস হওযার আগে নিতাই বোঝে এই জল তাব শবীবেবই অংশ। এই শবীবে ও এই জলে তখন শেষ স্মৃতি ছিল—বন্যাব আগের শেষ স্মৃতি।

গজেন আব অমূল্য দৌড়ে এসে ঝাঁপিযে পড়ে—তাদেব নেংটি আব ধুতি পাড়ে খুলে বেখে—সাঁতাব কেটে কোনাকুনি নিতাইযের দিকে চলে স্রোতেব উজানে এগিযে, বন্যাঢোকাব সম্ভাব্য মুখে। এখানে জলকুযাশা ছিল না, আকাশেব আলো একটু হালকা ছিল, ওবা জলেব মধ্যে মাছেব মত বয়ে চলে এই পুবনো জলে, প্রতিদিনেব জলে, জীবনযাত্রাব জলে।

পাড়ে অনড বাবণ শুনতে পায, বংশানুক্রমে পাওযা তাব এই নদী বেয়ে যে-বান ধাবাবাহিক এসেই যাচ্ছে, সেই এখনো অনুপস্থিত বন্যাব সামনে, চবেব মাটি ছেড়ে প্রথম উদ্বাস্তুব পাল, শেষ বাত্রিকে বা প্রথম সকালকে 'হাম্বা' ববে চকিত কবে ছুটে আসছে।

আটানব্বই

অকাল গোষ্ঠ

বাঁধেব ওপব গরু তোলা মানেই বন্যা স্বীকার কবে নেওয়া। গোয়াল থেকে গরু বেব করে সারাটা চর পেবিয়ে সোঁতাটা কিছু হেঁটে, কিছু সাঁতবিয়ে, বাঁধেব ঢাল বেয়ে ওপবে উঠে পড়া মানেই ঘর ভাসল। মুখে যতই বলা যাক না কেন যে গরুগুলোকে আগে তুলে দিলে ত আব ক্ষতি [illegible], বন্যা যদি নাই আসে বা নেহাৎ ছোটখাট বন্যা যদি আসে, তা হলে নামিয়ে আনলেই হবে—গরুকে একবাব ঘর ছাড়া করলে সে ঘরে আর টেকা যায না। এমনি গরু আশেপাশে চবছে, বা, পাল করে গরুগুলোকে মাঠে নিয়ে যাওয়া হয়েছে—সে এক কথা। সে ত জানাই আছে—কখন সে গরু ফিববে। বাড়ির সবচেয়ে ছোট ছেলে যদি সারা সকাল এবাড়ি ওবাড়ি ঘুরে বেড়ায তা হলেও যেমন বাড়ি ভবাই থাকে। কিন্তু গোয়াল শূন্য করে, গরুর পালকে পাড়া ছাড়িয়ে, চব ছাড়িযে, নদী ছাড়িযে একেবাবে বাঁধেব মাথায় তুলে দেয়া—আর তাবপব সেই ঘববাড়িতেই থাকা—এ অসম্ভব। গোয়ালঘরের দড়িটা, গোয়ালঘরে গরুর মুখ থেকে খসে পড়া পোয়াল আর ঘাস গরুব চোনা আব গোববেব গন্ধে বাড়িতে আব তিষ্ঠনো যায় না, কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। যেন সাবা পাড়াতেই কোনো শোক নেমেছে, বা, একটা কোনো বাড়ির শোকই সারা পাড়ায় ছড়িয়ে পড়েছে।

হিশেব অনুযায়ী পাহাড়ের বন্যা এখানে আব দু-এক ঘণ্টার মধ্যেই এসে যাচ্ছে যখন, তখন গরুর পালের সঙ্গে গরুগুলোকে তাড়াতে-তাড়াতে বাড়িব ও পাড়ার বাচ্চাকাচ্চারাও ছুটতে থাকে। রাতশেষের বানাবাতাসে আর বৃষ্টির ছাঁটে বিদ্ধ এ চরে গরুর পালের সেই সমবেত হাম্বারব যেন চরের ভেতর থেকে জেগে ওঠে। মানুষের স্বরের সঙ্গে মেশানো হাম্বা ডাকে কেমন এক স্বস্তি থাকে। কিন্তু মানুষের স্ববেব সমর্থনহীন এই রাত শেষ-করা হাম্বায় মানুষের বসত উৎখাত হয়ে যায়। নদীর পথে ধীরে-ধীরে স্পষ্ট হয় পাল বেঁধে গরুরা ছুটে আসছে। অথবা হয়ত স্পষ্টও হয় না—ঐ জলকুয়াশা সরে-সরে যায় আর সেই অবকাশ জুড়ে জেগে ওঠে ধাবমান গোষ্ঠের চলৎমূর্তি। যখন গ্রাম থেকে আরো দূরে যায়, তখন দেখা

যায় সেই পালের ভেতব গরুর গায়ে গা লাগিযে পেছনে-পেছনে, ভেতবে-ভেতরে গাঁয়ের বাচ্চারাও ছুটে আসছে। তাদের এক-এক হাত তোলা। কোনো কোনো হাতে কঞ্চি বা লাঠি আছে। কিন্তু সে কঞ্চি বা লাঠি কোনো গরুর পিঠে পড়ে না, গরুর পাল এতটাই সারি বেঁধে ছুটছে, ছুটছে অথচ সারি থেকে সরছে না।

গাঁয়ের এই বাস্তা এই গরুগুলোর চেনা, এই বাচ্চাগুলোবও চেনা। এই বাস্তা দিয়ে এতটা বড় পালে না হলেও, ছোটখাট পালে এই গরুগুলো ত প্রায় রোজই ঘরে ফেবে, যায়-আসে। কখনো-কখনো কোনো-কোনো গরু ত বাঁধা বাছুবেব হাম্বা শুনে ছোটেও বটে। এত বড় গাঁয়ে, এক-একটি এত বড় পাড়ায় কোনো-না-কোনো গরুব ত দুধেব বাছুর থাকেই—গরুদের ত আর পরিবার পরিকল্পনা হয়নি—দুধেব বাছুবেব ডাক শুনে কোনো-না-কোনো গরুকে ত ছুটতেও হয়। কিন্তু তাই বলে এমন ছোটা? তাও এই রাত শেষ হওযার আগেই ? মানুষেব গলার স্বরের গরমে কুয়াশা কেটে যাবারও আগে ? তাও আবাব এত তাড়াতাড়ির আঙুলে খোলা দড়ি ফেলে ? গলায় পিঠে মানুষের হাতের ছোঁয়া না নিয়েই ?

এই রাস্তা ত মানুষেব ও গরুব পায়ে-পায়ে এ-বকম পাল বেঁধে পালানোর জন্যে তৈরি হয়নি। তাই এত গরুর সঙ্গে ঐ গরুটার পেটের ধাক্কা লেগে যায। একটা গরু একটু সরে গেলে তার একটু পেছনের গরুটার কাঁধে ধাক্কা লাগে। সেটা একটু পেছিয়ে গেলে তাব পেছনের গরুর গলা এসে আগের গরুটার কোমরের হাড়েব ওপব ওঠে। একটু জোয়ান হযে ওঠা বাছুর এই সুযোগে একে ধাক্কা দিয়ে, ওকে সরিয়ে, আরো সামনে এগিয়ে যেতে চায় আব তার মা তাকে ধরবার জন্যে আর-একটু জোবে ছুটতে গিয়ে ধাক্কা খায়। যে-বাছুর এখনো বাঁট ছাড়ে নি সে এই সুযোগে পেছন থেকে মায়ের সারা রাত ধরে ভরে ওঠা বাঁটে মুখ ঢুকিযে টান দেয—সেই টানেব আবেশে মাযের গলা লম্বা আর পা চারটে শিথিল হতে না-হতেই পেছনের গরুটাব ধাক্কায বাছুবটা ছিটকে যায়। মার বাঁটে মুখ ঢোকানোর জন্যে ওব ঘাড়টা নোযানো ছিল আব নোযানো ঘাড়েব ভাবে সামনেব পা দুটোব কুঁচকিতে ভাঁজ পড়ে। সেই ভাঁজেব ঝোঁক সামলাতে পেছনেব পা দুটো ফাঁক হযে থাকে, হাঁটু দুটোতেও একটু ভাঁজ পড়ে। পেছনের গরুর ধাক্কা খেযে তাই সে বাছুবটা প্রথমে ডাইনে ছিটকে যায। ছিটকোতে-ছিটকোতে তাব সামনের পা দুটো ভেঙে যায়, সেটা হুমড়ি খেযে পড়ে, পড়ে কাত হয়ে যায। পেছনেব গরুগুলোব ধাক্কায তাব মা চলে যায, তাব মাব বোঁটা থেকে প্রথমে সরু ধাবায, তাবপব ফোঁটায়-ফোঁটায় দুধ মাটিতে পড়তে থাকে—অনেকক্ষণ। বাছুরেব পেছনেব গরুগুলো তাব ওপব এসে পড়ে না। তাকে পাশ দিতে বাঁয়ে সরে যায। ফলে, সবচেয়ে বাঁযেব গরুটা বাস্তা থেকে গড়িয়ে পড়তে গিযে মাথাটা নীচে নামিয়ে পেটটাকে রাস্তার ওপব এনে ফেলে। এর মধ্যেই পেছনের গরুটা তাব জাযগা নিযে নেয়। সে এবার মাথাটা তুলে গলাটাকে ভিড়েব মধ্যে ঢুকিযে দেয়, তারপর পেটটাকে। ততক্ষণে বাছুরটা সামনের দুই পায়ের ওপব ভর দিযে সোজা হযে পেছনেব পাযেব ওপব ভর দিয়ে দাঁড়ায়, দৌড়য়, 'হা-স্বা', গরুর পালেব ভেতব থেকে অনেকগুলো গভীর 'হাম্বা' ওঠে। কার বাছুরের সাড়া কে দেয় বোঝা যায় না। প্রফুল্ল পালের গাইটা বুড়ি হয়েছে, মোটা হয়েছে। সেটা জোরে ছুটতে পারে না। কিন্তু পালেব মাঝখানে তাকে জোরে ছুটতেই হয। তার অত বড় পেটটাব দোলনে সে নিজেই হাঁফিয়ে ওঠে। তার নাক দিয়ে ফেনা গড়ায়। দেড়া গজেনেব গাইটা দুদিন আগে বিইয়েছে। তার বাছুরটা ছুটতে পারে না। তাকে তুলে দেয়া হয়েছে জগদীশের মোষের পিঠে। বাছুবটাকে নিযে মোষটা বেশ তালে-তালে দুলে-দুলে ছোটে পালের মাঝখানে। তাব গাযেব ধাক্কায় অন্য গরুগুলো দু পাশে সরে যায়। কিন্তু বাছুরটা বারবারই পিঠের ওপর উঠে দাঁড়ানোর জন্যে সামনের পা দুটো কোলের ভেতর থেকে বের করতে চায় আর মোষের চলার দোলায় ও বেগে সঙ্গে-সঙ্গে তার ঘাড়টা নুয়ে পড়ে। সে আবার পা দুটোকে গুটিয়ে নিয়ে ঘাড়টা সোজা কবে। তার মা-গাই মোষটার পেছন-পেছন ছোটে। বাছুরটাকে বসিয়ে দেয়া হয়েছে পেছন দিকে মুখ করে। তার মা জিভ বের করে গলা তুলে বাছুরটাকে চাটতে চায়। কিন্তু মোষের অত উঁচু পিঠ পর্যন্ত তার জিভ যায় না। তার বাছুরচাটা এখনো শেষ হয়নি।

গাঁয়ের বসতসীমানা ছেড়ে পালটা এবার চাষের সীমানায় আসে। এও ঠিক রাস্তা নয়। একটি বড় আল, দুপাশে মোটা ঘাস, মাঝখানে কাল মাটি জলে পিছল। রাস্তা থেকে দুপাশের জমি কোথাও বেশ ঢালুতে, কোথাও তার থেকে সামান্য উঁচু। পিছলে গেলে ঐ মাঠেই পড়ে যেতে হবে। পালটার গতি

একটু কমে আসে। ছুটছে কিন্তু পদক্ষেপগুলো একটু ছোট হয়ে এসেছে যাতে পিছলে গেলে সামলানো যায়। আর হুড়োহুড়িটাও যেন কম। সঙ্গের ছেলেগুলো লাঠি বা কঞ্চি উঁচিয়ে দু পাশের খেতে নেমে গেছে। সেই ঢাল থেকে তারা কঞ্চি বা লাঠির ঘা মারছে রাস্তায়—'হে-ই হে-ই হে-ই' আওয়াজে—গরুর পা যেন পিছলে না যায়। গরুর পাল ছুটছে আর মাঠ দিয়ে ছেলেগুলোও ছুটছে। এখন আর দুপাশে গাছ বা বাড়িঘরের সারি নেই, যেন এতক্ষণ সেই সারি এই প্রায় ভোরে, এই শানশান বাতাসে, এই জলে খানিকটা আশ্রয় দিচ্ছিল। কিন্তু এই খেতিজমিও ত চেনাই। এই মাটি আর ঘাসপাতার ভেজাগন্ধও ত চেনাই। এই দু পাশের অবকাশ দিয়ে নদী ও নদীব বাঁক দেখাও ত এই পালেব অভ্যস্তই। কিন্তু তারও ত একটা সময় আছে। এখন রোদ নেই, এখন ঘাসে মুখ দেয়া নেই, এখন কালো মাটির ওপর পেট ঢেলে দিয়ে শোয়া নেই, এখন গলা তুলে ভেতবের ঘাস মুখে নিয়ে আসা নেই। এখন ছোটা, ছোটা।

নিরানব্বই

গরুর পালের পাড়ে ও জলে নামা

জলেব একটা গন্ধ আছে—গরুবা সে গন্ধ চেনে। কিন্তু এখন জলেব কোনো গন্ধ পাচ্ছিল না। বাতাস এলোমেলো ঝাপটে বইছিল, আর বাতাসেব সঙ্গে মিশে ছিল সুচের মত জল। ধীরে-ধীরে গরুগুলোর বাঁ দিকেব পিঠেব লোম ভিজে ওঠে—বাতাসের ঝাপটা ঐ দিক থেকেই আসছিল। তাদের গায়ের লোমগুলো বাতাসেব ঝাপসায় সবে-সরে যায় আব সেই ফাঁক দিয়ে জল একটু-একটু গড়ায়। তাদেব বাঁ মুখেব লম্বা পাশটাব লোমও সে-বকম ফাঁক হয়ে থাকে আর সেই ফাঁক দিয়ে জল গড়িয়ে গলার দিকে নামে। বাঁ দিক থেকে আসা বাতাস আব জলেব ঝাপটা থেকে মুখটা বাঁচাতে পুবো পালটাই একটু ডান দিকে মুখটা ফিবিয়ে বাখতে চাইছিল। তাদেব পা সোজা যাচ্ছে, তাদেব শবীব সোজা আছে কিন্তু তাদের মুখগুলো একটু ডাইনে ফিবতে চাইছে। তাতে তাদেব গতি এই খেতবাড়িতে আবো একটু কমে আসে। আর তাদের নাক থেকে জলের গন্ধ ক্রমেই হারায়। যতই তারা নদীর কাছাকাছি হয়, যতই তাদের বাঁ চোখ, মুখ ও নাকেব বাঁ পাশ জলে ভিজে ওঠে, ততই তারা জলেব গন্ধ থেকে দূরে সরে—যেন তারা জলের বিপবীতে ছুটছে।

খেতবাড়ি শেষ হয়ে যায়—পালের ক্ষুব পড়ে নদীর পাড়েব বালিতে। এখন আর পড়ে যাওয়াব ভয় নেই, এখন আর পিছলে যাবাব ভয় নেই—বালুবাড়িতে পা দিতে না-দিতেই পালটা যেন ছড়িয়ে পড়তে চায়। পুরোটা পালেব ভেতর যে-একটা উদ্বেগ কাজ করছিল, বালুবাড়িতে পেঁছে সে উদ্বেগটা যেন আচমকা ও অতর্কিত শেষ হয়ে যায়, যেন তাদের এই বালুবাড়িতেই পৌঁছনোব কথাছিল। বালির ওপর দিয়ে হাঁটা যায় না, পায়ের ফাঁকে বালি ঢুকে যায়। সেই কারণে যে পালের গতি কমে আসে তাই নয়, বালিতে হাঁটার জন্যে পালটা ছড়িয়ে যেতে চায়, গরুগুলো যে যার মত হাঁটতে চায়। কিন্তু সেই বাচ্চাগুলি এখন তাদের কঞ্চি আর লাঠি উঁচিয়ে সামনে এসে গেছে। দুদিক থেকে লাঠি আর কঞ্চি গরুর পালের ওপর নেমে আসতেই গরুগুলো দাঁড়িয়ে পড়ে মুখ সরিয়ে নেয় আর পায়ে-পায়ে আবার পুরনো লাইনে ফিরে আসে। সেই ছেলেরা আর এগয় না, ঐ জায়গায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে গরুগুলোকে লাইনে বাখে। তারপর বালির ওপর ধীব পায়ে পালটা যখন নদীর দিকে একটু টলতে-টলতেই এগয় তখন সেই ছেলেরা আরো পেছিয়ে গিয়ে চেঁচায় 'হেট' 'হেট'। পালটা এখন এই বালুবাড়িতে যেন একটা লাইনের মত দাঁড়িয়ে গেছে। দুপাশে নদীর খাত দিয়ে সারা রাতের বাতাস দক্ষিণ থেকে পুব থেকে উত্তরে আর পশ্চিমে শান-শান-করে ওড়ে আর সেই নদীখাতের অবকাশেই এই গরুরা যেন একটা সাঁকো বা বাঁধ। নিতাই, গজেন, আর অমূল্য পাড়ের কাছের জলে ছিল। রাবণ সেই পাড়েই বসে ছিল। গরুর পাল দেখে জল থেকে উঠে নিতাই, গজেন, অমূল্য ছুটতে শুরু করে। জল ছেড়ে উঠেই ওরা পাড়ে ফেলে রাখা ধুতি-নেংটি এক পাক দিয়ে পরে নেয়। একে বালি, তায় ভেজা, বাতাসের বিপরীতে ওরা এগতে পারে না। নিতাই কিছু একটা বলে চেঁচায়—সে চেঁচানি বাতাসে উল্টো দিকে উড়ে চলে যায়। নিতাই

একটু এগিয়ে ছিল অমূল্য তখনো জল থেকে যেন পুরো উঠতে পাবে না। হঠাৎ অমূল্য জল থেকে না উঠে, আবার জলের দিকে চলে যায়, তাবপর ডুব জলে পৌঁছে সাঁতার দেয়। নিতাই 'এ গজেন' বলে ডাক দিয়ে পেছন ফিবতেই দেখে অমূল্য আবাব জলে সাঁতাব কাটছে। নিতাই দাঁড়িয়ে পড়ে কোমরে হাত দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'এহন তব সাঁতাব দেওনেব টাইম ?' জলে ত তখনো বান ঢোকেনি। অমূল্য চিত হয়ে হাত মাথাব দিকে ছুঁড়ে দেখায় সে ওপাবে যাচ্ছে।

নিতাই বুঝে নেয়। ভালই ত কবছে অমূল্য। গরুব পালকে নদী পার করানোব সময ওপারে ত থাকতেই হবে কাউকে। কিন্তু একা অমূল্য কি পাববে। সে গজেনকে বলে, 'যা, তুইও যা ওপাব—দেইখা আয, কুনখান দিযা পাব করাই ?'

নিতাইয়েব কথায গজেন জলে ফেবে কিন্তু সে অমূল্যর দিকে যায় না। পাড়েব কিনারা ঘেঁষা জলে ছপছপ কবতে-কবতে সে এলোমেলো পাযে হাঁটতে থাকে। বালি দিয়ে হাঁটার সুবিধে অনেক। কিন্তু জলতল ত সমতল নয। গজেন খানিকটা ছপছপ কবে হেঁটে যাওয়াব পরই তার এক পা গর্তে পড়ে যায—সে কাত হয়ে জলেব মধ্যে পড়ে, তাবপব হাতেব ভরে আবাব সোজা হয়ে হাঁটে। এবার সে পাড় ছেড়ে দিয়ে আব-একটু গভীবে যায—সেখানে তাব হাঁটু জল। খানিকটা মাটি শক্ত পায গজেন—সে একটু আন্দাজেব চেষ্টা করে শক্ত মাটিব ঢালটা কোন দিকে। অন্তত হাঁটাব আরামটুকু পাক। কিন্তু সেই মাপ নিতে গিয়েই গজেন আবাব পড়ে, পড়ে গিয়ে সে আব ওঠে না—মাথাটা জলেব তলায নিয়ে যায়, অন্তত জলেব তলায ত আব ঐ বাতাস আব বৃষ্টিব সুচ নেই। ভস কবে মাথা তুলে গজেন একবার এপাব-ওপাব দেখেও বটে, চুল থেকে জল ঝেড়ে ফেলেও বটে। হাত দিয়ে মুখচোখের জল সরিয়ে গজেন দেখে অমূল্য ওপাবে উঠে হেঁটে-হেঁটে এদিকে আসছে। গরুগুলো যেখানে এখন দাঁড়িযে তার সোজাসুজি পশ্চিমের পাড়েব দিকে একটা জাযগা ঠিক করে গজেন আবাব জলে ডুব দেয।

ততক্ষণে বালুবাড়িতে গরুব পালটা এসে পড়েছে। আলগা দু-একটা গরু পেছনে আসছে। নিতাই সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচায—'হেই বালিশ-সালিশ—তোবা দুইডা দুই পাকে খাড়াবি আব ঐ বলরামেব ছোযাটাক কয্যা দে পাছত যাইতে, পাছত। ভয় পাস না। বানাব জল এখনো আসে নাই, কোনোটা এদিক-ওদিক হইলে হইব না, চিল্লাচিল্লি কবিস না।'

সেই গরুব পালেব মাঝখানে, সবচেযে উঁচুতে মোষেব কালো কুচকুচে পিঠেব ওপব বাদামি বাছুরটা আবার পাযেব ওপব উঠতে যায আব তাব ঘাড ভেঙে যায। মোষটা তাব গলা উঁচু কবে। শিঙ দুটো বাতাসকে বেঁকিয়ে দেয। সেই বাঁকানো শিঙ এতই বাঁকানো যে তলাব দিকটা ভিজে কাল হয়ে গেছে কিন্তু ছুঁচলো বাঁকটাব নীচে জল লাগতে পাবছে না, সেটা ধূসবই আছে। মোষটা যে-কারণেই হোক একটু অস্থির হয়ে ওঠে—হযত ও বুঝেছে তাব একটা বিশেষ দাযিত্ব আছে, হযত তাব মালিকেব কোনো হদিশ পাচ্ছে না বলে একটু অনিশ্চিত ঠেকছে তাব। সে তাব লেজেব ঝাপট মাবে। যাব বাছুব সেই গাইটা দাঁড়ানোব সুযোগে জিভটা বাড়িয়ে তুলে বাছুরটাকে চাটতে চাইছিল। দাঁড়িয়ে আছে বলে মনে হচ্ছিল, বুঝিবা পেরে যাবে। মোষের লেজটা তাব মুখে ঝাপটা মারে। বোধহয়, চোখেও লাগে। গাইটা চোখ কুঁচকে মুখটা নামিয়ে বাঁ দিকে ঘুবিয়ে নেয। পালটা এইটুকু মাত্র দাঁড়িয়ে আছে, তাব মধ্যেই মাঝখানে এক এঁড়ে সামনের গরুটার ওপর দুই পা তুলে দেয় আব গরুটা সামনে হুমড়ি খায় এক বাছুরের ওপর। এঁড়ে পড়ে যায়। কিন্তু বাছুরটা গিয়ে পড়ে আর-এক বাছুরের ওপর। সে বাছুরটা ভাবে, আগের বাছুবটা তাকে টিসচ্ছে। সেটা শিঙ নামিয়ে তেড়ে যায়। পালের ঐ জায়গাটাতে একটা ধাক্কাধাক্কি পড়ে যায়।

নিতাই হঠাৎ লাফিয়ে সালিশের হাত থেকে তাব লাঠিটা কেড়ে নিয়ে এঁড়েটাব দিকে ধেয়ে যায়। এঁড়েটা বুঝতে পেরেছিল। সেটা প্রথমে ডান দিকে মুখ ঘোরায, তারপর মুখ গলিয়ে একটু ফাঁক তৈরি করে উল্টো দিকে দৌড় দেয়। নিতাই ছিল পালেব বাঁয়ে, আর এঁড়ে দৌড়য় ডাইনে। ফলে নিতাই তার পেছনে ছুটতে পাবে না। সে লাঠিটা উঁচিযে চেঁচায—'বাদ দে, ওটাক নিবাব লাগিবে না, শালা, গরম খাইলেই হইল্! বানা নাই, ভাসা নাই, শালো বলদা!'

কিন্তু বালিতে এঁড়েটা দৌড়তে পারে না। ওদিক থেকে বালিশ দৌড়ে সেটাকে ধরে ফেলে।

নিতাই পালটার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ায়, নদীর দিকে পেছন করে—যেন একবার দেখতে চায় কোনো নতুন ব্যবস্থা নিতে হবে কিনা। সে একবার ডাইনে তাকায়—নদীর ওপরটা অনেক দূর পর্যন্ত পরিষ্কার

কিন্তু পারে এখনো আবছা অন্ধকার। নিতাই আকাশের দিকে তাকায়—আকাশ একেবারে মাটির বুকের ওপর নেমে এসেছে। পারেব ঐ অন্ধকার আর আজ যাবে না। কদিন পর যাবে—এখন তাও বলা মুশকিল। বন্যাটা যেন উত্তরে, নিতাইয়েব বাঁয়ের পাহাড থেকে নামছে না—সমস্তটা আকাশই বন্যা হয়ে যেন এই চরের পৃথিরীর ওপব এসে পড়েছে। একেবারে পিষে মেরে ফেলবে। নিতাই আবাব ডাইনে তাকায়, পুবে। তার লম্বা বাবরি চুলগুলো তার মাথা থেকে সমকোণে উডতে থাকে। সে বাঁ হাত দিয়ে চুলগুলোকে মুঠো করে ধবে কিন্তু ঘাড় ঘোরায না। তাব চোখে-মুখে জল আব বালির সুচ এসে বেঁধে--নিতাই ঘাড ঘোরায় না। ওদিক থেকে বান আসবে না, কিন্তু ওদিক থেকেই ত বাতাস আসছে, বৃষ্টি আসছে আর চরেব পৃথিবীটাকে ঢেকে ফেলে নীচে নামা এই যে-মেঘ তার ওপর দিয়ে, তার ভেতব দিয়ে-দিয়ে, আরো বহু মেঘ হু হু করে এদিকে ছুটে আসছে, ছুটে যাচ্ছে আবো উত্তবে। আরো বৃষ্টি হবে, আরো বন্যা আসবে। নিতাই সেই আগামী বৃষ্টি আর আগামী বন্যাব আন্দাজ কবতে, সামনের গরুর পালটা ভুলে গিয়ে শুধু তাব ঘাড়টা ডাইনে ঘোবায়, আকাশে তোলে, আবাব নামায। নিতাইয়েব ধুতিটা যেন তাকে পেঁচিয়ে পেঁচিযে চরে ফেলে দেবে এবকম ভাবে তাব গাযে সাঁটে আব খসে।

নিতাই গরুব পালটার ওপব দিযে একবাব চোখটাকে মেলে দেয—পালেব পেছনে, সেই খেতবাড়িব বাস্তায, আরো পেছনে গ্রামেব সেই বাস্তায। এত কাছে গ্রামেব সেই গাছগাছডা। অথচ এখান থেকে দেখাচ্ছে যেন ঐ আকাশটাই নেমে এসে গ্রামেব বেডা হয়ে গেছে।

নিতাইয়েব মনে হয সে এই গ্রামটাকে কি শেষবাবেব মত দেখছে ? ঐ যে-গ্রামটা এখন তার চোখেব আডালে চলে গেছে, বৃষ্টি আর বাতাসেব ধূসরতায যে-গ্রামটাকে সে দেখতেও পাচ্ছে না ভাল করে—সেই গ্রামটাব গাছগাছালি বাডিঘব জোতজমি সব, সব নদীব ঘোলা জলেব তলায চলে যাবে ? নাকি, সে চলে যাওযা শুরু হযেই গেল ? এখনো চব ডাঙাই আছে, এখনো এই নদীতে বানা ঢোকে নি কিন্তু আকাশ আর বাতাসের যা চেহারা তাতে ঐটুকুই মাত্র বাকি, বাকিটুকু ঘেবা হয়ে গেছে। নিতাইয়েব জীবনে প্রথম স্বাদ যে-নদীর তাব ধাত আলাদা, জল আলাদা। আব এ-নদী ত নিতাইযের পুবো বযসের নদী। জলের ভাষা নিতাই তাব জলেব তৈরি শবীব দিয়ে বোঝে।

নিতাই গরুব পালেব দিকে তাকায। পুবো পালটা যেন তাব জন্যে অপেক্ষা কবে আছে—সাবি দিয়ে দাঁডিয়ে। বন্যার ভয়ে গরুগুলোকে বাঁধে তুললেও অনেক বাব হযত বন্যা আসে নি কিন্তু গরু সবানো মানেই ঘব ভাঙা। এই গরুব পাল ওপারে উঠিযে দিযেই গ্রামেব মানুষগুলোকে বাঁধে তুলতে হবে। কিন্তু নিতাই কেন তুলবে ? সকলেই ত আকাশ দেখছে, বাতাস দেখছে। না। নিতাই কাউকে ডাকাব আগেই হযত দেখা যাবে গ্রামেব কিছু-কিছু লোক এখানে এসে জডো হযেছে। হোক। এমনিতেই হবে। নিজেব গরুব গন্ধ ছাডা আব-কতক্ষণ এই চবেব ঘবে বসে থাকতে পারবে ?

নিতাই দেখে গরুগুলো পা বদলাচ্ছে। না, আব দেবি কবা যায না। সে সামনেব গরুটির গলাব দডি ধবে নদীব দিকে এগুতে গিয়ে দাঁডিযে পডে। গরুটাকে ছেডে দেয। তাবপব চিৎকাব কবে বলে, 'হে-এ সালিশ, মইষটাক নিযা আয এইঠে।'

বালিশ-সালিশ দু জনেই পালেব ভেতরে ঢুকে, হাতেব লাঠি আর কঞ্চিটাকে ওপরে তুলে এ-গরুকে সবিযে, ও-গরুব পাশ দিযে মোষটাব কাছে পৌঁছে যায়। তাবপর বালিশ মোষের গলাব দডিগাছটা ধরে সেটাকে পাল থেকে বাইবে আনতে চায। মোষটা মুখ নাডিযে বালিশের হাতটা সরিয়ে দেয। বালিশ দাঁড়িয়ে মোষেব নাক ছোঁয মাত্র। সে হাতটা আবাব মাথাব ওপব তুলে আবাব মোষের গলাব দডি ধবে টেনে সরু গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'চল্, কেনে, চ-ল, আগত চল্।'

মোষটা এবার মাথা ঝাঁকিয়ে বালিশকে সরায না বটে কিন্তু মুখটা একটুও নডায না। বালিশ 'চল্ কেনে, চ—ল' বলতে-বলতে টানতে-টানতে দডি ধরে প্রায় ঝুলে পডে কিন্তু মোষের গলার মাংসপেশীতে দডিটা আরো বসে যায মাত্র। মোষটা ঘাড আব-একটু তুলে দেয—বালিশের নাগালের বাইবে। বালিশ দড়ি ছেডে দেয়। মোষটা তার লেজ ঝাপ্টায়।

সালিশ হঠাৎ একটা লাফ দিয়ে দডিটা ধবে ঝুলে পডে চেঁচায়, 'হে—এ বালিশ, পাছত খোঁচা মার কেনে, হে—ট, হে—ট, আগত-আগত।'

ঠিক সেই সময়ই নিতাই সামনে থেকে টাকরায় জিভ ঠেকিয়ে টর-র্-র্-র্ আওয়াজ তোলে বার দুয়েক আর চেঁচায—'হে-এ-এ-এ, আয় কেনে—এ-এ-এ।' বাতাসের ঝাপ্টায় সে-আওয়াজের অনেকটা

ভেসে চলে যায় বটে কিন্তু সেটুকু অন্তত পৌঁছে যায়, যাতে মোষটা বুঝতে পারে তাকে ডাকা হচ্ছে। সে ধীর পায়ে সালিশের টান অনুসরণ করে সারি থেকে বাইরে বেরতে ঘাড় ঘোরায়।

মোষটা খুব ধীর পায়ে চলে, তার পিঠেব ওপব বাছুবটা দাঁড়াতে গিযে আবাব পা মুড়িযে ফেলে আর মোষটার পেছন-পেছন গাইটাও বাছুরের দিকে গলা তুলে সারি থেকে বেরিয়ে আসে। সেই সারির পাশ দিয়ে তারা নিতাইয়ের কাছে এসে দাঁড়ায়। নিতাই মোষেব গলার দড়িটা ধরে তাদের বলে, 'যা, আস্তে-আস্তে পার হবি, হাল্লাগুল্লা করিস না।' নিতাই আর দাঁড়ায় না—মোষেব দড়িটা ধরে নদীর দিকে হাঁটে। এখনো বানার জল ঢোকে নি কিন্তু গত কযেক দিনের বৃষ্টির জলে ত এই চেনা নদীটাতেও অচেনা গন্ধ লেগে গেছে। জল ঠাণ্ডাও বটে। সারা বাত গোযালেব গবমে কাটিযে জলে পা দেযা মাত্র যদি গরু বা মোষ ভয় খেয়ে যায় তা হলে সারাটা পালই ছত্রখান হযে যাবে, এদিক-ওদিক দৌড়তে শুরু করবে, কোনো-কোনোটা জলে গিয়েও পড়তে পাবে। পেটে জল লাগলেই ভয পেযে যাবে—ভাবতে পারে তাকে কোথাও নিয়ে যাওযা হচ্ছে।

নিতাই জলে নেমে যায়, তার হাতটা মোষের দড়িতে, মোষটাও জলে নেমে কযেক পা এগিযেছে, হঠাৎ নিতাই গর্তে পড়ে যায়—পড়ে যাওয়ার আগে সে মোষের দড়ি ছেড়ে দেয—না হলে মোষটাও পড়ে যেত। নিতাই, 'ধুস শালা' বলে উঠে পেছিযে আবাব পাড়ে উঠে আসে। পাড় থেকে একটা লাঠি মত তুলে সে আবার তাড়াতাড়ি মোষটার কাছে চলে যায। মোষটাব পা যদি আচমকা গর্তে পড়ে, তা হলে ওর পিঠ থেকে বাছুরটাও পড়ে যেতে পারে একেবারে নদীর মধ্যে। এখন লাঠিটা দিযে গর্ত বুঝে-বুঝে নিতাই হাঁটে আর মোষটাকে টানে—নিতাইযেব বাঁ হাতে লাঠি, ডান হাত মোষেব গলাব দড়িতে।

মোষটা যেন বুঝেই যায় তাকে খুব আস্তে-আস্তে বুঝেশুনে পা ফেলতে হবে। নিতাই লাঠি ফেলে দেখে পা ফেলে এগবার পর সে পা ফেলে এগয়। সাঁতার জল পর্যন্ত গেলেই মোষটা ভেসে যেতে পারবে। একটু কি বেশি ঠাণ্ডা লাগছে জল, এখন? বানাব জল কি ভেতবে-ভেতবে ঢুকে গেছে। মোষটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে—'আঁ-আঁ-আঁ-আঁ' আওযাজ তোলে। মোষ জলে ভয পায না, ববং আবাম পায়। সে জন্যে মোষটাকে দিয়ে এই পাল পাব কবানোর সুবিধে অনেক। 'হে-এ ট-ব-ব-ব-ব' তালু দিয়ে আওয়াজ তোলে নিতাই। কিন্তু মোষটা নড়ে না। নিতাই পেছিয়ে গিযে মোষেব পিঠেব বাছুরটাকে দেখে—বেটা একটা পা পিঠ ছাড়িযে বাইরে বেব করে দিয়েছে, ফলে তার শবীবটাও গড়িযে এসেছে, তার ঠিক পেছনে সেই গাই। এটা পেছনে আছে বলেই গোলমাল হচ্ছে। নিতাই লাঠিটা দিযে গাইটাব মুখে মারে—'শালো, গা চাটিবার ধরিছেন?'

গাইটা ঘাড় নামিয়ে মুখটা সরিয়ে নেয়। নিতাই জলেব মধ্যেই উঁচু হযে দাঁড়িযে পা-টা সহ বাছুবটাকে ভেতরে ঠেলে দেয় আর সঙ্গে-সঙ্গে মোষটা চলতে শুরু কবে। শুরু কবে কিন্তু থেমে যায। নিতাই আবার সামনে গিয়ে বাঁ হাতে মোষের দড়ি ধবে। টাকবায় আওযাজ তোলে—'টর-ব-ব-ব-অ।' মোষটা আবার পা ফেলে।

কিন্তু লাঠিসহই নিতাই একেবারে হুড়মুড় করে পড়ে যায। পড়ে গিয়ে বোঝে ডুবজল। লাঠি ফেলে দিয়ে জলে হাতটা মারতেই সে স্রোতের টানে সরে যায়—'আইস্যা গেছে রে, বান ঢুইক্যা গিছে।' কিন্তু একটা ডুব দিয়েই নিতাই তার শরীরটাকে কব্জা করে ফেলে। সে চেঁচায না। ভয পেযে যাবে সবাই। এখন পালের অর্ধেকটাই জলে। এইবার মোষটা ডুবজলে নামবে। স্রোত ঢুকেছে কিন্তু জল এমন কিছু বাড়ে নি। নিতাই পা দিয়ে আন্দাজের চেষ্টা কবে, যেখান থেকে সে পড়ে গিযেছে সেই জাযগাটা কোথায়। পায় না। মোষটা দাঁড়িয়ে আছে একেবারে ডুবজলেব কিনাবায় হাঁটুজলে। নিতাই কী করে বোঝাবে, আর-এক পা পরেই ডুবজল, স্রোতের জল। যদি বোঝানো যেত তা হলে মোষটা সে ভাবেই নিজেকে ভাসিয়ে দিত। কিন্তু বোঝাবে কী কবে নিতাই? 'মহিষটা ত ভাবব্যার ধবছে আস্তে-আস্তে ভাসব্যার লাগবে।' গজেনকে ডাকবে? কিছু ঠিক করতে না পেরে আর স্রোতের ধাক্কায় সে যাতে সরে না যায় সে জন্যে, নিতাই হঠাৎ মোষটার বাঁ পাটা হাঁটুর নীচে চেপে ধরে, যেন ওটা একটা খুঁটি। মোষটা তাতে কিছু বোঝে। সে 'আঁ-আঁ-আঁ-আঁ' করে একটা ডাক ছেড়ে নিতাইয়ের হাতসহ বাঁ পাটা তোলে, ও, নিতাই বোঝে, ডুবজলের দিকে এগিয়ে দেয়। সেই পা তোলার ভঙ্গিতেই নিতাই বুঝে ফেলে মোষটা জেনে গেছে আর-এক পা পরেই ডুবজল। সে মোষের গলার তলা থেকে 'ট-র-র-র-অ' করে ডেকে

ওঠে। ডাকতে-ডাকতে নিতাই দেখে মাথাব ওপব নেমে আসা আকাশটাতে নিজেব মেঘেব মত গলাটা বাড়িয়ে দিয়ে মোষটা তার ডান পাটাও ওঠাল আর নিমেষে চওড়া কাঁধটাকে জলের ভেতবে আরো চওডা করে গলাটা তুলে ফেলল। সামনেব পাদুটোকে যে জলেব মধ্যেই একটু উঁচু করে জলে ভেসে উঠল, তাতেই তার পেছনেব পা দুটো লম্বা হয়ে গেল, পিঠেব উচ্চতা কমে গেল আব জলেব মধ্যে সেই পিঠেব ওপর বাদামি বাছুরটা ভাসতে-ভাসতে চলল, তাব একটুও ঝাঁকি লাগে না। নিতাই মোষটাব গলা জড়িযে ভেসে ওঠে, তাবপব তাব পাশে-পাশে সাঁতাব কাটে—জিভে আওযাজ তোলে—'টব-ব-র-র-অ।'

একশ

গরুর পালের পাড়ে ও বাঁধে ওঠা

মাঝখানেব এই গভীব খাতটুকু বেশি চওডা নয়। মোষটাব পাশে-পাশে সাঁতাব দিতে-দিতে নিতাই বোঝে, নিশ্চিতভাবেই তার আগেব বোঝাটা বোঝে—বানাব জল ঢুকে গেছে। সামনেব মোষটা এ-রকম ভেলাব মত ভেসে যাওযায পেছনের গরুগুলোও গা এলিয়ে ভেসে থাকে। কিন্তু, নিতাই যেমন তার শরীর দিয়ে বোঝে, এই এতগুলো পশু তাদেব এতগুলো শবীব দিয়ে নিশ্চযই তার মতই, বা তার চাইতেও বেশি কবে বুঝছে এতক্ষণ তাবা হাঁটু জল দিয়ে হেঁটে এসে এই যে-গভীব জলে পডল সেটাব বকম-সকম আলাদা। কিন্তু সেটা বুঝে উঠতে-উঠতেই মাঝখানেব সোঁতাটা শেষ হযে যায। মোষটা পাযে মাটি পায, মাটি পেযে দাঁড়িযে পড়ে, কিন্তু পাড়ে ওঠাব জন্যে পা তোলে না। নিতাই একটু এগিয়ে দাঁড়িযে পড়ে, দাঁড়িযে পা দিয়ে-দিয়ে অনুভব কবে এখানেও জলেব নীচে পাড ভেঙেছে। সে দাঁড়িয়ে দেখে, এই গরুব পালেব গায়ে লেগে সোঁতাব জলটা একটু আবর্তিত হচ্ছে আব ফেনা উঠছে। গরুগুলোর ফাঁক দিয়ে বাঁ থেকে ডাইনে জল বয়ে যাচ্ছে—একটু ফেনা তুলে।

নিতাই পায়ে-পায়ে পাড়ের আন্দাজ নিয়ে পালটা থেকে একটু উত্তরে সবে। সেখানে জাযগা পেযে যায। নিতাই সেখানে দাঁড়িয়েই ডাকে 'আয-আয', আব জিভে 'টব-ব-ব-ব' আওযাজ তোলে।

মোষটা প্রথমে তাকিয়ে দেখে—ঘাড় ঘুবিয়ে তাকিযে দেখে, তারপর আস্তে ডাইনে ঘোরে। তার পেছন-পেছন গরুগুলোও পা ফেলে। একটু ফাঁক হতেই একটা শব্দ তুলে স্রোতেব জল বেরিয়ে যায়—এতটা স্রোত এই সোঁতায কখনোই থাকে না। নিতাই জলেব বেবিয়ে যাওযা দেখে অনুমান কবে কতটা বেগে জল এখানে ঢুকছে। বানা এসে গেছে।

নিতাই একটু অন্যমনস্ক হযে যায়। মোষটা কাছে এসে দাঁড়াতে সেই অন্যমনস্কতা নিয়েই সে তার গলার দড়িয়ে হাত দিয়ে আবার স্রোতেব দিকে তাকায—পালের গরুগুলোর গায়ে কত জোরে স্রোতটা আছড়ে পড়ে, যেন সেটা আন্দাজ করতেই। মোষটা তাব মাথা ঝাঁকিয়ে নিতাইকে মনে পড়িয়ে দেয়—তাদের এখন পাড়ে ওঠার কথা। নিতাই তাড়াতাড়ি মোষটার আডাআড়ি দাঁড়ায়, দুহাত দিয়ে ওপরের বাছুরটাকে ধবে, চেঁচিয়ে ওঠে, 'হে এ গজেন, অমূল্যা, ধর, এইখানে আয।'

নবেশ নিচু স্ববে জানায, 'তুল্ না তুই, আছি।'

নরেশ কখন সেই দক্ষিণ পাড় থেকে এই এতটা রাস্তা পার হয়ে এসে এপারে উঠে গেছে? তা হলে তিস্তা ব্রিজেও কি বানের ধাক্কা লাগতে দেখে এসেছে নরেশ? নিতাই ভাবে বটে কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারে না।

মোষটা আস্তে করে তার সামনের বাঁ পা তোলে। একটু সময় নিয়ে সে ডান পাটাও পাড়ে তুলে দেয়। তারও পর একটু সময় নিয়ে, বা, বাছুরটাকে সামলাবার জন্যে নিতাইকে একটু সময় দিয়ে, অত বড় শরীরটাকে একটা ঝাঁকিতে পাড়ের ওপর তুলে, পেছনের পা দুটো দ্রুত টেনে বোল্ডার আর জলের মাঝখানের সঙ্কীর্ণ জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে পড়ে।

জলের সোঁতাটা, বা নদীর শাখাটা পেরবার চাইতেও নদীর পাড় থেকে বাঁধের ওপর ওঠাটা গরুর

পালের পক্ষে কঠিন। বাঁধের মাটি বৃষ্টিতে যাতে ক্ষয়ে না যায় আর বাঁধ আর নদীর মাঝখানের পাড়টুকু যাতে স্রোতে না ভাঙে সেজন্যে বোল্ডার দিয়ে পুরোটা বাঁধানো—সে বোল্ডার আবার তারেব জালে ঢাকা। পাড়ের বোল্ডার আর জলের সীমানাটুকুতে একফালি জমি। অনেক জাযগায় সে জমি ভেঙে গেছে, অনেক জায়গায় জলসহ বোল্ডাব একেবারে জলের মধ্যে ঝুলে পড়েছে। ঐ সঙ্কীর্ণ জাযগা দিয়ে গরুর পালটা চলতে পাববে না। আব বোল্ডারের ওপব পা দিয়ে গরুগুলো এমনিতেই উঠতে পারবে না—তাদের ক্ষুর বোল্ডারে পিছলে যাবে , তারের জালের জন্যে আবো পাববে না—তাবে পা আটকে যাবে।

গজেন আর নরেশ আগেই একটা ডাঙার কাছে দুটো সমতল বোল্ডাব পাশাপাশি দিয়ে সিঁড়িব মত করে রেখেছে। সেটা দিয়ে উঠে তারেব জালে আটকানো বোল্ডারগুলোব দুটো সাবি পেবতে পাবলেই একটা বোল্ডারহীন নালী পাওয়া যাবে। নালীটাব ওপবেব দিকে আবাব বোল্ডাব ও তাবেব জাল। একমাত্র এই পথটা দিয়েই গরুব পালটাকে তোলা যাবে। গজেন আব নরেশ মোষটাকে সেদিকেই নিয়ে যায়—গজেন মাটিতে মোষেব গলাব দড়িটা-ধবে, আব নবেশ বোল্ডাবেব ওপর দাঁড়িয়ে দেখে কোনো মোষটা আবার পাড ভেঙে পড়ে যায় কি না।

জায়গাটা এতই সরু যে এমনি দেখলে মনেই হত না ওখান দিয়ে কোনো গরুব পক্ষে যাওযা সম্ভব। কিন্তু গরুগুলো পা ফেলে ঘেঁষে-ঘেঁষে—তাতে তাদেব পায়ে-পায়ে একটু লেগেও যায বটে কিন্তু এতই আস্তে যাচ্ছে যে কোনো গরু হুমড়ি খায় না। তারা বোল্ডার ঘেঁষেই চলে—পেটটা বোল্ডাবে ঘষে যায়, এইমাত্র। নরেশ কোমর ভেঙে গরুগুলোর পিঠ ছুঁয়ে-ছুঁয়ে দেয।

জলের ভেতর থেকে নিতাই চিৎকার করে বলে, 'হে-এ নরেশ, একখান্ বোল্ডাব ফেলা এইখ্যানে, মাটি ভাইংগ্যা গিছে।' নরেশ দেখে, প্রফুল্ল পালের বুড়ি ও ধুমসো গরুটাকে নিতাই পাড়ে তোলাব চেষ্টা করছে—সে গরুটার সামনে, বালিশ আব সালিশ দুই পাশে আর বলবামেব ছেলেটা পেছনে। বাকি গরুগুলো জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে।

'আরে আরে—খাইছে রে খাইছে—ঐ বুড়িটাবে তুললি ত এই ফালি দিয়্যা এক পাও আগাইবাব পারব না, হে-হে-হে', বলতে-বলতে নরেশ বোল্ডার থেকে ফালিটুকুতে নামে আর নেমে চেঁচায—'এই ন্যাতাই, আরে বুড়িটাক পাশে রাখ, শ্যাষে তুলিস,' চেঁচাতে-চেঁচাতে নবেশ গরুগুলোব পিঠে হাত ছুঁইযেই যায়, ঘাড় নদীর দিকে ঘুরিয়ে রেখে।

নিতাই নরেশের কথাব কোনো জবাব দেয় না। বাচ্চা দুটোকে বলে—'সবায্যা নে, সবায্যা নে।' জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে বালিশ-সালিশ দু জনেই দু দিকে টানে। বুড়ি গরু বোধহয নির্দেশটা বুঝতে পারে—সে সালিশের দিকে দু পা এগিয়ে যায়। নিতাই বলরামের ছেলেটাকে বলে—'আ-ন, ওগুল্যাবে আ-ন্।' বলরামের ছেলে পেছনের গরুটাকে এগিয়ে দেয়। ঐটুকু বিরতিতে নিতাই দেখে, গরুগুলোব পায়ের চাপে পাড়টা এত ভেঙে ও ভিজে গেছে যে-কোনো গরু পড়ে যেতে পারে। সে বালিশকে বলে, 'আউগ্‌গা, আর এট্টু আউগ্‌গা।' সালিশ দড়ি ধরে টেনে দুই পা যেতে না-যেতেই ধপ করে গভীব জলে পড়ে যায়। বালিশ তীব্র শিশুকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে, 'অ কাহা, সালিশ পইড়্যা গিছে, আগাই কুথায় ?'

নিতাই 'খাড়া' বলে কিন্তু তাকিয়েও দেখে না, প্রফুল্ল পালের বুড়িটাও দাঁড়িয়ে যায। সালিশ উঠে আসে। নিতাই দু পা পরে এক জায়গায় নতুন করে গরুগুলোকে পাড়ে তুলতে গিয়ে দেখে পাড়েব গরুগুলো এগচ্ছে না, দাঁড়িয়ে আছে, এখন কোনো গরু তুললে সেটা দাঁড়ানোরও জায়গা পাবে না।

নিতাই তার বাবরি চুলের রাশি বাঁ থেকে ডাইনে ফেলে চিৎকার করে ওঠে, 'তুরা কি ঐখানে গাঁজা টাইনবার ধরছিস নাকি, এই নরেইশ্যা।'

নরেশ আধখানা ঘাড় ঘুরিয়ে বাঁ হাত তুলে নিতাইকে থামতে বলে। নরেশ ঘাড উঁচু করে দেখে পিঠের বাছুরটাকে নিয়ে মোষটা ঐ নালী বেয়ে উঠতে পারছে না। 'আরে, শালা গজেন, তুর মাথা না শালকাঠ ?' বলতে-বলতে নরেশ এক লাফে বোল্ডারের ওপর উঠে ঐ দিকে ছুটে যায, 'শালা, পেরেক ঢোকে না মাথায় ? বাছুরটাকে নামায়্যা থো বোল্ডারের উপর।'

নরেশের চিৎকার শুনে গজেন পেছন ফিরে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। নরেশ গিয়েই মাটিতে নেমে তাব লম্বা হাতে বাছুরটাকে টেনে মোষের পিঠের কিনারায়, আনে, গজেনকে বলে, 'ধর মাথাডা।'

'আরে, হাত দিয়্যা ঘ্যার পাই না যে—' গজেন বলে।

'আবে শালা বাইটকুল', নরেশ হেসে ফেলে, 'টান, বোল্ডাবের কাছে টান, টাইন্যা আন।'

গজেন মোষেব গলাব দড়ি ধরে টেনে বোল্ডাবের কাছে নিয়ে আসে। নরেশ আব গজেন বোল্ডারের ওপর উঠে পড়ে মোষেব পিঠ থেকে বাছুরটাকে এক টানে নামাতে গিয়ে বোঝে পিছলে যেতে পারে। পেছনে সেই মা-গাইটা হঠাৎ 'হা-ম্বা' ডেকে ওঠে। নরেশ মোষটাব পিঠে তার ডান পাটা দিয়ে দু বার চাপ দিয়ে যখন বোঝে মোষটাও বিপবীত চাপে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন 'ওয়ান টু থ্রি' বলে এক ঝাঁকিতে বাছুরটাকে বোল্ডাবের ওপর এনে আস্তে কবে নামায়। পেছন থেকে বাছুরটার মা-গাই হামলে পড়ে—এতক্ষণে সে বাছুবটাকে জিভেব আওতায় পেয়েছে। গজেন মোষেব দড়ি ধরে নালী বেয়ে বাঁধেব ওপরে উঠে যায়। নবেশ ছুটে যায় নিতাইয়ের দিকে।

এই নালীটা তৈবি হয়ে গেছে একটু অদ্ভুত কারণে। সাধাবণ ভাবে বাঁধেব ওপর থেকে কোনো জল স্রোতেব মত গড়িয়ে পড়া নিষেধ। যদি তেমন স্রোত কোথাও কোনো-কোনো কারণে তৈরি হয়ে যায়ও, তা হলে সেটা তখনই বন্ধ কবে দেয়াব কথা। নইলে বাঁধেব মাটি ক্ষয়ে যাবে, বাঁধের তলার মাটি আলগা হয়ে যাবে। কিন্তু এই নালীটা তেমন কোনো স্রোতেব ধাক্কায় তৈরি হয় নি—বরং বাঁধের গা এখানেও তাবেব জালে আঁটা বোল্ডার দিয়ে বাঁধানো।

নদীব স্রোত বন্যাব সময় যাতে সবাসবি বাঁধেব গায়ে ধাক্কা না মারে, সে জন্যে, বিশেষ-বিশেষ জায়গায় শালখুঁটিব লম্বা খাঁচা নদীব ভেতব পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে—যাকে বলে 'স্পার'। সেই স্পাবগুলোব ভেতবটাও বড-বড বোল্ডাব দিয়ে ভরা। জলস্রোত সেখানে ঘা খেয়ে ঘুরে যায়, ঘুরে যাওয়াব সময় কিছুটা বালি ও মাটি ফেলে বেখে যায়। তাতে পাডটা আর-একটু চওড়া হয়, নদী একটু দূবে সবে যায়। যখন নদীতে বন্যা আসে তখন এ-সব ব্যবস্থার সুফল বোঝা যায়—অনেকক্ষণ পর্যন্ত স্পারেব ধাক্কায় নদীস্রোত উল্টোদিকেব চবে, নিতাইদেব চবে গিয়ে ধাক্কা মাবে।

কিন্তু ৫৮ সালে বাঁধ তৈবিব পব ৬২-৬৩ সালে দেখা গেল—আর-সব জায়গা থেকে জল সরে গেলেও এই জাযগাটিতে একটা ছোট্ট খাঁড়িব মত থেকে যাচ্ছে। তাতে কাবো কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না—কাবণ জল সবে গেলে এ বকম একটা তিবিশ-পঁযতিবিশ হাত খাঁড়ি থাকলেই-বা কী আর না থাকলেই-বা কী। কিন্তু তাব পবেব বৎসব বন্যায এই খাঁড়িব ভেতব দিয়েই স্রোত গিয়ে বাঁধের গায়ে সবাসবি ঘা মাবল। সেবাব বৃষ্টি বেশি হয নি। সেই শীতকালেই বোল্ডার দিয়ে নদীর পাড়টাকে বাঁধিয়ে দেযা হল—যাতে খাঁড়িব ভেতব জল ঢুকতে না পাবে। খাঁড়িটা একটা জলহীন নালীর মত থেকেই গেল। ধীবে-ধীবে বুনো গাছগাছডায ভবে গেল। কিন্তু একেবারে বুজে গেল না।

এখন জগদীশের মোট তার পিঠেব বোঝা নামিয়ে সেই খাঁড়ি বা নালীর পাশ দিয়ে পা ফেলে-ফেলে উঠতে লাগল। গজেন মোষটার গলাব দড়ি ধরে আগে-আগে যাচ্ছিল। দড়িতে কোনো টান লাগছিল না। মোষটা তা হলে নিজেব মত কবেই ধীবেসুস্থে উঠছে। গজেন দড়িটা ছেড়েও দিতে পারে।

কিন্তু ছাডে না। তাবেব জালেঘেবা বোল্ডাব আব খাঁড়ির সীমানার মধ্যে জায়গাটা, মানে যে-জায়গাটা দিয়ে পালটা উঠবে, সেটা তত চওডা নয়, যদিও নদীর পাডে আর বোল্ডারেব মাঝখানের যে-পথটুকু ওরা পাব হয়ে আসছে, তার থেকে চওডা। তার ওপর আবার চডাই ত বটেই। কোনো গরু বা বাছুর যদি এখান থেকে ঐ গর্তটাব মধ্যে পড়ে যায়—তা হলে সেটাকে ঐ গর্ত থেকে তোলা সাত হাঙ্গামা। একেবারে ঘাড মটকে যদি না পডে তা হলে মরবে না হয়ত, কিন্তু ঠ্যাংট্যাং ভেঙে যেতে পারে। ঘাড়ও যদি না মটকায়, ঠ্যাঙও যদি না ভাঙে তা হলে কোনো গরুর অবিশ্যি ওখানে থাকতে আপত্তি হবে না—গাছগাছালিও আছে, জলও আসবে না। কিন্তু এখন, চর খালি কবাব এই শুরুতেই এসব গোলমাল শুরু হওয়া ভাল নয়।

গজেন মোষটার সঙ্গে-সঙ্গে আধাআধি পর্যন্ত উঠেছে, তখন ফিরে তাকিয়ে দেখে গরুর পালটা মন্থর গতিতে পেছন-পেছন আসছে বটে কিন্তু তাদের গা থেকে এত জল ঝরছে যে পুরো চড়াইটা ভিজে গেছে। ভেজার রং দেখে বোঝা যায়—পিছল হয়ে গেছে। 'এই খাইসে, এ্যালায় ত গর্তত পড়ি যাবা ধরিবে', গজেন মোষটাকে থামিয়ে দেয়, তারপর নদীর দিকে মুখ করে দাঁড়ায়। নিতাই আর নরেশ এখনো নদীর পাড়ে। গজেন আর মোষটা থেকে শুরু করে সেই পাড় পর্যন্ত একটা করে গরু বা বাছুরের লাইন। নদীব মধ্যে পালের আবো কিছু গরু-বাছুর। এই পুরো লাইনটা এগনোর সঙ্গে-সঙ্গে পাড়ে

একটা-একটা করে উঠছে।

'হে-এ-এ নিতাই', গজেন চিৎকার করে ওঠে। সে চিৎকারটা বাঁধের ওপর দিয়ে বিপরীত দিকে চলে যায়। তা হলে কি মোষটাকে দাঁড় করিয়ে রেখে বলে আসবে? 'শালা অমূল্যা কোটত গেইল?' গজেন এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে বালিশ-সালিশ, বলরামের ছোয়া, আরো গোটা তিনেক ছাওয়াছোটর ঘর বাঁধের ওপব গরুর খোঁটা পোঁতা শুরু কবেছে। আর, বোল্ডারের ওপর দিয়ে মাথায ঘাসপোয়ালেব বস্তা নিয়ে 'দুইটা আখোয়াল' বাঁধে উঠছে। গজেন চিনতে পারে—অশ্বিনী রায়ের মানষি আর অমূল্যাদের মানষি। গজেন সেখানে দাঁড়িয়ে চেঁচায—'হে-ই বাউ, এইঠে আসেন কেনে।' লোকদুটি গজেনের কথা শুনতে পায় না কিন্তু মুদ্রা দেখতে পায়। তারা বোল্ডার ভেঙে বাঁধে উঠছিল, গজেনের ডাক শুনে সিধে ডাইনে ঘুরে গজেনের দিকে আসতে শুরু করে। বাঁধের ঢাল দিয়ে আড়াআড়ি হাঁটা কঠিন। ওদের ডান-পাটা নীচে, বাঁ-পাটা ওপরে।

কিন্তু মোষটা দাঁড়িয়ে পড়ায় গরুর লাইনটাই ত দাঁড়িয়ে পড়েছে। ফলে, পাড়ে আর নতুন গরু তোলার জায়গা না পেয়ে নরেশ ঘুরে তাকায়, নিতাইয়ের চুল নদীর ভেতর থেকে জেগে ওঠে। ওরা তাকিয়ে কিছু বুঝতে চায়। গজেন হাত তুলে অপেক্ষা করতে বলে। লোকদুটি এগিয়ে আসে। নরেশের চিৎকার বাতাসের সঙ্গে এসে ঝাপটা মেরে উঠে যায়—'ঐখানে খাড়ায়্যা-খাড়ায়্যা কি মুতব্যার ধরছিস নাকি?'

গজেন সে-কথার কোনো জবাব না দিয়ে লোকদুটিকে বলে—'এইঠে পিছল হয্যা যাছে, খাড়ি করি ছাড়িবার ক, যা কেনে।' লোকদুটি ওখান থেকে ঢালটার দিকে একবাব তাকিয়েই সমস্যাটা বুঝতে প্যারে। গজেনের কথা শেষ হওয়াব আগেই দুজনে বোল্ডার দিয়ে সব-সব করে নেমে যায়। অশ্বিনী রায়ের মানষিটা, আষাঢ়ু, নেমেই যায কিন্তু অমূল্যাদেব মানষিটা আবাব উঠে আসে। সে বাঁধের ওপর উঠে মাথাব বস্তাটা ফেলে আবাব বোল্ডার দিয়ে নদীব দিকে ছোটে।

আষাঢ়ু নরেশকে গিয়ে বলতেই নবেশ হাতেব ইশারায জানায, ঠিক আছে, এখন গজেন মোষটাকে নিয়ে উঠুক। আষাঢ়ু আব অমূল্যাব মানষিটা আবার বোল্ডার দিযে গরুব লাইনেব দিকে আসে। আষাঢ়ু অমূল্যার মানষিটাকে কিছু বলে, সে তড়াক করে মাটিতে নেমে পাড়ে দাঁড়ানো গরুগুলোর পা থেকে জল কাচিয়ে ফেলতে শুরু কবে আব আষাঢ়ু বোল্ডারেব ওপব, বাঁধের ঢালুতে যে-সব আগাছা জন্মেছে সেগুলো ছিঁড়ে-ছিঁড়ে ঢালটাতে একবাব ছড়িয়ে দিয়ে দ্বিতীযবাব আনার জন্যে পেছন ফিবতেই গজেনের হা-হা হাসির আওযাজে ঘাড ঘুরিয়ে দেখে গরুগুলো সেই সব ঘাসপাতা জিভে তুলে চিবুতে শুরু করে দিয়েছে। সে তখন আবার ঘুবে, হেঁটে, এই লাইনটাব দিকেই এগয—গজেনের দিকে জিজ্ঞাসু মুখ তুলে। গজেন হাতেব ইঙ্গিতে তাকে বাঁধেব ওপব যেত বলে। মোষের দড়িটা ধরে নিজে পা বাড়ায়।

বাঁধের ওপর থেকে খোঁটা পোঁতার আওয়াজ মৃদু আসছে—আওয়াজের বাকিটা ত বাতাসে রংধামালির দিকে চলে যাচ্ছে। এখন ত গরুবাছুরগুলো এসে বাঁধে উঠল। এখনই যে-যার গরু-বাছুর আলাদা করে নেবে, আলাদা খোঁটায় পুঁতবে। যাদের অনেকগুলো গরু, নানা রকমের নানা কাজের গরু—তারা সেই অনুযায়ী গরুগুলোকে ভাগ করে খোঁটায় পুঁতবে। অমূল্যা আর অশ্বিনী রায় ত 'মানষি' পাঠিয়েই দিয়েছে, জগদীশ বারুই এ-রকম পাঠায় না—সে জানে তার গরুমোষ দেখার লোকের অভাব হবে না। কিন্তু ঐ চরে প্রতিদিনের কাজে যাদের সঙ্গে দেখা হয় না, তারা বন্যার মুখে এই বাঁধে গরুবাছুর পরিবারসহ এসে উঠলেও ত আর একেবারে মিলেমিশে যেতে পারবে না। শেষে দেখা যাবে—পাড়া অনুযায়ী এখানেও ভাগ হয়ে আছে। কিন্তু গরুর বেলায় পাড়াভাগে চলবে না—যার-যার গরু সে আলাদা-আলাদা করে নেবে। প্রথমে এল গরু। তারপরই আসছে গরুর খাবার আর দেখাশোনার লোক—যার মানষি আছে তার মানষি, যার ছাওয়াছোট আছে তার ছাওয়াছোট। যার-যার গরু তার-তার মত আলাদা হয়ে যাবে।

ভেঙে পড়া দিগন্ত থেকে উচ্ছন্ন বাতাস আর লোপাট আকাশ থেকে বৃষ্টির তীরে বিদ্ধ হতে-হতে এতক্ষণ যে গরুমোষবাছুরের পাল সমবেত এক বাঁচার প্রয়াসে এই বাঁধ পর্যন্ত ছুটে এল, তাদের ওপর ব্যক্তিস্বত্বের ভাগাভাগি কায়েম রাখতে বাঁধের ওপর খোঁটা পোঁতা হচ্ছে। সেই খোঁটা পোঁতার আওয়াজ বন্যার বাতাসে বাহিত হয়ে উড়ে যাচ্ছে।

গজেনের হাতে ধরা জগদীশের মোষের বাঁকা শিং আকাশের ধূসর মেঘে জেগে ওঠে।

একশ এক

চর দুই নম্বর

নিতাইদের চর থেকে নদী হয়ে মাইল আট আর জলপাইগুড়ি শহব হয়ে মাইল বার ভাটিতে এই দুই নম্বরটাও ত চর—লোকের মুখে-মুখে। আসলে এটা তিস্তার এই খাত বছরে আট মাসই শুকনো থাকে। বাকি চার মাসও শুকনো থাকতে পারে যদি তিস্তা অন্যদিক দিয়ে বয়ে যায়। তেমন পর-পর তিন বছর গেল বলেই না এইখানে লাঙল নামল, মানুষজন নামল ; তারপব ঘরও উঠল, কলাগাছও ফাঁপল, আর একসারি সুপুবি গাছও সাঁইসাঁই কবে বাড়ল। কিন্তু, তাবপরই আবাব একবার তিস্তা আর-সব খাত ছেড়ে দিয়ে এই একটা খাতের দিকেই ছুটল। এ-বকম কবতে-করতে গত বছর দশেকে এখন এই নিচু চরের কোনো-কোনো জায়গা উঁচু হয়ে গেছে, কোনো-কোনো জায়গা ডোবা হয়ে আছে। আর দশ বছরে জমির ভাগাভাগিটাও পরিষ্কার। শীতকালে পুরো জমিতেই রবিচাষ হয। গমও আজকাল ভাল হচ্ছে। যদি এ-রকম ভালই হয়, তা হলে অন্য ববি চাষ না কবে গমই করবে সবাই। উঁচু জায়গাগুলো থাকে আমনের জন্যে। উঁচু, মানে এই চবেব নিচু জমিব চাইতে উঁচু কিন্তু, নদীর পাড়ের অনেক নিচু।

জমির উঁচুনিচুর হিশেব যদি কষা যায়, তা হলে এই দুই নম্বর আসলে তিস্তারও নীচে। কিন্তু তিস্তার বড খাত আর দুই নম্বরের মাঝখানে বিবাট চওডা কচুযা—সেখানে পাকা বাড়ি পর্যন্ত আছে। জমির ঐ আডালটা থাকায এখানে নদীর তলায় বসে নদী চায কবা যায়। পাহাড়ের বৃষ্টিতে যদি ধস নামে, বন্যা নামে, তা হলে ওপর থেকেই তিস্তার জল আবো নানা খাত দিয়ে ছড়ায়। এই খাত দিয়েও। ওপরের বন্যার জলেই এই খাতে বান ডাকে। এর সঙ্গে বড় তিস্তার কোনো যোগ নেই। সে যোগ হলে তিন-চার গুণ লাল নিশানাতেও কুলোবে না। তেমন যে হয না, তা নয়, অন্তত পনের যাদের বয়স তারা এখনো তেমন দেখে নি।

নদীর জমি যখন চাযে আসে তখন ষোল আনাব ওপর আঠার আনা লাভ। কারণ, এ জমির কোনো মালিক নেই। যখন জমি জলে ভেজা, পা বাখলে দেবে যায়, থাকার জন্যে একটা বাঁশের মাচান বানাতে বাঁশ পোঁতা যায় না, বাঁশ মাটিব ভেতবে সেঁদিয়ে যায, জল শুকোয় নি, একটু আঁচডালেই নীচের জল বেবিযে পড়ে, তখন যে গিয়ে প্রথম জমিটাতে নামে তার চোখের হিশেব আর মনের হিশেব হতে হয় নির্ভুল। এক কোনো পাগল-ছাগল যেতে পারে—চার পুরুষ ধরে জমি হারাতে-হারাতে এখন বটগাছের তলা ছাড়া যাব নিজস্ব কোনো ছায়া নেই সে এই জমিটাকে নিজের জমি বলে ভাবতে পারে। তার পাগলামিব সঙ্গে জমিব একটা কার্যকাবণেব যোগ ঐতিহাসিক বলেই এটা সম্ভব হতে পারে, হয়ও অনেক সময়।

আব, নয় ত ঠিক এর উল্টো। তিস্তা ক-বছর পর-পব খাত বদলায় তার একটা আন্দাজি হিশেব যার বাপ-ঠাকুর্দার কাছ থেকে জানা আছে বা পর-পর ক-বছর এই খাতে জল কত পরে এসেছে ও কত আগে বেরিয়ে গেছে—এ হিশেব যার মনে আছে—তেমন হিশেবনিকেশ টাকাপয়সার মানুষ, আধপাগলা কাউকে দু-চাব টাকা দিয়ে, এখানে বসিয়ে দিতে পারে জায়গাটার সম্ভাব্য দখল রাখতে।

চরের জমির ত কোনো মালিক নেই—তাই যেন ভগবানের জমি। যে আগে দখল নিতে পারবে, জমি তার। যে যতটা দখল নিতে পারবে, ততটাই তার। মণ্ডলঘাট আর কচুয়ার মাঝখানে দুই নম্বর। এখন মণ্ডলঘাট পর্যন্ত তিস্তার বড় বাঁধ দেয়া হয়েছে—একেবারে পুরনো 'পাহাড়ে হাট'-এর মাঝখান দিয়ে। মণ্ডলঘাট চৌপত্তি থেকে এই বাঁধ একটা 'গোল' হয়ে গেছে যেন। এ বাঁধটা যেন চৌপত্তিরই একটা অংশ। বাঁধে ওঠা যা, চৌপত্তিতে ওঠাও তাই। মাঝখানে জলাজঙলা কিছু জায়গা আছে। বান-বন্যা ছাড়া এ বাঁধে কেউ আসে না, আর বান-বন্যাতেও আসে ত দুই নম্বরের মানুষজনই। বাঁধটা ফাঁকা বলে, জঙ্গলটঙ্গল পরিষ্কার করে এখানেই ক্যাম্প হয়। এ চরের দখল রাখলে পরে এটা মণ্ডলঘাটেরই অংশ হয়ে যেতে পারে। আর কচুয়ার পশ্চিম দিয়ে আর-একটা বাঁধ গেছে সেই বোয়ালমারির দিকে। তার মানে দুই নম্বরটা পড়ল একেবারে দুই বাঁধের মাঝখানে।

দুই বাঁধের মাঝখানে ত এক নদীই থাকতে পারে। ইনজিনিয়াররা নাকি দুই দিকে বাঁধ দিয়ে ইচ্ছে করেই এই জায়গাটিকে শুকনো রেখে দিয়েছে—যাতে সাংঘাতিক বন্যার সময়, যখন পাহাড় ভেঙে নীচে নামবে; পাহাড়ের মাথা দিয়ে জল ঢুকে তলা দিয়ে বেরিয়ে আসবে, ফরেস্টকে ফরেস্ট উপড়ে আসবে,

যখন বোল্ডারগুলো গড়াতে-গড়াতে নামে যেন ভূমিকম্প আসছে, যখন গোটা সাতেক লাল নিশানা রেডিওতে বাজে, ও স্থানীয় সংবাদে হেলিকপ্টার ওঠে ও মিলিটারি নামে তখন নদী বেরবার একটা রাস্তা পায়।

এ বকম একবার ঘটেছিল বটে আটষট্টিতে কিন্তু আবার কবে ঘটবে কেউ জানে না। ততদিন নদীর জন্যে এই খোলা পথটা আটকে দিয়ে আবাদ হবে। যেখানে জমি, যেখানে চাষ-আবাদ সেখানেই মালিকানা, দখল, ভাগাভাগি। নদী নিয়েও সেই মালিকানা, সেই দখল, সেই ভাগাভাগি, আছে। শুকনো হলেও এ ত নদীই।

কিন্তু নদী হলেও এ ত মাটিও বটে। মাটি ত আর নদী নয় যে বয়ে যাবে। মাটি মানে ত গাছ। তাও ছোটখাট ফুললতাপাতা না, কাঁটাগাছ না, ঝোপঝাড়ও না। মাটি মানে মহীরুহ গাছ—যেখানে আছে, সেখানেই আছে, বাকলের ওপর বাকল জমে, সেখানেই ডালে ঝুরি নামে, সেখানেই ডালে-ডালে সব পরগাছা বাসা বাঁধে, সেখানেই মাটির ওপর মাটি পড়ে, সেখানেই মাটি উঁচু থেকে আরো উঁচু হয়, লোকে বলে মাটির বুক, সেখানেই উঁচু নিচুতে নানা রকম বাসা বাঁধা হয়, চাষ চষা হয়—মাটি নিয়ে মানুষের কাজেরও আর শেষ নেই। তার পর কোনো এক সময় কারো মনেও থাকে না এই মাটি আসলে মাটি নয়, নদী, বা বড়জোর নদীর জন্যে খুলে রাখা পথ—সে পথে নদী আর কখনো ঘুরে আসে নি। তখন ধীরে-ধীরে সেই নদী জনপদের প্রাক্তন এক উপকথায় পরিণত হয়, জনপদবাসীর পুরুষানুক্রমিক মুখে-মুখে। ধীরে-ধীরে তেমন মানুষ কমে আসে, যারা নিজেদের অতীতকে গৌববান্বিত কবতে এক নদীব ক্রমবিস্তার ঘটায়—'সে কী নদী।' ধীরে-ধীরে তেমন মানুষ কমে আসে, যাদের স্মৃতিতে নদী বহমান থাকে। ধীরে-ধীরে তেমন মানুষ কমে আসে, যাবা নদীকে ডাকনামে ডাকে। সেই কোনো এক সময় এই জায়গাটিকে আর দু দিক বাঁধ বাঁধা বলে চেনা যাবে না। তখন নদীর প্রবহমাণ জলের জন্যে অন্য কোথাও নতুন বাঁধের দবকার হবে।

এই জায়গাটি, এই দুই নম্বরটি, এখনো সেই পথে পৌঁছয় নি—যেমন ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে সেই পাহাড়ের তলার মঞ্জুলি, তার নীচে প্রেমগঞ্জ বা বাসুসুবার চর, দোমোহনি বা পদমতীব চব, বা তারও নীচে কোচবিহারের পুবে মেখলিগঞ্জ পশ্চিমে হলদিবাড়ির মাঝখানে নুয়াপাড়া থেকে দহগ্রামের বহু পুরনো চর। বা, তার আগেই এই কাশিয়াবাড়ি, বোয়ালমারি, এমন-কি কচুয়াও। তাই এখনো এই খাতে নিয়ে নদীর সঙ্গে কিছু-কিছু দখলের লড়াই চলছে। মানুষজন এখনো চাষে-চাষে এই নদীপথকে নদীর পক্ষে দুরধিগম্য করে তুলতে পারে নি। নদী এখনো জলে-জলে এই মাটিকে চাষেব পক্ষে অযোগ্য করে তুলতে পাবে নি। তাই এখনো বছরে কয়েকবাব, বা দু-এক বছরে একবাব চলে মানুষ আর নদীব দখলের লডাই।

এই লডাইটাতে মজা আছে। হঠাৎ জলের ধাক্কায় মাটির ভাগাভাগি বন্ধ হয়ে যায়। তিস্তার জল ঢুকে আলগুলোকে ঢেকে দিলেই, আলে-আলে ভাগ করা মালিকানাও ঢেকে যায়। তখন জল হয়ে পডে সকলেরই শত্রু। যেন জল সরে গেলে, মাটি বেরলে, এই মানুষজনের পুরনো কয়েকটি দখলের লড়াই আবার শুরু হতে পারবে ; তার আগে পর্যন্ত, যতক্ষণ জল উঁচুনিচু, শুখা-দোআঁশলা, ঢাল-চড়াই জমির ভেদ লোপ করে দিতে থাকে, ততক্ষণ, এই সব জমির দখলদাররা, চাষীরা, মালিকরা, ভুলে থাকতে পারে, জলের নীচের মাটির অসমতলতা বা এই টানা জমির মাটির পরতে-পরতে বালি, চুনপাথর, এই সবের মিশেলের বৈচিত্র্য।

ঐ অসমতলতা আর ঐ মিশেলের রকমফেরের জন্যে জমির দাম বাড়ে-কমে, দখল কায়েম হয়, হাতবদল হয়—সম্পত্তির মামলা ত মানুষের সঙ্গে মানুষেরই হয়। কিন্তু, এখন, এমন সব ঋতুবিপর্যয়ে, যখন পাহাড় থেকে ঢল নেমে নদীকে ক্রমেই করে তুলছে যে-কোনো আয়তনের পক্ষেই অনেক বড়, যখন জলের চেনা রং বদলে গেছে, জলের ওপর হুমড়ি খেয়ে তার একেবারে ঘোলাটে মেঘের মত শাদা রং, ফেনা, আর ফেনা কেটে গেলে আচমকা কাদাগোলা জল চিনতে হয়, যখন জল যেন নদী বয়ে আসছে না—নদীময় পাতাল থেকে উথলে উঠছে, তখন বাঁধের ঠিক নীচেই নদীর গভীর ভেতর থেকে ভাদই চিৎকার করে ধমকে ওঠে বাঁধের ওপর মহেশ্বর জোতদারকে—বাবা গে, বাঁশ ফেলি দাও, বাঁশ ফেলি দাও—'

ভাদইয়ের সারা জীবনে মহেশ্বরকে ডাকার কোনো উপলক্ষই থাকার কথা নয়। আর ক্বচিৎকদাচ যদি

হয়ও, তা হলেও 'দেউনিয়া' কথাটিই কত-না শ্লেষ্মায় জড়িয়ে বেরিয়ে আসে। কিন্তু তিস্তার বানার মধ্যে দাঁড়িয়ে 'দেউনিয়া' বড় দীর্ঘ শব্দ। আর এই তল্লাটের সবচেয়ে বড় জোতদারের একজন, মহেশ্বর দেউনিয়া, ভাদইয়ের হুকুম মত বাঁধের ওপর জমিয়ে রাখা বাঁশ একটা তুলে বাঁধের ঢাল বেয়ে ধীরে-ধীরে নেমে জলের ভেতরে ভাদইয়ের দিকে ছুঁড়ে দেয়। ভাদই সেই বাঁশটা ধরে ফেলে চিৎকার করে, 'আরো দ্যাও কেনে, আরে দ্যাও', যেন, এইমাত্র তিস্তার বন্যায় মানবেতিহাসে শ্রেণীসংগ্রামের চরম নিষ্পত্তি ঘটে গেল।

একশ দুই

বন্যার মুখে শয্যা

জল এসেছে সেই বুধবার থেকে। কিন্তু এখানে অন্তত সেদিন বৃষ্টি ছিল না। ফলে মনে হচ্ছিল, যেমন এসেছে, তেমনি চলে যাবে। কিন্তু আজ শনিবার, কাল গেল শুক্রবার, তার আগের দিন বৃহস্পতিবার থেকে এখানে ঝড়ো বাতাস আর বৃষ্টি শুরু হল। বৃহস্পতিবার সকাল দশটা-এগারটা নাগাদ থামলও একটু। রাস্তাঘাট শুকিয়ে গেল। রোদ উঠল না। কিন্তু আকাশের রোদঢাকা মেঘে জল বেশি ছিল না। তাই রোদের আভা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। দুই নম্বরের নদীর জল একটু-আধটু বেড়েও ছিল, যেমন বাড়ে, এ রকম ঝড়ো বাতাসে।

কিন্তু বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে ঝড়জল দ্বিগুণ হয়ে উঠল। বৃহস্পতিবার রাত দশটায় প্রথম, তারপর শুক্রবার সকাল জুড়ে রেডিওতে বারবার 'কমলা' সঙ্কেতের কথা বলা শুরু হল। যাঁরা নদীর চরে বা বাঁধছাড়া পারে বসবাস করেন তাঁদের 'নিরাপদ-স্থানে' সরে যাওয়ার নির্দেশ ঘন-ঘন দেয়া হল। সিকিমে কোন একটা জায়গায় বিরাট ধসের খবর পাওয়া গেছে কিন্তু বিস্তৃত বিবরণ এখনো মেলে নি। হেলিকপ্টার ও সৈন্যবাহিনীর কথা রেডিওতে শুক্রবার রাত দশটার আগে বলে নি, তার মানে কোথাও তখনো বন্যা শুরু হয় নি।

কিন্তু শুক্রবার রাত দশটাতেই বলা হল—সিকিমের কিছু খবর পাওয়া গেছে, কয়েকটি জায়গায় প্রবল ধসের ফলে নদীর মুখ আটকে গিয়ে কৃত্রিম হ্রদ সৃষ্টি হয়েছে। এই হ্রদগুলি ফেটে গেলে নদীর 'নিম্ন এলাকায়' 'আকস্মিক' ও 'প্রবল' বন্যার আশঙ্কা দেখা দেবে। জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের 'জেলা কর্তৃপক্ষ' 'সতর্কতামূলক' ব্যবস্থা নিয়ে সর্বত্র কমলা সঙ্কেত দিয়েছেন। নদীর চরে ও বাঁধছাড়া পারে যাঁরা বসবাস করেন তাঁদের এই মুহূর্তে নিরাপদ স্থানে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তা ছাড়াও সকলকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

রেডিওর এই ঘোষণাতেই যেন হাওয়া তিস্তার ওপরের শূন্যতা থেকে পারে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যেন, জলস্রোত পাড় ভেঙে ফেলে লাফিয়ে উঠে আসতে পারছে না বলেই, হাওয়া, জল বেয়ে ধেয়ে এল ওপরে, একসঙ্গে, এক পরাক্রান্ত আক্রমণে, যা কিছু দাঁড়িয়ে ছিল তাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে। নিশ্চয়ই মিশে গেল, উড়ে গেল অনেক কিছু। বৃষ্টি ছিল, কিন্তু বাতাসের বেগে সে বৃষ্টি মাটিতে পড়তে পারে না—মাটির সমান্তরালে তীক্ষ্ণ ছুটে যায়।

সুতরাং শুক্রবার রাতটা ত প্রায় অন্ধের মতই কাটানো। শনিবার ভোর হয় যেন নেহাৎ ভোর হতে হয় বলে। ছাইরঙা আকাশ নদীর ওপর নেমে এসেছে আর ঘোলাটে নদী বাঁধ বেয়ে উঠে গেছে অনেকটা। নদীর ভেতরে এই উঁচু ডাঙাটায় জল এখনো ওঠে নি বটে, কিন্তু কাল সন্ধ্যার তুলনায় সারা রাতে বেড়েছে প্রায় দেড় গুণ। বাতাস যে-রকম তাতে মনে হয় যেখানে পাহাড়ে ধস নামছে, সেখানে আরো ধস নামবে। কিন্তু সেই ধসের ফলে কোথায় কোন পাহাড়ে নতুন-নতুন হ্রদ গোপনে-গোপনে তৈরি হয়ে আছে, সেগুলো যদি একসঙ্গে ফেটে যায় তা হলে বাঁধ ত বাঁধ, বাঁধের ওপর থেকেও সরে যেতে হবে মণ্ডলঘাট স্কুলে। যদি সেই সব হ্রদের জল একসঙ্গে না বেরিয়ে এক-এক বারে, বা চুঁইয়ে চুঁইয়ে, বেরয় তা হলে এখানে বন্যা হবে না।

দেখতে-দেখতে বাঁধের ওপর কিছু-কিছু লোকজন আসা শুরু করে।

সবচেয়ে আগে আসে আবদুল—এই দুই নম্বরের বাঁধে।

তার রকমসকম দেখে মনে হয় সে 'সাগাই' খেতে এসেছে। আকাশেব মেঘ, বাতাস বা বৃষ্টির চাপ ও বেগে বা তাব চোখেব সামনে তিস্তাব ঘোলাটে জলেব ক্রমবিস্তারে আবদুলের যেন কিছুই যায় আসে না সে এমনভাবে তাব একটা খুব সযত্ন ভাঁজ-করা বিছানা, একটা ভাঙা ছাতাও সেই বিছানার সঙ্গে বাঁধা, একটা এলুমিনিযামেব মগ, আর একটা এলুমিনিয়ামেব হাঁড়ি নিয়ে এসে ভেজা ঘাসের মধ্যেই বসে পড়ে। কোন জাযগায় যে বসবে সেটা আবদুলকে একটু ভাবতে হয় বই-কি। সে একবার দুই নম্বরের এই গোলবাঁধটা চক্কর দেয়। পুবোটা চক্কর দিতে পারে না, উত্তরের দিকে এতটাই জংলা যে আবদুলও ফিবে আসে। তা ছাড়া বাঁধে বসলেও নদীর দিকে মুখ করেই ত বসতে হবে। শেষ পর্যন্ত আবদুল একটা ঝাঁকড়া কুলগাছেব নীচের ডালটা বেছে নেয়। ঝোলানোব জন্যে বিছানাটা সে প্রথমে খোলে। ততক্ষণে বাঁধে যাবা ছিল তাবা নদীর দিকে পেছন ফিরে আবদুলের দিকে মুখ করে। আবদুলেব বিছানাটা আসলে একটা তুলোব কম্বল—এ-বকমই কোনো বন্যার সময় রিলিফে পেয়েছিল। সেটার তুলো অনেক জাযগায় উঠে গেছে, কোনো-কোনো জাযগা ফেঁসেও গেছে, কিন্তু এমন নিপুণ ভাঁজ আবদুলেব যে বাইরে থেকে বোঝাই যায না। সেই কম্বল খুলে তাব ভেতব থেকে আবদুল একটা পাটেব দড়ি বেব করে। বের কবে দড়িটাকে পাশে বেখে, আবার কম্বলটাকে ভাঁজ কবে। কম্বলটা খোলা হয যতটা, ভাঁজ তার চাইতে বেশি। সেই ভাঁজেব ওপব দাগ পড়ে গেছে—বেশ মোটা দাগ। ঐ দাগগুলো ছাড়া অন্যভাবে আর এ-কম্বল এখন ভাঁজ কবাই যাবে না। কিন্তু আবদুল একবাব লম্বালম্বি ভাঁজ কবে আবার খোলে। পুবো কম্বলই দোভাঁজি কবে সে উঠে দাঁড়ায, তাব মাথা ধবে সামনে ঝুলিয়ে ঝাঁকায, তাবপব খুব ধীরে সেটাকে মাটিতে ছোঁয়ায আব আস্তে কবে শোযাতে শোযাতে, নিজে কোমব ভেঙে-নিচু হতে-হতে এগিযে কম্বলটাকে একেবাবে মাটিব ওপব মেলে দেয। তাবপব আবাব যেখান থেকে সে শুরু করেছিল, সেই জায়গাটিতে ফিবে আসে, যেন কম্বলেব, লম্বা কবে শোযানো কম্বলেবও মাথা আব পা আছে। জল দেখতে আসা যে-ভিড়টা তখন আবদুলকে দেখছিল, তাব ভেতব কেউ বলে, 'আবদুল, এ্যাখন শুইয়া পড, বাত্তিবে ত বানা আইসলে জাযগতে হবে।'

আবদুল সে-কথাব কোনো জবাব দেয না। এমন-কি ফিবেও তাকায না। সে এবাব কম্বলেব দুটো দিক ধরে আবার ধীবে-ধীরে এগতে থাকে, নিচু হযে। কম্বলটাকে তলাব ভাঁজেব ওপব শুইযে সে এবাব মাটির ওপর উবু হয়ে বসে দুহাত দিযে কম্বলটাকে সমান কবে। এবাব ডান দিক থেকে তুলে বাঁ দিকেব তলার ওপর ফেলে। তারপব আবার তার দিক-থেকে তুলে ওপব দিকে ভাঁজ ফেলে। আবাব দু হাতে ঝাড়ে আব দু হাতে কম্বলটাকে একটু চাপে। এবাব সে উঠে দাঁড়ায—কম্বলটাকে ওখানে বেখেই। তাব পরনে একটি খাকি ফুলপ্যান্ট—একটু ছোট কিন্তু খুব ঢোলা, গাযের শার্টটা তাব ভেতব গোঁজা, শার্টেব ওপর একটা সোয়েটার। যে-ভঙ্গিতে রাস্তাব মোড়ে গোল কবে দাঁড়ানো ভিড়েব মধ্যে মাদাবিকা খেল দেখানোর সময় মা বা বাপ ভিড়টাব এক পবিধিব একপ্রান্ত থেকে আব-এক প্রান্তে পেশাদাবি নিশ্চযতায হেঁটে আসে, আবদুলও সে-রকমই হেঁটে এসে পাটের দড়িটা তুলে নেয়। সে ভাঁজ কবা কম্বলটা ওখানে না এনে, ওখান থেকে ফিরে এসে দড়িটা নিয়ে যে আবার কম্বলের কাছে ফিবে যায তাতেই বোঝা যায়—কম্বলটা খোলা, ভাঁজ করা ও বাঁধা এই কাজটার চাইতেও কাজের প্রক্রিয়াটা তাব কাছে বড়। আর, তার মুখচোখে একটা স্মিত হাসি লেগেই ছিল—সকলে তাকে দেখছে এই ঘটনাতে সে বেশ অভ্যস্ত।

আবদুল গিয়ে কম্বলটার সামনে এক হাঁটু গেড়ে, আর-এক হাঁটু তুলে বসে দড়িটা বাণ্ডিলটাব নীচে লম্বালম্বি দেয়। দুদিকে ধরে দড়িটা টানটান করে। একবার বাণ্ডিলটা তুলে সেটাকে ফেলে এমন করে বসায় যেন দড়িটা ঠিক মাঝখান দিয়ে যায়। উঠে গিযে ডান হাতি দড়িটাকে টানটান কবে, আবার, বাঁ দিকে গিয়ে বাঁ হাতি দড়িটাকে টানটান করে। তারপর বাণ্ডিলটার সামনে আগের ভঙ্গিতে বসে দুদিকের দড়ি দু হাতে ধরে একই টানে মাঝখানে নিয়ে এসে একটা গিঁঠ দেয়। হাঁটুটা দিয়ে সেই গিঁঠটা চেপে ধরে এবার সে দড়িটাকে পাশাপাশি ঘুরিয়ে দেয় আর বাণ্ডিলটাকে উল্টে দেয়। দড়িটাকে বাণ্ডিলের অপর দিক দিয়ে ঘুরিয়ে এসে সে আবার বাণ্ডিলকে উল্টে দেয়। এবার দড়ির দুটো প্রান্তকে আগের গিঁঠটার ভেতর দিয়ে গলিয়ে একটা গিঁঠ দেয় ও তার ওপর আবার একটা এমন ফাঁস বানায় যাতে বাণ্ডিলটাকে সে হাতে বা লাঠিতে ঝুলিয়ে নিতে পারে। এবার সে উঠে দাঁড়ায় ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাণ্ডিলটাকে

দেখে। দেখারও যেন একটা সময় ছিল, সেটা পেরিয়ে গেলে সে নিচু হয়ে বাণ্ডিলটা তুলে গাছের তলাটায় আবার চলে আসে। একবার তাকিয়ে ভাঙা ডালের অংশটা দেখে, তারপব, রোজই সে যেন এই গাছটাতেই বাণ্ডিলটা ঝুলিয়ে রাখে এমন ক্ষিপ্রতায় বাণ্ডিলটাব ঐ হাতলেব মত ফাঁসটাকে ঐ ভাঙা ডালে ঝুলিয়ে দেয়। বাণ্ডিলটা একটু দোলে। সে দুলুনি থামাব আগেই আবদুল ওব ডেকচিব ভেতব মগটাকে ঢুকিয়ে কুলগাছটার যে-জায়গাটা থেকে ডালপালা বেবতে শুরু করেছে, সেখানে ঐ হাঁড়িটাকে ঢুকিয়ে দেয়। হাঁড়ির সামনে দুই ডালের ওপব ওব লাঠিটা সেঁদিয়ে আবদুল দুই হাত ঘষে, তাব কাজ শেষ।

একশ তিন

বন্যার মুখে জিপগাড়ি

আবদুল এ-এলাকার পরিচিত পাগল। বা, পাগলও নয়, হয়ত। তার এমনিতে কোনো পাগলামি নেই। কথা প্রায় বলেই না। পোশাক-আশাকও যে তাব এ-বকম হোমগার্ডদেব মত, তার কারণ সে তার নিয়মিত চক্করের মধ্যে নগব বেরুবাড়িব বর্ডার ক্যাম্পে একবাব যায়, অন্তত মাসে একবার। ওখানে গেলে টানা দিন সাতেক বা দিন পনেরও থেকে যায়। গিয়ে তার জন্যে কাজ যেন ঠিক করাই আছে এ-রকম দ্বিধাহীনতায় তরকাবির বাগানে কাজ কবতে লেগে যায়। ক্যাম্পেব কিচেনে খায় আর একটা বারান্দায় ঘুময়। বারান্দার বাটামে তার বিছানা ও হাঁড়ি বাঁধা থাকে। কেউ আপত্তি করে না। তারপর আবার একদিন ক্যাম্প ছেড়ে হাঁটা দেয়। সেটাও আগের মুহূর্তে বোঝা যায় না। কুয়োপাড়ে যায়, হাতমুখ ধোয়, তারপর বারান্দায় এসে লাঠিটার ডগায় বাণ্ডিলটা ঢুকিয়ে, আর-এক দড়িব ফাঁসে হাঁড়িটাকেও লাঠির মাথায় গলিয়ে সে হাঁটা দেয়, যেন তবকাবিব বাগানের কাজটুকু কবে দেযার জন্যেই সে এসেছিল, বা, সে এখানে রোজ খাটে, এখন দিনের শেষে বাড়ি ফিবছে।

আবার এ-রকম চক্কর মারতে-মারতেই মণ্ডলঘাটেব চৌপত্তিতে, ঘুঘুডাঙার হাটে, কাদোবাড়ির হাটে যায়। কিন্তু কখনো কাবো বাড়িতে বা কোনো পাড়ার মধ্যে যায় না। এতই চেনা আবদুলের গন্ধ যে রাতবিরেতে সে কোথাও ঢুকলেও কুকুরবা ডাকে না, একবাব এসে শুঁকে যায় মাত্র। যেখানে যায় সেখানেই তার খাবার জুটে যায় বটে কিন্তু খাবার কখনো চায় না আবদুল। বরং যেখানেই যায় সেখানেই সে সারা দিন ধরে এত কাজ করে যে মজুবি ধরলে তাব একটা ভাল আযই হতে পারে। কিন্তু রোয়াগাড়াই হোক আর ধানকাটাই হোক—আবদুল কাবো খেতে কখনো কাজ করে না। মনে হয়, যেন মানুষের সঙ্গেই ও থাকতে চায়, অনেক মানুষের সঙ্গে, মানুষের ভিড় কিন্তু কোনো একজন বা দুজন মানুষের সঙ্গে নয়। তাই আবদুল হাটে, চৌপত্তিতে, ক্যাম্পে ঘোরে —কোনো বাড়িটাড়ির কাছে ঘেঁষে না।

আবদুল এসে বাঁধের ধারে দাঁড়িয়ে, কোমরে হাত দিযে নদীর দিকে তাকায। তিস্তায় বন্যা হবে, চরের সব মানুষ এসে বাঁধে উঠবে, এখানে ক্যাম্প বসবে, ত্রিপল টাঙানো হবে, সাধুসন্ন্যাসীরা আর অফিসাররা আসবে-যাবে—আগামী কয়েক দিন এখানে অনেক কাজ আবদুলের। কুলগাছের ডালে বিছানা, হাঁড়ি আর লাঠি ঢুকিয়ে সে এখন সেই অত কাজের জন্যে তৈরি।

চৌপত্তির দিক থেকে একটা আওয়াজ ওঠে আর এই বাঁধের ভিড়টা প্রায় দৌড়েই চৌপত্তির দিকে ছোটে। বাচ্চাদের গলায় চিৎকার ওঠে, 'আসি গেইল্, আসি গেইল্, জিপগাড়ি আসি গেইল্।' আবদুল প্রায় একাই দাঁড়িয়ে থাকে। আবদুল ছাড়া আর দাঁড়িয়ে থাকে এ এলাকার সবচেয়ে বড় জোতদার মহেশ্বর রায়। তার প্রায় বিশ-ত্রিশটা গরু দুই নম্বরে থাকে। সে গরুগুলোর খোঁজখবর করতে এসেছে।

যে-ভিড়টা চৌপত্তিতে ছুটে গিয়েছিল সেই ভিড়টাই এখন চুপচাপ ফিরে আসে, হাঁটতে-হাঁটতে—মইনুদ্দিন ডিলার, গামবুটপরা দারোগার মত দেখতে একজন, আর একজন অফিসারের পেছনে-পেছনে। ওরা তিনজন সামনে-সামনে ছিল, পেছনের ভিড়ের মধ্যেও শহর থেকে

আসা আরো দু-একজন ছিল। মইনুদ্দিন ডিলারের পরনে লুঙি আর পাঞ্জাবি। সে এদের মধ্যে সকলের চেয়ে লম্বা আর অফিসারটি সবচেয়ে খাটো। আবদুল যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই যে এরা এসে দাঁড়ায় তার কারণ হতে পারে যে আবদুল একা দাঁড়িয়ে থাকায় অফিসারটির মনে হয়েছে—এটাই দাঁড়াবার জায়গা। আবদুলের খাকি প্যান্ট দেখে তার মনে হয়ে থাকতে পারে—সে সরকারি কাজই করছে। এত বড় ভিড় ও অফিসারদের দেখে আবদুলের সরে যাওয়ার কথা কিন্তু সে যে সরে না আর মাত্র একবার তাকিয়েই আবার নদীর দিকে মুখ ফেরায় সেটাই বোধহয় তার পাগলামো।

মইনুদ্দিন ডিলার সবার ওপর দিয়ে গলা তুলে হাত বাড়িয়ে মহেশ্বর জোতদারকে ডাকে, 'এই যে মহেশ্বরবাবু , এইখানে আসেন।' বাতাসে মইনুদ্দিনের গলা শোনা যায় না কিন্তু মহেশ্বর তার আহ্বানটা বোঝে। সে এগিয়ে আসে, ভিড়টা তাকে জায়গা ছেড়ে দেয়। সে অফিসারদের পাশে এসে দাঁড়ায়।

'এই যে ডি-সি সাহেব আসছেন, বলেন, এখানকার পরিস্থিতি কী?'

মহেশ্বর নমস্কার করে দু হাত দু দিকে ছড়িয়ে বলে, 'পরিস্থিতি ত সগায় দেখিছেন—।' যেন মহেশ্বরের দু হাতেই বন্যা।

'ঐ চরে যাঁরা থাকেন তাঁরা সব উঠে এসেছেন ত?' ডেপুটি কমিশনার জিজ্ঞাসা করেন।

'কায় আর উঠিবে? গাইগরুগিলাই এখন ঐঠে থাকি গেইল!' মহেশ্বর সেই একই ভঙ্গিতে বলে।

'মানে? রেডিয়োতে এতবার করে অ্যানাউন্সমেন্ট করা সত্ত্বেও আপনারা লোকজনকে সরান নি? এরপর ক্যাজুয়ালটি হলে তার দায়িত্ব কে নেবে? এখানকার পঞ্চায়েতের লোকজন নেই?' ডেপুটি কমিশনার ঘাড় ঘুরিয়ে ভিড়টাকে জিজ্ঞাসা করেন।

'পঞ্চায়েত আর কী করিবে, কহেন? এই ত মাস্টার আছে, মেম্বার।' মহেশ্বর বলে।

'কই? কে মেম্বার?' ডেপুটি কমিশনার বলেন।

'মাস্টার, মাস্টার', একটা গুঞ্জন ওঠে। ডেপুটি কমিশনার ঘুরে দেখেন—লুঙি ও গেঞ্জিপরা এক যুবক নমস্কার করে এগিয়ে এল।

'কী? আপনারা রেডিয়োতে এতগুলো এ্যানাউন্সমেন্ট শুনেও চরের লোকদের পাড়ে তোলার কোনো ব্যবস্থা করেন নি?' ডেপুটি কমিশনার একটু চেঁচিয়েই বলেন কিন্তু বাতাসের বেগ এতে বেশি যে বোঝা যায় না, তিনি রাগ করে জোরে বলছেন, নাকি এই বাতাসের জন্যে তাকে বাধ্য হয়েই জোরে বলতে হচ্ছে।

মাস্টার মৃদুস্বরে বলে, 'স্যার, আমরা ভাবছিলাম জল নেমে যাবে, তাই আর-কিছু করা হয় নি।'

ডেপুটি কমিশনার নিজের মত করে বুঝে নেন এই মেম্বার পঞ্চায়েতের সভ্য নিশ্চয়ই কিন্তু এখানকার নেতা নয়। নেতা হলে জিপগাড়ি থেকে তার সঙ্গে আসত। কিন্তু পঞ্চায়েতকে না-জড়িয়ে কিছু করাও ঠিক হবে না। এবার ডেপুটি কমিশনার নদীর দিকে তাকিয়ে নিচু স্বরে ডাকেন, 'সান্যাল।'

মইনুদ্দিন ডিলার ভাবে ডেপুটি কমিশনার তাকে বুঝি কিছু বলবেন। সে তার লম্বা ঘাড় ডেপুটি কমিশনারের কাছাকাছি এনে জিজ্ঞাসা করে, 'আমাকে কিছু বললেন স্যার?'

ডেপুটি কমিশনার তার বিপরীত মুখটা ঘুরিয়ে বললেন, 'না। আমাদের ডিস্ট্রিক্ট পঞ্চায়েত অফিসার মিস্টার সান্যাল—'

কথা শেষ হওয়ার আগেই মিস্টার সান্যাল পেছন থেকে এগিয়ে এসে বলেন, 'হাঁ স্যার।'

'এখানে এ্যাভেইলেবেল পঞ্চায়েত মেম্বারদের মিট করুন পঞ্চায়েত অফিসে, আমি আসছি। আর তার আগে নৌকো পাঠান, এখুনি', শেষ কথাটা ডেপুটি কমিশনার বলেন মোবাইল সিবিল এমার্জেন্সির অফিসারকে।

মিস্টার সান্যাল আর সিবিল এমার্জেন্সির অফিসার বাঁধ ছেড়ে চৌপথির দিকে যান। তাঁদের সঙ্গে ভিড়ের অনেকেও সেদিকে যায়। বাকি ভিড়টাকে নিয়ে ডেপুটি কমিশনার দাঁড়িয়ে থাকেন। সেই ভিড়টার ভেতরে থেকেও সেই ভিড়টার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল আবদুল। সে প্রথমে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকে এক পাও সরে নি। তার আশেপাশে, প্রায় গায়ে গা লাগিয়ে এই ভিড়ে যারা ছিল তাদের সবারই মুখ ডেপুটি কমিশনারের দিকে ফেরানো। ডেপুটি কমিশনারের পেছনে যারা তাদের মুখ নদীর দিকে কিন্তু তারা তাকিয়ে আছে ডেপুটি কমিশনারের দিকেই। আবদুল যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখান থেকেই তার উচিত ছিল ডেপুটি কমিশনারের দিকে তাকানো।

একশ চার

বন্যা 'ঘোষণা'—হল কি হল না?

এখন অবিশ্যি আবদুলেব দাঁড়ানোটাব একটা মানে আসে, কাবণ, ডেপুটি কমিশনাবও নদীব দিকেই তাকিয়ে ছিলেন। জলেব বং ঘোলা থেকে ঘোলা, স্রোতেব বেগে সেই বিবাট বিস্তাবেব কোথাও একটা কুঞ্চন পর্যন্ত নেই। মাইল-মাইল বিস্তৃত সেই জল ধাতুপাতেব মত পড়ে আছে স্রোতের বিভ্রম জাগিয়ে। সেই পাঁশুটে বিবর্ণতা আকাশ থেকে নদী আব ডাঙায় ফোঁসফোঁস কবছে। বুঝি, কোথাও কিছু ঘটে গেছে, বা এখনই ঘটবে।

'তা হলি আপনি স্যাব চলেন, ঐখানে বসি সব কথাবার্তা হোক'—মইনুদ্দিন ডিলাব গলাটা ডেপুটি কমিশনাবেব কানেব কাছে এনে বলে।

'ওখান যখন যাবাব যাব। আপনি এক কাজ করুন—এখানে কি চিড়ে আব গুড় পাওয়া যাবে?'

'এখানে পাওয়া যাবে না স্যাব, ঘুঘুডাঙ্গাতে তা হালে রিক্সা পাঠাই?'

'হ্যাঁ, এখুনি পাঠান।'

'হাঁ স্যাব', বলে মইনুদ্দিন ডিলাব ভিড় থেকে বেবতে গেলেই ডেপুটি কমিশনাব বলেন, 'শুনুন, এখন আবাব রিক্সা ভাড়া নিয়ে দবদস্তুব কবতে যাবেন না, যা চায় তাই দিয়ে পাঠিয়ে দিন।'

মইনুদ্দিন বেবতে-বেবতে আবাব ঘুবে দাঁড়িয়ে বলে, স্যাব, ক্যাম্প কি তা হলে আজ থেকেই স্টার্ট হবে?'

'না, না, ক্যাম্প না। তবে লোকজন চবটব থেকে আসবে, সবাই ত আব রান্না কবতে পারবে না। তাদেব জন্যে স্টক করুন। ওয়েদাব ফোবকাস্ট খাবাপ। পাহাড়ে ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছে। জল আবো বাড়বে।'

'আবো বাড়িবে স্যাব?' মহেশ্বরেব জিজ্ঞাসায় কোনো উদ্বেগ নেই যেন।

'বাড়বে না? পাহাড়ে ত ধস নামছে। আপনাদেব ত আজকাল এত বেডিয়ো হয়েছে। গত তিন দিন ধরে শুনছেন না?'

'শুনছি স্যাব,' মহেশ্বব স্বীকাব কবে।

'শুনছেন ত লোকজন সবান নি কেন?'

'বেডিয়োতে কথা ত সব সময় বিশ্বাস না যায়, সেই তানে স্যাব।'

'স্যাব', সিবিল মোবাইল এমার্জেন্সিব অফিসাবটি এসে পেছন থেকে বলে, 'এখানে ত একটা নৌকো পেলাম স্যাব।'

'একটা নৌকোয় কী হবে?' ডেপুটি কমিশনাব জিজ্ঞাসা কবেন। তাবপব বলেন, 'নৌকো কি আছে এখানে? তা হলে সেগুলো নিয়ে নেযাই ত ভাল। দবকাবেব সময় কোথায় পাব—?'

অফিসাবটি মহেশ্ববকে দেখিয়ে বলেন, 'ওঁব একটা নৌকো আছে স্যাব, কিন্তু উনি দেবেন না।'

মহেশ্বব চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। ডেপুটি কমিশনাব একবার মহেশ্ববেব দিকে, একবার অফিসারের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'উনি ত তখন থেকে এখানেই দাঁড়িয়ে আছেন, নৌকো দেবেন না বললেন কখন?'

'স্যাব, নৌকো ত বাইস মিলেব সামনে আছে। ওখান দিয়েই এদিকে বেববে। ওর লোকজন আছে। তাবা বলল, তিনি নৌকো কাউকে দিতে না কবেছেন।' ডেপুটি কমিশনাব একটু বুঝে নেন, তারপর বলেন, 'কী? আপনাব নৌকো দেবেন না নাকি?'

'না স্যার।'

ডেপুটি কমিশনার একটু অবাক হন। কিন্তু অভিজ্ঞতাব জোবে বোঝেন তিনি বাগারাগি করলে হিতে বিপরীত হবে। যদি ঐব নৌকো থাকে তা হলে পঞ্চাযেতেব লোকজনবাই সে নৌকো নিয়ে নেবে।

'সে কি, লোকজনকে বেসকিউ কবতে হবে না?'

'আমার গরুমানষিকও এসকু নাগিবে স্যার। আপনাবা সেনাবাহিনী আনেন স্যার।'

ডেপুটি কমিশনাব হাসাব সুযোগটা নিয়ে বলেন, 'আচ্ছা, এক কাজ করুন। যে-নৌকোটা পেয়েছেন এটা এখনই চবের দিকে ছেড়ে দিন। আর ওঁবটা ত থাকলই। এখানকার একজন কাউকে সঙ্গে নেবেন।' অফিসার চলে যান।

আবদুল বাঁধ থেকে নেমে জলের কিনারায চলে যায়—ও নৌকোয় যাবে। তার দিকে আঙুল দেখিয়ে ডেপুটি কমিশনার জিজ্ঞাসা করেন—'ও যাবে নাকি?' যে ভিড়টা তখনো ছিল তার ভেতর থেকে হাসি ওঠে। মহেশ্বরও হেসে বলে, 'পাগলা—।'

'তা হলে ওকে যেতে দিচ্ছেন কেন?'

'না, না, ও খুব ভাল পারিবে স্যার।'

আবার ওঁদের অপেক্ষা কবতে হয। বেশ কিছুক্ষণ পর দেখা যায় একটা নৌকো ওঁদের বাঁ দিক থেকে বেরিয়ে কুটোর মত দক্ষিণ দিকে ভেসে যাচ্ছে—কিন্তু পাঁচজন লোক লগি দিয়ে নৌকোটাকে উল্টো দিকে ঠেলছে। আবদুল তার জুতোজামা-সোয়েটাবসহ জলে ঝাঁপ দিযে স্রোতেব টানে মুহূর্তে নৌকোটার কাছে পৌঁছে যায।

ডেপুটি কমিশনার পঞ্চায়েতের মিটিঙের জন্যে পেছন ফেরেন। তিনি অন্তত বলতে পাববেন—ফার্স্ট রেসকিউবোটটা স্টার্ট কবে দিযেছেন।

ডেপুটি কমিশনারেব পেছনে-পেছনে মোবাইল সিবিল এমার্জেন্সির অফিসারও হাঁটতে-হাঁটতে বাইরে আসে। এতক্ষণ তাদের সঙ্গে লোকজনের যে-ভিড়টা ছিল সেটা খসে গেছে। কাউকে-কাউকে ডেপুটি কমিশনাবই কাজে পাঠিয়েছেন আব বাকিরা এখন নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে নৌকোটাকে দেখবে।

দুটো দোকানঘবেব ফাঁক দিয়ে ওঁবা চৌপত্তিতে এসে যান। ওঁদেব জিপগাড়িগুলো উল্টো দিকে দাঁড় করানো। তাঁদের দেখে ড্রাইভাববা একটু এগিযে আসে। কিন্তু ড্রাইভাররা ডেপুটি কমিশনারের কাছে পৌঁছনোর আগেই দুদিকের দোকান থেকেই অনেকে বেরিয়ে আসে। আসামেব সিল্কের চাদর গায়ে, লুঙিপরা একজন এসে নমস্কার করে বলে, 'আসেন স্যার, একটু বসে যাবেন।'

ডেপুটি কমিশনাব যদিও বলেন, 'না, এখন আব বসব কী? একটু পঞ্চায়েতে গিয়ে দেখি।' কিন্তু দুইহাত মাথার পেছনে দিযে দাঁড়িযে পড়েন, যেন একটু কথা বলতেই চান।

'আপনি নিজে এসে গেলেন স্যার'—সেই সিল্ক-চাদব গাযে ভদ্রলোকই আবার বলেন।

'না এসে আর উপায় কি?' ডেপুটি কমিশনার হেসে বলেন, 'আমি ত জানিই আপনাদের যত নোটিশই দেয়া হোক, রেডিয়োতে যতই বলা হোক, আপনারা কিছুতেই চর ছেড়ে ডাঙায় উঠবেন না। এতগুলো ফ্লাড কাটালাম আপনাদের সঙ্গে—আর এটুকু বুঝব না?'

ডেপুটি কমিশনারেব সঙ্গে অন্য সবাইও হেসে ওঠে। একটি বাচ্চা ছেলে একটি কাপডিশ নিযে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। সে বোঝে না কাকে দিতে হবে। একজন তার হাত থেকে কাপডিশটা নিয়ে, ডিশের চাটা ফেলে ডেপুটি কমিশনারকে এগিয়ে দেয়। ডেপুটি কমিশনার কাপটা নিয়ে ছোট্ট একটা চুমুক দেন। ইতিমধ্যে একজন বলে, 'স্যার, নিজের ঘরবাড়ি ছাড়িং আসিবার মন চাহে না। মনত খায়, দেখি কেনে আজি সকালটা, আজি রাইতটা—'

'সে ত দেখলেন, তারপব জলে ভাসলে ত সব হবে সরকারের দোষ। আপনাদের পঞ্চায়েতও ত কিছুই করে নি। পঞ্চায়েত অফিসটা কোন দিকে?'

'এই যে স্যার, এই যে, আসেন'—একজন সরে গিয়ে ডেপুটি কমিশনারকে পথ করে দেয়।

ডেপুটি কমিশনার চায়ে শেষ চুমুক দিযে কাপডিশটা কোথাও রাখার ভঙ্গি করতেই একজন হাত বাড়িয়ে নিয়ে নিলে, 'দেখি, একটু পঞ্চায়েতে গিয়ে', বলে ডেপুটি কমিশনার এগিযে যান।

একশ পাঁচ

বন্যার মুখে পঞ্চায়েত

ডেপুটি কমিশনার কয়েক পা হাঁটতেই তাঁর ড্রাইভার পেছন থেকে দৌড়ে এসে বলে, 'স্যার, গাড়িটা নিয়ে আসি?'

ডেপুটি কমিশনার দাঁড়িয়ে পড়ে ড্রাইভারের দিকে ঘুরে বলেন, 'না, না, তুমি এখানেই থাকো। চাটা খেয়েছ?'

ড্রাইভার দাঁড়িয়ে পড়ে ঘাড় হেলায়। ডেপুটি কমিশনার হাঁটতে-হাঁটতে দোকান ঘরগুলো পার হয়ে যান। বাঁয়ের বিস্তীর্ণ বালির চড়ার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেন, 'এই জায়গাগুলো খুব ভাল ধানি জমি ছিল। আটষট্টির ফ্লাডে সব নষ্ট হয়ে গেল। এদিককার ধান ত খুব ভাল ছিল'।

যারা সঙ্গে আসছিল, তাদের ভেতর একজন বলে, 'আপনি স্যাব তখন ছিলেন স্যার এখানে?'

হাঁটতে-হাঁটতে একটু ঘাড় ঘুড়িয়ে ডেপুটি কমিশনাব বলেন, 'আমি তখন প্রবেশনে ছিলাম, সে বছরই ফ্লাড। তাই জলপাইগুড়িতে এলেই মনে হয় ফ্লাড হবে। আপনারা তখন ছিলেন, এখানে?'

এ প্রশ্নের কোনো একটি জবাব হয় না—কেউ-কেউ ছিল, কেউ-কেউ তখন অনেক ছোট ছিল। কিন্তু সকলেবই কিছু-কিছু জানা আছে। সকলে মিলেই জবাব দিতে যায়—ডেপুটি কমিশনাবও একবার বাঁয়ে, একবার ডাইনে ঘাড ঘুরিয়ে যেন সকলেব কথাই শুনতে চান। শেষ পর্যন্ত তাঁব পাশে যে ছিল সেই কথাটা চালিয়ে যেতে পাবে—'আটষট্টিব বন্যাব পব ত স্যার মণ্ডলঘাটেব চেহাবাই বদলি গিসে। কোটত সে পাহাড়েব হাট? কোটত সে সবকাব পাড়া?'

পঞ্চাযেত অফিস এসে যায়। ডেপুটি কমিশনাবকে 'স্যাব, এইখানে স্যাব' বলেই পাশেব লোকটি দৌড়ে পঞ্চাযেত অফিসেব ভেতবে চলে যায়। কিন্তু সে ঢুকবাব আগেই পঞ্চাযেত অফিসেব ভেতব থেকে অনেকে বেবিযে আসে, বাবান্দায। যাবা তাঁব সঙ্গে এসেছিল, তাদেব দিকে ঘাডটা একটু হেলিযে ডেপুটি কমিশনাব বলেন, 'ঠিক আছে। এখন একটু এঁদেব সঙ্গে বসি। আব আপনাবা নিজেবা সব সাবধানে থাকবেন। জলপাইগুডির বন্যা শুনলেই ভয হয।' সবাই একটু হেসে উঠলে ডেপুটি কমিশনার পঞ্চাযেত অফিসের বাবান্দায় ওঠেন।

'কী? আপনারা কজন মেম্বার আছেন?' জিজ্ঞাসা কবে, ডেপুটি কমিশনাব বাবান্দা থেকে পঞ্চায়েত অফিসেব ভেতরে ঢোকেন।

ঢুকে তিনি দাঁড়িয়ে পড়েন, দাঁডিয়ে-দাঁডিয়ে অফিসেব বেড়াগুলো দেখেন। দরজার মুখোমুখি বাঁশের বেডাটাতে লেনিনের একটা রঙিন ছবি বাঁধানো। ডান দিকে সেক্রেটাবিযেট টেবিল, পাশে স্টিলের আলমারি। সেই টেবিলের পেছনের বেড়ায় ওপরে 'বামফ্রন্ট সরকার জিন্দাবাদ' লেখা একটি পোস্টার। ডেপুটি কমিশনার যেখানে দাঁড়িয়ে ার বাঁযে বেডার ওপরে রবীন্দ্রনাথেব একটা রঙিন ছবি—সম্ভবত কোনো ক্যালেন্ডাব থেকে কাটা। বাঁধানো সেই ছবিতে একটা শুকনো মালাও দুলছে।

'স্যার, বসেন স্যার', সেক্রেটাবিযেট টেবিলেব উল্টো দিকের চেয়ারটাকে একটু এগিয়ে দেন একজন।

চেয়ারটাতে বসতে-বসতে ডেপুটি কমিশনাব জিজ্ঞাসা করেন, 'কী, আপনাদের মেম্বাব কে কে আছেন, এখানে?'

দরজাব কাছেব ভিড়টা থেকে একজন এগিযে আসে, 'স্যার, আমরা কয়েকজন মাত্র আছি স্যার, আর দুই জন মেম্বারের বাড়িতে সাইকেল দিযা লোক পাঠানো হইছে স্যাব। কিন্তু তারা এইখানে আছে না টাউনে গেইছে—' মেম্বার বাক্যটি শেষ করতে পারে না।

এর মধ্যে আরো দুজন এগিয়ে এসেছে। ডেপুটি কমিশনার বলেন, 'আপনাবা বসুন।'

সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সামনের চেয়ারের বাঁ দিকের বেড়া ঘেঁষে একটা বেঞ্চ পাতা ছিল। মেম্বারবা সেই বেঞ্চটাতেই বসে। পাশের একটা ঘর থেকে একজন একটা চেয়ার এনে বাখে দেখে ডেপুটি কমিশনার জিজ্ঞাসা করেন, 'ওদিকেও একটা ঘব আছে নাকি?'

'হ্যাঁ স্যাব, ছোটঘব একখান আছে। একটা ঘরত্ ত ভিড় হয়্যা যায়, অফিসের কাজকর্মে বাধা হয়, স্যালায় ঐঠে কাজ হয়।'

ডেপুটি কমিশনার আবার ঘরটার বেড়াগুলোতে চোখ বুলিযে বলেন, 'পঞ্চায়েত অফিসগুলোতে এখনো নতুন ঘরের গন্ধ পাওয়া যায়। তাই না?' সকলে একটু হাসে। ডেপুটি কমিশনার আবার বলেন, 'ঘবটব নোংরা হতে দেবেন না। আব কাগজপত্র জমতে দেবেন না। যা বাজে জিনিস, সঙ্গে-সঙ্গে নষ্ট করে ফেলবেন। একবাব যদি নোংরা জমতে শুরু করে, তা হলে আর কোনো দিন পরিষ্কার করতে পারবেন না। আমাদের কাছারি দেখেন না? এখন হোয়াইট ওয়াশও করা যায় না। হ্যাঁ বলুন। আপনাদের এখানে ত দেখছি আপনারা কোনো ওয়ার্নিঙেই কান দেন নি। এরপর বড় একটি এ্যাকসিডেন্ট হয়ে গেলে, তখন কৈফিয়েত দেবে কে?'

'স্যার, বোধ হয়, এ-ব্যাপাবে কথা বলার জন্যেই আপনার কাছে আজ যাওয়া হয়েছে', একজন মেম্বার বলে।

'এখনো যদি আমার কাছে ছোটেন তা হলে আর পঞ্চায়েত করে লাভ কী হল। আপনাদের এলাকায় বন্যা হলে আপনাদেরই ব্যবস্থা নিতে হবে—'

'না স্যার। হামারালার ত জানা নাই টাকাপয়সার খরচা কতখান চলিবে আর কতখান চলিবে না—'

'প্রথমেই ফান্ডের কথা আসে কোত্থেকে। সে-সব ত পরে পঞ্চায়েত অফিসার এসে আপনাদের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করবেন। তার আগে ত বাঁধের ওপারে, নদীর দিকে যাঁরা আছেন, তাঁদের নিয়ে আসতে হবে। তাঁরা ত দেখলাম ভাবছে ফ্লাড আসবে না। শেষে মাঝরাতে যদি লোক সরাতে হয় তখন কী করবেন? ঐ বাঁধের ওপর একজন ভদ্রলোকের নৌকো চাইলেন আমাদের সিবিল এমার্জেন্সির অফিসার, তিনি আমাকে বলে দিলেন নৌকো এখন তাঁর কাজে লাগবে, নৌকো দেবেন না—'

'কে স্যার?'

'সে আমি কী করে বলব। দেখুন ত আমাদের সিবিল এমার্জেন্সির অফিসার বাইরে আছেন কি না।'

একজন মেম্বার উঠে দরজায় যায়। দরজা থেকেই ডাকে, 'এইঠে আসেন, আপোনাকে স্যার ডাকিছেন।'

সিবিল এমার্জেন্সির অফিসার ঘরে এলে ডেপুটি কমিশনার বলেন, 'আপনি এখনো ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন? ওখানে যান, দেখুন নৌকোটা ঠিক মত ফাংশন করছে কিনা।'

'হ্যাঁ স্যার', বলে ভদ্রলোক বেরিয়ে যান।

'মহেশ্বর জোতদারের নৌকোর কথা কহিছেন স্যার? উমরায় নৌকো দেয় নাই?'

'কে দেয় নি তার নাম আমি জানি না। আমি একটা রেসকিউ নৌকো স্টার্ট করিয়ে দিয়েছি, এবার আপনারা দেখুন আর কোন-কোন পয়েন্টে লোক থাকতে পারে। যদি দরকার হয়, ঐ আর-একটি নৌকোও নিয়ে নিন। অন্তত আজ সন্ধের মধ্যে নদীর দিকে যেন কেউ না থাকে। এই কথাটি বলার জন্যেই আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম।' ডেপুটি কমিশনার চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন। দরজার দিকে পা বাড়াতে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে বলেন, 'আপনাদের লিডাররা কেউ নেই বলে দেরি করবেন না। তাঁরা এলে বলবেন, আমি আপনাদের বলেছি। আর ঘুঘুডাঙা থেকে চিড়েগুড় আনতে গেছে, সেগুলো এসে গেলে যা করার করবেন।' ডেপুটি কমিশনার বারান্দায় এসে দাঁড়ান। সেখানে তখনো অনেকে দাঁড়িয়ে, বসে। রাস্তার দিকে তাকিয়ে ডেপুটি কমিশনার বলেন, 'গাড়িটাকে একটু আসতে বলুন না।'

একশ ছয়

বন্যার কার্যকারণের সেই মুহূর্তটি

অফিসাররা বাঁধটা ফাঁকা করে দিয়ে চলে গেলে জানা জিনিশই আর-একবার জানা হয়, নৌকো করে সরিয়ে আনার মত বিশেষ কিছু দুই নম্বরে আর নেই। মেয়েরা ও বাচ্চারা ত উঠেই এসেছে, চৌপত্তিতে ঘোরাফেরা করছে, পুরুষমানুষরাও আসছে-যাচ্ছে। এখন, ধীরেন সাহার নৌকোটা একবার যায়, তাতে কোনো-বাড়ির জিনিশপত্র কিছু-কিছু আনাও হয়। কিন্তু তারপর নৌকোটা কোথাও নিয়ে যাওয়া হয় যেন বেঁধেছেঁদে তৈরি রাখবার জন্যেই—সিবিল এমার্জেন্সির অফিসারের অনুমতিসহ। যতদিন জল থাকবে, মানুষজনকে যাতায়াত করতে হবে, ততদিনই নৌকোটা সরকারের ভাড়া পাবে। অফিসারের ভাড়া করা নৌকো ত আর পঞ্চায়েত খারিজ করতে পারবে না।

কিন্তু এই অফিসারদের আসা, সিবিল এমার্জেন্সির লাল গাড়ি, নৌকো ভাড়া করা; ঘুঘুডাঙা থেকে চিড়ে আর গুড় আনতে রিক্সা পাঠানো, এর ফলে, যেন বন্যাটা ঘোষণা হয়ে গেল। এই ক-দিনের ঝড়বৃষ্টিতে ও হাঁটুজল থেকে কোমর জলে ডুবেও বন্যাটা যেন ততখানি বন্যা ছিল না, এখন এটা সরকারি বন্যা বলে সাব্যস্ত হয়ে গেল। আরো যদি বাড়ে, তাহলে হেলিকপ্টার আর সৈন্যবাহিনীর কথা আসবে। কোনো বন্যায় কেউ কখনো হেলিকপ্টার দেখে নি, একজন সৈন্যও দেখে নি। কিন্তু মোটামুটি এটাই ঠিক হয়ে গেছে—ঐ দুটো দিয়ে বন্যার আর-এক অবস্থা বোঝানো হবে।

অফিসারদের আসা-যাওয়ায় নদী-আকাশের চেহারাটা যেন আরো সত্য হয়ে ওঠে। নদীর কোনো পার থেকে বাতাসের ছুটে আসা দেখা যায় না, অত প্রবল বাতাসে আকাশের সমস্ত মেঘ তছনছ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু যেন মেঘে তৈরি নয়—এমনই অনড় থাকে এ আকাশ। আর আকাশেও প্রত্যাহত বাতাস এসে আছড়ে পড়ে এই বাঁধে দাঁড়ানো মানুষগুলোর গায়ে।

বাতাসের বিপরীতে বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে একা-একা মহেশ্বর জোতদার চিৎকার করে ওঠে, 'এ্যালায় ত গরুগিলাক আনিবার নাগে হে, হে-এ এ ভাদই'—ভাদই কোথায় না জেনেই।

মহেশ্বর এমন ঘোষণা করেছিল এ-কথা সত্য। বিপরীত ঝঞ্ঝার সে-কথা ভাদইয়ের দিকে না এসে পশ্চিম থেকে পশ্চিমে চলে গেছে—এই ঘটনাও সত্য। সেই মুহূর্তে ভাদই, কান্দুরা আর কানকাটু বাঁধের ঢাল বেয়ে জলে নেমে যায়—এ ঘটনাও সত্য। এই তিনের মধ্যে কার্যকারণেব কোনো সংযোগ না-ও থাকতে পারে। কিন্তু থাকতেও পারে।

এখন ত এখানে রিলিফ ক্যাম্প প্রায় হয়েই গেল—চিড়ে আসছে, গরুর খাবারও নিশ্চয় আসবে, সুতরাং গরুগুলোকে নিয়ে আসা উচিত।

অথবা, শনিবারের বিকেলের এই মুহূর্তে, মহেশ্বর-ভাদই-কান্দুরা-কানকাটু একসঙ্গে বুঝে ফেলে এই মুহূর্তটি আত্মরক্ষার শেষ সময়, যেন তারা সেই অদৃশ্য পাহাড়ের অজ্ঞাত সব নতুন হ্রদের গায়ের ফাটলচিহ্ন দেখতে পেয়ে গেছে, জলের রঙে হঠাৎ যেন তারা মৃত্যু দেখতে পায়, অথবা অনির্দিষ্ট নদীপার থেকে উত্থিত বাত্যার আওয়াজে শুনতে পায় ধ্বংসের ধ্বনি। অফিসারের আসা থেকে ভাদইদের জলে নেমে পড়ার ভিতর হয়ত কোনো কার্যকারণ ছিল না। কত কাকতালীয়কেই ত আমরা কার্যকারণ বলে ভুল করি। অথবা কত কার্যকারণকে আমরা কাকতালীয় মনে করি।

ভাদই, কান্দুরা আর কানকাটু জলে মেনে যায়। জলের বাধাটুকু বাদ দিয়ে, তাদের হাঁটায় কোনো অনিশ্চয়তা থাকে না। পা পায়ের অভ্যাসে পায়ের তলার মাটি চিনে নেয়। কখনো উঁচু, কখনো নিচু, কখনো কোনো গর্তের ভেতর হঠাৎ কোমর পর্যন্ত ডুবে যায়, তারপরই আবার হাঁটু জেগে ওঠে। ওদের তিনজন একই জায়গায় নেমেছিল—কিন্তু ছড়িয়ে গেল তিন দিকে। ভেতরে ছড়ানো উঁচু ডাঙাগুলিতে গরুগুলো ছড়িয়েছিটিয়ে বাঁধা ছিল, সেই সব জায়গা থেকে 'হা-ম্বা' ডাক দীর্ঘায়িত এক কোরাসে ছড়িয়ে পড়ে, যেন ওরা জেনে গেছে এরা তিনজন আসছে। সেই কোরাস থেমে যাওয়ার পর আবার কোনো একক গাভীস্বর মেঘের চাপা ডাকের মত নদীর পারের দিকে ছড়িয়ে পড়ে—সেই সব মেঘের ডাক, যেগুলো আমাদের দেখতে পাওয়া মেঘেরও অনেক ওপরে থাকে। বানভাসি গরুরা বুঝে গেছে, এবার তাদের সরানো হবে। তারা দড়িতে শিং ঘষে মাটিতে ক্ষুর ঠুকতে শুরু করে।

এক গোছা পাটের দড়ি গলায় জড়িয়ে ভাদই আবার ফিরে আসতে হাঁটে। জলের ভেতর ভাদইকে যেন আর অত ছোট দেখায় না, শুধু তার খাটো শরীরে কাঁধের আর হাতের পেশিগুলো ফুলে-ফুলে ওঠে—জল কাটানোর জন্যে ত ভাদইকে দুটো হাত নাড়িয়ে যেতে হয়। ভাদই কোথায় সাঁতরায় আর কোথায় হাঁটে সে ত বোঝাই যায় না, জলে তার এই একবার ওদিকে যাওয়া, আর একবার এদিকে আসা এমনই, যেন, সে জল চষে বেড়াচ্ছে।

বাঁধের তলায় এসে ভাদই মহেশ্বর জোতদারকেই হুকুম করে—'বাঁশ ফেলাও কেনে, বাঁশ ফেলাও।'

মহেশ্বর বাঁশের গোছা থেকে একটি বাঁশ নিয়ে বাঁধের ঢাল বেয়ে নেমে জলের কিনারা থেকে ভাদইয়ের দিকে ছুঁড়ে দেয়। সেটা জলে পড়তেই ভাদই আবার চিৎকার করে, 'আরো ফেলাও কেনে, আরো ফেলাও—'

মহেশ্বরকে আবার উঠতে হয়। আবার একটা বাঁশ নিয়ে সে ঢাল বেয়ে নীচে নামে, এবার জলের কিনারা পর্যন্ত যায় না, সেখান থেকেই গড়িয়ে দেয়—জলে পড়লে ভাদই নিয়ে নেবে। কিন্তু বাঁশটা দুটো কাঁটা গাছে এমনই আটকে যায় যে মহেশ্বরকে আরো খানিকটা নেমে পা দিয়ে সেটাকে গড়িয়ে দিতে হয়।

সেই বাঁশটা ধরতে ভাদইকে বেশ কিছুটা এগিয়ে আসতে হয়, তার কোমর থেকে জল ধীরে-ধীরে নেমে যায়, আর বাঁধের একেবারে কাছাকাছি এসে ভাদই মহেশ্বরের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে ওঠে, 'কায় একখান একখান করি বাঁশ আনিবার ধরিছেন, ফ্যালান কেনে, বাঁশ ফ্যালান।' জলের ভেতর থেকে ভাদই তার এক হাত বাড়িয়ে দেয়। ভাদই বাতাসের দিকে পেছন ফিরে ছিল, তাই তার কথাগুলো

বাতাসের বেগে এসে এই বাঁধটিতে আছড়ে পড়ে। মহেশ্বর এমন ভাবে তার কাপড়টা তুলে হাঁটু ভেঙে বাঁধ বেয়ে ওঠে, যেন মনে হয়, ভাদইয়ের হুকুম এই মুহূর্তে অমান্য করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

মহেশ্বর যখন একবার-দুবার, বাঁধময়, ও দূরেও, তার চোখ ঘোরায় এমন কাউকে দেখতে যে বাঁশগুলো নীচে জলে ভাদইয়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসবে, তখন নীচে, জলের অনেক অভ্যন্তর থেকে কান্দুরা ডাকে—'ভাদইগে—'। ভাদই বাঁধের নীচের জলে আজানু দাঁড়িয়ে হঠাৎ ঘাড়টা ঘুরিয়ে হাঁক দেয়—

'হে-এ-এ'

'ছাড়ু কি না ছাড়ু?'

'না ছাড়ু, না ছাড়ু।'

ভাদইয়ের 'না-ছাড়ু,' আওয়াজটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরও যে প্রলম্বিত ও তীব্র হয় তা প্রতিধ্বনিও হতে পারে। কিন্তু এত বিপরীত বাতাসে প্রতিধ্বনি আসে না। তা হলে হয়ত কান্দুরাই কথাটাকে আর-একটু দূরে কানকাটুর কাছে ছড়িয়ে দিল —এখন গরুগুলিকে ছেড়ো না।

বন্যার জল যখন আসে, তখনও তার আসাটা দেখা যায় না, আসে ত থিতু জলের সঙ্গে বা স্রোতের সঙ্গে মিশে। জলটা শুধু উঁচুতে উঠতে থাকে—কোনো আওয়াজ নেই, কোনো ভাঙন নেই, পাতালের জল যেন উথলে ওঠে। কিন্তু বাতাস ত তেমন নীরবে, অব্যাহত আসে না। একে ত এখন তিস্তার এপার-ওপার সত্যি দেখা যায় না—ঝকঝকে রোদের দিনেও দেখা যায় না। জল বা বালির ঝিকমিকে দৃষ্টি আটকে যায়। এখন ত আরো দেখা যায় না—ছাই রঙের আকাশ নদীর একেবারে ওপরে নেমে মাঝখানে যেন নদীর ওপর দেয়াল হয়ে আছে। আর বাতাস সেই অদৃশ্য দেয়ালের পেছন থেকে তিস্তার এত বড় বিস্তারটা পার হয়ে যায় প্রায় যেন নীরবেই, অথবা, জলের যে-শব্দটা এখন আলাদা করে চেনা যায় না সেই শব্দের সঙ্গে মিশে আত্মগোপন করে। তারপর বাঁধের ওপর আছড়ে পড়ে সংহত সমস্ত শক্তিকে একসঙ্গে মুক্ত করে দিয়ে।

কিন্তু ভাদই-কান্দুরা-কানকাটু যেখানে, নদীর সেই 'শুকনো' খাত, আসলে বড় তিস্তার বুকের চাইতেও নিচু। সেখানে এই বাতাস নেই, এই আওয়াজ নেই। সেখানে জলের আওয়াজ মাটির ভেতর থেকে উঠে আসছে, তারপর ছড়িয়ে পড়ছে এই জলের ওপরেই, বাতাসের সঙ্গে মিশছে না।

মহেশ্বর সেই বাতাসে তছনছ হয়। সে কাউকে দেখতে পায় না। বাঁধে কেউ নেই, সব চৌপত্তিতে। অথবা এই বাতাসে মাথার চুল, কাপড়চোপড়, সমস্ত এমন এলোমেলো হয়ে আছে যে একবার চোখ বুলিয়ে কাউকে চেনা যায় না। মাথার ওপরে এমন বাতাস আর পায়ের নীচে এমন জল না থাকলে মহেশ্বর জোতদারের উচিত একবার চোখ তুলেই হুকুম করার লোক পাওয়া। কিন্তু নীচে জলের মধ্যে ভাদই হাত বাড়িয়ে আছে বাঁশের জন্যে, যে গরুগুলোকে তুলে আনা হবে, তার ভেতর মহেশ্বরের গরুরই সংখ্যা বেশি, এদের দিয়েছে ফসলের ভাগ পেতে। ফসলের ভাগ পেয়ে গেলে জমিব ভাগ কায়েম হয়।

কিন্তু মহেশ্বর এখন ত কাউকে পায় না বাঁশগুলো বাঁধের ওপর থেকে, নীচে ভাদইয়ের কাছে পৌঁছে দিতে। ভাদই হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে। অগত্যা তাকে দুটো বাঁশ দু হাতে নিয়ে এগতে হয়। বাঁধের কিনারায় এসে ঢালের দিকে ছুঁড়ে দেয়। কোথায় পড়ল না দেখে আবার ফিরে যায়। আবার দুটো বাঁশ এনে ঢাল বেয়ে গড়িয়ে দেয়। কোথায় পড়ল না দেখে আবার ফিরে যায়।

মহেশ্বর যখন বোঝে, তাকেই হাতে করে-করে বাঁশগুলো নিয়ে-নিয়ে ভাদইয়ের হাতে দিতে হবে, তখন সে ঠিক করে ফেলে, একটা-একটা করে বাঁশ নেয়ার বদলে বরং সবগুলো বাঁশই বাঁধের ঢালে ছড়িয়ে দিয়ে, পরে, পা দিয়ে দিয়ে গড়িয়ে দেবে। কিন্তু বাঁধের উত্তর দিক থেকে গামবুট আর খাকির মোবাইল সিবিল এমার্জেন্সি চিৎকার করে হাত তোলে। বাতাসে চিৎকারটা শোনা যায় না, হাত তোলাটা দেখা যায়। মহেশ্বর দাঁড়ায়। তারপর দু পা গিয়ে বাঁধের একেবারে মাথায় যে-বাঁশগুলো পড়ে ছিল সেগুলো পা দিয়ে ঢালে নামিয়ে দেয়। দিয়ে, দেখে, একটা বাঁশও জলে পড়ল না।

জলের ভেতর থেকে ভাদই চিৎকার করে ওঠে, 'আরে কী করিছেন, তাড়াতাড়ি দেন কেনে বাঁশ, তাড়াতাড়ি দেন—'

অগত্যা মহেশ্বরকে ঢাল বেয়ে নামা শুরু করতে হয় জলের দিকে, নামতে-নামতে পা দিয়ে

বাঁশগুলোকে সে গড়িয়ে দিতে থাকে। বাঁশগুলো যেন ডাঙায় নেই, জলে আছে—এমন ভাবে ঘুরে-ঘুরে যাচ্ছে। মহেশ্বরকে একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে গিয়ে বাঁশগুলোকে পা দিয়ে ঠেলতে হয়। হয়ত একটু রেগে গিয়েই থাকবে মহেশ্বর। সে বাঁশগুলোকে বেশ জোরে-জোরে লাথি মারে। আর তাতেই দু-একটা বাঁশ ভাদইয়ের হাতের সীমানায় গিয়ে পড়ে। ভাদই দুটো লম্বা বাঁশ তার আগে ভাসিয়ে দিয়ে নিজে সেগুলোর পেছনে ভাসে।

ঠিক সেই সময়ই মোবাইল এমার্জেন্সি বাঁধের ওপর থেকে চিৎকার করে ওঠে, 'এ আপনি কী করছেন, বাঁশগুলো আমাদের লাগবে—কাওশেড করার জন্যে।'

মহেশ্বর বাঁধের ঢাল থেকে মাথা তুলে চিৎকার করে বলে—'এইলা তোমার বাবার তালই রাখি গেইসে এইঠে?'

শোনা গেল না বলে, নাকি মানে বোঝা গেল না বলে, মোবাইল এমার্জেন্সি কানে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'কী বললেন?'

একটা বাঁশ হাতে নিয়ে এমার্জেন্সিকে মারার জন্যেই যেন তুলে মহেশ্বর পেছনে ছুঁড়ে দেয়। বাঁশটি যে জলে পড়ল তার কোনো শব্দও ওঠে না। মহেশ্বর আঙুল এমার্জেন্সির দিকে তুলে জিজ্ঞাসা করে—'তোমার বাবায় আনিছে এই বাঁশ? তোমার বাবায়?' যেন এমার্জেন্সির বাপ বাঁধের ওপরে এমার্জেন্সির পাশেই দাঁড়িয়ে আছে।

এমার্জেন্সি তখনো কানের পেছনে একটা হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'কী বলছেন?'

একটা রাগ দু বারের বেশি তিনি বার করা যায় না। মহেশ্বর এমার্জেন্সিকে আঙুল দিয়ে বাঁশগুলো দেখিয়ে, নদীর ভেতর ভাদইকে দেখায়। তারপর আবার বাঁশগুলোকে লাথি দিয়ে-দিয়ে গড়াতে চায়।

বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে এমার্জেন্সি দেখে।

তারপর, বাঁধের ওপর থেকে দুটো বাঁশ নিয়ে বাঁধের ঢালের দিকে নামে। দু-এক পা নেমে বাঁ হাতের বাঁশটা মাটিতে নামিয়ে রাখে আর ডান হাতের বাঁশটা মাথার ওপর তুলে, দুই হাতে ধরে। তার সামনে যেন কোনো লক্ষ আছে। সেই লক্ষ সে এই ওপর থেকে বিদ্ধ করবে, এমন ভাবে তাক করে। ভাল করে তাক করতে বাঁ-পাটা একটু পেছিয়ে দেয়। বোঝে যে এই ঢালে এর চাইতে শক্ত ভাবে পা রাখতে পারবে না। মোটা শরীরটাকে একটু দুলিয়ে জলের দিকে বাঁশটা ছুঁড়ে দেয়। বাঁশটা বেশ খানিকটা ওপর থেকে বাঁধেব ঢালেই চলে যায়, কিন্তু লম্বালম্বি পড়ে বলে একটা ডিগবাজি খেয়ে জলে পড়ে, ভাদইয়ের বাঁ দিকে, পেছনে। জলে যদি সে বাঁশ ভেসে যায় সেই ভয়ে ভাদই লাফিয়ে এদিকে আসে, একটু যেন সাঁতার কেটেই।

একশ সাত

জলগোধূলি

এখন এই নির্জন বাঁধে, নির্জন বন্যায় ও নির্জন ঝড়ে—জলের ভেতর দাঁড়িয়ে, হেঁটে সাঁতার কেটে ভাদই একটা বাঁশের সঙ্গে আর-একটা বাঁশকে জুড়ে-জুড়ে লম্বা করছে, আর বাঁধের ওপর থেকে মহেশ্বর জোতদার আর এমার্জেন্সি অফিসার ঠেলে-ঠেলে তাকে বাঁশ জোগান দিয়ে যাচ্ছে—বাঁধের ঐ ঢাল বেয়ে, কখনো পা দিয়ে বাঁশ গড়িয়ে, কখনো হাত দিয়ে ছুঁড়ে, কখনো জলের কাছে গিয়ে ভাসিয়ে দিয়ে। ভাদই একটার পর একটা বাঁশ জুড়ে যাচ্ছে আর পাটের দড়ি দিয়ে গিঁঠ দিচ্ছে। বাঁশটা হাতে যাওয়ার পর জোড়া দিয়ে গিঁঠ বাঁধতে তার খুব বেশি সময় লাগছিল না। পিঠের কাছে যে তার কাস্তে গোঁজা ছিল, অথবা, কান্দুরা বা কানকাটু কারো ছিল—সে নিয়ে এসেছে, তা বোঝা যায় যখন ভাদই গিঁঠ বাঁধার পর দড়ি কাটে। এই রকম করে বাঁশ বেঁধে ভাদই নিয়ে যাবে, অন্তত কাছাকাছি কোনো একটা উঁচু জায়গা পর্যন্ত। দু লাইনে বাঁধা বাঁশ বন্যার জলের সঙ্গে-সঙ্গে ভাসবে। এখন গরুগুলোকে এই দুই সারির মাঝখানে ছেড়ে দিলে সবগুলো সিধে বাঁধে উঠবে। না হলে এমন জলেভরা জায়গাটা তাদের এতই অপরিচিত যে একসঙ্গে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে চলে যেতে পারে—বড় স্রোতের দিকে। তখন এই জলের মধ্যে ভাদই-কান্দুরা-কানকাটুর সাধ্যও নেই গরুর পালকে বাঁচায়। দুই দিকে বাঁশের নিশামা থাকলে গরুর

পালের ভুল হবে না। তা ছাড়াও, জল আরো বাড়লে, সব ডুবে গেলে, এই বাঁশের নিশানাটা অন্তত থাকবে—সব ডোবার আগে এই নিশানা ধরেই ত যাতায়াতের দরকার হতে পারে।

ভাদই এই বাঁশের লাইন টেনে নিয়ে গেল সামনের উঁচু ডাঙাটিতে—সেটার ওপরও এখন জল উঠেছে। সেখানে একটা পাতলা বাঁশ কাদায় এমনভাবে গাড়ে যাতে একটু স্রোতেই সেটা নুয়ে যায়। নুয়ে গেলে উপড়ে যাবে না। আর যদি যায়ও, তাহলে বাঁশের লাইনের ওদিকের মাথাটা বাঁধা থাকছে বাঁধের ঢালে। জল উঠলে সেই বাঁধনকে তোলাও যাবে। তখন যদি দরকার হয়, আর, জলের ভেতরেব এই পাতলা বাঁশটাও যদি উপড়ে যায় তা হলে, বাঁধ থেকে এই বাঁশের লাইনটা ধরে অন্তত এই ডাঙাটা পর্যন্ত ত আসা যাবে।

কিন্তু তখন আসার দরকারটা কী? এখন না হয় গরুগুলোকে ঠিক ভাবে নিয়ে যাওয়ার জন্যে লাইন দরকার। যখন সারা তল্লাট জলে ডুবে যাবে, এমন কি বাঁধ থেকেও লোক সরানোব দরকার হতে পারে, তখন, এই বাঁশের লাইন ধরে জলের তলের ঘরবাড়িতে ফিরে যাওয়ার কী দরকাব হবে?

দরকার হোক না-হোক, বাঁশের এই নিশানা ধরে ত সবাই বুঝতে পারবে— ঐখানে জলের নীচে তাদের ঘরবাড়ি, জমিজিরেত।

এখনই সেই সব সম্পত্তির ওপর নদী। উঁচু উঁচু ডাঙাগুলোতে ঘরবাডির চাল দেখা যাচ্ছে, বেড়াগুলোও। নিচু জমির ঘরগুলোর চালের টুই জেগে আছে। জলের চেহারা ভাল নয়। আজ সারাবাত এই বাতাস চলবে, বৃষ্টি চলবে, তাতে এই জল ফুলে উঠবে। সকালে দেখা যাবে—এখানে আর বাড়িঘর বলতে কিছুই নেই, শুধু নদী। তার ওপর এখনো ধস নেমে চলেছে। এমন সব পাহাড়ের গর্তেগুহায জল জমে-জমে যে-হ্রদ হয়ে আছে, সেগুলো একসঙ্গে ফেটে গেলে পাহাড়ের জলে এখানে নতুন নদী তৈরি হবে। ভাদই-কান্দুরা-কানকাটু সেই নতুন নদীর জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে।

নিকটতম একটু ডাঙাতে হাঁটুর ওপর পর্যন্ত ডুবিয়ে ভাদই একটানা লম্বা ডাক দেয় বাঁ থেকে ডাইনে তার মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে—'হে-এ-এ কা-ন-ন্দু-রা-আ-আ- কা-আ-ন-কা-আ-টু-উ-উ-উ।' নদীর ওপারের বাতাস সে আহ্বানকে এই পারে পৌঁছে দেয়, তছনছ করে, যেন ভাদইয়ের আহ্বান এদিকেই ছিল। কিন্তু নদীর ভেতরটা ফাঁকা বলে, ভাদইয়ের বাতাসবিরোধী ডাক কান্দুরা-কানকাটুর কাছে পৌঁছে যায় ঠিকই।

ডেকে ভাদই ওদিককার জলে নেমে পড়ে। সেখানে ডুব জল ও স্রোতের টান। তাতে ভাদই তাব ছোট্টখাট্ট কোমল শরীরটাকে একটা কাঠের মত ভাসিয়ে দিয়ে আরো দূরেব ডাঙাগুলোব কোনো একটাতে চলে যায়, কান্দুরা ও কানকাটুর মতই।

দু রাত্রির বাসি এই ঝড় ও বন্যায় আজকের এই প্রায় শেষবেলায় ওরা যেন শেষবারের জন্যে খতিয়ে নিচ্ছে এই বসতির সীমা-সরহদ্দ—মানুষের দখল থেকে যে-জমি নদী পুনর্দখল কবেছে। সেই সীমাব সবটুকু নয়, কিন্তু বেশ ছড়ানো-ছিটনো অনেকখানিতে, মাত্র তাবা তিন জন এখন জলে সাঁতাব কাটছে বা হাঁটছে বা দাঁড়িয়ে আছে।

তারপর, সেই সব উঁচু ডাঙায় বেঁধে রাখা গরুগুলোকে নিয়ে তারা একসঙ্গে জলে নামে। এ-
আসে সেই উঁচু ডাঙাটার দিকে, যেখানে ভাদই বাঁশ বেঁধে বেখে গেছে।

তারা তিন দিক থেকে আসছিল। কান্দুরা ছিল দক্ষিণের ডাঙায় আর ভাদই ছিল উত্তরের ডাঙায়। কানকাটু মাঝের ডাঙা থেকে গরুগুলোকে জলে নামায়। তিনদিক থেকে জলে নেমে পড়ায় এই এক স্বস্তি যে গরুর পালগুলিকে অন্তত কিছুটা সামলাতে পারবে, চট করে কোনো একটা পাল এদিক-ওদিক চলে যেতে পারবে না। যদি উত্তরের দিকে চলে যায় তাহলেই বিপদ। এদিকে গেলে ত তাও বাঁধ পাবে।

এই তিন-তিনটি পালকে একদিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে হেট হেট হুট হুট করার কোনো দরকার ছিল না, তবু, ভাদই, কান্দুরা আর কানকাটু মাথার ওপর ছড়িমত কিছু একটা ঘোরাচ্ছিল আর জিভ দিয়ে টাকরায় আওয়াজ তুলছিল যেন তারা মাঠ বা রাস্তা দিয়ে পালগুলিকে নিয়ে যাচ্ছে। সেই আওয়াজেই হোক, আর, তাদের সামনে উঁচু বাঁধে এই গৃহপালিত গরুগুলো মাটির ইশারা পায় বলেই হোক, তারা যতটা সম্ভব দ্রুতগতিতে ঐ বাঁধের দিকেই ছুটছিল।

ছোটায় একটাই অসুবিধে ছিল। এই গরুর পালও এই নদীখাত এমন সরাসরি পেরতে অভ্যস্ত নয়। তা ছাড়া, কোথাও, তাদের কারো-কারো বুক জল, কোথাও, কোনো-কোনো বাছুর ডুবে যায়, কোথাও-বা

গাভিনের হাঁটু জেগে ওঠে ও সেই জলস্রোতের মধ্যেও জলস্থলের পার্থক্য না-বোঝা বাছুর, মায়ের বাঁটে হামলায়, পর মুহূর্তেই বাছুরসহ সেই গাই প্রায় পিঠ পর্যন্ত জলের ভেতরে চলে যায়।

কোনো একটি গরুও হা-স্বা ডাকে না, যেন, এই গরুর পাল জানে যে তাদের সমবেত ডাকে, আকাশ আর জলজোড়া বাতাস-বৃষ্টি আর সেই দূর পাহাড়ের গোপন সব হ্রদ সঙ্কেত পেয়ে যাবে। যত দ্রুত সম্ভব তারা এই নতুন নদী পেরিয়ে পুরনো মাটিতে পা রাখতে চায়।

কিন্তু ভাদই, কান্দুরা আর কানকাটুর হয়ত কিছু সাহসের দরকার হয়, একটু অতিরিক্ত সাহসের। একা-একা এই পাহাড়-ভাঙা জল ডিঙতে সে-সাহসের দরকার হয় না, কিন্তু এই এতগুলো গরু নিয়ে এত দিক থেকে এই দৈনন্দিনের বাইরের জলরাশি পেরতে তাদের হয়ত দরকার হয় সেই সাহসের অতিরিক্ততাটুকু। তারা, নদীর ঐ ক্রমবিস্তারের মাঝখানে, পায়ে-কোমরে-বুকে-পিঠে, আর, কখনো সারা শরীরে; ঐ জলরাশির আবর্তনের মাঝখানে, দেখে, এ-আকাশ যেন নদীর ওপর চেপে বসেছে, এরপর যেন নদী ও আকাশের মাঝখানে কোনো রেখাও থাকবে না। ভাদই হাঁকার দিয়ে ওঠে, পার্থক্য এখনো এটুকু আছে এইটি নিজেকে বোঝাতে—'হে-ই, হে-ট, হেট, খবোরদা—আ-রো-হে, খবোরদার—', কান্দুরা চেঁচায—'কানকাটু বাঁয় মারি দে, বাঁয়ে মার।'

যে-জলমগ্ন ডাঙায় ভাদই বাঁশ বেঁধে বেখে গিয়েছিল, গরুগুলো সেখানে উঠে পলমাত্র দেরি না করে হু হু বেগে সেই দুই বাঁশেব লাইনের মধ্যে ঢুকে পড়ে। এতক্ষণ যেভাবে আসছিল, তেমন ছড়িয়ে নয়, দুই বাঁশের ভেতরের সেই জায়গাটুকুতে গায়ে গা লাগিয়ে এই এতগুলো গরু যেন একটা অগ্রসরমাণ সাঁকো হযে যায, মাঝখানে ছড়িয়ে-ছড়িয়ে থাকে কান্দুয়া, ভাদই আর কানকাটু। আচ্ছন্ন আকাশেও এক অদৃশ্য সূর্যাস্ত ঘটছিল। সেই অভ্যস্ত গোধূলিলগ্নে, সেই বিকেলে, সেই প্রবল ঝঞ্ঝায় এই যেন অপ্রাকৃত জলরাশি ভেদ করে ভাদই-কান্দুরা-কানকাটু তাদের ধেনুদল নিয়ে প্রায় ফিরে আসে—

একশ আট

'সীমান্তবাহিনী'র দুই অর্থ

তিস্তার মধ্যে নোয়াপাড়া, মেচিয়াপাড়া, সয়েদপাড়া, দহগ্রাম—এই চারটি চর বা ছিট-মহল। এ নিয়ে ভারতের সুপ্রিম কোর্টে মামলা-মোকদ্দমা পর্যন্ত হয়েছে, কারণ, এই চারটি জায়গা আগেকার পূর্ব পাকিস্তান ও এখনকাব বাংলাদেশকে কোনো এক চুক্তি অনুযায়ী দিয়ে দেয়া হয়েছে। ব্রিটিশ আমলে পাটগ্রাম থানা ছিল জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে। তিস্তা এখানে বরাবরই সীমান্তবাহিনী। মণ্ডলঘাটের পর তিস্তা পুব পারে মেখলিগঞ্জ আর পশ্চিমপারে হলদিবাড়ি এই দুই জায়গার মধ্যে দিয়ে তখনকার কোচবিহার রাজস্টেট, এখনকার কোচবিহার জেলা, পার হয়ে পাটগ্রামের পশ্চিম সীমা দিয়ে রংপুরের দিকে চলে যেত। তখন পাটগ্রামের পশ্চিমের এই নদীই ছিল রংপুর আর জলপাইগুড়ির মাঝখানের সীমান্ত। এই নদীর একেবারে মাঝখানে, পাটগ্রামের একেবারে ভেতরে নোয়াপাড়া, মেচিয়াপাড়া, সয়েদপাড়া, দহগ্রাম ও আরো অনেক নাম-না-থাকা চর আসলে ছিল কোচবিহার রাজ্যের ছিটমহল ও সেই কারণে কোচবিহারের ভারতভুক্তির পর ভারত ইউনিয়নের ও পশ্চিমবঙ্গের অংশ। কিন্তু সে ত ম্যাপের অংশ। অন্য একটা রাষ্ট্রের একেবারে ভেতরে এই কয়েকটি চরের মত ছিটমহলে ভারত ইউনিয়ন বা পশ্চিমবঙ্গ তার নিত্যিনৈমিত্তিক দখল কায়েম রাখবে কী করে? কেনই-বা রাখবে? যে-সব স্থায়ী জায়গা, নদীর গতিপথ বদলানোয়, অনেক দিন ধরে কার্যত নদীর চর হয়ে গেছে অথচ সেটলমেন্টে সে-সব জায়গা মূল ভূখণ্ডের অংশ, তাদের জুরিসডিকশন লিস্ট নম্বর আছে, সেই সব জায়গাই ত ছিটমহল। এই সব মহল ত নদীর ভাঙাচোরায় ছিট হয়ে গেছে। কোথাও এক নম্বর আর পাঁচ নম্বর হয়ত ভারতের, দুই তিন চার হয়ত বাংলাদেশের। আবার কোথাও হয়ত আট নম্বর আর নয় নম্বর বাংলাদেশের, ছয়, সাত আর দশ ভারতের। এই রকম এক-একটা চর নিয়ে এক-একটা রাষ্ট্র হয়ে থাকা দুই রাষ্ট্রের পক্ষেই অসুবিধের। সেই জন্যেই দুই দেশের মধ্যে কিছু লেনদেন সেরে ছিটমহলগুলোকে

যতদূর সম্ভব একটু সাজিয়ে নেয়া হয়েছে। কিন্তু সাজিয়ে নেয়া হলেও ত নদী নদীই থাকে। চর চরই থাকে। আর, নদী নদী থাকলেও বা চর চর থাকলেও ত সেখানে রাষ্ট্র থাকে, রাষ্ট্রের সীমান্ত থাকে, সীমান্তে বর্ডার আউটপোস্ট থাকে। কাস্টমসের লোকজন থাকে, সীমান্তবাহিনী থাকে, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের ক্যাম্প থাকে, সেই ক্যাম্পের নিজস্ব অস্ত্রভাণ্ডার থাকে। তেমনি, আগে যেমন পাকিস্তানের থাকত, এখন তেমনি বাংলাদেশেরও বর্ডার আউটপোস্ট থাকে, কাস্টমসের লোকজন থাকে, বাংলাদেশ রাইফেলসের ক্যাম্প থাকে, সেই ক্যাম্পের নিজস্ব অস্ত্রাগার থাকে।

কিন্তু এত কিছু ব্যবস্থা যে-সীমান্তকে রক্ষা করার জন্যে সে সীমান্তটিই এখানে থাকে না। দুই দেশের আইনসঙ্গত বা বেআইনি যাত্রীরা কেউই এত বর্ডার থাকতে এই চরের বা নদীর জলের বর্ডার পেরতে চায় না। অথচ এই বর্ডার বা নদীর চরে যে-সব মানুষজন থাকে তারা তাদের বাজারের জন্যে বা খাবারদাবারের জন্যে কাছাকাছির বন্দর এলাকায় বা হাটেই ত যায়। না গিয়ে উপায় থাকে না বলেই যায়। এমন-কি ভারতীয় বর্ডার আউটপোস্টের খাবারদাবারের জন্যে, রবি আর বৃহস্পতি, সয়েদের হাটে নৌকো নিয়ে না গিয়ে উপায় থাকে না। সয়েদের হাটটা বসেই একটা অদ্ভুত জায়গায়—ওটা ত পুরোপুরি পাটগ্রাম, কিন্তু ঠিক হাটখোলায় নদীর সঙ্গে লাগানো একটা ফালি আছে ভারত ইউনিয়নের, কারণ, দেশভাগের সময় এই ফালিটা কোচবিহারের ছিটমহলের মধ্যেও আবার ছিল জলপাইগুড়ি জেলার ছিটমহল। সয়েদের হাটটা বসে এই সীমান্ত জুড়ে—তাই হাট করতে-করতেই ভারতীয় ইউনিয়নের বর্ডার আউটপোস্ট আর বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের লোকজন বাংলাদেশে ঢুকে যায় ও বাংলাদেশের বর্ডারের লোকজন ভারত ইউনিয়নে চলে আসে। হাটটা চলেই ত প্রধানত দুই বর্ডারের লোকজনের জন্যে—নইলে এত একটেরে হাটে কি এত পাঁঠা, খাশি বা মুরগি আসে?

হাটখোলটার পশ্চিম দিকটা বাংলাদেশের আর পুব দিকটা ভারতের। ঠিক আধাআধি নয়—বাংলাদেশেরটাই আসল কিন্তু ভারতের দিকে, রাজকিশোরী পাড়ার অংশটাতে, 'মুরগিহাটা। ওদিকেই পাঁঠা-মুরগি, এমন-কি দু-চাবটে গরু-বাছুরও বিক্রি হয়। দু-এক সময় গরুবাছুর নিয়ে গোলমালও বাধে—বর্ডারের চোরাই গরু ধরা পড়ে যায়। দু-একবার বাংলাদেশের চোর, ভাবতে গিয়ে গরু চুরি করে এনে বেচছে, ভারতীয় বর্ডারের লোকরা ধরে ফেলেছে হাটে, তারপর হাটের ভেতরে ভারতের এলাকায় নিয়ে এসে প্রচুর মার দিয়েছে। বাংলাদেশ বর্ডারের লোকজনও এসে সে মারে হাত লাগিয়েছে। আর-একবার এক চোরকে বাংলাদেশেরই বর্ডারের লোকরা ধরে ফেলেছিল কিন্তু সে এক দৌড়ে ভারতীয় এলাকায় গিয়ে নিজেকে ভারতের লোক বলে ঘোষণা করল। এক দেশের নাগরিকতা ত্যাগ ও আর-এক দেশের নাগরিকতা গ্রহণের মত নাটকীয় ঘটনাও কেমন হাসির বিষয়ে হয়ে ওঠে—'উমরায় ত কুচলিহাটার চোরা-বলাই।' চোরা বলাই সম্ভবত স্বনামখ্যাত বলেই আত্মরক্ষার জন্যে এমন একটা উপায় ভাবতে পারে। কিন্তু এই ঘটনায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষীদের একজন চোরা বলাইয়ের ঘোষণাকে মেনে নিয়ে তাকে ভারতীয় নাগরিকের স্বীকৃতি দিয়ে ঘাড় ধরে টেনে এনে তার পাছায় একটা লাথি কষায়—এতটাই জোরে যে সে হাটের এক তরকারিঅলার ঘাড়ে গিয়ে পড়ায় তার কুমড়োগুলো চারদিকে গড়িয়ে যায়। কুমড়োগুলোর কোনো-কোনোটা বাংলাদেশে চলে যায়, কোনো-কোনোটা ভারত ইউনিয়নের ফালি জমির আরো গভীরে। কুমড়োঅলা সেগুলের পেছনে-পেছনে দুই রাষ্ট্রের ভেতরে ছুটোছুটি করবে নাকি পেছন থেকে হঠাৎ তার ঘাড়ে যে চোরা বলাই এসে পড়ল তাকে চেপে ধরবে এটা সাব্যস্ত করতে না-করতেই ভারতীয় সীমান্তরক্ষী এসে চোরা বলাইয়ের চুল ধরে তাকে দাঁড় করায়। এদিকে বাংলাদেশ বর্ডার ফোর্সের লোকজন বলাইকে নিতে এলে ভারতীয়রা বলে, 'দাদা, একে কয়েক দিনের জন্যে ধার দেন, আমাদের ঠাকুরের এসিস্ট্যান্টটা ভেগেছে।'

বাংলাদেশ বর্ডারের লোকজন বলল, 'নিয়্যা যান কেনে দাদা, আপনাদের ক্যাম্পে ফাটক দেওয়া গেইল।' চোরা বলাইয়ের মাথার ওপর নেমে আসে হাট-করার বিরাট ঝুড়ি, এতক্ষণ সেটা এক জোয়ান দড়ি বেঁধে টানতে-টানতে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও একটা সতর্কতা থাকে। সীমান্তের কাছে কোনো হাট সন্ধ্যা পর্যন্ত চলবে না, তার অন্তত ঘণ্টা দু-তিন আগে শেষ হতে হবে, যাতে, হাটের লোকজন সন্ধ্যা হওয়ার আগেই বাড়ি ফিরে যেতে পারে—ভারতীয় বর্ডারের এ-নিয়ম এই হাটেও মানা হয়, যদিও এ হাটটাকে বাংলাদেশের হাট বলার আইনি সুযোগ অনেক বেশি। কিন্তু এই নিয়মটা মেনে নিয়ে দুই বর্ডারের সরকারি লোকজন যেমন তাদের নৌকো করে সেই সয়েদপাড়া-দহগ্রামের

ছিটমহল-চরমহলগুলোতে সীমান্ত পাহারা দেয়ার জন্যে ফিরে যায়, তেমনি, এই বড় চর এলাকার বাসিন্দাবাও নিজ-নিজ জায়গায় ফেরে। হাটে ত শুধু চরের লোকরাই আসে না, পাশাপাশি গাঁয়ের লোকজনও আসে—তারাও হাটশেষে তাদেব গ্রামে পৌঁছয়। সয়েদের হাটের হাটখোলা, হাটের লোকজন, দুই বর্ডাবেব সেপাই-জোয়ান, গরু-পাঁঠা-মুরগি, এমন-কি চোররাও, দুই রাষ্ট্রের এই সীমান্তকে মেনে নিয়েই সীমান্ত লঙ্ঘন করে। তিস্তা এখানে প্রকৃত সমতলেব বিস্তার পেয়েছে। সেই সমতলে, ও সেই বিস্তারে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা জায়গাগুলিতে, সীমান্ত ত একেবারে অনতিক্রম্য ও সুনির্দিষ্ট। তিস্তা সেই অনতিক্রম্যতা ও নির্দিষ্টতাকে অন্য সময় একটা আকারও দেয়। তখন তিস্তার চরের মধ্যে টিনের লাল রং দেখে ভারতীয় বর্ডার ক্যাম্প ও টিনের সবুজ রং দেখে বাংলাদেশ বর্ডার ক্যাম্প চিনে নেয়া যায়। তখন চরের ওপর কাঁটাতারের যে-বেড়া একটা সীমান্তের সঙ্কেত হয়ে থাকে, সেটা মেনে নিয়ে তিস্তাও যেন নিজের ভেতরে একটা অঘোষিত কাঁটাতারের বেড়া তোলে।

কিন্তু এখন বন্যার তিস্তা সেই সমস্ত সীমান্তচিহ্নকে লোপাট করে দেয়। যেমন সূর্যের আলো বা রাত্রির অন্ধকার সীমান্ত মেনে চলে না, তিস্তাও এখন সে-রকম। আজ শনিবারের বিকেল। চারপাশ থেকে তিস্তা এই চরগুলোব ওপর উঠে আসছে, কোনো একটি চরের ওপর নয়—সেই নাউয়াপাড়া থেকে ঐ নীচের ছয় নম্বর দহগ্রাম পর্যন্ত সবগুলো চরের ওপর দিয়ে তিস্তা বয়ে গিয়ে ছিটমহল, চরমহলের আন্তর্জাতিক সমস্যা দূব করে দেবে। বুধবার থেকে জল বাড়ছে। কিন্তু এখানকার বৃষ্টি ত থেমেও গিয়েছিল। বৃহস্পতিবার শেষ বাত থেকে হঠাৎ আকাশ ক্রমেই বিবর্ণ হতে শুরু করে আর বাতাস যেন খুবলে মাটি তুলে ফেলতে চায়। এখন এই শনিবারের বিকেলে ঘোলা আকাশ আর ঘোলা তিস্তা মিলে যেন একটা সুড়ঙ্গের মত হয়েছে।

একশ নয়

বাংলাদেশের দূত ইন্ডিয়ায়

ভারতের সীমান্ত চৌকিতে রেডিও-টেলিফোন বেজে ওঠে। এক্সচেঞ্জে কেউ ছিল না। এখন ডিউটি কিশোবীচাঁদের, সে কম্যান্ড্যান্টের ঘরের সামনে অন্যদের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল। একটা এল-প্যাটার্ন ব্যারাকের মাথায় কম্যান্ড্যান্টের ঘর আর তার সমকোণে, শেষে 'এক্সচেঞ্জ'—সুতরাং ফোন বাজলে শুনতে পাওয়ারই কথা। কিন্তু বাতাসটা বিপরীত দিকে ধেয়ে যাচ্ছিল আর কম্যান্ড্যান্টের ঘরে এরাও নিজেদের মধ্যে জোরে-জোরে কথা বলছিল—তাই ফোনের বাজনা আর শোনা যায় না।

ওপরে ভামনির ছাউনি আর পাশে বাঁশের বেড়া দিয়ে এই একটাই ব্যারাক—এই ব্যারাকের দক্ষিণ আর পুবের দিকটা অফিস আর পশ্চিম ও উত্তর দিকটা 'প্রাইভেট'। আসলে ভামনির ঘর একটা—সেই ঘরটা দুভাগ করা, বাঁশের বাতার পার্টিশন দিয়ে। এই 'প্রাইভেট'-দিকে অবিশিষ্ট একটা ঘর খুব লম্বা—সেখানে জওয়ানরা থাকে। অফিসের দিকের মাঠটা পরিষ্কার—এক দিকে ভলি আর ফুটবল খেলার মাঠ, তারও পরে অনেকটা দূর পর্যন্ত মাঠটা ঘাসেঘাসে ছড়িয়ে গেছে। সেখানকার ঘাসগুলো বড়—কয়েকদিনের বৃষ্টিতে নেতিয়ে আছে। তারও পরে কাঁটাতারের বেড়া। প্রাইভেট-দিকটাতে একটা আলগা ঘর—রান্নার জন্যে। আর-একটা ছোট আলগা ঘর—ইটের দেয়াল, চুনকাম করা, লাল টিন, একটা বারান্দা, একটা কোল্যাপসিবল গেট, তার পেছনে একটা কাঠের দরজা—এই ঘরটাতেই বন্দুক ও হয়ত আরো কিছু অস্ত্র থাকে। বারান্দায় দুজন শাস্ত্রী পোশাক পরেই পাহারা দিচ্ছে।

এই ছোট ঘরটা ও শাস্ত্রীরা ছাড়া আর-কোথাও রাষ্ট্রব্যবস্থার কোনো পরিচয় নেই। এমন-কি কম্যান্ড্যান্টের অফিসের সামনে লোহার যে-ফ্ল্যাগস্টাফটিতে ভারতের জাতীয় পতাকা রোজ সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত ওড়ে, সেই ফ্ল্যাগস্টাফটি ভিজে ও তার গায়ের দড়িটি স্যাতসেঁতে হয়ে আছে! বৃষ্টির জলে ফ্ল্যাগস্টাফের রং অনেকটা ধুয়ে গেছে—শাদা রঙের মাঝে-মাঝেই লোহার দাগ। ফ্ল্যাগস্টাফটা একটা সিমেন্ট-বাঁধানো বেদির ওপরে। বেদিটাকে গোল করে ইটের কেয়ারি—এক দিকে একটু ফাঁক। ২৬ জানুয়ারি ও ১৫ আগস্ট ওখান দিয়ে গিয়ে কম্যান্ড্যান্ট পতাকা উত্তোলন করে। অন্য দিন নাইট ডিউটির

সেন্ট্রি পতাকা তুলে দিয়ে ডিউটি থেকে অফ হয়। গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে ফ্ল্যাগস্টাফের কেয়ারি কাদায় ঢাকা পড়েছে। ফ্ল্যাগ গত কয়েকদিন তোলা হচ্ছে না। প্রথম দিনের বৃষ্টিতেই এত ভিজে গেছে যে কম্যান্ড্যান্টের অফিসের বেড়ায় শুকোবার জন্যে গুঁজে দেয়া হয়েছিল। বুধবারে শুকয় নি। বৃহস্পতিবারে দিনের বেলায় শুকবার আশা ছিল, কিন্তু তারপরই ত এই বৃষ্টি-বাতাস শুরু হল। এখনো ফ্ল্যাগটা শুকতে দেয়াই আছে—কিন্তু একটা ছোট লাঠিতে ফ্ল্যাগটা ঝুলিয়ে দিয়ে লাঠিটা বেড়ায় গুঁজে দেয়া, যেন বাইরে বৃষ্টি বলে অফিসের ভেতরে ফ্ল্যাগ তোলা হয়েছে। ফ্ল্যাগটা একটা বড় ভেজা ন্যাতার মত নেতানো। রংগুলোও একটু মিশে গেছে। গেরুয়াটার ভেতরে সবুজের ছোপ, বা সবুজের ভেতরে গেরুয়ার ছোপ অত চোখে নাও পড়তে পারে কিন্তু শাদার ভেতরে গেরুয়া আর সবুজের ছোপ খারাপ লাগবে। ক্যাম্পে আর 'স্পেয়ার' নেই। নতুন ফ্ল্যাগ চাইতে হবে।

এখন চরের মত হয়ে গেলেও আসলে ত এটা ছিটমহল, এখানকার মাটি তাই পুরনো ও শক্ত, তিস্তার বেলেমাটির মত আলগা নয়। গাছগাছড়ায় পুরো গ্রামটি ঘেরা। শুধু ঘেরাই নয়, ভরাও। সীমান্তের নিয়মঅনুযায়ী এই আউটপোস্টের ভেতরের প্রায় সমস্ত গাছ কেটে ফেলা হয়েছে—যে দুটি-একটি গাছ এদিকে-ওদিকে ছড়ানো সেটাও ক্যাম্পের দরকারেই। একটা বিরাট আমগাছ—কম্যান্ড্যান্টের 'প্রাইভেট'-এর সোজা পশ্চিমে, প্রায় নদীর কাছাকাছি। ওখানে চাঁদমারি হয়। আর-একটা বড় সিসু গাছ থেকে গেছে ঐ বন্দুকের পাকা ঘরের পেছনে সিধে উত্তরে। কেন, তা এখন আর অনুমান করা যায় না। কিন্তু এ-রকম দু-একটি গাছ বাদে ক্যাম্পের চারপাশ, চারপাশেই অন্তত মাইলখানেক জায়গাও, একেবারে খোলামেলা। সেই ঘাসবনের সীমানায় কাঁটাতারের বেড়া ঘেঁষে খুঁটির ওপর গার্ডরুম—একটা পুবে, একটা পশ্চিমে। সেখানে দুই শাস্ত্রীর রাতদিন বাইনোকুলার নিয়ে পাহারা দেয়ার কথা। কোনো দিনই কেউ ওখানে একা-একা বসে থাকে না। যার নাইটডিউটি থাকে সে আর-কাউকে সঙ্গে নিয়ে রাতটা ওখানে ঘুমিয়ে আসে। এখন ত কোনো কথাই নেই—ক্যাম্প ভাসতে বসেছে, এখন আবার গার্ডরুম কী?

ভারতের সীমান্ত চৌকিটাই এ রকম একটু বেখাপ্পা ও একটেরে, কারণ, এখানে দেশ নেই কিন্তু সীমান্ত আছে—তিস্তার যে-ঘোলাটে স্রোত এই সীমান্তের ওপর আছড়ে পড়ে বাঁয়ে-ডাইনে ভাগ হয়ে যাচ্ছে সেটাকে যদি দেশ বলে ধরা যায়, তা হলে অবিশ্যি দেশ আছে। কিন্তু শীতের সময় যদি-বা পাতলা, শুকনো, মাঝে মাঝে বালি-বেরনো ঐ নদীটাকে দেশ বলে মনে হতেও পারে, এখন ত মনে হচ্ছে ঐ নদীর মুখ থেকে ভেতর দিকে যত সরে যাবে তত বাঁচবে—সেই ভেতরটাই যেন দেশ। কিন্তু এই দ্বীপের মত ছিটমহলেরও মাত্র একটা অংশে ইন্ডিয়া, বাকি সবই ত বাংলাদেশের।

ফলে, বাংলাদেশের সীমান্ত চৌকিটার প্রাধান্য অনেক বেশি। তারা ত নিজেদের দেশের ভেতরে বসে-বসে নিজেদের সীমান্ত পাহারা দিচ্ছে। তাদের ত আর কোনো সময় মনে হয় না যে তারা দেশের বাইরে গিয়ে দেশকে পাহারা দিচ্ছে। এমন-কি, এখন যে তিস্তার বন্যা সেই ইন্ডিয়া থেকে এত জল নিয়ে এই বাংলাদেশের দিকে ধেয়ে আসছে, আজ এই শনিবার বিকেলে আর ভরসা হচ্ছে না যে রাতের ঘণ্টা কটা নিরাপদে কাটবে, আর এখন তাড়াতাড়ি, সন্ধ্যা হওয়ার আগেই একটা কিছু উপায় ভেবে রাখতে হচ্ছে—তাতেও ত ভারতের সীমান্তচৌকির সমস্যা আর বাংলাদেশের সীমান্তচৌকির সমস্যা এক নয়। বাংলাদেশের ওরা হয়ত সবাই মিলে এতক্ষণ নৌকোয় ডাইনে-বাঁয়ে কোথাও পার হয়ে গেছে। ইন্ডিয়ার ত পার হওয়ারও জায়গা নেই, পার হতে হলে সেই বাংলাদেশেরই কোথাও যেতে হবে। সপ্তাহে একদিন বা দুদিন কয়েকজন মিলে হাট করে আনা এক জিনিশ, আর সেখানও ত আইনের এই ছুতোটুকু থাকে যে হাটটা অর্ধেক ভারতে বসে, সুতরাং বেআইনি চালান বন্ধ করার জন্যে তারা রাউন্ডে যায়। কিন্তু তাই বলে পুরো ক্যাম্প তুলে দিয়ে বাংলাদেশেরই এক জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নেয়া ত আর যায় না। আবার, না নিয়ে উপায়ই বা কী?

কম্যান্ড্যান্ট বলে, 'এক কাজ করো। তোমরা এখন নৌকোটা নিয়্যা ওপার যাও। কয়েকটা শিফটে যত জন পারো যাও। আমি বাকিদের নিয়্যা এইখানে থাকি। রাত্তিরে যদি জল ঘরে ঢোকে, তখন আমরাও নৌকায় চইড়্যা বসব।'

বিভূতি ঘোষ বয়স্ক লোক। সে বলে, 'কথাটা মন্দ বলেন নি। তা হলে রাতে না গিয়ে এখনি চলে যান না!'

'কোথায় যাব ?' কম্যাভ্যান্ট জিজ্ঞাসা করে।

'রাতের ঐ অন্ধকারের মধ্যে, তখন পুরো ফ্লাড, যেখানে ভেসে যাবেন।'

কম্যান্ড্যান্ট তার চেয়ারে হেসে দুলে-দুলে ওঠে, 'ঘোষের কথা শুনো।'

'তা হলে আর এত মিটিংটিটিঙের দরকাব নাই, যা হওয়ার তা হবে', বটুক বর্মন বলে ওঠে।

'কী হবে তা ত বোঝাই যাচ্ছে। কী নিত্যানন্দ, বলো আবার, গাঁয়ের লোকজন কী করছে ?'

'নদী ত দক্ষিণের গাঁয়ে তখনি ঢুকে গেছে—আমি ত সেই সকালে দেখে এসেছি। তারপর জল ত আরো বাড়ল। দক্ষিণের লোকজন বলছিল—তাদের গরুবাছুর ক্যাম্পের মাঠে এনে রাখবে।'

'তা আনে নাই যখন, জল কমতেও পারে,' কম্যান্ড্যান্ট বলে, 'কী বলো বিভূতি ঘোষ ?'

'আপনার ত দেখছি বেশ আমোদ হয়েছে। এখন ইলিশমাছ আর খিচুড়ি হলেই হয়।'

'আরে ফ্লাডেই যদি মরতে হয় ইলিশমাছ খায়্যা মরাই ভাল,' কম্যান্ড্যান্ট চেয়ারের মধ্যে হেসে ওঠে।

এমন সময় আপাদমস্তক ওয়াটার প্রুফে মোড়া একজন একটা সাইকেলে চড়ে হুড়মুড় করে এসে নামে। সাইকেলটাকে সিঁড়িতে রেখে লোকটি বারান্দায় ওঠে। বারান্দায় উঠে সে তার ওয়াটারপ্রুফের টুপি খোলার পরও কেউ চিনতে পারে না। তারপর ওয়াটারপ্রুফের বোতাম খুলতেই বটুক বর্মন বলে ওঠে, 'আরে আজিজ, তুমি ?'

'আর আজিজ ? রেডিও-টেলিফোন বাজি-বাজি হায়রান হই গেসি। স্যালায় সাইকেল নিগি রওনা দিছু। উঃ কী বাতাস। কম্যান্ডার পাঠি দিসে।'

একশ দশ

ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ বার্তাবিনিময়

'সে কী ? তোমরা ফোন করছিল্যা নাকি ?' কম্যান্ড্যান্ট চেয়ার থেকে পা নামিয়ে জিজ্ঞাসা করে। আজিজ তখন ভেজা ওয়াটারপ্রফুটা কোথায় রাখবে সেই জায়গা খুঁজছিল, শেষে আর জায়গা না পেয়ে ফিরে গিয়ে তার সাইকেলের সিটের ওপরই রাখে। এমনভাবে ভাঁজ করে রাখে আজিজ, যাতে বাইরের দিকটা বাইরে থাকে।

আজিজের পরনে লুঙি, স্যান্ডো গেঞ্জি আর গামবুট। লুঙিটা ভাঁজ করে কোমরে গোঁজা। এইবার আজিজ কম্যান্ড্যান্টের দিকে তাকিয়ে বলে 'তোমরালার টেলিফোন কি অফ করি রাখিছেন ?'

'কেন ? অফ কেন ? কার ডিউটি ছিল ?' কম্যান্ড্যান্ট তার চেয়ারের দুই হাতল ধরে জিজ্ঞাসা করে একটু উঁচু গলায়। কিশোরীচাঁদ ভিড়ের ভেতর থেকে এক্সচেঞ্জের দিকে সরে যায়। কিন্তু তাড়াতাড়ি হেঁটে বা দৌড়ে যায় না। তা হলে ত ধরাই পড়ে যাবে ডিউটি তার ছিল। তা ছাড়া বাংলাদেশের ক্যাম্প থেকে এই দুর্যোগে মেসেঞ্জার এল কেন সেটাও সে জেনে যেতে চায়। এমনিতে এ ক্যাম্পে কে কোথায় কখন ডিউটি করছে তা নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই—রুটিন কাজগুলো হয়ে গেলেই হল। কিন্তু বাংলাদেশের ক্যাম্প থেকে ফোন করে না পাওয়াটা সাধারণ ব্যাপার না। তার ওপর আবার ফোন না পেয়ে সাইকেল চড়ে মেসেঞ্জার এসেছে।

আজিজ তখন বলছে, 'স্যার, কম্যান্ডার সাহেব জানিবার চাহেন তোমারালার পাছত কোনো ফ্লাড ওয়ার্নিং আসিছে কি আসে নাই ?'

'কেন ? তোমাদের কাছে কিছু এসেছে নাকি ?' কম্যান্ড্যান্ট একটু ঝুঁকে পড়েন।

'সে ত বাবু কহিবার প্যারিম না। মোক কহি দিছে তোমারালার ওয়ার্নিং আসিছে কি আসে নাই পুছিবার তানে,' আজিজ বলে। কম্যান্ড্যান্ট একটু ভাবে, তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেন—'এই, এক্সচেঞ্জে কে আছে ? কোনো ওয়েদার মেসেজ আসছে না কি ?'

ততক্ষণে কিশোরীচাঁদ এক্সচেঞ্জের কাছে চলে গেছে। সেখান থেকে সে জবাব দেয়, 'না, আসে নাই।'

'তুমি ত ফোনের কাছে ছিলাই না, জাইনল্যা কেমন কইর্‌য়া ?' কম্যান্ড্যান্টের গলায় আধা-তিরস্কার।

'আমি ত এখানেই ছিলাম', কিশোরীচাঁদ এক্সচেঞ্জের দরজা থেকে গলা তুলে বলে।

'ছিল্যা ত ছিল্যা। এখন দেখো, কোথাও ফ্লাডের কোনো খবর পাও কিনা—কোচবিহার দেখো, জলপাইগুড়ি হেডকোয়ার্টাস দেখো। আজিজ, তোমাদের কোনো খবর নাই ?' কম্যান্ড্যান্ট জিজ্ঞাসা করে।

'খবর আর কোটত পাম ? এ্যালায় ত দুই নম্বর ভাসি গেইসে।'

'দুই নম্বর ? ভাইস্যা গিছে ?' কম্যান্ড্যান্ট দাঁড়িয়ে পড়ে, 'সেখানে ত তোমাগো অনেক লোক।'

'হ্যাঁ, সগায় আসি ক্যাম্পত ভিড় করিবার ধরোছে।'

'তোমাদের ক্যাম্পে দুই নম্বরের লোকজন আইস্যা গিছে ? সাইরছে। তা হালি ত এই ক্যাম্পতেও আইসবার ধরব', কম্যান্ড্যান্ট এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, 'এ-ই দ্যাখো ত দক্ষিণপাড়ার খবর কী ?' কম্যান্ড্যান্ট চিৎকার করে বলে। এখানে যে-ভিড়টা জমে ছিল সেটা ধীরে-ধীরে কেমন সরে যায়। এক বিভূতি ঘোষ দাঁড়িয়ে থাকে। কম্যান্ড্যান্ট বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতেই বৃষ্টির ছাঁটটা আচমকা বাতাসে এদিকে ফেরে, কম্যান্ড্যান্ট তাড়াতাড়ি পেছিয়ে আসে, আজিজ দেয়ালের দিকে মুখ করে আর ঘোষ ঘরের ভেতর ঢোকে।

'স্যার, কম্যান্ডার কহি দিছেন, আপনার সঙ্গে ফোনে কথা কহিবার চান। উমরায় ফোনের পাশতই আছেন আপনি ফোন ধরিলেই কাথা কহিবার পারিবেন।'

'আরে, তাই নাকি, খাড়াও, তা হইলে কথা কয়্যাই নেই', কম্যান্ড্যান্ট ফোনের দিকে হাত বাড়াতেই আজিজ বাধা দিয়ে বলে, 'স্যার, আমার আর-একখান ম্যাসেজ আছে স্যার, সেইটা শুনি ফোনখান ধরেন।'

'আছে নাকি ? কও, কও।'

'স্যার, কম্যান্ডার বলিছেন, এ্যালায় রাতিভর পানি বাড়িবার ধরিবে, এ্যানং বাতাস দিবা ধরিছে, তোমরালার ক্যাম্পের সগায় হামরালার ক্যাম্পে আজি রাতিত্‌ সাগাই নিমন্ত্রণ খাইবেন।'

'অ্যাঁ ? সাগাই দিছে তোমার কম্যান্ড্যার ?' হে-হে করে হেসে ওঠে কম্যান্ড্যান্ট।

'হ্যাঁ, স্যার, সগায় আজি হামরালার ক্যাম্পত চলেন, ওইঠে রাতিটা থাকিবেন, কালি সকালে বাও-জল কমিলে এইঠে আসিবেন।' আজিজ তার মেসেজ শেষ করে।

'আরে শুইনছ বিভূতি ঘোষ, সারা ক্যাম্পডা তুইল্যা যাইতে হবে, কাম দেখছনি ?' বলে কম্যান্ড্যান্ট আবার হে-হে করে একচোট হেসে ওঠে। তার হাসিতে মনে হয়, এটা বাইরের দুর্যোগের কোনো ব্যাপার নয়, ফুর্তির ব্যাপার।

'আপনি ত চিল্লিয়েই যাচ্ছেন, ও যে আপনাকে একটা ফোন করতে বলল,' বিভূতি ঘোষ কম্যান্ড্যান্টকে মনে করিয়ে দেয়।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলো ত কানেকশন করতে', কম্যান্ড্যান্ট ফোনের দিকে আঙুল দিয়ে দেখায়। বিভূতি ঘোষ রিসিভারটা তুলে বলে, 'বাংলাদেশকে কানেকট করো,' তারপর কম্যান্ড্যান্টকে বলে, 'ধরুন।' কম্যান্ড্যান্ট তখন আজিজকে বলছিল, 'তোমরা কি পাঁঠাটাঠা কাইট্যা সাগাই ডাইকতে বারাইছ ?' এই কথাটা শেষ করতে-করতে হাতটা বাড়িয়ে দিলে বিভূতি ঘোষ রিসিভারটা ধরিয়ে দেয়।

রিসিভারটা একটু ধরে থেকে কম্যান্ড্যান্ট চিৎকার করে ওঠেন, 'হ্যা হ্যাঁ', তারপর গলাটা নেমে আসে, 'ইয়েস, ইন্ডিয়া স্পিকিং, ইন্ডিয়া স্পিকিং, ইন্ডিয়া স্পিকিং। হ্যালো, কম্যান্ড্যান্ট ইন্ডিয়ান বর্ডার আউটপোস্ট, দহগ্রাম, স্পিকিং'। তারপর হঠাৎ গলা চড়িয়ে দেয় কম্যান্ড্যান্ট, যেন ভিড়ের মধ্যে খুঁজতে-খুঁজতে, যাকে খুঁজছিল তাকে পেয়ে গেছে, 'আরে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মোতাহার ভাই ? আরে , আজিজ আইসছে ত, কয়, সবার নাকি সাগাই খাওগার কথা হ্যা হ্যা হ্যা', কম্যান্ড্যান্ট হাসতে থাকে। বিভূতি ঘোষ নিচু স্বরে বলে, 'উনি কী বলতে চাইছেন, সেটা আগে শুনে নিন, তারপর হাসুন।' শুনে, কম্যান্ড্যান্ট হাসি থামিয়ে বলে ওঠে, 'হ্যাঁ, কলেন, কী হইল ?' তারপর রিসিভারে শুধু 'হুঁ, হুঁ' করে যায়। টেলিফোন থেকে একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। বাইরের বাতাস কোনো বাধার সামনে আচমকা পড়ে গিয়ে আওয়াজ তোলে, আবার কোথাও প্রয়োজনের চাইতে বেশি চওড়া পথ পেয়ে কেমন হা-হা করে ওঠে। ফোনে বাংলা দেশের কম্যান্ডারের গলা বাইরে থেকেও বোঝা যাচ্ছিল,

ঘোষ সেটা কান পেতে শোনে।

গোঁ-গোঁ আওয়াজটা থেকে যায়। এবার ভারতের কম্যান্ড্যান্টকে জবাব দিতে হবে কিন্তু কম্যান্ড্যান্ট চট করে যেন জবাব খুঁজে পায় না। একটু চুপ করে থাকে, তারপর বলে, 'হ্যালো, মোতাহার ভাই?' ওদিক থেকে আবার সেই গোঁ গোঁ আওয়াজ আসে—একটু সময়ের জন্যে। কম্যান্ড্যান্ট আবার একটু সময় নেয়, তারপর বলে, 'মোতাহার ভাই, আমাদের হেডকোয়ার্টাসে ত ফোনের কোনো লাইনই পাচ্ছি না, আপনি বলতেছেন ক্যাম্প, মানে আমাদের ক্যাম্প ভাসিবেই?' আবার সেই গোঁ-গোঁ আওয়াজ। কম্যান্ড্যান্ট যেন হঠাৎ জবাবটা পেয়ে যায়।

'হ্যালো মোতাহার ভাই। আমি এড্ডু সবার সাথে কথা বইল্যা নেই, দেখি জলপাইগুড়ি বা কোচবিহারের সঙ্গে কনট্যাক্ট করা যায় কিনা। তাবপর আপনারে ফোন দিব নে।'

বাংলাদেশ থেকে আবার গোঁ গোঁ আওয়াজ আসে।

'না, না, হাফ অ্যান আওয়ার, না, ধরেন ফিফটিন মিনিটস পরে আপনারে ফোন করব। না। বুঝছি ত, দেরি হয়্যা গেলে সব দিকেই লোকসান। তবে, আমার একটা রিকুয়েস্ট। যদি আমাগো আপনাদের ঐখানে শিফট কইরতেই হয়, তা হালে আমাগো র‍্যাশন আমরা সঙ্গে নিয়্যা যাব।'

বাংলাদেশ থেকে আরো একটা সংক্ষিপ্ত গোঁগোঁর পর কম্যান্ড্যান্ট আবার 'হে হে' হাসি শুরু করে কিন্তু শেষ করতে পারে না, 'আচ্ছা, রাখি।' রিসিভারটা রেখে দিয়ে রিসিভারে হাত রেখেই কম্যান্ড্যান্ট ঘোষকে বলে—'সবাইরে ডাকো। ওরা শিফট কইরব্যার কয়। ফ্লাড নাকি সামনে বাড়তেছে। রাত্তিরে নাকি এই ক্যাম্পে জল ঢুইকবে।'

একশ এগার

ইন্ডিয়ার গোপন আলোচনা

কম্যাণ্ড্যান্ট টেবিলেব সামনে তার চেয়ার ছেড়ে টেবিলের উল্টোদিকের চেয়ারে এসে বসে দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে। বিভূতি ঘোষ সবাইকে খবর দিতে যাওয়ায় এখন কম্যাণ্ড্যান্টের চোখের সামনে ক্যাম্পের মাঠটুকু, মাঠটুকুর শেষের ঘাসবন, ঘাসবনের শেষের গাছগাছালি। কিন্তু সেই গাছগাছালি দেখাচ্ছে যেন দিগন্তসীমা—বাতাসে বৃষ্টির ছাঁট এত ছড়াচ্ছে। এমন কি সামনের ঐ ঘাসবনটাই যেন অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে মাঝেমধ্যে। ক্যাম্পেব এই মাঠটুকুতে ঘাস বা গাছ নেই বলে বাত... আর বৃষ্টির পাক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বাতাস এত জোরে আছড়ে পড়ে এত দ্রুত পাক খাচ্ছে যে বৃষ্টির জল কুয়াশার মত জমাট বেঁধে বাতাসের ধাক্কায় আবার আবর্তের মত হয়ে যাচ্ছে। কম্যাণ্ড্যান্ট যেন এই প্রথম বৃষ্টিটাকে বুঝতে চায়।

দরজা থেকে আজিজ বলে, 'স্যার, মুই যাছ?' তার গায়ে ওয়াটার প্রুফ, মাথায় টুপি

'অ্যা? হ্যাঁ, হ্যাঁ। তোমার সাহেবরে সালাম দিও আজিজ।'

'হ্যাঁ স্যার, দিম।'

কম্যাণ্ড্যান্ট তাকিয়ে দেখে আজিজ সাইকেলটা ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, বাতাস সাইকেলের হ্যাণ্ডেলটা ঘুরিয়ে দিচ্ছে যেন। যাবে কী করে, আসার সময় ত বাতাসটা পিঠে ধাক্কা দিয়েছে, এখন তা বুকে দেবে।

কম্যাণ্ড্যান্ট সেটা দেখতে-দেখতেই আজিজ তার চোখের আড়ালে চলে যায়। আজিজকে সারাটা রাস্তা হেঁটেও যেতে হতে পারে। হতে পারে না, হেঁটেই যেতে হবে। সাইকেলটা এখানে রেখে গেলে পারত; তা হলে তাড়াতাড়ি যেতে পারত।

বিভূতি ঘোষ ঘরে ঢুকে কম্যাণ্ড্যান্টের পেছনে চলে যায়, তারপর কোণ থেকে একটা টুল টেনে নিয়ে বসে বলে, 'ওরা বলল কী, ফ্লাড আসবেই?'

'হুঁ।'

'আমাদের রেডিয়াতেও ত তাই বলছে।'

'হুঁ।'

'তা হলে ত শিফট করা ছাড়া কোনো উপায় নেই।'

'হুঁ।'

'তা হলে আবার সবাইকে ডাকলেন কেন?'

কম্যাণ্ড্যান্ট কোনো জবাব দেয় না। আসলে সে একটা দ্বিধার মধ্যে পড়েছে। যদি ক্যাম্প তুলে দিয়ে ওদের ওখানে শেলটার নিতে হয়, সেটা তারই সিদ্ধান্ত। ক্যাম্পের আর সবাইও বলবে—কম্যাণ্ড্যান্টের হুকুমে গিয়েছি। কিন্তু গেলে ত ওই কয়েক ঘণ্টার জন্যে বা রাত্তিরের জন্যে ইন্ডিয়ার সীমান্তে কোনো পাহারা থাকবে না।

ক্যাম্পের অন্য অনেকে একে-একে এসে যায়—অনেকে বলতে জনা দশবার মাত্র। তার মধ্যে কাস্টমসের একজন আছে। কেউ-কেউ ঘরের ভেতর এসে দাঁড়ায়, কেউ-কেউ দরজার বাইরে। যারা দরজার বাইরে তারা চিৎকার করে, 'কী বলবেন স্যার বলুন, বৃষ্টিতে দাঁড়ানো যাচ্ছে না এখানে।'

'তা ওখানে বৃষ্টিতে ভিজতে-ভিজতে আর কথা কইবা কী কইর‍্যা, ভিতরে আস, ভিতরে আস', বলে চেয়ার থেকে উঠে কম্যাণ্ড্যান্ট নিজের চেয়ারে গিয়ে বসে। কম্যাণ্ড্যান্ট এতক্ষণ যে-চেয়ারে বসে ছিল, সেটা বিভূতি ঘোষ টান দিয়ে পেছনে নিয়ে যায়। কাস্টমসের ভদ্রলোক ভেতরে ঢুকে সেই চেয়ারটিতে গিয়ে বসে। তার পেছন-পেছন আর-সবাইও ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে। কম্যাণ্ড্যান্ট বলে, 'দরজাটা বন্ধ কইর‍্যা দ্যাও।'

দরজার কাছে যে-ছিল সে দরজাটা আবজে দেয়।

'শুইনছ ত সব, তা হইলে কও তোমরা, কী করা যায়?'

'এর আবার বলা-কওয়ার কী আছে? ফ্লাড আইসলে ত সামনের উঁচু ডাঙায় উঠতেই হবে।'

'তোমরা শুইনছ ত, বাংলাদেশের কম্যাণ্ড্যার আমাদের অনুরোধ কইরছে আইজ রাইতডা তাদের ক্যাম্পে কাটাইতে।'

'ত তাই চলুন। যেতে হলে ত এখনই যেতে হবে। না হলে সন্ধ্যা হয়ে গেলে ত আরো বিপদ।'

'পুরা ক্যাম্পে তালা মাইর‍্যা চল্যা যাব সবাই?' কম্যাণ্ড্যান্ট জিজ্ঞাসা করে, 'আসলে জলপাইগুড়ির সঙ্গে একটা কনট্যাক্ট হইলেই আর-কোনো ঝামেলা হইত না। কিন্তু হেডকোয়ার্টার্সের পার্মিশন ছাড়া ক্যাম্পটা এ-রকম বন্ধ কইর‍্যা দিব?' কম্যাণ্ড্যান্ট চুপ করে, অন্যরাও সমস্যাটা নিয়ে ভাবে।

'এই, কে ছিলা এক্সচেঞ্জে?' কম্যাণ্ড্যান্ট সবার দিকে তাকায়।

'আমি ছিলাম', কিশোরীচাঁদ বলে। বাতাসের ধাক্কায় দরজাটা এত জোরে খোলে যে পাল্টা ধাক্কায় আবার বন্ধ হতে যায়। এবার একজন দরজাটা এঁটে বন্ধ করে ছিটকিনিটা লাগিয়ে দেয়। ফলে, বাতাসের আওয়াজটা কম আসে।

'কী? কোনো মেসেজ দিব্যার বা নিব্যার পারল্যা?'

'না, না। কিসের? অল ডেড।'

'কোচবিহারও ডেড?'

'যাহা কোচবিহার, তাহা জলপাইগুড়ি। স্যার, এই রকম ফ্লাডে আবার কবে আমরা মেসেজ পাই? সব জায়গাতেই ত জল।'

'হ্যাঁ। আর মনেই-বা রাইখছে কেডা যে এইখানে তিস্তার মুখে একখান ইন্ডিয়া আছে?' কম্যাণ্ড্যান্টের গলায় যেন একটু বিষাদ। সেই বিষাদে সে একবার দরজা দিয়ে বাইরে তাকাতে চায়। দরজাটা বন্ধ থাকায় বাইরেটা দেখা হয় না বটে কিন্তু তার তাকানোটা থাকে।

'তা হলে করবেনটা কী, সেটা ত আপনাকেই ঠিক করতে হবে, টাইমও ত আর নেই—', বিভূতি ঘোষ টুল থেকে বলে।

'আচ্ছা, এই নিয়ে এত ভাবার কী আছে? এখানে ফ্লাডের জল আসছে— আপনারা কি ফ্লাডে ভাসবেন নাকি? যদি ভাসতে চান, ভাসুন, আর যদি ভাসতে না চান বাংলাদেশের ক্যাম্প চলুন', কাস্টমসের লোকটি বলে।

কম্যাণ্ড্যান্ট তার দিকে একটু তাকিয়ে থাকে। তার তাকানোতে বোঝা যায় সে অন্য কিছু ভাবছে।

'আপনি ত ভাবছেন ইন্ডিয়া ছেড়ে বাংলাদেশে গিয়ে উঠবেন কিনা। তা এখানে ত আপনার বাংলাদেশ ছাড়া অন্য কোনো দেশই নেই। উঠবেন কোথায়? কাস্টমসের ভদ্রলোক আবার বলে।

কম্যাণ্ড্যান্ট তার দিকে তাকিয়েই ছিল। এবার তার ঠোঁটে একটু হাসি দেখা যায়।

'আর ক্যাম্প ছাড়ছেন কোথায় ? বাংলাদেশের ক্যাম্প থেকে টর্চ ফেললেই ত দেখা যাবে। রাতে না হয় একবার এসে দেখে যাবে কেউ', কাস্টমসের লোকটিই আবার বলতে থাকে, 'ব্যাপারটা ত রাতের কয়েক ঘণ্টা, এই নিয়ে এত ভাবার কী আছে ?'

'যদি হেডকোয়ার্টার্স থিক্যা কোনো মেসেজ আসে ?' কম্যাণ্ড্যান্ট জিজ্ঞাসা করে।

'নো রিপ্লাই হবে। বুঝবে ফ্লাডে সব নষ্ট হয়ে গেছে', বটুক বর্মন জবাবটা দেয়।

কম্যাণ্ড্যান্ট সোজা হয়ে বসে, 'শোনো, তা হলে এখনই মুভ করো। সবাই ফুল ইউনিফর্মে—'

'ইউনিফর্ম ভিজে ত ঢোল হয়ে য্যাবে', বটুক বর্মনই বলে।

'ক্যান ? তোমাদের ওয়াটারপ্রুফ নাই নাকি ? না। ইউনিফর্ম ছাড়া বাংলাদেশের ক্যাম্পে যাওয়া যাবে না। ফুল ইউনিফর্ম উইথ আর্মস।'

'আর্মস নিগি করিবেনটা কী ?'

'এতগুলা আর্মস আমি কি এইখানে খালি রাইখ্যা যাব নাকি ? তা হালে যাওনের কাম নাই।' কম্যাণ্ড্যান্ট তার সিদ্ধান্ত জানায়।

'আমরা নেয়ার পরও ত থাকবে—সেগুলো ?'

'সে-সব আমি অর্ডার দিচ্ছি। তিনজন এক্সট্রা সেন্ট্রি ডিউটিতে থাকব আর্মারির ছাদে, ঐখানে ত্রিপল ফিট করো। কুইক। আর সবাই ইন ফুল ইউনিফর্ম উইথ আর্মস টু বাংলাদেশ ক্যাম্প,' কম্যাণ্ড্যান্ট উঠে দাঁড়ায়।

একশ বার

'টু বাংলাদেশ উইথ আর্মস' : আয়োজন

গত কয়েকদিন ধরে সারাটা ক্যাম্প এই বৃষ্টি আর বাতাসে যেন ধীরে-ধীরে চাপা পড়ে গিয়েছিল। বুধবারের কথা ছেড়ে দিলেও বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে এই বৃষ্টি ক্যাম্পটাকে যেন গিলে ফেলল। বোধহয় এর ভেতরে একটা নিয়ম সকলের অজ্ঞাতেই কাজ করে। সাধারণত রাতভর বৃষ্টি হয়ে সাকালে রোদ ওঠে। তাতে কারো কিছু এসে যায় না, বরং রাতের বৃষ্টিতে একটু আরামে ঘুমনো যায়। সারা বর্ষাকালে দু-চারবার রাতের বৃষ্টি সকালে ছাড়ে না, সারা দিন হয়ে সন্ধের দিকে হয়ত ধরল, বা, সে রাতেও হয়ে, তার পরদিন সকালে বেশ পরিষ্কার হল। তাতেও কারো কোনো কাজ আটকায় না—বর্ষার মধ্যে অন্তত দু-চারবার এ-রকম বৃষ্টি না হলে চলবে কেন ? কিন্তু দু-রাতেও যে-বৃষ্টি থামে না, তৃতীয় রাত্রির দিকে গড়িয়ে যায় আর সে রাত পোহানোর পরও দেখা যায় আকাশটা নেমে এসেছে, বাতাসের জোর আরো বেড়েছে আর বাতাসের বেগে বৃষ্টির জল আকাশেই এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে—সে-বৃষ্টি তখন ধীরে-ধীরে পুরো ক্যাম্পটাকে দখল করে নেয়। এমনিতেই ত কাজকর্ম কিছু নেই। তবু সকালের পি-টি, সপ্তাহে একদিন রুট মার্চ, তরি-তরকারির বাগান করা, ডিউটি শিফ্‌ট, দিনরাত ধরে এক-একটা গ্রুপের সীমান্ত এলাকায় চৌকি দেয়া—এ-সব কাজের মধ্যে দিনটা ত একরকম ব্যস্ততাতেই কেটে যায়। কিন্তু এ-রকম বৃষ্টিবাতাসে সেই সব কাজই একে-একে বন্ধ হয়ে যায়। পি-টি সবচেয়ে আগে বন্ধ হয়, রুটমার্চের কথাই ওঠে না, ডিউটি-শিফট নিয়মমত হয় বটে কিন্তু আর্মারির বারান্দায় ছাড়া অন্য কোথাও সেটা বোঝাও যায় না, দু-একটা গ্রুপ ওয়াটার প্রুফ চাপিয়ে ছোটখাট চৌকিতে বেরয় বটে কিন্তু সে শরীরের খিল ভাঙবার জন্যে। খাওয়াদাওয়াও একঘেয়ে হয়ে আসে। রাতদিন শুয়ে-বসে বা তাস্ খেলে সময় আর কিছুতেই কাটে না। এক এক সময় মনে হয়—এ-ক্যাম্পে বোধহয় জনমনিষ্যি থাকে না। আলসেমি কাটানোর জন্যে হঠাৎ-হঠাৎ কারো চিৎকার-চেঁচামেচি ছাড়া মানুষজনের স্বাভাবিক স্বর শোনাই যায় না।

কম্যাণ্ড্যান্ট হুকুম দেয়া মাত্র হঠাৎ সারাটা ক্যাম্প যেন জেগে উঠল। বাতাসের ভেতরও যাতে শোনা যায় এমন চড়া গলায় ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি শুরু হয়ে গেল। যে-মাঠটা গত কয়েক দিন ধরে খালি

পড়েছিল, সেখান দিয়ে ওয়াটার প্রুফ মাথায় দৌড়ে চলে যায় কেউ। কেউ আবার পিঠের দিকটাতে ওয়াটার প্রুফের ঢাকনি দিয়ে জলের ছাঁট আটকে বারান্দায় কোনো কাজ সারে। পেছনের দিক থেকে নানা রকম চিৎকার আর আওয়াজ উঠতে শুরু করে। বাংলাদেশের ক্যাম্প থেকে নিমন্ত্রণ অন্তত পুরো ক্যাম্পটাকে জাগিয়ে দিল।

উপেন, রামাশিস আর আসিন্দির আর্মারির ছাদে উঠে ত্রিপল খাটাচ্ছিল। ছাতের ওপরেই লোহার পাইপ থাকে, সে পাইপ ফিট করার জন্যে ছাদের মধ্যে বড় নল লাগানো আছে। সেই নলগুলোর মধ্যে পাইপগুলো ঢুকিয়ে নাটবল্টু লাগাতে হয়। উপেন নাটবল্টু লাগাচ্ছিল আর টাইট দিচ্ছিল। আর রামাশিস ও আসিন্দির তলা থেকে কাঠের মই বেয়ে ত্রিপল টেনে তুলছিল। ত্রিপলটা ভারী—মাঝখান দিয়ে একটা ছোট বাঁশ চালিয়ে দু জনে কাঁধে করে সেটা তুলছিল। রামাশিস ওপরে, আসিন্দির নীচে। মইয়ের মাঝামাঝি উঠতেই রামাশিসের দিক থেকে ত্রিপলটা গড়িয়ে আসিন্দিরের দিকে চলে যায়। ফলে ত্রিপলের পুরো ওজনটাই আসিন্দিরের ওপর চাপে।

'খাড়া কেনে, খাড়া কেনে,' বলতে-বলতে আসিন্দির ডান হাত দিয়ে বাঁশটা উঁচু করে ধরে চেঁচায়, 'তিরপলখান টানি নে রামাশিস, টানি নে।'

রামাশিস মইয়ে হেলান দিয়ে ডান হাতে বাঁশটাকে ধরে রেখে, বাঁ হাতে ত্রিপলটা টানে কিন্তু নাড়াতে পারে না। আর-একবার জোরে টানে, তাতেও ত্রিপলটা নড়ে না।

'কিয়া ? তিরপল ঠিক হ্যঁায় ত রে ?' রামাশিস জিজ্ঞাসা করে।

'আরে ঠিক না-ঠিক সে ত টাঙিবার তানে দেখিম, এলায় বাঁশখান নামি দাও কেনে।' আসিন্দিরের কথা শুনে রামাশিস তার দিকের বাঁশটাকে মইয়ের ওপরে রেখে এবার মইয়ে হেলান দিয়ে দুই হাতে ত্রিপলটাকে টানে। প্রথম টানটা একটু সাবধানে দেয়। তার গায়ে ওয়াটার প্রুফ, পা খালি। জোরে টান দিলে যদি পিছলে যায়, তা হলে মই থেকে উপুড় হয়ে ত্রিপল-আসিন্দির সব নিয়ে একেবারে মাটিতে পড়বে। প্রথম টান দিয়ে একটু বুঝে নিয়ে সে দু হাতে দ্বিতীয় টানটা দিতেই ত্রিপলটা সড়াৎ করে সরে আসে।

'ঠারো, ঠারো,' বলে রামাশিস এবার তার বাঁশটাকে মইয়ের আরো উঁচুতে তুলে দিয়ে ত্রিপলের পাশ দিয়ে দু ধাপ নেমে, ত্রিপলের তলা দিয়ে বাঁশটা ধরে।

'হাঁ, থোড়াসে টান লাগাও,' বলে সে বাঁশটাকে পেছনে টানে, আসিন্দিরও বুঝে বাঁশটা ধরে থাকে। এবার রামাশিস বাঁ হাতে বাঁশটাকে উঁচু করে ধরে, 'উঠো, আভি উঠো', বলে মইয়ের সিঁড়ি ভাঙে।

এ-রকম করে রামাশিস তিনটি সিঁড়ি ভাঙতেই বাঁশের মাথাটা ছাতের ওপর উঠে যায়। রামাশিস বলে, 'থোড়াসে নামাও', আসিন্দির নীচে নামায়। মাথার বাঁশটা ছাতের ওপর পড়ে। রামাশিস চেঁচায়, 'এ উপীন, পাকড়ো ভাইয়া, জলদি।' উপেন এসে বাঁশের মাথায় পা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তার হাতে রেঞ্চ আর প্লায়ার্স। আসিন্দির আর রামাশিস এবার বাঁশটাকে উঁচু করতে-করতে মইয়ের সিঁড়ি ভাঙে। তাদের দিকের বাঁশটা উঁচু হতে থাকে। ত্রিপলটা গড়িয়ে গিয়ে ছাতের ওপর পড়ে। উপেন বাঁশটা ধরে নেয়। বাঁশটাকে ছাতের ওপর ফেলে দিয়ে সে আবার নাটবল্টু টাইট করতে যায়।

ছাতের পুব সীমায় আর পশ্চিম সীমায় তিনটে-তিনটে ছটা টিউব দাঁড় করানো, মাঝখানেরটা উঁচু, দুপাশে সমান মাপের নিচু। এই ছটা লাগানো হয়ে গেলে আবার আড়াআড়ি তিনটে লাগানো হবে—তার ওপর দিয়ে ত্রিপলটা ফেলা হবে। উপেন খাড়া টিউব সবগুলোই লাগিয়ে ফেলেছিল। রামাশিস সেগুলো নাড়িয়ে-নাড়িয়ে দেখে আবার পুবের দুটো টিউবের গোড়া টাইট করে। ততক্ষণে আসিন্দির আর উপেন আড়াআড়ি টিউবটা নিয়ে প্রথম লাইনের খাড়া টিউবের সঙ্গে লাগাতে থাকে। এই লাগানোর জন্যে টিউবের মাথাগুলির মাঝখানে কাটা ও দুদিকে ফুটো। নাটবল্টুগুলো উপেনের পকেট। সে পকেটে হাত দিয়ে একটা নাট বের করে টিউবগুলোর মধ্যে দিয়ে ঢুকিয়ে হাতে বল্টু লাগায়। সেজন্যে আসিন্দিরকে বিপরীত দিকে টিউবটা উঁচু করে ধরে রাখতে হয়।

এক দিকের বল্টু লাগিয়ে আসিন্দিরের দিকে এসে সে-দিকের টিউবগুলোতে নাটবল্টু উপেন লাগানো শুরু করতেই রামাশিস এসে উপেনের হাত দিয়ে লাগানো নাটবল্টু টাইট দিতে থাকে।

আসিন্দির গিয়ে ত্রিপলটার ভাঁজ লম্বালম্বি খুলতে শুরু করে। খুলতে গিয়ে তাকে ত্রিপলটা দু হাতে একটু টেনে আনতে হয়—তার পর ভাঁজ খুলে-খুলে এগিয়ে যায়। ভাঁজটা খুলে ফেলার পর আসিন্দির

দেখে দড়ি নেই। এখন ত্রিপলের দুই মাথায় আর মাঝখানে দড়ি বেঁধে টিউবের ওপর ফেলে ওদিক থেকে টানতে হবে। আসিন্দির মইয়ের দিকে যেতে-যেতে বলে, 'খাড়াও কেনে, মুই দড়ি আনিবার যাছু।'

আসিন্দির নাইলনের দড়ি নিয়ে আসতে-আসতেই রামাশিস আর উপেনের টিউব ফিট করা হয়ে যায়। তারপর দড়ি বেঁধে টেনে তুলতে গিয়ে ত্রিপলটা ঠেকে যায়। আসিন্দির দড়িটা পরের টিউবের সঙ্গে বেঁধে ত্রিপলটাকে বাঁশ দিয়ে খোঁচাতেই সেটা টিউবের ওপর উঠে যায়। তখন আবার তার পরের টিউবে, যেটা একটা উঁচু সেটাতে তুলতে হয়।

আর্মারির ছাতে ত্রিপলের ছাউনি উঠে যায়।

একশ তের

বাংলাদেশ অভিমুখে কুচকাওয়াজ

ইতিমধ্যে সেই ফ্ল্যাগ তোলার মাঠে বা পি-টির মাঠে একে-একে সবাই এসে জড়ো হচ্ছে। এখন আর-কেউ বৃষ্টির জন্যে বারান্দায় দাঁড়িয়ে নেই, বরং, সকলেরই বারান্দা ছেড়ে মাটিতে নামার তাগাদা যেন বেশি। প্রত্যেকেই ইউনিফর্ম পরে নিয়েছে, পায়ে গামবুট আর গায়েমাথায় ওয়াটারপ্রুফ। বিভূতি ঘোষ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হুইসল বাজাচ্ছে।

বটুক বর্মন, পরশমণি সুন্দাস, আষাঢ়ু, সুভদ্র আর পঞ্চানন টানতে-টানতে ও ঠেলতে-ঠেলতে একটা ঠেলাগাড়ি নিয়ে আসছে পেছন থেকে। গাড়িটা দেখতে অনেকটা জিপগাড়ির সঙ্গে লাগানো ট্রেইলারের মত। বড়-বড় টায়ারের চাকা, সামনে কাঠের দুটো উঁচু দণ্ড, জোয়ালের মত—সেটা ধরে টানা যায়, বা গাড়ির পেছনে লাগিয়ে নেয়া যায়। ওরা গাড়িটা টেনে এনে রাখে। তারপর আবার ফিরে যায়।

এবার ওরা একে-একে কাঁধে করে-করে আনতে থাকে দুটো পাঁঠা, দু-বাণ্ডিল কলাপাতা, পলিথিনের চাদর দিয়ে মোড়া ছোট-ছোট কিছু প্যাকেট। পাঁঠাদুটো গাড়ির মধ্যে প্রথমে এদিক-ওদিক তাকায়, তাবপর পাশের ঢাকনাটা পা দিয়ে টপকাতে চায়। কিন্তু বারকয়েক পিছনে গিয়েই বোঝে যে ওখানে ওঠা যাবে না। তখন গাড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভ্যা-ভ্যা করে বারকয়েক চেঁচিয়ে চুপ করে যায়। বোধহয় ঐটুকু সময়ের মধ্যে ওদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন না হওয়ায়, বিপদের আশঙ্কাটাও ওদের কেটে যায়। তবু চাপা গলায় একটা ছোট 'ভ্যা-ভ্যা' ডেকে দেয়, একসঙ্গে নয়, একটার পর আরেকটা।

অনেকেই ততক্ষণে বৃষ্টির মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে পড়ছে। বাতাস তাদের গায়ের ও... ঝাপটা লাগাচ্ছে, বৃষ্টির ছাঁট তাদের মুখের ওপর এসে সুচ বেঁধায় কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাদের যেন এই বৃষ্টিতে ও হাওয়াতে দাঁড়াতেই ভাল লাগছে। এতগুলো লোকের এই বৃষ্টিতে মাঠে এসে দাঁড়ানোর মধ্যেই যেন বৃষ্টি ও বাতাসকে অস্বীকার করা আছে।

কম্যাণ্ড্যান্ট তার ঘর থেকে নীচে নামে, সিঁড়ি দিয়ে, একটু ধীরে-ধীরে। তার গায়েমাথায় কোথাও ওয়াটারপ্রুফ কিছু ছিল না। সিঁড়িয়ে পা দিতেই বৃষ্টি আর হাওয়ার মধ্যে পড়ে যায়। এক জওয়ান দৌড়ে গিয়ে কম্যাণ্ড্যান্টের ঘরের মধ্যে ঢুকে ওয়াটারপ্রুফ নিয়ে বেরিয়ে আসে। তখন বৃষ্টি আর হাওয়ার মধ্যেই কম্যাণ্ড্যান্ট সেই গাড়ির দিকে খানিকটা এগিয়ে গেছে। জওয়ানটি পেছন থেকে ওয়াটারপ্রুফটা মেলে ধরে ডাকে, 'স্যার।' কম্যাণ্ড্যান্ট দাঁড়িয়ে হাত দুটো পেছনে মেলে দেয়, 'এ-বৃষ্টি কি আর এই কোটে ঠেকবেনে?' বলতে-বলতে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কম্যাণ্ড্যান্ট কোটটা পরে, কিন্তু বোতাম লাগায় না, তারপর টুপিটা নিয়ে ভেজা মাথায় চাপাতে গেলে জওয়ানটি বলে ওঠে, 'স্যার, মাথাটা মোছেন।'

কম্যাণ্ড্যান্ট হাত বাড়ায়। সে দৌড়ে গাড়িটার কাছে গিয়ে একটা পলিথিনের ব্যাগ থেকে তোয়ালে নিয়ে ছুটে আসে। কম্যাণ্ড্যান্টও দু পা এগিয়েছে। দাঁড়িয়ে পড়ে মাথাটা মুছে টুপিটা চাপায়।

'কী ঘোষ? চলো, স্টার্ট দাও। তোমার ব্যবস্থা-ট্যাবস্থা কী কইরল্যা?'

'আর্মারিতে ডিউটি দেবে তিনজন-না, ছয় জন। আর্মারির ওপরে ত্রিপল টাঙানো হয়েছে। জল যদি আর্মারিতে ঢোকে তা হলে আর্মস এমিউনেশন ছাতে তুলে রাখবে। এই ত ব্যবস্থা। আর-সবাই যাচ্ছি।'

'তা হলে চলো, আর দেরি কইর‍্যা লাভ কী?'

গাড়িটার ভেতর থেকে একটা পাঁঠা নিচু স্বরে ডেকে ওঠে, 'ভ্যা-অ্যা।' অন্য পাঁঠাটি যেন সেই ডাকের সঙ্গত রাখার জন্যে আরো নিচু স্বরে আরো সংক্ষিপ্ত ডাকে, 'ভ্যা।'

'কী? ফল ইন করাব নাকি?' ঘোষ জিজ্ঞাসা করে।

'করো, বেশ মার্চ কইরতে-কইরতে যাওয়া যাবেনে,' কম্যাণ্ড্যাট বলে।

'ফল ইন করলে ঐ গাড়ি নেয়া যাবে কী করে?' বটুক জিজ্ঞাসা করে।

কম্যাণ্ড্যান্ট ঘোষের দিকে তাকায়। কম্যাণ্ডান্ট বলে, 'তা হালি এমনিই চলো।'

ঘোষ হুইসল মুখে দিয়ে হুইসল নামিয়ে আনে, 'না। ফল ইন করতে হবে। ফল ইন করে আর্মারিতে গিয়ে আর্মস নেয়া হবে, তারপর আবার ফল ইন। তারপর ডিসপার্স।'

কম্যাণ্ডান্ট ঘাড় হেলাতেই ঘোষ চেঁচিয়ে হুকুম দেয়—'ফ-অ-ল ই-ন্।'

যারা দাঁড়িয়ে ছিল তারা দুজন করে দাঁড়িয়ে পড়ে। যারা তখনো ঘরে ও বারান্দায়, তাদের ভেতব একটা তাড়াহুড়ো পড়ে যায়। কেউ-কেউ বারান্দা থেকে লাফিয়ে মাঠে নামে, নেমেই দৌড়য়। বাতাসের আওয়াজের চাইতেও গামবুটে কাদা ভেঙে দৌড়নোর আওয়াজ প্রবল হয়। সেই আওয়াজের মধ্যেই ঘোষের হুকুম আবার শোনা যায়—'অ্যাটেনশন।'

তখনো ভেতরের দিক থেকে কারো-কারো দৌড়ে আসার আওয়াজ বাঁধানো বারান্দা দিয়ে ধপ-ধপ করতে-করতে ছুটে আসে, তারপর আচমকা থেমে যায়। বারান্দা থেকে মাঠে লাফিয়ে নেমে তারা লাইনের পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়। ঘোষের হুকুমে লাইনটা চলতে শুরু করে। ঘোষ পাশে-পাশে হাঁটতে-হাঁটতে 'লেফট' 'লেফট' করতে-করতে আর্মারির দিকে এগয়। লাইনটা যখন আর্মারির সামনে পৌঁছয় তখনো একজন এক হাতে এক জোড়া গামবুট ঝুলিয়ে খালি পায়ে জলের মধ্যে দৌড়তে-দৌড়তে লাইনের শেষে এসে দাঁড়ায়।

আর্মারি থেকে যে-যার রাইফেল নিয়ে বেরিয়ে এসে আবার লাইনে দাঁড়ানো শুরু করে। আর্মারির ভেতরে লাইন বেঁধেই সবাই একে-একে ঢোকে, যেখানে যার রাইফেল থাকে, সেখান থেকে রাইফেলটা তুলে কাঁধে ঝুলিয়ে আবার লাইনে এসে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বারকয়েক ঝাঁকি দিয়ে রাইফেলটাকে কাঁধের ওপর ফিট করে নিচ্ছে। এমন-কি লাইনে দাঁড়ানোর পরও কাঁধ ঝাঁকিয়ে রাইফেলটা ঠিক করে নিতে হয়।

এই লাইনের প্রতিটি লোকের কাঁধে বন্দুক ওঠা মাত্রই পুরো লাইনটার চেহারা যেন পাল্টে যায়। এতক্ষণ ছিল ওয়াটারপ্রুফ, গামবুট আর টুপির লাইন। তাকালেই বৃষ্টিবাদলের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু বন্দুক কাঁধে উঠতেই বৃষ্টিবাদল অবান্তর হয়ে যায়। এমন-কি এই যে বাতাস এই বাঁধা লাইনের গায়ে হামলে পড়ছে আর টুপির আচ্ছাদনের ভেতরেও বৃষ্টির ছুরি বিঁধছে সে-সব যেন রোদের মতই স্বাভাবিক। সেই স্বাভাবিকতা মেনে নিয়েই এই পুরো লাইনটা রাইফেল কাঁধে তুলে নিয়েছে, আর, রাইফেল কাঁধে ওঠা মাত্রই এই বাহিনীর পেশাগত পরিচয় যেন প্রধান হয়ে ওঠে—ইন্ডিয়ার সীমান্তরক্ষার কাজ।

কম্যাণ্ড্যান্ট ঘোষকে বলে, 'মার্চ কর‍্যাই খানিকটা নিয়্যা যাও, তারপর ছাড়ো।'

এক জওয়ান এসে কম্যাণ্ড্যান্টের সামনে দাঁড়িয়ে তার বেল্টসহ রিভলবারটা মেলে ধরে। কম্যাণ্ড্যান্ট ওয়াটার প্রুফটা ফাঁক করলে জওয়ানটি নিচু হয়ে কম্যাণ্ড্যান্টের কোমরে বেল্টটা বাঁধতে থাকে। ঘোষ নির্দেশ দেয়, 'এই তোমরা চারজন গাড়িটা নিয়ে এসো। এ-টে-ন-শ-ন।'

এদের পায়ে বুট ছিল না বলে খট শব্দটি উচ্চকিত হল না। কিন্তু এখানে আর সেই আগের বারের মত দৌড়োদৌড়ি হুড়োহুড়ি পড়ল না। সবাই যে-যার জায়গায় দাঁড়িয়েই ছিল। ঘোষের নির্দেশে পুরো লাইনটা এক ছন্দে চলতে শুরু করল। তাদের ডান ঘাড়ের ওপরের শূন্যতায় মাথার পাশে রাইফেলের নল দুলে ওঠে, দলের চলার ছন্দ মেনে দুলে ওঠে।

পুরো লাইনটা ঘাসবনের দিকে চলে। ঘাসবনের ভেতরে তাদের প্রথম পা ফেলামাত্র বৃষ্টিতে নুয়ে পড়া ঘাসে ঢাকা-পড়ে-থাকা পথটা পায়ে-পায়ে তৈরি হয়ে যেতে থাকে।

একশ-চোদ্দ

বন্যার বাতাসের মুখে দুটি পাঁঠা

ঘাসবনের ভেতর পুরো লাইনটা ঢুকে গেলে ঘোষ অর্ডার দেয়া বন্ধ করে। লাইনটা কিন্তু চলতে থাকে যেন অর্ডার দেয়া হচ্ছে এমন তালে-তালেই। এই পথটাতে লাইন ভেঙে চলার মত জায়গা নেই। এইটুকু সময় তালে-তালে পা ফেলার অভ্যেস কিছুক্ষণ থাকে। ধীরে-ধীরে বাতাসের ধাক্কায় ওয়াটারপ্রুফের কলার আর ঝুল ফতফত করে আছড়ে পড়ার আওয়াজ ওঠে। ধীরে-ধীরে তাদের পা ফেলার একটা সমবেত আওয়াজ শোনা যায়। এবং আবো ধীবে এই লাইনটার শ্বাস ফেলার একটা আওয়াজও এই বাতাসের মধ্যে আলাদা হতে থাকে।

যে-রাস্তাটা এখন ঘাসে ঢাকা সেটা পায়ে চলা রাস্তা নয়। বর্ডার ক্যাম্প থেকে পাথর আর ইটের টুকরো ফেলে পিটিয়ে রাস্তাটা তৈরি করা হয়। বছরে একবার রাস্তাটাব মেবামত হওয়ার ফলে ভেঙেচুরে যায় না। লাইনের পেছনের গাড়িটা দুজন ঠেলছে, দুজন টানছে। তাদের বন্দুকগুলো গাড়ির ভেতর রাখা হয়েছে। গাড়িটার ওপরে ত্রিপলের ঢাকনাটা বাতাসে ফুলে ওঠে বটে কিন্তু ওড়ে না—এক-এক দিকে তিনটে স্ক্রুর মধ্যে পাত দিয়ে মোড়া ত্রিপলে ফুটোগুলো ঢকিয়ে দেয়। পাঁঠাদুটো সেই ত্রিপলের তলা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে, তাই ত্রিপলটা বাতাস ছাড়াও নড়ছে। বাতাসের ধাক্কায় ত্রিপলটা একটু উঁচু হয়ে যাওয়ায় তাব ভেতরে বাতাস ঢুকে পডছে—তারপব কিছুক্ষণ পাঁঠাদুটো চুপচাপ।

জলে ভেজা ঘাস নুয়ে পড়ে এই যে-রাস্তাটাকে ঢেকে রেখেছে সেটা শেষ হওয়ার আগেই তিস্তার আওয়াজ কানে আসে। কম্যাণ্ড্যান্ট লাইনের পেছনে-পেছনে যাচ্ছিল। লাইনের মাঝ থেকে ঘোষ সরে দাঁড়ায়, তারপর কম্যাণ্ড্যান্টের দিকে ঘুরে বলে, 'নদীব আওয়াজ শুনছেন ?'

কম্যাণ্ড্যান্ট তখনো অত স্পষ্টভাবে নদীর আওয়াজটাকে আলাদা করতে পাবে নি, সে জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে ঘাড়টা দোলায়। ততক্ষণে লাইনটা আরো খানিক এগিয়ে গেছে। ঘোষ তাও চেঁচিয়ে বলে, 'নদীব আওয়াজ।' এবার কম্যাণ্ড্যান্ট সম্মতিতে ঘাড় দোলায়।

ঘাসবনের শেষে সেই কাঠের খুঁটি দিয়ে তৈরি উঁচু সেন্ট্রি বক্স। আসলে একটা ঘরই—দরজাও আছে। দরজাটা বাতাসে একবার বন্ধ হচ্ছে, আর খুলছে। কম্যাণ্ড্যান্ট একবার তাকিয়ে চেঁচায়—'এই, ঐ দরজাটা আটক্যাইয়্যা দিয়্যা অ্যাসো।' বলে, কম্যাণ্ড্যান্ট থামে। আবার বলে, 'লাস্ট কে ডিউটিতে ছিল্যা ? দরজা খোলা রইখ্যাই সব চল্যা অ্যাসো ?' লাইনের সবচেয়ে পেছনে, কম্যাণ্ড্যান্টের সামনে যে-দুজন ছিল, তাদের বাঁ দিকের জওয়ানটি লাইন থেকে বেরিয়ে মইয়ের মত সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায়। সে উঠতে-উঠতেই আরো দুবার দরজাটি খোলে ও বন্ধ হয়। কিন্তু এই সেন্ট্রি বক্সগুলো বড়-বড় কাঠ আর খুঁটি আর বড়-বড় পেরেক আর নাটবল্টু দিয়ে এমন ভাবে তৈরি যে ঘরটা বাঁকাচোরা হয়েই থাকে। সেই কারণেই এত বাতাসেও দরজাটা খুব জোরে পড়ে না।

সেন্ট্রি বক্সের তলায় কাঁটাতারের বেড়ার ভেতর গেট—যে-দুজন সামনে ছিল, তার গেটের সঙ্গে খুঁটির পেঁচানো তারটা খুলে গেটটা ঠেলে দেয়। সেই ফাঁক দিয়ে দলটাকে একটু বাঁয়ে বেঁকে বাইরে বেরতে হয়। সে রকমভাবে বেরতে গিয়ে লাইনটা ভেঙে যায়। বেরিয়ে গিয়ে কেউ আর লাইনে দাঁড়ায় না। গেট দিয়ে বেরিয়েই কেউ-কেউ ঘুরে দাঁড়ায়, কেউ হাত দুটো ওপরে তুলে আড়মুড়ি ভাঙার ভঙ্গি করে আর কেউ-কেউ ডাইনে ঘুরে হাঁটতেই থাকে—থামে না।

এই জায়গাটায় একেবারেই কাঁচা ঘাস আর ঘাসের মধ্যে কাদা। ডাইনে না বেঁকে সোজা গেলেই নদী। ঘাসবনের ভেতর দিয়ে আসার সময় বাতাসের যে-আওয়াজ উঠছিল, গেটটা পেরনোর পরই সেই আওয়াজটা যেন বদলে যায়। কিন্তু বদলাবার ত কথা নয়—একটা কাঁটাতারের বেড়ায় আর বাতাসের আওয়াজ বদলাবে কেন। বাতাসটা একই রকম ভাবে বইছে, বৃষ্টির ছাঁটও একই রকম ভাবে পড়ছে, কিন্তু এদের হাঁটাটাও বদলে গেল। এতক্ষণ লাইন বেঁধে হাঁটার একটা আলাদা আওয়াজ ছিল, সেটা এখন আর নেই। ঘাসে ঢাকা পথ কিছুটা দেখে-দেখে আসতে হচ্ছিল, এখন তাও করতে হচ্ছে না। ফলে, নদীর আওয়াজ আর বাতাসের আওয়াজ মিলে যে ঝঞ্ঝারব তৈরি হচ্ছে সেটা কানে আসে। আর, কানে একবার এলে ত ঐ আওয়াজটাই থাকে—আর-কোনো আওয়াজ শোনা যায় না।

গাড়িটা এসে গেটে আটকে যায়। যে-চারজন গাড়িটা নিয়ে আসছিল তার ভেতর থেকে একজন এসে গেটটা ঠেলে দেয়, কিন্তু গেটটা বেশি খোলে না। আর একবার আর-একটু জোরে ঠেলতে গেটের ওপর দিকটা নড়ে, তলার দিকটা সরে না। এই গেটও ত ঐ ভাবেই তৈরি, তাছাড়া গেটটা পুরো খোলার ত দরকারও পড়ে না সাধারণত। উপেন এগিয়ে গিয়ে মাটিটা দেখে চেঁচায়, 'ঠেলিলেই খুলিবে নাকি ? এইঠে ত মাটি উচ্যা হয়্যা আছে।'

'মাটিটা ক্যাটা দাও,' কম্যাণ্ড্যান্ট বললে উপেন গেটটা ধরে দাঁড়িয়ে পা দিয়ে মাটিটায় লাথি মারে। তাতেই নরম মাটি একটু গর্ত হয়ে যায়, গেটটা টান দিতেই কিছুটা খুলে যায়, সঙ্গে-সঙ্গে পেছনের জোয়ানরা ধাক্কা দিয়ে গাড়িটা গেটের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়, একটু গেলেই গাড়িটা আটকে যায়। উপেনের পাশে তখন বটুক বর্মন গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সে দেখে চেঁচায়, 'এই গেটখান উঁচু করি ধরো কেনে, ধরো উঁচু করি।' বলে সে নিজেই গেটটা ধরে টেনে তোলে, উপেন হাত লাগায়, উপেনের বন্দুকটা দুলে সামনে চলে এলে সে সেটাকে পেছনে ঠেলে দেয়, আর দু-জন এসে হাত লাগাতেই গেটটা বেশ খানিকটা উঁচু হয়, পেছনের জোয়ানরা গাড়িটা ঠেলে দেয়, গাড়িটা এগিয়ে আসে কিন্তু চাকাটা আটকে যায়। উঁচু করে ধরে থেকেই উপেন চেঁচায়, 'ঐ দিকোটা টানি নেন আর এই দিকোটা ঠেলেন।' গাড়ির বাঁ দিকটাকে ভেতরে ঢোকানোর জন্য দুই জোয়ান-টানে কিন্তু গাড়িটা কাত হয় না। কম্যাণ্ড্যান্ট গিয়ে উল্টোদিক থেকে ঠেলা দিতে শুরু করে। কম্যাণ্ড্যান্টের সঙ্গে আরো দুজন হাত লাগাতেই গাড়ির জোয়ালটা হট করে বাঁয়ে ঘুরে যায়—কারো মাথায় লাগতেও পারত, কিন্তু গাড়ির ডান চাকাটা গেট গলে বেরিয়ে আসে। এবার সবাই মিলে জোয়ালটা ধরে টানতেই গাড়িটা বাঁ দিকে মুখ করে গেট পেরিয়ে যায়।

কম্যাণ্ড্যান্ট বলে, 'গেটখানা বন্ধ কইর‍্যা দ্যাও।'

ঘোষ বলে, 'হ্যাঁ। নইলে ফ্লাডের জল ঢুকে যাবে।'

কম্যাণ্ড্যান্ট বলে ওঠে, 'সব কথারই ত জবাব আছে ঘোষ। এই গেটটেটগুল্যা ত রোজই খোলা-বন্ধ হওয়ার কথা। সেডা হয় না ক্যান ?'

ততক্ষণে গাড়ি ঘোরানো হয়ে গেছে। আবার হাঁটা শুরু হয়। যারা এগিয়ে গিয়েছিল, তারা এদের এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঘুরে আবার এদিকেই আসছে। কিন্তু গাড়িটা দেখে আবার দাঁড়িয়ে পড়ে, তারপর ঘুরে সোজা চলতে থাকে।

'ঘোষ, সবারে কয়্যা দাও বাংলাদেশের ক্যাম্পের আগে যেন আবার লাইন হয়, মার্চ কইর‍্যা ঢুইকতে হবে', কম্যাণ্ড্যান্ট বলে। ঘোষ এক জোয়ানকে খবরটা দিয়ে আগের দলের কাছে পাঠায়। সে দৌড়তে শুরু করে বটে কিন্তু ওয়াটার প্রুফ আর বাতাসের ধাক্কায় এগতে পারে না।

'ঘোষ, চলো নদীটা দেইখতে-দেইখতে যাই,' বলে কম্যাণ্ড্যান্ট একটু কোনাকুনি নদীর দিকে হাঁটা শুরু করে।

এখন দলটা চার টুকরো। আগে একদল চলে গেছে। যারা গাড়িটা বের করার জন্যে গেট খোলাখুলিতে ব্যস্ত ছিল তারা একটা দল হয়ে এগয়। কম্যাণ্ড্যান্ট, ঘোষ আর দুই জোয়ান নদীর দিকে যায়। আর গাড়ি নিয়ে এখন ছয়জন চলে। যে-জোয়ানটিকে ঘোষ পাঠিয়েছিল আগের দলটাকে খবর দিতে সেই এক দলছুট ছুটছিল।

ভারতের এই সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর মধ্যে স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে-সঙ্গে পশ্চিমবাংলার নানা জেলার লোকজন আছে, নদীয়ারই বেশি। তা ছাড়া কম্যাণ্ড্যান্ট যেন পশ্চিমবাংলারই নয়, বাংলাদেশের। নেপালি আছে কয়েকজন, বেশ কয়েকজন বিহারিও আছে। পাঞ্জাবি ছিল জনা তিন, তারা সবে ট্রান্সফার হয়ে গেছে। দহগ্রামের এই এমন এক 'ইন্ডিয়াতে'ও—যেটাকে ইন্ডিয়াই ফ্লাডের সময় ভুলে গেছে—বোঝা যাচ্ছে 'ইন্ডিয়া'টা অনেক বড় দেশ।

একশ পনের

দেশের জন্যে দুঃখ

নদীর কাছ পর্যন্ত কম্যাণ্ড্যান্টকে আর যেতে হয় না, তাব আগেই কোনো-কোনো জাযগায নদী তাদের কাছে চলে আসে। এই মাঠ ত আর সমান না, কোথাও বেশ নিচু, কোথাও উঁচু। সেই সব নিচু জাযগায নদীর জল ঢুকে গেছে। আর সেইসব জাযগায জল যে-রকম তোড়ে ঢুকছে তাতে মনে হয, আর-কিছুক্ষণের মধ্যেই এই পাড় একেবারে ভেসে যাবে। কম্যাণ্ড্যান্ট এ-রকম এক জাযগায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখে নদীর জল এসে ঐ নিচু জমিব কিনাবায ঘা মেরে আবাব ফিবে যাচ্ছে, আবাব নতুন স্রোত এসে ঘা মাবছে।

'ঘোষ, দেইখছ কাণ্ডখান।'

'হ্যাঁ, এখানে এ-রকম জল, মানে আমাদেব ক্যাম্পেব উত্তরে দক্ষিণপাড়া ত ভেসে গেছে এতক্ষণ?'

'কই, ওবা যে ক্যাম্পে আইস্যা উইঠবে কইল, এ্যালো না ত!'

'বুঝে গেছে যে ক্যাম্পও ভাসবে, তাই অন্য কোথাও গিয়ে উঠেছে হয়ত!'

'আর কুথায় উইঠবে? আব ত সব ফরেন ল্যাণ্ড?'

'ফবেন ল্যাণ্ডেই গেছে এতক্ষণ। না গিয়ে ভাসবে নাকি?'

ওরা নদীর আবো কাছে যাবাব জন্যে দু-চাব পা এগিয়েই থেমে পড়ে—নদীর এপাব-ওপার ত দূরের কথা, সামনে একটু দূরেই নদীটা আব দেখা যাচ্ছে না। নদীব খোলা বুকের ওপরে আকাশ আব নদী এখন আলাদা করা যায় না—বাতাস সেই অবকাশ দিয়ে হু হু কবে বয়ে যাচ্ছে নদীর মতই বেগে কিন্তু বিপরীত মুখে। সেই বাতাসে বৃষ্টিব ধাবাপাত আর মাটিতে নামছে না—বাতাসে কাত হযে যাচ্ছে, উড়ে যাচ্ছে, আকাশেই আবর্ত তৈরি করছে। আর তাতে নদীর বুকেব ওপর এমন কুয়াশা তৈরি হযেছে যে কিছু দেখা যাচ্ছে না। নদীর স্রোত চলছে মাটির ঢাল অনুযায়ী। অত জল অতখানি ঢাল বেযে যখন গড়াচ্ছে তখন তার একটা আলাদা আওয়াজ ওঠে, আকাশ গমগম করে। কিন্তু এখন ত সে আওয়াজটাও কয়েকগুণ বেড়ে গেছে বিপবীতমুখী বাতাসের ধাক্কায়। বাতাসেব স্রোত আর জলস্রোতের সংঘর্ষে যে-আওযাজ উঠছে তাতে মনে হয নদী তাব খাত থেকে উঠে এসে নতুন খাত তৈরি করে ফেলবে।

দূর থেকে একটা চিৎকারের মত ভেসে আসে। কম্যাণ্ড্যান্ট জিজ্ঞাসা করে, 'কিসের চিৎকার?' একটু কান পেতে শোনে ঘোষ, তারপর বলে, 'চিৎকার না, গান গাইছে, আমাদের ছেলেরা।'

'তা হালে তাড়াতাড়ি চলো, না হইলে আবার অন্ধকার হইয়্যা যাব। তোমাদের সঙ্গে টর্চ লাইট আছে ত?' কম্যাণ্ড্যান্ট জিজ্ঞাসা করে।

'হ্যাঁ স্যার, আছে', একজন জোয়ান ওয়াটারপ্রুফের বোতাম খুলে টর্চটা দেখাতে গেলে কম্যাণ্ড্যান্ট বলে, 'থাক, থাক, থাইকলেই হইল।'

ওরা নদীর পাড় ধরেই একটু তাড়াতড়ি হাঁটতে শুরু করে। তাড়াতাড়ি হাঁটতে গেলে বাতাসের ধাক্কা জোরে লাগে, পা পেছিয়ে যায়, বুক আর ঘাড়টা এগিয়ে আসে। ওরা ঘাড়টা নিচু করে হাঁটে—মুখে যাতে বৃষ্টির ছাঁট কম লাগে। কম্যাণ্ড্যান্ট হাত দিয়ে একবার মুখ মুছে নেয়। এই বাতাস আর বৃষ্টির বিপরীতে এদের ঐ চলা দেখে বোঝা যায় এদের প্রত্যেকেরই স্বাস্থ্য কী রকম পেটানো। সেই স্বাস্থ্যই নিশ্বাসের আওয়াজে প্রমাণিত হয়ে ওঠে—চারজনের নিশ্বাসের আওয়াজ এই বাতাসনদীর আওয়াজের ভেতরেও শোনা যায়। কখনো-কখনো তাদের ছোট-ছোট খাঁড়িমত পার হতে হচ্ছিল—নদীর জল যেখানে ছোট-ছোট নালী দিয়ে ঢুকে পড়ছে।

একটু এগিয়ে তারা গাড়িটা গায়। পাঁঠাদুটো তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। তাদের আর গাড়িটার মাঝখানে বেশ খানিকটা মাঠ। চেঁচালে শুনতে পাবে না। ঘোষ বলে, 'পাঁঠাদুটোকে বোধহয় ত্রিপল চাপা দিয়েই মেরে ফেলল। এই, ওদের গিয়ে বলো ত ত্রিপলের ঢাকনাটা খুলে দিতে।'

একজন জোয়ান ছুটে গেলে কম্যাণ্ড্যান্ট ডাকে, 'ঘোষ।'

ঘোষ কোনো জবাব দেয় না। কিন্তু কম্যাণ্ড্যান্ট যখন কিছু বলে না, ঘোষ জিজ্ঞাসা করে, 'কিছু বলছিলেন নাকি?'

কম্যাণ্ড্যান্ট হাঁটতে-হাঁটতে ঘোষের দিকে তাকায়। কিন্তু কিছু বলে না। এবা বেশ তাড়াতাড়িই হাঁটছিল। শ্বাসের আওয়াজ উঠছে জোরে-জোরে। কম্যাণ্ড্যান্ট কিছু ভাবছে।

কম্যাণ্ড্যান্ট আবার ডাকে, 'ঘোষ।'

এবার ঘোষ বলে, 'বলুন।'

'আজ ত পাঁঠাটাঠা কাইট্যা পিকনিক হবে নে।'

'হ্যাঁ। তা ত হবে। ওরা ত নেমন্তনই করেছে। আমাদের পাঁঠা কি আর আমাদেব খাওয়াবে ?'

সেই জোয়ানটা গাড়ির কাছ থেকে ফিরে আসছে। এবার বাতাস পেছনে বলে, একটু তাডাতাডিই।

'হ্যাঁ। আজ না হয় অগ পাঁঠাই খ্যাইলা। কাইল ত তোমাগো পাঁঠা খাইতে হব। অগ ত আর পাঁঠাব ফরেস্ট নাই।'

'হ্যাঁ। তা. নাই। বলছেন কাল দুপুরেও এ-বৃষ্টি ছাড়বে না ?'

'না-ছাড়লে ত বাঁইচল্যা। বাংলাদেশের ক্যাম্পেই থাইক্যা যাবা নে। ছাইড়লে যাবা কোথায় ? জল দেইখল্যা না ? রাত্তিরের মধ্যে সব ভাইস্যা যাবে।'

'হ্যাঁ। সে-রকমই ত মনে হয়। এদিককার নদীগুলো বড় গোলমেলে। আমাদের ওদিকেব নদীগুলো দেখে আপনি বুঝতে পারবেন, টাইম পাবেন। কিন্তু এ ত একেবারে ট্রেচারাস। কোনো আন্দাজই পাবেন না।'

'আরে, তোমাগো দ্যাশে বৃষ্টির জলে ফ্লাড, আর এ্যাখন ডিভিসিব জলে।'

'এখানে ত ডিভিসিও নাই, শুধুই বৃষ্টি।'

ওরা দ্বিতীয় দলটাকে পেরয়। কম্যাণ্ড্যান্ট, ঘোষ, দুই জো[illegible]চ্ছে নদীর পাড় দিয়ে আব উপেনদের দলটা যাচ্ছে আর-একটু ভেতরে দিয়ে। কম্যাণ্ড্যান্টদের চলার গতি দেখে ওরাও তাডাতাড়ি হাঁটতে শুরু করে।

'এখানে পাহাড় আছে। পাহাড় ভাইঙ্গ্যা জল এখানে নামে। শোনো, কই কি, এই গাড়িটা আবার ফেরত পাঠাও। চাইল আর ডাইল আর আলুগুলা নিয়্যা আসুক। এদেব ক্যাম্পে কযদিন থাইকতে হব, কে জানে ? আর আমাগো ক্যাম্পে জল ঢুইকলে ত চাইল সব নষ্ট হইয়া যাবে নে।'

'সব চাল আনতে বলেন ?'

'পারলে তাই। না-পারলে, যা পাবে।'

ঘোষ একবার পেছন ফিবে দেখে, তারপব সামনে তাকায়, 'এই কাদামাটিতে অত লোড নিয়ে কি এই গাড়ি আসতে পাববে ? ফেঁসে যাবে।'

কম্যাণ্ড্যান্ট কোনো জবাব না দিয়ে হেঁটে যায়। তারপর বলে, 'গাডিতে যে-কয় বস্তা পাববে গাডিতে আনুক, আর না-হয় ত জোয়ানরা কাঁধে কইব্যা আনুক।'

'এতটা রাস্তা ?'

'যা পারে তাই আনুক ত।'

ওরা সামনের দলের কাছে পৌঁছে যায়। তারা দাঁড়িয়েই ছিল। একটু দূবে বাংলাদেশেব ক্যাম্প, সবুজ টিন দেখা যাচ্ছে—সেন্ট্রি বক্স। এখান থেকেই লাইন করতে হবে। সবাই মিলে পেছনের লোকজনে জন্যে অপেক্ষা করে। অপেক্ষা করে আর বাংলাদেশের ক্যাম্পের দিকে তাকিয়ে দেখে। ভাবতেও সীমান্ত রক্ষী বাহিনী মাত্র এইটুকু দূরত্বে এসে যেন কিছুটা অসহায় বোধ করে ফেলে, এবার সত্যি-সত্যি তাদের দেশ ছেড়ে যেতে হচ্ছে। এরা যেমন, সামনে, বাংলাদেশের ক্যাম্পের দিকে তাকায়, তেমনি, পেছনে, তাকায় যে-পথটা দিয়ে তারা এল, সেই পথের দিকেও। ঐ পথেই ত ইন্ডিয়া, তাদেব দেশ।

একশ ষোল

বাংলাদেশে ইন্ডিয়ার সীমান্ত রক্ষী বাহিনী

প্রায় সকলেবই ওয়াটারপ্রুফ আর টুপির সামনেটা ভেজা, পেছনটা সে-তুলনায় শুকনো। বন্দুকগুলো এবার আর কাঁধে ঝোলানো না, হাতে চেপে ধরা। ঘাড় সোজা, মুখ শক্ত। সবার আগে কম্যাণ্ড্যান্ট। সবার পেছনে ঘোষ। তারও পেছনে গাড়িটা। ঘোষের 'লেফট-রাইট-লেফট'-এর তালে-তালে ভারতীয় সীমান্ত বক্ষী বাহিনী বাংলাদেশের ক্যাম্পে এসে ঢোকে।

তাদেব দেখতে পেয়েই বাংলাদেশের কম্যাণ্ড্যার লুঙি পরে খালি গায়েই বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু ভারতীয় বাহিনীর এ-রকম কুচকাওয়াজে তাড়াতাড়ি ভেতরে গিয়ে খাকি জামাটা পরে আসে। জামাটা পরতে-পরতেই প্যান্টের দিকে হাত যায়, কিন্তু প্যান্ট মানেই জুতো। তাতে ত আবার একটু সময় লাগবে; সুতরাং বাংলাদেশেব কম্যাণ্ড্যান্ট লুঙির ওপর জামাটা চাপিয়েই বেরিয়ে আসে আবার। একজন তাব ওপর ছাতা খুলে ধরে সঙ্গে যায়। কিন্তু একটু যেতে না যেতেই বাতাসে ছাতাটা উল্টে গেলে সে তাড়াতাড়ি আর-একটা ছাতা আনতে ছোটে।

ইতিমধ্যে ঘোষের নির্দেশে ভারতীয় বাহিনী 'এ্যাটেনশন' হয়ে দাঁড়িয়ে আবার 'স্ট্যাণ্ড এ্যাট ইজ' হওয়া মাত্র ভাবতীয় কম্যাণ্ড্যান্ট গিয়ে বাংলাদেশেব কম্যাণ্ড্যারকে জড়িয়ে ধরে। বাংলাদেশের কম্যাণ্ডার ভাবতীয় কম্যাণ্ড্যান্টকে জড়িয়ে ধবে বলে, 'আবে দাদা, আপনি ত আমারে ডর খাওয়াইয়্যা দিবার ধবিছেন, এলায় বাইফেল কাঁধে মিলিটাবি মার্চ করি ঢুকি পড়িসেন। এ ত সীমান্তে গুলিবিনিময় হওয়া ধরিত, চলেন, চলেন', বলে কম্যাণ্ড্যান্টকে জড়িয়ে বারান্দার দিকে এগতে গিয়ে কম্যাণ্ড্যার হাত দিয়ে একটা ভঙ্গি করে যাতে সকলকেই আসতে বলা হয়। বারান্দায় ওঠার আগে কম্যাণ্ড্যান্ট হঠাৎ দাঁড়িয়ে বলে, 'আবে ভাই, দাঁড়াও। ঘো—ষ।'

ঘোষ আসতেই বলে, 'ঐগুলো কিচেনে পাঠাও।'

'সে কী? কিচেনে আবার কী? কম্যাণ্ডাব জিজ্ঞাসা করে।

'আরে দুইডা ভাতে সিদ্ধ দেযাব মতন পাঁঠা ছিল। ওদের ঐখানে রাইখ্যা আইলে ত সর্দি লাইগ্যা মরত। তাব থিকা ভাবত-বাংলাদেশ মৈত্রীর ভোগে লাগুক, চলো, চলো', এবার কম্যাণ্ড্যান্টই আগে পা বাড়ায়।

কম্যাণ্ড্যান্ট আব কম্যাণ্ড্যার বাবান্দায় উঠতে না-উঠতেই বাংলাদেশের ক্যাম্প থেকে সবাই হৈ হৈ কবে মাঠে নেমে যায়, ভারতীয় জওয়ানদের প্রায় হাতে ধরে-ধরে বারান্দায় তুলে নিয়ে আসে। বারান্দাতে উঠেই ভারতীয় জোয়ানরা প্রথম মাথার টুপি খুলে ফেলে, তার পর ওয়াটাবপ্রুফের বোতামে হাত দেয। বাংলাদেশের প্রায় সবারই পরনে লুঙি, কারো-কারো গায়ে গেঞ্জি। [illegible] এই সময়টুকুতে সত্যি মনে হতে থাকে যে ভারতীয বাহিনী এই ক্যাম্পে নিমন্ত্রণ খেতেই এসেছে।

ভেজা ওযাটারপ্রুফগুলো বারান্দার বাটামে ঝোলানো, ভেজা গামবুটগুলো খুলে একপাশে বাখা—এই সবে প্রথম দিকের কয়েকটি মিনিট যায়। এর মধ্যে গাড়ির ভেতরে প্যাকেট করে নিজেদের লুঙি বা পাজামা, গামছা ইত্যাদি জোয়ানবা নিয়ে আসে, এক জোয়ান গিয়ে কম্যাণ্ড্যান্টের প্যাকেটটা দিয়ে আসে কম্যাণ্ড্যারের ঘরে। এই নানা ছুটোছুটি হৈহৈ-এর মধ্যে যখন ভারতীয় জোয়ানরাও কিছুক্ষণ পর লুঙি বা পাজামার ওপর গেঞ্জি চাপিয়ে গল্প করতে বা তাস খেলতে বসে যায় তখন দুই দেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর মধ্যে চেহারাগত আর-কোনো পার্থক্য থাকে না। বাংলা ভাষার উচ্চারণের বৈচিত্র্য বাংলা দেশের বাহিনীর ভেতরে যতটা, ভারতীয় বাহিনীর মধ্যেও ততটাই। রামাশিস আর পরশমণি শুধু আলাদা। বাংলাদেশের ক্যাম্পে কোনো হিন্দিভাষী ছিল না, নেপালি ত নয়ই। রামাশিস আর পরশমণি এক ফাঁকে কিচেনে গিয়ে জেনে আসে, মাংস-ভাত ছাড়া কিছু হচ্ছে কিনা।

কিচেনে এখানে বাংলা দেশের সীমান্তরক্ষীরাই রান্না করছে। তারা বলে, 'কেন্ দাদা, ডাইল হইব, ছোলার ডাইল।'

রামাশিস বলে 'ব্যস, ব্যস, হামলোগ ভেজ খায়গা, দোঠো আলু কি বেগুন সিদ্ধ লাগাবেন, ব্যস।'

কিচেনের লোকরা প্রথমে 'ভেজ'টা বুঝতে পারে না। বোঝার জন্যে তাদের একটু ভাবতে হয়, 'নিরামিষ খাবেন? মাংস খাবেন না? ক্যা?'

পরশমণি বলে, 'না, হামরা ত খাই না। এমনি ভেজই খাব।'

বাংলাদেশেব একজন হঠাৎ বুঝতে পারে, 'আরে দাদা' বলে গিয়ে রামাশিসকে জড়িয়ে ধরে 'হে-হে' করে হেসে ফেলে। তাবপর তার অন্যান্য সহকর্মীব দিকে তাকিয়ে বলে, 'দাদারা ভাইবছে আমরা বড় গোস্ত খাওযাইয়্যা দিব নে—হে-হে-হে-হে।'

এত বড় একটা খবর ত আর চেপে রাখা যায় না। রামাশিস আর পবশমণিকে নিয়ে কিচেনের সবাই গিয়ে বারান্দায় ওঠে। তারপর যে-হলঘরটাতে সবাই মিলে গুলতানি করছে তার দরজায় দাঁড়িয়ে একজন চিৎকাব করে—'এই শুনো ভাই সবাই।'

এতজন লোক দরজায় এসে চেঁচামেচি করায় সকলেরই নজর পড়ে এদিকে। তখন কিচেনের সেই কর্মীটি রামাশিস আর পরশমণিকে দেখিয়ে বলে, 'ইন্ডিয়ার এই দাদারা কিচেনে গিয়া কয় কি,' লোকটি ভেজ' শব্দটি মনে করতে পারে না, 'নিরামিষ খাইব। ক্যা ? না, দাদারা ভাইবছে আমরা বড় গোস্ত খাওযাইয়্যা দিব নে।'

সকলে মিলে হেসে ওঠায় বামাশিস দু হাত তুলে বলে, 'আরে না, না, আমরা ভাবলাম কিয়া পাকাতা হ্যায়, দেখভাল কবে আসি।' পবশমণি আব রামাশিস বসে পড়ে। কিচেনের লোকজন আবার কিচেনে যাওয়াব জন্যে ঘুরে দাঁড়ায়। একজন মুখ বাড়িয়ে বলে, 'দাদার মুরগাটার চারটা ঠ্যাংই রাইখ্যা দিব।'

ভেতর থেকে একজন তাদের পেছনে চিৎকার করে—'ল্যাজ আর শিংখানও দিস দাদারে।'

পরশমণি আর বামাশিস তাড়াতাড়ি একটা তাসেব দলের পেছনে ভিড়ে যায়।

এখন এই ঘরটাব চাবদিকে তাকালে চট করে বাংলাদেশীদের আর ভারতীয়দের আলাদা করা যাবে না—সবাই এমনই মিশে গেছে। মানুষরা মিশে গেলেও তাদের পোশাক-আশাক এবং আনুষঙ্গিক কিছু-কিছু জিনিশ মিলছিল না। এখানে এই ঘরের দেয়ালে দুই রক্ষীবাহিনীর বন্দুকই সার দিয়ে দাঁড় করানো। কিন্তু বন্দুকগুলো দেখতে একরকম নয়। এই ঘরের ভেতরে টাঙানো দড়িতে দুই বাহিনীরই কিছু-কিছু ইউনিফর্ম ঝুলছে। তার রং আলাদা। দেয়ালে, জানলায় ও দবজার কপাটে, সিনেমার নায়ক-নায়িকার ছবি সাঁটা—তাব ভাবভঙ্গি আর চেহারা ভারতীয়দের পরিচিত না। তাস খেলতে-খেলতে বা নেহাৎ শুয়ে-শুয়েই কোনো জোয়ান হিন্দি গান গুনগুন করে। বাংলাদেশের কেউ বলে, 'আরে দাদা জোরে কবেন না, শুনি।' দুইদেশের সিগারেট প্যাকেট আলাদা।

এই দুই ক্যাম্পেব লোকজন পরস্পরের চেনা। অনেকেই অনেককে নাম ধরে ডাকে। হাটে দেখা হয়। ডিউটি করতে গিয়ে দেখা হয়। চৌকি মাবতে গিয়ে দেখা হয়। সেই ঘনিষ্ঠতা না থাকলে বাংলাদেশের সীমান্ত ক্যাম্পের কম্যাণ্ড্যারের পক্ষে কি আর সম্ভব হত বন্যার মুখে তাদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা ?

কিন্তু সেই ঘনিষ্ঠতায় ত কোনোদিন এ-রকম এক জায়গায় থাকাখাওয়া হয়নি। তাই যেটুকু আনন্দ হচ্ছে—সেটা পিকনিকের আনন্দের মত। সেই আনন্দটুকুকেই সবাই একটু বাড়িয়ে নিতে চাইছে।

বাংলাদেশের কম্যাণ্ড্যার ভারতীয় কম্যাণ্ড্যান্টকে জিজ্ঞাসা করে, 'দাদা, একড়া স্কচ রাইখছি আপনার তানে। বাহির করি ?'

কম্যাণ্ড্যান্ট আধশোয়া হয়ে বলে, 'করেন।'

একশ সতের

দুই সেনাপতির সংলাপ

কম্যাণ্ড্যারের ঘরে দুটো ক্যাম্পখাট পাতা—দুটোর মাঝখানে দেয়াল ঘেঁষে একটা টেবিল, টেবিলেব ওপর একটা লণ্ঠন, আর পায়ের দিকে দুটো দরজা—দু দিকের বারান্দায় যাওয়ার। ঘরটাতে দুটো খাটই পাতা থাকে। আর-এক জন যে থাকে সে হয়ত আজ অন্য কোথাও শোবে, বা, হয়ত দুটো খাট পাতা থাকলেও ব্যবহার হয় একটাই।

কম্যাণ্ড্যান্ট লুঙি আর স্যাণ্ডো গেঞ্জি পরে উত্তর দিকের খাটটাতে বসে। তার রিভলবারসহ বেল্ট

খুলে বালিশের পাশে রাখা। কম্যাণ্ড্যাব টেবিলের ওপর দুটো গ্লাশ রাখে, তারপর চৌকির তলা থেকে এক টিনেব সুটকেশ টেনে বের করে। আবার উঠে টেবিলের ড্রয়ারের ভেতর থেকে একগোছা চাবি নিয়ে কোমব ভেঙে সুটকেশের তালাটা খোলে। ডালাটা পুরো খুলতে হয় না, বাঁ হাতে তুলে রেখে ডান হাতটা ঢুকিয়ে একেবারেই বোতলটা বেব করে হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর রেখে, তালা বন্ধ করে সোজা হয়ে দাঁড়ায় কম্যাণ্ড্যার। তাবপর চাবিটা ড্রয়ারে রেখে পা দিয়ে সুটকেসটা আবার খাটের তলায় ঠেলে দেয়।

'আপনাদেব ভাই এই একটা বড সুবিধা—সিগারেট, পান ফার্স্ট ক্লাশ, মদও পান ফার্স্ট ক্লাশ,' বেনসন এ্যান্ড হেজেস-এব প্যাকেটটা হাতে তুলে কম্যাণ্ড্যান্ট বলে।

'সে ত দাদা আপনাদেবই-বা কম কেনে ? যারা স্কচ খাওয়ার তারা স্কচই খায়', কম্যাণ্ড্যার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বোতলেব ছিপি খোলে।

'আবে যাবা খাওযাব, তাবা ত খাইবেই, আপনাদের এখানে যারা না খাওযার তারাও ত খাইতে পারে, ইচ্ছা কইরলে।'

'উল্টাটাও ত আছে দাদা।'

'উল্টাটা আবার কী ?'

'যেইলা স্কচ চায় না, দেশী চায, স্যালায় খাবেটা কী ?'

'অ। ফবেন লিকাব তৈবি হয না ?'

'হয় এখন একটা ডিস্টিলাবিতে। কিন্তু আসলে হামবালাব বেশিটাই একেবাবে খাঁটি ফবেন।'

'তা যাই কন। খাইতে চাল্যে ত খাইতে পায। আর এই সিগারেট—এ ত আপনাদের সব দুকানেই পাওযা যায।'

'আবে ইন্ডিযার য্যামন্ ক্যাপস্টান-ট্যাপস্টান, এইঠে স্যানং এই সব সিগারেট।'

'কিন্তু ঐযে কইল্যাম খাঁটি ফবেন। আমাদের ত নিজেদের ফ্যাক্টরি, ফরেন পাব কুথায় ?'

'হামবালাব একটা স্টেট এক্সপ্রেসেব ফ্যাক্টবি আছে কিন্তু সেও ত পুরা ফরেন।'

কম্যাণ্ড্যান্টেব সামনে গ্লাশটা এগিযে দিযে কম্যাণ্ড্যার গ্লাশটা নিয়ে নিজের চৌকিতে বসে। কম্যাণ্ড্যারেব বযস বেশি নয, বংপুবেব বাজবংশী ছেলে, তার কথার মধ্যে রাজবংশী ভাষা থেকে বেরিয়ে আসাব চেষ্টা আছে। কিন্তু বংপুবেবই এই বর্ডারে কাজ কবছে বলে সে-সুযোগ খুব একটা বেশি পাচ্ছে না। ভবিষ্যতে যদি যশোহবেব দিকে বদলি হয়, তা হলে বেশ খানিকটা কাটিয়ে উঠতে পারে। কম্যাণ্ড্যান্টেব বযস বেশি—সেই সুবাদে এর আগেই দুজনের দাদা-ভাইয়ের সম্পর্ক তৈরি হয়েছে বটে কিন্তু তা না হলেও কম্যাণ্ড্যান্ট এই দুজনের মধ্যে সব সময়ই বড়ব স্বীকৃতি পেত। কম্যাণ্ড্যান্ট এখানে লুঙিগেঞ্জি পবে বসে আছে ত অত বড একটা দেশ ইন্ডিয়ারই লোক হিশেবে—বাংলাদেশের কাছে সেটা একটা মহাদেশই বটে। গ্লাশটা তুলে ধবে কম্যাণ্ড্যান্ট বলে, কী ? টোস্ট কবব্যান নাকি ? কী কইবেন ? ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী ?'

কম্যান্ড্যার একটু হাসে, 'সে যাদেব কবাব করিবাব দেন। আপনি ত আর এই ফ্লাড না হইলে আসিতেন না। ফ্লাডেব নামে টোস্ট কবি।'

হে-হে করে কম্যাণ্ড্যান্ট হেসে ওঠে, 'আবে, আপনার ত বুদ্ধি আছে খুব। ত কোন ফ্লাডের নামে কইববেন—যে-ফ্লাডের ভযে এইখানে আসছি, না যে-ফ্লাডেব চোটে এইখানে আরো দুই দিন থাকব ?'

কম্যাণ্ড্যার হো-হো হেসে ফেলে—'কোন ফ্লাড কায জানে।' গ্লাশটা তুলে এগিয়ে দেয়, কম্যাণ্ড্যান্টও গ্লাশটা তার গ্লাশের সঙ্গে মেলায়, কম্যাণ্ড্যার বলে—'থ্রি চিয়ার্স ফর ফ্লাড।'

কম্যাণ্ড্যান্ট চুমুক দিযে গ্লাশটা রেখে বলে, 'আপনাগ এইখানে নাকি ফ্লাডের লোকজন আইস্যা উইঠছে ? কোথায় ?'

কম্যাণ্ড্যার তাব মাথার দিকের বেড়াটা দেখিয়ে বলে—'ঐ দিকে, রান্নাঘরের পাছত ত্রিপলের দুইখান ছাউনি ফেলি দিছি। বিকালে ত শুনিলাম শ-খানেক হবা পারে, এ্যালায় আরো বাড়ি গিছে নিশ্চয়। ইন্ডিয়ার লোজকনও ত আসিছে শুনিছু। বিকালের টাইমত ইন্ডিয়াই বেশি আসিছে। এখনো।'

'তা ইন্ডিয়ার ক্যাম্পসুদ্ধু আইসছি, মানষেরা যাবে কোথায় ? আপনারা কি ক্যাম্প খুইলছেন নাকি ?'

'আরে না না, ত্রিপলের ছাউনি কিছু, মাথাখান বাঁচিবে আর জল নামিলে ত চলি যাবে। এই ডাঙাখান

ত অনেক উচা।'
'এইখানে টিভি নাই ?'
'হ্যাঁ, আছে ত। দেখিবেন ? এখন তে লেকচার হছে। খাড়ান, ফিল্ম হবার সময় যাম। কটা বাজে এখন ?'
'কম্যাণ্ডার বালিশের তলা থেকে ঘড়ি বের কবে দেখে বলে, 'সাত।' কম্যাণ্ড্যান্ট নিজের ঘড়ি দেখে সময়টা মেলাতে গিয়ে আবার দেখে, 'সাড়ে সাত, তোমাব ঘড়ি শ্লো নাকি ?'
'আরে না, মোর ঘড়ি রোজ মিলাই।'
'আমার ঘড়ি ত ভাই ফাস্ট যায় না।'
একটু পবে কম্যান্ড্যাব হো হো হেসে বলে, 'আবে আপনার ত ইন্ডিয়ার টাইম, হামরালার ত বাংলাদেশেব টাইম। এইঠে নটায ফিল্ম দিবে। দেখব।'
'আমাদেব নর্থ বেঙ্গলে ত বাংলাদেশেব টিভিই সবাই দেখে, তোমাদের আর দিল্লির। কলকাতা ত ধরাই যায় না।'
'আমাদের সাউথ বেঙ্গলে কলকাতাখান দেখা যায়, শীতকালে।'
'টিভি এক, নদী এক, ফ্লাড এক, শুধু টাইমটা আলাদা ?'
'কেনে ? কহিলেন যে সিগারেট আলাদা, মদ আলাদা—'
'নদীডাও আলাদা হইব।'
'কোন নদী ? তিস্তাবুড়ি ?'
'বুড়ি না ছুড়ি কে জানে। আমাদের ইন্ডিযায় ত পাহাড়ের তলায় বিরাট তিস্তা ব্যাবাজ বান্ধানো হইচ্ছে।'
'তিস্তাব বাঁধ ?'
'বাধ। স্লুইস গেট। ফ্লাড হবাব পারব না। জল আটক থাকব। শীতেব সময় ছাড়া হয়। বিরাট নাকি ব্যাবাজ—তিস্তার মাঝখান দিয়্যা।'
'স্যালায় আমবা জল পাম কোটত ?'
'জলের কি অভাব পইড়ছে তোমার ? প্রতি বছরই ত ফ্লাড পাও।'
'ফ্লাড হবার তানেই ত বংপুবেব এইঠে, পাটগ্রামে, এ্যালায ফলন ভাল হয়। এ ফ্লাডত আপনাদের মানষি মরে, আর আমাদেব ফসল বাড়ে।'
'সেই জন্যই ব্যাবাজ হচ্ছে, তিস্তা ব্যাবাজ। ফ্লাডও নাই, মানষে মইববেও না।'
'কিন্তু নদীখান ত ভাগ হবা ধরিবে। আপনাদের হাতত চাবি—জল দিলে জল পাব, না দিলে শুখা।'
'শুখা ত শুখা। তখন এক টিভিটাই এক থাইকব—তোমবা কলকাতা দেখবা, আমরা রংপুর দেখব। আর সব আলাদা—নদী আলাদা, ফ্লাড আলাদা, টাইম আলাদা।'
'আলাদাখান এত বাডা ভাল না হয', কম্যান্ড্যার কম্যান্ডান্টেব গ্লাশ আবার ভরে দিয়ে, নিজের গ্লাশটাও ভরে নেয়।

একশ আঠারো

ঘোষের ইণ্ডিয়ায় একবার প্রত্যাবর্তন

ঘোষ একেবারে একলা হয়ে যায়।
বাংলাদেশের ক্যাম্পে জোয়ানরা জোয়ানদের সঙ্গে মিশে গেছে, কাস্টমসের লোক কাস্টমসের ঘরে গিয়ে উঠেছে। ফোনের লোক ফোনের লোকের ঘরে। কিন্তু ঘোষেরই যেন কোনো ঘর ছিল না।
আসলে আছে নিশ্চয়ই। বাংলাদেশের ক্যাম্পে কি কম্যাণ্ডার আর জোয়ানদের মাঝখানে আর-কেউ নেই নাকি ? কিন্তু ঘোষের সঙ্গে তাদের পরিচয় হওয়ার সময় হয় নি। বাংলাদেশের ক্যাম্পে পৌঁছে,

কোনো-রকমে এক কাপ চা খেয়েই সে ছজন জোয়ানেব সঙ্গে গাডিটা নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়েছে। চালডাল যে-কবস্তা পারে নিয়ে আসতে হবে—কম্যাণ্ড্যান্ট যেমন বলে দিল।

ঘোষ ও তার লোকজন বাতাসের সঙ্গেই যাচ্ছিল। তাদেব ওয়াটারপ্রুফের পিঠ ভিজছিল—বুকটা শুকনো ছিল। পিঠে হাওয়া নিয়ে হাঁটাব সুবিধে। তাছাড়া, তাডাও ত একটা ছিল। এখন যদি তাড়াতাডি যেতে পাবে, ফেবাব সমযেব দেবিটা তা হলে পুষিয়ে যাবে। গাডি বেশি ভারী হলে টানা মুশকিল হবে।

চালডালটা যদি নষ্ট হত তা হলে তাদেব কোনো ক্ষতি ছিল না, বরং লাভ ছিল। হেডকোয়ার্টাব থেকে নতুন রেশন আসত, এগুলো কম দামে বেচে দিয়ে কম্যাণ্ড্যান্টও সে ভাগ কবে নিতে পাবত। ফ্লাডেব পব এ-সব জিনিশেব চাহিদা থাকে। কিন্তু নতুন রেশন আসতে দেবিও হতে পাবে। দেবি হবেই। অন্তত সে-কদিনেব বেশন বাঁচাতে হবে। ঘোষ মনে-মনে হিশেব কষতে-কষতে হাঁটে—কত বস্তা চাল বাঁচালে নতুন রেশনেব সময় পর্যন্ত চালানো যাবে অথচ বেচাব মত অন্তত কযেক বস্তা ভেজা চাল থেকে যাবে। নদীতে জল যা দেখেছে তাতে আজ তাদেব ক্যাম্পে জল উঠবেই। জলটা কতদিন থাকবে—সেটা অবিশ্যি এখনই বোঝা যাচ্ছে না। ঘোষ মাঝেমধ্যে নদীব দিকে টর্চ মাবে কিন্তু টর্চেব আলো জলেব কুয়াশায় বেশিদূর যায না।

জোয়ানবা গাডিটা টানতে-টানতে প্রায দৌড়ে-দৌড়ে আগে চলে যাচ্ছে। ঘোষকে একা-একাই হাঁটতে হয়। ওবা আগে পৌঁছেও দাঁডিয়ে থাকবে—গুদামেব চাবি তাব কাছে।

ঘোষ পায়ের কাছে ও আশেপাশে দু-একবাব টর্চ মেবে বুঝতে চেষ্টা কবে যাওযাব সময কম্যাণ্ড্যান্টের সঙ্গে সে যে খাঁডিগুলোতে তিস্তার জল ঢুকতে দেখেছিল সেগুলো কোথায় গেল। সে ও কম্যাণ্ড্যান্ট ত সে-রকম নিচু জায়গা বারকযেক পেবল।

টর্চ নিবিয়ে বাঁ দিকে তাকিয়ে ও আকাশেব দিকে চেয়ে ঘোষ আন্দাজের চেষ্টা করে—সেই খাঁড়িগুলো পেরিযে এল কি না। সে আব কম্যাণ্ড্যান্ট ত তাদেব ক্যাম্প থেকে বেবিযে নদীব ধাবে গেল, তারপর নদীব পাড দিয়ে এগল। তা হলে কি ওগুলো আসলে খাঁডি ছিল না? নদীব পাডই ছিল? কিন্তু তখন তা হলে সেটা নজবে পড়ল না? সে আর কম্যাণ্ড্যান্ট ত ঐ খাঁডিব জল দেখলও কিছুক্ষণ।

ঘোষ দাঁডিয়ে পডে। তার পথ ভুল হওয়া সম্ভব নয। সোজা হাঁটছে।

কিন্তু আবো কয়েক পা গিয়ে তার মনে পড়ল—ওগুলো যদি খাঁডিই হবে তা হলে গাডিটা সেখান দিয়ে নামিয়ে তোলা হল কেমন কবে? তা হলে নিশ্চযই খাঁডি ছিল না—পাডটাই ভেঙে আব-একটু ভেতবে ঢুকে গেছে। কিন্তু সে আব কম্যাণ্ড্যান্ট ত সে-সব জাযগা দিয়ে হাঁটলও। তা হলে গাডিটা চলেছে কিন্তু সে টেব পায় নি নাকি? তার রাস্তা ভুল হচ্ছে না ত? ঘোষ দাঁড়িয়ে পড়ে।

দাঁডিয়ে পডার পব সে পেছন থেকে হামলে পডা বাতাসেব আওয়াজ দুই কা. পাশে পায। কিন্তু বৃষ্টি পায় না। তার ওয়াটারপ্রুফেব ওপর বৃষ্টির ছাট লাগার আওয়াজ সাঁ সাঁ করে কানে বাজে। বৃষ্টিটা বোধ করার জন্যে সে ঘুরে দাঁড়ায়। মুখের চামড়ার ওপব বৃষ্টিব ছাঁটগুলো একসঙ্গে এসে বেঁধে। ঘোষ আবার ঘোরে ও হাঁটতে শুরু করে। আর, কয়েক পা হাঁটতেই সে যেন চেনা জায়গাব একটা আভাস পায়। সে দাঁড়িয়ে পড়ে টর্চটা জ্বেলে বাঁ দিকে আরো কযেক পা হাঁটে, হ্যাঁ, তাদেব ক্যাম্পেব কাঁটাতারের বেড়া শুরু হল। সে তা হলে পথ হারায নি। কিন্তু খাঁড়িগুলো গেল কোথায়।

সেন্ট্রিবক্সের গেটটা খোলাই ছিল—গাডি গেছে। গেটটা পেবতেই ছপ করে জলে পা পডল। ঘোষ পায়ের কাছে টর্চ জ্বালে, গামবুটের নীচে ঘোলা জল, টর্চেব আলোতে পাতলা দেখাচ্ছে। ফ্লাডের জল তা হলে ক্যাম্পে ঢুকে গেছে। টর্চ নিবিয়ে কযেক পা ছপ ছপ করে হাঁটে ঘোষ। আকাশে খোলা চাঁদনি—তাতে মেঘ দেখা যায় বা মেঘের আভাস পাওয়া যায় মাত্র। এখন মাটির দিকে তাকালে জলে সেই মেঘের আবছায়া পাওয়া যায়। ঘোষ আবাব টর্চ জ্বালিযে দাঁডিয়ে পড়ে। তাব টর্চের আলোকবৃত্তের মধ্যে জলের দ্রুত সরলরেখাগুলো পরস্পরের সঙ্গে না মিশে বাঁ থেকে ডাইনে যাচ্ছে আর বৃষ্টির ছাঁটে নুয়েপড়া ঘাসগুলো জলের টানে সোজা হয়ে যাচ্ছে।

টর্চটা বাতাসে নাড়িয়ে ঘোষ হাঁকে, 'এই, তোমরা এসে গেছ?'

ক্যাম্পের বারান্দা থেকে টর্চ জ্বলে ওঠে, দু-তিনটে। ওবা চিৎকার করে কিছু বলে—শোনা যায়, বোঝা যায় না। মাঠটা পেরিয়ে ঘোষ একেবারে গুদামের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়—বারান্দার নীচেই গাডিটা

লাগিয়ে রেখেছে।
সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠতে-উঠতে ঘোষ বলে, 'জল ত ঢুকে গেছে।'
জোয়ানদের একজন বলে, 'হ্যাঁ স্যার। ওরা ত কেউ নামল না, আর্মারির বারান্দা থেকে।'
'টর্চটা ধরো ত', গুদামের তালা খুলতে-খুলতে ঘোষ জিজ্ঞাসা করে, 'কী, জল কি বারান্দায় উঠবে নাকি ?'
'তা ত উঠিবার পারে স্যার, যাওয়াব তানে ত জল না আছিল, আর এলায় ত সপসপাছে।'
গুদামের দবজা খোলামাত্র বাতাসের ধাক্কায় কপাটটা পুরো খুলে আবার সেই খোলার বেগের প্রত্যাঘাতে ঘোষের মুখের ওপর বন্ধ হয়ে যায। গুদামের ভেতরে কোনো খালি টিন ছিল হয়ত—সেটা খুঁটির গায়ে লেগে ঝন ঝন আওয়াজ ওঠে। একসঙ্গে অনেকগুলো টর্চ জ্বলে ওঠে। ওরা দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকে।
'শোনো, তোমরা যা টানতে পারবে, তাই নাও, শেষে রাস্তায় ফেলে দিতে না হয়।'
'স্যার, এলায় ত নিগিবার কষ্ট হবে। একবস্তা চাউল আর একবস্তা আটা নিগিবাব পারি।'
তা হলে তাই নাও। আর ডালের ছোট বস্তা নাও একটা।'
জোয়ানবা দু জন করে এক-এক বস্তা মুহূর্তে তুলে নেয়। একজন দরজাটা ধবে থাকে, দুটো বস্তা নিয়ে বারান্দার কিনারায় রাখে। ঘর থেকে ওরা বেরিয়ে গেলে ঘোষ টর্চ জ্বেলে দেখে কেরোসিনের একটা সিল্‌ড় টিন নীচে আছে। একবার ভাবে, জোয়ানদের রওনা করে দিয়ে টিনটা তার ঘরে রেখে দেবে কিনা। মুহূর্তের মধ্যেই আবার ভাবে, পরে দেখা যাবে।
'এই শোনো, ঘোষ দরজার দিকে টর্চ ফেলে। একজন জোয়ান এগিয়ে আসে।
'এই টিনটা ঐ বস্তাগুলোর ওপর রেখে দাও', ঘোষ টর্চের আলো দেখায় জোয়ানটিকে। সে টিনটা তুলে চালের বস্তার ওপর রেখে ঠেলে দেয়।
জোয়ানরা সবাই নীচে নেমে গিয়েছিল। ঘোষ গুদামের দরজাটা বন্ধ করার জন্যে টানতেই বাতাসের ধাক্কায় একটা কপাট তার হাত থেকে ছিটকে যায়।
'এই, একটু ধরো ত।'
এক জোয়ান বারান্দার ওপর ভর দিয়ে উঠে আসে। সে দরজার কড়াদুটো টেনে ধরলে ঘোষ তালা লাগাতে পারে। জোয়ানটা আবার লাফিয়ে নীচে নামে। গাড়ির জোয়ালটা ততক্ষণে দু জন উঁচু কবে তুলেছে, আর দুজন পেছনে হাত দিয়েছে।
'এই, তোমরা বস্তা তোলার পর গুদামে ক বস্তা থাকল ?' ঘোষ বারান্দা থেকে সিঁড়িব দিকে যেতে-যেতে জিজ্ঞাসা করলে এরা থেমে যায়। কিন্তু কেউ আব-কিছু বলে না। একটু পর একজন হেসে ফেলে বলে, 'কিছু ত দেখি নাই রো, খপ করি ধইচছি, গট করি বাহির হছি।' বলেও সে হে-হে করে হাসে, আরো দু-একটি অস্পষ্ট হাসির সঙ্গে নিজেব স্বর মিলিয়ে।
'আচ্ছা, আচ্ছা, যাও, আমি একটু আর্মারিটা দেখে যাই।'
ওরা একটা হ্যাঁচকা টানে গাড়িটা চালু করে, তারপর এগিয়ে যায়। আর ওদের দিকে পেছন ফিরে ঘোষ একবার বারান্দা ও সার-সার ঘরের দরজার ওপর দিয়ে টর্চটা ফেলে। বাতাসের আঘাতে দরজাগুলোতে আওয়াজ উঠছে। অথচ জনমনিষ্যি নেই। মাত্র এই একটু আগেও ত তাদের ক্যাম্পটা কী রকম গমগম করছিল, না ?
সামনের মাঠটায় দাঁড়িয়েই ঘোষ আর্মারির দিকে টর্চ ফেলে, এই তোমরা ঠিক আছ ত ?'
বারান্দা থেকে টর্চ জ্বলে, ঘোষ শুনতে পায়, 'হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছি।'
ঘোষ টর্চটা জ্বেলেই একটু এগিয়ে যায়। তারপর গলা তুলে বলে, 'কাল সকালে তোমাদের বদলি এলে তোমরা বাংলাদেশের ক্যাম্পে চলে যেও।'
'জল ত বাড়িবার ধরিছে। জল বাড়িলে বদলি আসিবে ক্যানং করি স্যার ?'
ঘোষ একটু ভাবে। তারপর আবার আর্মারির দিকে কয়েক পা এগিয়ে টর্চটা ফেলে দাঁড়ায়। পেছন থেকে একটা আওয়াজ পেল—গাড়িটা বোধহয় সেন্ট্রি বক্স পেরল।
'শোনো, জল বাড়লেও কেউ-না-কেউ আসবে। আর বারান্দায় জল উঠলে তোমরা ছাতে চলে যেও।' ঘোষ ছাতে টর্চ ফেলে—ভিজে ত্রিপলের ঢাকনাটা অন্ধকারের মত দেখাচ্ছে।

'আমরা ঠিক আছি স্যার, ভাববেন না', বারান্দা থেকে জবাব আসে। ঘোষ এবার ঘুরে তাড়াতাড়ি গেটের দিকে হাঁটতে শুরু করে।

একশ উনিশ

বন্যার মুখে একটু ভেজা ধর্ষণ দিয়ে চবপর্বেব শেষ অধ্যায়

ঘাসবনে পা দিয়ে জলেব ওপব টর্চটা ফেলে ঘোষ দেখে এখন জলেব তলায় পুবো বাস্তাটা দেখা যাচ্ছে—ঘাসগুলো সোজা হয়ে গেছে। এইটুকুব মধ্যেই কি জল আবো বাডল ? ঘোষ ছপছপ করতে-করতে গেটেব কাছে পৌঁছয়। গেটটা খুলেই বেখে গেছে ওবা। বেবিয়ে গেটটা বন্ধ কবার জন্যে ঘুবতেই সেন্ট্রিবক্সের তলা থেকে কেউ বেবিয়ে এসে ডাকে, 'বাবু।'

ঘোষ চমকে যায়। টর্চটা জ্বালতেই মেয়েটি গেট দিয়ে বাইবে চলে আসে। গেটটা আব ঠেলে না দিয়ে টর্চটা জ্বালিয়ে বেখেই ঘোষ জিজ্ঞাসা কবে, 'কী ব্যাপাব ?'

'না বাবু, মুই ক্যাম্পত যাম, তোমাব নখত।'

'ক্যাম্প ? কিসের ক্যাম্প ?'

'বানভাসির ক্যাম্প বাবু। মোব গাঁওখান ভাসি গেইসে।'

'ও', ঘোষ গেটটা ঠেলে দিয়ে হাঁটতে শুরু কবে, মেয়েটিও তাব পেছন-পেছন চলে। গাড়িটা বেশ খানিকটা এগিযে গেছে, বাতাসে আওয়াজ আসছে। এতক্ষণ বাতাস পিছে নিয়ে আসতে-আসতে তাডাতাডি পা ফেলাটা যেন বপ্ত হযে গিয়েছিল। সেই ভাবে পা ফেলতে গিযে বাতাসেব প্রথম ধাক্কায় একটু পেছিযেই যায় ঘোষ। তাবপর বুকটা ঝুঁকিয়ে হাঁটতে শুরু কবে। আব মাঝে-মাঝে টর্চ ফেলে।

কয়েক পা যাওযাব পব তাব সন্দেহ হয় মেযেটা কি আসছে। ঘাড ঘুবিযে টর্চ ফেলে দেখে, মেয়েটা ত আসছেই। সঙ্গে একটা কুকুবও।

হাঁটতে-হাঁটতে ঘোষ জিজ্ঞাসা কবে, 'তুমি কোন গাঁযেব ?'

'দক্ষিণপাডাব বাবু।'

'তুমি একা-একা এই বাত্তিবে যাচ্ছ কেন ? তোমাব বাডিব সবাই কোথায় ?'

'মোব ত বাডি নাই বাবু। মোব মানষিও নাই। মুই নিদ গেছু। আব-সব মানষি জল দেখি কোটত চলি গেইছে।'

মেযেটিব কথা ঘোষ শুনতে পায না। সে আব-একটু আস্তে হাঁটে, মেযেটি প্রায তার পাশাপাশি চলে আসে। তাবও প্রায পাশাপাশি সেই কুকুরটি।

'তুমি গ্রামের লোকেব সঙ্গে গেলে না কেন ?'

'মোক ত ডাকছিল্। কিন্তুক মুই যেইলা গেইছি, দেখি নৌকা নাই।'

'ও। তোমাদেব লোকজন নৌকো কবে ক্যাম্পে গেছে ?' ঘোষের যেন খুব খারাপ লাগে না একা-একা যাওয়ার বদলে গল্প করতে-কবতে যেতে।

'সব নৌকা কবি চলি গেইল। তাব বাদে মুই হাঁটা ধরিছু।'

'তুমি ওদের সঙ্গে গেলে না কেন, যারা গাডি নিয়ে গেল—' ঘোষ হাত তুলে সামনেটা দেখায়।

'ডর খাইছু বাবু। অত মানষি চিল্লাছে। ভাবিছু উমরায় আগত যাক, মুই পাছত-পাছত যাম। ত দেখি, তোমরালা একেলা আসিবার ধরিছু। স্যালায় ভাবিছু, এলায় এই বাবুটার সাথত যাম।'

'তুমি কি ইণ্ডিযার ?'

'না বাবু, মুই কাবো না হয।'

'না। তোমাদের গ্রামটা কি ইণ্ডিয়ায় না বাংলাদেশে ?'

'না বাবু। মুই কারো না হয়।'

'তোমার বাড়ি নেই ?'

'না বাবু। বাড়ি নাই রো।'

'তোমাব কোনো লোকজনও নেই ?'
'না বাবু। মোর কুনো মানষি নাই।'
'তোমাব ইণ্ডিয়া বাংলাদেশও নেই ?'
'না বাবু। মুই কারো না হয়।'
এ ছিটমহলের কোথায় কতটুকু ভাবত, আব কোথায কতখানি বাংলাদেশ বোঝা মুশকিল। মেয়েটি ইণ্ডিয়ারই কিনা সেটা নিশ্চিত হওযার জন্যে একটু ভেবে ঘোষ জিজ্ঞাসা কবে, 'তুমি কাব নাম শুনেছ—বাজীব গান্ধী না এবশাদের ?'
'না বাবু, মুই শুনো নাই রো। মুই নাম শুনো নাই।'
'তোমার ওখানে ভোট ফর হয় ? পঞ্চায়েত হয় ?'
'হবা পাবে বাবু। ভোট হবা পারে। হবা পারে।'
ঘোষ বাঁযে তাকায়—ঘোলাটে চাঁদনি তিস্তার জলের ওপব পড়ে আছে এমন, মনে হচ্ছে তিস্তাটা একটা দেয়ালের মত আকাশে উঠে গেছে। ঘোষ ডাইনে তাকায—দুই সীমান্তেব মাঝখানে মালিকানাহীন প্রান্তব এখন জলে ডুবছে। বাংলাদেশের দিক থেকে ভাবতের দিকে বাতাস ফ্লাডেব মতই ছুটে আসছে। ঘোষ মেয়েটিব ওপর টর্চ ফেলে, দাঁড়িয়ে। মেয়েটিও দাঁড়িযে পড়ে। সে প্রথমে টর্চের দিকে তাকায়, তারপর চোখ কোঁচকায। কুকুরটা মেয়েটিব পাযেব কাছে টর্চেব আলোব বৃত্তেব মধ্যে এসে দাঁড়ায়।
'কী দেখিলেন বাবু ? মোক দেখিসেন ?'
টর্চ নিবিয়ে ঘোষ আবার হাঁটা শুরু কবে। এত সপসপে ভিজে গেছে মেয়েটি যে দেখেও কিছু বোঝা যায় না। বাতাসের বেগ ঠেলে যেতে হচ্ছে বলেই হোক, বা অন্য কোনো কারণেই হোক, ঘোষেব গতি একটু কমে আসে। ক্যাম্পে তার ঘরে নিয়ে যেতে পারলে মেয়েটিকে একটু শুকিয়ে দেখে নেয়া যেত। ক্যাম্পটা ত এখন সুনসান। যাওয়া যায়। কিন্তু আর্মারিব বারান্দা থেকে ওরা যদি টর্চ ফেলে ? ঘোষ আগে গিয়ে, মেয়েটিকে পবে আসতে বলতে পারে। কিন্তু মেয়েটি যদি তখন না আসে ? সেন্ট্রি বক্সটায় যাওয়া যায় অবিশ্যি।
ঘোষ একটা ঢোক গিলে জিজ্ঞাসা করে, ক্যাম্পে তোমার কে আছে।'
'কায়-না-কায় ত থাকিবে বাবু।'
'তোমার ত বাড়ির কেউ নেই বললে ?'
'না বাবু। মোর বাড়ি নাই রো।'
'না। বাড়িব লোকজনও ত কেউ নেই বললে ?'
'না বাবু। মোর মানষি কুনো নাই রো।'
'ইণ্ডিয়া বাংলাদেশও নেই ?'
'না বাবু। মোর ঐলা কিছু নাই রো।'
'তোমার দেশ নেই ? একটা ?'
'না বাবু। মোব দেশ নাই রো।'
'তা হলে ক্যাম্পে আর তোমার কে থাকবে ?'
'মানষিলা ত থাকিবে বাবু, বানভাসি মানষিলা।'
গাড়ি টেনে নিয়ে যাওয়া জোয়ানদের অতর্কিত চিৎকার ঘোষ আর শুনতে পায না। ওরা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। বা, তিস্তার আওয়াজটাই এখন প্রবলতর। তা হলে কি পায়ে-পায়ে ওরা তিস্তার কাছেই চলে এসেছে, পাড়ে ? ঘোষ বাঁয়ে-টর্চ ফেলে—মাটিতে ঘোলাটে জল, তারপর তিস্তার ওপরের ঘোলাটে কুয়াশা। সেই আলোটাই ঘুরিয়ে মেয়েটার ওপর আবার ফেলে। মাথায় চুল থেকে সারাটা শরীর সপ সপ করছে, নিংড়োলে জল বেরবে। মেয়েটি এবার মুখ তুলে আবার জিজ্ঞাসা কর, 'কী দেখিসেন বাবু ? নদীতে বান উঠিছে ?'
টর্চটা জ্বালিয়ে রেখেই ঘোষ মেয়েটির দুই কাঁধে হাত দিয়ে তার মুখোমুখি দাঁড়ায়। মেয়েটির ঘাড়ের পেছন থেকে টর্চের আলো সীমান্ত-অন্তবর্তী এলাকায় অকারণ ছড়িয়ে থাকে। তাতে দেখা যায় কুকুরটা অন্যদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে। এতদিন সীমান্তে-সীমান্তে চাকরি করছে ঘোষ—সে নিশ্চিতরূপে জেনে

যায় এই মেয়েটিও বর্ডারেব আরো অনেক তাদেব মত, যাদেব বাড়িঘব নেই, মানুষজন নেই। এমন-কি দেশটেশও নেই।

ঘোষ সেই আপাদমস্তক ভেজা মেয়েটাকে স্রোতেব মত বাতাসেব ভেতব ভেজা মাটিতে শোযায়।

চবপর্বটা এখানেই শেষ কবা যায়। এব পব ত এই মেয়েটি ক্যাম্পে যাবে। সেখানে সে আরো সব বানভাসি মানুষেব সঙ্গে থাকবে। সেই বানভাসি মানুষদেব বেশির ভাগেবই পবিবাব আছে, ঘববাড়ি আছে, বাংলাদেশ-ইন্ডিযা ত আছেই। আবাব, এই মেয়েটিব মত দু-চাবজনও আছে। সেখানে মেয়েটি আবাব ঘুমিয়ে পড়তে পাববে। ঘোষ যে তাকে এই ভেজা শবীরে ভেজা মাটিতেই শোয়াল—সেটা তাব জীবনে এতই ঘটেছে যে গল্প কবার কিছু নেই।

পর্বেব শেষ অধ্যায় হিশেবে ধর্ষণটা ঠিক লাগসই হল না। এ যেন প্রায় পবস্পবেব সম্মতিতেই ঘটল। তবুও ত একটা ধর্ষণই, অসম্মতিব কোনো সুযোগই যেখানে নেই। ক্যাম্পেব বানভাসি লোকজন ত খানিকটা জানাই—সেখানে আব ফিবে যাওযাব দবকাব নেই।

ববং চবপর্ব এখানেই শেষ হোক।

পাহাড়েব তলা থেকে বাংলাদেশেব সঙ্গে আন্তর্জাতিক সীমানা পর্যন্ত তিস্তাব ভেতব ত কতই চব। কোনো চব ডাঙার চেয়েও স্থাযী। কিন্তু ডাঙা যেমন ভাসে, এই সব চবও ত তেমনি ভাসতে পাবে। প্রতি বছবই নানা বন্যাব সময এই সব চবে মানুষকে ঘবছাড়াব ভয পেতে হয।

চবে যাবা আবাদ কবে তাবা জল আব মাটিব সঙ্গে মৈত্রীব সম্পর্কটাকেই বড় কবে দেখে। তেমন ভাবনাচিন্তা কবে দেখে না, শরীবেব অভ্যাসে দেখে। ভাল মাটি, যদি খাটা যায ফসলও পাওযা যাবে। আব, সব জমিবই নিজস্ব ফসল আছে। সেইটি বুঝে নিতে হয—কোন জমিতে কী ফলবে? আগে কেউ কখনো শুনেছে তিস্তাব বালুবাড়িতে এত ভাল তবমুজ হয?

জলেব সঙ্গেও সেই মৈত্রীব সম্পর্কটাই অটুট থাকে। তুমি জলেব একেবাবে ভেতবে এসে ডাঙাব ফসল ফলাচ্ছ—জল তাব জাযগা ছেড়ে দিয়েছে বলেই না ফলাচ্ছ!

কিন্তু বছবেব এই কযেকটি মাস জলেব সঙ্গে সেই মৈত্রীব সম্পর্কটা ভেঙে যায। জল যে সব সময়ই তাব হাবানো জাযগাব দখল নেয, তা নয। জলেব শক্তি তখন মানুষেব শক্তিব চাইতে অনেক গুণ বেশি। তখন জলেব সঙ্গে বন্ধুত্ব বাখতে যাওযাব মানে মৃত্যু, শত্রুতা কবতে চাওযাব মানেও মৃত্যু। তখন জলকে পথ ছেড়ে দিতে হয। অনেক সমযই দেখা যায, জল নেমে গেলে মানুষ আবাব তাব পুরনো ঘববাড়ি ফিবে পায। কিন্তু দু-একটা চব আব চব হযে জাগতে নাও পাবে। সেই অনিশ্চযতাটুকু থেকেই যায। তা থেকে পবিত্রাণ নেই, তা থেকে উদ্ধাবও নেই। সেই কাবণেই চবেব মানুষ চব ছাড়তে-ছাড়তেও ছাড়ে না, যেন, না-ছাড়লেই চবটা তাদেব থেকে যাবে।

জল, আকাশ, এব কোনো কিছুই ত দেশীয় সীমান্তেব ঊর্ধ্বে নয। বাতাসেব আব, আলোব কোনো সীমানা নেই—তা ছাড়া সব কিছুরই আছে। সেই সীমানা যখন লোপাট হযে যায, তখন সেই সীমানানির্ধাবক শাসনকাঠামোও লোপাট। সীমানায়-সীমানায় এত ভাগাভাগি আটাআটি সত্ত্বেও ত ক[illegible] মানুষমানুষীই আছে যাদেব কোনো দেশই নেই, কোনো সীমান্তই নেই। সীমান্ত শুধু তাদেব ধর্ষি[illegible] জীবনকে আরো একটু বিড়ম্বিত করে মাত্র। সে বিড়ম্বনা থেকে তিস্তা-পাবেবও দেশহীন মানুষেরও কোনো মুক্তি নেই।

মুক্তি যখন নেইই, তখন চবপর্বেব কাহিনী শেষ হোক—নদীব মত তবল মাটিতে নদীব মতই ভেজা মেয়েকে যখন সীমান্ত ভেঙে শুতে হয।

বৃক্ষপর্ব

বাঘারুর প্রত্যাবর্তন

একশ কুড়ি

আপলচাঁদ ফরেস্টে রাত তিনটে

শনিবার রাত তিনটের সময় আপলচাঁদের ভেতরে তিস্তার পাড়ে দাঁড়িয়ে গয়ানাথ ও আসিন্দির তিস্তার ফ্লাড দেখছিল, ঠিক রাত তিনটেয়। আসিন্দিরের এক হাতে পাঁচ ব্যাটারির টর্চ, আর-এক হাতের কব্জিতে সিকো ঘড়ি ঢলঢল করে। সেই বাতাস, বৃষ্টি আর ফ্লাডের মধ্যেও আসিন্দিরের কব্জিতে নীল সময় দপদপ করছিল, যদি আকাশে তখন তারা থাকত, তবে সে তারাও দপদপ করত আসিন্দিরের সিকো ঘড়ির মতই। বাঘারু ফ্লাড দেখছিল না। সে গয়ানাথ আর আসিন্দিরের একটু পেছনে দাঁড়িয়েছিল। তিস্তার ওপরে ঘোলাটে আকাশ, ঘোলাটে আলো। কিন্তু পাড়ে, অত গাছগাছড়া থাকায় অন্ধকার। সেই অন্ধকারে বাঘারু আর-একটা গাছের মতই দাঁড়িয়েছিল।

আপলচাঁদ ফরেস্টের ভেতরে গাজোলডোবা যেখানে, সেখানে, শনিবার বিকেল থেকেই তিস্তা পাড় ভাঙছিল। ভাঙতে-ভাঙতে রাত বারটা নাগাদ সেখানে একটা ছোট সোঁতামতই যেন হয়ে যায়। এমন সোঁতা নয় যে তিস্তার জল ওখান দিয়ে হু হু করে ঢুকে আপলচাঁদের ভেতর দিয়ে ছুটবে। কিন্তু এমন একটা সোঁতা যে তিস্তার ফ্লাডের জল এখন ওখানে এসে ধাক্কা মারবে ও আবো মাটি খাবে। পরে, তিস্তার ফ্লাড যখন সরে যাবে—এ সোঁতাটাও শুকিয়ে যাবে। দেখতে-দেখতে গাছগাছালি বা জঙ্গলে গর্তটা বুজে যাবে। এক বছর পরে আর বোঝাও যাবে না যে এখানে তিস্তার একটা সোঁতা ঢুকেছিল।

আসিন্দিরের হাতে পাঁচ ব্যাটারির টর্চ কিন্তু সে সেটা জ্বালায় না। গয়ানাথ আর আসিন্দির পাড়ে দাঁড়িয়ে তিস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে—যেন তিস্তা থেকে কেউ উঠে আসবে।

গয়ানাথ বলে, 'কয়টা গাছ পড়িছে দেখ কেনে।'

আসিন্দির বলে, 'কয় দফা দেখিবার নাগে? স্যালায় ত চারিখান পড়িছে, আর পড়ে নাই।'

গয়ানাথ জিজ্ঞাসা করে, 'তর মনত খায় কী? অর্জুন গাছটা পড়িবে কি না পড়িবে?'

আসিন্দির পাল্টা জিজ্ঞেস করে—'তোমরালার মনত কী খায় বাপা? জল কি আরো ধাক্কা মারিবার ধরোছে? না ছাড়ি দিছে?'

এ কথার জবাবে গয়ানাথ তিস্তার স্রোতের দিকে আরো নিবিষ্ট তাকায়। এখন তিস্তার জল আর আকাশের মেঘ একই রকম ঘোলাটে। তাতে তিস্তার জলের আলাদা গতি বোঝা যাওয়ার কথা নয়। কিন্তু গয়ানাথ আর আসিন্দির সেই রাত বারটা থেকে দেখে যাচ্ছে। এতক্ষণ ধরে দেখতে-দেখতে তারা তিস্তার জল চোখ দিয়ে মাপার কতকগুলি পদ্ধতি তৈরি করে নিতে পেরেছে। অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থেকে তারা এখন বুঝতে পারছে, কোন একটা জায়গায় স্রোতটা মোটা হয়ে বাঁয়ে মোড় নিয়ে এই পাড়ের দিকে চলে আসছে। সেই বাঁকটাতে এই মরা আলোও একটু চকচকায়। স্রোতের আবর্তে যখন বেশি জল ঢুকে পড়ে আর আরো বাঁক নেয় তখন সেখানে আলোটা আরো একটু বেশি চকচকায়।

তেমন একটু দেখেই গয়ানাথ ডাকে, 'হে-এ বাঘারু, দ্যাখত জল বাড়ি গেইছে কি না।' বাঘারু তখন পাড় থেকে ঝপ করে নতুন সোঁতায় লাফিয়ে পড়ে। জল মাপবার জন্যে সেখানে বাঘারু একটা ডাল পুঁতে রেখেছে। জলের ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ার আওয়াজ উঠলে আসিন্দির একটু ঘুরে টর্চটা জ্বালায়। টর্চের আলোপথ জুড়ে দেয়ালির পোকার মত বৃষ্টির ছাঁট। বাতাসে সেই আলোময় বৃষ্টি তোলপাড় হয়—টর্চের ঐটুকু আলো জুড়েও। বাঘারু নিচু হয়ে দেখে তার আগের বারের দাগ জল ছাড়াল কি না। সে জন্যে জলের কিছু স্থিরতা ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়—জলের যে সামান্য তোলপাড় সে কি নতুন স্রোতের ঘায়ে নাকি বাঘারু লাফিয়ে পড়ায়? আসিন্দির একবার নিবিয়ে আবার আলো জ্বালে। বাঘারু সেই আলোর মধ্যে নিজের ঘাড়টা পেতে দিয়ে নিচু হয়ে দেখে বলে, 'নাই রো।' তারপর দাঁড়িয়ে থাকে। আলো নিবে যায়। বাঘারু একটা অর্জুন গাছের শেকড় ধরে উঠে আসে।

গয়ানাথ আর আসিন্দির অপেক্ষা করে আছে এই অর্জুন গাছটা কখন পড়বে। কিন্তু অর্জুন গাছটার গোড়ার মাটি প্রায় অর্ধেক ক্ষয়ে গেলেও গাছটা সোজা হয়েই দাঁড়িয়ে আছে। মাঝখানে একবার গয়ানাথ বাঘারুকে দিয়ে গাছটা ঠেলিয়েও ছিল। বাঘারু জানে এখানে স্রোতটা যত জোরে লাগছে তাতে অর্জুন গাছটা কোনোদিনই হয়ত পড়বে না। ওর শেকড় ওদিকে অনেকখানি ছড়িয়ে আছে। এখানে স্রোতের

টানের জোর এত কিছু নয় যে সেই শেকড় খেয়ে নিতে পাবে। ববং উল্টনো এই অর্জুন গাছটার জন্যেই হয়ত স্রোতটা এখানে ঠেকে থাকবে, বা, ডাইনে বেঁকবে নরম মাটি খেয়ে।

আসিন্দির বলে ওঠে, 'আর দেরি করিবার কাম নাই, ভাসি দেন, বাপই, ভাসি দেন।' গয়ানাথ আবার সেই জলের বাঁকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেও বলে ওঠে, 'তা হয় ত দে কেনে, ভাসি দে, বাঘারুক বল্, কুড়ালিয়াখান নিয়া আয়।'

আসিন্দির বাঘারুকে ডাকে না। ঘুরে, টর্চটা আর-একবার জ্বালিয়ে বাঘাকর দিকে যায়। তার পরনে লুঙি, পায়ে গামবুট। একটু গিয়েই তার চোখে কেমন ধাঁধা লাগে। কিন্তু চোখের সেই ধাঁধা দূর করতে টর্চ না জ্বেলে সে গাছ-মোচড়ানো বাতাসে অন্ধকারে ডেকে ওঠে, 'হে-এ বাঘাক', খানিকটা চমকে ডেকে ওঠার মত। বাঘারু আসিন্দিরের ঘাড়ের ওপর শ্বাস ফেলার ঘনিষ্ঠতায় কথা বলে ওঠে, 'কন কেনে।' তখন আসিন্দির টর্চ জ্বালায়। টর্চ জ্বালিয়ে বাঘারুকে আপাদমস্তক একবার আলোকিত করে। সেই প্রক্রিয়ায় বাতাসে গাছগাছড়ার পাক খেয়ে যাওয়া ও ভেজা জঙ্গলও চকিতে দেখা যায। আসিন্দির তিস্তার দিকে টর্চ মেরে তার শ্বশুরকেও দেখে নেয। মাত্র এই কয়েক পা এসেই তার মনে হল হাবিয়ে যাচ্ছে—হাতে একটা পাঁচ ব্যাটাবিব টর্চ থাকতেও? বাঘাককে নিশ্চিত ভাবে দেখে নিয়ে সে বলে, 'কুড়ালিগা নিয়া যা, বুড়া ডাকিছে।'

অন্ধকারে বাঘারু দু পা গিয়ে অভ্রান্ত হাত মেলে এক গাছের কাণ্ডে বিঁধিয়ে বাখা কুডালটি এক ঝটকায় তুলে নেয়। ঝপ করে ঝোপের মধ্যে কিছু পড়ে যায। বাঘাক ভুলে গিযেছিল—কুডালের সঙ্গে নাইলনের দড়ির দুটো বাণ্ডিল ঝোলানো ছিল। সেটা ঝোপ থেকে তুলে সে গয়ানাথের দিকে যায়। গয়ানাথ নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে। আসিন্দির একটু ভেতবে। কুড়োল হাতে গযানাথেব দিকে বাঘাকর হাঁটাটা দেখে আসিন্দির একটু ভয় পেয়ে ওঠে—আবাব। সে তাব নাইলনেব জামাব বুক পকেট থেকে সিগারেট আর লাইটার বের করে।

গয়ানাথ টের পায় না বাঘারু পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। সে তখনো স্রোতের সেই বাঁকের দিকে তাকিয়ে। বাঘারু ডাকে 'দেউনিয়া—।'

'অ্যা? আসিছিস? নে, ভাসি দে, ভাসি দে।'

বাঘারু নদীর পাড়ে দাঁড়ায়। তারপর, জেলেরা জাল ফেলার সময় জালটা মাথার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে জলে ফেলার আগের মুহূর্তে হাঁটুটা যেমন সামান্য ভেঙে দেয়, বাঘারু সে-রকম ভঙ্গিতে নদীর দিকে তাকায়। নদীর বিস্তারের দিকে নয়, যে-নদীটা এখন বন্যাবাহিনী তিস্তা সেই নিশীথ জলরাশির দিকে নয়, বাঘারু তাকিয়ে থাকে ঠিক তার পায়ের তলার জলগুলোর দিকে, যেন ঐ জল নেহাৎই বাঘারুর শোল-মাগুর জিয়নো ডোবার জল, তার সঙ্গে ঐ জলরাশির প্রবলতার যেন কোনো সম্পর্কই নেই, বা, থাকলেও তাতে বাঘারুর কিছু যায়-আসে না।

একশ একুশ

বাঘারুর বৃক্ষকর্তন

বাঘারু ডান দিকে ঘুরে পাড় দিয়ে জঙ্গলের আরো ভেতরে চলে যায। সেখানে একটা মাঝারি সাইজের শালগাছ জলের মধ্যে পড়ে গেছে কিন্তু তার শেকড়টা এখনো মাটিতে। বাঘারু বাঁ হাত দিয়ে কুড়ালটা তার নেংটির পেছনে গুঁজে নেয়—কুড়ালের কাঠটা তার মেরুদণ্ডে খাঁজের সঙ্গে মিশে যায় আর কুড়ালটা একটু আলগা হয়ে থাকে। নাইলনের দড়ির বাণ্ডিলটার মাঝখানের ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে সে বাণ্ডিলটাকে বাঁ কাঁধে তুলে নেয়; কাঁধে পুরোটা ওঠে না, বাহুতে ঝুলে থাকে। তারপর সে শালগাছটার উৎপাটিত শেকড়টা ধরে টেনে একবার আন্দাজ নিয়ে গাছটার কাণ্ডে পা দেয়—সেই কাণ্ডের নীচেই তিস্তার জল। বাঘারু বাঁ-পাটা কাণ্ডের ওপর দেয় কিন্তু ডান পা-টা মাটি থেকে তুলতে গিয়ে বোঝে শরীরের পুরো ওজনটা এক ধাক্কায় সে বাঁ-পায়ের ওপর নাও তুলতে পারে। সে বাঁ-পাটা নামিয়ে নেয়।

শেকড়টা ছেড়ে আবার সোজা হয়ে দাঁড়ায়। এবার সে ঘুরে গাছটার উল্টো দিকে যায়। বাঁ হাতে তাকে ঐ একই শেকড় ধরতে হয়। এবার ডান পা-টা কাণ্ডের ওপর তুলতেই বাঘারু বুঝে ফেলে নদীর ভেতর পড়ে থাকা গাছটির অবস্থান ও তার লাফিয়ে উঠে ডালপালার কাছে চলে যাওয়ার মধ্যে একটা সঙ্গতি এসে গেল। এটা প্রথমে বুঝে তারপর যে বাঘারু ডান পাযেব ওপর শরীরের ভব দিযে নদীব ভেতব সাঁকোর মত ঐ গাছটাতে ওঠে, তা নয়! সে বাঁ হাতেব মুঠোতে শেকড ধরে ডান পা-টা কাণ্ডটিব ওপব নিয়ে একবার মাত্র পায়ে একটা ঝোঁক দিয়েছে, তারপবেই গাছটা বেয়ে উঠেই সে ডান হাতে তলার ডালটা ধরে ফেলে, শেকড থেকে বাঁ-মুঠোটা খুলে শূন্যেব ওপব দিযে হাতটাকে নিয়ে এসে তলার আরো একটা ডাল ধবে ফেলে। ঐ কয়েকটি সেকেণ্ডে বাঘাক জলের ওপব দিয়েই যেনে হেঁটে গেল চিলেব ডানার মত তার দুই হাত ছড়িয়ে দিয়ে। সেই তলাব ডালদুটোব কাছে পৌঁছেই বাঘাক দু দিকে দু পা দিয়ে গাছটার মধ্যে বসে পড়ে। নাইলনেব বাণ্ডিল দুটো বেঁধে একটা বাণ্ডিল কবা আছে। সে বাণ্ডিলটা বের কবে না, কিন্তু তার মাথাটা যেখানে গোঁজা ছিল সেখানে একটা ঝটকা দিয়ে মাথাটা বের করে এনে গাছটার তলার ঐ ডাল দুটোর ফেঁকড়ির ভেতর দিয়ে দড়িটা চালিয়ে দেয়। বাঘাক কাণ্ডটাকে পেঁচিয়ে দু দিকের দুই ডালের ফেঁকড়ির ভেতর দিয়ে ৪-এব মত এক গিঁট দিয়ে ফেলে। দড়িটা কাটবার জন্যে বাঁ হাতটা ঘুবিয়ে কুড়োলটায় হাত দিয়েও সে হাত সরিয়ে আনে। তাবপব তাব শবীরটাকে লম্বা করে সে গাছটার ডালপালার আবো ভেতরে মাথাটা নিয়ে যায়। পাতাব ভেতর দু-হাতেব দশটা আঙুল চালিয়ে আব-একটা ডাল খুঁজে বের কবে কিন্তু সেটাতেও গিঁট দিতে গিযে দেখে সে ত মাথাটাকে আগের গিঁঠেই বেঁধে দিয়েছে। বাঘারু তখন বাঁ বাহু থেকে বাণ্ডিলটাকে গডিযে হাতেব আঙুলে আনবার জন্যে ওখানে শুযে-শুযে বাঁ হাতটা আস্তে-আস্তে ঝোলায়, কব্জিটা বেঁকিযে রেখে, যাতে বাণ্ডিলটা ঝপ করে জলে পড়ে না যায়। কব্জিব কাছে বাণ্ডিলটা এসে গেলে বাঘাক হাতটাকে নাচিযে বাণ্ডিলটাকে আঙুলে নিয়ে আসে, এইবাব বাণ্ডিলটাকে গাছটাব তলা দিযে হাতে চালান কবে আবাব ওপব দিয়ে বাঁ হাতে নিয়ে আসে। পেঁচানো হযে গেছে, এবাব গিঁট দিতে হবে। কিন্তু পুবো বাণ্ডিল দিযে ত আব গিঁট দেযা যাবে না। বাঘাক ডান হাতটা পিঠেব দিকে বেঁকিযে কুড়োলটা খোলে। দড়িটা কাণ্ডেব ওপব তাব চোখেব ঠিক নীচে। সে কুড়োলেবই পেছনট' ধবে খুচ কবে একটা ঘা দিতেই দড়িটা কেটে যায়—এখন তার ডান হাতে কুড়োল, বাঁ হাতে বাণ্ডিল। সে আগে কুড়োলটা পিঠে গোঁজে, ডানহাতে বাণ্ডিলদড়িব আলগা মাথাটাকে আর গিঁটেব আলগা মাথাটাকে ধরে রেখে বাণ্ডিলটাকে বাঁ হাতের আঙুল থেকে কনুইয়েব দিকে নিয়ে যায়। তারপর দশ আঙুলে গিঁঠটা দেয। গাছে পিপড়ে ছিল। গিঁঠ দেযাব সময় পিঁপড়েগুলো তাকে এত কামড়ায় যে গিঁঠ দেযা হযে গেলে তাকে আগে হাত দুটো ঝেড়ে তারপর সোজা হতে হয়। পাড়ে ফিরে আসাব জন্যে বাঘাক দু দিকেব ডাল ধরে দাঁড়ায় আর তারপর একটা পা এগিয়ে দিয়ে মাটিতে লেগে থাকা শেকডটাব ওপর ঝাঁপিযে পড়ে। তাব সঙ্গে-স‌ে নাইলনের দড়িটা গাছের মাথা থেকে পাড পর্যন্ত দোলে। সেটাকে আবো একটু দুলিয়ে বাঘারু ফবেস্টের আর-একটু ভেতরে ঢুকে যায়। সেখানে একটা গাছের কাণ্ডে কয়েকটা প্যাঁচ দিয়ে বাণ্ডিলটাকে গাছটার গোড়ায় ফেলে রেখে ডান হাতে পিঠ থেকে কুড়োলটা খুলে নিয়ে জলে পডা শালগাছটার কাছে এসে নিচু হয়ে উৎপাটিত শেকড়ের যে-অবশিষ্ট অংশ তখনো গাছটাকে আটকে রেখেছিল, সেটুকুর ওপর ঝুঁকে পড়ে। বাঘারু কিছু দেখতে পায় না। সে ডানহাত দিয়ে আন্দাজ নিতে চেষ্টা করে। কিন্তু আন্দাজও কিছু পায় না। তখন সোজা দাঁড়িয়ে কুড়োলটা মাথার ওপব তুলে সেই শেকড়টার ওপর নামায়। কোপটা পড়তেই বাঘারু বোঝে ঠিক জায়গায় পড়েছে ' তার পরেব কোপগুলো সেই নিশ্চয়তাতেই নেমে আসতে থাকে। গাছটার ভেতর থেকে একটা আওয়াজ একটু-একটু করে উঠে সারা গাছেই ছড়িয়ে যায়। তারপর গাছের মাথা থেকে জলের আওয়াজটা বদলে যায়। বাঘারু বোঝে গাছটা আরো ঝুলে গেছে। আরো দু কোপ দিতেই গাছটা একটা সংক্ষিপ্ত তীব্র আওয়াজ তুলে জলের ভেতর পড়ে যেতে থাকে। জলের আওয়াজটা হঠাৎ বেড়ে উঠে আবার কমে যায়। ঝুপঝুপ করে কিছু মাটি পড়ার শব্দ ওঠে, গাছটার শেকড়টা তারও পরে নাইলনের দড়িটাকে টানটান করে তিস্তার জলে ভেসে ওঠে। বাঘারু তাড়াতাড়ি কুড়োলটা পিঠে গুঁজে, সেই গাছের গোড়ায় গিয়ে দড়ি ধরে টানতেই বোঝে গাছটাকে স্রোত টানছে। সে তাড়াতাড়ি বাণ্ডিলটা তুলে নিয়ে প্যাঁচটা একে একে খোলে। প্যাঁচ খোলার আগেই যেন ভেসে যাচ্ছে—স্রোতের এত টান। শেষ প্যাঁচটা খোলে না বাঘারু—তা হলে তাকেই জলে টেনে

নিতে পাবে। সে একটা প্যাচ গাছের সঙ্গে রেখে একটু-একটু করে দড়ি ছাড়তে থাকে। বেশ খানিকটা ছাড়ার পর বাঘারু বোঝে সে জলের টান সামলাতে পাববে। তখন গাছ থেকে শেষ প্যাচটা খুলে সে স্রোতে ভাসা গাছেব সঙ্গে সমান বেগে দৌড়ে গয়ানাথ আসিন্দিব যেখানে আছে সেদিকে ছোটে। কিন্তু দু পা ছুটেই আবাব একটা গাছের সঙ্গে দড়িটাকে লাগিযে দেয়। একটু অপেক্ষা করে আবার দু পা ছোটে। এই প্রথম গাছটাকে ভাসানোব আগে তাকে একটু বুঝে নিতে হয়—বাতাসের বেগ, স্রোতের ধাব আব তার নিজেব জোব। তাকে আবো তিনটে গাছ এ-বকম কবে ভাসানোব জন্যে বেঁধে এনে, তাবপর চারটেকে একসঙ্গে ভাসিযে দিতে হবে।

এখানে, এই ওপরে, ফরেস্টের ভেতর, বাতাস আর বৃষ্টির ধরনটা আলাদা। নদীর ওপব দিয়ে বৃষ্টি আর বাতাস এই আবছা আলোতে নদীর স্রোতেব মত বেগে স্রোতেবই বিপবীতে পাহাড়েব দিকে ধেয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টির ফোঁটা মাটিতে পড়তে পাবছে না। কিন্তু সেই বাতাসই আবাব হু হু করে ফবেস্টের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। এই নিশুত বাতে, তাবাহীন, বা বলা যায আকাশহীন বাতে, হঠাৎ বাঁধভাঙা বন্যাব জলেব মত বাতাস নদীর ভেতব থেকে ফবেস্টের ভেতব ঢুকে আব বেবতে পাবছে না। গাছেব-পাতায-পাতায় আকাশটা এত ঢাকা যে বাতাস আকাশে বেবিয়ে যেতে পাবে না। গাছেব নীচে মাটিব ওপবে এত বেশি ঘাস আব জঙ্গল যে বাতাস সেখানে ঢুকে হেঁটেও বেবিয়ে যেতে পাবে না। ফলে, নদীর বুক থেকে হু হু ঢুকে কাণ্ড বেয়ে, ডালপালা বেযে, গাছের সংলগ্ন অন্যগাছের ডালপালা দিয়ে ফরেস্টময় স্রোতের বেগে ছড়িয়ে অপব কাণ্ড বেযেই ছুটে নেমে আসে। মাটিব ওপরেব জঙ্গলগুলিব ভেতব, লুকনো একপাল পশুর মত সে-বাতাস ছুটে গিযে ঢোকে কিন্তু বেবিয়ে আসতে গিযে সাত পথে হাবিযে যায়। আর সেই বাতাসের বেষ্টনীতে আপাদমস্তক ফরেস্টটা মুচড়ে-মুচড়ে ওঠে।

একশ বাইশ

গয়ানাথ মাটি-গাছ-জলের স্বরে কথা বলে ওঠে

গয়ানাথ বলে, 'হে-এ আসিন্দির, দেখ ত কনেক, অর্জুন গাছটা খাইছে কি খায় নাই?'

আসিন্দির টর্চ জ্বালে আর বলে, 'ঐ অর্জুন গাছটোব তানে তোমাক শালগাছ গিলা ছাডিবাব নাগিবে', বলে সে টর্চটা নিবিয়ে দেয়। আবার দু জনে চুপ করে থাকে। এখন দু-জনই বসে আছে—একই গাছের গুঁড়ির ওপর। গয়ানাথ তিস্তাব দিকে মুখ করে, আসিন্দিব ফবেস্টেব ভেতবেব দিকে মুখ করে। ফরেস্টের সেই ভেতর থেকে আওয়াজ আসছে—বাঘারু শেষ গাছটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে জলে ভাসিয়ে এই বাকি যে-তিনটি গাছ গয়ানাথের সামনের পাড়েব নীচে তিস্তায রাখা আছে, সেগুলোর সঙ্গে আঁটি বাঁধার জন্যে টেনে আনবে। অত বড়-বড় গাছের ডালপালা জলের ভেতর থেকে পাড়ের ওপর উঠে এসেছে—একেবারে গয়ানাথের পা পর্যন্তই প্রায়। আবছা আলোয সেই ডালপালাগুলো কিছুটা ছায়া-ছায়া বলেই অনেক বড় দেখাচ্ছে। এখান থেকে গয়ানাথ তিস্তার ভেতরে জলের যে উজ্জ্বলতা দেখে জলের তোড় আন্দাজ করছিল—সেই জায়গাটি আর দেখা যাচ্ছে না। তিন-তিনটি গাছের ডালপালা তিস্তাকে প্রায় সম্পূর্ণ আড়াল করে রেখেছে। তিস্তা আড়ালে পড়াব পর তিস্তাব আওযাজটা এখন গয়ানাথ আর আসিন্দিরের কানে আসছে। গুমগুম আওয়াজ তুলে তিস্তার জল বয়ে যাচ্ছে—আওয়াজেই যেন বোঝা যায় পেছনে আরো নদী-নদী জল এমন চণ্ড বেগে এই জলটাকে ভাটিতে ঠেলছে। তিস্তার বন্যার সঙ্গে যাদের কিছু পরিচয় আছে তারাই জানে—তিস্তার জল যখন জলের মত ছলছল খলখল শব্দ না করে, বড়-বড় বোল্ডারের সঙ্গে বোল্ডারের ঘর্ষণের মত গুমগুম আওয়াজ তোলে তখন পাতাল থেকে তিস্তার জল উঠতে থাকে, সে জল সব ভাসিয়ে দেবে—গাঁ-গঞ্জ, বাড়ি-টাড়ি সব। এই শেষ রাতে তিস্তার ভাঙনে ফরেস্টের পড়ে যাওয়া গাছ বেঁধেছেঁদে তিস্তায় ভাসিয়ে, কয়েকদিন পর জল নামলে, ভাটিতে যেখানে ঠেকে থাকবে সেখানে গিয়ে দখল নিয়ে স মিলের কাছে বেচে হাজার-হাজার টাকা লাভের ব্যবসায়ী নেমেছে জামাই-শ্বশুর। কিন্তু, এখন, গাছগুলো ভাসিয়ে দেয়ার ঠিক আগে, এই গাছের থেকেও এই তিস্তার বন্যা তাদের কাছে বেশি সত্য হয়ে উঠল

হঠাৎ—যে-বন্যা ফরেস্টের এমন-এমন আকাশছোঁয়া গাছকে তাদের পঞ্চাশ-আশি-একশ বছরের শেকড়সুদ্ধ উপড়ে দেয়, সেই বন্যা আসিন্দির আর গয়ানাথকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে চোখের পলক ফেলার আগেই। উৎপাটিত গাছের ডালপালার আড়াল থেকে তারা সেই সর্বনাশের আওয়াজ শোনে।

কিন্তু এ গাছগুলোতে গয়ানাথের এক ধরনের হকও ত আছে!

গাজোলডোবার কাছে তিস্তা আপলচাঁদের পাড় ভাঙতে শুরু করে শনিবার সকাল থেকেই। এক সময় সেখানেই ফরেস্টের সঙ্গে গয়ানাথের পৈতৃক একখতিয়ানের জমি ছিল। শেষ সেটলমেন্টে সাব্যস্ত হয়ে গেছে—সেখানে গয়ানাথের আর-কোনো জমি ফরেস্টের সঙ্গে নেই, সব জমিই ফরেস্টের খতিয়ানভুক্ত করে দেয়া হয়েছে। গয়ানাথ সেই সেটলমেন্টের বিরুদ্ধে আপিল করে। সেটলমেন্টের সব আপিলেই রায় বহাল থাকে। তখন গয়ানাথ জলপাইগুড়ির কোর্টে সিবিল মামলা ঠোকে ও ফৌজদারি কোর্টের কাছে দরখাস্ত করে যে মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত পূর্বাবস্থা বহাল থাকুক। আদালতও একটা সময় পর্যন্ত কার্যকর রাখার জন্যে এই আদেশ দেন। কিন্তু সেই সময় পার হয়ে যাওয়ার পর গয়ানাথ আবার দরখাস্ত করলে আদালত আর-একটু বিশদভাবে বিষয়টি খতিয়ে দেখেন যে ওখানে পূর্বাবস্থা বহাল রাখলেও গয়ানাথ বা সরকারের কারো কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হচ্ছে না। তা হলে আপনারা পূর্বাবস্থা বহাল রাখতে চান কেন— আদালতের এই প্রশ্নের জবাবে গয়ানাথের উকিল জানান যে তাঁদের ভয় ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট তা হলে এই জায়গায় সব গাছ কেটে নেবে। কথাটায় আইনি প্যাঁচ ছিল। যে-সম্পত্তির মালিকানা এখনো আদালতে সাব্যস্ত হয় নি সেই সম্পত্তির ভোগদখল যদি অপরপক্ষ করে বসে তা হলে বাদীর সমূহ আর্থিক ক্ষতি। বিশেষত, যে-জমির মালিকানা নিয়ে মামলা, সে-জমির প্রধান আর্থিক সম্পদ ফরেস্টের এই গাছ। আদালত রঙ্গরসিকতা করে গয়ানাথের উকিলবাবুকে বলেও ছিলেন—আরে ওটুকু না-হয় গয়ানাথবাবু সরকারকে খয়রাৎ করে দিন। আদালতের সম্মান রাখার জন্যে উকিলবাবুও গয়ানাথবাবুকে কানে-কানে কথাটা জানান। গয়ানাথবাবুর কথামত উকিলবাবু আদালতকে জবাবে জানান যে স্যার যদি হুকুম দেন তা হলে গয়ানাথবাবু তাঁর নিজ খতিয়ানের যে-কোনো দাগ থেকে মামলাধীন জমির সমপরিমাণ জমি সরকারকে খয়রাৎ করতে রাজি আছেন কিন্তু এখানে ত সম্পত্তির মালিকানার মামলা, সেই মালিকানা ঠিক না হলে গয়ানাথবাবু খয়রাৎ করার কে, তা হলে বরং স্যার রায় দিয়ে দিন যে ঐ জমিতে গয়ানাথেরও অংশ আছে, তার পরে গয়ানাথবাবু ওটা সরকারকে খয়রাৎ করে দেবেন। আইনের প্যাঁচ হাকিমের চাইতেও ভাল জানেন গয়ানাথবাবু উকিল—তিনি জেলার এক নম্বর উকিল। কিন্তু উকিলের চাইতেও ভাল জানে গয়ানাথবাবু নিজেই—তার বাপঠাকুর্দার কাছ থেকে জমির আইন তার শেখা। সরকার পক্ষের উকিল একবার অন্যমনস্ক ভাবে বলেওছিলেন, স্যার, এখানে এ-অর্ডার দিলে তিস্তা ব্যারেজ তৈরি করার অসুবিধে হবে। আদালত একটু খুশি হয়েই বলেন, তা হলে তিস্তা ব্যারেজের প্ল্যানটা দেখান আর ওরা এই জমির এলাইনমেন্টে কী করবে সেটা বলুন। কিন্তু সরকারি উকিলের কাছে সে-সব কিছুই ছিল না। তাঁরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে আদালতকে জানান—স্যার ঠিক আছে, এবারও অর্ডার যদি দিতে চান দিন, আমরা পরের ডেটে তিস্তা ব্যারেজের মাস্টার প্ল্যান ও এই জমির ব্যাপারে ইনজিনিয়ারদের রিপোর্ট আদালতে পেশ করব। সরকারি উকিলের কথাতে, পরে, গয়ানাথ হাতে চাঁদ পেয়ে গিয়েছিল। যে-তারিখেই এই দরখাস্ত ওঠে, গয়ানাথের উকিলবাবু বলেন যে স্যার সরকারপক্ষ তাঁদের কথামত কাজগপত্র জমা দেন নি, সুতরাং পূর্বাবস্থা বহাল রাখার আদেশ বহাল থাকুক। সরকারি উকিলের হাতে আরো জরুরি মামলা। এখন এই এক চিলতে জমির জন্যে কে মাস্টার প্ল্যান আর ইনজিনিয়ারদের রিপোর্ট জোগাড় করবে? ফলে সিবিল কোর্টে জমির মালিকানার মামলা চলতে থাকে আর ঐ জমির ব্যাপারে পূর্বাবস্থাও বহাল থাকে।

সোম-মঙ্গলবার থেকে ক্রান্তিহাট-গাজোলডোবা-আপলচাঁদের আকাশও ভারী হয়ে নীচে নেমে আসে; বাতাস আর বৃষ্টি বইতে থাকে। কিন্তু ভাটির বৃষ্টি আর বাতাসের চাইতে ওপরের বৃষ্টি আর বাতাসের প্রকৃতি আলাদা। ভাটিতে বাতাস আকাশ থেকে বা আকাশের সীমান্ত থেকে, অবলম্বনহীন ছুটে আসে। আর ওপরে, এই ফরেস্টের কাছে বাতাসটা মাটির ভেতর থেকে উঠে আসে। খ্যাপা হাতির ও পাল হয় না। তা হলে বলা যেত—এ বাতাস খ্যাপা হাতির পালের মতন।

এ-রকম বাতাস আর বৃষ্টি থাকলে তিস্তার জল বাড়বেই। কিন্তু কতটা বাড়বে, কত দিন থাকবে তার

ত আর-কোনো আন্দাজ পাওয়া যায় না। গয়ানাথ জোতদারের জমিজমা চারদিকে ছড়ানো। সে এই অংশ-জমির মালিকানা নিয়ে সিবিলকোর্টে মামলা করতে পারে, সে এই জমিতে পূর্বাবস্থা বহাল রাখার জন্যে ফৌজদারিও কবতে পারে কিন্তু তাই বলে তার সব কাজকর্ম ফেলে সে ত আর এই জমিতে পাহাবা দিতে পারে না।

পাহারা দিক আর না-দিক, শুক্রবার বিকেলেই গয়ানাথের কাছে খবর আসে আরো ওপরে তিস্তা ভাঙছে। তাতেও গয়ানাথের কিছু যায়-আসে না। কারণ, ওদিকে গয়ানাথের জমি নেই আর গয়ানাথের বাড়িঘর তিস্তা থেকে দূরে। কিন্তু শনিবার দুপুর নাগাদ গয়ানাথ যখন খবর পায় তিস্তার ভাঙন গাজোলডোবায শুরু হয়েছে সে তাব জামাইকে ডেকে বলে, 'ভটভটিখান বাহির কর্, জমিখান দেখি আসি।'

আসিন্দিরের পেছনে বসে গয়ানাথ তার পূর্বাবস্থাবহাল জমির হাল তিস্তা কোনোভাবে বদলে দিচ্ছে কি না দেখতে গিয়ে দেখল—ফরেস্টেব অত ভেতবে, বাড়িটাড়ি থেকে অত দূরে তিস্তা ফরেস্টের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। একটা জায়গায জমি এতটাই খেয়ে ফেলেছে যে সেখানে আলাদা খাঁড়ি তৈরি হয়ে যাচ্ছে।

তখনই মাথায় বুদ্ধিটা খেলে গেল গয়ানাথ জোতদারের। তার চোখের সামনে একটা অন্তত বছর সাতেকের শালগাছ উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

'বাঘারুক্ নিগি আয়, আর টর্চখান', গয়ানাথ সেই স্বরে জলে কথা বলে ওঠে যে-স্বর এখানকার মাটি-গাছপালা-জলের সঙ্গে মেশানো। গয়ানাথ যদি এই হাওয়ার আর এই জলের আওয়াজ বোঝে, তা হলে এই জল আর হাওয়াও গয়ানাথের গলার আওয়াজ বোঝে। সেই তরুণ শালতরুর শেকড়ের ওর পা রেখে গয়ানাথ তাব জামাইকে আদেশ দেয়—'ভটভটিখান নিগি যা, টর্চ আনিবু, তোর বড় টর্চখান, বাঘারুক আনিবু, ভাল একখান কুড়ালিযা আনিবু, নাইলনেব দড়ি আনিবু এক বাণ্ডিল কি দুই বাণ্ডিল, মোটা নাইলন'—তিস্তার দিকে তাকিয়ে গয়ানাথ তাব ছোট-ছোট হাতের রোগা আঙুলগুলোর মাথা বুড়ো আঙুলেব সঙ্গে মিলিয়ে কত মোটা সে চায় তার একটা আন্দাজ দেয়, দুই হাতের আঙুলগুলো দিয়েই আন্দাজ দেয়। আসিন্দির পেছন ফিরলে ঘাড় ঘুরিয়ে গয়ানাথ বলে দেয়—'চিড়াগুড় আনিবু, সারা রাইত থাকা নাগিবা পারে।'

আসিন্দির চলে যায় আর গয়ানাথ একা-একা সেই প্রবল বৃষ্টি আর বাতাসের মধ্যে তিস্তার ফ্লাড আর ফরেস্টের গাছ পাহারা দেয়। সেই কিছুক্ষণ, কয়েক ঘন্টা তিস্তার জলের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে গয়ানাথ সেই লক্ষ-লক্ষ কিউসেক জলের তলার মাটিটাকেও যেন দেখে নেয়—দেখে নেয় সে মাটির ঢাল কোনদিকে কতটা, সে ঢালে বালি আর পাথর জমে আছে কিনা। সেই কিছুক্ষণ, কয়েকটি ঘন্টা ঐ বাতাসের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে গয়ানাথ সেই বায়ুর বেগ মেপে নেয়—মেপে নেয় আকাশের যে-শূন্যতা পূর্ণ করতে এই বাতাস পুব থেকে ছুটে আসছে সে-শূন্যতা আরো কত গভীর; এই বায়ুনিহিত জলরাশির ভেতর আরো কত মেঘ আছে, মেঘে আরো কত জল আছে। তিস্তা, বাতাস, বৃষ্টি আর ফরেস্ট মিলিয়ে গয়ানাথ এই নদী-অববাহিকার আগামী কয়েকদিনের আবহাওয়ার কর্মসূচি ঠিক করে নেয়।

সেই ফ্লাড গয়ানাথের নির্দেশ অনেকটাই মানল—যে-জায়গাটায় ভাঙন ধরেছিল সেখান দিয়ে তিস্তার জল সত্যিই ঢুকল, সেই স্রোতের পথে আরো দুটো গাছ জলেও পড়ল।

আসিন্দির বাঘারুকে মোটর সাইকেলের পেছনে প্রায় বেঁধেই নিয়ে আসে—কারণ চালানোর সঙ্গে-সঙ্গে বারবারই বাঘারু পড়ে যায়। বাঘারুব সঙ্গে কুড়োলও আসে, নাইলনের দড়ির বাণ্ডিলও আসে। আরো একটা গাছ জলে পড়ে। কিন্তু অর্জুন গাছটা আর পড়ল না।

বাঘারু চতুর্থ গাছটিকে ভাসিয়ে আগের তিনটি গাছের কাছে নিয়ে আসে।

একশ তেইশ

'বাঘারু হে, তুই ভাসি যা'

বাঘারু নদীর পাড়ে দাঁড়ায়, তার বাঁ বাহুতে নাইলনের দড়ির একটা বাণ্ডিল, বাঁ হাতের মুঠোতে ধরা দড়ি—গাছগুলোকে টেনে রেখেছে, ডানহাতে কুড়োলটা ঝুলছে। দড়িটা বাঘারুর মুঠোতে ছাড়াও যে-গুঁড়িটার ওপর গয়ানাথ আর আসিন্দির বসেছিল, সেই গুঁড়িটাতে জড়িয়ে রাখা। গয়ানাথ বললেই বাঘারু তার মুঠোর দড়িটা ছেড়ে দেবে, তখন স্রোতের টানে গাছগুলো কিছুটা দূরে চলে যাবে, তার পর গুঁড়িটা থেকে দড়িটা খুলে দিলেই ভেসে যাবে। বাঘারু দাঁড়িয়ে থাকে, গয়ানাথ কখন 'ছাড়ি দে' বলে তার অপেক্ষায়।

গয়ানাথ আসিন্দিরকে জিজ্ঞাসা করে—'কয়ড়া বাজিছেন হে?'

আসিন্দির চকিতে ঘড়িটা দেখে বলে—'চারিডা।'

'চারিডা?' গয়ানাথ নিজের মনেই বলে ওঠে।

নদীর ওপরে যে-আবছা আলো ছিল সেটা হঠাৎ মুছে যেতে থাকে। অথবা অনেকক্ষণ ধরেই মুছে যাচ্ছিল, এতক্ষণে তাদের নজরে পড়ে। দশমী-একাদশীর চাঁদ হঠাৎ কাল মেঘে ছেয়ে গেলে যে-রকম হঠাৎ আঁধার ঘনায়, এখন আলোটা সে-রকম হয়ে উঠল। বাঘারু আকাশে তাকায় নি। গয়ানাথ আর আসিন্দির তাকায়। তাকিয়ে বোঝে, চাঁদ ডুবে গেছে, এখন অন্ধকার আরো বাড়তে থাকবে, যতক্ষণ না সূর্য ওঠে। কিন্তু সূর্য কখন উঠছে, কয়েক দিন ধরে সেটা বোঝাও যাচ্ছে না। না গেলেও আকাশটা আবার ঐ-রকম আবছা আলোয় ভরে যাবে, রাতের চাইতে আর-একটু কম আবছা।

এতক্ষণ ঐ আবছা আলোটা নদীর ওপরের ফাঁকটায় ছিল। সেই ফাঁক থেকে ফরেস্টে যেটুকু নদীর পাড়ে, সেই অংশটাতেও একটু ছড়িয়ে ছিল। কিন্তু আর-একটু ভেতরে ঢুকতে সে-আলো আর পারে নি। এখন নদীর ওপর থেকে ঐ আবছা আলোটাও মুছে গিয়ে আঁধার ছড়িয়ে পড়ল। সেই ফাঁকা থেকে ফরেস্টের নদীর কিনারাতেও ঐ আঁধার ছড়াল। ফরেস্টের ভেতরটা হয়ে উঠল আরো অন্ধকার। নদীর ওপরে ঐ আঁধারটা ছড়িয়ে পড়তেই নদীর জলটাও যেন বদলে গেল। এতক্ষণ নদী আর আকাশ জুড়ে ছিল একটাই ঘোলা স্রোত। সেই ঘোলা স্রোত জলের ধাক্কায় মাঝেমধ্যে চলকাচ্ছিল, এই-যা। এখন আকাশের অন্ধকার নদীতেও ছায়া ফেলে। কিন্তু সেই অন্ধকারের ফলেই যেন ঘোলাটে ভাবটা কেটে গেল বলে একটা বিভ্রম হয়। নদীর জলটা হঠাৎ ঘোলাটে থেকে স্বচ্ছ হয়ে ওঠে যেন, যেন জলের মধ্যে জল রুপোলি চলকায়। আর নদীর অন্য পাড়টাও যেন দেখা যাচ্ছে। সবই বিভ্রম, বিভ্রম।

আসিন্দির অধৈর্য হয়ে ওঠে, 'এ্যালায়ও যদি না ছাড়েন, তা হালি আর আইত (রাত) জাগিবার কামটা কী আছিল?'

'হ্যাঁ, ছাড়ি দিম, ছাড়ি দিম', বলে গয়ানাথ জিজ্ঞাসা করে, 'বানার ক্যানং টান, কোনঠে গিয়া ঠেকিবে আন্দাজ কবিবার নাগে।'

'এ্যালায় কী আন্দাজ কবিবেন? কালি মোটর সাইকেল নিয়া দেখিবার নাগিবে। নাইলনের দড়ি দিয়া বান্ধা আছে, সগায় বুঝিবে কারো সম্পত্তি নাগে। আর ঠেকিলে ঠেকিবে ত চরত, মানষি সব ত চর ছাড়ি চলি গেইসে। ভয় না খান। কায়ও তোমার সম্পত্তি না নিবে বাপা। না-হয় ত গাছের গাওত্ লিখি দাও কেনে গয়ানাথ এণ্ড কোম্পানি।'

গয়ানাথ আসিন্দিরের কথার কোনো জবাব দেয় না। সে তিস্তার ওপরের অন্ধকারটার দিকে তাকিয়ে থাকে। এখন তিস্তার ফ্লাডটা আন্দাজ করার জন্যে ঐ অন্ধকার ছাড়া আর-কোনো অবলম্বন নেই। এখানে দাঁড়িয়ে বাতাস আর বৃষ্টির যে-ধাক্কা তারা খাচ্ছে সেটা গত ন-দশ ঘন্টায় শরীরেরই অংশ হয়ে গেছে। 'এ্যানং করি গাছগিলাক বান্ধা গেইল, এ্যালায় ভগোয়ানের নাম করি ছাড়ি দিম এই বানার মুখত? তারপর কোটত খুঁজি বেড়াম রে?' গয়ানাথ বেশ জোরেই বলে, কিন্তু তার স্বরের মধ্যে স্বগতোক্তি ছিল। আসিন্দির হয়ত গয়ানাথের কথা সব শুনতেও পায় না—সে ত পেছনে দাঁড়িয়ে। শুনতে পারে বাঘারু, কারণ গয়ানাথ কথাগুলো বাঘারু আর তিস্তার দিকে তাকিয়েই বলে।

'য্যালায় গিয়া গাছগিলা ঠেকিবে, স্যালায় হয়ত কায়ও নাই, তার পুব-পচ্ছিম দিয়া বানা বহি যাছে, কায় আর দেখিবে?'

এ গাছগুলো যেন ভেলা, সেই ভেলায় এ প্রলয়ে গয়ানাথ যেন তার প্রিয়তম কাউকে ভাসিয়ে দিচ্ছে। কোথায় গিয়ে এ-ভেলা এই বন্যায় ঠেকবে? কী করে খুঁজে পাবে গয়ানাথ যদি এই বন্যা পুবপশ্চিম সব পাড়ই ভাসিয়ে নেয়? চার-চারটি গাছে কত-কত হাজার টাকা তা হলে লোকসান? যেন, এই হাজার-হাজার টাকা গয়ানাথ তার কাছার গিঁট থেকে খুলে বন্যায় ভাসাচ্ছে! এই চার-চারটি গাছ বন্যার এই রাত ধরে তার তেমনই আপন হয়ে গেছে, তেমনই আপন।

'মউয়ামারির চরত চরুয়াগিলান আছে, প্রেমগঞ্জের চরত্ ভাটিয়াগিলান আছে, বাকালির চরত মুসলমানের ঘর আছে, কশিয়াবাড়ি পার হইয়া এই বৃক্ষগিলান কি পাকিস্তানত্ চলি যাবার ধরিবে?'

বাতাসের আওয়াজের সঙ্গে গয়ানাথের হাহাকার মিশে যায়। এই গাছগুলো যেন তার ময়ূরপঙ্খী, এখন হাবা উদ্দেশে সেই ময়ূরপঙ্খীটাকে ভাসিয়ে দিচ্ছে, কোনো দিন আর দেখতে পাবে কি না কে জানে। জলের তোড়ে গাছগুলোর ডালপাতা গয়ানাথকে ছোঁয়। বাতাসের বেগে স্পর্শটা বোঝা যায় না।

গয়ানাথ এবার চিৎকার করে ওঠে, 'হে-এ বাঘারু', যেন বাঘারু তার সামনেই দাঁড়িয়ে নেই, নদীর অপর পারে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। গয়ানাথ আবার চিৎকার করে ওঠে, 'বাঘারু হে-এ।'

বাঘারু সামনে দাঁড়িয়ে থেকেও কোনো জবাব দেয় না। দেউনিয়ার ডাকের জবাবে বাঘারু সামনে হাজির হতে পারে, জবাব দিতে ত পারে না। সে এখন ত সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। কিছুটা তিস্তার দিকে মুখ, কিছুটা গয়ানাথের দিকে মুখ। সে গয়ানাথের দিকে আরো একটু ঘোরে—তার হাতের মুঠোয় গাছবাঁধা দড়ি টানটান হয়ে ওঠে। স্রোতের ধাক্কা গাছগুলোকে পাড় থেকে ভাসিয়ে নিতে টানছে।

'বাঘারু হে, তুই যা কেনে গাছগিলার সাথত্। এ্যানং অমূল্য বৃক্ষ, কোটত না কোটত ভাসি যাবে, কার না কার ভোগত নাগিবে! তুইও ভাসি যা গাছগিলার সাথত্, গাছগিলাক পাহারা দিয়া নিগি যা।'

গয়ানাথের চিৎকারের পরবর্তী নীরবতা জুড়ে বাতাস হামলে পড়ে উৎপাটিত গাছগুলোর ডালপাতায় আর স্রোতের টান প্রায় অনিবারণীয় বেগে এসে লাগে বাঘারুর পাঞ্জায়, কব্জিতে, হাঁটুতে। কুড়োলটা মাটিতে ফেলে বাঘারু নরম মাটিতে গোড়ালি পুঁতে গাছগুলিকে টেনে রাখে।

'বাঘারু হে, গাছত উঠ্ কেনে। যেইঠে ঠেকি যাবু, থাকিবু। হামরালা গাছগিলাক আর তক খুঁজি নিম।'

গয়ানাথ সেই মুহূর্তে গাছে ওঠা কথাটির অর্থ আমূল বদলে দেয়। বাঘারু তার হাতের দড়িটা আস্তে-আস্তে ছাড়ে। তার ছাড় বোঝামাত্র স্রোত যেন একটানে গাছগুলোকে ভাসিয়ে নিতে চায়। বাঘারু খুব ধীরে-ধীরে আর-একটু ছেড়ে, পেছিয়ে, সেই গাছের গুঁড়িটার কাছে যায়। সেখানে সে গুঁড়িটাতে হাঁটু ঠেকিয়ে দড়িটাকে আরো টেনে এনে তার শরীরের সমস্ত পেশির শক্তি সংহত করে অত্যন্ত ধীরে সেই শক্তি প্রয়োগ করে গুঁড়িটাতে প্যাঁচ দেয়—দুটো-তিনটে। গাছগুলো পাড়ের কাছাকাছি চলে আসা আবার। খালি হাতে বাঘারু সোজা হয়ে দাঁড়ায়, তারপর দু পা এগিয়ে কুড়োলটা তুলে পিঠের ভাঁজে ঢুকিয়ে নেংটিতে গোঁজে। এবার পাড়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে একটা শক্তমত ডাল সে খোঁজে। তার বাহু থেকে নাইলনের দড়ি শূন্যতায় ঘনঘন দোলে। বাঘারু একটা ডাল পেয়ে যায়। পাখি যেভাবে ডাল পা রাখে বাঘারু সেই ভাবে ডালটার ওপর হাত দুটো রেখে আকাশ-আঁকড়ানো বন্যার আকাশে ঝাঁপ দেয়। ভাসমান গাছের মাথা যেন অতিরিক্ত ঝড়ে কেঁপে ওঠে।

'খুলি দে, খুলি দে, দড়িখান খুলি দে'—গয়ানাথ চিৎকার করতে-করতে গাছের গুঁড়িটার দিকে ছুটে যেতে গিয়ে ফিরে আসে। নদীর পাড়ে তখন নাইলনের দড়ি ঝুলছে—গাছের ভাসমান মাথার ভেতর থেকে যে-গুঁড়িটাতে দড়ি পেঁচানো ছিল, সেই গুঁড়ি পর্যন্ত। সেই দড়ির শেষেই বাঘারু কোনো ডালের ভেতর ঢুকে গেছে। তার উদ্দেশে গয়ানাথ জোতদার চিৎকার করে বলে, 'হে-এ বাঘারু, অর্জুন গাছখান পাছত ভাসি গেইলে বান্ধি ফেলিস। বাঘারু, অর্জুন গাছখান বান্ধি ফেলিস—'

আসিন্দির বোঝে নি, বাঘারুও গাছের সঙ্গে ভেসে যাবে। সে বাঘারুকে গুঁড়িটাতে আরো গোটা কতক প্যাঁচ দিয়ে দড়িটাকে আটকাতে দেখল, দড়ি দুলিয়ে পাড়ে যেতে দেখল, পাড় থেকে নদীর ভেতরের গাছেও যেতে দেখল। তখন সে বুঝে থাকতেও পারে, নাও পারে। গয়ানাথ যখন চিৎকার করে তাকে গুঁড়িটা থেকে দড়িটা খুলে দিতে বলে তখন আসিন্দির টর্চ জ্বালিয়ে দেখে। বাঁ হাতে টর্চটা নিয়ে, ডান হাতে দড়িটা ধরে টান দিতেই ওপরের প্যাঁচটা খুলে আসে। পরের প্যাঁচটা আর একটানে

খোলে না, কিন্তু টর্চটাকে মাটিতে রেখে দু হাতে টানতেই খোলে— স্রোতের টানে গাছগুলো পাড় থেকে সরে যায়। এই প্যাঁচদুটো বাঘারু শেষে দিয়েছিল। পাড়ছাড়া স্রোতে গাছগুলো যেন আন্দোলিত হয়, সেটা বাঘারু ডালে-ডালে জায়গা খুঁজছে বলেও হতে পারে, স্রোতের ধাক্কাতেও হতে পারে। শেষের প্যাঁচগুলো আসিন্দির দু হাতে টেনে খুলতে পারে না। গয়ানাথও ডান হাত লাগায়। কিন্তু গাছের বাকলের কোনো খাঁজে দড়িটা আটকে গেছে। দড়ি ছেড়ে দিয়ে গয়ানাথ বলে, 'আঠিয়াল মাটি আনি ঢুকা কেনে।' গয়ানাথ এবার টর্চটা ধরে—আসিন্দির সেই অর্জুন গাছের গোড়াতে যায়। 'শিকড়ের তলাত হাত দে'—গয়ানাথ টর্চ ধরে। দু হাতের মুঠো ভরে পাড় থেকে ভেজা মাটি তুলে আনতে আসিন্দিরের সিকো ঘড়ির নীল ডায়াল চমকায়। সেই মুঠোভরা মাটি ঐ দড়ির ওপর দিতেই গুঁড়ির গায়ে লেগে থাকা জলে গুঁড়িটা পিছল হয়ে যায়। কাদামাখা হাতে আসিন্দির দড়িটা ধরে হ্যাঁচকা একটা টান মারতেই দড়িটা অনেকখানি উঠে আসে। বুঝতে পেরে, আর-একটা হ্যাঁচকা টান দিতেই আসিন্দির মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, চোখের সামনের পাহাড়ের মত আড়াল মুহূর্তে সরে যায়, গাছগুলো ও বাঘারু চোখের পলক না-ফেলতেই দৃষ্টির বাইরে মিলিয়ে যায়, আর তিস্তার বন্যা আবার বাধাহীন পাড়ে ধাক্কা মারে।

একশ চব্বিশ

অন্ধকার ও জলস্রোতের মাঝখানে

পাড় থেকে গাছের ডাল ধরে ঝুলে নদীর স্রোতে-ভাসা চারটে গাছের ভেতর সেঁদিয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই বাঘারু বুঝে ফেলে যে ডালটা সমেত জলে ডুবে যাচ্ছে। এমন আচমকা ডুবে গেলে তাড়াতাড়ি আরো ওপরের ডাল ধরে ভেসে ওঠার কথা বা তাড়াতাড়ি ডালপালা মাড়িয়ে পাড়ে উঠে আসার কথা। কিন্তু বাঘারু যখনই বোঝে সে যে-ডালটায় দাঁড়িয়ে, সেই ডালসমেতই ডুবছে, তখনই একেবারে দাঁড়িয়ে যায়, যেন মেপে নিতে যে আচমকা তার ওজনে এ ডালটা কতটা ডুবে যায়। বাঘারু নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে না কোনোভাবেই। তাড়াতাড়ি পাড়ে উঠে আসার উপায় যে তখনো আছে তা যেন তার জানাই নেই। বা, ওপরে উঠে যাবার মত ডাল যে নেই এটা তার বড় বেশি জানা আছে। এর একটা কারণ হতে পারে যে বাঘারু জানেই জলেভাসা গাছের ওপর চাপ দিলে তা জলে ডোবে। আর একটা কারণ এও হতে পারে যে বাঘারু আসলে জানেই না কী করে নিজেকে বাঁচাতে হয়। পশুপাখি নিজেকে যেমন বাঁচাতে জানে তেমনই স্বাভাবিক আত্মরক্ষার শক্তি, অথবা পশুপাখি যেমন টের পায় না তার মরণফাঁদ কোথায়, তেমনই স্বাভাবিক আত্মহত্যার শক্তি—এর ভেতর কোনো শক্তির ওপর ভর করে বাঘারু ডালসমেত জলে ডুবে যেতে থাকে তা আন্দাজ করেও বলা মুশকিল। তখন ত বাঘারুকে আর দেখা যাচ্ছিল না। দিনের বেলা হলেও দেখা কঠিন হত—চার-চারটি গাছের ডালপালা এমনই ঘন আর ছড়ানো। আর, তখন ত কথাই নেই। নদীর ওপর নেমে আসা ছাইরঙা মেঘের আড়ালে দেখতে না-পাওয়া চাঁদও অস্তে চলে গিয়ে বাতাস আর বৃষ্টিকে আরো অন্ধকারময় করে তুলেছে। আসিন্দির আর গয়ানাথ মিলে গাছের গুঁড়ি থেকে প্যাঁচগুলো একটার পর একটা খুলে দিয়ে যখন ফিরে যায় তখন বাঘারু ঐ জলের তলায় ডুবে মরে থাকতেও পারত। তার মত সাঁতারুও, বন্যার তিস্তার চার-চারটে শক্ত করে বাঁধা গাছের ডালপালায় চাপা পড়লে বেরতে পারত না। তার চুল, বা তার শরীরে চামড়ার মত লেগে থাকা নেংটিটাও কোনো ডালে আটকে তাকে জলের তলে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলতে পারত।

কিন্তু বাঘারু দড়ির বাণ্ডিলটা তাড়াতাড়ি গলায় ঝুলিয়ে নিতে-নিতে বোঝে, ডালটা খানিক ডুবে আর ডুবল না। তার হাঁটু পর্যন্ত জল। অর্থাৎ, ডালটা ওখানে পাড়ের মাটি পেয়েছে। সেই সুযোগে সে গাছের ডালের ওপর শুয়ে পড়ে ডালটার সঙ্গে মিশে যেতে চায়—মিশে গিয়ে পাদুটো আর হাতদুটো দিয়ে ডালটাকে জড়িয়ে ধরতে চায়, যেন সে এই গাছটারই একটা ডাল। তখন চকিতে বাঘারুর একবার

মনে হয়েছিল নাইলনের দড়িটা দিয়ে ডালের সঙ্গে সে নিজেকে বেঁধে নিলে পারে। কিন্তু সে ত মাত্র মনে হওয়াই।

ইতিমধ্যে আসিন্দির একটা প্যাঁচ খুলে দিতেই ঐ চার-চারটি গাছ পাড় ছেড়ে স্রোতের ভেতরে ঢুকে পড়ে, মুহূর্তে সেই ডালটা আরো তলিয়ে যায়, বাঘারুর পিঠের ওপর দিয়ে তিস্তার স্রোত বয়ে চলে। এখন গাছগুলোর তলায় মাটি নেই—গাছগুলোর ভেতর দিয়ে জলস্রোত এত জোরে বইতে থাকে যেন সেই স্রোতের ধাক্কায় গাছগুলো আবার সোজা হয়েও যেতে পারে। বাঘারুর মনে হয়—এ-অবস্থাটাই অপরিবর্তিত থাকলে সে ভেসে যেতে পারবে কারণ তার পা থেকে কোমর পর্যন্ত যতটা জল বইছে, কোমর থেকে পিঠের ওপর দিয়ে ততটা জল বইছে না। তার মানে, এই ডালটার যেদিকে তার মাথা সেটা উঁচু ও মোটা। তার মানে, এই গাছটা যখন খাড়া ছিল তখন কাণ্ডের যে-জায়গাটা থেকে ডাল বেরিয়েছিল, সেই মোটা জায়গাটাতেই তার মাথা।

ততক্ষণে, আসিন্দির আর গয়ানাথ মিলে আরো একটা প্যাঁচ খুলে দিতেই আর-এক ধাক্কায় গাছগুলো নদীর আরো কিছুটা ভেতরে চলে যায়। সেই ধাক্কাতেই হোক, আর যেখানে গিয়ে গাছগুলো পড়ল সেখানকার স্রোতের জন্যেই হোক গাছটা ঘুরে যেতে থাকে। জলের নিয়মে এখন গাছটা ত জলের ভেতরে ঘুরতে থাকবে। বাঘারু ডালটার তলায় পড়ে যাবে। তখন বাঘারুর ওজনে ডালটা আরো তলিয়ে যাবে। সেই ডালটা যেভাবে ঘুরছিল, তার বিপরীত মুখে একটু ঘুরে বাঘারু ডান হাতটা মাথার দিকে বাড়িয়ে দেখে হাতে আন্দাজ মত কোনো মোটা ফেঁকড়ি পায় কি না। এ যেন এমন কোনো গাছে ওঠা যার ডালপাতাগুলো মাটিতে পোতা আর শেকড়টা আকাশে। বাঘারু উল্টোপথে সেই শেকড়টার দিকেই যেতে চায়। ভবিষ্যৎ না-ভেবেই যেতে চায়—কারণ ডালের চাইতে কাণ্ড মোটা। মোটা বলেই সেখানে সে বেশি আশ্রয় পেতে পারে। কিন্তু মোটা বলেই সেই কাণ্ডটা যদি জলের নিয়মে পাক খেতে শুরু করে তা হলে বাঘারু সেই কাণ্ডটাকে সামলাতে পারবে না। কিন্তু সামলাতে না পারলেও ত সে জলে ভেসে যেতে পারবে। এই ডালপালার ভেতর চাপা পড়বে না। বাঘারু এই ডালপালার চাপ থেকে বেরতে চাইছিল। সে এমন একটা জায়গা খুঁজছিল যেখান থেকে সে নদীটাকে দেখতে পাবে।

ডানহাতের আঙুলে সে ফেঁকড়িটা পেয়ে যায় কিন্তু সেটা আঁকড়ে ধরতে না-ধরতেই পাড় থেকে আরো একটা প্যাঁচ খোলা হয়, আর সেই ধাক্কায় বাঘারুর ডালটা প্রায় সম্পূর্ণ ঘুরে যায়। মুহূর্তের মধ্যে বাঘারু ডালের ওপর পায়ের একটা ধাক্কা দিয়ে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে দু হাতে, সেই ফেঁকড়ির আন্দাজ যেখানে পেয়েছিল সেই জায়গাটা ধরে, ঝুলে পড়ে। সম্পূর্ণ ঝুলে যেতে সে পারে না কারণ অন্য ডালপালায় তার দু পা আটকে যায়। সেই সব ডালপালার ওপর শরীরের সবটুকু ভর দিয়ে বাঘারু ওপরের ডালটাতে উঠতে যায়। নদীর মধ্যে, স্রোতের মধ্যে মড মড় আওয়াজে ডালপালা ভেঙে যায়, বাঘারু তার দুই হাত কনুই পর্যন্ত দু দিকের ডালে দিয়ে ঝুলতে থাকে।

এই অবস্থায় সে কিছু সময় পায়। গাছের গুঁড়িতে নাইলনের দড়ির বাঁধন আটকে গিয়েছিল। সেটাকে এঠেল মাটি দিয়ে পিচ্ছিল করে নিচ্ছিল আসিন্দির। সেই ফাঁকে নিজের দুই হাতের ওপর জোর দিয়ে বাঘারু নিজেকে ঐ গাছপালার ভেতর থেকে বন্যার আকাশের ভেতর উত্থিত করে, সেখানে সেই উত্থানের মধ্যেই গভীর একটা শ্বাস নেয়, আর সেই শ্বাসের জোরেই যেন ওপরের সেই কাণ্ডটার দুদিকে নিজের দু পা ছড়িয়ে দিয়ে বসে পড়তে পারে। এমনভাবে বসে পড়তে হয় বাঘারুকে যে গাছের মাথাগুলো তার পেছনে পড়ে যায় আর তার সামনে থাকে শুধু নদী। তখন অন্ধকার এতই যে বাঘারু ঠাহর করতেও পারে না সবগুলো গাছের শিকড়-কাণ্ডই একদিকে কি না। সেটা সে তখন ঠাহর করতে চায়ও না। সে দেখে, তার সামনে নদী এবং বাঁ দিকটা খোলা। তেমন বিপদে সে ত এখান থেকে বাঁয়ে, এবং সামনে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্রোতে ভেসে যেতে পারবে। গাছের ডালপাতার চাপ থেকে মুক্তি পেয়ে বাঘারু যেন আশ্বস্ত হয়।

কিন্তু তখনই পাড়ের শেষ প্যাঁচটাও খুলে যায় আর বাঘারুকে দু হাতে দু দিকের ডাল চেপে নিজেকে সামলাতে-সামলাতে বুঝতে হয় সে বাতাসের আর বৃষ্টির দেয়াল ভেদ করে সামনের আরো অন্ধকারের দিকে ছুটে যাচ্ছে।

একশ পঁচিশ

জলস্রোতে বৃক্ষবাহন

প্রথম কয়েকটি মুহূর্ত বাঘারুর নিজেকে সামলাতেই যায়। যেন যে কোনো মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে এমন একটা আশঙ্কায় তাকে হাতদুটো দিয়ে গাছের কাণ্ডটাকে শক্তির সর্বস্বসহ আঁকড়ে থাকতে হয়। সে নিজেও টের পায় না, তার পাদুটোও হাঁটুতে বেঁকে গিয়ে কাণ্ডের সঙ্গে মিশে আছে। নদীব ঐ স্রোতটাকে সে শরীর দিয়ে বুঝছিল বাতাসের বিপরীত বেগ শবীব দিয়ে ঠেকাতে-ঠেকাতে। অন্ধকার ত ছিলই, কিন্তু তার সঙ্গে ঐ বাতাস আর বৃষ্টিতে তার দৃষ্টিতে এতই আচ্ছন্নতা আসে যে প্রতিটি মুহূর্তে তার ভয় হয়, সামনে কোনো বিরাট পাথরের সঙ্গে সে ধাক্কা খাবে আর তার মাথাটা চুরমার হয়ে যাবে। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে এই ভয়টা তাকে এমনই পেয়ে বসে সে বাঁ হাতটার কনুই তার চোখে চাপা দেয়, মাথাটা নিচু করে। কিন্তু তাতেও মনে হয় সামনের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকলেও বুঝি বাঁচার কিছু সম্ভাবনা আছে। সে আবার বাঁ হাতটা নামিয়ে নিজের বুকমুখ দিয়ে সামনের অন্ধকারটা ভাঙতে-ভাঙতে এগয়, তাঁর নিজের ইচ্ছেয় নয়—নীচের স্রোতেব টানে, সেই স্রোতের ওপর কোনোভাবেই বাঘারুর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। সে সেই মুহূর্তে চাইছিল কোনো এক কারণে এই স্রোতটা একবাব একটু থামুক অথবা এই গাছেব পাঁজা কোথাও ঠেকে যাক, অন্তত একটু সময়ের জন্যে ঠেকে যাক। বাঁয়ে-ডাইনে, ওপরে-নীচে-সামনে—কোনোদিকে বাঘারু কোনো পবিচিত চিহ্ন দেখতে পায় না, যেমন সে দেখতে অভ্যস্ত, আকাশের তারাদেব দিকবদল, অথবা ধানের খেতে বা ফরেস্টে বাতাসের হঠাৎ মোড় নেয়া। রাত্রিব নদীও ত বাঘারুর চেনাই, নদীর স্রোতও ত বাঘারুর চেনাই, এই অন্ধকার, এই বাতাস, এই বৃষ্টিও ত তার চেনাই কিন্তু সে ত এই সবকিছুকে এমন একসঙ্গে নদীর মাঝখান থেকে কখনো দেখে নি। এর আগে গয়ানাথের গাছ নিয়ে বাঘারুকে কখনো ভাসতে হয়নি।

·বাঘারু একবার ডাইনে তাকায়—তার কাটা অন্য গাছগুলো দেখলে যেন কিছুটা ভরসা পাবে। যদিও সে বোঝে যে গাছগুলো একটু আগুপিছু করেও একই বেগে ভেসে চলেছে কিন্তু কোন গাছটা কোথায় তা টের পায় না। ববং যেন মনে হয় সে যে-গাছটায় শেকড়ের ওপর বসে সেটাই সবচেয়ে আগে ছুটছে।

দু দিকের দুই ডাল শক্ত করে ধরে বাঘারু তার পাদুটো ঝুলিয়ে দেয়। তার পায়ে জল লাগে না। কিন্তু ডান দিকে হেলে পাটা আর-একটু ঝোলাতেই স্রোতের টানে পা-টা যেন তার শরীর থেকে ছিঁড়ে যেতে চায়। বাঘারু পা-টা তুলে আনে।

কিন্তু জলের ছোঁয়ায় বাঘারু যেন একটু সাহস পেয়ে যায়। এতক্ষণ যে তার মনে হচ্ছিল সে আকাশপথে বৃষ্টি আর বাতাসের মধ্যে দিয়ে উড়ে যাচ্ছে সেই ভয়টা তার কেটে যায়। পায়ে যে জল আর স্রোতের ধাক্কা লাগল সেটা ত তার চেনা। কিন্তু জলটা এত নীচে কী করে গেল?

বাঘারু আবার দুই হাতের দু দিকের ডাল শক্ত করে ধরে পাদুটো সোজা নামিয়ে বুড়ো আঙুলটাও টানটান করে রাখে। কিন্তু জল ছুঁতে পাবে না। হাতেব ওপর ভর দিয়ে সে একটু গড়িয়ে নামে। কিন্তু কোনো পায়ের বুড়ো আঙুলেই জল পায় না। হাতের ভরে পেছনে আর-একটু গড়াতেই সে হড় করে গাছের একটা গর্তের মধ্যে পড়ে, আর সঙ্গে-সঙ্গে তার দু পা জলের তোড় সামনে টেনে নেয়। তার পায়ের পাতা পুরোটাই জলে। গর্তের মধ্যে পড়ে সে খানিকটা সেঁটে গিয়েছিল। তাতে হাতের ওপর ভরসা না রেখেও সে যেন বসতে পারে। ঐ ভাবে সেঁটে গিয়ে বাঘারু গাছটাকে চিনতে চায়। এটা সেই বড় খয়ের গাছটাই হবে। মাটি থেকে সোজা খানিকটা উঠে বাঁয়ে বেঁকে আরো খানিকটা যাওয়ার পর ডালপালা বেরিয়েছে। গাছটা খুব বড়। আর, এখন ঐ বাঁকের ওপরের দিকটা জলের ওপরে আছে। অর্থাৎ বাঁকটা আকাশের দিকে। এতক্ষণ বাঘারু ছিল সেই বাঁকেরও ওপরে। তাই পায়ে জল পাচ্ছিল না। এখন সে গড়িয়ে নেমে গেছে ঠিক সেই বাঁকের খাঁজটাতে। তাই আটকে গেছে। কিন্তু জলের তোড়ে এখন যদি গাছটা ঘুরে যায় তাহলে বাঘারু জলের তলায় চলে যাবে। তেমন হলে, তার আত্মরক্ষার উপায় কী হবে সেটা স্থির করতেই বাঘারু হাত দিয়ে গাছের উল্টো দিকটা দেখে—বাঁকের পিঠেই ত কুঁজ থাকার কথা, কুঁজটা আছে কি না। বাঘারু যেন পেয়ে যায়—সে যে·গর্তের ভেতর

সেঁটে আছে তার ভেতর দিয়েই গাছটা যেন উল্টো দিকে ফুলে উঠেছে। বাঘারু আশ্বস্ত হয়। গাছটা উল্টে গেলে সে আলগোছে নিজেকে সোজা রাখবে—তারপর গড়ানো শেষ হলে আবার বসবে।

এখন গাছটার কাণ্ড ও শেকড় তার সামনে—নৌকোর গলুইয়ের মত খানিকটা। এখন যদি কোথাও ধাক্কা লাগে তা হলে বাঘারুর মাথাটা অন্তত ফাটবে না—বাঘারু সেটুকু আড়াল পেয়েছে। আর মাঝে-মাঝে পা-দুটো ঝুলিয়ে বাঘারু স্রোতটাকে যে আন্দাজ করতে পারছে এতেও তার ভেতরে এক ধরনের আত্মবিশ্বাস চারিত হয়ে যায়। পাডেব বাঁধন সম্পূর্ণ উৎপাটিত হওয়াব পর এই অন্ধকারে বাতাসের বিপরীতে ঐ বেগে ভেসে যেতে-যেতে বাঘারু ভয় পেয়ে গিয়েছিল—এমনই ভয়, যাতে সে নিজেকে সামলাতে পারছিল না। কিন্তু এখন এই একটু তলায় নেমে এসে, এই একটা গর্তে সেঁটে গিয়ে, পা দিয়ে জল পেয়ে, গাছটাকে হাতিয়ে-হাতিয়ে চিনতে পেরে ও গাছটা উল্টে গেলে সে কী করবে তা পর্যন্ত ঠিক করে ফেলতে পেরে বাঘারুর ভয়টা কেটে যায়। শুধু যে ভয়টাই কেটে যায় তা নয়, সে অবস্থাটা অনেকখানি ঠাহর করে ফেলতেও চায়। তিস্তার বন্যা না হয় গাছ চারটিকে মাটি থেকে টেনে জলে নামিয়েছে কিন্তু ভাসিয়ে ত আর নেয় নি। বাঘারু ত নিজে হাতে প্রত্যেকটা গাছের শেকড কেটে, সেগুলোকে দড়িতে বেঁধে, এক জায়গায় এনে, জলে ভাসিয়েছে। সুতরাং বাঘারু ত জানে, এই গাছগুলোর এত ডালপালা, এত পাতা যে বাঘারু যদি হিশেব মত তার ভেতর সেঁদিয়ে যেতে পারত তা হলে এই বাতাস ও বৃষ্টি তার গায়ে লাগতই না—গয়ানাথের যে-ঘরে সে শোয় সেই ঘর থেকে তিস্তার ভেতরের এই উপড়নো গাছে আশ্রয় অনেক বেশি। কিন্তু এখন এই অন্ধকারে বাঘারু সে-রকম একটা জায়গা খুঁজে বের করবে কেমন করে? এখন ত সবচেয়ে বেশি অন্ধকার। আরো অনেকক্ষণ এই অন্ধকার থাকবে—কতক্ষণ সে-হিশেব তার জানা নেই। কিন্তু সে জানে এই অন্ধকারটা দিয়েই রাত শেষ হয়। সূর্য উঠবার আগের আলোতেই এই অন্ধকারটা কাটতে শুরু করবে। গত কয়েকদিনের মধ্যে সূর্যের মুখ দেখা যায় নি। যেন, সারাটা দিনই সাঁঝবেলা। কিন্তু মুখ দেখা না-গেলেও আলোটা ত থাকবেই। তাকালে ত কোনটা আকাশ, কোনটা নদী, কোনটা মেঘ, কোনটা জল, কোনটা গাছ, আর কোনটা পাড তা চেনা যাবে। তখন ত বাঘারু তার নিজের হাতে কেটে ভাসিয়ে দেয়া এই গাছগুলোর ডালপালার ভেতরে কোথায় ঢোকা যায়, আর কোথায় ঢোকা যায় না, তার একটা হিশেব কষতে পারবে।

তার আগে বাঘারুর এখন অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকা।

একশ ছাব্বিশ

দুই আঘাতের মাঝখানে

এ-রকমই সময় কেটে যায়।

কিন্তু সে সময় কতটা তার কোনো অনুমান বাঘারুর আসে না। সময়ের সঙ্গে ত বাঘারুর শরীর বাঁধা। বাতাসের ছোঁয়ায় সে বোঝে বেলা কত হল, ছায়ায় গাঢ়তায় সে টের পেয়ে যায় বেলা কত হেলল, শোয়ানো ঘাস দেখলে সে পায়ের স্পর্শে শেষ রাতেও আন্দাজ পায় সূর্য উঠতে আর দেরি কত, এমন-কি গয়ানাথের গোয়ালিয়া ঘরে বা বাইরের এগিনায় (আঙিনায়) গভীর ঘুমিয়ে থাকলেও তার শরীর তার অজ্ঞাতেই জেনে যায় রাত কতটা ফুরিয়েছে। কিন্তু এখন তেমন কোনো অনুমান বাঘারুর আসে না। কতক্ষণ আগে গাজোলডোবা থেকে গাছগুলোর সঙ্গে সে ভেসেছে তার আন্দাজ পাবে কী দিয়ে। পাড় ছাড়ার পর থেকে জলস্রোতে গাছগুলো যে-বেগে ভেসে যাচ্ছে তার কোথাও কোনো ছেদ নেই। নদীর এই খোলা আকাশের ভেতর দিয়ে যে-বেগে হাওয়া আর বৃষ্টি বয়ে আসছে তারও কোনো ছেদ নেই। তা হলে বাঘারু সময় মাপবে কী দিয়ে? একটু যদি আবছা আলোও থাকত তা হলে বাঘারু অন্তত চেষ্টা করতে পারত ডাইনে-বাঁয়ে তাকিয়ে দুই পাড়ের বা কোনো চরের ইশারা খুঁজতে। দেউনিয়া যখন গাছগুলোর সঙ্গে তাকে ভাসতেই বলল, আর-একটু আগে বলল না কেন—মেঘের

আড়ালে-আড়ালেও যতক্ষণ একটা চাঁদ ছিল। দেউনিয়া ঐ অর্জুন গাছের আশায়-আশায় বসে থাকল। 'এতই যদি তোমরালার অর্জুনগাছখানের শখ, হামাক বলিলেন না কেনে ? যে-টাইমত মোক জোয়াইটা ভটভটিয়াত্ বান্ধি আনি ফেলাছে, ঐ অর্জুনগাছখান ত কাটি ফেলাবার পারছু।'

বাঘারু একটু যেন হেসে ফেলতে পাবে।

'মোর দেউনিয়াখান অর্জুনগাছখান চাহিবার পারে, কিন্তু কাটিবার না দিবে। কাটিবার ত টাইম নাগিবে। কাটিবার ত আওয়াজ উঠিবে। স্যালায় কায় জানে কোটত কোন ফরেস্টের গার্ড আসি খাড়ি যাবে। স্যালায় অর্জুনগাছে কুড়ালিয়ার দাগ ত আর মুছি ফেলা না যায়। মোর দেউনিয়াখান সারা রাত বসি থাকিল্, কিন্তু কহিল্ না, বাঘারু হে—কাটি ফেল্, অর্জুনগাছখান কাটি ফেলা। এক অর্জুনগাছোখান্ মোর চাঁদখানক ডুবি দিলা। এ্যালায় এই আন্ধারত মুই না জানো কতখন ভাসি যাছি, জানো না কতখন ভাসি যাম। চাঁদাডোবা আন্ধার ত বেশি টাইম থাকিবার কথা না হয়। মোব ত মনত খাছে কি সারা রাতি এই আন্ধার দিযা ভাসিছু।' বাঘারু খুক করে হাসে।

'ভাসি যাছু, না, মোর ভটভটিখান চড়ি যাছু'। বাঘারু আবারও খুক করে একটু হাসে। 'আসিন্দির জোয়াইযেব ভটভটিখান ডাঙার উপর দিয়া যাছে, মোর ভটভটিয়াখান জলের উপর দিয়া যাছে—।' বাঘারু টাকরায় জিভ লাগিযে মোটব সাইকেলের মতন একটা আওয়াজ তুলতে চায়। আওয়াজেব কথা ভেবে আবার একটু হাসে বটে, তবে আওযাজটা তোলে না। জিভটা টাকবা থেকে নামিয়ে নেয়। কিন্তু দু দিকের ডালটা ধবে, যেন মোটব সাইকেলেব হ্যান্ডেল।

একটু পরে সে-রকম মনে হওগাব খেলাটা শেষ হয়ে যায়। তখন বাঘারুর মনে হয়, তাকে তার দেউনিয়া যে বলদ বলে ডাকে সেটা কতটা সত্য। সে এই গর্তটা পেযে যেন বত্তে গেছে, হাতের ভেতর ডাল পেয়ে যেন আশ্রয জুটে গেছে তাব। কিন্তু সে এ-রকম ভটভটিয়া চালাবার মত করে ডালের ওপর বসে আছে কেন ? এই গর্তটাতে সেঁটে থেকেই ত সে উল্টে যেতে পারে, পা দুটো ডাল বরাবর ছড়িয়ে দিতে পারে, মাথাটা ডালে হেলিয়ে দিতে পারে—তাতে তাব এক রকমের শোয়াই ত হতে পারে। এমন-কি, সে চোখও বুজিতে পারে। তাবপব যখন অন্ধকার কাটবে, কাটবে।

গর্তটার ভেতর বাঘারু এমনই হেঁটে গিয়েছিল যে নিজেকে ঘোরাতে তার অসুবিধে যেটুকু হয় সেটা এই কারণে, নিজে ঘুবতে গিযে গাছটাকে যেন দুলিয়ে না দেয়। এই স্রোতের মধ্যে গাছে যদি সে ঝাঁকি দিয়ে ফেলে তা হলে গাছটা ঘুরে যেতে পারে। তাতে, যেটুকু জায়গা গুছিয়ে নিতে পেরেছে বাঘারু, সেটা হাতছাড়া হয়ে যাবে।

বাঘারু দুদিকের ডাল ছেড়ে এই ডালটার মাথাটা ধরে কোমরটাকে তোলে, তারপব পা দুটোকে আস্তে কবে ডালেব সঙ্গে লেপ্টে লম্বা করে দেয়। মাথার ওপর লম্বা করে দেয়া হাত আর ডালের সঙ্গে লম্বা কবে দেয়া পা—এতেই তার এতটা আরাম হয যে বাঘারু ভাবে কী দরকার আর চিত হওয়ার, বরং এ-রকম উপুড় হয়ে থাকা যেন তার অভ্যেস হয়ে গেছে, কী দরকার আবার একটা নতুন ভঙ্গিতে যাওযাব ? বরং এই ভঙ্গিতে থাকলে, দরকার হলেই সে সোজা হয়ে বসে পড়তে পারবে।

কিন্তু যে-গর্তটার জন্যে সে বসাব একটা জায়গা পেয়েছিল, সেই গর্তটার জন্যেই সে অমন উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে পারে না। কোমরটা গর্তের ভেতরে ঢুকে যায়। বাঘারু তখন কোমরটা উঁচু করে ডালটার ওপর কাত হয়—বাঁ দিকে। কাত হয়েও সে ডালের ওপর লম্বালম্বি থাকতে পারে। একটু থাকেও। তার এই চিত হওয়ায়, কাত হওয়ায় ডালটা বা গাছটা সামান্য একটু নড়লেও, তারপরই স্থির হয়ে যায়। বাঘারু এবার গর্তটার ভেতর তার পেছনটাকে চিত করে দেয় প্রথমে, একটু অপেক্ষা করে, তারপর জলস্রোতের তালে-তালে নিজেকে চিত করে ফেলে। তার পা দুটো ডালের সঙ্গে লম্বা করে ছড়ানো, এখন হাত দুটো দুদিকে ছড়িয়ে ডালেব ওপর রাখা। যদি তেমন দরকার হয় তা হলে সে চট কবে বসতে পাববে। কেমন করে পাববে সেটা বোঝাব জন্যে পা দুটো দ্রুত গুটিয়ে আনে। হ্যাঁ, পারবে। আবার পা দুটো মেলে দেয। আর তখন পিঠে গোঁজা কুড়োলটা পিঠে লাগে।

প্রথমে বাঘারু সেটাকে অগ্রাহ্য করতে চায়। কিন্তু স্রোতের দোলায় যখনই ডান দিকে হেলে তখনই কুড়োলের ধারটা তার চামড়ায় লাগে। সে বোঝে, জোরে একটা ধাক্কা লাগলে কুড়োলটা মাংসের ভেতর সেঁদিয়ে যেতে পারে। সে ডান হাতটা বেঁকিয়ে পিঠের দিকে নিয়ে যায় ; তারপর কুড়োলের লোহাটা ধরে সেটাকে তুলে নিয়ে আসে। এনে দু হাতে কুড়োলটাকে চোখের সামনে মেলে ধরে। এত অন্ধকার

যে কুড়োলের ধারটাও চমকায় না। লোহাটার ওপর হাত বোলায় বাঘারু। ভিজে গেছে। বাঁ হাতে কুড়োলটা ধরে ডান হাতের পাতা দিয়ে কুড়োলটা মোছে। তারপর শুয়ে-শুয়েই পা দুটো ফাঁক করে, শুয়ে-শুয়েই কুড়োলেব কাঠটা ধরে, শুয়ে-শুয়েই কুড়োলটাকে বাতাস আর বৃষ্টির ঝাপটের মধ্যে তোলে আর নিজেব দুই পায়েব মাঝখানে ডালটাব ওপব নামিয়ে আনে—কুড়োলটা গভীর গেঁথে যায়। বাঘারু পা দুটো আবার ডালেব ওপর লম্বা কবে দেয় মাঝখানে কুড়োলের লোহাটা বেষ্টন করে। হাত দুটো দু দিকের ডালে ছড়িয়ে বাখে। এইবার যেন সে একটু চোখ বুজতে পারে। বাঘারু চোখ বোজে।

যেন এতক্ষণ চোখ খোলা ছিল বলেই বাতাসের আব বৃষ্টির গর্জন সে শুনতে পাচ্ছিল না। চোখ বুজতেই তার শরীবেব তলা থেকে জলের অন্তর্ঘাতী কল্লোল উঠে এসে তার শরীরের ওপরে হাওয়ার পরাক্রান্ত আক্রমণের সঙ্গে মিশে যায়। এই দুই আঘাতেব মাঝখানে চোখ বুজে বাঘারু ভেসে থাকে। ভেসে থাকতে-থাকতে সেই দুই আওযাজও তাব শবীরেব সঙ্গে মিশে যায়। সে আর-কোনো আওয়াজ শুনতে পায় না।

এর পব, কতক্ষণ পব বোঝা যায না, সে আওযাজ পায পাখিব ডাকাডাকির—অন্ধকার কেটে যাচ্ছে, সে আওয়াজে বোঝা যায।

একশ সাতাশ

জলস্রোতে নিদ্রাভঙ্গ

বাঘারু পাখির ডাক শুনে চোখ খোলে না। পাখিব ডাকটা কোনো আওয়াজেব মত করে তার কানে পৌঁছয় না। যেন অনেকক্ষণ ধরেই এক-আধবার আওয়াজটা হচ্ছে, তারই মধ্যে এক-আধবার সে শুনতে পাচ্ছে, এক-আধবার শুনতে পাচ্ছে না, যেমন রোজই হয়। তারপব, এক সময় সে শুনতেই পায় পাখি ডাকছে। মানে, ভোর হয়েছে। ভোব হওয়াব কথাটা মনে হতেই বাঘারু চোখ মেলতে চেয়েছিল বটে, কিন্তু মেলে নি। আর এই না মেলার সময়টুকুর ভেতরেই বাতাসের বিপরীত ঝাপট আর স্রোতের কল্লোলের উঠে আসা তার কানে বাজে। তা হলে কি সে একটু ঘুমিয়েও গিয়েছিল ? কিন্তু চোখখোলা আর ডাল থেকে হাত সরিয়ে কুড়োলের হাতলটা ধবার মধ্যে কোনটা আগে ঘটে বোঝা যায় না। বাঘারু দেখে তার কিছুটা ওপরে গাছের. পাতাভরা ডাল, সে-ডালে দু-একটা পাখি।

এতক্ষণ পর, বাঘারুর সচেতনতা পুরো ফিরে আসে। সে কুড়োলের হাতলে হাত দিয়ে মাথাব ওপরের সেই ডালটাব দিকে, বা ডালের পাতাগুলোব ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে, তাকিয়ে থাকে। অন্ধকারটা কাটে নি কিন্তু এখনই শুরু হল সূর্য ওঠাব আগের আলোব আভাস ছড়ানো। এখনো বাঘারু তার মাথার ওপরের পাতার বং দেখতে পাচ্ছে না, শুধু আকারটা দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু পাখি ? তা হলে কি গাছটাছ নিয়ে সে কোথাও ঠেকে গেছে ? কোনো পাড়ে কিংবা কোনো চরে ? তার নীচে ত সে স্রোতের আওয়াজ পাচ্ছে। সে ত কোথাও ঠেকে গেলেও পাওযা যেতে পাবে। যে-ডালটায় সে শুয়ে আছে সেটাও ত দুলছে। তাও ত কোথাও ঠেকে গেলে দুলতে পাবে। বাঘারু তার মাথার ওপরের ডালগুলোকে দেখে—দুলছে। সেও ত কোথাও ঠেকে গেলে বাতাসে দুলতে পারে। কিন্তু কোথাও ঠেকে না-গেলে পাখিগুলো ডেকে-ডেকে উঠছে কেন ? নাকি এগুলো এই গাছেরই পাখি—গাছগুলোর সঙ্গেই ভেসে আসছে ? নাকি এগুলো এই পাড়ের বা চবেব পাখি—গাছের ডাল পেয়ে উড়ে এসে বসেছে ?

বাঘারু যেন নিজের সঙ্গে একটা খেলাই পায়। তার ত এখন কিছু করার নেই। অন্ধকারটা কাটছে মানে, তার প্রায় আর-কোনো বিপদ থাকল না—এখন ত সে সব কিছু দেখতেই পাবে, ভাসমান গাছের কোথায় পা দিতে পারবে সেটা দেখেই বুঝবে। এখন ত সে দড়ি দিয়ে টেনে-টেনে গাছগুলোকে আরো কাছাকাছি এনে ফেলতে পারবে—প্রায় ভেলার মত। সে সারাটা রাত টেরই পেল না—তার মাথার ওপর এত পাতাওয়ালা একটা ডালের আচ্ছাদন ছিল ? আর এখন সে বুঝতেই পারছে না সে কোথাও ঠেকে আছে, না ভেসে যাচ্ছে ?

বাঘারু শুয়ে থেকেই তাব পা দুটো দুদিক থেকে ঝুলিয়ে দেয়। জলেব ছোঁয়া লাগে—স্রোত পা-টা টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে ত কোথাও ঠেকে গেলেও হতে পারে। পাখিগুলো আবার ডাকে, কেটু বেশি সমবেত ডেকে ওঠে—যেন তাবা তাদের পবিচিত পবিবেশেই আছে। কিন্তু যত পবিচিতই হোক, এই গাছটা ত তাদেব চেনা হতে পারে না। তা হলে সেই গাজোলডোবার ফরেস্ট থেকে এই খযের গাছ, শালগাছ আব বাঘারুর মত, তাবাও, ভেসে আসছে রাতভর ? বাঘাক দুদিকেব ডালে সামান্য ভর দিযে উঠে বসে। দড়িব বান্ডিলটা তাব বুকে দোলে। সে দেখে তার সামনের, নদীর পেছনের অন্ধকার থেকে তাব এখনকাব পেছনে নদীব সামনের দিকে, হু হু কবে ছুটে যাচ্ছে। বাতের সেই অন্ধকার জুড়ে বাঘাক এ বকম বেগেই ছুটে এসেছে কিন্তু দেখতে পায নি। এখন, আঁধার আবছা হয়ে যাওযায সে স্রোতের সেই গতিব দাকণ টান যেন প্রথম বোধ কবে।

বোধ করতেই, বাঘাক সেই গতির সঙ্গে নিজেকে মানিযে নিতে চায। সে পেছন থেকে কোনো গতিব সঙ্গে নিজেকে মানাতে পারে না—জিপগাড়িব পেছন থেকে ফবেস্টেব ভেতব ঢুকতে যেমন তার দিকজ্ঞান নষ্ট হযে যায, এখানেও স্রোতেব বিপরীত দিকে মুখ কবে সে স্রোতটাকে সামলাতে পাবে না। সে কুড়োলটা তুলে পিঠে গোঁজে, দড়িব বাণ্ডিলটাকেও পিঠেব দিকে ঠেলে দেয, তাবপব সেই গর্তটার ভেতর বসেই ঘুরে যায—স্রোতেব টানে নোঙবছেঁড়া কোনো নৌকোব মত গাছগুলো সোজা ভেসে যাচ্ছে। সামনে, বেশি দূব দেখা যাচ্ছে না কিন্তু জলেব ওপবকার অন্ধকাবটা আবছা হচ্ছে, যেন সেই আবছা অন্ধকাবটা এই গাছগুলোব আঘাতেই দূর হচ্ছে।

বাঘাক দেখে কাল সে এই ডালটাবই মাথাতে বহুক্ষণ ভযে এঁটে ছিল। এখন বোঝে ঐখানেই বিপদ ছিল সবচেয়ে বেশি। পাশাপাশি কোনো ডাল নেই—হাত পিছলে গেলে জলে ত পড়তই, এই গাছগুলোব নীচে চাপাও পড়ত। এই গাছগুলো যে-স্রোতেব টানে ভাসছে, সেও সেই স্রোতেব টানেই ভাসত, ফলে, গাছগুলোব তলা থেকে বেবতে পাবত না। বাঘারু ঘাড় ঘুরিযে গাছের ডালপালাগুলো একবাব দেখে যেন আশ্বস্ত হতে চায, সে ঐ উঁচু ডাল থেকে জলে পড়ে গেলেও ডালপালা ধবে আবার জল থেকে মাথা তুলতে পাবত। কাল বাতে সে একেবাবে মবে যেতে পাবত—এমন ধারণাটা তাড়াতে না পাবলে যেন বাঘাকব এখনকা' বেঁচে থাকা সম্পূর্ণ হবে না।

ততক্ষণে ঐ গাছগুলোব ডাল থেকে উড়ে আবাব গাছেব ডালে ফিবে বসা আব ডাকাডাকি করা পাখিব সংখ্যা বেড়ে গেছে। এই পাখিগুলোব বাসাসমেতই গাছগুলো জলে পড়েছিল। এই পাখিগুলোর বাসা জলে ভাসে নি বা ভেজে নি। ফলে, অন্ধকাবে অন্ধেব মত তাবা বাসা ছাড়ে নি। এখন স্রোতেব টানে গাছগুলোব সঙ্গেই ভেসে যাচ্ছে।

বাঘাক একটু দাঁড়িযে দেখতে চায—বসে যা দেখছে তার চাইতে বেশি কিছু দেখা যায় কি না, আর, গাছগুলো কী ভাবে বাঁধা আছে, কোনো গাছ ত খসেও গিযে থাকতে পা৻:

বাঘাক জানে, কোনো গাছেব বাঁধন আলগা হযে গেলে সে বুঝতে পাবতই— কাবণ গাছগুলোকে ত খুব ভালভাবে বাঁধা যায নি, একটা বাঁধন আলগা হলে সব বাঁধনই ঢিলে হযে যেতে পাবত। সব বাঁধনের মূল ত তার গলায দড়িব বাণ্ডিলে। যদি জলেব ভেতব কোনো স্রোতেব বিপরীত টানও থাকত তা হলে স্রোতেব আড়াআড়িতে বাঁধন ঢিলে হযে যেতে পাবত। এই এত জল এমন টানে একদিকে চলছে যে গাছগুলো ঘুরছে না পর্যন্ত। কিন্তু তবু বাঘাক একবাব দাঁড়িযে দেখতে চায।

যে-গর্তটাব ভেতব সে বঁসে আছে সেখানে পা বেখে এই ডালটাতেই ঝুঁকে হাতের ভর দিয়ে খানিকটা দাঁড়াতে পারে বটে কিন্তু সেটা ঠিক খাড়া দাঁড়ানো ত হবে না। এমন ভাবে খাড়া দাঁড়াতে চায বাঘাক যাতে সবগুলো গাছ আলাদা-আলাদা কবে চেনা যায়, দবকাব হলে নতুন করে আবার গাছগুলোকে বাঁধা যায়। কিন্তু আসিন্দিবেব ভটভটিয়ার মত করে ডালটাব ওপর বসে থেকে একবার সামনের আবছা আঁধাব আর একবার ঘাড় ঘুবিয়ে অন্যান্য গাছের দিকে তাকিয়ে বাঘারু বোঝে এখনো অন্ধকার ততটা কাটে নি যাতে সে দাঁড়ানোর জায়গা খুঁজতে পারে, বা যদিও পায়, সেখানে দাঁড়িয়ে সে গাছগুলোকে বা গাছের বাঁধনগুলোকে আলাদা করে দেখতে পারবে না। তার জন্যে এই আঁধার আরো কিছু কাটা দরকাব। পাখিগুলো যে-বকম বেশি-বেশি ডাকছে তাতে বোঝা যায়—আঁধারটা কাটছে।

একশ আটাশ

বাঘারু ও পাখিদের জাগরণ

বাতাস আর বৃষ্টি সেই একইরকমভাবে নদীস্রোতেব বিপরীতে আকাশ দিয়ে বয়ে আসছে। বাঘারু স্রোতের বেগে ধেয়ে যাচ্ছে আর তার গায়ের ওপর বাতাসের ও বৃষ্টির পাল্টা ঝাপ্টা এসে লেগেই যাচ্ছে—এই অবস্থাটা এতই অপরিচিত যে বাঘারু মনে আনাব চেষ্টাও করে না যে কতক্ষণ আগে সে গাজোলডোবায় ঐ ফরেস্ট থেকে জলে ভেসেছিল।

'এ ক্যানং বসি থাকা বেলা ঠাকুরের তানে ? আতির (রাত্রির) আন্ধার কনেক-কনেক করি কাটিবার ধরিবে আর পুবপাখে বেলাঠাকুর উঠিবার আগত নাল, হলদিয়া বংগিলা উঠিবে আব মুছিবে। সেগিলা অঙের (রঙের) ছাও পড়িবে জলের উপরত। আর নদীব জল টলটল করিবার ধরিবে অঙত। এ্যানং চলিবা থাকিবে অঙের খেলা আকাশত্ নদীত্ আব মাঠঘাটত, ফরেস্টত্। তার বাদে সব অঙ মুছি যাবার ধরিবে। কায় মুছিছেন কায় জানে। য্যালায রঙগিলা মুছি গিয়া, ধবো কেনে, সারাখান আকাশ গোবরমোছা এগিনার (আঙিনা) নাখান নাগে, য্যান, এ্যালায সিদ্ধ ধান শুখাবার তানে ঐঠে মেলা দিবার লাগিবে, স্যালায বেলঠাকুরখান উঠিবেন, লাল টকটক বন্ন ধরি নদীখানেব মাঝতঠে। বেলাঠাকুর যেইঠে উঠেন সেইঠে মাঝত্ঠে উঠেন। মাঠত্ দেখো, বেলাঠাকুব মাঠের মাঝতটে উঠিবার ধরিবেন। নদীত্ দেখো, বেলাঠাকুর নদীর মাঝত্ঠে উঠিবেন। ফরেস্টত্ দেখো, বেলাঠাকুব ফরেস্টেব মাঝত্টে উঠিবেন। আব, এ কী হবা ধবিছেন ? আতি আব দিনত বৃষ্টি আব বাও, বাও আব বৃষ্টি। দিনেব বেলা আতির নাখান আবছা, আতির বেলা দিনেব নাখান আবছা। এ্যালায থাকো এইঠে বসি—এ আন্ধাব পাতলা হওয়াব তানে। থাকো বসি।'

বাঘারু যেন অস্থির হয়ে ওঠে এই স্রোত, বাতাস, বৃষ্টিব ভেতবে এই গাছগুলো নিয়ে তার ভেসে যাওয়ার নির্দিষ্ট একটা ভূমিকা তৈরি করে নিতে। কাল বাতেব শেষে সে যখন গাজোলডোবাব পাড় ছেড়েছে তারপর থেকে প্রতিটি মুহূর্তই যে-ডাল হাতেপায়ে পেয়েছে, সেই ডাল তাকে অন্ধেব মত আঁকড়ে থাকতে হয়েছে, একটা আন্দাজ পর্যন্ত পায় নি—কোথায় কতটুকু পা সবাতে পারবে বা হাত নাড়াতে পারবে। আন্দাজে-আন্দাজে একটা বসাব জায়গা পেয়ে ডাল বরাবর শুয়ে সে হয়ত একটু ঝিমিয়েও নিয়েছে। কিন্তু সে-সব যেন মাঝরাতের অন্ধকাবে হঠাৎ জলে পড়াব মত। বাঘারুর কিছু করার ছিল না। অথচ বাঘারু ত গয়ানাথেব চার-চারটে গাছ কেটে, বেঁধে, ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অর্জুনগাছটা পড়লে পাঁচটা গাছ হত। বাঘারুব এই গাছগুলো এক-একটাই ত এক-একটা ফরেস্ট যেন। শাল আছে একটা, খয়ের আছে একটা। বাকি দুটো গাছ খুব ভাল করে দেখেও নি ত বাঘারু। এই গাছগুলো দিয়ে গয়ানাথ তাকে ভাসিয়ে দিয়েছে। তাকে কোথাও গিয়ে ঠেকতে হবে। কোথায়, তা সে জানে না, গয়ানাথও জানে না। এক, নদীর এই ফ্লাড জানলেও জানতে পাবে। তার, বাঘারুর কাজ, এই গাছগুলোকে নিয়ে সেই কোথাও ঠেকে যাওয়ার, ঠেকে থাকার। তাবপর আসিন্দির আর গয়ানাথ ভটভটিতে করে তাকে খুঁজে বের করে 'গাছগিলাক আর হামাক্ যা করিবার করিবে।' কিন্তু সেইজন্যে ত এখন এই সকাল থেকে এই গাছ আর বানা আর বাতাস আর বৃষ্টি নিয়ে বাঘারুর সচেতন ও সক্রিয় হয়ে ওঠার কথা। তা না, এখনো তাকে এই ডালের ওপর বসে থাকতে হচ্ছে প্রায় অন্ধের মতই।

বাঘারু চোখ মেলে চারদিকে তাকায়। আকাশের দিকে তাকালে সেই ছাই-ছাই মেঘগুলো কোথাও-কেথাও দেখা যায়, নদীর জলও দূরে কোথাও-কোথাও চলকায়। কিন্তু এই যে-গাছগুলোর সঙ্গে সে ভেসে যাচ্ছে তার পাতাগুলো কিছুতেই স্পষ্ট হচ্ছে না, তার রঙও না। এর মধ্যে পাখিগুলি চারটে শোয়ানো গাছের ডালে বসে নদীর জল অথবা কোনো অনির্দিষ্ট সকালের দিকে তাকিয়ে আছে। সকালের পাখি সাধারণত আলোর দিকে মুখ করে থাকে। কিন্তু গাছগুলো এমন কাত হয়ে পড়ায়, ডালপালার যে-বিন্যাসের সঙ্গে পাখিগুলো পরিচিত ছিল, সেটাই কেমন বদলে গেছে। ফলে, তারা যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, কোন ডালে বসে কোন দিকে তাকালে তাদের পরিচিত আলো দেখতে পাবে। নীচের জলস্রোতের ঐ বেগটাও তাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় নেই। তাদের অভ্যাস এতটা ভেঙে যাওয়াতেও কিন্তু পাখিগুলো নিজেদের মত করে একটা রোজকার অভ্যেসে ফিরে যায়—চার-চারটে গাছের মেলানো-মেশানো ডালপালার মধ্যে উড়তে-উড়তে। চার-চারটে গাছ এমনি

জটপাকিয়ে আছে যেন মনে হয়—একটাই কোনো এমন বড় গাছ, যে-গাছে সূর্য আড়ালে পড়ে যেত ' একটা গাছের সরু মোটা নানা ডালে নানা ভাবে ছোটাছুটি কবতে করতে পাখিগুলো হঠাৎ-হঠাৎ একসঙ্গে ভয় পেযে ডেকে উঠছে। বাঘারু বুঝে উঠতে পারে না—ভযটা ওবা পাচ্ছে কেন, এমনই সমবেত ভয।

বাঘারু গাছটা দিযে গডিযে আবো খানিকটা নীচে নামে। তাব পাযেব পাতা ত জলে ডুবেই যায, গোড়ালি ভেঙে জল উঠতে থাকে। এইখানে বাঘারু পাশে আর-একটা মোটা ডাল পায। কিন্তু সেটা ধরে বসে-বসেই এই ডাল থেকে ঐ ডালে যেতে বাঘারু পিঠে একবাব হাত ছোঁযায়—কুড়োলটা আছে ত ? এতই বেশি মিশে গেছে কুডোলটা শবীরের সঙ্গে যে বাঘারুর প্রায মনেই থাকছে না। মনে ত না-থাকবাবই কথা। শুধু কাজের সময় হাত বাড়ালেই যেন পাওয়া যায। নতুন ডালটাতে পা দিতেই ডালটা ভো-স করে জলে ডুবে যায আর বাঘারু তাড়াতাড়ি আগেব ডালটাতেই ফিরে আসতে যায। ডালটা আচমকা ধাক্কায আবার ডুবে যায, আর বাঘারু এতটাই তলিয়ে যায যে তাকে পুবনো গাছেব ডালটায় পা দেযার বদলে দুই হাত দিতে হয়। কোমব পর্যন্ত ভিজে গিয়ে সেই পুবনো ডালটা দুই পা দিযে জড়িযে ধবে বাঘারু—তাব পিঠে জলেব ছোঁযা লাগে। এখন যদি সে একটা ঝাঁকি দিয়ে নিজেকে ডালেব ওপর তুলতে যায, যা হলে এই ডালটাও ঘুরে জলেব তলায চলে যেতে পাবে। ফলে বাঘারুকে ও-রকম ঝুলেই থাকতে হয। কিন্তু বাতেব শেষ কয়েক ঘণ্টা ঐ ডালটাব ওপবেই ভব দিয়ে এসেছে বলে ডালটাকেও সে একটু বেশি চিনেছিল। বাঘারু নিজেকে জলেব ভেতব আবো খানিকটা ছেড়ে দেয—ফলে তাব শবীবটা হাল্কা হয়ে যায। সেই হাল্কা শবীবটাকে জলের ভেতব দিযেই সে ওপরে নিয়ে যায—যেখানে সে বসেছিল সেই জায়গাটিতে। ঝাঁকি লাগলেও ঐ জাযগাটিতে ঘুব লাগবে না।

ভেজা শবীরে বাঘারু আবাব তাব পুবনো গর্তেব ভেতব বসে পড়ে। সেখানে সেঁটে যেতেই বাঘারুব একবাব মনে হয—তাব এখান থেকে নড়াব দবকাবটা কী ? যেখানে গিযে ঠেকবে সেখানে তাব নামাব মত জাযগা থাকলে, নামবে। এ-ছাড়া ত তাব কিছু কবাবও নেই।

পাখিগুলো চিবকাল যেমন, এখনো তেমনি, বাঘারুব নাগালেব বাইবে ওড়াউড়ি কবে যাচ্ছে। কিন্তু আজ যে বাঘারু আব তাবা একটা গাছে চড়ে যাচ্ছে সেটাও অবাস্তব হয়ে যায এই গাছগুলোর উঁচু ডাল-নিচু ডালেব পার্থক্যে। পাখিগুলো নিশ্চযই বুঝতে পারছে না যে তাবা আব বাঘারু একই গাছে ভেসে আছে।

পাখিগুলো আবাব আচমকা ডেকে উঠল—একসঙ্গে, ভযার্ত।

বাঘারু এবাব ঐ ডাল বেযেই একটু পেছিয়ে যায। গাছগুলো পাড থেকে ছাড়ার সময় সে হাত-পা বুক-পেট দিযে ডালেব যে-অংশটাকে জড়িযে এঁটে বসেছিল, সেই জাযগাটাতে পৌঁছয। সেখান থেকে তাকিয়ে বোঝবাব চেষ্টা কবে—পাখিগুলো সব কটি গাছ জুড়েই এ-রকম ভয পাচ্ছে, নাকি, একটা জাযগাতেই। ঐ একটু উঁচু ডাল থেকে বাঘারু দেখে চাবটি উৎপাটিত গাছে ব ঃ পাখি ও তাদেব কত ওড়াউড়ি চলছে সবগুলো গাছ জুড়ে। ফিবে-ফিবে ওড়া কিন্তু বাতাসেব ধাক্কা সইতে না পেরে আবার পাতাব ভেতব ঢুকে যাওয়া।

কিন্তু পাখিগুলোব ভয দূব কবাব দাযিত্ব বাঘারুকে কে দিল ?

'গাছগিলা গয়ানাথেব, পাখিগিলা গাছেব, পাখিগিলা গয়ানাথেব না হয়। গাছগিলাব চামডার নাখান পাখিগিলা গাছের ডালত বাসা বান্ধির ধরোছে। যেইল বাও দিবাব ধবে, ঝডের নাখান বাও দিবার ধরে, বাওড গাছগিলাব ডালপালা ওলটপালট খাবার ধইচছে—এ্যানং ওলটপালট য্যান গাছের মাথাগিলা মাটিত নামি আসিবে আর গাছের শিকড়খান আকাশত উঠি যাবে—স্যালায় বৃক্ষের কুনো প্রাণী বৃক্ষ ছাড়িবেন না। পাখ-পাখাল ডালপালা আঁটি ধরি থাকিবেন, পিপিড়া গাছের গাওত সিন্ধি যাবে, সাপখোপ গাছের গর্তত ঢুকি যাবে। সেই বৃক্ষখান যদি ঝড়ত উলট খায়, পড়ি যায়, স্যালায়ও বৃক্ষের কুনো প্রাণী বৃক্ষ ছাড়িবেন না। তারপর বাও থামিবেন, বৃষ্টি থামিবেন, বৃক্ষের পাতা পচি খসি যাবার ধরিবেন—স্যালায় পাখপাখাল, সাপপিপিড়া নতুন গাছত বাসা বান্ধিবার ধরে। গয়ানাথের ঝড় গয়ানাথের গাছক উপড়ি দিছে। গয়ানাথের বাঘারু মুই, গয়ানাথব গাছক ভাসি দিছি। গায়ানাথেব বাঘারু মুই 'গয়ানাথর গাছ নিগি ভাসিছু। তিস্তাব এই বানাত ভাসি যাছু। তিস্তার বানার নাখান এই ঝড় আর বৃষ্টির বানাত ভাসি যাছু। গয়ানাথর বাঘারু মুই গয়ানাথর গাছ নিগি ভাসি যাছু।

গয়ানাথর জোয়াই আর গয়ানাথ ভটভটিয়াখান চড়ি সদর আস্তা (রাস্তা) দিয়া তামান চর আর কায়েম দেখি-দেখি খুঁজিবার ধরিবেন—কোটে গিয়া ঠেকিল্ গয়ানাথর গাছ আর গয়ানাথর বাঘারু। মোর আর কী কষ্ট ? বসি আছু, খাড়ি আছু, তিস্তার বানা মোক টানি নিযা যাছে। গয়ানাথ দেউনিযাখানের বড় কষ্ট। আসিন্দির জোয়াইখানেব বড কষ্ট। এ্যালায এ্যানং বানা। কোটৎ চব, কোটৎ টাডি। আব এ্যানং ঝড়। এ্যানং বৃষ্টি। কোটত মোক খুঁজি-খুঁজি বেডিবার লাগিবে। মুই চিল্লি পাবি—হে দেউনিয়া মুই এইঠে। কিন্তুক কায় শুনিবেন সেই চিক্কার। কী আর করিবেন বে দেউনিয়া ? তোমরালাব গাছগিলা আর বাঘারুক য্যালায় ভাসি দিছেন, স্যালায় ত তুলি নিবার নাগিবে। না-হয় ত সবখানই তোমার "লস', পুরাখান "লস", এই চারিখান গাছ "লস্", এই বাঘারুখান "লস্"। জ্বালিযা যেইলা জালখান নদীতে ফেলেন, স্যালায়, ত গুটিবার নাগিবেই। না হয় ত জালখানই "লস",। তোমরালাব গাছ গিলাক আর বাঘারুখানক যেইলা ভাসি দিছু স্যালার গুটিবাব নাগিবেই। এই ঝড়ত্, এই বৃষ্টিত্ তোমায় ভটভটিয়াখান নিগি বাহির হওয়া নাগিবে। কিন্তু গাছের এই পাখিগিলা ত গয়ানাথ দেউনিয়ার না-হয়। পাখিগিলা গাছের। গাছখান ফ্লাডত ভাসিবার ধরিছে ত পাখিগিলাও ভাসিবার ধরিছে। এ্যালায় ঝড়ত্ কাঁপিছে, বৃষ্টিত্ ভিজিছে কিন্তুক পাখিগিলাই আন্ধাব কাটি দিছে। পাখিগিলার কুনো গযানাথ নাই রো, কিন্তুক পাখিগিলার ত বাঘারু আছো, মুই আছো। মোক দেখিবাব নাগিবে না কেনে ভয় খাছে পাখিগিলা ?' এই সব কথাবার্তা ভাবনাচিন্তার ভেতরই সেই বৃষ্টিপাত-ও ঝড়ো হাওয়া আক্রান্ত সূর্যোদয়ের আচ্ছন্নতার সময় জুড়ে বাঘারু ব্যস্ত থাকে। সেই ব্যস্ততায় সে থই হাবিয়ে ফেলে কখন ও কেমন করে গাছেব পাতাগুলোর সবুজ, দৃশ্য হয়ে ওঠে, এবং এমন-কি খয়েব গাছের পাতার সবুজেব সঙ্গে শালগাছের পাতার সবুজের পার্থক্যও, এমন-কি, একই গাছের বিভিন্ন পাতাব আকার ও রঙের পার্থক্যগুলিও। বাঘারুর চিন্তায় স্তরপরম্পরা যেমন আছে, আরো সব মানুষের মতই, তেমনি তার চিন্তাব পবম্পরাহীন জট পাকিয়ে যাওয়াও আছে, আরো সব মানুষেব মতই, কিন্তু সেই আব-সব মানুষ থেকে তাব পার্থক্যও আছে। গয়ানাথের জমিতে হাল দিতে-দিতেই হোক, গয়ানাথের বাথানের মোষ-গরুগুলিকে নিয়ে চলতে-চলতেই হোক আর গয়ানাথের গাছগুলো নিয়ে জলে ভাসতে-ভাসতেই হোক—বাঘারুকে আজও সব মানুষের মতই একা-একা ভাবতে হয় বটে, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে তাকে কথাও বলতে হয একা-একাই। যদি সে কথা বলে উঠতে পারে—তা হলে তাব মাথার ওপবে আকাশ, পাযেব তলায় মাটি বা জল থাকলেই যথেষ্ট। এর আগে তার কোনো-কোনো বাক্যোদ্গমেব সময কখনো কোথাও কোনো অনির্দিষ্ট অফিসার বা নির্দিষ্ট এম-এল-এ থাকতে পারে, এখন তেমনি এই নতুন দিনে তিস্তাব বন্যার সীমান্ত ধরে-ধরে গাছগুলোকে খুঁজবে যে-আসিন্দির আব গয়ানাথ, সেই তারাও তার কথা বলাব উপলক্ষ হতে পারে। হয়ও।

হয় বটে, কিন্তু সে-জন্যে বাঘারুর পক্ষীসন্ধানে কোনো ছেদ পড়ে না। সে ঐ মাস্তুলের মত গাছেব কাণ্ড থেকে দেখে, পাখিগুলো আসলে এই নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওযাতে না পেরে কখনো কোথাও-কোথাও এক সঙ্গে ভয় পাচ্ছে। তারা গাছের ডালপাতার মত স্থায়ী ও অনড আশ্রয়েই আছে অথচ বন্যার স্রোতে ঐ বেগে ভেসে যাচ্ছে—এর ভেতর মিলটা কোথায় তারা বোঝে না। ফলে সকালবেলার অভ্যস্ত ছোটাছুটি করতে-করতে গাছগুলোর পাতার ভেতর দিয়ে একেবারে জলেব কাছে পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে, এমন-কি জল ছুঁয়েও ফেলছে—আর তার পরই ভয়ে চিৎকাব কবে ওপরে উঠে আসছে।

এই প্রক্রিয়াটি আবিষ্কার করে যখন বাঘারু, তখন সে বুঝে উঠতে পারে না—কিছুপাখি স্রোতে পড়ে ভেসে গেছে কিনা। যদি স্রোতে ডানা লেগে থাকে তা হলে আর উঠতে পারে নি, ভেসেই গেছে। কিন্তু বাঘারু কী করে পাখিগুলোকে এই গাছগুলোর ডালপালার ভেতবে যাওয়া থেকে আটকাবে ? নীচের ডালপাতার ভেতরে ঢুকে গেলে নীচের বন্যায় তাদের ভেসে যাওয়া ঠেকাবে কী কবে বাঘারু ? পাখিগুলোও কখনো দেখে নি, ডাল থেকে ডালে গেলে জলে পড়তে হয়।

বাঘারু জলস্রোতের কাছ থেকে পাখিগুলোকে বাঁচাতে চায়। সে 'হেট হেট' করে গাছটার ডালে ঝাঁকি দেয়। তাতে ওপরের ডালের পাখিগুলো ডাল ছেড়ে আকাশে উড়ে আবার ডালে বসে। বাঘারু দেখে, পাখিগুলো যেন বেশি করে ডালপালার ভেতর দিয়ে জলের কাছাকাছি যেতে চায। কেন চায়, সেটা বাঘারু বুঝে ফেলে—ডালপাতার অত ভেতরে গেলে ঝড়ো বাতাসের ও বৃষ্টির ঐ ঝাপ্টা থেকে

বাঁচছে। কিন্তু পাখিগুলো বাতাস আর বৃষ্টি চেনে, বন্যার স্রোত ত আর চেনে না। তাই জলের কতটা ওপরে থাকলে তারা আত্মরক্ষা করতে পারবে হিশেব করতে পারে না।

বাঘারুর চোখের সামনে এতক্ষণে স্পষ্ট হল—একটা শাল, একটা খয়েব, একটা সিসু, আব-একটা গাছ এখনো সে চিনতে পারছে না—একেবারে পরস্পবের সঙ্গে মিশে আছে। কিন্তু নীচের যে-গাছটাকে সে চিনতে পাবে না সেটা আড়াআড়ি এই তিনটি গাছের তলায় লেগে আছে স্রোতের ধাক্কায় নাকি নাইলনের দড়ির বাঁধনে। যাতেই হোক, লেগে ত আছে। বাঘারু সেদিক থেকে একেবারে বাঁ দিকের গাছটার সীমার ডালে দাঁড়িয়ে। সে যদি মাঝখানের শালগাছটাবও মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াবাব একটা জায়গা পেত তা হলে সেখান থেকে সে সবগুলো গাছকেই ও সেই গাছেব পাখিগুলোকে দেখতে পেত।

বাঘারু ঠিকই করে ফেলে সে ঐ গাছগুলোর ঠিক মাঝামাঝি যে-শালগাছটা তাবও মাঝখানে যাবে। এখন চারপাশ ফরশা হয়ে আছে। বৃষ্টির ফোঁটাগুলোকেও দেখা যাচ্ছে। তিস্তার স্রোত—যতদূব পর্যন্ত চোখ যায়, ততদূব পর্যন্ত একই বকম ঘোলাটে। তাকালে মনে হয় না, এই বিরাট জলপ্রান্তরের কোনো স্রোত আছে। কিন্তু বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে স্রোতের সেই বেগে মাথা ঘোবে।

খয়েব গাছেব ঐ বাঁকা কাণ্ডটা বেয়ে বাঘারু তবতব কবে নীচে নেমে ঐ জলটা ধবে জলেই নেমে যায়। স্রোতের ধাক্কায় তার শরীবটা ডালেব সমান্তরালে ভাসে—দেখিছু ক্যানং সোঁতা হে।' কিন্তু এতে তাব শালগাছের ডালটা ধরতে সুবিধেই হয়। সে ডালটা ধরায় যে-ঝাঁকুনি লাগে, তাতে পাখিগুলো কিচিরমিচির কবে ওপরে উঠে যায। বাঘারুব মনে হয, শালগাছটাতে পুরো ভব দিলে গাছটা জলেব ভেতরে ডুবে যেতে পারে। কিন্তু তা নাও যেতে পাবে যদি তলার সেই না-চেনা গাছটাব ডালপালা শালগাছটার তলায় থাকে। একবাব ডান হাতের ওপব বেশি ঝোঁক দিযে দেখে নিতে চায়। সেই ঝোঁকটা দিতে-দিতেই তাব বাঁ হাতটা খয়ের গাছ ছেড়ে দেয। দুই হাতে শালগাছটা ধবতে-ধবতেই শালগাছটা তলিয়ে যায়—বাঘারু সেটাকে আরো একটু তলিযে নিযে শালগাছেব ওপব উঠে বসলে তার হাঁটু পর্যন্ত জলে ডুবে থাকে।

একশ উনত্রিশ

মাচাননির্মাণ

ডালের ওপব বসে বাঘারু একটু অপেক্ষা কবে যে ওপরে তাব উঠে বসার ধাক্কা সামলে ডালটা আবার ভেসে ওঠে কিনা। জলের স্রোত তাব হাঁটুব পেছনের গর্তটায় সামান্য ধাক্কা মাবে কিন্তু স্রোত এতই খর যে জল উছলে ওঠে না। ডালটা একটু ভেসে ওঠে বটে কিন্তু পুরোটা ভেসে ওঠে না। বাঘারু তার ডানে তাকিয়ে আর একটা এমন ডাল খোঁজে যেটা কাণ্ড থেকে ওপরের দিকে উঠে গেছে। সে তেমন একটা ডাল বাছাই কবতে পারে বটে কিন্তু সেটা আবাব একটু পেছনে। এই ডাল থেকে ঐ ডালে যাবার হাঙ্গামা পোষাবে কিনা সেটা মাপতে বাঘারু একবার ঘাড ঘুরিয়ে ডালটা ত দেখেই, তার সঙ্গে-সঙ্গে ডালের আশপাশটাও দেখে নেয। তারপর সেই ডালটায় যাবার জন্য একই সঙ্গে ডান হাত ও পা বাড়িয়ে দেয়। তাতে এই ডালটা আবার জলে ডুবে যায় বটে কিন্তু তাতে বাঁ হাত, বাঁ পা-টা ঐ ডাল থেকে সরিয়ে আনতে বাঘারুর সুবিধেই হয়। এবার সে অনেকগুলো ছোট-ছোট ডালপালা ভেদ করে, আবার সেগুলোকেই ধরে একটা উঁচু ডালের ওপর দাঁড়াতে পারে ও চারদিকে তাকাতে পারে। একটা উঁচু জায়গায় উঠে যেমন চারদিকে তাকাতে হয় তেমনি তাকিয়েছিল বাঘারু কিন্তু তাকানোর পর, অতটা ফরশা সকালেও সে বুঝে উঠতে পারে না কোথায় এসে পড়েছে, কোন পাড়ের কাছ দিয়ে যাচ্ছে। বাঘারুকে কখনো তিস্তার ওপর দিয়ে তিস্তার দুই পাড় চিনতে-চিনতে যেতে হয় নি, তার পক্ষে নদীর ভেতর থেকে নদীর পাড় চিনে নেয়া এমনিতেই মুশকিল হত। আর, এ নদী তার সারা বছরের চেনা নদীই নয়। সারাটা বছরের মধ্যে দু-চার-দশ দিন এই নদী বাঘারুর অপরিচিত হয়ে ওঠে আর নদী

অপরিচিত হয়ে ওঠায় এই নদীর সঙ্গে জড়িত দুই পারের সব বাড়িটাড়ি গাছগাছড়াও অচেনা হয়ে যায়। বছরের তেমনি দু-চার দশ দিন এখন চলছে।

বাঘারু ডাল থেকে ডালে চলে আসায় এই গাছগুলোর ডালপালায় যে-আলোড়ন উঠেছিল তাতে পাখিগুলো মাঝে-মাঝেই একটু উড়ে উঠে আবার নতুন জায়গায় বসে পড়ছিল। বাঘারু উঁচু ডালটাতে দাঁড়িয়ে যে-সময়টুকু চারপাশ দেখে, পাখিরা সেই ফাঁকে চার-চারটি গাছের ডালপাতার ভেতরে-ভেতরে ঢুকে যায়। এক-একটা ঝাঁকিতে পাখিগুলো কিন্তু গাছ ছেড়ে বেশি দূর উঠতে পারে না—সেখানে বাতাসের ঝাপট লাগে। কিন্তু সেটা পুষিয়ে নিতেই আবার জলের বিপজ্জনক কিনারা পর্যন্ত চলে যায়। বাঘারু ঠিক ভেবে উঠতে পারে না, কী করে পাখিগুলোকে জল আর বাতাস থেকে সমদূরত্বের নিরাপদ ডালপালাগুলিতে ফিরিয়ে আনবে।

কিন্তু এই ডালটা বাঘারুর পছন্দ হয়ে যায়। সবচেয়ে না হলেও, এই ডালটা বেশ উঁচুই। চারদিক দেখা যায়। চারটি গাছের মাঝখানেও। একটাই অসুবিধে—মাথার ওপর বড় ভারী কোনো ডালপালা না-থাকায় জল আর হাওয়ার ঝাপটা সরাসরি বাঘারুর গায়ে এসে পড়েছে। বাঘারু আবার তার বাঁয়ে তাকিয়ে দেখে ওদিকে আর-একটা নিচু কোনো ডাল পাওয়া যায় কিনা যেখানে দরকার হলে সে বৃষ্টি আর বাতাসের ধাক্কা থেকে বাঁচার জন্যে গিয়ে মাঝেমধ্যে বসতে পারে।

কিন্তু তেমন কোনো ডাল খুঁজে পাবার আগেই বাঘারু তার পিঠ থেকে কুড়োলটা তুলে আনে। এই ডালটার ওপর একটা মাচান মত বানিয়ে নিতে চায় সে।

'মোক ত ভাসিবা নাগিবে, যত্ত দিন এই ফ্লাড চলিবে, তত্ত দিন এই গাছগিলা নিয়া মোক ভাসিবার নাগিবে। যত্ত দিন আসিন্দির জোয়াই আর গয়ানাথ দেউনিয়া মোক খুঁজি না পায় তত্ত দিন মোক ভাসিবার নাগিবে। গয়ানাথ এই ফ্লাডের নদীর ভেতর কোনঠে মোক খুঁজিবার পাবে হে? যেইলা ফ্লাড থামিবে, হেই পাহাড়ভাঙা ফরেস্ট ভাঙাজলগিলা সব নদী খালি করি বহি যাবে, যে-চরবাড়ি-টাড়িগিলা ফ্লাডত ঢাকা পড়ি যাছে, স্যালায় সেগিলা আবার দেখি যাবার পাম, স্যালায় মুই এই গাছগিলাক নিয়া কোটত ঠেকি থাকিম আর গয়ানাথ আর আসিন্দিরজোয়াই মোক খুঁজি পাবে। তত দিন ত মোক ভাসিবার নাগিবে—'

এই সব কথা কখনো-কখনো ভাবার জন্যেই বলতে-বলতে বাঘারু তার কুড়ালিয়া দিয়ে ছোট-ছোট নানা ডাল কেটে যায়। কাটা ডালগুলো ওখানেই ঝুলে থাকে, দুটো-একটা ডাল পড়ে গিয়ে নীচের ডালে আটকে যায়। কাটার সময় বাঘারু কোন ডালই কুড়োয় না। সে কখনো বাঁ হাতে একটা ছোট ডাল নামিয়ে এনে তার গোড়ায় ডান হাতে কোপ দেয়—একটা। তারপর বাঁ হাতটা ছেড়ে দেয়। কাটা ডালটা আটকে থাকে। কখনো বাঘারু ডান হাতটা একটু লম্বা করে দূরের কোনো ডালের গোড়ায় কোপ দেয়। সেটা এক কোপে না নামলে, আর একটা কোপ তাকে দিতে হয়। কিন্তু তার দুই হাতের সমবেত শক্তি প্রয়োগ প্রয়োজন হয় এ-রকম কোন ডাল সে কাটে না।

দেখতে-দেখতে বাঘারু নিজের জন্যে যেন আকাশটাকে পরিষ্কার করে ফেলে। তাতে বৃষ্টি আর হাওয়ার ঝাপটের মুখে সে আরো পড়ে যায় বটে কিন্তু চারদিকটা বেশ পরিষ্কার হয়ে যায়। সেই [illegible] রাতের অন্ধকার থেকে সে যেন এই চার গাছের সঙ্গে আরো একটা গাছ হয়ে ভেসেছে—এতক্ষণে [illegible] গাছ আর নদীস্রোতের ওপর তার প্রভুত্ব দেখাবার মত একটা আসন তৈরি করতে পারছে।

কুড়ালিয়াটাকে আবার পিঠে গুঁজে নিয়ে বাঘারু কাটা ডালগুলো টেনে আনতে শুরু করে। ততক্ষণে এই ডালটার ওপর তার হাঁটাচলা এতই স্বাভাবিক হয়ে যায় সে অনেক সময় দুই হাতেই কাটা ডালগুলো তুলে এনে এখানে এই ডালটার ওপর আড়াআড়ি ফেলে। ফেলতে-ফেলতে একবার তাকিয়ে দেখে যথেষ্ট ছোট ডাল কাটা হয়েছে কিনা।

বাঘারু এবার নীচের একটা ডালে নেমে যায়। সেখানে দাঁড়িয়ে সে দুই হাতে ঐ ছোট ডালগুলোকে ওপরের বড় ডালের ও পাশাপাশি আরো নানা ডালের ওপর দিয়ে আড়াআড়ি মেলে দেয়। মেলে দিতেই একটা মাচানের মত হয়ে যায়।

এইবার বাঘারু নাইলনের দড়ির বাণ্ডিলটা গলা থেকে খুলে সামনে এনে একটু ভাবতে বসে। এই ছোট ডালগুলোকে বড় ডালটার সঙ্গে বেঁধে না দিলে ডালগুলো ত খসে পড়ে যাবে কিন্তু এত মোটা গাছ বাঁধা নাইলনের দড়ি দিয়ে সে ঐ টুকু টুকু ডাল বাঁধবে কেমন করে? সুতলি থাকলে হত। বাঘারু সামনে

দাঁড়িয়ে গাছগুলোব দিকে তাকায যেন ওখানে কোথাও পাটের সুতলি থাকতে পারে। একটু দূরে একটা লতা মত দুলছিল। বাঘারু হাত বাড়িয়ে সেটা ধরতেই ছিঁড়ে যায়। সেটা বাঘারুর হাতেই লেগে থাকে। ততক্ষণে সকালের আবছা আলোয ঘোলাটে আকাশ ও ঘোলাটে নদীস্রোতের ওপব দিয়ে নিজের দৃষ্টিটা একবার বুলিযে নিয়ে আসে—কোথাও কি পাটেব সুতলি থাকতে পাবে ? অগত্যা বাঘারু তার হাতের নাইলন দড়িব বাণ্ডিলটার দিকেই তাকায। এই চার-চারটি গাছের সব বাঁধন এই বাণ্ডিলটার সঙ্গে বাঁটা। কোনো গাছ কোথাও আটকে গেলে বা সবে গেলে সে এই বাণ্ডিলের টানে বুঝতে পারবে। এই বাণ্ডিলটা থেকে একটা টুকবো কেটে নিয়ে তার প্যাঁচ খুলে-খুলে ছোট-ছোট সুতলির মত দড়ি হয়ত বের কবা যেত কিন্তু তা হলে ত বাণ্ডিলটাকে কাটতে হয। কাটলে সে কী করে টের পাবে—গাছগুলো ঠিক আছে কিনা। গয়ানাথকে যেমন বাথান বুঝিয়ে দিতে হয়, তেমনি ত এই ফরেস্টও বুঝিয়ে দিতে হবে।

একশ ত্রিশ

পাখিরা জলে ঝরে যায়

শেষে বাঘারু একটা বুদ্ধি বেব করে।

বুদ্ধিটা যে বেব কবে তা নয—হাতে আছে এক মোটা নাইলনের বান্ডিল, সুতবাং যা করার তাকে এই দড়ি দিয়েই কবতে হয। ঐ ছড়িয়ে বার্থা ছোট ডালগুলোর ওপব দিয়ে নীচ দিয়ে সে নাইলনের দড়িটাকে দু দিকেব মোটা ডালগুলোব সঙ্গে আড়াআড়ি বাঁধে। মোটা ডালগুলোর সঙ্গে দড়িটা পেঁচিয়ে দেযাতে ঐ মাচানটা যেন নাইলনেব মোটা দড়িব জালে আটকা পড়ে যায়। তাতে ঐ ছোট ডালগুলো খুব শক্ত করে বাঁধা হল না বটে কিন্তু ঐ মাচানেব ওপর থেকে বাঘারুর পড়ে যাওয়ার ভয় আর-থাকল না—দড়িব জালে আটকে যাবে।

নাইলনেব দড়িব বাণ্ডিলটাকে আবাব গলায ঝুলিয়ে বাঘারু ডালের ওপব পা দিযে তার মাচানের ওপব উঠে গিয়ে দাঁড়ায। দাঁড়িয়ে চাবপাশে—সামনে-পিছনে, ডাইনে-বাঁয়ে, ওপরে-নীচে তাকায়। দাঁড়িয়ে ও তাকিযে তাব এত ভাল লাগে যে সে একবার ঐ মাচানেব ওপর বসে পড়ে, তারপর সেখানে আধশোযাও হয, তাবপব আবাব উঠে দাঁড়ায।

দাঁড়ানো, বসা বা শোয়ার সময বাঘারুকে একটু সাবধান হতে হয় বটে যাতে ডালগুলো সরে না যায়, কিন্তু তাতে তাব আনন্দ কিছু কমে না। এতক্ষণে সে যেন এই বন্যা, এই বৃষ্টি, এই হাওয়া ও এই গাছগুলোব ওপর নিজেব নিয়ন্ত্রণ পায়। সে ছোটখাট ডালগুলো কাটায় তার ·· পথও অনেকটা খুলে গযেছিল। সে দেখতে পাচ্ছিল, স্রোত ঠেলে তার এই চার গাছের বহর প্রায় একটুও না হেলে তরতর কবে এগিয়ে যাচ্ছে। স্রোত এই গাছের বহর ও তাকে যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে সেদিকেই যেতে হচ্ছে বটে কিন্তু এই মাচানের ওপব বসে চারপাশ দেখতে পাওয়ায় বাঘারুর মনে একটা ভাব আসে যে সে গাছগুলোকে, এবং স্রোতটাকেও, অনেকখানি নিজের খুশিমত চালাতে পারছে।

নিজেব এই মনে হওয়ার সমর্থনের জন্যে বাঘারুর একটা লাঠি দরকার—বেশ লম্বা ও সোজা একটা লাঠি, এখান থেকে যে-লাঠি দিয়ে জল ছোঁয়া যাবে, আবার দরকার হলে যে-লাঠি আকাশেও তোলা যাবে। আকাশে তোলাব কোনো দরকার বাঘারু ভাবে না—কিন্তু লাঠি একটা থাকলে সেটা ত আকাশে তোলাই যায়, নইলে আব সেটা লাঠি কেন ?. এ অভাবটা বাঘারু রাখতে চায় না।

সে-কুড়ালিযা খান আবার পিঠ থেকে খুলে এনে, ডান হাতে ঝুলিয়ে, স্রোতের দিকে মুখ করে মাচানের ওপব দাঁড়িযে, নিজের চারপাশের ডালপালা-ছাঁটা ফাঁকায় দাঁড়ায় আর এদিক-ওদিক ঘাড় ঘুবিয়ে লাঠি বানানোর মত একটা ডাল খোঁজে। যে-খয়ের গাছটাতে সে রাত কাটিয়েছে সেটাকে এখন মনে হয় কত দূরের—তার ডালপালাগুলোকেও মনে হয়, ঘন। সিসু গাছটাও ত পাশেই ; সেটার পাতাগুলো গাঁযে গা লাগানো—বাতাসের ধাক্কায় সব একদিকে হেলে আছে। বাঘারু সেদিকে তাকিয়ে ভাবে—সিসুগাছেব ডালাপালার মধ্যে সে তার পছন্দমত একটা লম্বা সরু ডাল পেয়ে যেতে পারে। এবার সে স্রোতেব উল্টোদিকে তাকায় যে-গাছটাকে সে আগে চিনে উঠতে পারে নি সেই গাছটা

দেখতে। কিন্তু, কুড়ালিয়া হাতে ঝাঁপানোর জন্যে প্রস্তুত ভঙ্গিতে সে বোঝে ঐ গাছটাতে পৌঁছনো অনেক হাঙ্গামার ব্যাপার।

সে মাচানটি থেকে পাশের সিসু গাছটাতেই যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে দেখে তলায় একটা ডাল উল্টো হয়ে পড়ে আছে, কাটা দিকটা ওপরে। আগাটা কোথায় গিয়ে পড়েছে দেখা যাচ্ছে না। সে কুড়ালিয়াটা পেছনে গুঁজে ঐ ডালটাকে টেনে তোলে। আর বেশ ভেতর থেকে উঠে আসে লম্বা একটা হিলহিলে ডাল। বাঘারু ডালটা হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে—আগার দিকটা একটু বেশি সরু কিন্তু আপাতত তার কাজ চলে যাবে। সে মাচানে ফিরে এসে বসে। পিঠ থেকে কুড়ালিয়াটা খুলে ডালটাকে পরিষ্কার করে। সব পাতাটাতা ঝরিয়ে দেবার পর ডালটাকে বেশ একটা চাবুকের মত দেখায়। বাঘারু লাঠিটাকে সামনে ধরে দেখে। গায়ের চামড়াটা খুলে দিলে ভেতরের রঙটা বেরিয়ে পড়ত। কাঁচা সিসু কাঠের ভেতরের রং সরষের তেলের মত ঝকঝক করে। কুড়ালিয়াব হ্যান্ডেলটা ডান বগলে চেপে ধরে সে গোড়া থেকে একটু-একটু চাঁছতে শুরু করে। এতক্ষণে, ঐ ঝড়ো বাতাস সত্ত্বেও ফরেস্টের কাঁচা সবুজের গন্ধ বাঘারুর নাকে আসে—ডালটাব চামড়ার ভেতর থেকে উঠে আসছে। এই গন্ধটাতে বাঘারু নিজের অজ্ঞাতেই একটু স্বস্তি পায়। গাছের ওপর এ রকম একটা মাচান পেতেছে, তার হাতে ডালের রস লাগছে, নাকে ফরেস্টেব গন্ধ—বাঘারু যেন বন্যায় ভেসে যাচ্ছে না, ফরেস্টেরই ভেতর দিয়ে হাঁটছে, বা চা বাগানের ভেতর দিয়ে।

একটা হ্যান্ডেলমত তৈরি হয়ে যাওযাব পব বাঘারু ছাল ছাড়ানো বন্ধ করে। কুড়ালিয়াটা পাশে রেখে হাত তুলেই আবার হাত দিয়ে চেপে ধরে—যদি জলে পড়ে যায়। সে সেটা পিঠে গোঁজে।

তারপর দাঁড়িয়ে উঠে, দুই পা ফাঁক করে বাঘারু দুই হাতে লাঠিটা মাথার ওপরে বৃষ্টি আর বাতাসের ভেতর ঘোরায়। ঘোরাতে-ঘোরাতে তার বেশ মজাই লাগে—যেন তার লাঠিটা দিয়ে বৃষ্টি আর হাওযার ঐ তোড়টা ভেঙে দেয়া যাচ্ছে। সেই মজাতেই বাঘারু লাঠিটাকে নামিয়ে আনে যেন আবো বাস্তব প্রতিরোধের সঙ্গে লড়ে আনন্দ পেতে আর গাছের ডালপালাগুলোর ওপর মারতে থাকে—'হে-হে-হে-হে'—এই রকম আওয়াজ তুলে।

হঠাৎ লাঠির ঘায়ে ডালগুলো থেকে, এবং আরো নীচের ডাল থেকেও, পাখিগুলোর একটা ঝাঁক বাঁচার তাড়নায় ফরফর করে আকাশে উঠে যায়। সে যে পাখিগুলোকে নীচে জলের কাছ থেকে ওপরে তুলে আনতে চেয়েছিল সেটা বাঘারুর মনে পড়ে যায়। সে এতক্ষণে সম্বোধনের সুযোগ পায়, 'উঠি আয় কেনে, জলেব কাছতঠে উঠি আয়' বলে সে লম্বা লাঠিটাকে আরো নীচে ডাইনে-বাঁয়ে চালায়।

তেমন চালায় বলেই আর মাথা তুলে দেখে না। তলা থেকেও পাখিগুলো ডাকতে-ডাকতে ওপরে আসে, তারপর ডাল ছেড়ে আকাশে উঠে যায়।

তখন বাঘারু দেখে, তার লাঠির ভয়ে পাখিগুলো আওয়াজ করতে-করতে ডাল ছেড়ে বড় বেশি ওপরে উঠে গেছে—এতটা ওপরে যেখান থেকে তাবা আর নামতে পারছে না, ঝড়ো বাতাসের ধাক্কায় তাদের স্রোতের বিপরীতে চলে যেতে ইচ্ছে আর চার-চারটি গাছের বহর নিয়ে বাঘারু তাদের তলা থেকে স্রোতের টানে সরে আসছে। সেই বাতাসের ভেতর পাখিগুলোর তলায় জল ছাড়া কোনো আশ্রয় নেই। এ পাখিগুলো হাওয়ার বিপরীতে উড়ে এই গাছের কাছে ত আসতে পারছেই না, হাওয়া এত জোরে বইছে যে অনুকূলে পাখা মেলেও থাকতে পারছে না। নদীর ওপরে হাওয়ার ভেতরে পাখির ঝাঁকটা কেমন শুকনো পাতার মত ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে। বাঘারু আরো সরে যেতে-যেতেও দেখতে পায়—দুটো একটা পাখি যেন আকাশ থেকে নদীতে পড়েও গেল, ঐ শুকনো পাতার মতই।

বাঘারু বিহ্বল হয়ে ঘুরে সামনে যত দূর চোখ যায় তত দূর ঘোলা জলের দিকে তাকিয়েই মাচানের ওপর আবার ঘুরে পেছনে বাতাসের ভেতর পাখিগুলোর ঝরে পড়ার দিকে তাকায়। কিন্তু তখন সে আরো দূরে সরে এসেছে।

একশ একত্রিশ

বাঘারুর বিষাদ

সকাল আরো কিছুটা বাড়তেই বাঘারু মাচানে বসে দেখতে পায়, তার ডান হাতের, মানে তিস্তার পশ্চিম দিকেব, পাড় । বাঘাক বিমর্ষ হয়ে বসে ছিল তার মাচানে—দুই হাঁটু দুই হাতে জড়িয়ে, তার লাঠিটাকে পাশে শুইয়ে । গলায় নাইলনেব দড়ির বাণ্ডিল আর পেছনে কুড়ালিয়াখানও ছিল—কিন্তু বাঘারুর বসার ভঙ্গিতে মনে হচ্ছিল সে-সব আব সে কখনোই ব্যবহার করবে না । না বুঝে, না ভেবে অতগুলো পাখিকে গাছ থেকে ঝড়েব বাতাসের ভেতর উড়িয়ে দিয়ে যে সে মেরে ফেলল, তারপর থেকে বাঘারুর আর নড়াচড়া করে না । প্রথমে ত তাব মনে হয়েছিল গাছের সবগুলো পাখিকেই সে উড়িয়ে দিয়েছে । পাখিগুলো ঐ বাতাসে ভেসে যেতেও পারল না, গাছগুলোর ওপর ফিরে আসতেও পারল না । তারপর অবিশ্যি বাঘারুব খানিকটা সান্ত্বনা জুটেছে—এই শালগাছটাতে ও আরো তিন-তিনটি গাছে আরো পাখি থেকে গেছে দেখে । একটা ঝাঁকই অমন আচমকা উড়ে গিয়েছিল । কিন্তু আর বাঘারুর পাখিদের সঙ্গে নেই । পাখিরা ডালপালাব ভেতর দিয়ে-দিয়ে ওড়াউড়ি করতে-করতে যদি জলে পড়ে ভেসে যায়, যাক । তাদের বাঁচানোর চেষ্টা বাঘারু আব করতে যাচ্ছে না । এমন-কি, তাকে যদি এ গাছ থেকে ও গাছে যাতাযাত করতে হয—তাহলেও সে পাখিদের দিকে ফিরে তাকাবে না । সে না-তাকালেই পাখিগুলো তাদেব মত উড়বে, থাকবে, ভাসলে ভাসবে, মরলে মরবে । বাঘারু তাই তার মাচানের ওপর স্রোতেব দিকে মুখ কবে দুই হাতে দুই হাঁটু জড়িয়ে দেখে তার ডান হাতে তিস্তার পশ্চিমপাড়ের ফরেস্টটা দেখা যাচ্ছে আর মাঝেমধ্যে বাঁধ, মাঝেমধ্যে বাড়িঘর ।

বাঘাক ও-সব চেনে না । কিন্তু সে বোঝে যে-স্রোত গাছসহ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেটা পশ্চিম পাড়েব দিকেই ছুটছে । এই স্রোতটাকে ঐ পাড়ে নিয়ে গিয়ে ঠেকিয়ে দিতে পারে । আবার ওদিক থেকে আর-একটা স্রোত তাকে পশ্চিম পাড় থেকে টেনে সরিয়েও নিতে পারে । বাঘারুর হাতে যদি লম্বা সরু লগি থাকত তা হলে পাড়েব কাছাকাছি গেলে সে সেই অল্প জলে লগি ঠেলে পাড়ে ভিড়বার চেষ্টা করতে পারত । একটা পাড়ে আটকে গেলেই তাব কাজ শেষ । বাকি কাজ ত গয়ানাথ আর আসিন্দিরেব—'মোক খুঁজিবাব আব গাছ খুঁজিবাব । ঠিকোই খুঁজি পাবে । গয়ানাথ গন্ধ পাবার পারে—কোটত গাছ আব বাঘারু ।'

বাঘারু বাঁ দিকে, তিস্তাব পুব পারে, তাকায় । কিছু দেখা যায় না । সূর্যটা যে ঐ দিক থেকেই উঠেছে সেটা বোঝা যায় ঘোলা আকাশে মেঘেব আঞ্চলিক উজ্জ্বলতা থেকে । আর, দেখা যায় রেল লাইনের একটা ডিসট্যান্ট সিগন্যাল আব খুব আবছা কিছু গাছপালা । কিন্তু এ-সব জুড়েই তিস্তার জল ছড়িয়ে গেছে, এখনো ছড়িয়ে যাচ্ছে যেন । বাঘারুর মাচান থেকে মনে হয়, সমস্ত বন্যাটা ছড়িয়ে পড়ছে তিস্তার পুব পারে । মাচানে বসে সামনে জলেব স্রোতের দিকে তাকিয়েও মনে হয় সেই দূরের পুব দিকেই জলস্রোত ধেয়ে যাচ্ছে । 'জল যাছে পুব পাখে, মুই গাছগিলা নিয়া যাছ পচ্চিম পাখে—' বাঘারু যেন রহস্যে পড়ে যায়. কিন্তু সে-রহস্য নিয়ে আর-কোনো দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগ নেই । 'মোক ত ভাসি দিছে, গয়ানাথ ভাসি দিছে, মোক, যেইটে নিগাবে, মুই যাম ।'

কিন্তু আব-কিছুক্ষণেব মধ্যেই বাঘারুকে উঠে দাঁড়াতে হয়। কারণ, ততক্ষণে তিস্তার পশ্চিমপাড়ে চা বাগানের ফ্যাক্টরির চোঙা আর বাঁধ দেখা যায় ব আর, আরো একটু পরে বাঘারুব চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তিস্তার মাঝখানে কিছু গাছেব মাথা আর টিনের চাল । সেই গাছ আর চালগুলোর গলা পর্যন্ত জল—'চর আছিল, মানছিলা চলি গেইছে ।' বাঘারুর গাছের বহর সেই চরের দিকেই ধেয়ে যাচ্ছে । বাঘারুকে তাব মাচানের ওপব দাঁড়িয়ে প্রস্তুত থেকেও ভাবতে হয় সে কি ঐ চরের জেগে থাকা টিনের চাল আব গাছের মাথায় গাছগুলোকে বাঁধবার চেষ্টা করবে ?

বাঘারু তাব মাচানে দাঁড়িয়ে যখনই এই ভাবনা শুরু করে, তার মনে হয় জলস্রোত যেন তখনই আরো তীব্র হয়ে সেই চরেব দিকে ধেয়ে যায়, এই গাছগুলোসহ তাকে সেখানে আছড়ে ফেলার জন্যেই যেন এই জলরাশি ছুটছে । যতক্ষণ, এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেবার ছিল না, ততক্ষণ এই জলস্রোতের গতির তীব্রতা বাঘারু যেন বুঝতেই পারে নি—এক কাল অন্ধকারে ভেসে যাবার মুহূর্ত ছাড়া, কিন্তু তাবপর, বিশেষত রাত শেষ হওয়ার পর থেকে, এই স্রোতের সঙ্গে বাঘারুর যেন একটা সহাবস্থানই

চলছে। যদিও বাঘারু স্রোতে ভেসে যাচ্ছে—তবুও যেন তার এই ভেসে যাওয়া স্রোতনিরপেক্ষ। তেমনি এই স্রোতও বাঘারুনিরপেক্ষভাবেই বয়ে চলেছে। কিন্তু এখন বাঘারু যখন একটি সিদ্ধান্তের মুখোমুখি তখন হঠাৎই যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যে-সিদ্ধান্তই নিক বাঘারু তা কার্যকর করতে হবে এই জলস্রোতের সঙ্গে লড়ে। বাঘারু প্রতিপক্ষ হিশেবে জলস্রোতের দিকে তাকাতেই জলস্রোতের বেগ ও শক্তি তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর, অনেক, অনেকক্ষণ পর বাঘারু জলের উচ্চকিত কল্লোল শুনতে পায়। এতক্ষণ এই কল্লোল ওপরে বাতাসের সঙ্গে মিশে একটাই আওয়াজ হয়েছিল—সেই একটা আওয়াজ ভেদ করে বাঘারু তার গাছ নিয়ে যাচ্ছে।

তবু, কখনো-কখনো বরং, হাওয়ার আওয়াজটা আলাদা করে সে বুঝতে পেরেছ। গাছের ডালে দাঁড়িয়ে ত তাকে হাওযাব ঝাপটই সামলাতে হয়েছে। স্রোতটাকে ত সে-রকম ভাবেও কখনো সামলাতে হয় নি। তাই স্রোতটা আছে, স্রোতেব জন্যেই এই গাছগুলো নিয়ে সে ভাসছে, ও-সব সত্ত্বেও স্রোতটাই যেন কেমন অবান্তর হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু এখন, যে-মুহূর্তে বাঘারু বুঝে ফেলে এই স্রোত তাকে সামনের ঐ চরের ভেতর নিয়ে যেতে পারে এবং ঐ চরের গাছ বা টিনের চালে সে নিজেকে গাছসহ আটকে দিতে পারে, সেই মুহূর্তে, তার পায়ের তলা থেকে জলের প্রবল শক্তি কল্লোলিত হয়ে উঠে আসে। বাঘারু তার পায়ের তলার জলরাশির দিকে তাকায় না—বরং সে তাকিয়ে ছিল একটু দূরেই। সেই দূরের জল দেখেই সে আন্দাজ করতে চাইছিল যদি তাকে এই জলে ঝাঁপ দিতে হয়, তা হলে স্রোতের অনুকূলে ভেসে যেতে চাইলেও কি তার শবীর ঐ স্রোতের তীব্রতার অনুকূলতা করতে পারবে? নাকি, এ জলস্রোতের বেগের কাছে সমর্থন বা বিরোধিতার কোনো আলাদা মূল্য নেই, ভাসিয়ে নেয়ার বেগে এ স্রোত সব কিছুকেই তলিয়ে নেবে ? আর,এক হতে পারে বাঘারু এই নাইলনের দড়িতে ফাঁস বানিয়ে তৈরি থাকল, যদি ঐ চাল আব গাছগুলোর কোনো একটার পাশ দিয়ে তাদের ভেসে যেতে হয়, তাহলে, সেই ফাঁসটা ছুঁড়ে দেবে। যদি ফাঁস আটকাল, ভাল। যদি না আটকায়, তাতেও ক্ষতি নেই। কিন্তু এই বিকল্প ভাবতে-ভাবতেই বাঘারু বোঝে সে-ভাবে আটকানো যাবে না। তাকে জলস্রোতেব সঙ্গে একটা সংঘাতে যেতেই হবে যদি সে এই চরে নিজেকে আটকাতে চায়। কিন্তু কী ভাবে সে-সংঘাত তৈবি হবে তার কোনো আন্দাজ বাঘারু করতে পারে না, অথচ তাব প্রস্তুত শবীবেব সামনে ঐ গাছ আব টিনেব·চালগুলো ক্রমেই কাছে চলে আসছে, দ্রুত, দ্রুততব।

একশ বত্রিশ

অস্থায়ী নোঙর

বিশ-বাইশ ঘণ্টা আগে যে-চর থেকে নিতাই-গজেন-নরেশরা গরুবাছুরগুলোকে বন্যার ভয়ে বাঁধে তুলেছিল, বাঘারু তার ফরেস্ট নিয়ে সেই চরের দিকেই ভেসে যাচ্ছিল। এখন, জলস্রোতে সেখানে বসতির চিহ্ন জেগে আছে মাত্র দুটি-চারটি গাছের মাথায় আর টিনের চালে।

বাঘারু এখন সেই চরের দিকে ভেসে যেতে-যেতে দেখতে পায় রায়পুর-রংধামালির বাঁধের গায়ে মানুষ আর গরুর সারি। তারা বাঘারুর দিকেই তাকিয়ে আছে কি না, বা, ওখান থেকে বাঘারুকে দেখা যায় কিনা—তার কোনো কিছুই বাঘারু বোঝে না। কিন্তু বন্যায় যে-মানুষ বাঁধের ওপর সংসার নিয়ে ভাসছে, সে নদী ছাড়া আর কোন দিকে তাকিয়ে থাকবে ?

জলের ভেতর ঐ গাছের মাথা আর টিনের চাল বাঘারুকে একটা আশ্রয়ের ইঙ্গিত দিয়েছিল মাত্র, কিন্তু বাঁধের ওপর মানুষ আর গরুবাছুরের সারি, ত্রিপলের উড়ন্ত ছাউনি, আর প্লাস্টিকের চাদরের ওড়া দেখে বাঘারুর ভেতর নিজের অজ্ঞাতেই সিদ্ধান্ত তৈরি হয়ে যায়, এই চরটাতেই সে গাছগুলোসহ নিজেকে বাঁধবে। এটা প্রাকৃতিক ভাবেই ঘটে। এই বাতাস আর বৃষ্টি যেমন প্রাকৃতিক নিয়মে কয়েক দিন ধরে বয়ে চলেছে, এই জলস্রোত যেমন প্রাকৃতিক নিয়মে প্রতিদিনই এই এত জলরাশি নিয়ে এমন বয়ে

চলেছে, তেমনি বাঘারু বাঁধের ওপর মানুষ আব জলেব ভেতব টিনেব চাল দেখে সেখানেই নিজেকে আটকানোর জন্যে সক্রিয় হযে ওঠে প্রায় কোনো কার্যকাবণ ছাড়াই। পাড়ে, বাঁধেব ওপবে মানুষ আর গরু দেখার পর বাঘারুব কাছে ঐ জলকল্লোল তুচ্ছ হয়ে যায। সে যেমন কযেক ঘণ্টা আগে গাজোলডোবার ফরেস্টেব অন্ধকাবে গয়ানাথেব একটি কথায় ভাসমান গাছগুলোর ভেতর অন্ধকার জলে ঝাঁপিযে পড়েছিল, এখনো তেমনি অত মানুষ আব গরু দেখামাত্র সে বুঝে যায তাকে এখানেই নামতে হবে। জলস্রোত যতই তাকে ভাসিয়ে নিযে যেতে চাক—সে এই গাছেব মাথায় বা টিনেব চালে নিজেকে আটকাবে।

বাঘারু সেই মুহূর্তে কিন্তু এটা ভাবে না যে সে এই চবেব মধ্যে কোনো ভাবে নিজেকে আটকাতে পাবলে পশ্চিম পাড়েব বাঁধে গিয়ে উঠতে পাববে। কিন্তু এতগুলো মানুষ আব গরুব এত কাছ থেকে বাঘারু এই সম্ভাব্য আশ্রয় ছেড়ে চলে যায কী কবে? এবপব তাব আবো নিবাপদ ও আবো প্রচুব মানুষ জুটতে পারে কিন্তু সেই অনির্দিষ্ট আশায বাঘারু এমন হাতেব কাছেব মানুষদেব ছাড়ে কী করে? এখানে তাব গাছ বাঁধলেও ত সে বাঁধটাকে দেখতে পাবে।

বাঘারু এত দ্রুত তাব মাচান থেকে নেমে আসে আব ডাল বেয়ে-বেয়ে এই গাছগুলোব পেছন দিকে চলে যেতে থাকে যেন এমন পবিস্থিতিতে তাকে কী কবতে হবে সেটা তাব বহু অভিজ্ঞতায জানা। পশু যেমন শুধু তাব শাবীবিক অনুভবশক্তিতে জেনে যায তাব শবীবকে অনাহত বাখতে, বাঘারু সে-বকম ভাবেই যেন জেনে গেছে যে এই গাছগুলোব আগে ঝাঁপিয়ে নয, গাছগুলোব পেছনে, গাছেব ডাল ধবে জলে ভাসলেই সে হাতেব কাছে কোনো কিছু পেযে যেতে পাবে। যদি সেই কোনো কিছু না পাওয়া যায়, বা সেই কোনো কিছু থেকে তাব হাত ফসকে যায, তা হলে ত এই দড়ি ধবে স্রোতের টানেই আবাব সে নিজেব গাছে ভেসে ফিবে আসতে পাববে।

বাঘারু যে গাছগুলোব ডাল বেযে-বেয়ে পেছন দিকে যায় তাতে গাছগুলো দুলে ওঠে, পাখিগুলো আবাব ডেকে-ডেকে ওড়ে কিন্তু বাঘারু এখন গাছটা উল্টে যাবে কিনা, ডালটা তাব ভাব বইতে পারবে কিনা এ-সব হিশেবনিকেশেব মধ্যেই নেই। এমন-কি পা হড়কে জলে পড়ে যাওযাব আশঙ্কাও তার নেই। কাবণ সে ঐ পেছনের গাছ থেকে জলে নামতেই যাচ্ছে। যখন বাঘারু ডাঙা ছেড়ে এই গাছের ডাল ধরে ভেসেছে, তখন, ডালপালাব সঙ্গে তাব শবীবেব যে-সাযুজ্য মেপে-মেপে তৈবি কবেছিল, এখন সেই সাযুজ্য ভেঙে-ভেঙেই সে এই গাছগুলোব পেছন দিকে যাচ্ছে।

বাঘারু তাব মাচান থেকে শালগাছটাবই নীচেব ডালে নামে, সেখান থেকে হাত বাড়িয়ে সামনেব একটা উঁচু ডাল ধবে ঝুলে নীচেব একটা ডালে নামার পব বোঝে এটা পাশের সিসু গাছটা। সেই ডালটা ধরে মাথাটা নুইযে তবতর কবে খানিকটা এগিয়ে যাবাব পব বাঘারু আবাব ডান দিকের একটা ডালে, শালগাছেব, পা দেয। শালগাছেব ডালগুলো এত শক্ত যে বাঘারুব ওজনে জলে তলিয়ে যেতে পাবে কিন্তু নিজে বেঁকে না। সেই ডালটা ধবে হেঁটে, আবো তলায় নেমে যেতে, বাঘারুকে সামনে নুয়ে সিসু গাছেব ডালেব ওপব হাত বাখতে হয। শালেব ডালটা ডুবে জল তার পা ছাপিযে ওঠে। বাঘারু এবাব শালগাছটা ছেড়ে দিয়ে সিসু গাছটার তলার দিকের একটা মোটা ডাল ধরে জলে নামে। ডালটা জলের গায়ে লেগে ছিল। বাঘারু ঝুলে পড়ায আবো তলে ডুবতে থাকে। বাঘারুর শরীরটা স্রোতের ধাক্কায় ডালটার সমান্তরালে ভাসে। সমান্তরাল সেই শরীরে সে ডালটা ধরে-ধরে আরো তলার দিকে নামে। নেমে গিয়ে একেবাবে তলায যে-গাছটা আড়াআড়ি ছিল তার সামনে পড়ে। এই গাছটা সে এতক্ষণ চিনতে পারে নি। এখন সিসুগাছটার ডাল ছেড়ে ঐ গাছটাব যে-কোনো একটা ডাল ধবার জন্যে হাত বাড়িয়েই চেনে, চাঁপা গাছ। যে-ডালটাতে তার হাত পড়েছিল সেটা নেহাৎই পাতলা—ধরতে না-ধরতেই বাঘারু জলেব তলায় ডুবে যায়। ডুবতে-ডুবতেই হাত বাড়িয়ে আর-একটা ডাল ধরে মাথাটা তোলে। তার মাথা অনেকগুলো পাতলা ডালেব ভেতর আটকে গেলে বাঘারু আবার ডুব দেয়। জলের তলাতেও তাকে আটকে দেযাব মত আগডাল ছিল কিন্তু বাঘারু দুই হাতে সেগুলো সরিয়ে ও ভেঙে চাঁপা গাছটাকে পেরিয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরে। এটা গাছটার মাথার দিক—বাঘারু স্রোতের ধাক্কায় তখন চাঁপা গাছটার সঙ্গে লেপ্টে আছে, সে গাছটাব শেকড়ের দিকে সরে যায়, তারপর গাছটার ওপর উঠে বসে। তার মাচান থেকে বাঘারু এই বন্যাব স্রোতের ভেতর দিয়ে এমন ভাবে এই চাঁপা গাছের গোড়া পর্যন্ত চলে আসে, যেন, আসার পথটা তার প্রতিদিনের অভ্যাসে চেনা।

বাঘারু দেখে একটা পোয়ালের বাঁশ পেরিয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে বুঝে ফেলে সে চবটাতে ঢুকে পড়েছে। মাত্র কয়েকঘণ্টা আগে এখানে মানুষের বসতি ছিল। জলের ঠিক তলায় কোথায় কী উঁচিয়ে আছে তা বলা যায় না। বাঘারু জলে নামতে গিয়ে নামে না। কিন্তু নাইলনের ছড়িব বাণ্ডিলটা অনেকটা খুলে স্রোতের বিপরীতে প্রায় প্রস্তুত হয়ে থাকে যে একটা কোনো শক্ত গাছেব ডাল পেলেও ঝুলে পড়বে। বাঘারু দেখে, একটু দূরে-দূরে দুটো-একটা টিনেব চাল জেগে আছে কিন্তু সে-সব চালে পৌঁছুনো যাবে না। হঠাৎ গাছগুলো আটকে যায়। গাছের তলার জল ফুলে ওঠে। কোথাও আটকে গেছে। বাঘারু সুযোগটা নিতে চায় কিন্তু সে নড়াচড়া কবলে ত বাধাটা সবেও যেতে পারে। বাঘারু কোনো রকমে একটা সরু ডাল ধরে দাঁড়িয়ে দেখে দু-তিনটে সুপুবি গাছেব ভেতর গাছগুলো আটকা পড়েছে। কিন্তু স্রোতের বেগে এই চাঁপা গাছটাই ঘুরে সামনে চলে যাচ্ছে। বাঘারু প্রস্তুত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে। চাঁপা গাছটা আর-একটু ঘুরতেই দেখে, সুপুরি গাছগুলোব পশ্চিমে একটা টিনের চাল। বাঘারু বসে পড়ে জলে তার দুই পা নামিয়ে দেয়। যেই সুপুরি গাছগুলোব কাছাকাছি আসবে সে জলে ভেসে ঐ টিনের চালে উঠবে একটা সুপুরি গাছের সঙ্গে দড়িটা পেঁচিয়ে দিয়ে। কিন্তু চাঁপা গাছটা আর ঘোরে না, থেমে যায়। বাঘারু কোনাকুনি জলে ঝাঁপ দিয়ে মুহূর্তে একটা সুপুরি গাছেব মাথা জড়িয়ে ধরে হেলে পড়ে।

নিতাইদের চরে বাঘারু তার গাছগুলো নিয়ে থেকে যাওয়াব জায়গা পেয়ে যায়। কাবো একটা সুপুবি বনে গাছগুলো আটকে গেলে জলের ওপর জেগে থাকা সুপুবি গাছেব মাথায় উঠে পড়ে বাঘারু, তারপর এক সুপুরি গাছ থেকে আর এক সুপুরি গাছ করে এই টিনের চালেব মাথায়। বাঘারুর পক্ষে বাছাই কবা মুশকিল—গাছগুলোর ভেতরে বানানো মাচানে বসে থাকা, সুপুবি গাছেব আগায ওঠা আর এই টিনেব চালে পা ছড়ানোব মধ্যে কোনটা বেশি লোভনীয। কিন্তু এখানে ত আব তাব কোনো পছন্দেব ব্যাপার ছিল না। যেন এখানে আটকে যাবার জন্যেই গয়ানাথ তাকে ভাসিয়ে দিয়েছিল—গাছগুলো এমনই এখানে আটকে যায়। আর, এত বাছাবাছিরই-বা কী আছে? টিনেব চালে বসে থাকতে খাবাপ লাগলে সুপুরি গাছেব মাথায় চলে যাবে। সেখানে ঝুলে থাকতে খাবাপ লাগলে আবাব দোল খেয়ে গাছের মাচানে ফিবে যাবে। নাইলনেব ঐ দড়ি দিয়ে গাছগুলোকে এমনই প্যাঁচাতে-প্যাঁচাতে এসেছে বাঘারু যে এখান থেকে সেগুলো আর ভেসে যেতে পারবে না।

বাঘারু টিনের চালের ওপর পা ছড়িয়ে বসেছিল বায়পুর-বংধামালিব বাঁধের দিকে তাকিয়ে। সেই একই হাওয়া, একই বৃষ্টি, একই বন্যা অথচ এই চালের থেকে ঐ বাঁধটাকে কত বঙিন দেখাচ্ছে। এমন-কি মানুষজনের চলাফেরা, পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। গরুগুলোর বঙও আবছা চিনতে পাবছে বাঘারু। একটা বা দুটো মোষও আছে। মেয়েদেরও চেনা যাচ্ছে। শুধু এদের কারোরই মুখ বোঝা যাচ্ছে না। এই টিনের চালের ওপর বসে-বসে শুধু জল ছাড়া ওপরেব বাঁধেব এই সব দৃশ্য দেখাটা ত খুব আরামের।

বাঘারুর পক্ষে কোনো দৃশ্য দেখে ক্লান্ত হওয়া সম্ভব নয়, কারণ সে সব সময়ই দৃশ্যেব অংশ। এই এত বন্যা আর এত জল দেখেও সে ক্লান্ত নয়। কিন্তু ক্লান্ত না হলেও সে ত দৃশ্যান্তব বোঝে। এখন, এই টিনের চাল থেকে ঐ বাঁধ একই দৃশ্যান্তরের কাজ করে যাচ্ছে। তা ছাড়া, একটা কাজও ত শেষ হল। তাকে গাছের সঙ্গে গয়ানাথ ভাসিয়ে দিয়েছিল ত কোথাও এ-রকম আটকে যাওযার জন্যেই। আটকে থাকার জন্যেও। এখন আসিন্দির জোয়াই-এর ভটভটিয়ার পেছনে বসে গয়ানাথ তাকে যখন খুঁজে পাবে তখন পাবে। বাঘারুর আর-কিছু করার নেই।

এখনো ত জল বাড়ছেই, হাওয়া বাড়ছেই। চারদিকে কোথাও কোনো ইশারা নেই, যা দেখে আন্দাজ করা যায় যে বন্যাটা এবার কমবে। কিন্তু এখন আন্দাজ পাওয়া না গেলেও বন্যা ত একদিন কমবেই; তখন, জলের সঙ্গে-সঙ্গে বাঘারু তার গাছগুলো নিয়েও নামতে থাকবে—এই জলের তলায় কার ঘরবাড়ির আঙিনায় কে জানে? জল নামলেও তখন বাঘারুকে এখানেই অপেক্ষা করতে হবে—গয়ানাথ কবে তাকে খুঁজতে পাবে তার অপেক্ষায়।

কিন্তু তখন, এই চারপাশের দৃশ্যও ত বদলে যাবে। এখন ত মনে হচ্ছে চারদিকে শুধু জল। এর একটা সুবিধে আছে—নানা রকম জিনিশে চোখ আটকে যায় না। কিন্তু তখন ত ডাঙা জেগে উঠবে। ডাঙা মানেই জমি। জমি মানেই আল। আল মানেই মালিক। মালিক মানেই বাড়ি। বাড়ি মানেই

টাড়ি। টাড়ি মানেই গাঁও-গঞ্জ-শহর। তখন চারদিকে কত জিনিশ, কত উঁচুনিচু, কত বাঁকাচোরা, কত সোজাউল্টো। সে ত রোজ যেমন থাকা তেমনি থাকা। এখন ত রোজকার মতন থাকা না। সেই রোজকার দিনটা এখন জলে ঢাকা পড়ে আছে। জলের কোনো মালিক নেই। তাই জলের কোনো আল নেই। আল থাকলেও বাঘারুর কিছু যায়-আসে না, আল না থাকলেও কিছু যায়-আসে না। কিন্তু এখন এই টিনের চালের ওপর বসে আলহীন জল দেখতে খুব ভাল লাগছে। আরো ভাল লাগছে, এই কথা ভাবতে যে এ-জলে কেউ আল বাঁধতেও পারবে না। বাঘারুর তাই বেশ মজা লাগে এই ভেজা টিনের চালের মাথায় বসে সামনের একটা জলের ওপারে পশ্চিম পাড়ের বাঁধের লোকজন দেখতে।

কিন্তু এটাও একটা টিনের চাল। এখানে ত একটা সুপুরি বাগান, আরো কয়েকটা টিনের চাল, আরো কিছু গাছগাছালি দেখা যাচ্ছে। আবার, এখান থেকে তাকিয়েই বোঝা যায় এ-রকম কিছু চাল, কিছু গাছগাছালির পর তিস্তার বন্যা তিস্তার বন্যার মতই বয়ে চলে। সেই দূরের দিকে তাকিয়ে থেকে আবার এই দুটো-চারটে গাছগাছালি টিনের চালের ওপর চোখ ফিরিয়ে আনলে মনে হয়—এগুলোও যেন তিস্তার বন্যায় ভাসছে, যেমন গাছ নিয়ে ভাসতে-ভাসতে বাঘারু এসে গেছে। বাঘারু যে-জলটা অন্ধকারে, আবছা আলোয়, হাওয়ায়, বৃষ্টিতে পেরিয়ে এসেছে, আর এই চালে আর সুপুরি বাগানে আটকে না গেলে সামনের ঐ জলের ধাবালো যে-স্রোতে সে এখনো ভেসে যেত—সেই দুইয়ের মাঝখানে তার গাছের বহরকে বেঁধে রেখে এই টিনের চালের ওপর বসে এটা বুঝতে পারে এখানে বাড়ি ছিল, যেমন মানুষের থাকে, এখানে সুপুরি বাগান, খেত, ধানবাড়ি, গোয়ালিয়া ছিল যেমন মানুষের গাঁ-গঞ্জে থাকে। এই জল, এই বন্যা, সেই বাড়িটাড়ি গাঁ-গঞ্জকে ঢেকে দিয়েছে শুধু। বাঘারুর ত কোনো বাড়ি নেই, টাড়ি নেই, বাঘারুর কোনো গাছ নেই, আল নেই। বাড়ি আছে গয়ানাথের, টাড়ি আছে গয়ানাথের, ফরেস্টের গাছ আছে গয়ানাথের, ফরেস্টে গরুমোষের বাথান আছে গয়ানাথের। এই যেখানে সে বসে আছে সেখানেও জলের তলায় গয়ানাথের বাড়ি, টাড়ি, বাগান, ফরেস্ট, ধানবাড়ি, গোয়ালবাড়ি, গরু মোষ আছে। জল যখন নেমে যাবে—গয়ানাথ তাকে খুঁজে বের করবে, তার ফরেস্টের চারটি গাছের হিশেবনিকেশ বুঝে নেবে, গয়ানাথের বাঘারু আবার গয়ানাথের কাছে ফিরে যাবে। জল যখন নেমে যাবে—এই এখানকার জলের তলায় জমি জেগে উঠবে, বাড়িটাড়ি জেগে উঠবে, ফরেস্ট জেগে উঠবে। এখন এখানে এই ভেজা টিনের চালের ওপর বৃষ্টি আর হাওয়ার মধ্যে বসে ঘোলাটে জলস্রোতের ওপর দিয়ে ঐ পাড়ের মানুষজন, গরু মোষের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে বাঘারু যেন ভেবে ফেলতে চায়—এই জলটাই থাকুক, সব আল-বাড়িটাড়ি-ফরেস্ট-গরুবাছুর ডোবানো এই জলটাই থাকুক, যে-জলটা দিয়ে বাঘারু ভেসে এল সে-রকম জল দিয়েই বাঘারু আরো ভেসে যাক, এতই ভাসুক যে গয়ানাথ আর আসিন্দির আর তাকে খুঁজে পাবার সুযোগ পাবে না।

বাঘারু যে ঠিক এ-রকমই ভেবে ফেলতে পারে, তা নয়। ঠিক এতটা এ-রকম করে ভেবে ফেলার মত অভ্যেসও তার নেই। সে ত ভাবতে পারে কেবল তার শরীর দিয়ে। সেই শরীরেই আসলে বাঘারু এই জলের মধ্যে বসে থাকতে ক্লান্তি বোধ করে না, একাকিত্বও বোধ করে না—বরং তার শরীরের ভেতরে কোথাও যেন ভবিষ্যতের এক কুণ্ঠা আগে থাকতেই দানা পাকিয়ে ওঠে যে আবার তাকে কোনো এক দিন এই চাল থেকে মাটিতে নামতে হবে। তার শরীরের ভেতরেই বাঘারু এই মাটিঢাকা, বাড়িটাড়িঢাকা, জমিজিরেত-সুপুরি বাগান-গাছগাছালিঢাকা বন্যার জলের সঙ্গে আত্মীয়তা বোধ করে ফেলে আর সেই আত্মীয়তাবোধ থেকেই জলের তলার মাটি থেকে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতাও তার শরীরে এসে যায়।

জলে ভেসে যাওয়া থামতেই, আর এই এখানে এসে নিজেকে বেঁধে ফেলতেই, বাঘারুর শরীর জানান দেয়। তার খিদে পাচ্ছে। বাঘারুর ত এমনি খিদে পাওয়ার অভ্যেস নেই। গয়ানাথের বাড়িতে যখন তাকে খেতে দেয়, তখন তার খিদের একটা অংশ মেটে, কিন্তু এখানে ত বাঘারুকে কেউ ভাত দেবে না। বাঘারু এই সব গাছগাছালির মাথার দিকে তাকায়—সেখান থেকে কিছু খাবার পাওয়া যায় কিনা খুঁজতে। একটা সুপুরি গাছে পাকা সুপুরি আছে, অন্য গাছগুলোতেও কাঁচা সুপুরির গোছা। কিন্তু বাঘারুর খিদে কি এত সুপুরিতেও মিটবে?

একশ তেত্রিশ

জলের দিগ্‌বিদিক

রবিবার ভোর হতে না-হতেই বংধামালি-রায়পুব চা-বাগানের বাঁধ থেকে দেখা যায়, পুবপাবে তিস্তা একের পর এক গাঁ ও বন্দর ছাড়িয়ে প্রায় ময়নাগুড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। তার মানে, দোমোহনি ততক্ষণে তিস্তার প্রায় মাঝখানে। জলপাইগুড়ি শহরের কাছারিব বাঁধ থেকে দেখা যায় তিস্তা সেই বার্নেশ বন্দর ছাড়িয়ে ল্যাটার‍্যাল রোডেব কাছাকাছি চলে গেছে। আবাব, তিস্তার পুব পারের বাকালি-পদমতী, বা আরো ভাটিব জোড়পাকড়ি থেকে দেখা যায়—বুড়ি তিস্তাব খাতের মধ্যে তিস্তা ঢুকে যাচ্ছে।

পুব পার থেকে পশ্চিম পারের, বা, পশ্চিম পার থেকে পুব পারের তিস্তা দেখার বা বন্যা মাপার প্রধান নিরিখ হচ্ছে তিস্তাব মাঝখানের কোন-কোন চব অদৃশ্য হয়ে গেল সেই হিশেব : নদীব এক পার থেকে অন্য পারের দৃশ্য ত সাবা বছর দেখতে-দেখতে মানুষেব চেনা হয়ে যায়। দোমোহনির পুরনো ডিসট্যান্ট সিগন্যাল, নিতাইদের চরেব কোনো বড় গাছ, জলপাইগুড়ির কমিশনারের বাড়ির পেছনের অর্জুন গাছ, বার্নেশের সামনে ভামনি বনের চবটা, কাশিযাবাড়ির কাছে নদীব তিনমুখো ধারার মাঝে-মাঝেই চিকচিকে বালির চরগুলো—এই সবই মোটামুটি ভাবে নদীটাব সীমা-সবহদ্দ ঠিক করে রাখে। রবিবার সকালে সূর্য উঠতে না উঠতে দেখা গেল—এই সব সীমাচিহ্নই লোপাট, যতদূর চোখ যায় তিস্তার ঘোলাটে জল ছড়িয়ে গেছে।

রাতের অন্ধকাবে জলটা ছড়াল আর ভোরে সূর্যের আলোতে সেটা সকলেব চাক্ষুষ হল—তা ত নয়। এখন শুক্লপক্ষ চলছে, সুতরাং রাতে তত অন্ধকার ছিল না। কিন্তু সেই যে বৃহস্পতিবাব থেকে আকাশের ঘোলাটে মেঘ জল-ডাঙা মিলিয়ে চরাচরকে ঢেকে দিয়েছে, আব ঝড়েব মত বাতাস বৃষ্টিব সঙ্গে বয়েই চলেছে—তার ভেতর দিয়ে কতটুকু আলো আর গলতে পাবে ? তবু, সারা রাতই রাতেব শেষ প্রহরেব মত একটা আবছা ভাব ছড়িয়ে ছিল। সেই আবছায়ায় অবিশ্যি আবো বেশি মনে হতে থাকে যে এমন-কি আকাশেব ভেতবেও তিস্তার বান ঢুকে গেছে। ভোর হওয়াব আগে সেই আবছা আলোটা মুছে যায়। চাঁদ ডোবা আর সূর্য ওঠার মাঝখানে কিছু সময়েব একটা অন্ধকাব বিবতি ছিল। সেই বিরতিটা সূর্যোদয়ে একেবারে কাটে তা না, কারণ, ঐ ঘোলাটে আকাশেব কোন তল্লাটে সূর্য উঠেছে তার হদিশ পাওয়া ভার। কিন্তু সেই অন্ধকাবটা কাটতে-না-কাটতেই ধীরে-ধীবে যেন বোঝা যায় সাবা রাতের মধ্যে তিস্তার জল একটুও কমে নি। তারপর আলো আব-একটু স্পষ্ট হলে বোঝা গেল, জল পাড় ছাপিয়ে উঠে এসেছে : নিজের পাড়ে তিস্তার জলের বাড় দেখে তখনো আশা থাকে, জল তাহলে এদিকেই গড়িয়েছে বেশি, অন্য পাড় তাহলে এখনো ভাসে নি। ঘোলা আলো আর-একটু বাড়তে না-বাড়তেই দেখা যায়, শনিবার সন্ধ্যায় চিরকাল দেখা যে-সব গাছগাছালি, বা ডিসট্যান্ট সিগন্যাল, বা বালি, বা বাঁক একে-একে অদৃশ্য হতে-হতে তিস্তাব অপর পারটাকে মুছে দিল সেগুলোব কিছুই আর ভোরের আলোতেও দেখা যাচ্ছে না। যেন রাতের আবছা আলোতে তিস্তার দুই পাড় তিস্তার বন্যায় ভেসে-ভেসে নতুন কোনো জায়গায় এসে পৌঁছেছে—নদীর মাঝখান থেকে নতুন সেই দুটো পাড় দেখতে হচ্ছে। যেন, কেউ আর নদীব এক পাড়ে দাঁড়িয়ে নেই—সকলেরই সামনে-পেছনে নদীর দুই পাড়। আলো আরো একটু বাড়লে প্রথম দেখার সেই বিভ্রমটুকুও কেটে যায় আর চোখের হিশেব দিয়ে তখন মাপতে-জুগতে হয়—তিস্তা কোন পারে কোথায় কদ্দুর ঢুকল। রাতের আবছায়ায় তিস্তার এই এমন আক্রমণের ভেতর যেন কোথাও অবিশ্বস্ততা আছে, বা, নিজেদের অপ্রস্তুতির ভেতর আছে অসহায় আত্মসমর্পণের অনিবার্যতা—সেটা কেটে যায় আলো আরো একটু বাড়তেই। তখন বোঝা যায়—আকাশ যেমন ছিল সেই বৃহস্পতিবার থেকে, রবিবার সকালেও তেমনই আছে, বৃষ্টি যেমন ছিল সেই বৃহস্পতিবার থেকে, রবিবার সকালে তেমনই। আর তখনই দিনের আলোয় এই হিশেবটা কঠিন সত্য হয়ে ওঠে—জলও ত তা হলে যেমন সেই বৃহস্পতিবার থেকে বাড়ছে, তেমনি বাড়তে থাকবে। আর তেমনি বাড়তে থাকলে—কী হবে ?

এই হিসেবনিকেশের একটা স্তরপরম্পররা আছে। তিস্তা যদি সেই বৃহস্পতিবার থেকে এই একই

বাতাস আর একই বৃষ্টির সঙ্গে একই বেগে বেড়ে থাকে, তা হলেও গত তিন দিনের সেই বাড়া আর এখন এই রবিবারের বাড়ার অর্থ এক নয়। বৃহস্পতিবাব থেকে তিস্তা বাড়ছিল প্রথমে নিজের খাতটা ভরে ফেলে, তারপব সেই খাতেব মধ্যে ছোটখাট নানা চবজমি ভাসিয়ে, তাবপর আরো একটু চর ভেঙে, কখনো পুব কখনো পশ্চিম পাড়ে ছোটখাট ভাঙচুর ঘটিয়ে। তারপর শুক্রবার রাত্রি থেকেই ত শুরু হয়ে গেছে—পুরনো কায়েম চবও ভাসানো। কিন্তু তারও একটা হিশেব ছিল। তিস্তার জলের তলার মাটির ঢালের হিশেব। সে হিশেবের কোনো মাথামুণ্ডু নেই। কারণ কেউ কি জানে, কয়েক বছর ধবে কোন জায়গায় পাহাড়েব বালি, পাথর, মাটি জমিয়ে তিস্তা তার তলদেশকে উঁচু কবে ফেলেছে কতটা ? বা, পাহাড়ের খাঁজে-খাঁজে যে-সব হ্রদে জল জমে থাকে সেগুলো ভেঙেচুরে তিস্তায় বৃষ্টিব জল ছাড়াও বাড়তি জল ঢুকেছে কতটা ? কিন্তু মাথামুণ্ডু না থাকলেও ত সবাই একটা আন্দাজ কবতে চায়। সেই আন্দাজেব, কাল শনিবাবেব সন্ধ্যা পর্যন্তও, একটা মানে ছিল। এমন-কি কাল রাতেও ছিল। তখন ত আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না যে তিস্তা সব আন্দাজ কেমন ভাসিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু আজ রবিবার ভোব হতে না-হতেই, তিস্তাব জলপ্রান্তব ঐ নিচু আকাশের তলায় দৃশ্য হতে না-হতেই বোঝা গেল, তিস্তা আর-কোনো হিশেবের মধ্যে নেই, কোনো আন্দাজ দিয়ে আব বোঝা যাবে না জল কী ভাবে বাড়বে, কী ভাবে ছড়াবে। নদী এখনো দু পাড়েব বাঁধেব অনেক নীচে, বোল্ডাবেব জালেব অনেক দূরে। বোল্ডারের জালেব নীচে, পাড়ে, যদিও জল এসেছে, তাহলেও বোঝা যায়, ওটা স্রোতেব ধাক্কায় আসা জল। ঐ জায়গাগুলো এখনো বানেব জলে ভবে নি। কিন্তু বানেব জল ঢোকাব জন্যে ত ঐ জায়গাগুলোই মাত্র এখনো বাকি আছে। পাড়েব ঐ জায়গাতেও যদি জল ঢুকে যায়, তা হলে ত এখন বাকি থাকবে বোল্ডারে জাল। ঐ বাঁধা পাথবেব সঙ্গে এখন স্রোতের ধাক্কাধাক্কি শুরু হবে। কিন্তু তাব আগেই ত কোথাও, কোনো নিচু পাড়ে বন্যাব জল ঢুকে বোল্ডাবেব ফাঁকগুলো দিয়ে বাঁধের গোড়ায় চলে যেতে পাবে। এই এত জলেব এত স্রোত কোথাও যদি বাঁধে এক চুল ভাঙন ধবাতে পারে তা হলে সে বাঁধ বক্ষা কবে সাধ্য কাব ? সে-বকমই ত হয়েছিল, আটষট্টিতে। সেই ববিবারেব সকালে তিস্তাব ওপব আটষট্টি সালেব স্মৃতি যেন বাস্তব হয়ে উঠল।

তিস্তাব এই জলপ্রান্তবে এখন কোনো কিছু দাঁড়িয়ে নেই, নিজেব দিকচিহ্নগুলো উপড়ে ফেলেছে তিস্তা, এখন সে সব তিস্তাব জলের অংশ। ঘবেব চাল, গাছ, সব ভেসে যাচ্ছে। কচুবিপানাব মত সবুজের আভাস দিয়ে ধূসর জলে চকিতে ভেসে যায় ফরেস্টেব গাছ। ওপরে কোথাও তিস্তা কোনো ফরেস্টেব ভেতব ঢুকে পড়েছে। তা হলে তিস্তা কি নতুন কোনো ফাঁক পেয়ে গেছে ? সেখান দিয়ে এই জল অনেকটা বয়ে যেতে পাববে ? তা হলে এই ভাটিতে জল পাড় না-ভাঙতেও পাবে ? নাকি ঐ ওপর থেকেই তিস্তা সব ওপড়াতে ওপড়াতে আসছে ? কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত ত জলে ফরেস্টেব গাছ দেখা যায় নি। বাতে কখন শুরু হল—এই ফবেস্ট-উৎপাটন ?

একশ চৌত্রিশ

কমলেকামিনীদর্শনতুল্য চালে বাঘারুদর্শন

এ-রকম অবস্থায় বায়পুর-বংধামালিব বাঁধেব ওপব থেকে দেখা গেল নিতাইদেব চবেব একটা টিনের চালের ওপব একটা লোক এদিকে মুখ করে বসে আছে। ঐ চালটা অশ্বিনী রায়ের বাড়ি। বাঘারু তার গাছেব বহব নিয়ে যখন ঐ চরে ঢুকেছিল সেটা কাবো চোখে পড়েনি—চোখে পড়ার কথাও নয়। সকাল থেকেই ত মাঝনদী দিয়ে ফবেস্টেব গাছ ভেসে যাচ্ছে। বাঘারু তার গাছগুলোর ভেতরে যে-ভাবে মাচানে বসে ছিল, গাছগুলো নিয়ে যে-ভাবে চরে ঢুকল, সুপুরি গাছে যে-ভাবে গাছগুলোকে বাঁধল—সে সব এই রায়পুর-বংধামালিব বাঁধেব ওপর থেকে দেখা যেত। কিন্তু কেউই ত সে রকম ভাবে ওদিকে তাকিয়ে থাকে নি। বরং তিস্তা আরো কত নতুন-নতুন দিকে ছড়িয়েছে সে-সব আঁচ করাটা ছিল দরকারী। কিন্তু লোকটা যখন অশ্বিনী রায়ের চালের ওপর পা ছড়িয়ে বসে এদিকেই তাকিয়ে থাকে

তখন সেই লোকটা আর বাঁধটার মাঝখানে কোনো বাধা থাকে না। তাকে দেখতেই হয়—এই বাঁধের ওপর থেকে সবাইকে এক সঙ্গেই দেখতে হয়। আর দেখামাত্রই কেউ একজন চিৎকার করে ওঠে, 'মানষি ভাসি যাছে, মানষি ভাসি যাছে।'

এই কথাটা ভয়ঙ্কর। তিস্তা তার পাড়ের ফরেস্ট উপড়ে আনছে—সেটা বোঝা যায়। কত জায়গাতেই ত তিস্তা আর ফরেস্ট পাশাপাশি, গায়ে গা লাগানো। সেখানে ফরেস্টের দু-চারটে ব্লক এমন ফ্লাডে ভাসতেই পারে। কিন্তু গাছ নয়, মানুষ ভেসে আসছে, মানে ওপরের কোথাও কাল রাতে সকলের অজান্তে তিস্তা টাড়িতে গাঁয়ে ঢুকে গেছে, বস্তি ভাসিয়ে দিয়েছে। মানে, ওপরে কোথাও আটষট্টি ঘটে গেছে। নিশ্চয়ই এমন কোথাও ঘটেছে, যেখানকার মানুষ এমন ঘটবে ভাবে নি। নইলে মানুষ ভাসবে কেন? কিন্তু চোখের সামনে ত এই দেখাই যাচ্ছে, আপাদমস্তক একটা মানুষ তিস্তার জলে ভেসে এসে অশ্বিনী রায়ের চালের ওপর বসে আছে।

বাঁধের লোকজন বাঘারুর ওপর থেকে চোখ সরিয়ে তিস্তা ধরে উত্তরে তাকায়—আরো মানুষ ভেসে আসছে কিনা দেখতে। মানুষ ভাসলে ত আর একটা মানুষ ভাসতে পারে না। কিন্তু এ মানুষটিকে যেমন ভাসতে দেখা যায় নি, একবারেই অশ্বিনী রায়ের চালে দেখা গেছে—তেমনি অন্য মানুষদেরও হয়ত কেবল তখনই দেখা যাবে যখন তারা এ-রকম কোনো গাছের মাথায় বা চালের মাথায় উঠবে।

কিন্তু তার ভেতরই ছোটদের মধ্যে কেউ চিৎকার করে ওঠে, 'ঐ একখান ভাসি আসিছে, ঐ একখান—'

'কোটত কোটত?'

নিতাই চিৎকার করে ওঠে, 'কেডা দেখছে রে? কায় দেখিছে? দেখা।'

জগদীশ বারুই নিজের কপালের ওপর বাঁ হাত দিয়ে চেঁচায়, 'কেডা দেখলিরে? কয়ডা মানুষ? বেটাছেলে না মেয়েছেলে?'

জগদীশের কথায় কেউ-কেউ হেসে ওঠে। কে একজন বলেও, 'আরে আপনার সেই মানাবাড়ির মাগিটাই ত ভাইস্যা আইসছে। এহন সামলান গিয়া।'

জগদীশ রাগ করার সময় পায় না কিন্তু তার ছানিপড়া চোখেও নিবিষ্টভাবে দেখতে চায়। নিতাই আবার চিৎকার করে, 'কেডা দেখলি রে? দেখা।'

ছোটদেরই আর-একজন কেউ বলে, 'ঐ ত, আরে ঐ ত, ঐ যে, মাথাখান দেখা যায়। এই পাকে, এই পাকে।' বাঁ হাত দিয়ে সে দিক বোঝায়।

সকলেই চুপচাপ খুঁজে বের করতে চায়। একজন বলেও, 'হয়। মাথোখান ডুবিছে আর ভাসিছে, ডুবিছে আর ভাসিছে।'

নরেশ পেছন থেকে বলে, 'আরে, কিছু দ্যাখব্যাবই পাই না, তুরা এহেবারে ডোবা ভাসা শুধধ্যা দেইখ্যা ফেললি?'

নিতাই হঠাৎ হাত তুলে বলে, 'খাড়া, খাড়া, এই কুনটা ডুবে-ভাসেরে, এইডা? এই যে ভাসি যায়, এইডা?' নিতাই তার আঙুলটা দিয়ে নদীর ভেতরের একটা জায়গা দেখায়।

একটা অনির্দিষ্ট গলায় অনিশ্চিত জবাব আসে, 'তাই ত, ঐডাই—'

নিতাই নিজের সন্দেহটা আরো জোর দিয়ে জানায়, 'ঐডাই ত?'

এবার কেউ জবাব দেয় না। নিতাই একটু পরে বলে, 'মানষি না, কাঠ। কাঠ।' কিন্তু নিতাইয়ের কথায় কোনো জোর ছিল না। বলার পরও সে দেখে যায়। এবং যা দেখছিল সেটা দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যাচ্ছে যখন তখন বলে ওঠে, 'কাঠই ত মনে হইল। তগ কি মানষি মনে হইল রে?'

নিতাই কাকে জিজ্ঞাসা করল, সে নিজেই জানে না। কিন্তু বাঁধসুদ্ধু সবাই আবার নতুন করে খোঁজে, নদীর সেই ভেতরের জল দিয়ে কোনো মানুষ ভেসে যায় কি না! নিতাইও যেখানে ছিল, সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে।

নরেশ পেছনে ছিল। সে কিছুই দেখতে পায় নি, কোনো সন্দেহও প্রকাশ করতে পারে নি। সে হঠাৎ পেছন থেকে নিতাইকে ডেকে বলে, 'এ নিতাই। অশ্বিনীদার চালের উপর যেইডা বসি আছে, সেইডা ত মানষি, নাকি ঐটাও কাঠ?'

তখন সবাই আবার বাঘারুর দিকে তাকায়। বাঁধ থেকে বাচ্চারা চিৎকার করে হাত নাড়ে। কিন্তু

বাঘারু তার কোনো সাড়া দেয় না। বাচ্চারা চিৎকার বাড়ায়। তাতেও বাঘারু সাড়া দেয় না বা হাত নাড়ায় না। অমূল্য ধমক দিয়ে ওঠে, 'থামা ত চিল্লানি, পাশের মানুষের কথা শুনা যায় না এমন হাওয়া আর ওরা চিল্লাবার ধরছে।' তারপর গলা নামিয়ে ডাকে, 'নিতাইদা।'

অমূল্যর ডাক শুনে নিতাই প্রথমে পেছনে তাকায়, তারপর সেখান থেকে অমূল্য নরেশের কাছে চলে আসে।

অমূল্য জগদীশকেও ডাকে, 'কাহা।'

'কী কস?' বলে জগদীশও এগিয়ে আসে, 'রমণী সরকারকে ডাক্।'

'আরে থামেন ত। কিছুর মধ্যে কিছু নাই, এর মধ্যি ডাকাডাকির কী হইল? আপনে আইসেন না এই দিকে। কী কস্ অমূল্যা?'

অমূল্য বলে, 'কই কি—নিতাইদা ডেপুটি কমিশনারকে একটা ফোন কইর‍্যা দ্যাও রায়পুর বাগান থিক্যা।'

'কী কব?'

'কবা, এইখানে দেখত্যাছি তিস্তা দিয়্যা মানুষ ভাসি আইস্যা চরের চালে বইস্যা আছে।'

নিতাই একটু ভাবে। নরেশ বলে, 'যা নিতাই, ফোন কইর‍্যা দে, মানুষডা ত সত্যি-সত্যি বইস্যা আছে।'

জগদীশ বাকুই কাপড়ের গিঁঠ থেকে দুটো বিড়ি বের করে একটা নিতাইকে দিয়ে বলে, 'যা, কইর‍্যাই দে ফোন।'

নিতাই বিড়িটা ধরিয়ে চুপ করে টানে। অমূল্য বলে, 'ভাবো কী, নিতাইদা।'

নরেশ নিতাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আন্দাজ করার চেষ্টা পায় নিতাই কী একটা ভাবছে।

'না। কই কী—আমি ভাবছিলাম এ্যাহন ভোলারে নিয়্যা সাইকেল কইর‍্যা', নিতাই সাইকেল চড়তে জানে না, ভোলা তাকে নিয়ে যাবে, 'শহরে যাব রিলিফের জইন্যে। খাওয়া লাগব ত এতগিলা মানষির। এ্যাহন যদি ডেপুটি কমিশনারকে ফোন কইর‍্যা বলি মানুষ সব উপুর থিক্যা ভাইস্যা আসতেছে তা হালি রিলিফের কথা আর শুইনবে কো ? সব ত তখন রেসকুতে লাইগবেনে। আমাগো কি এ্যাহন বানভাসি মানষি খুঁইজব্যার লাগব, না নিজেগার চাইল-ডাইল-গম-চিড়া জোগাড় কইরব্যার লাগব?' নিতাই বিড়িটা টানতে-টানতে বলে।

'কিন্তু মানুষ একখান যে ভাইস্যা আইসছে?' জগদীশ স্বগতোক্তির মত বলে।

'সে ত মোটে একখান মানষি, কোটত ভাসি আসছে কায় জানে', নিতাই যুক্তি খোঁজে।

একশ পঁয়ত্রিশ

বাঘারুর কমলেকামিনীতুল্য অন্তর্ধান

শেষ পর্যন্ত অবিশ্যি বোঝা যায় সমস্যাটা এমন কিছু কঠিন নয়। ঠিক হয়, ভোলাকে নিয়ে, নিতাই যেমন ভেবেছিল, তেমনি জলপাইগুড়ি শহরে যাবে রিলিফের খোঁজে। এখান থেকে তাকে পার্টি অফিসে যেতে হবে। সেখান থেকে পার্টির কোনো নেতাকে ধরে যে-অফিসারের কাছে গেলে রিলিফের ব্যবস্থা হবে তার কাছে যেতে হবে। আজ রবিবার—সুতরাং রিলিফ বললেই ত আর রিলিফ হবে না। চাল-ডাল-চিড়া-গুড় জোগাড় করতে হবে। বৃষ্টির রকমসকম অর ফ্লাড দেখে ব্যবসায়ীরা সে-সব গুদামে লুকিয়ে রাখতেও পারে। তার ওপর সরকার এখন রিলিফ ঘোষণা করবে কী না সেটাও দেখতে হবে। কংগ্রেসের সরকার হলে না হয় মিছিল নিয়ে গিয়ে ঘেরাও দেয়া যেত। কিন্তু এখন ত সব বুঝেশুনে কাজ করতে হয়। রিলিফ একবার দেয়া শুরু করলে ত সব জায়গাতেই দিতে হবে। শহরে গেলে ফ্লাডের খবরও কিছু পাওয়া যেতে পারে। সুতরাং নিতাই শহরেই যাক—আজ না হলেও, কাল অন্তত রিলিফ পাওয়া যাবে।

নিতাইয়ের চরের যারা এই বাঁধে উঠেছে তারা ত আগে থাকতে সাবধান হয়েই উঠতে পেরেছে। ফ্লাড আসার আগেই তারা সব কিছু নিয়ে আসতে পেরেছে—ফলে অবস্থা এমন না যে সরকারি চালডাল না-পেলে না-খেয়ে থাকতে হবে। যার যা সংসার—বাঁধের ওপর সেই সংসারই বহাল আছে। সকাল থেকে বাঁধের পশ্চিম চালে বাতাস থেকে আগুন বাঁচিয়ে রান্নাটান্নার কাজ শুরুও হয়েছে। তবু ফ্লাড হলে বাঁধে উঠতে হয়, বাঁধে উঠলে রিলিফ চাইতে হয়। যে-কদিনের রিলিফ পাওয়া যায়, সে কদিনেরই লাভ।

কিন্তু সেই অনির্দিষ্ট রিলিফের চাইতে এই চোখের সামনে অশ্বিনী রায়ের চালের ওপর বসে থাকা মানুষটি অনেক বেশি কাছের। লোকটিকে প্রথম দেখার পর নদীর স্রোতে যে আরো মানুষ খোঁজা হচ্ছিল, তাতে এখন আর কেউ ব্যস্ত নেই। কিন্তু অন্তত একটা মানুষও ত সারা রাত ধরে ভেসে এসে এই চালে উঠে বসে আছে। তা হলে ওপরে কোথাও কোনো বড় রকমের ভাঙন হয়েছে। সেই কথাটি এই লোকটির মুখ থেকে জানা দরকার। তাই দুই জনকে সাইকেল দিয়ে রায়পুর বাগানের ম্যানেজারবাবুর কাছে পাঠানো হল—ম্যানেজারবাবু যেখানে যেখানে ফোন করার ফোন করে জানাক যে রায়পুরে সামনের বাঁধের উল্টোদিকের চরে একটা মানুষ, জ্যান্ত মানুষ, ভেসে এসে একটা টিনের চালের ওপর বসে আছে—তাকে 'রেসকু' করা এখনই দরকার। ম্যানেজারবাবুই ভাল বুঝবেন, রবিবার দিন কোথাও ফোন করলে কী কাজ হবে।

বাঘারুকে নিয়ে যখন বাঁধের ওপর এই সব নানারকম আলাপ-আলোচনা চলছে, তখন সে এই বাঁধের সামনে আরো বেশি করে একটা দৃশ্য হয়ে যায়। বাঁধের লোকজনের সামনে এখন তিস্তার বন্যা মাপা ছাড়া বাঘারুকে দেখাটাই একটা বড় আকর্ষণ হয়ে ওঠে, যেন, তিস্তা দিয়ে কী বন্যা এখন আসছে সেটা তিস্তার জল দেখে যতটা বোঝা যাবে, তার চাইতে অনেক বেশি বোঝা যাবে বাঘারুকে দেখে।

বাঁধ থেকে বাঘারুকে যতটা দেখা যাচ্ছিল, নদীর ভেতর চালের ওপর থেকে বাঘারু যেন বাঁধটাকে ততটা ভাল করে দেখতে পাচ্ছিল না। বাঘারুর কাছে বাঁধটা একটা বড় দৃশ্য—যেমন তিস্তাটা একটা বড় দৃশ্য। সেখানে কোনো একটা বিশেষ কিছু ত আর বাঘারু দেখতে পাচ্ছে না। অতগুলি মানুষের নড়াচড়া, কিছু রং, বাঘারু দেখতে পাচ্ছিল বটে, কিন্তু তার বদলে বাঁধের মানুষজনও বাঘারুকে পুরোটাই দেখতে পাচ্ছিল।

তাই বাঘারু যখন চালের ওপর থেকে উঠে সুপুরি গাছে চড়ে, তখন অশ্বিনী রায় নিজের মনেই বলতে থাকে—'গেইল, গেইল, মোর তামান গুয়াবাড়িটা গেইল।' অশ্বিনী রায় চিৎকার করে বলে নি, কিন্তু এই একটা কথাই ঘুরে-ঘুরে সবাইকে বলে যেতে থাকে, সে নিজে ভাল করে দেখতেও পাচ্ছে না। বাঁধের অন্য সকলে ততক্ষণে এইটুকু বৈচিত্র্যে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে যে লোকটি বন্যার ঐ নদীর মধ্যে এক টুকরো চালের ওপর থেকে সুপুরি গাছে উঠে গেছে এবং উঠে যাওয়ার পর আর নামছে না। এই উত্তেজনার মাঝখানে কেউ একজন অশ্বিনী রায়কে ধমকেও ওঠে, 'তোমরালার গুয়াবাড়িখান কি ফ্লাডত ভাসি গেইছে, না ঐ মানুষটা খাইছে?' এই এক ধমকেই অশ্বিনী রায় চুপ করে যায়।

কিন্তু লোকটা চালের ওপর থেকে সুপুরি গাছে উঠলই বা কেন আর উঠলই যদি, তা হলে আবার চালে নেমে আসছে না কেন? বাঘারু চালের সঙ্গে লাগানো সুপুরি গাছটা থেকে পাশের সুপুরি গাছ ধরে সেখান থেকে যে তার গাছের মাচানে চলে গেছে সেটা এই বাঁধ থেকে দেখাও যায় না, বোঝাও যায় না। রবিবারের ভরদুপুরে যতই ঝড়বৃষ্টির অন্ধকার নদীর ওপরের আকাশকে আচ্ছন্ন করে রাখুক, বাঁধের এই এতগুলো লোক ত স্পষ্ট দেখতে পেল অশ্বিনী রায়ের চালের ওপর একটা লোক বসে আছে, চলাফেরা করছে, তারপর একটা সুপুরি গাছের ওপর উঠে চলে গেল, আর নামল না। সুপুরি গাছের ওপর কেউ বসে থাকতে পারে না। আর, টিনের চালের মত এত প্রশস্ত জায়গা থাকতে হঠাৎ সে সুপুরি গাছের মাথায় উঠতেই-বা যাবে কেন। আর, যদি-বা কোনো কারণে ওঠেই, তাহলে উঠে আর ফিরে নামবে না? এই বাঁধের ওপর থেকে দেখা গেল—জ্বলজ্যান্ত একটা লোক ভেসে এসে উঠল, বেশ অনেকক্ষণ বসে থাকল, তারপর, সুপুরি গাছে উঠে হাওয়া হয়ে গেল?

সুপুরি গাছ থেকে বাঘারুর নেমে আসার সময়টা যখন সব হিশেবের বাইরে চলে যায়, আর চোখের সামনে তিস্তার জলস্রোত নতুন বেগে ফুলে উঠছে মনে হয়, তখন, গত ক-দিন ধরে একঘেয়ে এই ঝড়ো বাতাস, মাটির প্রায় সমান্তরাল বৃষ্টি ও আবছা আকাশের মধ্যে যেন নতুন অর্থ একটা সঞ্চারিত হতে

থাকে। এই বাতাস ও এই বৃষ্টি যেমন চলছে, তেমনই চলবে—কোথাও তার কোনো বিরতির সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। যে-জল নদী বেয়ে আসছে, তারও কোনো বিরতি নেই, যেন অনন্তকাল ধরে এই জল বয়ে আসবে। প্রতিদিনের যে-মানচিত্রের ভেতর এই নদীব বয়ে যাওয়া সেই মানচিত্রটি এমন ভাবে বদলে গেছে, যে এখন আর কোনো বদলও চেনা যাচ্ছে না। আর-মাত্র কয়েক ঘণ্টা পর রাত্রি আসবে। সেই রাত্রিতেও এই ঝড় বইবে, এই বৃষ্টিবাতাস ভেজাবে, নদীর এই জল বাড়তে থাকবে। অথচ একটা মানুষকে সামনে ডুবে থাকা চরের একটা জেগে থাকা চালে দেখা গেল, আব সে সুপুরি গাছ বেয়ে উঠে আর নামল না—এমন একটা ঘটনাকে মেনে নিতে হচ্ছে, এতগুলো মানুষকে এক সঙ্গে মেনে নিতে হচ্ছে? তিস্তার এমন বন্যায় কোথাও কোনো গাছের মাথায় একা-একা বাঁচতে-বাঁচতে কেউ-কেউ কখনো-কখনো এমন কোনো-কোনো দৃশ্য দেখে থাকতে পারে। কিন্তু, এখানে রাত জেগে, বেড়িয়ো শুনে, ফোন করে, পাহাড়ের জলের হিশেব কষে, চর থেকে যে-মানুষজন বাঁধে গরুবাছুর ঘরসংসার নিয়ে এসে উঠেছে তাদের সবার পক্ষে ত এটা মেনে নেয়া শক্ত। কারণ, এমন একটা ঘটনা মেনে নিলে, বুঝতে হবে, এই বন্যাটা স্বাভাবিক বন্যা নয়, এই তিস্তাও রোজকার তিস্তা নয—কোনো দৈবী খেলা চলছে এই বন্যায়, জল আর হাওয়ায়। যে-মানুষটা চোখের সামনে ঐ টিনের চালের ওপর ছিল, সে টিনের চাল থেকে উধাও হয়ে যাবে—এমন ঘটনা দেখলেও মেনে নেয়া যা[illegible] না।

বাঘারুর অন্তর্ধান এই বাঁধের লোকজনের মধ্যে প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে। আর দেখতে-দেখতে এমন লোকের সংখ্যাই বেশি হয়ে যায় যারা বাঘারুকে চালেব ওপরও দেখে নি। তারা জিজ্ঞাসা করতে থাকে—'তোরা দেখিছিলু ত? মানষিডা ছিল্, না, ছিল্-না?'

একশ ছাত্রিশ

ফোনে বাঘারুউদ্ধারের আহ্বান

বেলা আড়াইটে নাগাদ বাঁধের ভিড়টা প্রায় ছোটখাট একটা হাটের ভিড়ের মত হয়ে গেল।

রায়পুর বাগানের বাবুরা, বাবুদের বাড়ির মেয়েরা, চা-বাগানের কুলিকামিনরা, রংধামালি বন্দরের লোকজন, রংধামালি হাটের দোকানদাররা, দল বেঁধে—ফ্লাড দেখতে এখানেই এসে ওঠে।

তিস্তা দেখার জন্যে এদের এতদূর না এলেও চলত। এমন-কি রায়পুর বাগান থেকেও ত উত্তরে বাঁধের যে-কোনো একটা জায়গায় উঠে তিস্তা দেখে নেয়া যায়। আর হাটের লোকজন ত বাঁধের পারেই। কিন্তু এখানে এলে তিস্তার ফ্লাড ও সেই ফ্লাডে ভেসে আসা এই চরেব লোকজনকে একসঙ্গে দেখা যাবে—সেটা নদীর পারের এদের এতদিনে জানা হয়ে গেছে। প্রত্যেক বছরই বন্যায় রায়পুরের উল্টোদিকের এই চর যে ভাসে, তা নয়—কোন চর ভাসে, কোন চর ভাসে না, তা নির্ভর করে তিস্তার জল কোন দিক দিয়ে যাবে তার ওপর। কিন্তু যদি তিস্তা পশ্চিম পাড় ঘেঁষেই বয়, তা হলে এই চরটা ভাসবে আর চরের লোকজন এসে বাঁধের ওপর উঠবে—এটা জানা কথা।

জানা কথা হলেও ত সব সময় জানা যায় না।

আজ সকালে বাঁধ থেকে দুটো ছেলে সাইকেলে রাইপুর বাগানে গিয়ে খবর দিয়েছিল, তিস্তার বন্যায় এখন জ্যান্ত মানুষ ভেসে আসতে শুরু করেছে; এসে, তাদের ডোবাচরের গাছগাছালি ও টিনের ওপর আটকে আছে; এদের 'রেসকু' করার জন্যে যাতে মিলিটারির নৌকো আসে সে জন্যে টাউনে ডি-সিকে যেন ফোন করে দেয়া হয়। রায়পুর বাগানটি ঐ চরের লোকজনের অপরিচিত নয়। রংধামালির হাটে বাবুদের সঙ্গে মুখচেনাও আছে অনেকের। ফলে, তারা যখন এই খবর দেয়, তখন বাবুদেরও কেউ-কেউ তাদের খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতে চায় তাদের চর কখন ভাসল, তারা কখন বাঁধে উঠল, কখন থেকে তিস্তার লোক ভেসে আসতে দেখেছে তারা। এ ঘটনা জেনে নিতে চায় বাবুরা—ফ্লাডের মত একটা ঘটনা আর মানুষ ভেসে আসার মত আরো বড় ঘটনা যদি তাদের হাতের নাগালে কিন্তু চোখের

আড়ালেই ঘটে গিয়ে থাকে, তাহলে অন্তত এই ছেলেগুলোর মুখ থেকে তার কিছু প্রত্যক্ষ বিবরণ শুনে নেয়া উচিত।

কিন্তু রায়পুর বাগানে গিয়েছিল অমূল্যদের পাড়ার সুবল আর ছিদাম। যে-কারণেই হোক, তাদের দুজনের কেউই খুব একটা বিশদ বিবরণ দিতে চায় না। সুবল আর ছিদামের বদলে আর-কেউ হলে হয়ত বাবুদের এই এত প্রশ্নের সুযোগে বেশ সবিস্তার কাহিনীই বলতে বসত। সুবল-ছিদামও যে তেমন গল্প বলতে পারত না, তা নয়। কিন্তু নিজেদের চর ছেড়ে, ঘর ছেড়ে, খোলা বাঁধের ওপর তাদের একটা রাত কেটেছে, এবং মাত্র একটা রাত। আজ হাওয়ার আর নদীর যা-চেহারা তাতে আর-ক-রাত কাটাতে হবে, তারা জানে না। সারা শরীরে ঐ জল আর হাওয়ায় তাদের ইতিমধ্যেই একটা একঘেয়েমি এসে গেছে। যে-বন্যার মধ্যে আছে, সেই বন্যা নিয়ে আর কথা বলতে তাদের ভাল লাগছিল না। তা ছাড়া সুবল-ছিদামের যা বয়স, তাতে বাঁধের ওপর তাদের আর-কিছু করার ছিল না—এখন শুধু বসে-বসে সময় কাটানো। বিলিফ-টিলিফ এই সব করার জন্যে ত নিতাইকাকাবই আছে। গরুবাছুরও আছে বাঁধা। তারা তাই রায়পুর বাগান থেকেই সাইকেলে টাউনে গিয়ে দুপুরের শোতে একটা সিনেমা দেখে বিকেলে বাঁধে ফিরে আসবে। ডি-সিকে ফোন করার কথাটুকু তারা জানাতে চায় শুধু—এর চাইতে বেশি কথার মধ্যে জড়িয়ে পড়তে চায় না। বাবুদের কথার উত্তরে ছোটখাট 'হাঁ' 'হুঁ' দিয়ে তারা সাইকেলে চড়ার ভঙ্গি করে। কিন্তু সাইকেলে চড়ার আগে বাবুদের একবার মনে করিয়ে দেয়, 'ফোনটা কইব্যা দিবেন বাবু, মিলিটারিনৌকা য্যান পাঠায়।'

ফলে, সুবল-ছিদাম চলে যাবার পর বাবুদের মুখে-মুখে কথাটা বাগানে ছড়ায়, বাগানের কুলিকামিনদের কাছেও কিছু খবর আসে, দুপুরে বাবুরা বাড়িতে খেতে গেলে বাড়িতেও খবরটা পৌঁছে যায়। রায়পুর বাগানের লোকজনের কাছে এটা আর-কোনো খবর না যে চরের লোকজন বাঁধে উঠেছে। কিন্তু সেই বানভাসি লোকেরা এসে খবর দিয়ে গেছে যে তিস্তা দিয়ে লোকজন ভেসে আসছে—এটা একটা খবর বটে। কত লোক, কখন ভাসল, কোথায় উঠল, মিলিটারির নৌকো কখন আসবে—এর কোনো কিছুই জানা নেই বলে কৌতূহল আরো বেড়ে যায়। এদের মধ্যে অনেকেই ত বন্যায় যে মিলিটারি নামে তা শুধু রেডিয়োতে শুনেছে, অন্য জায়গার বন্যার খবরে টিভিতেও দেখেছে। কিন্তু তাদেরই বাঁধ থেকে মিলিটারির নৌকো ছাড়বে—এটা প্রায় যেন অবিশ্বাস্য ঠেকে। এমন আশাও কারো-কারো মনে আসে যে মিলিটারি যখন নামবে তখন কি আর টিভিতে দেখাবে না? টিভিতে দেখানো না-হলে কি মিলিটারি নামবে? একেবারে তাদেরই বাঁধের ওপর থেকে মিলিটারিরা যাবে আর সেটা আবার তাদের টিভিতেই দেখা যাবে—এ-রকম একটা অসম্ভবও সম্ভব হতে পারে ভেবে দুপুরের খাওয়া কোনো রকমে সেরে রায়পুর বাগানের বাবুরা, গিন্নিরা, বাচ্চারা বাঁধের ওপর এসে ওঠে।

বাঁধের দিকে আসতে-আসতে রঘু ঘোষ একবার ম্যানেজারের বাংলোতে হাঁক দেয়—'কী ম্যানেজারবাবু, খবর পেলেন নাকি মিলিটারির নৌকো কখন আসবে?'

ম্যানেজারবাবু খাওয়াদাওয়ার পর শুয়ে ছিলেন। তিনি জানলায় পর্দা সরিয়ে ঘাড়টা একটু তুলে বলেন, 'কী, তুমিও যাচ্ছ নাকি বাঁধে?'

'করবটা কী? সবাই যাচ্ছে। আপনি যাবেন না?'

'তোমরা আগাও। আমি একটু শুয়ে, পরে যাচ্ছি।'

'তা একটা ফোন করেন জ্যোতিদাকে, মিলিটারি কখন আসবে।'

ম্যানেজারবাবু পর্দা ফেলে দেন। রায়পুর চা-কোম্পানির অফিস জলপাইগুড়ি শহরে। তাদের সেক্রেটারিকেই ম্যানেজারবাবু ফোন করে জানিয়েছিলেন তখন। তারপর আর-খবর নেন নি। তাঁর আর খবর নেয়ার আছেই-বা কী? এখন জ্যোতিবাবুকে ফোন করলে অবিশ্যি জানা যায় কী হয়েছে।

ম্যানেজারবাবু পর্দা তুলে বলেন, 'এই রঘু, জ্যোতিবাবু একটা ফোন নম্বর দিলেন। মোবাইল সিবিল এমার্জেন্সির। তাদের কাছে জানতে হবে, কখন আসবে। তুমি এসে ফোন করে দেখো ভাই।'

'করেন-না ফোন', রঘু ঘোষ রাস্তার ওপর থেকেই বলে।

'ও-সব মিলিটারির ব্যাপারস্যাপার ভাই, তুমি করলে করো, না-করলে ছেড়ে দাও, লোক ভাসছে ত ভাসুক,' ম্যানেজারবাবু জানলার পর্দা ফেলে দিয়ে আবার শুয়ে পড়েন।

'আপনাকে নিয়ে যে কী হবে, একটা ফোন করতে এত ভয় পান—' বলতে বলতে রঘু ঘোষ

ম্যানেজারের বাংলোর বাগানের গেট ঠেলে ঢোকে। দরজা খোলাই ছিল। ফুলবাগান থেকে বারান্দায় উঠে পর্দা ঠেলে ঘরে ঢোকে রঘু ঘোষ। ম্যানেজারবাবু যে-চৌকিটাতে শুয়েছিলেন তার পাশেই, টেবিলে ফোন। ম্যানেজারবাবুর চৌকিটাতে রঘু ঘোষ বসতেই ম্যানেজারবাবু বলেন, 'করো, দেখো কী বলে। আজ রবিবারে দেখবে মিলিটারিও নাই, পুলিশও নাই।'

রঘু ঘোষ লাইনটা পেয়ে যায়, 'হেলো, হ্যাঁ, শোনেন আমি রায়পুর চা বাগান থেকে বলছি, হ্যাঁ, ও, হ্যাঁ,' বলতে-বলতে রঘু ঘোষ থেমে যায়। ম্যানেজারবাবু চোখের ওপর থেকে হাতটা নামিয়ে তাকিয়ে থাকেন। রঘু ঘোষ বলে ওঠে, 'আচ্ছা, আপনারা তা হলে আধ ঘণ্টাব মধ্যে পৌঁছে যাবেন?' রঘু ঘোষ আরো কিছু শুনে, 'আচ্ছা' বলে ফোনটা রেখে দিয়ে বলে, 'আরে ওঠেন, ওঠেন, আধঘণ্টার মধ্যে মিলিটারির নৌকা আসবে। চলেন। জ্যোতিদা আবার ফোন কবেছিলেন।' ম্যানেজারবাবু বলেন, 'আরে, আমাকে ছেড়ে দাও, তোমরা ত যাচ্ছই।'

রঘু ঘোষ দাঁড়িয়ে উঠে বলে, 'আরে চলেন ত, আপনাকে নিয়ে আব পারা যায় না।'

ম্যানেজাববাবু অগত্যা ওঠেন। ধুতি ওঁর পবাই ছিল। উনি আলনা থেকে শাদা ফুলশার্টটা গায়ে চড়ান আর স্যাণ্ডেলটা খুলে রবারের চটিটা পরে ছাতাটা হাতে নেন। দরজা দিয়ে বেরতে-বেরতে ম্যানেজাববাবু বলেন, 'এই রঘু, ঐ মিলিটারিরা এসে যদি জিজ্ঞাসা করে কে খবর দিয়েছে, কী হয়েছে, সে-সব কিন্তু ভাই তোমরা সামলিও।'

হে-হে করে হাসতে-হাসতে রঘু ঘোষ বলে, 'আরে, আচ্ছা-আচ্ছা, চলেন।'

ম্যানেজারবাবুকে নিয়ে রঘু ঘোষ যখন বাঁধে পৌঁছয় তখন ভিড় একেবারে জমজমাট। রঘু ঘোষ বাঁধে উঠে ওদের বাগানের দলটাকে খোঁজে। ওদিকে ম্যানেজারবাবুকে দেখে হাটের লোক দু-একজন নমস্কাব করে এগিয়ে আসে। বঘু ঘোষ বলে, 'এই আসার আগে ফোন করলাম। আধঘণ্টাব মধ্যে মিলিটারির নৌকো এসে যাবে। এতক্ষণে টাউন থেকে রওনা হয়ে গেছে?'

রাযপুরের গুদামবাবু আগেই এসে গেছেন। উনি এদের দেখে কাছে আসতে-আসতে বলেন, 'আরে, আর রেসকিউ করবে কাকে? যে ভেসে এসেছিল সে নাকি কিছুক্ষণ পব একটা সুপুবি গাছের ওপর উঠে উধাও হয়ে গেছে।'

'মানে? সে আবার কী?' বঘু ঘোষ জিজ্ঞাসা কবে।

'ঐ যে দেখছেন টিনের চাল ভেসে আছে,' গুদামবাবু আঙুল দিয়ে অশ্বিনী বায়েব চাল দেখান, 'ঐখানে নাকি একটা লোক ভেসে এসে উঠেছিল। এবা সবাই দেখেছে—।' গুদামবাবু বেশ জোরে-জোরে কথাগুলো বলছিলেন—ফলে তাঁদের ঘিরেই ভিড়টা জমাট বেঁধে যায়। তা ছাড়া এই জায়গায় এই ভিড়ের মধ্যে এখন রায়পুরের ম্যানেজারবাবু, গুদামবাবু, ফ্যাক্টরিবাবুই (রঘু ঘোষ) সবচেয়ে প্রধান ব্যক্তি। রায়পুরের এক শ্রমিক এসে ম্যানেজারবাবুব হাত থেকে ছাতাটা [illegible] তাঁর মাথায় ধরে রাখে। গুদামবাবু বলেন—'তারপর নাকি লোকটা হঠাৎ একটা সুপুরি গাছে চড়ে। ওরা সবাই দেখেছে। কিন্তু সুপুরি গাছ থেকে আব নামে নি। আব, নামবেই-বা কোথায়?'

'সুপুরি গাছ ত পিছল হয়ে আছে। পড়ে যায় নি ত গাছ থেকে?' ম্যানেজারবাবু বলেন।

'পড়ে গেলে ওরা দেখত না?' গুদামবাবু জিজ্ঞাসা করেন।

'তা, লোকটা কি হাওয়া হয়ে গেল?' বঘু ঘোষ পাল্টা জিজ্ঞাসা কবে।

একশ সাঁইত্রিশ

বন্যার উপকথা

'সে আমি কী করে বলব, আমি ত আর দেখি নি, কিন্তু এরা ত সব এক কথা বলছে!' গুদামবাবু ডান দিকে হাত দেখান।

'চলুন ত দেখি', রঘু ঘোষ সেদিকে পা বাড়িয়ে ম্যানেজারবাবুর দিকে ঘুরে তাকায়। ম্যানেজারবাবু

কথা বলছিলেন। হাত তুলে রঘু ঘোষকে এগিয়ে যেতে ইঙ্গিত করেন। রঘু ঘোষ আর গুদামবাবু ঘিরে ধরা ভিড়টাকে ভেঙে এগিয়ে যায়। ভিড়টার কেউ-কেউ গুদামবাবু আর রঘু ঘোষের পেছন-পেছন যায়, কেউ-কেউ ম্যানেজারবাবুকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকে।

গুদামবাবুর পেছনে-পেছনে রঘু ঘোষ যেখানে গিয়ে দাঁড়ায় সেখান থেকেই বানভাসিদের অস্থায়ী আবাস শুরু। এর মধ্যেই বানভাসিদের আলাদা করে চিনে নেয়া যায়। তারা বেশির ভাগই বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে এক-এক দঙ্গলে জড়াজড়ি করে আছে। চব্বিশ ঘণ্টার ওপর হাওয়া আর বৃষ্টি তাদের শরীরের ওপর দিয়ে গেছে—সেটা দেখেই বোঝা যায়। বাতাসের ধাক্কায় কোনো আড়াল বা ঢাকনা থাকছে না। কিন্তু এরই মধ্যে বড়-বড় বোল্ডারের পাশে পাথরের আড়ালে অনেকে নিজেদের শরীর বাঁচাচ্ছে। কেউ-কেউ আবার সংসারের জিনিশপত্র পাঁজা করে রেখে তার আড়ালে বাতাস আর বৃষ্টি থেকে মাথা বা শরীরের কোনো অংশ বাঁচাচ্ছে। পাশেই গরুগুলো দাঁড়িয়ে-বসে। তাদের সারা শরীর সপসপে ভেজা। গোবরের গন্ধে বাতাস ভারী। এক বুড়ি একটা তক্তার ওপর কাত হয়ে শুয়ে, তার মাথার ওপর একটা ঝুড়ি চাপা দেয়া—বৃষ্টি ঠেকানোর জন্যে।

রঘু ঘোষ আর গুদামবাবু যে-জায়গায় এসে দাঁড়ায়, সেখান থেকেই বানভাসিরা নিজেদের আলাদা করে রাখা শুরু করেছে বটে কিন্তু ঐ শুরুর জায়গাটাতেই যা ভিড়। তারপর জিনিশপত্র আর গরুবাছুরে বাকি বাঁধটা এমন ঠাসা যে যারা ফ্লাড দেখতে এসেছে তাদের পক্ষে সেদিকে এগনো মুশকিল। ফলে, ঐ প্রথম দলটার কাছেই ভিড়টা একটু বেশি। সবাই যেন তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছে যে বন্যায় নিজেদেব বাড়ি ছাড়তে হলে কী রকম দেখায়।

এই দেখার মধ্যে যে কৌতূহলের আলস্যই ছিল তা নয়, অনেকের পক্ষে এই দেখাটা স্মৃতিচারণও বটে। এই ভিড়ের মধ্যে অনেকে আছে যারা আটষট্টির বন্যায় কোনো রকমে বেঁচেছে। আবার এমনও অনেকে আছে যারা দু-এক বছর আগের কোনো বন্যায় ভেসেছে। তবু যে সবাই মিলে বানভাসিদের দেখছে, তার কারণ, বানে যে ভেসে আসে শুধু তাকেই দেখে না, তার ভেতর দিয়ে বন্যাটাকেই দেখে। কিন্তু সেই-বা কতক্ষণ দেখা ? তাই মানুষজন দেখছিল, আবার সরেও যাচ্ছিল। রায়পুরের দলটাও এখানেই ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। গুদামবাবু রঘু ঘোষকে এসে বলেন, 'এই যে এদের জিজ্ঞাসা করুন। এরা সবাই দেখেছে যে লোকটা টিনের চালের ওপর বসেছিল।'

'কী, তোমরা দেখেছ নাকি ? সত্যি একটা লোক ভেসে এসেছিল ?' রঘু ঘোষ একটু হেসে, একটু জোরে বলে। কিন্তু বানভাসিদের যে-দলটাকে সে জিজ্ঞাসা করে, তারা জবাব ত দেয়ই না, এমন-কি রঘু ঘোষের দিকে ফিরেও তাকায় না। বোধহয় বহুক্ষণ ধরে এই প্রশ্নটা তাদেব করা হয়ে আসছে। কেউ জবাব দিল না দেখে অফিসবাবুর বড় শালী রঘু ঘোষের'দিকে তাকিয়ে বলে, 'সত্যি একটা লোক ভেসে এসেছিল, তারপর নাকি সুপুরি গাছে চড়ে উধাও হয়ে গেছে জলের ভেতর থেকে ?'

রঘু ঘোষ আবার একটু হে-হে করে হাসে অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে। তারপর অফিসবাবুর বড় শালীকে বলে, 'চলেন, আপনাকেও ঐ চালের ওপর রেখে আসি, তারপর বিনা পয়সায় সুপুরি গাছের প্লেনে উঠবেন।'

অফিসবাবুর স্ত্রীর প্রায় সব সময়ই অসুখ। তাঁর বড় শালীই চিরদিন তাঁদের সংসারের দেখাশোনা করে আসছেন। সেই সুবাদে অফিসবাবুর অন্যান্য সহকর্মীর সঙ্গেও তাঁর এক রকম সস্নেহ রসিকতার সম্পর্ক।

'আর-একটু পরেই দেখা যাবে, কে টিনের চালে উঠেছে, আর কে সুপুবি গাছে উঠেছে,' রঘু ঘোষ ঘোষণা করে।

'কেন ? মিলিটারি আসবে নাকি ?' গুদামবাবু জিজ্ঞাসা করেন।

'এই ত আসার আগে ফোন করলাম। জ্যোতিদা ফোন করে দিয়েছিলেন। ওরা রওনা হয়ে গিয়েছে, যে-কোনো সময়ই এসে পড়বে,' রঘু ঘোষ প্রায় ঘোষণার মত করে বলে।

রঘু ঘোষের কথাটা চকিতে বাঁধময় ছড়িয়ে যায় যে মিলিটারিরা টাউন থেকে রওনা দিয়েছে, যে-কোনো সময়ই এসে পড়বে। এমন-কি বানভাসিদের মধ্যেও একটু নড়াচড়া দেখা দেয়। তারা অনেকেই বহুক্ষণ নদীর দিকে তাকায় নি, এখন, কেউ-কেউ আবার তাকিয়ে নেয়। কখনো এক ঝলক, কখনো তাকিয়ে থাকে—চোখ আর ফেরায় না। তেমন তাকিয়ে থাকা কাউকে দেখলে হঠাৎ মনে পড়ে যায় এদের বাড়িঘর, খেতিবাড়ি, ফসল, সব কিছুর ওপর দিয়ে তিস্তার এই জল দিগন্তগুলিকে

ঠেলতে-ঠেলতে ছুটছে। নিজেদের সর্বস্ব এই জলের তলায় রেখে লোকগুলো বাঁধের ওপর বসে আছে কি আবার ওখানে ফিরে যাওয়ার আশায় ?

রঘু ঘোষের বৌ লিলি আর রঘু ঘোষের ভাগ্নী গোপা পেছন থেকে এসে রঘু ঘোষকে ডাকে। রঘু ঘোষ তার সেই অপ্রস্তুত হাসি নিয়ে বলে, 'কী ?'

গোপা জিজ্ঞাসা করে, 'মিলিটারি নাকি সত্যি আসবে ?'

'হ্যাঁ ত—'

লিলি বলে, 'তুমি ফোন করেছিলে ?'

'হ্যাঁ।'

'হ্যাঁ ? গুল মারার আর জায়গা পাও নি, না ? তোমার কথাতেই একেবারে মিলিটারি চলে আসবে ? কী পাওয়ার ?'

'আরে, সকালে ত ম্যানেজারবাবু জ্যোতিদাকে ফোন করেছিলেন। জ্যোতিদা ওদের বলে দিয়েছে। আমরা ফোন করাতে বলল, এখনই যাচ্ছি।'

'কী করবে, এসে ?'

'সে আমি কী করে বলব ? থাকো, নিজেরাই দেখতে পাবে।'

'ঐ যে বলছে, একটা লোক নাকি সুপুরি গাছ দিয়ে ভ্যানিশ হয়ে গেছে—' বলেই লিলি খিলখিল করে হেসে ওঠে। রঘু ঘোষও হেসে ফেলে তাড়াতাড়ি বলে, 'এই কী হচ্ছে, ম্যানেজারবাবু আছেন।' ততক্ষণে গোপাও মুখে আঁচল চাপা দিয়েছে।

এখন এই ঘটনাটি আর-মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগের ব্যাপার মাত্র নেই। তিস্তার বন্যায় একটা লোক ভেসে এসেছিল—তেমন ভেসে আসতে পারেই, প্রায় প্রতি বছরই আসে। লোকটা অশ্বিনী রায়ের চালের মাথায় উঠে বেঁচেছে—তেমন বাঁচতেও পারে, ফ্লাডের ভেতর এ-রকম করেই বাঁচতে হয়। লোকটা অশ্বিনী রায়ের সুপুরি গাছে উঠেছিল—তেমন উঠতেও পারে, তাকে ত কিছু একটা খেতে হবে কিন্তু সে আর সুপুরি গাছ থেকে নেমে আসে নি।

এই শেষ জায়গাটায় ঘটনাটি যেন আর ঘটনা থাকে না—আজকে সকালেরই একটা ঘটনা। লোকটির সুপুরি গাছে ওঠা আর নেমে না-আসা যেন তিস্তা নদী নিয়ে কত অসংখ্য কাহিনীর একটি হয়ে যায়। তিস্তা যেন আর নদীমাত্র থাকে না—সে তার প্রাচীন অস্তিত্বে ফিরে যেতে চায় এই একটিমাত্র কাহিনীকে অবলম্বন করে। তিস্তার দুই পাড় দিয়ে বাঁধ বাঁধা হয়েছে। সেই বাঁধের ওপর সবাই দাঁড়িয়ে। একটা ট্র্যানজিস্টারের আওয়াজও মাঝে-মাঝেই পাওয়া যায়—বোধহয় বানভাসিদেরই ভেতর থেকে। কিন্তু তিস্তা আর তিস্তানদী না থেকে তিস্তাবুড়ি হয়ে ওঠে। সেই তিস্তাবুড়ির মূর্তি পাটকাঠি আর পাট দিয়ে বানিয়ে লোকে পুজো করে। সেই তিস্তাবুড়ি, এখনো পারে তার বুকে [illegible]মান একটা লোককে আকাশে উধাও করে দিতে।

বন্যার উপকথা জন্মাচ্ছিল—নতুন।

একশ আটত্রিশ

বাঘারু উদ্ধার সংক্রান্ত অনুসন্ধান

বাঁধের ওপরে বানভাসি মানুষের ভিড়টা এই নতুন কথার সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন করে দর্শনীয় হয়ে ওঠে।

বর্ষায় তিস্তায় বারকয়েক ফ্লাড ত হবেই, কোনো-কোনোবার তার মধ্যে একটা ফ্লাড বড় হয়ে যায়। বৃষ্টি যদি তেমন পড়ে তবে একটা ফ্লাডই গোটা তিনেক ফ্লাডের সময় জুড়ে বহাল থাকে। এবার যেমন বৃষ্টি হচ্ছে গত প্রায় সপ্তাহ খানেক ধরে তাতে এ-রকম একটা ফ্লাড ত প্রত্যাশিতই ছিল। কিন্তু সেই হিশেবের বাইরে যদি ফ্লাডটা চলে যায়, তা হলেই সকলে নড়েচড়ে বসে।

এবারের এই ফ্লাডটা এখন দ্বিতীয় সপ্তাহে ঢুকছে। আজ, এই পরিবারের দিকটা সেদিক থেকে খুব দরকারী দিন। এখন এই বিকেলের দিকেও হাওয়া আর বৃষ্টির বেগ কিছুমাত্র কমে নি। কিন্তু সকলেরই মনে একটা হিশেব ছিল যে আজ দুপুরের পর থেকে এই বেগটা কমতে শুরু করবে। এখনো অনেকেই মনে মনে হিশেব কষছে যে বাতাস আর বৃষ্টির বেগ হয়ত একটু কমেছে, কিন্তু এখনই সেটা বোঝা যাচ্ছে না, রাতের মধ্যে নিশ্চয়ই বোঝা যাবে। এ-রকম ভাবাটাও অনেকটা মনে-মনে সান্ত্বনা পাওয়ার মত। এই সান্ত্বনাটুকু না থাকলে এখনই সকলকে প্রস্তুত হতে হয় যে কালও যদি এই বাতাস আর বৃষ্টি অব্যাহত থাকে তা হলে তিস্তার এই ফ্লাড হিশেবের বাইরে চলে যাবে। গেলে, তাদের কী করতে হবে—তা, এই বানভাসি মানুষজন, বা তখন যাদের নতুন করে বানে ভাসতে হবে, তারা, জানে না। কোনো ইস্কুলটিস্কুলে ক্যাম্প তৈরি হবে ? বাঁধের ওপব থেকেও লোক সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে ? ওপরে বা নীচে, হয় ত এখানেই, বাঁধ ভাঙবে ?

কিন্তু বাতাস আর বৃষ্টিব ওপব নির্ভরশীল সেই অনুমানের আড়ালেও যেন আর মাথা বাঁচানো যায় না—যখন সত্যি করেই চোখের সামনে একটা লোককে তিস্তার জলে ভেসে এসে অশ্বিনী রায়ের চালে উঠতে দেখা যায়। সেটা ছিল, যেন সমস্ত হিশেবের বাইরে। এ-রকম বৃষ্টি আর বাতাস থাকলে মঙ্গলবার নাগাদ ও-রকম একটা ঘটনা ঘটলেও ঘটতে পারত।

ফলে, বাঘারুর পরে আর নতুন লোকজন যখন সাবে-সারে ভেসে আসে না এই প্রায় বিকেল পর্যন্ত, তখন ফ্লাডের হিশেব আবার প্রত্যাশিত সীমার মধ্যেই থাকে। একটা লোকই ভেসে এসেছে—তেমন ত যে-কোনো সময়ই হতে পারে। ঐ একটা লোক টেলিফোনে-টেলিফোনে যতই কেন না আরো অনেক লোক হয়ে যাক, মিলিটারিব নৌকোর জন্যে যত ডাকাডাকিই হোক না কেন—বন্যার জলের বাড়া কমার সঙ্গে যাদের মরণবাঁচন জড়িত, তারা কিছুটা আশ্বস্তই হয়।

আবার সেই লোকটিও যখন নাকি সুপুবি গাছ বেয়ে উধাও হয়ে যায়, তখন তা নিয়ে যত হৈচৈই হোক না কেন, যত গল্পকথাই রটুক না কেন—ফ্লাডটার হিশেব তাতে আরো বেশি করে হিশেবের মধ্যে আসে। লোকটিকে যখন দেখা যাচ্ছে না, তখন ও-রকম একটা লোক ভেসে এসেছিল সেটাও যেন আর তত সত্য থাকে না। ফ্লাডের তিস্তায় ও-রকম হয়। কেউ হয়ত ঘরের চালের মায়া কাটাতে না পেরে চালের সঙ্গেই ভেসে যায়। কেউ হযত বাড়ির কাঁঠাল গাছের মায়া কাটাতে না পেরে সেই গাছের সঙ্গেই ভেসে যায়। এও হবে তেমনি কিছু একটা। তা ছাড়া পাগল-খ্যাপাও কেউ হতে পারে—সুপুরি গাছের ওপর নিজেকে বেঁধে রাখতেও পারে। সে যাই হোক না কেন—ফ্লাডের হিশেবের মধ্যে তাকে না নিলেও চলে।

তাই, এই বিকেলের দিকে এই বাঁধেব ওপরের ভিড়টায় অলক্ষে দুটো ভাগ হয়ে যায়। চর থেকে যারা উঠে এসেছে তারা নিজেদের মত আলাদা হয়ে থাকে। কেউ-কেউ বৃষ্টিবাতাস থেকে একটু আড়াল বানিয়ে বাড়ির সবাইকে নিয়ে মাথা বাঁচায়, কেউ আবাব এই ভিড়ের মধ্যেই ছড়িয়েছিটিয়ে থাকে। হাটের বা বাগানের লোকজনের কাছে গল্পটা ক্রমেই প্রধান হয়ে ওঠে। হতে-হতে শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায়, যেন তারা ঐ গল্পের জন্যেই এখানে অপেক্ষা করছে।

মোবাইল সিভিল এমার্জেন্সিব গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল একটু আগেই—বাঁধের ওপর লোকজন-গরুমোষ দেখে। দুজন সেপাইকে নিয়ে অফিসার বাঁধেব ওপর উঠে দেখে—তারা যে-সীমায় এসে উঠেছে, তাদের সামনে গরুবাছুর, মানুষজন, সংসারের আরো নানা জিনিশ নিয়ে বানভাসি লোকজন। তারা গরুবাছুরের সারির মাঝখান দিয়ে, কিছু-কিছু শুয়েবসে থাকা লোকজনের পাশ দিয়ে, এই ভিড়টার দিকে আসতে শুরু করে। এর মধ্যে ছোটখাট ত্রিপল আর প্লাস্টিকের চাদরের ঢাকনা কেউ-কেউ দিয়েছে, তাই অফিসারকে দূর থেকে দেখাও যায় না। নইলে টুপি, ওয়াটারপ্রুফ আর গামবুটে তাকে দূর থেকে দেখেই সবাই এগিয়ে আসত। ভিড়টার দিকে এগতে-এগতে অফিসার জিজ্ঞাসা করতে থাকে, 'কী, কোথায় লোক ভেসে এসেছে ? কে ভেসে এসেছে ? কোথায় ? কে দেখেছে ?' ওদিক থেকে যে কেউ আসতে পারে সেটা, যারা শুয়েবসে ছিল তারা বুঝতে পারে নি। ফলে, আচমকা অফিসারকে তার লোকজনসহ দেখে তারা হকচকিয়ে উঠে বসে, বা দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর অফিসারের প্রশ্নটা শোনে। কিন্তু শুনেও বুঝে উঠতে পারে না। বোঝার পর যখন জবাব দেবার জন্যে অফিসারের দিকে দৌড়য়, তখন অফিসার আরো খানিকটা এগিয়ে গেছে।

এই করতে-করতে অফিসাব যখন বান দেখতে আসা ঐ ভিড়টার মধ্যে গিয়ে পড়ে, তখন তার পেছনেও একটা বেশ বড় ভিড তৈরি হয়ে গেছে। অফিসাবকে দেখেই রায়পুর চা বাগানের ম্যানেজারবাবু একটু পেছিয়ে যান। অফিসারের কাছে যাওয়াব তাড়ায় লোকজন ম্যানেজারবাবুকে অফিসাব থেকে আলাদাও করে দেয়।

অফিসার জিজ্ঞাসা কবে, 'কী ? আপনাদের এখান থেকে ফোন কবা হযেছে, লোকজন ভেসে এসে চরের চালে উঠে বসে আছে। কোথায় ভেসে এসেছে ? কখন ? বলুন, বলুন, দেখি নদীটা দেখতে দিন, সামনে থেকে সবে যান—'

অফিসাবেব এই কথাতে সেপাইদুটো একটা কাজ পায। তারা অফিসারের সামনে থেকে লোকজনকে দুদিকে সবিয়ে দেয়, লাঠিগুলো দিয়ে সেই ফাঁকটাকে বহালও রাখে। এখন অফিসারের সামনে সবাসবি নদী থাকে। সেই নদীব দিকে মুখ কবে অফিসার দাঁড়িয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করেই যায়।

যদি অফিসাব একবাব জিজ্ঞাসা কবেই থামত, তা হলে হযত কেউ-না-কেউ একটা জবাব দিতে পারত। কিন্তু উত্তবের জন্যে অপেক্ষা না কবে কথাগুলো সে বলেই যাচ্ছিল, ফলে, কেউ আর-কোনো কথা বলার সুযোগই পায না।

'কী ? বলুন ? কোথা থেকে কে ভেসে এসেছে ? বলুন ? ফোন গেল ত এখান থেকে। এখানে ফোন কোথায় আছে ?'

এবাব যেন জবাব দেযাব মত একটা প্রশ্ন পাওযা যায। ভিডেব ভেতর থেকেই কেউ বলে, 'রায়পুর চা বাগান।'

'ও ? বাযপুব ?' বলে অফিসার যে-ভাবে ঘাড ঘুরিযে বায়পুরেব দিকে তাকায়, তাতে বোঝা যায় বাযপুব বাগানটা চেনে। তাব এই ঘাড ঘোরানোব অবকাশে ভিড়ের ভেতর থেকে আর-কেউ বলে দেয—'ম্যানেজাববাবু ত আছেন।'

'কোথায় ম্যানেজাববাবু ?' অফিসাব জিজ্ঞাসা কবে।

'ঐ ত ম্যানেজাববাবু। ম্যানেজাববাবু, ম্যানেজারবাবু'।

ম্যানেজাববাবু আবো একটু পেছিয়ে গিযেছিলেন। বাগানেব শ্রমিকটি তাঁর মাথায় ছাতা ধরেই ছিল। তিনি যে ইচ্ছে করে ক্রমেই পেছিয়ে পডছিলেন, তা হয়ত নয়, কিন্তু অফিসারকে ঘিরে অফিসারের পেছনেব ভিডটা এত বাডছিল যে তাঁকে পেছতেই হচ্ছিল।

ডাক শুনেও ম্যানেজাববাবু এগিযে আসেন না। অফিসার ঘাড় ঘুরিয়ে ম্যানেজারবাবু কোথায় তা দেখাব চেষ্টা কবে। তার চেষ্টার মধ্যেও সেই অপেক্ষা ছিল যে ম্যানেজারবাবু নিশ্চয়ই এবার এগিয়ে আসবেন। কিন্তু ম্যানেজারবাবু এগিয়ে না আসায তাকে আরো একটু ঘুরে ম্যানেজারবাবুকে খুঁজতে হয। ফলে অফিসাব ও ম্যানেজারবাবুব মাঝখানের ভিড়টা দু ভাগ হয়ে যায়। অফিসার নদীর দিকে পেছন ফিরে ম্যানেজারবাবুব দিকে যখন ঘুরে দাঁড়ায় তখন ভিড়টা অফিসারের পেছনে চলে যায়। অফিসাব ম্যানেজাবাবাবু বলতে কাকে বোঝাচ্ছে তা বুঝতে পারে। সেখানেও একটা ইতস্ততের মধ্যে কিছুটা সময় যায। অফিসার অপেক্ষা করে থাকে যে ম্যানেজারবাবু এবার এগিয়ে আসবেন। ম্যানেজারবাবু যে এগিয়ে আসছেন না এটা বোঝার পর অফিসার ম্যানেজারবাবুর দিকে এগিয়ে যায়।

'নমস্কার ! আপনাদের বাগান থেকে ফোন কবা হয়েছিল এখানে এই বাঁধে লোকজন ভেসে এসে চালেব ওপর উঠে আছে, রেসকিউ কবতে হবে। আমাদের একটু রিপোর্ট করুন।'

ম্যানেজারবাবু সরাসরি অফিসাবের মুখেব দিকে তাকান না। পাশের শ্রমিকটিকে বলেন, 'রঘুবাবুকে ডাব।' তারপর বঘুবাবুকে খুঁজতেই সেই ভিড়ের ওপব দিয়ে চোখ বুলিয়ে বলে যান, 'আমরা ত কিছু দেখি নি, আমরা ত এখন এলাম। এদেরই দুটো ছেলে সকালে গিয়ে বলল, লোকজন ভেসে আসছে, ফোন করে দিতে। দাঁড়ান, আমাদের মধ্যে যে জানে তাকে ডেকে আনছে, সে সব বলতে পারবে।'

ম্যানেজারবাবু তখনো ভিড়ের ওপর দিয়ে রঘু ঘোষকে খুঁজছেন। পেছন থেকে রঘু ঘোষ এসে বলে, 'কী হল ?'

'আরে, তুমি কোথায় গিয়েছিলে ? এই দেখো, এঁরা কী জানতে চাইছেন ?' ম্যানেজারবাবু আধ পা পেছনে যান, যেন বঘু ঘোষকে জায়গা দিতে। রঘু ঘোষ পেছন থেকেই বলে, 'ঐ ত ঐ চালের ওপর নাকি একটা লোক ভেসে এসে উঠেছে।' 'কোন চালটা ?' অফিসার আবার নদীর দিকে ঘোরে, রঘু

ঘোষ তার পাশে এসে দাঁড়ায়। অফিসার আর রঘু ঘোষ কয়েক পা এগিয়ে যায়। সেপাই দুটো সামনের লোকজনকে সরিয়ে দেয়। কিন্তু কখন সরতে হবে লোকজন এর মধ্যেই তা শিখে গেছে।

রঘু ঘোষ নদীর দিকে আঙুল তুলে বলে, 'ঐ ত ঐ সব চালের কোথাও হবে।' তারপর ভিড়ের দিকে তাকিয়ে গলা তুলে বলে, 'আরে, আপনারা বলছেন না কেন? আপনারা দেখেছেন, আপনাদের জায়গা, আপনারা বলেন। কে আছেন ঐ চরের?'

জগদীশ বারুইয়ের গলা শোনা যায়, 'আবে, নিতাইডা ত আইল না এহনো। এই গজেন, নরেশ, অমূইল্যা, দ্যাখ না কী কয়?'

নরেশ ভিড়ের ভেতর থেকেই বলে, 'কওনের কী আছে? ঐ ত ঐ চালডার উপুড একখান মানুষ ভাইস্যা আস্যা উঠল, সক্কলেই দ্যাখছে।'

অফিসার আঙুল দিয়ে নদী দেখিয়ে বলে, 'ঐ চালটাব ওপর, ঐ সুপুরি গাছের ভেতরে যে-চালটা?'

'হ্যা।' নরেশ জবাব দেয়। নরেশ এগিয়ে আসে না, কিন্তু সে লম্বা বলে ভিড়েব ভেতরেও তাকে আলাদা করা যায়।

'কই? কেউ নেই ত!' অফিসার জিজ্ঞাসা করে।

'আরে সেইডাই ত কথা', ভিড়ের আড়াল থেকে জগদীশ বারুইয়ের গলা ভেসে আসে, 'সক্কলে দেইখল্যাম, ভাইস্যা আইল, আবার সক্কলে দেইখল্যাম, নাই।'

'নাই মানে? আবার ভেসে গেল নাকি?' অফিসার একটু উদ্বেগের সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করে। তাদের আসতে একটু দেরি হয়েইছে। এর মধ্যে যদি কোনো লোক ভেসে এসে আবার ভেসে গিয়ে থাকে আর এ নিয়ে যদি কোনো গোলমাল বাধে, তা হলে, সে ফেঁসে যেতে পারে।

'কেডা জানে? ভাইসল না উইড়ল না কোথায় গেল? হেই সকালের ব্যাপার। আপনারা আইলেন এতক্ষণে। তা লোকডা কি এতক্ষণ ধইর‍্যা সাঁতরাব নাকি?' জগদীশ বারুই আড়াল থেকে বলে ওঠে।

অফিসার গলাটা নরম কবে বলে, 'আমাদের ত আরো দশ জায়গায় দৌড়তে হচ্ছে। কী করা যাবে বলুন। এখন বলুন, কী করতে হবে।'

জগদীশ বারুইয়ের কথার ভঙ্গিতে নরেশও একটু সাহস পায়, 'আমরা ত ফোন কইর‍্যা কইল্যাম মিলিটারির নৌকা পাঠাইতে? তা আপনারা কি নৌকা নিয়্যা আইসছেন?'

'ফোন করলেই ত আর নৌকা তুলে আনা যায় না, আপনারা বলুন কী হয়েছে, তারপর নৌকো লাগবে কি কী লাগবে ঠিক করা যাবে।'

'এক কথাই ত কয়্যা আইসত্যাছি সকাল থিক্যা। মানুষ ভাইস্যা আস্যা উঠছে। এহন আপনার জিপগাড়ি নিয়্যা যান নদীর ভিতরে—দেইখ্যা আসেন মানুষ আছে কি নাই।'

নরেশের কথায় সবাই হেসে ওঠে। অফিসার একটু এদিক-ওদিক তাকায়। তার সামনে বাঁধের বোল্ডার জল পর্যন্ত নেমে গেছে। সেই বোল্ডারের পরেই বন্যার তিস্তা। নরেশের কথায় রাগ ও অভিযোগ প্রকাশ হয়ে পড়েছে। ভিড়ের ভেতর থেকে ঠাট্টাবিদ্রূপ শুরু হয়েছে। নরেশের কথায় সবাই হেসে ওঠায় এই ভিড়ের মেজাজের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। তাকে এখন এখানে কিছু কাজ দেখাতেই হবে, নইলে এরা হয়ত ফিরে যেতে দেবে না। অফিসার রঘু ঘোষের দিকে তাকিয়ে গলাটা একটু নামিয়ে বলে, 'কিন্তু এখন ত চালের ওপর কাউকে দেখা যাচ্ছে না।'

রঘু ঘোষ হে-হে করে হেসে বলে, 'আরে সেটাই ত সমস্যা। লোকটা নাকি এসেছিল, এখন আর নেই।' তারপর আবার একটু হেসে নরেশকে বলে, 'কী? সবটা বলো—'

'কইল্যাম ত সবডা? আবার কী কব?'

'যাঃ। শুনলাম যে সুপুরি গাছে উঠেছিল লোকটা!'

'সুপুরি গাছে উঠেছিল মানে? ঐ সুপুরি গাছে?' অফিসার জিজ্ঞাসা করে।

'তা সুপুরি গাছেই উঠুক, আর গাবগাছেই উঠুক, সেইডা ত দেইখব্যার নাগব, না, কী?' আড়াল থেকে জগদীশ বারুই বলে।

'না। তা ত হবেই। আপনারা বলুন, কী হয়েছে। আমাকে ত সেই অনুযায়ী কন্ট্রোল রুমে জানাতে হবে। তারপর তারা ব্যবস্থা করবে। আমি ত আর পকেটে করে নৌকো আনতে পারব না।'

'যেইডা পারব, তারে পাঠাইলেই পারত্যান।' নরেশ বলে।

'না, সুপুরি গাছের ব্যাপারটা কী ?' অফিসার জিজ্ঞাসা করে।

তার কথায় কেউ জবাব দেয় না। রঘু ঘোষ বোঝে, চরের বানভাসি এই লোকজন ঐ কথাটি অফিসারকে বলতে চাইছে না যে, ভেসে আসা লোকটি সুপুরি গাছে উঠে উধাও হয়ে গেছে। এটা বললে, তাদের সমস্ত বক্তব্যটাই হালকা হয়ে যাবে। অথচ লোকটি যদি ঐ চালের ওপর এখনো বসে থাকত তাকে উদ্ধার করার জন্যে এদের এত মাথাব্যথা হত না। তিস্তার এই ফ্লাডে যে ভেসে এসে একটা চালে উঠতে পারে সে নিজেকে বাঁচাতেও পারে। কিন্তু তাকে আর দেখা যাচ্ছে না বলেই নৌকো করে ওখানে গিয়ে দেখে আসা দরকার, এদের আসল ইচ্ছে সেটাই।

'শুনুন', বলে রঘু ঘোষ হাসে, 'আমরা এসে শুনলাম ঐ লোকটি সুপুরি গাছে উঠেছে কিন্তু আর নামে নি। এখন আপনারা মিলিটারির নৌকো নিয়ে এসে ওখানে দেখুন লোকটি আছে কি নেই।'

'হয়', একটু সমবেত স্বরে শোনা যায়।

ফ্লাডের ভেতর চালের ওপর একটা লোককে দেখতে-দেখতে দিন কাটানো যায়, না দেখতে-দেখতেও রাত পোয়ানো যায়। কিন্তু লোকটা সুপুরি গাছে উঠে উধাও হয়ে গেলে, ফ্লাডের তিস্তায় একটা লোক সুপুরি গাছ বেয়ে উধাও হয়ে গেলে, তাদেরই চর থেকে উধাও হয়ে গেলে, তারা এই বাঁধের ওপর বসে থাকবে কোন ভরসায় ? না হয় এখন তাদের বাড়িজমির ওপর দিয়ে কয়েকমানুষ-ডোবা জল এই বেগে বয়ে যাচ্ছে। তবু তাবা ঐ চরের মুখোমুখি এই বাঁধে তাদের গরুবাছুর, ছাওয়াছোট, বেটিছোয়া নিয়ে ত অপেক্ষা করে আছে যে জল একদিন নামবে ও তারা আবার কাদামাটি ভেঙে তাদের চর চিনে নিতে পারবে। এর মধ্যে কিছু অনিশ্চয়তা ত আছেই—তিস্তা ঐ চরটাকে খেয়ে দিয়েছে কি না তা ত জল না নামলে বোঝা যাবে না, কিন্তু এখন ঐ জলঢাকা চরে কি আরো এমন কোনো ঘটনা ঘটে যাচ্ছে যার ওপর তিস্তার ফ্লাডেরও কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই ? যে-লোকটার ভেসে আসা তাদের দেখা, টিনের চালের ওপর বসে থাকা তাদের দেখা, সুপুরি গাছ বেয়ে ওঠাও তাদের দেখা—সুপুরি গাছ থেকে সেই লোকটার না-নামাও ত তাদের দেখা। তা হলে তাদের চরের ওপর দিয়ে তিস্তার বন্যাই যে বয়ে যাচ্ছে তা নয়, সুপুরি গাছের মাথা দিয়ে যাদের যাতায়াত তারাও কি এসে চরটার দখল নিয়ে নিল নাকি ? সেইটি যাচাই করার জন্যেই মিলিটারি দরকার, মিলিটারির নৌকো দরকার। কিন্তু সেই দাবিটা যে অফিসারের কাছে করা যায় না, তা এরা বোঝে।

একশ উনচল্লিশ

বাঘারুউদ্ধার সংক্রান্ত বাজেটবিতর্ক

'মানে ? লোকটা সুপুরি গাছে উঠেছে, আপনারা দেখেছেন ?' অফিসার ভিড়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে।

'হয়', ভিড়টা মাথা নাড়ে।

'তারপরে আর নামে নি, সেটাও দেখেছেন ?'

'হয়'।

'গাছের ওপর থেকে পড়েটড়ে যায়নি ত ?'

কেউ কোনো জবাব দেয় না।

'আপনারা দেখেছেন, পড়েটড়ে যায়নি ত ?'

আবারও সেই একই নীরবতা। একটু পরে আড়াল থেকে জগদীশ বারুই বলে ওঠে, 'পইড়লে ত অবার উইঠত চালে !'

সুপুরি গাছের মাথাটা জল থেকে খুব বেশি উচুতে নয়। সেখান থেকে পড়ে গেলে স্রোতের টানে লোকটি ভেসে যেতে পারে, কিন্তু ভেসে যেতে-যেতে আবার ঐ চালটাতে, বা, ঐ দিকের আর-একটা সুপুরি গাছে বা আরো দু-একটা চালে উঠতেও পারে—এই দুইয়ের মধ্যে কোনটা বেশি সম্ভাব্য অফিসার সেটা মনে-মনে যাচাই করে। যাচাই করতে গিয়ে সে জগদীশ বারুইয়ের প্রশ্নটার সামনে পড়ে

যায়—লোকটি যদি কোনো রকমে ভেসে যাওয়া থেকে নিজেকে ঠেকাতে পারত, তা হলে ত তাকে আবার দেখা যেত। ঐখানে গিয়ে যাচাই করে না এলে কী করে জানা যাবে, লোকটি আছে কি নেই। অফিসার মনে-মনে খুব সতর্ক হিশেব কষে। তারা একটু দেরি করে এসেছে এই আন্দাজ থেকেই যে এর মধ্যে এখানকার লোকজন নিজেদের মত একটা ব্যবস্থা করে নেবে। দুপুরের পর দ্বিতীয় ফোনটা পেয়ে তাদের ঠিক করতে হয় যে এখানে আসতে হবে। কিন্তু এটা অফিসারের আন্দাজের মধ্যে ছিল না যে সত্যি করেই এখানে এখন নদীতে নৌকো ভাসাতে হবে। অফিসার এটা বোঝে যে এই চারপাশের ভিড়টা তাকে কিছু না করে চলে যেতে দেবে না। এক, ফোন করব বলে গাড়ি নিয়ে রায়পুরে গিয়ে সেখান থেকে চলে যেতে পারে—এখানে সেপাইদুটোকে রেখে। এখন যদি সে সত্যি কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে কথা বলে তা হলেও নতুন কোনো ব্যবস্থা সন্ধ্যার আগে করা সম্ভব নয়। মিলিটারির নৌকো ব্যাপারটা ভুয়ো। তাদের কিছু রাবারের নৌকো আছে—সে-নৌকো নিয়ে স্রোতের এ বেগ সামলানো যাবে না। অফিসার ঘড়ি দেখে—সাড়ে তিনটে বেজে গেছে, তাব হাতে আব বড় জোর ঘণ্টা খানেক-ঘণ্টা দেড়েক সময় আছে। এখান থেকে কোনো নৌকো ভাসালে সেটা ফেরার পথে বিপদে পড়তে পারে, ততক্ষণে অন্ধকারও হয়ে যাবে।

অফিসার একটু অনিশ্চিত স্বরে বলে, 'আপনারা যাঁবা ঐ চরের লোক, তাঁরা ত সবাই চলে এসেছেন?'

অফিসারের কণ্ঠস্বরে প্রশ্নটা খুব স্পষ্ট ছিল না বলেই হয় ত কেউ কোনো জবাব দেয না। একটু অপেক্ষা করে অফিসার বলে, 'মানে, আপনাদের কেউ ত আব ওখানে নেই? চরে?'

'না। তা নাই। আমরা ত এখানে ওঠা শুরু করছি শুক্কুরবার শেষ রাইত থিক্যা—' জগদীশ বারুই আড়াল থেকে বলে।

'সে ত ভালই করেছেন যে অপেক্ষা করেন নি। তাই গরুবাছুর সবই আনতে পেবেছেন।'

'সে আমাগো হিশাব আমাগো কাছে। আপনাদের উপর ভরসা কইবলে আব বাঁধে উইঠতে হইত না'—নরেশ মেজাজ দেখিয়ে বলে।

অফিসার একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনারা কী চান, সেটা বলুন, আমাকে ত কন্ট্রোলে জানাতে হবে। ঐ লোকটি ওখানে আছে কিনা সেটা দেখতে চান?'

'সেই লগেই ত সকাল থিক্যা ফোন করা হইল', নরেশ বলে।

'শুনুন', অফিসার একটা সিদ্ধান্ত নেয়ার ভঙ্গিতে বলে, 'আপনাদের এখানে কি কাবো নৌকো আছে?'

'আমাগো নৌকা নিয়্যা যাবার উপায় থাইকলে আপনাগো ফোন কইবতে যাব কুন কামে?' নরেশ জবাব দেয়।

'কন্ট্রোলে ফোন করে এখানে নৌকোর ব্যবস্থা করতে-করতে ফ্লাডের জল নেমে যাবে'—অফিসাব স্পষ্ট জানায়।

'তয় যে রেডিওতে-টিভিতে এত মিলিটারি দেখান?' একটা মেয়েলি গলায় পেছন থেকে কেউ বলে।

'সে কোথায় কী দেখায়, সে-সব আমি বলতে পারব না। আমি আপনাদের কাজের কথা বলছি। আপনারা যদি কন্ট্রোলে জানাতে বলেন, আমি রায়পুর বাগানে গিয়ে ফোন করে দিতে পারি। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তার বেশি আমার ক্ষমতার বাইরে। সেখানে ডি-সি ঠিক করবেন। আর, যদি আপনারা এখান থেকে কোনো নৌকো আর মাঝি দিতে পারেন, তা হলে আমি এখনই সেটা রিকিউজিশন করতে পারি।'

'কী কইরব্যার পারেন?' অমূল্য নরেশের পাশ থেকে জিজ্ঞাসা করে।

'আমরা এখনই ভাড়া করে নেব।'

'আগে কইলেন নৌকা চাই, এ্যাহন কইলেন মাঝি চাই। তা আপনারা রেসকুটা কী কইরবেন?' জগদীশ বারুই স্পষ্ট গলায় আড়াল থেকে বলে।

'না। আমরা গবমেন্ট থেকে নৌকোর ভাড়া দেব, মাঝিদের ওয়েজ দেব মানে মাঝিদের টাকা দেব।'

অফিসারের কথার পর হঠাৎ সবাই চুপ করে যায়। ঠিক বোঝা যায় না, এই নীরবতার অর্থটা কী? রঘু ঘোষ একটু অপেক্ষা করে বলে, 'কী? এখানে নৌকো আছে কারো?'

'আরে এহানে যে-নৌকা সেকি এই জলের টান সামলাব্যার পারব ? আর নৌকাডা নিয়্যা যাবেনে কে ? কত টাকা দিবেন যে মানষি এই জলে ভাইসবে ?' জগদীশ প্রশ্ন করে।

'এই অবস্থায় টাকা নিয়ে ত আর দরাদরি করব না আপনাদের সঙ্গে। আপনারা কত চান, বলুন না। নৌকো আছে এখানে ?'

আবার সবাই চুপচাপ। সেই নীরবতার মধ্যেই ভিড়টা যেন একটু আলগা হয়ে যায়। অমূল্য আর নরেশ প্রায় কানে-কানে কথা বলতে-বলতে বাঁধের কিনারার দিকে একটু আড়ালে চলে যায়। আরো কিছু-কিছু এমন কথা হয়। আর, মাত্র কিছুক্ষণের মধ্যেই অফিসার কেমন একা হয়ে যায় যেন, তার সঙ্গে সকলেব কথাবার্তা শেষ হয়ে গেছে। আবো একটু অপেক্ষা করে অফিসার গলাটা তুলে বলে, 'শুনুন, আর দেরি করা যাবে না। হয় আপনারা নৌকো দিন, আর না-হয় আমি রায়পুর বাগানে গিয়ে কন্ট্রোলে ফোন করব। তারপর কন্ট্রোল যা করার কববে। ম্যানেজারবাবু,' অফিসার পেছনে তাকায়।

রঘু ঘোষ হে-হে করে হেসে বলে, 'ম্যানেজারবাবু চলে গেছেন। আমরা আছি, আপনি গেলে চলুন।'

'আপনি বাগানের ?'

'হ্যাঁ।'

নরেশ আর অমূল্য ফিরে আসে, এসে দাঁড়িয়ে থাকে। অফিসার তাদের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'কী হল ? নৌকো পাওয়া যাবে ?'

'তা যাবেনে। আমরা চাবজন যাবাব পারি। কিন্তু মাথাপিছু আড়ইশ টাকা দিবার লাগব। নৌকার ভাড়া আলাদা,' নবেশ বলে।

নরেশ কথাটা বলে ফেলার পর হঠাৎ যেন চারপাশের সবাই চুপ করে যায়। শুধু বাতাস আর বৃষ্টির আওযাজটা বেড়ে ওঠে। এই ভিড়ের ভেতর যারা বাগানের আর হাটের তারা হয়ত এখন একটা দর-কষাকষিব উত্তেজনাতেই চুপ করে যায়। আর, ঐ চরেরই যে-বানভাসিরা ভিড়ের মধ্যে ছিল, তারা নরেশের কথাতেই হঠাৎ বুঝে ফেলে, তাদের নিজেদেবই চবে গিয়ে ফিরে আসার দাম এখন এতটাই বেড়ে গেছে।

অফিসারই প্রথম কথাটা বলে, 'সে কী হে ? তোমাদের একটা লোক নাকি ওখানে চালের ওপর পড়ে আছে। তোমাদেরই ত উচিত ছিল এতক্ষণ নৌকো করে লোকটাকে নিয়ে আসা। আমরা খরচা করতে রাজি আছি শুনেই হাজার টাকা দর হাঁকলে—' কথাটা শেষ করে অফিসার এদিক-ওদিক তাকায়, তারপর বঘু ঘোষেব চোখ পেযে যায। বঘু হে-হে কবে হেসে অফিসারের কথাটাতে অন্য জোর সঞ্চার করে দেয়।

কিন্তু রঘু ঘোষেব হাসির পরও এই ভিড়ের নীরবতা ভাঙে না। একটা গোহাটে যেমন গরু কেনাবেচার সময় একটা গরু নিয়ে সারা দিন ধরেই দর কষাকষি চলতে থাকে, এখন বাঁধের ওপর যেন সে-রকম একটা পরিস্থিতিই তৈরি হল। নরেশ-অমূল্য ভিড় থেকে একটু সরে গিয়ে মাটির ওপর উবু হয়ে বসে পড়ে—কিন্তু নিজেদের মধ্যেও কোনো কথা বলে না। ভিড়টা একটু আলগা হয়ে যায়—কেউ-কেউ অফিসারকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকে, কেউ-কেউ আবার সরে গিয়ে নরেশ অমূল্যর কাছে দাঁড়ায়। ভিড়টা একটু আলগা হওয়ার পর বোঝা যায়, অফিসারের ডান দিকে পেছনে জগদীশ বারুই মাটিতে বসে।

'বললে যে, নৌকো পাওয়া যাবে, নৌকো কোথায় ?' অফিসার বলে কিন্তু সে কথার জবাব কেউ দেয় না। একটু অপেক্ষা করে অফিসার এবার গলা তুলে ও ঘাড়টা ঘুরিয়ে বলে, 'কী ? এখানে নৌকো কার আছে ? কোথায় ?'

অফিসারের কথার কেউ জবাব দেয় না। এবার একটু অধৈর্য হয়েই অফিসার বলে, 'বাঃ। তোমাদের হাজার টাকা দিতে রাজি হলে নৌকো পাওয়া যাবে আর তা না-হলে পাওয়া যাবে না ? ফ্লাডের সময় এ-রকম করা কিন্তু বে-আইনি।'

এব্যারও কেউ কোনো কথা বলে না কিন্তু অনেকেই নরেশ-অমূল্যর দিকে তাকায়। সেই চাহনি অনুমান করেই বুঝি নরেশ-অমূল্য মাথা নিচু করে মাটিতে কাঠি দিয়ে আঁকিবুঁকি কাটে। অশ্বিনী রায় পেছন থেকে এসে অফিসারকে বলে, 'স্যার, আমারই ঐ চালটা। লোকটা আমার গুয়াগাছটাত্ উঠিল্

আর নামিল্ না।'

পেছন থেকে জগদীশ বারুই হেসে দুই হাত ঘুরিয়ে বলে, 'কিসের মধ্যে কী, পান্তাভাতে ঘি। কথা হব্যার ধইরছে রেসকুর, উনি কন উনার গুয়াবাড়ির কথা।' জগদীশের মন্তব্যে একটুআধটু হাসিমশকরা শুরু হওয়ার কথা, কিন্তু যারা হাসতে পারত বা পাল্টা মন্তব্য করতে পারত তারা মুখ খোলে না। পরিস্থিতিটা একটু বেশি গম্ভীর হয়ে যায়। অশ্বিনী রায় তার সঙ্গে কথা বলায় অফিসারও যেন একটা অবলম্বন পেয়ে যায়। সে অশ্বিনী রায়কেই জিজ্ঞাসা করে, 'আমি ত তখন থেকে চেঁচাচ্ছি এখানে নৌকো কার আছে, আপনারা ত তার কোনো জবাব দিচ্ছেন না। তা আমি কি সাঁতার কেটে গিয়ে লোকটাকে ধরে আনব? এখানে নৌকো কোথায় আছে?' অফিসার রঘু ঘোষের দিকে ফিরে বলে, 'আপনারা জানেন না—কার নৌকো আছে?'

'আমরা কী করে জানব। আমরা কি রোজ এখানে আসি নাকি?' রঘু ঘোষ হে-হে করে অফিসারের মুখের ওপরই হাসে।

'আপনাদের বাগান নদীর এত কাছে, আপনারা নৌকো রাখেন না কেন একটা?' অফিসার আচমকা রঘু ঘোষকেই জিজ্ঞাসা করে। রঘু ঘোষ প্রশ্নটা শুনে প্রথমে 'অ্যাঁ' বলে ফেলে, তারপর তার সেই হে-হে হাসিটা এবার অনেকক্ষণ ধরে হাসে। সেই হাসিটা শেষ করে জামার হাতায় মুখ মুছে সে বলে, 'বাঃ, আপনাদের বছরে-দু বছরে কখন দরকার হবে সেই জন্যে কোম্পানি বাগানে নৌকো পুষবে?'

জগদীশ বারুই পেছন থেকে বলে ওঠে, 'হয়। আপনারা নৌকা রাইখবেন, আলকাতরা মাখাইবেন, গাব ঘইষবেন আর উনারা আইস্যা বছরে একবার জিপে কইর‍্যা নৌকোবিলাস কইরবেন।'

অশ্বিনী রায় নরেশ-অমূল্যর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। নরেশ-অমূল্য কেউই তার দিকে চোখ তুলে তাকায় না। অশ্বিনী রায় একটু দাঁড়িয়ে থেকে সেখানেই উটকো হয়ে বসে। যেন তার পা ধরে গিয়েছে তাই বসেছে, এমন ভাবে বসে থাকে। একটু পরে নরেশের দিকে তাকিয়ে বলে, 'পুছিবার ধইচছে নৌকাখান কার? তা ক কেনে, কয়ি দে। সরকারের অফিসার—'

নরেশ বলে, 'আপনে কয়্যা দ্যান না, আমাগো কাছে আইছেন ক্যান? আমাগো ত নৌকা নাই।'

নরেশ একটু জোরেই বলে—অনেককে শুনিয়ে। কথাটার মধ্যে একটু ঝাঁঝ ছিল—সেটা অশ্বিনী রায় বুঝতে পারে। তাই এমন মুখভঙ্গি করে বসে থাকে যেন কথাগুলো তাকে বলা হয় নি।

জগদীশ বারুই তার জায়গা থেকে উঠে নরেশের পাশে এসে বসে খুব নিচুগলায় বলে, 'সাতশতে রাজি হয়্যা যা, আমি কয়্যা দিচ্ছি, তগ মাথা পিছু দ্যাড়শ, আর একশ আমারে দিবি।'

'আপনে আবার এর মধ্যি বাতাসায় চাট মাইরবেন! দ্যাড়শতেও রাজি হবনে না।' নরেশও প্রায় শোনা যায় না এমন স্বরে বলে।

'তরা রাজি কি না সেইডা ক। অফিসার রাজি হয় কি না-হয় আমি বুঝব নে। অমূল্যরে জিগা।'

নরেশ অমূল্যর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে কথা বলে যায়। তারপর জগদীশের দিকে ঘুরে জানায়, 'অমূইল্যা মাথাপিছু দুইশর কমে রাজি না। আর আপনার আবার কমিশন কিসের?'

জগদীশ শ্লেষ্মাজড়িত হাসি হেসে বলে, 'তগই ভাল হইত। আমারে একশ দিতি। না-দিস ত আমিই অফিসারের কনট্রাক্ট নিব—তহন পঞ্চাশ টাহাও পাবি না,' কথাটা বলে জগদীশ বারুই দাঁড়ায়—দুই হাতের আঙুল জড়িয়ে মাথার ওপর তুলে মটকায়, আওয়াজ করে একটা হাইও তোলে।

ততক্ষণে আর-একটু বিকেল হয়েছে, যদিও বিকেলটা তেমন বোঝাই যায় না। জগদীশ বারুই তাদের মগ্ন চরের দিকে একবার তাকায়। একটু তাকিয়ে থেকে বলে, 'মানষিডা চোখের সামনে ভাইস্যা আইসল, আর সুপুরি গাছে চইড়্যা চইল্যা গেল?'

বাঘারুর সেই নিরুদ্দেশ নিয়ে এখানে দর-কষাকষি শুরু হয়। সে দর-কষাকষি এই বাতাস আর বৃষ্টির সঙ্গে মিশেও যায়। বাঘারু জানবে কী করে যে সে সুপুরি গাছের মাথায় চড়ে আছে না ভেসে গেছে শুধু এইটুকু দেখে যাওয়ার জন্যে সরকারের অফিসারের সঙ্গে দরদাম নিয়ে কথাবার্তা চলছে। বন্যাতে অনেকেরই অনেক কিছু ভেসে চলে যায়, আবার অনেকের কাছেই ত অনেক কিছু ভেসে আসেও। জগদীশ, নরেশ ও অমূল্য বুঝতে পারে না—তাদের কাছে সত্যি কিছু ভেসে আসছে কিনা। তারা ভাসিয়ে আনতে চাইছে।

অফিসার বলে, 'দেখুন, আমি ত এখানে সারা দিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না। আমি

দেখলাম—কোনো লোক রেসকিউ করার নেই। আমি সেই কথাই রিপোর্ট করব। আর, তা না-হলে আপনারা নৌকো কোথায় বলুন—আমরা রেসকিউয়ের ব্যবস্থা করছি।'

একশ চল্লিশ

বাঘারুউদ্ধার নিয়ে আলোচনাসভা ত্যাগ ও পরে মতৈক্য

অফিসার একটু অপেক্ষা করে। কিন্তু অবস্থা কিছু বদলায় না। ভিড়টা আলগা হয়েই আছে, এখন যেন আবো আলগা হয়ে যেতে পারে। জগদীশ বারুই বাঁধের কিনারে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নরেশ-অমূল্যকে ঘিরে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তারাও একটু-আধটু তফাতে সরে যায়। অফিসার নদীর দিক থেকে ঘুরে দাঁড়ায় উত্তর মুখো। বানভাসি লোকদের দুটো-চারটে গরু বাঁধা আছে কিন্তু তারপর ফাঁকা। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে অফিসার নদীর দিকে একেবারে পেছন ফিরে সোজা হাঁটা দেয়।

অফিসারের পেছনে একটা ছোট ভিড় ছিল। অফিসার যে হাঁটা দেবে এটা কেউ বোঝে নি। ফলে দু-একজনকে হাত দিয়ে সরিয়ে অফিসার এগিয়ে যায়। তাকে এগিয়ে আসতে দেখে ভিড়ের লোকজন তাকে পথ করে দিয়ে তার দিকেই তাকিয়ে থাকে। রঘু ঘোষ অফিসারের পেছনে দু-এক পা গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

কেউই বুঝতে পারে না—অফিসার কোথায় যাচ্ছে। প্রথমে ভাবে—বোধহয় দাঁড়ানোর জায়গা বদলাচ্ছে। তারপর ভাবে, পেচ্ছাব করতে যাচ্ছে। পেচ্ছাব করতে হলে ত বাঁধের ওপরই উত্তর দিকে দু-পা গেলে হত। কিন্তু হয়ত বাঁধের ওপর থেকে অফিসাবেব পেচ্ছাব করা চলে না। ততক্ষণে অফিসার বাঁধের নীচে নেমে তার জিপের দিকে হাঁটতে শুরু করেছে। বাঁধের নীচে নেমে অফিসার চলে যাচ্ছে।

অশ্বিনী রায় ক্ষীণ স্বরে বলে, 'এ নরেইশ্যা, আরে অফিসার যে চলি যাছে রে, দেখ্ কেনে।'

শুনে নরেশ-অমূল্য উঠে দাঁড়িয়ে সেখান থেকেই গলা উঁচিয়ে দেখে। কিন্তু বুঝতে না পেরে আঙুলের ওপর ভর দিয়ে তাকায়। পেছন থেকে জগদীশ বারুই মাথার ওপর দুই হাতের তালি বাজিয়ে বলে ওঠে, 'নেরে অমূইল্যা, তগ হাজার টাকা জিপে চইড়্যা চইল্যা গেল। এহন নিজের হাত নিজে চাট বইস্যা-বইস্যা।'

নরেশ গোড়ালি মাটিতে নামিয়ে জগদীশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে ওঠে, 'চইল্যা গেল! মানে? আপনারা কি এহানে বইস্যা-বইস্যা তামাশা দেইখতেছেন? চলেন, জিপটারে আইটক্যান।' এই পর্যন্ত বলে নরেশ জগদীশের দিক থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে বাতাসে হাত ঘুরিয়ে বলে, 'এই চলো সবাই, জিপ আটকাও, জিও আটকাও।'

বলে নরেশ, অমূল্যর আর পাশে যাকে পেল তার, হাত ধরে টেনে বাঁধ থেকে হুড় হুড় করে নীচে নেমে অফিসারের দিকে দৌড়তে শুরু করে। তাদের সঙ্গে-সঙ্গে আরো দু-একজন নামে। তারও পরে কিন্তু একটু বেশি পেছনে, আরো দু-একজন হেঁটে নামে, হেঁটে-হেঁটেই জিপগাড়ির দিকে যায়। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। বানভাসিদের বেশির ভাগই বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ-কেউ নদীর দিক থেকে রাস্তার দিকে গিয়ে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকে। যারা নিজেদের জিনিশপত্রের আড়ালে শুয়েবসে ছিল, তারা সেখান থেকে যায় না।

সকালে যখন অশ্বিনী রায়ের চালের ওপরে বাঘারুকে প্রথম দেখা গিয়েছিল তখন বাঁধসুদ্ধু মানুষই, এক নিতাই ছাড়া, ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এখন, যখন তাকে উদ্ধার করে আনবার জন্যে শহর থেকে অফিসার এসে কিছু না-করে ফিরে যাচ্ছে, তখন কারো আর সে-ব্যাপারে কোনো উৎসাহ নেই। বাঘারুকে আর দেখা যাচ্ছে না, লোকটা ওখানে আছে কি নেই তাইই বোঝা যাচ্ছে না, ভেসে গেলে ত ভেসেই গেছে—এ-রকম একটা যুক্তি ত ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গেছে। লোকটা সুপুরি গাছে চড়ে উধাও হয়ে গেছে—এর ভেতরকার রহস্য ও ভয় ইতিমধ্যে এই এত বৃষ্টিতে, হাওয়ায় ও কথায় অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। ফ্লাডের তিস্তায় এমন ভৌতিক দৃশ্য, এখন অবান্তর অথচ ভবিষ্যতের প্রাসঙ্গিক, গল্প হয়েই

থাকল। সারা দিনের মধ্যে হাওয়া আর বৃষ্টি যে একটুও কমল না—সেটা আরো বেশি বাস্তব ভয়ের কারণ হয়ে উঠছে এই বিকেলে। আজও সারা রাত এই বৃষ্টি আর হাওয়া যদি চলে তা হলে ফ্লাডের চেহারা কী হবে তা এরা কেউ ভেবে উঠতে পারছে না। ভাবতে চাইছেও না হয়ত! কিন্তু সেই ভাবতে না-চাওয়ার মধ্যেই নিজেদের প্রস্তুত করে তুলছে আরো বিপদের জন্যে।

তা ছাড়াও এই ভিড়ের ভেতর আর-একটা অনিশ্চয়তাবোধ এই বিকেল থেকেই ছড়াতে শুরু করেছে। এদের হিশেব অনুযায়ী আজই ফ্লাডের চরম দিন হওয়ার কথা। কিন্তু এই ফ্লাড যদি আরো বাড়তেই থাকে, তা হলে কি তাদের চরের আব কিছু বাকি থাকবে? যেন তারা জানত, এই আজকে দুপুর পর্যন্ত যত জল এসেছে তার তলায় তাদের চরটা তাদেরই থেকে যাবে। কিন্তু এব পবও জলের যে-ঢল নামছে তাতে তাদের চরের জমিও নদীর সঙ্গে মিশে যেতে পারে। তা হলে? আবার কে কোথায় ঘর খুঁজবে? জমি খুঁজবে?

এ-সব কথা এখনো কেউ মুখে বলে নি, বলবেও না। কিন্তু কথাগুলো ভেতরে-ভেতরে তৈরি হয়ে গেছে। যখন তারা এই ঘটনার মুখোমুখি পড়ে যাবে— তখন হয়ত সকলে প্রস্তুত হয়ে যাবে—একটা চর ডোবা মানে ত আর-একটা চর জাগা! কিন্তু সেই প্রস্তুতির জন্যেও ত একটা সময় দরকার। যখন অফিসার এসে কথা বলছিল, ফ্লাড দেখতে আসা রায়পুর-রংধামালির লোকজন ভিড করেছে, তখনই, বানভাসি মানুষদের ভেতরে-ভেতরে বৃষ্টি আর হাওয়া আর নদীর জলের হিসেবনিকেশ শুরু হয়ে গেছে। তাই তারা এ-সব দর্শনার্থীদের সম্পর্কে কিছুটা উদাসীন হয়ে পড়ে।

তাও অফিসার পালিয়ে যাচ্ছে, তাকে ধরার জন্যে নরেশ হাঁক দিয়ে দৌড়ল, নরেশের সঙ্গে-সঙ্গে বা পেছনে-পেছনে তাদেরও ছোটারই কথা। অন্তত তাদের চরের ওপবই ত লোকটাকে সকালে দেখা গিয়েছিল, সুতরাং লোকটাকে উদ্ধার করা যেন তাদের চবেরই একজনকে উদ্ধার কবা।

কিন্তু অফিসার নৌকোর ভাড়া আর মাঝির টাকা দেবে শুনে নরেশ মাথাপিছু আড়াইশ, তাব মানে চার জনের এক হাজার, নৌকোর ভাড়া আলাদা, বলল যখন, তখন থেকেই যেন চবটাও আর তাদেব থাকল না, চরের ঐ মানুষটাও আর তাদের মানুষ থাকল না। এ-রকম ফ্লাডে, এ-রকম বিপদের মধ্যে নৌকো নিয়ে যারা যাবে তারা তাদের খুশিমত টাকা চাইতেই পারে। এ ফ্লাডে নৌকো ভাসানোর বিপদও ত কম না। সে টাকা যে দিতে পারবে সে পারবে, যে পারবে না সে পাববে না। কিন্তু এটা ত সরকারি টাকা। নরেশ আর অমূল্য প্রথমে রাজি হয়ে সাহস করে বলতে পারল বলেই টাকাটা তাবা পাচ্ছে—এটাতে চরের অন্য সব লায়েক মানুষের ত একটু দুঃখ হতেই পারে। সবকাব যদি নিজের নৌকোয় নিজের মাঝি নিয়ে 'রেসুক' করত সেটা হত সরকাবের ব্যাপার। কিন্তু তিস্তাব বন্যায় ভাসল একটা লোক, কে তা কেউ জানে না; সে নিজেই সাঁতরে উঠল অশ্বিনী রায়ের চালে; তাবপর নিজেই সুপুরি গাছ বেয়ে উঠে গেল—এখন সেই লোকটার নাম করে নরেশ-অমূল্য আর-দু-জনকে নিয়ে হাজার টাকা পকেটে ভরবে—এটা কেউ ভাবতেই পারে নি। সকালে যখন এ নিয়ে শোরগোল পড়েছিল, তখন ত সবাইই লোকটাকে দেখে অস্থির হয়ে উঠেছে। তাই তে ফোনাফুনি। কিন্তু সকালের এই শোরগোল বিকেলবেলা নরেশ-অমূল্যর ব্যবসা হয়ে উঠবে, তা কে জানত? এখন নরেশ-অমূল্য যদি অফিসারকে ঘেরাও দিয়ে নৌকোর টাকা আদায় করতে পারে ত করুক। কিন্তু চরের মানুষরা নরেশ-অমূল্যর জন্যে ঘেরাও দিতে যাবে কেন?

হয়ত নিতাই থাকলে এ সব ঘটত না। পঞ্চায়েতের লোক হিশেবে অফিসারের সঙ্গে নিতাইই কথা বলত। আর, নিতাইয়ের সঙ্গে কথা হলে এই সব টাকা-পয়সার কথা হয়ত উঠতেই পারত না। বিনি পয়সাতেই নিতাই হয়ত নৌকো ভাসাত। কিংবা, এ নিয়ে মাথাই ঘামাত না। কিন্তু নিতাই ত সারাদিন শহরে—রিলিফের খোঁজে।

অফিসার জিপের কাছে পৌঁছনোর আগেই নরেশরা অফিসারকে ধরে ফেলে। ধরে ফেলে মানে অফিসারই ওদের দৌড়নোর আওয়াজে পেছন ফিরে ওদের দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। সোজাসুজি ঘুরে দাঁড়ায় না, বাঁধের দিকে মুখ করে ওদের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অফিসার অবিশ্যি নরেশের চিৎকার আগেই শুনতে পেয়েছে, ওরা যে দৌড়ে তার দিকে আসছে সেটাও টের পেয়েছে কিন্তু তার মনে হয়েছিল আগেই জিপের কাছে পৌঁছে যাবে। খানিকটা আসার পর তার সেপাই দুজনের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে তার মাথায় এই যুক্তিও চলে আসে সে আসলে সেপাই দু-জনকে

ওখানে পোস্টিং করে এসেছে কোনো লোক নদীতে ভেসে আসে কি না তার ওপর নজর রাখতে। কিন্তু আরো খানিকটা এগিয়ে তার মনে হয়, এভাবে জিপে চড়ে চলে গেলে ব্যাপারটা খারাপ হতে পারে। আবার এখান থেকে ডি-সিকে হয়ত ফোনটোন করবে, মাঝরাতে তাকে আবার হয়ত এখানে পাঠাবে। তখন ত তার পক্ষে এখানে কিছু করাও মুশকিল হবে। এত কিছু ভেবে অফিসার দাঁড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু নরেশ-অমূল্য যেভাবে তার দিকে ছুটে আসছে, তাতে সে একটু ভয়ও পায়। বেশির ভাগ লোক বাঁধের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে দেখে আবার একটু ভরসাও পায়—এরা নিশ্চয়ই তাকে কিছু করবে না। তার ত কোনো দোষ নেই। এরা প্রায় দেড়-দু হাজার টাকা চেয়ে বসেছে, পাঁচশ টাকার বেশি খরচ করার ক্ষমতাই তার নেই। কিন্তু তার বোধহয় এ-রকম আচমকা চলে আসাটিও ঠিক হয় নি। এখন যদি এরা এসে তাকে ধরে নিয়ে যায় সেটা আরো খারাপ হবে, সে আর এখান থেকে ফিরতেই পারবে না। অফিসার আবার জিপের দিকে হাঁটতে শুরু করে—এবার একটু আস্তে-আস্তে।

জিপের কাছে পৌঁছুবার আগেই নরেশ-অমূল্য, আর তাদের সঙ্গে যারা দৌড়চ্ছিল তারা, তার পেছনে এসে পড়ে। অফিসার দাঁড়ায় না, ঘাড়ও ঘোরায় না। নরেশ-অমূল্য তার কাছাকাছি পৌঁছে পেছনে-পেছনে হাঁটে আর জোরে-জোরে শ্বাস ফেলে কিন্তু কিছু বলে না।

অফিসার জিপের ড্রাইভারকে 'গাড়ি ঘোরাও, ঐদিক দিয়ে রায়পুর যাব', বলে গাড়ি ঘোরানোর জন্যে অপেক্ষা করে।

তখন নরেশ বলে, 'আপনি কি চইল্যা য্যান নাকি ?'

তাদের দিকে মুখ না ঘুরিয়ে অফিসার বলে, 'শুনলেই ত কী বললাম ?'

'তা ঐ লোকটার রেসকুর কী হবে নে ?'

'ওখানে ত কোনো লোক দেখলাম না। তোমরা বলছ লোক আছে। বললাম, লোক দাও, নৌকো দাও, টাকা দেব, তোমরা ভাবলে এই সুযোগে দাঁও মারবে। তা এ-সব ত আমি ঠিক করতে পারব না। আমি কন্ট্রোল রুমে জানাব। তারা যা করতে বলে, তাই করব।'

নরেশ বা অমূল্য অফিসারের সঙ্গে এ-সব নিয়ে যুক্তি দিয়ে কথা বলার লোক না। তা ছাড়া বানভাসি সবাই যদি তাদের সঙ্গে আসত, তারা একটা চিৎকার-চেঁচামেচি তুলতে পারত। আবার, এ-কথাও ঠিক যে তারা দাঁও মারার মতই টাকা চেয়েছে। ফলে, অফিসারকে ধরার জন্যে তাদের এতটা ছুটে আসাটা কেমন তাদের নিজেদের কাছেই অনর্থক ঠেকে। জিপ গাড়িটা ঘুরে অফিসারের সামনে দাঁড়ায়। অফিসার ড্রাইভারের পাশে উঠে বসলে নরেশ এটুকুই একটু জোর দিয়ে বলার চেষ্টা করে, 'আপনি কি ফির্যা আইসবেন, না, বাগান থিক্যাই ফির্যা যাবেন শহরে ?'

অফিসার বলে, 'দেখো ভাই, আমার ক্ষমতা পাঁচশ টাকা খরচ করার। তোমরা যদি তার মধ্যে করতে পারতে তা হলে আমি এখনি করে দিতাম। আমি এখন কন্ট্রোলে ফোন করব। এখন তা আর কন্ট্রোল থেকে খবর দিয়ে আর্মির নৌকো পাঠানো যাবে না। যদি হয় তাও কাল দুপুরের আগে না। তা ছাড়া কাউকে ত দেখাই যাচ্ছে না। রেসুক করবে কাকে ? যাক গে। অত কথায় কাজ নেই। আমি ফোন করে তোমাদের এখানে ফিরে আসব। কন্ট্রোল আমাকে কী বলল, সেটা তোমাদের জানিয়ে চলে যাব। আমার আর-কিছু করার নেই। চলো।'

ড্রাইভার গাড়িটা চালানো শুরু করতেই নরেশ বলে ওঠে, 'খাড়ান, খাড়ান।' ড্রাইভার গাড়ি থামায়। নরেশ এগিয়ে এসে বলে, 'শুনেন স্যার। এই নদীর মইধ্যে আপনার মিলিটারিও নামার সাহস পাবেনে না। জলের একখান এমন-অমন ধাক্কা যদি লাইগ্যা যায়, তাহলি নৌকা উল্টায়্যা যাবে। আপনারও আর কষ্ট কইর্যা ফোন করার কাম নাই—ঐটা এক হাজার কইর্যা দ্যান নৌকার ভাড়া ধইর্যা, আমরা এহনি নৌকা ভাসাই।'

'তোমরা এখনি যাবে ? নৌকো কাছাকাছি আছে ?'

'হ্যাঁ। ঐ রংধামালি হাটের বগলে—'

'তা হলে শোনো—আমি তোমাদের সাড়ে সাতশ টাকা দিতে পারি। কিন্তু এখন পাঁচশ, কাল আমাদের অফিসে গিয়ে বাকি আড়াইশ আনতে হবে। আমাদের একটা ঘটনার জন্যে একবারে পাঁচশ টাকার বেশি খরচ করায় আইন নেই। আড়াইশ কাল তোমাদের দেব।'

নরেশ হেসে-হেসে মাথা চুলকোতে-চুলকোতে বলে, 'কাইল আর-একডা রেসকু যখন বানাইবেনই ত

সেডারেও পাঁচশ টাকার রেসকু দ্যান স্যার। বাড়িঘর জমিজমা ত সব দেইখলেন, ভাইস্যা গেল।'

এবার অফিসার সস্নেহ ধমক দেয়, 'ওঠো ত গাড়িতে, এরপর আর তোমার নৌকো ভাসানোরও টাইম থাকবে না। ওঠো। চলো, নৌকা কোথায়, সেখানে যাব। আর কাকে-কাকে নেবে, নিয়ে যাও। গাড়ি ঘোরাও।'

নরেশ একবার তাদের পেছনের ভিড়টার দিকে তাকায়। তারপর 'এই বালিশ, শোন্', বলে একটা ছেলেকে ডাকে, 'দৌড়ায়্যা যা, অশ্বিনী কাকারে কবি অর মানষিডারে হাটের বগলে পাঠাইতে।' নরেশ গিয়ে জিপের পেছনে ওঠে। অমূল্য যখন ঢুকছে তখন বালিশ পেছন থেকে বলে, 'মোক গাড়িত্ নিগাও কেনে।'

নরেশ ধমকে ওঠে, 'কইল্যাম দৌড়ায়্যা যা।'

'আরে নাও না ওকে তুলে। তারপর কাকে নেবে তাকেও গাড়িতেই তুলে নাও, হেঁটে যেতে ত সময় লাগবে,' অফিসার বলে।

বালিশ পেছনে উঠে পড়ে। গাড়ি বাঁধের তলা দিয়ে ঐ বানভাসিদের অস্থায়ী আবাসের দিকে চলে। নরেশ বলে, 'না, নৌকা যেইখানে আছে ঐ তক ত গাড়ি যাইব না। ও বাঁধ বরাবর গেলে আগে যাবে নে।'

বলতে-বলতেই গাড়ি পৌঁছে যায়। বালিশ পেছন থেকে টুক করে নেমে পড়ে। বাঁধের লোকজন বুঝতে পারে না, কী হল। অফিসারই নরেশ আর অমূল্যকে ধরল, নাকি নরেশ আর অমূল্যই অফিসারকে ধরল—সেটা বোঝা যায় না। নরেশ আর অমূল্যর ছুটে যাওয়া, তারপর, অফিসারের গাড়িতে চড়ে তাদের এখানে ফিরে আসা—এর ভেতর কোথাও তাদের কোনো বিপদের আশঙ্কা আছে কিনা, এই নিয়ে বাঁধের লোকজনদের ভেতর একটা অনিশ্চয়তা থাকে।

নরেশ অফিসারের পাশ দিয়ে মুখ বের করে বাঁধের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলে, 'অশ্বিনী কাহা, কাদাখোয়ারে পাঠাইয়্যা দ্যান হাটের বগলে—' তারপর মুখ ঢুকিয়ে বলে, 'চলেন।' নরেশের কথা বলার গরম ভাপ অফিসারের ডান কানের পেছনে ও ঘাড়ে লাগে। নরেশ মাথাটা সরালে তিনি রুমাল বের করে ঘাড় মুছে নেন। গাড়ি সোজাই চলছিল।

ঐ হাওয়ায় নরেশের কথা বাঁধের ওপরে পৌঁছেছিল কি তা বোঝা যায় না। যদিও নরেশ যেখান থেকে কথাটা বলেছে সেখানে বাতাস প্রায় ছিলই না—বাঁধে ঠেকে গিয়েছে। কিন্তু বাঁধের ওপর ত বাতাস একই রকম। ততক্ষণে বালিশ বাঁধের ওপর উঠে ঘোষণা করে দিয়েছে—নৌকো ভাসবে, কাদাখোয়াকে পাঠাতে বলেছে।

কাদাখোয়া, অশ্বিনী রায় জোতদারের 'মানষি', চরের সবচেয়ে ওস্তাদ মাঝি।

একশ একচল্লিশ

কাদাখোয়ার নিদ্রাভঙ্গ

অফিসারের জিপগাড়ি নরেশ-অমূল্যকে নিয়ে চলে যাওয়ার পর অশ্বিনী রায় কাদাখোয়াকে গিয়ে ডাকে—'হে বাউ।' কাদাখোয়া অশ্বিনী রায়ের গরুগুলো যে-খুঁটিতে বাঁধা, তার নীচে বাঁধের পশ্চিম ঢালুতে শুয়েছিল। সেদিকে বোল্ডারের মধ্যে একটা সমতল জায়গা সে খুঁজে বের করেছিল। তাবা সারা শরীরে শুধু একটা নেংটি পরনে, আর একটা গামছা, মাথার ওর ঢাকনির মত দেয়া। বাঁধের জন্যে হাওয়াটা এখানে অত জোরে বইছে না বলে কাদাখোয়ার উপুড় করা মাথার ওপর থেকে ওটা উড়ে যায় নি। কাদাখোয়া অবিশ্যি গামছাটা দিয়ে গলা পর্যন্ত মাথাটা এমন করে জড়িয়ে রেখেছে যে গামছাটা উড়ে যাওয়া সম্ভবও ছিল না। তার সারাটা শরীর এমন উলঙ্গ যে মাঝখানের নেংটিটুকুও চামড়ার সঙ্গে মিশে থাকে। মানুষের যেখানে কাপড়ের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, সেখানে কাদাখোয়ার কোনো কাপড়ের দরকার নেই। আর, যেখানে মানুষের কাপড়ের কোনো দরকার নেই, সেই মাথাটাকেই কাদাখোয়া

গামছা দিয়ে ঢেকে প্রায় বেঁধে রেখেছে এমন করে যে চট করে দেখলে তাকে মানুষ মনে নাও হতে পারে। বন্যার সময় বাঁধের ওপর ও-রকম কাঠ, গাছ কত পড়ে থাকে।

অশ্বিনী রায়ের গলার স্বর নিচুতে। বাঁধের ওপর থেকে তার ডাক কাদাখোয়া শুনতেই পায় না। অশ্বিনী রায় তখন বসে-বসে বাঁধের একটা বোল্ডার থেকে আর-একটা বোল্ডারে পা দিয়ে-দিয়ে নামে আর ডাকে, 'হে বাউ, বাউগে-এ।' কাদাখোয়া তাও-শোনে না। ততক্ষণে অশ্বিনী কাদাখোয়ার কাছে পৌঁছে গেছে। গিয়ে বোঝে কাদাখোয়া ঘুমুচ্ছে। গামছায় মোড়া তার মুখের ভেতর থেকে আওয়াজ বেরচ্ছে। অশ্বিনী আরো একটু এগিয়ে কাদাখোয়ার মাথাটা ধরেই মৃদু ঝাঁকায়—'হে বা, বাউ গে'—ডাকতে-ডাকতে।

বাঁধের ওপর থেকে জগদীশ বারুই চেঁচায়—'বোল্ডার দিয়্যা মারো মাথায়, ঐডা ত মরার নাখান ঘুমায়, ধাক্কা দ্যাও, ধাক্কা।'

অশ্বিনী রায়ের মুখোচোখে সব সময়ই একটু অসহায়তার ভাব। সে জগদীশের দিকে তাকায়—যেন জগদীশের কথা না শুনলে জগদীশ রাগ করবে। তারপর আর-একটু এগিয়ে দুই হাতে কাদাখোয়ার পাথরের মত চওড়া পিঠটা ধরে নাড়ায় —'হে বাউ, বাউ গে-এ।'

কাদাখোয়ার অত বড পিঠ অশ্বিনী রায় তার ঐটুকুটুকু হাতে নাড়াতে পারে না। কিন্তু কাদাখোয়া যে জেগে উঠেছে তা বোঝা যায় তার হাতদুটো গুটিয়ে আনায়। এতে অশ্বিনী রায় গলা আর-একটু তুলে ডাকে—'হে বাউ, বাউ গে-এ।'

এবার কাদাখোয়া তাব গোটা শরীবটাকে চিৎ করে। এক জায়গাতেই নয়—সে গড়িয়ে চিৎ হয়। ফলে বোল্ডারের ওপর যে-ছোট-ছোট গাছগাছালি ছিল সেগুলো তার বুকের ওপর লেগে থাকে, লেগে থাকে কুচি-কুচি পাথরও। এখন, তার মাথাটা বোল্ডার থেকে সরে গিয়ে একটা ফাঁকের মধ্যে পড়ে পেছনে হেলে যায়—গলাটা টান-টান হয়ে থাকে। পা দুটো ফাঁকই থাকে। দেখে, কোনো জীবন্ত মানুষ মনে হয় না।

বাঁধের ওপর তখন একটা লাইনই হয়ে গেছে। রঘু ঘোষ চেঁচায়—'আরে মাথায় জল ঢালেন, জল ঢালেন।'

রঘু ঘোষের ভাগ্নী গোপা জিজ্ঞাসা করে—'কী? নেশা করেছে নাকি?'

রঘু ঘোষের বউ লিলি বলে—'কোথায় টি-ভির নৌকা দেখব, তা না ঐ মিঠুন চক্রবর্তীকে দেখতে হচ্ছে।' বলেই খিলখিল হেসে উঠতেই রঘু ঘোষও হেসে ফেলে বলে, 'মিঠুন চক্রবর্তী ও রকম নেংটি পরে নাকি?'

'এমন টাইট প্যান্ট পরে যে নেংটির মতই,' বলে লিলি আর-এক দফা হাসে।

'তোমার কাদাখোয়ার জাগরণ ত কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ। খোয়া দ্যাও, খোয়া দ্যাও, নয় ত জাইগবে না', জগদীশ ওপর থেকে বলে।

আরো একবার তাকে ডাকার জন্যে অশ্বিনী হাত বাড়াতেই কাদাখোয়া দু হাত মুখের কাছে টেনে আনে। অশ্বিনী হাত সরিয়ে ডাকে, 'এই কাদাখোয়া, ঝট করি উঠ্ কেনে, ঝট করি উঠ্, নৌকা ভাসিবার নাগিবে।'

কাদাখোয়া উঠে বসে। সে যেভাবে গামছাটা মাথায় জড়িয়েছিল সেটা তার চিৎ হওয়ায় পাক খেয়ে গেছে। সে খুলতে পারে না। গামছায় জড়ানো মুখটা নিয়েই উঠে বসে। বসেও দু হাতে গামছার কোণটা পায় না। তখন গামছায় জড়ানো মুখটা নিয়েই উঠে দাঁড়ায় আর হাত দিয়ে গামছার কোনা খোঁজে। না পেয়ে, সে বাঁধের ওপরে উঠবার জন্যে গামছায় জড়ানো মুখ নিয়েই পা ফেলে। শেষে, গামছার কোনা না-পেয়ে গলার কাছ থেকে গামছাটা টেনে ওপরে তোলে। গামছার ভেতর থেকে তার ঠোঁটটা বেরয় কিন্তু গামছাটা নাকে আটকে যায়। অবশেষে বাঁধের ওপর উঠে একটা টান দিতেই গামছাটা খুলে যায়। গামছাটা হাতে নিয়ে সে মুখটা মোছে। তারপর অশ্বিনী রায়কে খোঁজে।

অশ্বিনী রায় তখনো বাঁধের ওপর উঠতে পারে নি! কিন্তু কাদাখোয়া গামছা খুলে ফেলতে পেরেছে দেখে চিৎকার করে বলে, 'হাটের বগলত চলি যা, নরেশুয়া আছে, নৌকা ভাসিবার লাগিবে।'

কাদাখোয়া গামছাটা দিয়ে মুখটা আর-একবার ডলতে-ডলতে বাঁধের ঐ ভিড়ের মধ্যে দিয়ে বাঁধের পুব দিকের ঢালের বোল্ডারের ওপর লম্বা-লম্বা পা ফেলে কোনাকুনি জলের দিকে নেমে যায়, তারপর

জলনিকাশী নালীটা এক লাফে ডিঙিয়ে জালঘেরা বোল্ডারের ওপর পড়ে বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

কাদাখোয়া এই এত ভিড় দেখে না, এই এত হাওয়াবৃষ্টি দেখে না, নদীর এই এত জল দেখে না। সে যেন ঘুমতে-ঘুমতেই হেঁটে চলে গেল এমনই তার ভঙ্গি। বাঁধের ওপর থেকে নীচে লাফিয়ে-লাফিয়ে নামার ফলে তার গা থেকে পাথরের কুচি ঝরে যায় কিছু-কিছু, সব নয়।

রংধামালি হাটের কোথায় নৌকাটা থাকে সেটা সবাইই জানে। নৌকোর একটা মালিকও আছে বটে কিন্তু সাধারণ সময়ে নৌকোটা চরের লোকজন তরি-তরকারির বোঝা হাটে নিয়ে আসার জন্যেই ব্যবহার করে। ঠিক খেয়া না হলেও হাটের দিন খেয়ার মতই নৌকোটা ব্যবহার করা হয়। চরের যারা নৌকোটা ব্যবহার করে তারা হাটের দিন মালিককে কিছু পয়সা ধরে দেয়। নৌকোর মালিকের একটা ছোট মনোহারী দোকান আছে। নৌকোর দেখাশোনা, ছোটখাট মেরামত চরের লোকেরাই করে নেয়। কাদাখোয়া ঘুমের মধ্যেই 'নৌকা' শুনে জেগে উঠে কোথায় যেতে হবে তা বুঝে যায়।

তেমনি বুঝে যায় বাঁধের লোকজনও। চরের মানুষরা ত বটেই, হাট ও বাগানের মানুষও। তারা জানে নৌকোটা কোথায় বাঁধা আছে—এখান থেকে উত্তরে বাঁধটা যেখানে বাঁয়ে ঘুরেছে সেই কোণটাতে। অফিসার গাড়ি নিয়ে নরেশ-অমূল্যকে ঐ বাঁকটায় নামিয়ে দেবে আর কাদাখোয়া এদিক দিয়ে ঐ বাঁকটাতে গিয়ে পৌঁছুবে।

কিন্তু নৌকোটা ছাড়তে একটু প্রস্তুতির সময় লাগবে—এটাও বাঁধের লোকজন জানে। এমনিতেই ভাঙাচোরা নৌকো—এটুকু জল পার হতেই নড়বড় করে। তার ওপর বৈঠা হিশেবে একটা বাঁশের সঙ্গে পেরেক সাঁটা একটা চওড়া কাঠ, থাকতে পারে, নাও পারে। এই ফ্লাডের জলে নৌকো ভাসানোর আগে, হাতুড়ি পাওয়া না যাক, অন্তত পাথর দিয়ে দুটো-একটা জায়গা ঠুকে নিতে হবে। আর, যে-কজন যাবে, তিনজন ত হল, তাদের প্রত্যেকের হাতেই লম্বা লগি চাই, লগি ছাড়া এই জলের স্রোতে নৌকো সামলানো যাবে না। ভাল নৌকোই সামলানো যায় না, আর এ নৌকোর কথা কে বলবে?

বাঁধের লোকজন নদীর দিকে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। উল্টোদিকে অফিসারের জিপ থামার আওয়াজ পাওয়া যায়। তখন আবার কেউ-কেউ উল্টো দিকে যায়। ততক্ষণে অফিসারই উঠে এসেছে।

একশ বিয়াল্লিশ

অপারেশন বাঘারু

বাঁধের ওপর উঠে এসে সোজা নদীর দিকে মুখ করে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে অফিসার বলে, 'এখুনি ছেড়ে দেবে।' তারপর বাঁ দিকে তাকায়—নৌকোটা যেদিক দিয়ে আসবে। তার দেখাদেখি অন্যরাও বাঁ দিকে তাকায়।

এখন নৌকোটার আসাই প্রধান ব্যাপার। তাই বাঁধের ভিড়টা কিছুটা উত্তর দিকেও ছড়িয়ে পড়ে—সেখানে যে-দুটো-চারটে গরু বাঁধা ছিল সেগুলোকেও ছাড়িয়ে। আর, জিনিশপত্র পাঁজা করে যেখানে চরের লোকজন সংসার পেতেছে—মেয়েরা সেখানেই দাঁড়িয়ে গেছে।

অফিসার একটু ডাইনে-বাঁয়ে তাকিয়ে বলে, 'নৌকোর যে-কনডিশন দেখলাম, যেতে পারবে ত?'

অফিসার বোধ হয় কোনো একটা উত্তর প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু উত্তর না পেয়ে সে আবারও ডাইনে-বাঁয়ে তাকায়। আবার, বাঁ দিকে নৌকোর প্রবেশপথের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিয়ে অফিসার একটু ঘুরে কাউকে খোঁজে। তারপর নদীর দিকে পেছন ফিরেই ঘোরে, 'আরে, সেপাই দুটো গেল কোথায়?' অফিসার যখন সেপাই দুটোয় খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে তখনই বাঁধের মানুষজনের মধ্যে চাপা আওয়াজটা বাতাসের বিপরীতে খেলে যায়—'আইসছে, আইসছে।' প্রথম দেখতে পেয়েছিল—যারা বাঁধের উত্তরদিকটাতে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার পরে যারা ছিল তারা দেখবার জন্যে হুড়মুড় করে এগিয়ে যেতে-যেতে বাঁধের ঢাল বেয়ে নীচে নেমে যেতে থাকে। ততক্ষণে নৌকোটা একটা টুকরো কাঠের মত স্রোতের মুখে এই বাঁধের লোকজনের মুখোমুখি এসে পড়েছে। বাঁধের বাকি অংশ থেকেও সবাই হুড়মুড় করে নীচে জলের একেবারে কিনারায় নেমে যায়—বাঁধের ওপর থাকে অফিসার,

রঘু ঘোষ, লিলি, গোপা, অফিসবাবুর বড় শালী, গুদামবাবু, হাটের কেউ-কেউ। বানভাসিদের দিকেও দু-একজন বয়স্কা আর নীচে নামেনি। গরুগুলি কী রকম বুঝতে পারে নদীতে কিছু ঘটছে, তারা নদীর দিকে মুখ করে গলা বাড়িয়ে দেয়। একটা গরুর গলায় দড়ি পেঁচিয়ে যায়। স্রোতের ধাক্কায় নৌকোটা স্রোতেব মুখে বেঁকে গেছে। পাড় থেকে মনে হচ্ছে যে-কোন সময় ঐ দিক দিযে উল্টে যেতে পারে। কিন্তু নবেশ, অমূল্য আব কাদাখোয়া সেদিকে তাকাতেও পাবছে না। নৌকোটা আর সোজা নেই, বেঁকে গেছে। এটাই নৌকোর পক্ষে বিপদ—সোজা না-থাকলেই নৌকো ডোবে। স্রোতের সঙ্গে ভেসে যেতে-যেতেই নবেশ, অমূল্য আর কাদাখোযা তাদের সমবেত শক্তিতে নৌকোটাকে সোজা করাব জন্যে জলেব ওপব প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছে—নৌকোর ওপব দাঁড়িয়ে থেকে যতটা হুমড়ি খাওয়া সম্ভব। নৌকোব মাথাব দিকে একটু আগুপিছু দাঁড়িয়ে নবেশ আব অমূল্য লগি মাবছে আব তুলছে, মারছে আর তুলছে। তাবা স্রোতের বিপরীতে লগি মারছে যাতে স্রোতের মুখে নৌকোর গতি বাধা পায়। কাদাখোয়া নৌকোব পেছন দিকে দাঁড়িযে স্রোতের দিকে মুখ করে সেই একই কাজ করছে। কিন্তু তাকে একা দুজনেব কাজ কবতে হচ্ছে—সে লগিটা তুলে একবার ডাইনে মারছে, একবার বাঁয়ে মারছে। তিনজনেবই কাজ নৌকোটাকে স্রোতের বিপরীতে রাখা। আর সেই চেষ্টার ফলেই নৌকোটা স্রোতে ভেসে যায না, কিছুটা এদের লগিব দ্বাবাও নিয়ন্ত্রিত হয। কিন্তু সেই নিয়ন্ত্রণটা আসে এ-রকম স্রোতের মুখে বেশ কিছুটা গেলে। স্রোতের মুখে নৌকোটা ছেড়ে দেযার পর প্রথম কাজ নৌকোটা সোজা রাখা। সোজা বাখতে পাবলে কিছুক্ষণেব মধ্যেই এই লগিফেলা-লগিতোলাব মধ্যে একটা ছন্দ তৈরি হয়। তখন এমন স্রোতেব মুখেও নৌকোটা আর ডোবে না। কিন্তু এখানে সেই সময়টা নিতে গেলে ঐ চর ছাড়িয়ে নৌকো চলে যাবে। তখন নৌকো ফেরানো অসম্ভব। বাঁধ থেকে ঐ চবেব দূবত্বটা এখন জলে-জলে এতই কম যে কোনো বকমে নৌকোটাকে ঠেলে একটু সরিয়ে নিতে পারলেই নৌকোটা চরের কোনো চালে বা গাছে ঠেকে যাবে। কিন্তু এই স্রোতেব বেগ ঠেলে সেই সামান্য সরিযে নেয়াটুকুও সম্ভব নয় যেন।

বাঁধেব মুখোমুখি এসে নৌকোটা প্রায বেঁকে যায, অর্থাৎ স্রোতেব অনুকূলে তাব মাথা ও লেজ না থেকে, স্রোতেব প্রায আড়াআড়ি হয়ে যায়। এটা যদি ঠেকাতে না পারে, তা হলে নৌকোটা দুটো-একটা পাক খেয়ে স্রোতেব ধাক্কায় কাত হয়ে যাবে।

কাদাখোযা একবাব ডাইনে একবাব বাঁয়ে মেরেও মেবেও নৌকোটিকে আব এটুকু সোজাও বাখতে পাবে না, এদিকে অশ্বিনী বায়ের গুয়াবাড়ি প্রায পার হয়ে যায়-যায়। হঠাৎ কাদাখোযা বাঁয়ে লগিমারা বন্ধ কবে ডাইনেই পর-পব তিনবার লগি মারে। সে লগিমাবা যেন জলেব মধ্যে বর্শা বেঁধানো আর তোলা। নৌকোটা মুহূর্তের মধ্যে পাক খেয়ে যায। বাঁধ থেকে একটা সমবেত আওয়াজ ওঠে, 'গেইল', 'গেইল।' কিন্তু ততক্ষণে নরেশ আব অমূল্যব মুখ চবেব দিক থেকে বাঁধের দিকে ঘুবে আসতে থাকে আর কাদাখোয়া নৌকোর মাথায় চলে যায়। কাদাখোয়া নৌকোর দু-দিকে পা দিয়ে, যেন মাটি খুঁড়ছে, বা কোদাল মাবছে এমন ভঙ্গিতে সেই লগি দু হাতে তুলে জলে বিদ্ধ করতে থাকে। জলে পড়তে না-পড়তে লগি কাত হযে যায। কাত হতে না-হতেই লগি তুলে এনে আবার জলে বিঁধিয়ে দেয় কাদাখোয়া। নৌকোটা কোনাকুনি চরের দিকে ধেয়ে যায—'ঐ একখান সোঁতা পাইছে, পাইছে।' ওখানে কোনো স্রোত চবের দিকেই যাচ্ছে। সেই স্রোতের বেগ ত চরের ওপর দিয়ে গেলেও কিছু কম নয়। কিন্তু ওরা নদীটা পার হয়ে চবে পৌঁছে গেছে। এখন চরে নৌকোটাকে আটকাতে পারবে কি না সেটা অন্য ব্যাপার। নৌকোটা ততক্ষণে অশ্বিনী রায়ের গুয়াবাড়ি ছাড়িয়ে সোজা দক্ষিণের স্রোতের দিকে যাচ্ছে। মাঝে-মাঝে জেগে থাকা এক-একটা চালের আড়ালে পড়ে যাচ্ছে।

'এই, এই, এই, আটকিছে, আটকিছে', বাঁধে একটা সাড়া পড়ে যায়।

'কী হল, কী হল ?' বলে অফিসার দু-পাশে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা কবে। কেউই জবাব দেয় না।

অফিসার তাড়াতাড়ি বাঁধ বেয়ে নীচে নামতে শুরু করে। তার সঙ্গে-সঙ্গে রঘু ঘোষ, তার বৌ, ভাগ্নী, অফিসবাবুর বড় শালী, গুদামবাবু, হাটের লোকজনও নামতে থাকে। নামতে-নামতেই লিলি জিজ্ঞাসা করে, 'কী, নৌকোটা উল্টে গেছে ?'

গোপা বলে, 'বাবা, গেল কী করে ? এখন ফিরবে, না ওখানেই থাকবে ?'

লিলি বলে, 'ওখানে কি ওদের জন্যে বাগানের ইনস্পেশকশন বাংলো বানিয়ে রেখেছে নাকি ?'

জলেব ধারে পৌঁছে ওরা পেছনে পড়ে যায়। ওদের দিকে কেউ তাকায় না। অফিসার পেছন থেকে এমন কাউকে খোঁজে যার সঙ্গে আগে কথা বলেছে। কিন্তু তেমন কাউকে না পেয়ে সে একজনের জামা ধরে টানে। সে ঘাড় ঝাঁকিয়ে জামাটা ছাড়িয়ে নেয়। কিন্তু অফিসার আবার তার জামাটা টেনে ডাকে, শুনুত ত।' অফিসারের গলা শুনে লোকটা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতেই অফিসার জিজ্ঞাসা করে, 'কী ? হলটা কী ? নৌকোটি কি পৌঁছেছে ?'

'হয়, হয়, আটকি গেছে, আটকি গেছে', বলে লোকটি আবার নদীর দিকে মুখ করে।

পেছন থেকে জগদীশ বারুই এসে অফিসারকে বলে, 'কী ? দেখসেন ? পৌঁছ্যায়্যা গিছে ?'

অফিসার নদীর দিকে পেছন ফিরে জগদীশকে জিজ্ঞাসা কবে, 'কী ব্যাপার ? নৌকোটা উল্টেটুল্টে যায় নি ত ?'

জগদীশ চিৎকার করে বলে ওঠ, 'উল্ট্যাবে ক্যান ? কাদাখোগাবে কন না, ঐ নৌকা নিয়া কাশিয়াবাড়ি চইল্যা যাবে। আর আমাগো নরেইশ্যা আর অমূল্যরও জোর আছে।' জগদীশের ভঙ্গিতে একটা অধিকারের ভাব আসে যেন নরেশ, অমূল্য আর কাদাখোয়ার এই রকমেব সাফল্যের পেছনে তারই প্রধান ভূমিকা।

অফিসার একটু অসহায় ভাবে বলে, 'এখন ফিরবে কখন ?'

জগদীশ খুব নিশ্চিত স্বরে বলে, 'ক্যান ? এহনই ? দেবি কবব ক্যান ?'

একশ তেতাল্লিশ

নৃত্যভাষায় সংলাপ

অশ্বিনী রায়ের চালের বা সুপুরি গাছের কাছে নৌকোটা ভেড়ে না, সেগুলোকে বাঁয়ে রেখে নৌকোটা কোনাকুনি চরের মধ্যে ঢুকে গিয়ে একটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা খায় প্রায়। নরেশ গাছটাকে জড়িয়ে ধরলে নৌকো হঠাৎ টাল খেয়ে গাছটাকে ঘুরে স্রোতের মুখে চলে যায়। নরেশকে গাছ আর নৌকোর মাঝখানে ঝুলতে হয়—কিন্তু ততক্ষণে কাদাখোয়া এক হাতে নৌকোটাকে আর-এক হাতে গাছটাকে ধরে জলে ঝাঁপ দিয়েছে। তাতেই নৌকোটা গাছের সঙ্গে সেঁটে যায়।

সমস্ত ঘটনাটা ঘটে যেন একেবারে সময়ের ছন্দে। বন্যার তিস্তার স্রোতে ভেসে এই গাছে এসে নৌকো লাগানোটা যেন অমূল্য, নরেশ আর কাদাখোয়ার, প্রতিদিনের ফেরি পারাপারের মত দৈনন্দিন কাজ, যেন তাদের জানাই আছে স্রোতটার কোন জায়গায় এক দিক থেকে লগি তুলে নিলে নৌকোটা পাক খেয়েও ডুববে না, না-ডুবে সোজা এই চরের দিকে চলে আসবে, এবং অশ্বিনী রায়ের চালটাকে বাঁয়ে রেখে কোনাকুনি এই গাছটাতে পৌঁছুবে।

আসলে ত এই নদীর, এই বন্যার এই স্রোতের সামান্য এক আঙুল জায়গাও তাদের চেনা বা জানা নয়। বন্যার জল কখন আসবে সেই হিশেবনিকেশ করে যাদের বাড়িঘর ও দাঁড়ানো ফসল ছেড়ে বাঁধে উঠে আসতে হয়েছে এবং সে-জল তাদের চোখের সামনে প্রতি মুহূর্তেই প্রায় সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়ে উঠতে-উঠতে বসবাসের চরে তাদের ফিরে যাওয়াটাই অনিশ্চিত করে তুলেছে—তারা কী করে আগে থাকতে জানতে পারবে এই দিনরাত রাতদিন ধরে বয়ে আসা জলস্রোত কোথায় কোন মোড় নিচ্ছে। তবু যে তারা একটা আধভাঙা নৌকো নিয়েও এই এমন স্রোতে এমন অনায়াসে ভেসে পড়তে পারে, তার কারণ এইটুকু স্থির বিশ্বাস যে খালি হাতপায়ে ভেসে গেলেও তারা শরীর নিয়ে কোথাও না কোথাও গিয়ে ঠেকে যেতে পারবে, জলে ডুবে মরবে না। নিজের ওপর এই বিশ্বাসটা স্থির—যতটা স্থির হওয়া সম্ভব। আবার, এই নদীর এখনকার অনিশ্চয়তাও সে-রকমই স্থির। জলে ভেসে যাবার পর কিন্তু অমূল্য, নরেশ আর কাদাখোয়া তিনজনেরই একটা মাত্র ভয় মনের ভেতরে কাজ করে, যদি নৌকো উল্টে যায় তবে তারা এই জলের সঙ্গে ভেসে আর বেঁচে থাকতে পারবে না। কিন্তু তবু যে মৃত্যুভয়ে তারা অস্থির হয়ে ওঠে না—গায়ে আগুন লাগলে যেমন অস্থির হয়ে ছোটাছুটি করে ফেলে সবাই—তার

কারণ, তারা ত দেখেশুনে ভেবেচিন্তেই নৌকোটা ছেড়েছে, স্রোতটা কত খর বেগে বইছে তার একটা হিশেবও তাদের জানা আর স্রোতে কী ধরনের ধাক্কা লাগতে পারে সেটাও তাদের আন্দাজ ছিল। তাই ঐটুকু প্রস্তুতি তাদের সামাল দেয়। কখনো একটা পায়ের ঝোঁকে, কখনো একটা হাতের চাপে নৌকোর টালমাটাল সামলাতে-সামলাতে তারা চরটাতে এসে যায়। নরেশ যে গাছটা জড়িয়ে ধরবে তা সে পূর্ব মুহূর্তেও জানত না, আর নরেশ গাছটা জড়িয়ে ধরলেই যে কাদাখোয়া গাছটা ধরে জলে ঝাঁপ দেবে তাও ঠিক ছিল না। এ-সব ত আর সে-রকম ভাবে ঠিক থাকতে পারে না। এমন হতেই পারত যে নরেশ গাছের ডাল ধরে ঝুলে থাকল আর নৌকো তার পায়ের তলা থেকেও সরে গেল। তা হলে, নৌকো আর নরেশের পায়ের তলায় ফিরিয়ে আনা কারো পক্ষেই সম্ভব হত না। নরেশকে তা হলে ঐ গাছের ওপর উঠে বসে থাকতে হত।

কিন্তু নরেশ গাছটা জড়িয়ে ধরলেই যে কাদাখোয়া ঝাঁপ দিয়ে জলে পড়ে সেটা এক অদ্ভুত রহস্য—নদীর স্রোত আর সেই স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার বহু কালব্যাপ্ত এক অভিজ্ঞতা আর অভ্যাসের ফল, সমবেত অভিজ্ঞতা ও সমবেত অভ্যাসের ফল। অথচ এর পরের কাজটার সমর্থন ছাড়া আগের কাজটা সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে যায়। কাদাখোয়া ঝাঁপ দিলেই নরেশের ঝাঁপটার একটা অর্থ আসে। সে-অর্থ আসবে কি আসবে না, না-জেনেই নরেশকে ঝাঁপটা দিতে হয়, তারপর অর্থটা বুঝতে হয়। নরেশ ঝাঁপ দেবে কি দেবে না, সেটা না-জেনেই কাদাখোয়া ঝাঁপটা দেয়। এমন হতেও পারত যে কাদাখোয়াই আগে ঝাঁপ দিল, নরেশ পরে গাছটা ধরল। কিন্তু এই দুটো কাজ কোনো এক ভাবে গাঁথা হয়ে যায় এই বিকেলে, এই আসন্ন আকাশের নীচে, এই অঝোর বৃষ্টি আর বাতাসের অভ্যন্তরে। রংধামালির হাটের কাছে যে-পচা পাটের দড়িটা দিয়ে নৌকোটা বাঁধা থাকে, এই ভরা ফ্লাডে অমূল্য সেই দড়িটা দিয়েই গাছের ডালের সঙ্গে নৌকোটাকে বাঁধে। তারপর, তারা সকলে বাঘারুকে দেখতে পায়।

বাঘারু তার গাছগুলোর মধ্যে মাচানের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। সে বসেই ছিল—হঠাৎ ঐ চালটার ওপাশে মানুষের এমন ভেসে আসা স্বরে সে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। নরেশ আর অমূল্য তাকে আগেই দেখতে পারত, আর গাছগুলোর পাশ দিয়েই ত কোনা মেরে নৌকোটা ঢুকল। কিন্তু সেই সময় ত নরেশ বা অমূল্যর আর-কিছু দেখাব দিকে চোখ ছিল না। বাঘারু যখন দেখে, ওরা তাকে দেখেছে, সে বসে পড়ল। এদের দিকে মুখ করে দুই হাঁটু জড়িয়ে ধরে বসে থাকল।

এখন এই নৌকো আর বাঘারুর গাছের মধ্যে মাত্র কয়েক হাত জল, জল না থাকলে এখানে অশ্বিনী রায়ের বেড়াব পরের খালি জমি। সেই খালি জমি, বাঁশের বেড়া, লাউয়ের মাচা, মটর শাকের ওপর কয়েক মানুষ সমান জলের মাথায় এই নৌকো আর ঐ মাচান। মাটিতে গাছের যে-ডালটা ঘাড় হেলিয়ে দেখতে হত, সেই ডালটাতে হাত লাগিয়ে নরেশ এখন তাকিয়ে বোঝে অশ্বিনী রায়ের চালের কাছে সুপুরি গাছের মাথাটা ঐ লোকটার ঐ মাচানে নামার সিঁড়ির মত। সুপুরি গাছে উঠে ও নেমে এসেছে—আর নরেশরা বাঁধ থেকে দেখল, লোকটা সুপুরি গাছে উঠল অথচ নামল না।

বাঘারু তার মাচানে বসে বোঝে, এই জায়গাটায় তা হলে আরো অনেকেই এসে পড়বে। এসে পড়ারই কথা। জলডোবা তিস্তায় ত এতগুলো চাল আর গাছ এক জায়গায় পাওয়াই মুশকিল। এখন এই জায়গাটাকে নদীটার মাঝখানেই মনে হচ্ছে—বাঘারু জানে না আসলে কতটা মাঝখানে। বাঘারু দেখে—এর তিনজন লোক একটা নৌকো নিয়ে এসেছে কিন্তু কোনো গাছ নিয়ে আসে নি।

তাদের দাঁড়ানো জলের তলার ঘরবাড়ি খেতখামারের ওপর দিয়ে নরেশ চিৎকার করে—'আরে, তুমি ঐ চালের উপুর বইস্যা ছিলা ? সেই তখন ?'

কথাটা কী রকম অবান্তর হয়ে যায়। বাঘারু তার গাছগুলোর মধ্যে মাচানে আর এরা তিনজন এই একটা নৌকোয় একটা গাছ জড়িয়ে—মাঝখানে কয়েক হাতের তফাত। কিন্তু এই কয়েক হাতের ওপর দিয়ে জলরাশি বাকি জলস্রোতের মতই তীব্র, ঘোলাটে, ঘূর্ণিময় ও প্রায় ঢেউহীন। মাত্র এই কয়েক হাত জলের দূরত্ব তারা ঘোচাতে পারে না। কিন্তু সেই জলে গাছ ধরে ঝুলে থাকার প্রাণান্তিক ভঙ্গিতে নরেশ এমন কাতর স্বরে এই সামাজিক জিজ্ঞাসা ছাড়া আর-কিছু উচ্চারণ করতে পারে না। ঐ পাড় থেকে নরেশ আর অমূল্য যখন নৌকো নিয়ে ভেসেছে তখন তাদের লক্ষ্য ছিল এখানে এসে কোনো লোক থাকলে তাকে নৌকোতে তুলে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু ঐ নৌকোটা জলে ভাসা মাত্র তাদের সেই লক্ষ্য তারা ভুলেই যায়। তখন তাদের প্রাণপণ চেষ্টা কোনো রকমে এই সুপুরি গাছ আর টিনের চালের কাছে

পৌঁছনো। যখন পৌঁছয়, তাদেব প্রাথমিক উদ্দেশ্য তারা ভুলেই যায়। বাঘারুকে প্রায় আবিষ্কারের মত দেখে, আবার তাদের সেই কথা মনে পড়ে যায়। তখন ত তারা তিস্তার সেই দিগন্তব্যাপ্ত স্রোতের মুখে একটা কুটোর মত ভাসছে। নরেশেব গলা থেকে ঐ অবান্তর সামাজিক জিজ্ঞাসা ছাড়া কিছু বেরয় না।

কিন্তু বাঘারু বোঝেই না কথাটা তাকে বলা হল। সে এদের দিকে তাকিয়ে থাকে। লোকগুলো যখন একটা গাছ ধরতে পেরেছে তখন কোনো একটা ব্যবস্থা করে নেবে। বাঘারু তার দড়ি আর কুড়োলের কথা ভাবে বটে কিন্তু সেটা ওদের কোনো কাজে লাগবে কিনা আন্দাজ করতে পারে না।

নবেশ দেখে, তাদের আবাব কোন জলস্রোত ভাঙতে হবে। সে চিৎকাব কবে বলে, 'অমূইল্যা, জিগ্যাইবাব পাবস না ?'

অমূল্য নৌকোর ওপব থেকে বাঘারুকে ডাকে, 'শুইনছেন ? এই দেউনিয়া, শুইনছেন ?' বাঘারু ওদের দিকেই তাকিয়ে, দেখেও যে ওবা কিছু বলছে, কিন্তু কোনো জবাব দেয় না। সে বুঝতেই পারে না, ওরা তাকে ডাকাডাকি করছে। অমূল্য এবাব একহাতের আঁজলায় নদীব জল তুলে বাঘারুর দিকে ছোঁড়ে। সে জল বৃষ্টির সঙ্গে মিশে তাদেব গায়েই পড়ে।

'আরে, বোবা নাকি ? ফিইবতে হব না ?' নরেশ বাঘারুর দিক থেকে ঘাড় ঘুবিয়ে সেই ফেরাব অনিশ্চযতাটা একবার মাপে। লোকটাকে নৌকোতে তুলে সেই স্রোতের মুখে আবাব নৌকোটা ছাড়তে হবে।

অমূল্য লগিটা নিয়ে বাঘারু ও তাদের মাঝখানে যে-জল তাতে মারে। একটু জল ছিটকোয় বটে, লগিটা স্রোতের এক ধাক্কায় অমূল্যর পেছনে চলে যায়। অমূল্য লগিটা তুলে আনে।

বাঘারু বুঝে উঠতে পারে না—এরা তিনজন কী করছে। লোকগুলি এসে গাছটা জড়িযে ধরার পব সেই অবস্থাতেই আছে। গাছেব ওপবও উঠছে না, গাছটাতে তেমন করে দড়িও বাঁধছে না। 'হাঁপি গেইছে, জিরাবাব ধরিসে !' এ-বকমই ভেবে নিয়েছিল বাঘারু। তাবপর, ওদেব জল ছিটনো, জলে বাঁশ মারা এগুলোর কোনো অর্থ তৈবি করতে পাবে না। কিন্তু তার জীবনে, বা দৈনন্দিনেই যে-কাজেব সঙ্গে তার শরীরের সম্পর্ক তৈরি হয় নি, সে-কাজেব কোনো অর্থ তার কাছে তৈরি হয় না। বোঝার চেষ্টা না-করার মধ্যে তার কোনো সিদ্ধান্ত নেই। শরীর ছাড়া সে কী দিয়ে বুঝবে ? এমন কি, যেখানে তাব শরীর থাকেও সেখানেও অনেক কিছু তার বোঝার বাইরে চলে যায়।

কিন্তু নরেশ আর অমূল্য অস্থির হয়ে ওঠে। তাদের কাছে এখন বাঁধে ফিরে যাওয়াটা খুব অনিশ্চিত হয়ে উঠছে ' সেই অনিশ্চয়তার সামনে এখানে এই লোকটির এমন বোবা ও অথর্ব হয়ে বসে থাকাটা অসহ্য ঠেকছে। লোকটাকে এই নৌকোয় তোলার একটা সমস্যা আছে। কিন্তু সে-সমস্যাটা ত পরেব কথা। লোকটির সঙ্গে কথাই ত এখনো বলতে পারল না।

হঠাৎ মরীয়া হয়ে অমূল্য আর নরেশ একসঙ্গে চিৎকার করে ওঠে, 'কী, শুইনব্যার পারেন না ? বোবা না কালা ?'

কাদাখোয়া গাছের ডালটা জড়িয়ে নৌকোর ওপরই বসেছিল—যে-দড়ি দিয়ে নৌকোটা বাঁধা সেটা স্রোতের একটানে ছিঁড়ে যাবে। নরেশ আর অমূল্য যে-ভাবে নৌকোর মধ্যে টলমল করতে-করতে বাঘারুর দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে, তাতে বাঘারু বুঝে ফেলে ওরা তার কাছে কিছু একটা চাইছে। সে লাফ দিয়ে দাঁড়ায়, তার কুড়োলটা নিয়ে। সেটা হাতে তুলে বাঘারু চিৎকার করে, 'নাগিবে ?'

নৌকোটা দুলে ওঠে। নরেশ আর অমূল্য একটু টাল খায়। তাড়াতাড়ি ঘাড় ফিরিয়ে সেই স্রোতপথ দেখে নেয়, গাছ থেকে আলাদা হয়ে গেলে যেখান দিয়ে তাদের ভেসে যেতে হবে।

নরেশ আর অমূল্য ঘাড় ঘোরাতেই বাঘারু নাইলনের দড়ির বাণ্ডিলটা তুলে ধরে চেঁচায়, 'নাগিবে ? এইখান নাগিবে ?'

অমূল্যর মাথায় বুদ্ধি এসে যায়। সে দু হাত দিয়ে বোঝায় দড়িটা তাদের চাই। অমূল্যর ইঙ্গিত বুঝতে পেরে বাঘারু তাড়াতাড়ি বাণ্ডিলটা থেকে দড়ি খুলতে থাকে। সেই প্রক্রিয়াটা ওদের দেখতে হয়—ঐ জলের ওপর দাঁড়িয়ে বাঘারু তার গলা থেকে পায়ে সোনালি দড়ির স্রোত নামিয়ে দিচ্ছে।

নরেশ বলে—'এ কে রে ? একেবারে কুড়াল নিয়া, দড়ি নিয়া, আমাগো রেসকু দিব্যার ধইরেছে।' বলেই নরেশ আবার চিৎকার করে, 'হে-এ দাদা, হে-এ দাদা।' দুহাতে দড়ি নিয়ে বাঘারু তাকায়। নরেশ হাত তুলে তাকে থামতে বলে। বাঘারু থামে। নরেশ অমূল্যকে বলে, 'হে-এ অমূইল্যা, বুঝ্যায়া দে,

দড়িখান কাটাব কাম নাই, ভাসায়্যা দিক, ঐ মাথাডা ধর‍্যা থাকুক। আমরা দড়ি ধর‍্যা টাইন্যা ওর বগলে যাই। নয়ত বুঝাবি ক্যামনে যে আমবা অকনিব্যার আইসছি ?' অমূল্য হাততালি দিয়ে বাঘারুকে ডাকে। তারপব এক হাত বাতাসে তুলে রেখে আর-এক হাত জলে লাগিয়ে তুলে আনে, যেন জল থেকে কিছু তুলে আনল এমন ভঙ্গিতে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অমূল্য নিজের বুকে দুই হাত দু-তিনবার ছুঁয়ে বাঘারুর দিকে মেলে দেয়। দু তিনবারের পর, আরো দু-তিনবার। অমূল্য বোঝে, সে যদি এই কথাটা বোঝাতে পারে যে ওরাই বাঘারুব কাছে যেতে চাইছে, তা হলে বাঘারু দড়ি ভাসিয়ে দেবে। তাই সে দড়ি ভাসানোর অনুবোধ জানানোর ভঙ্গির আব পুনরাবৃত্তি করে না। অমূল্য যেন নিজেও নিশ্চিত নয় যে এক হাত জলে আর একহাত বাতাসে রেখে সে তার কথা বোঝাতে পারবে কিনা। কিন্তু তার চাইতে এ ভঙ্গিটা অনেক বেশি নিশ্চিত—দুই হাতে নিজেব বুক ছুঁয়ে, হাত দুটি বাঘারুর দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। এই ভঙ্গির দ্বিতীয় কোনো অর্থ হতে পারে না।

বাঘারু দু হাতে নাইলনেব দড়িটা ঝুলিয়ে অমূল্যর দিকে তাকিয়ে থাকে। সে অর্থটা বুঝতে চায়। বন্যাব তিস্তায় কোন ভঙ্গির কী অর্থ তা যেন আগে থাকতেই ঠিক হয়ে থাকে। এমন জলের মধ্যে যদি এমন সাক্ষাৎকার ঘটে যায় তা হলে সেখানে অর্থবিনিময়ে দেরি হওয়ার কথা নয়। কিন্তু তবু যে ঘটছে তার কারণ বাঘারুর আজীবন অর্থবোধহীনতা, এমন-কি অন্যের শরীরের ভাষা বোঝার অক্ষমতা, শবীরেরও অক্ষরজ্ঞানহীনতা। বাঘারু তার নিজের শরীর দিয়ে একটার পর একটা এমন কাজ করে যেতে পারে—যার অর্থ, একেবারে নিকট অর্থ, হয়ত তার কাছে ধরা পড়ে, বা, যারা দেখে তাদের কাছে হযত একটা দূবার্থও এসে যায়। এই যেমন, বাঘারুকে যখন গয়ানাথ গাছগুলোর সঙ্গে ভেসে যেতে বলেছিল, তখন, বাঘারুব কাছে তার অর্থ ছিল ফ্লাডের জল আর স্রোত আর ভাসমান ঐ চারটি গাছের সঙ্গে নিজেব শবীরটাকে জুড়ে দেয়া আর গয়ানাথ আসিন্দিরের কাছে তার অর্থ ছিল জল নেমে গেলেও গাছগুলো নিবাপদ থাকবে। এখন তার এই চারটে গাছের মধ্যে বানানো মাচানটাতে দাঁড়িয়ে বাঘারুর বর্ণপরিচয ঘটছে, অমূল্যর ইঙ্গিত বুঝতে-বুঝতে বর্ণপরিচয় ঘটছে। তাই এ সাক্ষাৎকারে এমন অকারণ দেবি ঘটে যাচ্ছে।

কিন্তু বিকেল আব-বেশিক্ষণ নেই। ঝুপ করে অন্ধকার শুরু হলে এখান থেকে তারা আর ওপারে যেতে পাববে না। বৃষ্টি বাতাস কিছুই কমে নি। তিস্তায় এখনো এত জল আসছে যে তা মাপার মত কোনো দিগন্তও চোখের সামনে নেই। আজ রাতে এখানে গাছের ডালে, বা টিনের চালে, বা এই নৌকায়, বা ঐ মাচানে থাকা যাবে না। সারা রাতের মধ্যে এ-সব ভেসে যেতে পারে। নরেশ আর অমূল্যব পক্ষে সেটা আরো কঠিন—ফ্লাড আসার আগে যারা নিরাপদে গাই-গরু-সংসার নিয়ে বাঁধে উঠেছে, তাদের এখন এই ভরা ফ্লাডের ভেতর নিজের চরের চালে বা নিজের চরের গাছের ডালে রাত কাটাতে হবে ? বাঁধেব ওপর থেকে এই জেগে থাকা গাছ আর টিনের চালগুলোকে কত আপন লাগছিল তাদের, আব সেই চব-ডুবনো এই জলরাশির ভেতরে ঐ গাছটাকেই, তাদের নিজেদের, চরের গাছটাকেই, কত অপরিচিত লাগছে। তিস্তার বন্যা যে তাদের সত্যি বসবাসহীন করে দিল—এটা বোঝার জন্যে কি এই বিকেলে কয়েকশ টাকার জন্যে নৌকো ভাসানো তাদের ঠিক হল ? নরেশ আর অমূল্য যখন এমনই গৃহকাতব ও অস্থিব হয়ে ওঠে তখনই অমূল্যর ভঙ্গির অর্থ বাঘারু বুঝে ফেলতে পারে। সে দড়ি ফেলে দিয়ে দুই হাত আকাশে তুলে তাদের আশ্বস্ত করে—আনছে, আনছে, তাদের এখানে আনছে। বাঘারু এ-কথার পর মাচানটা দেখে, তারপর চালের টিনটা দেখে।

একশ চুয়াল্লিশ

বাঘারু ও উদ্ধারকারীদল

বাঘারু চট করে একটা হিশেব করে নেয়। মাচান থেকে দড়ি জলে ফেললেই ওরা ধরে ফেলতে পারবে। তারপর সেই দড়িটায় টান দিয়ে-দিয়ে এই গাছগুলোর তলায় পৌঁছে যেতে পারে। কিন্তু এই

গাছগুলোর ডালপালা, এই মাচান কি চার-চারটি লোকের ভার বইতে পারবে ? ওরা এক সঙ্গে এর কোনো ডালে পা দিলেই ত সে ডাল ডুবে যাবে ! তার চাইতে টিনের চালটাতে ওদের তোলা যায় । সুপুরি গাছ দিয়ে ওরা চালে উঠে যেতে পারবে ।

বাঘারু ডাল বেয়ে-বেয়ে সুপুরি গাছটার কাছে গিয়ে সুপুরি গাছটাকে জড়িয়ে ধরে দু ধাক্কাতেই মাথায় উঠে যায়, তারপর একটু ঝুলে অশ্বিনী রায়ের চালে পা দেয় । যে-দড়িটুকু সে খুলেছিল, সেটুকু তার শরীর থেকে সেই জলের ওপরের শূন্যতায় ঝোলে, দোলে ও তার শরীরের গতির সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরপাক খায় ।

বাঁধের লোকজন দেখে সুপুরি গাছের ওপর থেকে লোকটা আবার অশ্বিনী রায়ের চালের ওপর নেমে এসেছে ।

'নাইমছে, নাইমছে,' চিৎকার ওঠে ।

'ক্যানং করি নামিবে, এতগিলা টাইম কায় পারে সুপুরি গাছের উপর বসি থাকিবার ? ভাল করি দেখ, নরেশুয়াখান ঐঠে উঠিছে নাকি ?' কেউ একটু সন্দেহ জানাতেই সবাই এই বাঁধ থেকে মাপার চেষ্টা করে টিনের চালের ওপর লোকটা নরেশ কি না ।

অফিসার দু পাশে ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কী ? এই লোকটাই ভেসে এসেছিল নাকি ?' কিন্তু তার কথার কোনো জবাব কেউ না-দেয়ায় সে আবার দু পাশে ঘাড় ঘুরিয়ে বলে, 'অ্যাঁ ?'

লিলিও এই একই প্রশ্ন করে রঘু ঘোষকে । রঘু ঘোষ ঘাড় না-ফিরিয়ে জবাব দেয়, 'তা আমি জানব কী করে ?' তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে যোগ করে, 'সেই লোকটাই কী না, তা দিয়ে তোমার দরকারই-বা কী ? তোমার ত ঐ চালে একটা লোক দরকার—সে যেই হোক না ।'

অফিসবাবু পেছনে বাঁধের ওপর থেকে ডাকেন, 'এই রঘুবাবু, কী বলছেন ? কে ওখানে ?'

রঘু ঘোষ হাত তুলে আঙুলগুলো ঘুরিয়ে দেয় ।

'না, না, কেডা কইছে নরেইশ্যা ? নরেইশ্যা ত ফুলপ্যান্ট পইর্‌য়া গিছে ? এই লোকটার ত নেংটি—' । কেউ একজন নিশ্চিত স্বরে জানায় ।

'এতডা জল ঠেইল্যা গেলে ফুলপ্যান্টও নেংটি হয়্যা যায়,' আর-একজন সেই নিশ্চয়তা মুহূর্তে ভেঙে দেয় ।

'তয় ; কাদাখোয়া হবা পারে,' আর-একটা নতুন প্রস্তাব আসে ।

এইবার আবার একটু সবাই চুপ করে যায় । এত দূর থেকে চালের ওপর লোকটার চলাফেরা আর দৈর্ঘ্যটাই কিছু বোঝা যাচ্ছে । কিন্তু নরেশও ত লম্বাই—যদিও এতটা লম্বা ঠিক মনে হয় না । তা হলে কাদাখোয়া হতেই পারে । কিন্তু লোকটি যে-ভঙ্গিতে চালের ওপর চলাফেরা করছে, হাত নাড়ছে সেটা কাদাখোয়ারই কিনা তা চিনে নেবার মত গভীর ভাবে কে কবে এখানে কাদাখোয়াকে কাজ করতে দেখেছে ? চালের ওপরের লোকটি কাদাখোয়াই কিনা এটা যাচাই করতে-করতেই এই ভিড়ের কাছে চেনা কাদাখোয়া অচেনা হয়ে যায় ।

'হবা পারে, কাদাখোয়া হবা পারে ।'

'কাদাখোয়া হবা পারে নরেশুয়াও হবা পারে ।'

'ঐ মানসিডাও হব্যার পারে । না হইলে রেসকু করবেনে কারে ?'

অফিসার দু পাশে ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'লোকটিকে পেয়েছে ত, নাকি ?' কিন্তু অফিসারের কথার কোনো জবাব কেউ দেয় না । অফিসার আবার ঘাড় ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'পেয়েছে নাকি ?'

বাঘারু টিনের চালের কিনারে এসে দাঁড়ায়, তারপর তার পেছনে নাইলনের যে-দড়িটা ঝুলছে সেটা টেনে-টেনে এনে জড়ো করে । এই দড়ির ত কোনো আগা নেই, সবগুলো গাছই দড়িতে-দড়িতে বাঁধা । বাঘারুর হাতে টান লাগে, আর-দড়ি আসে না । তখন সে ঐ সবটা দড়ি পা দিয়ে নীচে ফেলে দেয়, জলে । জলে পড়া মাত্রই দড়িটা অনেকগুলো দড়ির মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়েই সোজা হয়ে যায় । দড়ির মাঝখানের বৃত্তটা বড় হয়ে যায় । কিন্তু নরেশদের নৌকোর কাছে দড়িটা পৌঁছয় না । অমূল্য একটা লগি দিয়ে দড়িটা টেনে নেয় ।

নরেশ আর অমূল্য যেন বাঘারুকে উদ্ধার করতে আসে নি, বাঘারুই যেন তাদের উদ্ধার

করছে—অমূল্য এমন ভাবে দড়িটা টেনে পরীক্ষা করে। দড়িটাতে টান দিতেই তাদের নৌকোতেও টান লাগে, নৌকোটা চালের দিকে ঘোবে। কাদাখোয়া জিজ্ঞাসা করে, 'খুলি দিম ?' অমূল্যর সঙ্গে নরেশও দড়িটায় হাত লাগিয়ে আস্তে বলে, 'দে কেনে।' কিন্তু নরেশের কথায় কিছু একটা সংশয় ছিল। কাদাখোয়া দড়ি খোলে কিন্তু গাছ ছাড়ে না।

দড়িটা বিপরীত দিকে কিসের সঙ্গে বাঁধা তা ত আর ওরা জানে না, ফলে ওরা দড়িটাতে জোরে টান দিতে ভরসা পায না। যেখানে দড়িটা বাঁখা আছে সেটা যদি তাদের টানে খুলে যায় তা হলে স্রোতের একটা টানে নৌকোটা এমন ছিটকোবে, তারাও সে-রকম ছিটকে জলে গিয়ে পড়তে পারে। সেই ভয়ে তারা নৌকোব ওপর দাঁড়িয়ে জোবে-জোবে টেনে পবীক্ষা কবারও সাহস পাচ্ছে না। চালের ওপর থেকে বাঘারু চিৎকার করে, 'টানেন, টানেন, না-ছিড়িবে, না-ছিড়িবে,' কিন্তু সেটুকু বলেই বাঘারু বসে থাকে না, সে দড়ির আর-একটা দিক চালেব ওপর থেকে হাতে তুলে নেয. দড়িটাকে সমান করে নিয়ে জোরে টানে। সেই টানেব জোবে অমূল্য আব নবেশ বোঝে দড়ি খুলে যাবার কোনো ভয় নেই। 'খুলি দে, খুলি দে,' কাদাখোয়াকে নরেশ বলে।

কাদাখোয়া দড়িটা খুলতেই নৌকোটা গাছ থেকে সরে যায়, দড়িটা টানটান হয়ে পড়ে আর জলস্রোত এসে নৌকোর সামনে উছলে ওঠে। মাত্র কয়েক হাতের সেই দূবত্ব স্রোতের বিপরীতে যেতে তার সমস্ত জোর হাতে এনে দড়িটা ধরে টানে। কাদাখোযাও হাত লাগায়। কিন্তু তাদের তিনজনই বুঝে ফেলে স্রোতের বিপরীতে একটা হেঁচকা টানে এই দূবত্বটা পার হতে গেলে স্রোত ফুলে উঠে নৌকো উল্টে দিতে পাবে। তা ছাড়া, দড়িটাতে হাত লাগিযে শবীবটা ঝুলিযে দিযে যে-টান দেয়া যায়, তার জন্যে ত গোড়ালি বাখাব একটা জাযগাও দবকাব। এ নৌকোতে তেমন কোনো জাযগা নেই। স্রোতের মুখে নড়বড় কবতে-করতেও যে-নৌকো এ পর্যন্ত এসে গেছে, স্রোতের বিপরীতে সে-নৌকোর তলার তক্তা ফাঁক হযে যেতে পাবে।

কিন্তু মাত্র ত কয়েক হাতের ব্যাপার। তাই আস্তে-আস্তে টানলেও তারা ঐ গাছগুলোর কাছে পৌঁছে যায়। বাঘারু চালেব ওপব হুমড়ি খেযে তলাব বটমে হাত দিযে দড়িটা গুঁজে দেয়। কাদাখোয়া বাঘারুর গাছগুলোব একটা মোটা ডালে দড়িটা বেঁধে দিয়েও ডালটা ধরে থাকে।

সুপুরি গাছটা ধরার জন্যে এই গাছগুলোব একটা ডালে একটু পা দিতেই হয়। অমূল্য পা দিয়েই বোঝে, ঝোঁক দিলে ডালটা ডুবে যাবে। সে আলগোছে ডালে পা দিয়ে সুপুরি গাছটায যেন ঝাঁপিযে পড়ে। সুপুবি গাছ বেয়ে অমূল্য চালে নামতেই নরেশ তার লম্বা হাতে নৌকোব ওপর থেকেই সুপুরি গাছটাকে জড়িয়ে ধরতে পারে। ওবা দুজন নেমে গেলে নৌকোটা জলের ওপর আরো হালকা হয়ে যায। কাদাখোযা নৌকোব ওপর বসে-বসে এই ডাল ঐ ডাল ধরে নৌকোটাকে ডালপালার আরো ভেতরে নিয়ে যায। সেজন্যে তাকে বাঁধনটা খুলতেও হয়। নতুন বাঁধনে নৌকোটা আরো একটু ভালভাবে আটকা পড়ে। কাদাখোযা সামনে হেলে সুপুরি গাছটাতে হাত দেয়। কিন্তু কী মনে করে ঝাঁপ দেয় না—ধাক্কা দিয়ে হাতটা সরিয়ে আনে। তার ত চালের ওপব কোনো কাজ নেই, বরং এখানেই থাকুক, 'মুই এইঠে থাকি, নৌকোর ভিতবত্, এইঠে।' সে নৌকোর ভেতর বসে পড়ে।

একশ পঁয়তাল্লিশ

বাঁধের ওপর তর্কবিতর্ক

বাঁধের ওপর থেকে দেখা যায়—আরো দু-জন চালের ওপর নেমে এল। অমূল্যকে সবাই চিনে ফেলে—সবার চেয়ে খাটো বলে। কিন্তু যে আগে চালের ওপর দাঁড়িয়েছিল সে, নরেশ, না কাদাখোয়া, এ নিয়ে সন্দেহ ছিল। এখন, অমূল্যর সঙ্গে যে নামল, তাকে যদি নরেশ বলে ধরে নেয়া যায়, তা হলে আগের লোকটা ত কাদাখোয়াই হয়। তা হলে, যে-লোকটিকে উদ্ধার করার জন্যে এরা এখান থেকে নৌকো নিয়ে রওনা হল, সে লোকটা কোথায় ? সুপুরি গাছে চড়ে সে লোকটা কি সত্যি-সত্যি উধাও হয়ে গেল নাকি ?

'অ্যাঁ ? আরে, যে-মানুষডারে রেসকু কইরব্যার গেল, সেই মানুষডাই ত নাই, এহন অগরে রেসকু করার জন্যে আর একখান নৌকা ছাড়ো। অ্যাঁ ?'

কথাটা শুনে অফিসার ব্যস্ত হয়ে পড়ে, 'সে কী ? লোকটি নেই ? লোকটি নেই নাকি ? কী ? আপনারা লোকটিকে দেখতে পাচ্ছেন না ?'

পেছন থেকে একটা গলা শোনা যায়, 'চালের উপরত্ কয়খান মানষি দেখিছেন ?'

'দেখছি ত তিনজন, তিনজন', বলে অফিসার আবাব চালের দিকে তাকিয়ে মিলিয়ে নেয়, 'হ্যাঁ, তিনজনই।'

'এইঠে কয়ডা মানষিক নৌকাত্ করি ছাড়ি দিলেন ?' আবার প্রশ্ন।

'ওরা ত দুজন ছিল, আর-একজন ত এখান থেকে যাওয়ার কথা, সে গিয়েছে ত ?' অফিসাব একটু ব্যস্ত হয়ে এপাশ-ওপাশ ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করে। তার কথাতে সবাই একসঙ্গে হেসে ওঠে। হাসিটার কোনো অর্থ অফিসার বুঝতে পারে না, কিন্তু তার কথার সঙ্গে এই হাসির সম্পর্ক অনুমান কবে আবাব এদিক-ওদিক তাকায়। হাসিটা থামার পর জগদীশ বারুই বলে ওঠে, 'এইখান থিকা আপনাব চোখের সামনে কয়জনরে দেইখলেন নৌকা কইর্যা যাতে ?'

'তিনজন, তিনজন, তিনজনই ত ছিল—' অফিসার জগদীশ বারুইকে খুঁজতে-খুঁজতে জবাব দেয়।

'হয় ?' ঐ তিনজনই ছিল, তিনজনই, আছে,' জগদীশ বারুই বিড়ি টানে সশব্দে।

'তালই কি দেখব্যার পারতিছেন অগ ? তয় না শুনি আপনার ছানি পড়ছে,' খুব নিচু স্বরে কেউ বলে।

জগদীশ বারুই হাসতে গিয়ে কেশে ফেলে। তারপর, কাশিটা বাড়তে থাকে। বুক থেকে কফ তুলে কাশিটা শেষ। তারপরও জগদীশ বারুইকে গলা পরিষ্কাব করতে হয়। এর মধ্যে একজন বলে, 'ঐটা কাদাখোয়া। কাদাখোয়াই আগত্ চালে উঠিছে, নরেশুয়ার গাওত ত জামা আছে—'

'হয়, হয়, নরেশুয়া, অমূল্যা, কাদাখোয়া—এই তিনো মানষি। আর সেই মানষিডা নাই।' কথাটা প্রায় সিদ্ধান্তের মত শোনায়।

'অ্যাঁ ? লোকটা নেই ? যাকে রেসকিউ করতে গেল, সেই লোকটাই নেই ? আর আপনাবা এখানে এমন চেঁচামেচি শুরু করলেন যেন ওখানে কত লোক ভেসে এসে উঠেছে। তারপর আবার হাজাব টাকা-দেড় হাজার টাকা নিয়ে দর্ কষাকষি শুরু করলেন। এখন ত আমাকে এক্সপ্ল্যানেশন দিতে হবে—লোক না দেখে নৌকো পাঠালাম কেন ?' বলতে-বলতে অফিসার সরে আসে আর রঘু ঘোষকে দেখে তার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে চিৎকার করে, 'কী মশাই ? আপনারাই ত বাগান থেকে ফোনের পব ফোন করলেন যে লোক ভেসে আসছে। এখন লোক কোথায় ? দিন—'

রঘু ঘোষ হে-হে করে হেসে ওঠে, 'আরে, আপনি আমার ওপর রাগারাগি করছেন কেন ? আমি কী করলাম ?'

'আপনারাই ত বাগান থেকে ফোন করেছেন—সকালে একবার, বিকেলে একবার।'

'সে ম্যানেজারবাবুকে বলুন', রঘু ঘোষ দায়িত্ব অস্বীকার করে, 'এখানকার লোক গিযে বলেছে তাই ফোন করা হয়েছে।'

'তাই বলে না দেখে ফোন করবেন নাকি ?'

অফিসারের সঙ্গে রঘু ঘোষের কথাবার্তা শুনে বাগানের লোকজন পায়ে-পাযে একদিকে জড়ো হতে শুরু করে—গুদামবাবু, অফিসবাবুর বড় শালী, লিলি, গোপা, আরো দু-একজন। গুদামবাবু জিজ্ঞাসা করে, 'কী ? কী হয়েছে ?'

রঘু ঘোষ একটু সরে এসে বলে 'আরে, ওখানে লোক পাওয়া যায় নি সেটা কি আমাদের দোষ ? ফ্লাডের সময় কেউ যদি এসে বলে নদী দিয়ে লোক ভেসে যাচ্ছে, ফোন করে দিন, তা হলে আমরা কী করব, ফোন করব না ?'

লিলি আস্তে বলে, 'অত চেঁচাচ্ছ কেন ?'

গুদামবাবু বলে, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওঁদের কিছু বলার থাকলে হেড-অফিসে জানান, আমাদের বলে কী লাভ ?'

অফিসবাবুর বড় শালী বলেন, 'চলুন, চলুন, এখন ফিরে চলুন।'

এদিকে বাগানের বাবুদের ও বাবুদের বাড়িব মেয়েদের এক জায়গায় জড়ো হয়ে এ-রকম কথাবার্তা বলতে দেখে বাগানের যে-কুলিকামিনরা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিল, তারাও এসে এখানে দাঁড়ায়। তাদের মধ্যে একজন একটু এগিয়ে এসে রঘু ঘোষকে জিজ্ঞাসা করে, 'কী, হোগেলাক হে, অফিসবাবু !'

রঘু ঘোষ তার দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে হেসে বলে, 'তোরা আবার কোত্থেকে এসেছিস ? যা—'

'তা তুইও চলেক—' একটা মেয়ে পেছন থেকে বলে ওঠে, 'হে বৌদি, অফিসবাবুকে লিগেলাক্ ?'

'কে রে ?' বলে রঘু ঘোষ হাসতে-হাসতে মেয়েদের দলটার দিকে চোখ পাকায়। অফিসার ততক্ষণে ভিড়টার পেছনে চলে গেছে। সেখানে দেখে জগদীশ বারুই আর অশ্বিনী রায় বোল্ডারের ওপর উবু হয়ে বসে বিড়ি খাচ্ছে আর মাঝেমধ্যে ঘাড় উঁচু করে ভিড়ের পেছনটা দেখছে। অফিসার তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলে, 'এই যে আপনারা এখানে ! তখন ত খুব বললেন, কত লোক ভেসে আসছে, এখনি নৌকো পাঠাতে হবে, মিলিটারি চাই। মিলিটারি এলে ত আপনাদেরই এখন জলে ভাসাত—'

অফিসার দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বলছিল, ফলে, জগদীশ বারুই আর অশ্বিনী রায় বোঝে না কথাটা তাদেরই বলা হচ্ছে। তারা বিড়ি খেয়েই যায়। জগদীশ বারুই একবার মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করে, 'কীরে, কিছু হইল নাকি ?'

অফিসার বলে ওঠে, 'হবেটা আবার কী ? লোক থাকলে ত আনবে। লোক না থাকলে কোত্থেকে আনবে ? আর আপনারা এদিকে ত বলছিলেন কত লোক ভেসে আসছে—'

অশ্বিনী রায় ঘাড় তুলে অফিসারকে দেখে উঠে দাঁড়ায়। জগদীশ বারুই অশ্বিনীকে দাঁড়াতে দেখে ঘাড় তুলে দেখে—তারপর সেও দাঁড়ায়। অশ্বিনী রায় একটু সরে যাওয়ার চেষ্টা করে ! জগদীশ বারুই তার হাত ধরে টেনে অফিসারকে জিজ্ঞাসা করে, 'কী কন ?'

'বলছি, তখন ত খুব লোক ভাসাচ্ছিলেন, এখন ত ওখানে একটা লোকও পাওয়া যাচ্ছে না। মিলিটারি এলে কী হত ?'

'সে কী হইত, আপনারা জানেন। লোক না থাইকলে কি লোক পয়দা কইর‍্যা ভাসায়্যা চালের উপর থুইয়্যা আইসব নাকি ? তাও ত দশমাস লাইগব। সকাল বেলায় জ্বলজ্যান্ত মানুষডারে সগগলে দেইখল চালের উপর, আর, সুপুরি গাছে চইড়্যা গেল কুথায় ? সেইডা জিগান না ?'

'গেল কোথায়, সেটা কি আমি খুঁজে বের করব নাকি ?' অফিসার রেগে সরে যায়। ও-রকম রেগে-রেগে অফিসার ক্রমেই ভিড়টার পেছনে সরে এসেছিল। সে প্রায় বাঁধের নীচে গিয়ে দাঁড়ায়। তার দাঁড়ানোর ভঙ্গিতেই একটা ইতস্ততের ভাব ছিল, যেন সে বাঁধ বেয়ে উঠে, ওদিক দিয়ে নেমে গিয়ে জিপে চড়ার একটা উপলক্ষ খুঁজছে। কিন্তু সেটা ঠিক পেরে উঠছে না।

অফিসার আবার ভিড়টার মধ্যে এসে, দু-একজনকে সরিয়ে সামনে এগিয়ে যায়। তখন দেখা যাচ্ছে, সেই টিনের চালের ওপর ওরা তিনজন মিলে কথাবার্তা বলছে। অমূল্য চালের একদিকে বসেই পড়েছে, আর নরেশ-কাদাখোয়া কথা বলে যাচ্ছে। কথা বলাটা বোঝা যায়, দু জনের দাঁড়ানোর ও হাত-পা নাড়ার ভঙ্গি থেকে।

'অমূল্যা করে কী ঐখানে বইস্যা-বইস্যা ?'

'কাদাখোয়ার তানে এ্যাত কথা কী কছে নরেশুয়া ?'

এই দুটি জিজ্ঞাসা নিয়ে এ-পাড়ের ভিড় খুব বিব্রত হয়ে ওঠে।

একশ ছেচল্লিশ

শীর্ষ বৈঠক

চালের ওপর নেমে নরেশ বাঁধের দিকে তাকায়। বাঁধের ওপর থেকে এই চালটাকে যত কাছে মনে হচ্ছিল, চালের ওপর থেকে বাঁধটাকে তত কাছের ত লাগেই না, একটু যেন দূরের লাগে। বাতাস আর বৃষ্টির কুয়াশায় আর তিস্তার জলস্রোতের শীকরে এই দূরত্বটার মধ্যে একটা পর্দার মত তৈরি হয়েছে ত বটেই, যেমন হয় ভোর রাতে, কিন্তু তা ছাড়াও বাঁধটাকে যেন দূরেরই ঠেকে, নরেশের। একটু ঠাহর

করতেই সে ভিড়টাকে প্রায় চিনে নিতেই পারে, এমন কি, আর-একটু নজর করলে লোকজনকেও চিনতে পারে—তবু অশ্বিনী রায়ের চালের ওপর উঠে নরেশ বাঁধটাকে আর কাছের দেখে না। অথচ, অশ্বিনী রায়ের যে-ঘরটা এখন জলের তলে, যে-সুপুরি গাছগুলো জলের ওপর শুধু মাথাটা তুলে জেগে আছে, সেই ঘর, সেই সুপুরি গাছের পেছন দিয়ে, তলা দিয়েও, নরেশ ত তার এই এতগুলো বয়স ধরে সামনের এই বাঁধটাই দেখে এসেছে। তার জন্ম যদিও এখানে নয়, কিন্তু এই চরটাতেই ত জোয়ান হয়ে উঠেছে সে। বাঁধের ওপর থেকে এই চরটার দিকে সারা জীবন যতক্ষণ তাকিয়েছে নরেশ, তার চাইতে অনেক বেশিক্ষণ তাকিয়ে থেকেছে চর থেকে বাঁধটার দিকে। অথচ, এখন নরেশের মনে হয়—বাঁধটাতেই তার বাড়িঘর, কত তাড়াতাড়ি সেখানে ফিরে যাবে! অশ্বিনী রায়ের বাড়ির সামনেব রাস্তা থেকে নরেশের বাড়ি দেখা যায় না। অশ্বিনী রায়ের চাল থেকে কি দেখা যেত? নরেশ একবার বাঁধের দিকে পেছন ফিরে জলের তলার এই চরে তার বাড়ি যেদিকে থাকার কথা, সেদিকে ঘোলা জলের ওপর দিয়ে তাকিয়ে জলের তলায় যে-সব গাছ, বাড়ি, বাগান, গোয়ালবাড়ি ডুবে আছে সেগুলোকে একবার দেখে নিতে চায়। অশ্বিনী রায়ের বাড়ি আর তাদের বাড়ি আলাদা পাড়ায়। মাঝখানে একটা ছোট খালও আছে। দেখা না-যাওয়ারই কথা। কিন্তু নরেশদের ঘরটা খুব উঁচু—তাব টিনের চালটা হয়ত দেখা যেতে পারে। নরেশ দেখে—চারিদিকে ধু ধু করছে শুধু জল। এখন যদি নরেশকে জলের তলায় নিয়ে গিয়ে তার বাড়ি খুঁজে নিতে বলে কেউ, নরেশ পারবে না। বাঁধের ওপর থেকে এই জল দেখেও মনে ভরসা থাকে যে জল নেবে গেলে চরে ফিরবে। কিন্তু এখানে এই চরেবই ওপর দাঁড়িয়ে সে-রকম কোনো ভরসা ত নরেশ পায়ই না, বরং বাঁধটাব দিকে তাকিয়ে সে ফিরে যাওয়াব একটা তাড়া বোধ করে। একটু ভয়ও যেন পায়। নরেশ বাঘারুকে জিজ্ঞাসা কবে—'তুমিই সকালে এই চালে উঠছিল্যা না?'

'হয়।'

'তারপর সুপুরি গাছে উইঠ্যা ভ্যানিস? আর নামার নাম নাই।'

'গাছত্ আছিল্।'

'আর, আমরা ভাবত্যাছি তুমি মানুষ, না ফ্লাডেব ভূত। এ্যাহন চলো, চলো।'

'কোটত যাম?' বাঘারু সোনালি দড়ি গুছোতে-গুছোতে বলে।

'ঐঠে, বাঁধে যাব্যাব নাগবে। আমরা ত তোমাক এসকু কইরব্যাব আসছি।'

'মুই না যাও', বাঘারু তাদের দিকে পেছন ফিরে বলে। নরেশ রেগে যায়, 'না-যাও কি? তোমার বাবার আহ্লাদ। যাব্যার লাগব। তোমাক্ এসকু করিবার তানে নৌকা নিয়্যা ড়ুইবতে-ড়ুইবতে আসছি, আর এ্যাহন না যাও! চলো—' নরেশের গলায় একটা বিরক্ত হুকুমের স্বর আসে বটে কিন্তু সেই স্ববে কোথায় যেন এই প্রস্তুতিও ধরা পড়ে যায় যে নরেশ যেন জানত, বাঘারু যেতে চাইবে না।

অমূল্য অশ্বিনী রায়ের চালের ওপর বসে পড়েছিল, বাঁধের দিকে মুখ কবে। অমূল্যদেব বাড়ি অশ্বিনী রায়ের বাড়ির পশ্চিমে, বাঁধের আরো সামনে, একটু কোনাকুনি, কিন্তু আলাদা পাড়ায়। অমূল্য নিজের সেই বাড়ির দিকে মুখ করেই বসে ছিল। অশ্বিনী রায়ের এই চালটা ভেসে থাকবে, সেখানে তাবা এসে উঠবে ও বসবে, অথচ অমূল্যর বাড়ির, অত বড় বাড়ির, একটা মাথাও দেখা যাবে না, সমস্তটা জুড়ে শুধু ঘোলা জল আরো ঘোলা জল উথলে বয়ে যাবে—এর ভেতর একটা অবিচার আছে, অমূল্যর ওপব একটা ব্যক্তিগত অবিচারই যেন। অমূল্যর ঘরজমির যে কোনো ইশারা পর্যন্ত পাচ্ছে না অমূল্য তাতে অন্যদের বাড়িঘর জমিজিরেত যেন ডাঙা হয়ে ওঠে। যেন, আর-কারোই কিছু ডোবে নি, যা ডোবার তা এক অমূল্যরই ডুবল! অশ্বিনী রায়ের চালে উঠে যেমন বাঁধ দেখছে অমূল্য, সে-রকম ত নিজের চালের ওপর বসেও দেখতে পারত—তাতেও বোঝা যেত, তার বাড়িটা আছে। কিন্তু যে-চরটায় তাদের বাড়িঘর, সেই চরটাতেই দাঁড়িয়ে বা বসে তারা শুধু জলই দেখে চারদিকে, সেই এক ঘোলা জল, এমন-কি আকাশ থেকে যেন সেই ঘোলাটে বৃষ্টিই হচ্ছে। অমূল্য বিরক্ত হয়ে চিৎকার করে ওঠে, 'না-যায় ত যাক, চল, আমি আর থাকইব না—'

নরেশ অমূল্যর দিকে তাকিয়ে কী বুঝে নেয়, তারপর গলার স্বর নীচে নামিয়ে বলে, 'কস কী? এডারে নিয়্যা না গ্যালে তরে টাকা দিব কেডায়?'

'না দিক। কেডায় জানত এডা এহানে আছে—'

'না-জানতি ত আলি ক্যা ?'

'তুই টাকার তাল তুললি, শালা। টাকা ? দেহিস না চাইরপাশে ? তিস্তার তলে তর খাড়া জমিতে বালুবাড়ি হবাব ধইরছে।'

নরেশ বাঘারুকে বলে, 'এই দেউনিযা শুনেন—'

বাঘারু ততক্ষণে সোনালি দড়ি গুছিযে ফেলেছে। সে নরেশের দিকে তাকিয়ে বলে, 'মুই দেউনিয়া না হই। গয়ানাথা জোতদার মোর দেউনিয়া।'

'তোমবালাব ঘব কোথায ?'

'ঐ' বাঘারু যে-তিস্তা পেরিয়ে এসেছে, সেই পুবো তিস্তাটাকেই দেখায়। নবেশ ভেবেছে সে কিছু দেখাচ্ছে। তাই, বাঘারুব অঙ্গুলিনির্দেশে ঘাড ঘুরিয়ে সেই একই জল দেখে ঘাড় ফিরিয়ে বলে, আরে, 'তোমাব গাঁও কুথায় ?'

বাঘারু সেই একই তিস্তার ওপব দিয়ে হাত ঘুবিযে আনে—'ঐঠে।'

নবেশ আবার চুপ কবে কিছু ভাবে। তাবপর বাঘারুকে বলে, 'জলে ভাইস্যা গিছে তোমাগ গ্রাম ?'

বাঘারু ঘাড নাডায়, না, ভাসে নি।

'তা, তুমি ভাইস্যা আইল্যা কোথ্‌থিক্যা মণি ?'

'গয়ানাথব ফরেস্টত তিস্তা ঢুকি গিছে।'

'তয় ?'

'গাছ ভাঙি গিছে।'

'তয ?'

'গয়ানাথ গাছগিলাক আব মোক ভাসি দিছে।'

'তয ?'

'হামবালা ভাসি আসিছু।'

'আসিছু ত আসিছু। বাবা, এহন বাঁধে যাবার লাগব ! অফিসার আইসছে। আমাগো পাঠাইছে। চলো, চলো'—নবেশ একটু এগিযে বাঘারুর হাত ধরে। বাঘারু বাধা দেয না। নরেশ হাত ধরে টানে, বাঘারু নডে না। নরেশ হাত ছেডে দেয, বাঘারুব হাতটা পডে যায়।

'গযানাথ কহিছে, বাঘারু, গাছগিলাব নগত ভাসি যা, য্যালায় বানা কমিবে তক খুঁজি নিম।'

'তা তোমাব গাছগুল্যা নিয্যাই চলো বাবা—ঐখান থিক্যাই তোমার দেউনিয়া তোমাক খুঁজি নিবে।'

বাঘারু চুপ করে বাঁধের দিকে তাকায়। এই যুক্তিটা তার ভাল লেগে থাকতে পারে যে বাঁধের ওখানেই গযানাথেব পক্ষে তাকে খুঁজে বেব কবার সুবিধে। আবাব, ঐ পশ্চিম দিকে তাকিয়েই সে হয়ত বাত্রিব আসন্নতা বুঝতে পাবে। বাঁধ, বাঁধের মানুষজন, কিছু চলাফেরা—এ-সব তাকে টেনে থাকতেও পাবে।

নবেশ বলে, 'চলো, চলো, গাছগিলা নিয়্যাই চলো, চল্ অমুইল্যা।'

অমূল্য উঠে দাঁডায়। তারপব নরেশ সুপুরি গাছের দিকে এক পা বাড়ায়। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে, বাঘারু নডে না।

একশ সাতচল্লিশ

কাদাখোয়ায় নৌচালনা

নরেশ ঘুরে দাঁড়িয়ে বিরক্ত হয়ে বলে, 'কী হইল ?'

বাঘারু বাঁধের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, 'না যাম। মুই এইঠে থাকিম।'

নরেশ গলা আরো তুলে বলে, 'আরে তোমাক্ ত তোমার দেউনিয়া কইছে যেইখানে ঠেইক্যা যাবি সেইখানে গাছগুলো নিয়্যা থাকবি, তক আমরা খুঁইজা নিব। এই কইছে ত ?'

'হয়। কহিছে।'

'তা, তোমার দেউনিয়া আসি যদি ঐ বাঁধের উপব খাড়ায় আর তুমি যদি তোমাব ঐ গাছের মাচানেব উপর বইস্যা থাক, তমার দেউনিয়া তোমাক দেইখবে ক্যামন কইব্যা ?'

বাঘারু বাঁধ থেকে চোখ সরিয়ে নরেশের ওপর আনে। নরেশ তার চোখ দেখে অনুমান কবে—এই যুক্তিটা যেন তার মনে ধরছে। সে যুক্তিটাকে আব-একটু জোর দিতে চায।

'তোমার দেউনিয়া তোমাক বাঁধ দিয়্যা খুঁইজব না জল দিয়্যা খুঁইজব ?'

'বাঁধত খুঁজিবে।'

'তা বোঝ ত সবই, কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা। বাঁধ দিযা খুঁইজব ত বাঁধে চলো। এহানে খাবাড়া কী ? দেউনিয়া চিড়ামুড়ি কিছু দিছে ?'

'নাই রো।'

'সারাদিন কিছুই খাও নাই ?'

'নাই রো।'

'খিদ্যা পায় নাই ?'

'হয়।'

নরেশ অমূল্যর দিকে তাকায। তাবপব নবেশ আব অমূল্য দুজন এক সঙ্গে বাঘারুব দিকে তাকায। তারা বুঝে ফেলে—ঐ দেউনিযা গাছগুলোকে বাঁচানোর জন্যে এই লোকটাকে গাছেব সঙ্গে ভাসিযে দিয়েছে। যদি এখানে না ঠেকত তা হলে লোকটা আরো দূবে-দূবে ভেসে যেত। এই ফ্লাডেব তিস্তা থেকে সে এক আঁজলা জলও ত পেত না। বাঘারুর দিকে তাকিয়ে এতক্ষণে নবেশ আব অমূল্য তাকে উদ্ধার করার জন্য আবেগ বোধ করে—জলে ভাসা ক্ষুধার্ত একটা মানুষকে উদ্ধার কবাব আবেগ। অফিসারটা এসে গেল বলে না-হয় নরেশ টাকাব কথা বলেছে। কিন্তু অফিসাবটা যদি না আসত আর এই লোকটাকে যদি এই চালের ওপর তাবা বসে থাকতে দেখত, তা হলেও, তাবা ঐ নৌকো নিযে এ-রকমই বেরিয়ে পড়ত। অমূল্য চালের ওপর দিয়ে হেঁটে, নবেশকে পেবিয়ে, বাঘারুর কাছে যায। তারপর বাঘারুর হাত ধরে বলে, 'চলেন ত। এইঠে জলেব মইধ্যে বইস্যা-বইস্যা শুখায্যা মইববেন নাকি ? চলেন। রাইতটা থাকেন। খান। ঘুমান। তারপর না হয় আপনি আপনার গাছ নিয়্যা ভাইস্যা যাইবেন।'

'ভোখ পাইছে, কিন্তু ঐঠে ত অফিসার আছে।'

'আরে, শুনেন, আমরা এই চরের মানষি। এই চরে আমাদের খেতি-ঘব সব—' অমূল্য বলে।

'চরুয়া ?'

'হয়, হয়, চরুয়া। এই যে-চালডার উপর খাডায্যা আছেন—এইডার যে-মালিক স্যায ঐ বাঁধে আছে। আমার বাড়িখান ঐ দিকে। এর বাড়িখান ঐ দিকে। ফ্লাডের জইন্যে আমবা সব গিয়্যা ঐখানে বাঁধে উঠছি। আমরা কব, আপনি আমাগ মানষি, চরে আটক্যা পডছিলেন, আমবা তুইল্যা আনল্যাম, ত অফিসার করব কী ?'

'গাছগিলা ? গয়ানাথ দেউনিয়ায় নখত অফিসারের ঝগড়া কাজিযা।'

নরেশ হেসে ওঠ, কিছুট অকৃত্রিম, কিছুটা বানানো, 'তিস্তার বানাভাসা গাছেব আবার আফিসার আছে নি ? আরে চলেন ত !' নরেশ গিয়ে বাঘারুর সেই হাতটাই ধবে যেটা অমূল্য ধবেছিল।

বাঘারুকে এমন হাত ধরে টানাটানি করে কেউ কোথাও কখনো সাধে নি। তার সন্দেহটাও সেখানেই। কিন্তু তার খিদেটা বড় বেশি সত্য হয়ে উঠছে। রাতটা কাটানোর পক্ষে এই জলের চাইতে ঐ বাঁধ নিশ্চয় ভাল। তা ছাড়া সে ত গাছগুলো নিয়ে যে-কোনো সময়ই ভেসে যেতে পারে। বাঘারু পা বাড়ায়।

নরেশ বাঘারুর হাতটা ছেড়ে দিয়ে আগে সুপুরি গাছে যায। অমূল্য বাঘারুর হাতটা ধবেই ঘোরে, যেন, পেছনে মাঠ আছে, ছেড়ে দিলে বাঘারু দৌড়ে পালাবে। সুপুরি গাছের সামনে এসে অমূল্য বলে, 'নামেন আগে।' বাঘারু হাতের ইশারায় অমূল্যকে নামতে বলে। অমূল্য সুপুরি গাছে ঝাঁপ দেয়। নীচে নেমে চেঁচায়, 'নামেন এহন।' বাঘারু সুপুরি গাছে ভর দেয়। বাতাসে সুপুরি গাছটা এত বেশি দোলে যে বাঘারুর শরীরের ওজনে সেটা আর নতুন করে দোলে না।

নীচে নেমে এখন সমস্যা হল—গাছ আর নৌকো নিয়ে চারজন কী করে যাবে। নৌকো করে চারজন চলে যেতে পারত—গাছগুলো এখানে রেখে। কিন্তু নরেশ বা অমূল্যর সেটা বলার সাহসই হয় না। বাঘারুর গলায় সেই নাইলনের দড়ির বান্ডিল—যে-দড়িতে এই গাছগুলোর সঙ্গে বাঘারু আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। কিন্তু হাতে আর-সময় নেই। তাদের এখনই ভাসতে হবে। এখান থেকে তারা ত আর সরাসরি উল্টো দিকে যেতে পারবে না—স্রোতের মুখে তাদের কোনাকুনি ভাসতে হবে—তারপর ওপারে যেখানে গিয়ে ঠেকে। সেখান থেকে আবার পাড় দিয়ে নৌকো টেনে বাঁধের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

'হে কাদাখোয়া—এই গাছগিলা কি নৌকাত বান্ধা যাবে?' নরেশ জিজ্ঞাসা করে।

'না হয়! নৌকাত গাছের ধাক্কা নাগিলে ডুবি যাবে', কাদাখোয়া বলে।

'তোমরালা নৌকাত যাও কেনে, মুই গাছত যাছি,' বলে বাঘারু আলগোছে তার মাচানে উঠে যায়। সেই মুহূর্তে এটাকে একমাত্র উপায় মনে হয়। নরেশ আর দেরি না করে বলে, 'তা গাছ ছাড় আগে, কুথায় তোমার নোঙর বাইন্ধছ?' নরেশ হেসে ফেলে। বাঘারু একটা গাছের ডাল থেকে দড়ির পাক খুলতে হাত দেয়। নরেশ খোঁজে আর-কোথায় বাঁধন আছে—দেখে, অশ্বিনী রায়ের চালের টঙে। 'হে কাদাখোয়া, খোল কেনে, ঐখান খোল্।'

কাদাখোয়া তাকিয়ে একবার দেখে। তারপর গাছের ডালে-ডালে সে ওপরে উঠে যায়। কাদাখোয়া আর বাঘারু দুজনের ওজনে গাছগুলো দুলে ওঠে, দুলতে থাকেও, কিন্তু ডোবে না। মনে হয় যেন ওরা দুজনই ভাসমান গাছগুলোর ডালে ওঠার সময় নিজেরা মাধ্যাকর্ষণের টান অতিক্রম করে গেছে। নীচের নৌকোয় দাঁড়িয়ে নরেশ আর অমূল্য বাঘারু আর কাদাখোয়ার শরীরের চেহারার মিলটাও আবিষ্কার করে। আপাদমস্তক নগ্ন শরীর থেকে তাদের হাতগুলো ডালের মত আকাশে উঠে যাচ্ছে আর নেমে আসছে।

দুদিকের বাঁধন খোলা সত্ত্বেও গাছগুলো নড়ে না। বাঘারু নীচে নেমে এসে কাদাখোয়াকে বলে, 'ঐঠে একখান আছে, ঐ নৌকাখানের কাছত।' কাদাখোয়া সেই তলার বাঁধনটা খোঁজে, পায় না। বাঘারু ততক্ষণে উল্টোদিকের নীচের বাঁধনটা খুলে দিতে শুরু করেছে। আর সেই বাঁধনটা ঢিলে হওয়া ও খোলার সঙ্গতিতে গাছের বহর স্রোতের টানে নড়ে ওঠে।

কাদাখোয়া বলে ওঠে, 'নাই রো।' বাঘারু, 'খাড়ান কেনে,' বলে তার বাঁধনটা খুলে দেয়। গাছের বহর স্রোতের টানে অশ্বিনী রায়ের ঘরের সঙ্গে লেগে যায় আর সেই ধাক্কায় নৌকোটা যেন গাছগুলোর ভেতর ঢুকে যায়। বাঘারু আবার ডালে-ডালে এদিকে চলে আসে। নরেশ আর অমূল্য নৌকাতেই দাঁড়িয়ে ছিল লগি হাতে। কাদাখোয়াকে বাঘারু বলে, 'নৌকাত যান, এটা খুলি[illegible] ত সোতের মুখে ভাসি যাবে।' কাদাখোয়া নৌকায় যায়। নৌকাটা গাছগুলোর এত ভেতরে সেঁদিয়ে গেছে যে এই গাছগুলো ভেসে গেলে নৌকাটা কী করে যাবে, ঠিক বোঝা যায় না।

হঠাৎ কাদাখোয়া বলে ওঠে, 'খাড়ি যান, খাড়ি যান।'

বাঘারু দাঁড়িয়ে পড়ে। কাদাখোয়া নৌকোর বাঁধনটা খুলে দেয় আর স্রোতের ধাক্কায় নৌকোটা গাছগুলোর ভেতর সেঁদিয়ে গিয়ে আটকে যায়, এমন, যেন ওটাও একটা গাছ। নরেশ একটু ভয় পেয়ে বলে ওঠে, 'হে কাদাখোয়া দেখিস কেনে, গাছ চাপা পইড়লে নৌকা ত ডুইব্যা যাবে নে।'

কাদাখোয়া কোনো জবাব দেয় না। সে নৌকোটাকে আরো একটু ঠিক করে নিয়ে অমূল্য আর নরেশকে বলে, 'লগি ধরেন, লগি ধরেন।' নরেশ আর অমূল্য লগি ধরলে কাদাখোয়া বাঘারুকে বলে, 'খুলেন কেনে, খুলে-ন।'

এদিকের বাঁধনটা যেখানে দেয়া ছিল, জল বেড়ে যাওয়ায় সেটা জলের তলায় চলে গেছে। বাঘারুকে একটা ডাল বা হাত ধরে, ঝুঁকে ডান হাতে জলের তলার ঐ বাঁধনটা খুলতে হয়। প্রথম গিঁঠটা খুলতেই স্রোতের তোড় গাছের বহরকে একটু টেনে নেয়। বাঘারু বাঁ হাতের ডালটা শক্ত করে ধরে একটা হ্যাঁচকা টান মারতেই গাছগুলো স্রোতের মুখে ভেসে যেতে গিয়ে আটকে যায়, ঘরের কোনায় একটা গাছের বড় ডাল আটকে গেছে। বাঘারু সেটা খোলে না। বরং সেই সুযোগে সে নৌকোর ওপর চলে আসতে পারে। আর, সেই ঝাঁকিতেও বটে, স্রোতের টানেও বটে, অশ্বিনী রায়ের গুয়াবাড়ির নোঙর ছেড়ে সেই বহর ঘোলাটে আকাশের নীচে তিস্তার ঘোলাটে স্রোতে উচ্ছন্ন বেগে ভেসে যায়। বাতাসের বিপরীত ধাক্কায় গাছের পাতায়-পাতায় এক ভাসমান ঝড়ের অলৌকিকতা সঞ্চারিত হয়।

'লগি মারেন, লগি মারেন', হাঁকতে-হাঁকতে কাদাখোয়া তার লগিটা নিয়ে বাঘারুর গত রাত্রির অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে পাওয়া অভিজ্ঞতা আত্মসাৎ করে বেড়ালের মত পায়ে বাঘারুর মাচানে গিয়ে ওঠে আর সেইখান থেকে শুধু তার বাঁয়ে লগি মারতে থাকে, এবার আর আগের মত বর্শা দিয়ে জল বিঁধবার মত করে নয়, লগিটা মেরে ঠেলছিলও একটু। বারকয়েক লগি মেরেই কাদাখোয়া চেঁচায়, 'এই গাছুয়ামানষিখান, উঠি আসেন, এইঠে, উঠি আসেন।' বাঘারু নৌকো থেকে ডালে-ডালে তার মাচানে চলে যায়। 'এইঠে লগি মারেন, লগি মারেন', বলে কাদাখোয়া তার লগিটা বাঘারুর হাতে ধরিয়ে দেয়। বাঘারু লগি মারতে থাকে, কাদাখোয়া দাঁড়িয়ে সামনে তাকায়। যেন—গয়ানাথের এক বাঘারু এখন দুটো মানুষ হয়ে গেছে, তিস্তার ওপরে ঐ গাছের মাচানে তাদের এতই মিল।

আসলে, যে-হিশেব কষে কাদাখোয়া হঠাৎ নৌকোটাকে গাছগুলোর মধ্যে সেঁদিয়ে দিয়েছিল সেটা অদ্ভুত মিলে গেল। এতগুলো গাছ এমন জড়ো করে বাঁধা যে জলস্রোত গাছের ভেতরে পুরো জোরে লাগে না। সেই গাছগুলোর ঢাকনায় নৌকোতে নরেশ আর অমূল্য লগি মারার এমন সুযোগ পায় যাতে স্রোতের ভেতরেও এই বহর স্রোতটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ক্রমাগত বাঁয়ে লগি মারায় ওরা খুব বেশিদূর ভেসে না গিয়েই কোনাকুনি বাঁধের দিকে যেতে থাকে। 'ইস্, আর-একখান লগি থাকিলে সিধা পার হওয়া ধরিতাম হে', কাদাখোয়া তিস্তার ঘোলা স্রোতের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলে।

একশ আটচল্লিশ

সন্দেহ ও সংশয়

বাঁধের ওপর থেকে দেখা যায়, অশ্বিনী রায়ের চাল থেকে অমূল্য, নরেশ আর কাদাখোয়া সুপুরি গাছে চড়ার একটু পরে সেই গুয়াবাড়ির দক্ষিণ দিয়ে নৌকোর বদলে একটা বিরাট গাছের বহর নদী দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। নৌকোটা গাছগুলোর এত ভেতরে যে বাঁধ থেকে দেখা যায় না। এমন-কি, কাদাখোয়া আর বাঘারু যে মাচানের ওপর দাঁড়িয়ে, সেটাও গাছের ডালপালায় আড়াল হয়ে থাকে। বন্যার সময় তিস্তা দিয়ে এ-রকম গাছ ত ভেসে যেতে পারেই, কিন্তু ওরা চাল থেকে সুপুরি গাছে উঠল আর তারপরই ঐ ফাঁক থেকে নৌকোর বদলে বেরল গাছের এই প্রকাণ্ড বহর—তাতেই সবার নজরে পড়ে যায়। তাও নজরে পড়ত না যদি গাছগুলো অশ্বিনী রায়ের গুয়াবাড়ির ফাঁকটা দিয়ে সোজা চলে যেত। কিন্তু সোজা বেরিয়েও গাছগুলো ঐ স্রোতটা থেকে আড়াআড়ি কোনাকুনি বয়ে আসে। কয়েকদিন ধরে এই খাতটাকে জলে ভরে উঠতে দেখে-দেখে স্রোতের ধারাটা এদের প্রায় সবারই চেনা হয়ে গেছে। তারা বোঝে, ঐ গাছ শুধু গাছ হতে পারে না, যদি হত তা হলে নদীস্রোতে সেটা অন্য রকম ভাসত। গাছগুলো বেরবার পরও বাঁধের লোকজন অপেক্ষা করে—নৌকোটা কখন বেরয়। কিন্তু প্রতীক্ষিত সময়ের মধ্যে নৌকোটাও বেরয় না, গাছগুলোও সোজা না গিয়ে একটু কোনাকুনি হয়ে যায়—তখন তারা এই দুইয়ের ভেতর যেন একটা সম্পর্ক থাকতে পারে বলে সন্দেহ করে। প্রথম কথাটা অশ্বিনী রায়ই বলে ওঠে, 'খাইসেন, খাইসেন, হামার কাঠাল আর লিচু গাছখান কায় কাটি দিসে হে, কায় কাটি দিসে।'

কথাটা শোনার পরও সবাই একটু চুপ করে থাকে। এটা কি ঠিক হওয়া সম্ভব?

নরেশ-অমূল্য নৌকোর ওপর আছে। এই সময় যদি কেউ ঐ গাছ কেটে নিয়ে যায়, তা হলে তারা কি বাধা দিত না? এ-রকম অবিশ্যি এমন কাছাকাছি চরে হতেও পারে। বন্যার সুযোগে কেউ-কেউ নৌকো করে এসে গাছটাছ কেটে নিয়ে যায়। কিন্তু এই চরে তা করতে হলে এই বাঁধ থেকেই যেতে হবে। নাকি, যে-লোকটাকে সকালে দেখা গিয়েছিল সেই লোকটাই এই সব গাছ কেটে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে অপেক্ষা করছিল—অমূল্য আর নরেশ গিয়ে তাকে ধরেছে? কিন্তু তাই যদি হয়, তা হলে গাছগুলোকে কি এমন ভাসিয়ে দেবে? তা যদি হয়ও, তাহলে ত নৌকোটা পেছনে-পেছনে বেরবে!

কেউ একজন বলে ওঠে, 'অশ্বিনী কাহার কাঠল আর লিচু গাছ কি ফ্লাডের জল খাইয়্যা শালগাছের নাগান বাইড়্যা গিছে? দ্যাহেন না, গাছ না, য্যান একখান ফরেস্ট!'

এত দূর থেকেও চোখের আন্দাজে বোঝা যায় এ গাছগুলো অশ্বিনী রায়ের বাড়ির গাছ নয়। সে-কথাটা একজন বলে দেয়ার পর সকলেরই মনে হতে থাকে। জগদীশ বারুই গাছের আভাস পায়, কিন্তু পরিস্থিতিটা বুঝতে পারে না। সে নদীর দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে চিৎকার করে বলে, 'আরে, গেল তিনজন মানুষ একখান নৌকায় আর তরা কত্যাছিস গাছের কথা? গাছের কথাডা আইল কোথ থিক্যা, অ্যাঁ? গাছের কথাডা আইল কোথ থিক্যা?'

জগদীশ বারুই চীৎকার করে বললেও, তার কথার কোনো জবাব কেউ দেয় না। বরং চাপা গলায় কেউ বলে ওঠে, 'হ্যাঁ, পাড়ের দিকেই ত আসে, হ্যাঁ, পাড়ের দিকেই আসত্যাছে।'

সেই চাপা স্বরে বিস্ময়টা আরো পরিষ্কার হয়। তারপরই এই ভিড়টা থেকে অনেকে বাঁধ ধরে ওপরে উঠে যায়, প্রায় দৌড়ে। বাঁধের ওপর উঠে তারা বাঁধ ধরে দৌড়তে থাকে দক্ষিণে। নৌকোটা চর থেকে যখন ফিরবে, তখন আরো ভাটিতে গিয়েই লাগবে, তারপর পাড় ধরে-ধরে এখানে ফিরে আসবে—এটা সবারই জানা। কিন্তু নৌকোর বদলে এত বড়-বড় গাছ একসঙ্গে স্রোতে ভেসে বেরিয়ে এল, আর স্রোত কাটিয়ে একটু আড়াআড়িই পার হল—এটা তাদের হিশেবের বাইরে। তাই বাঁধের ভিড়টা ভেঙে যায়। অনেকেই বাঁধের ওপর দিয়ে ছুটতে শুরু করে, যেখানে গাছগুলো এসে ভিড়বে সেখানে গিয়ে দাঁড়ানোর জন্যে। বাঁধের ভিড়টা ভেঙে যায়, দৌড়োদৌড়ি শুরু হয়, এই সব মিলিয়ে যেন একটা রহস্যের আভাস আসে। সকালে লোকটা চালের ওপর থেকে উধাও, বিকেলে তিন-তিনটে মানুষ নৌকোসুদ্ধ উধাও, তার বদলে এতগুলো গাছের স্রোত বেয়ে আসা— সব মিলিয়ে পরিস্থিতি বেশ জটিল হয়ে পড়ে।

কিছু লোক বাঁধ বেয়ে উঠেছে আর কিছু লোক বাঁধের ওপর গিয়ে দাঁড়িয়েছে বলে পাড়ের বোল্ডারের ওপরের ভিড়টা আলগা হয়ে যায়। অফিসার বাঁধের ওপর উঠতে-উঠতে বলে, 'মশাই, মনে হচ্ছে ফ্লাড এক আপনাদের এখানেই হয়েছে। এক জায়গায় এসে যদি এতক্ষণ আটকে থাকতে হয় তা হলে অন্য জায়গায় যাব কখন?'

রঘু ঘোষের পেছন পেছন উঠতে-উঠতে লিলি বলে, 'চলো-না, ঐ দিকে যাই—দেখি কী হল?'

রঘু ঘোষ পেছন না-ফিরেই বলে, 'আর ওখানে যেতে হবে না। এতক্ষণ এই বৃষ্টি আর বাতাসে আছো, সারা রাত ত বসে-বসে শ্বাস টানবে। এখন বাগানে চলো। অনেক দেখা হয়েছে।'

গুদামবাবু বাঁধের ওপর আগেই উঠে গিয়েছিলেন। উনি বলেন 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলুন। এ-সব হাঙ্গামায় আর জড়িয়ে লাভ নেই।'

রঘু ঘোষ বলে, 'হাঙ্গামা আবার কী?'

গুদামবাবু—'বাঃ, একটু আগে ত আপনাকেই দোষ দিচ্ছিল। এরপর দে— ঐ গাছ না কী তাই নিয়ে আবার কী গোলমাল হয়?'

অফিসার এদের কাছেই ছিল, বলে, 'আরে মশাই, এদের ত রেসকিউয়ের নামে একটার পর একটা গোলমাল বেড়েই চলেছে। নৌকোটা গেল কোথায়?'

এ-রকম সময় সেই গাছগুলো একটু ঘুরে যায়, আর তাতেই ডালপালার ফাঁক দিয়ে বাঁধের এই জায়গাটা থেকে দেখা যায়—গাছের ওপরে কাদাখোয়া দাঁড়িয়ে আছে। একবারমাত্র দেখা যায় কিন্তু যারা দেখে তারা চিনে ফেলতে পারে—'কাদাখোয়া, কাদাখোয়া, গাছগিলার মাথাত্ কাদাখোয়া। গাছগিলার মাথাত কাদাখোয়া।' ঐ দিকে গাছগুলো পাড়ের কাছাকাছি চলে এসেছে। যারা ওদিকে দৌড়ে গেছে, তারা নিশ্চয়ই আরো স্পষ্ট ভাবে দেখতে পাচ্ছে। এখানকার লোকজন বাঁধের ওপর দিয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকে।

এর মধ্যে গাছগুলো আরো ঘোরে। দেখা যায়, সত্যি কাদাখোয়া দাঁড়িয়ে আছে। গাছগুলো আরো ঘোরে। দেখা যায়, কাদাখোয়ার পাশে আর-একজন, কাদাখোয়ার মতই, দাঁড়িয়ে। কিন্তু নরেশ-অমূল্য নেই। সবাই গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে—কোনো ফাঁক দিয়ে নরেশ-অমূল্যকে যদি দেখা যায়। নরেশ-অমূল্য চরে যদি আটকে গিয়ে থাকে? কোনো বিপদ ঘটেছে নাকি? একা কাদাখোয়া ফিরে আসছে? সঙ্গে একটা লোক আছে, সে নিশ্চয়ই সকালের সেই লোকটাই? নাকি, নরেশ-অমূল্য পরে নৌকো নিয়ে আসবে? এ স্রোতে দুজনে একটা নৌকো চালাবে কী করে?

গাছগুলো পাড়ের আরো কাছাকাছি চলে এসেছে—কাদাখোয়া আর ঐ লোকটাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এইবার গাছগুলো এই বাঁধের আড়ালে চলে যাবে। ওখানে বাঁধের একটা বাঁক আছে, ডাইনে।

গাছগুলো সেই বাঁকটার আড়ালে চলে যাবে। এখান থেকে কী করে জানা যাবে—গাছগুলো ওখানেই থাকবে, নাকি টানতে-টানতে এখানে নিয়ে আসা হবে।

বাঁধেব ওপব যাবা ছড়িযে-ছিটিযে ছিল—তাবা আবো ছড়িযে-ছিটিযে যায়। কেউ-কেউ বাঁধ ধরে দক্ষিণের সেই বাঁকটার দিকে হাঁটা শুরু করে। বানভাসি যে-মেযেবা এতক্ষণ বাঁধেব ঢালেব নানা জায়গায দাঁড়িযে নদীর দিকে তাকিযে ছিল, তাবা এখন বাঁধের ওপব উঠে এসে গরুগুলোব পাশে দাঁড়িয়ে বা একটু এগিয়ে কপালে হাত দিয়ে বাঁধ ববাবব তাকায। এখন বোদ নেই। হাওযা ও বৃষ্টি অব্যাহত। কিন্তু দূরে তাকাবার জন্যে মেযেদেব ভঙ্গি ঐ একটাই। গরুগুলোও এতক্ষণ নদীব দিকে তাকিয়েছিল। তারাও শরীর না ঘুরিয়ে শুধু ঘাড়টা ডান দিকে ফেবায। ব্যবধান বেখে মাঝে-মাঝে এক-একটা গরু 'হা-ম্বা' ডেকে ওঠে, গম্ভীর, প্রলম্বিত 'হা—ম্বা'। তাবই মধ্যে, বাতাসে ঐ বাঁকেব আড়াল থেকে মানুষের সমবেত চিৎকাব শোনা যায। এখানকাব সবাই কান পেতে বুঝতে চায, চিৎকারেব ভেতর বিপদেব কোনো সঙ্কেত আছে কিনা।

একশ উনপঞ্চাশ

বাঘারু ও কাদাখোয়াব সংবর্ধনা

চিৎকারটা উঠে নেমে যায় বটে, কিন্তু থামে না। বাতাসটা ওদিক থেকে এদিকে আসছিল বলে ওখানকাব চেঁচামেচি এখানে শোনা যাচ্ছিল। বোঝা যায, খাবাপ কিছু ঘটে নি। মাঝে-মাঝেই চিৎকাবটা আবাব বাড়ছিল।

তাবপরই দু-একটি বাচ্চা ওদিক থেকে বাঁধ দিয়ে দৌড়তে-দৌড়তে এদিকে আসে। আব, তাদেব সেই দৌড়ের সঙ্গে ছন্দ বেখেই ওদিককার চিৎকাবটাও এগতে থাকে—বাঁধ ধবে নয, বাঁধেব একটু নীচ দিয়ে, নদীর পাশ দিয়ে, বোল্ডারগুলোব ওপর দিযে। বাঁধেব এখানে যাবা দাঁড়িযেছিল, তাবা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না কোন দিকে তাকিয়ে থাকবে—এখান থেকে নদীব দিকে কোনাকুনি, নাকি বাঁধেব ওপব দিয়ে সোজাসুজি। যে-বাচ্চাগুলো দৌড়ে আসছিল তাবা পেছনে ফিবে কিছু দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে, তারপর আবার দৌড়তে শুরু কবে।

তখনই দেখা যায—সেই গাছগুলো বাঁকটা পেবিয়ে এদিকে আসছে, মানে পাড় দিয়ে গাছগুলোকে টেনে আনা হচ্ছে। গাছগুলো আর-একটু এগতেই দেখা যায়—গাছগুলোব সামনে নৌকোটা আব তাতে নরেশ আর অমূল্য দাঁড়িয়ে। পাড়টা উঁচু বলে নৌকোটা এতক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। নবেশ আব অমূল্য যে দাঁত বের করে হাসছে, সেটাও এখান থেকে দেখা যাচ্ছে।

নরেশ আর অমূল্যর মাথার ওপরে, গাছের ডালের মধ্যে কাদাখোযা আব সেই লোকটি দাঁড়িযে। দুজনেরই কোমরে হাত। একটা সোনালি দড়ি সেই গাছের ডালের মাথায় কাদাখোযা আব লোকটিব ভেতর থেকে পাড় পর্যন্ত ঝুলছে আর সেই দড়ি ধবে নৌকো আর গাছগুলোকে সবাই টানতে-টানতে নিয়ে আসছে। নৌকোর ওপর অমূল্য আর তাব মাথার ওপবে ডালেব মধ্যে কাদাখোয়া লগি দিযে-দিযে পাড়ে মারছে—যাতে গাছগুলো পাড়ে ঠেকে না যায়। তাতেও পুবোটা সামলানো যাচ্ছে না, কাবণ, গাছের পেছনের ডালপালা পাড়ে লেগে যাচ্ছে। এতজন দড়িটা ধরে টানছে যে—গাছগুলো আবাব পাড় থেকে সরে যাচ্ছে। যারা টানছিল তারা কেউ-কেউ বোল্ডাবেব ওপব, কেউ-কেউ বোল্ডাব আব নদীর মাঝখানের সংকীর্ণ পথটা দিয়ে আগে-আগে আসছে। তারা দড়ি টানছে না, যেন, গাছগুলো আব নৌকোটাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে।

কতটুকু আর দূরত্ব ? দেখতে-দেখতে এরা সবাই বাঁধেব এই অস্থাযী ক্যাম্পের জাযগাটায পৌঁছে যায়। পৌঁছনোর আগেই সবাই দেখতে পায়—সেই নতুন লোকটির গলায় নাইলনের দড়িব বড় বাণ্ডিল—আর সেই দড়িটাই পাড়ের লোকজনের হাতে। তারা ঐ দড়ি ধবেই গাছ আর নৌকো টানতে-টানতে নিয়ে আসছে।

বহরটা এসে দাঁড়ায় সেখানে, যেখানে সবাই প্রথমে ভিড় করেছিল। নদীর ভেতরে নৌকোয়, পাড়ের একটু নীচে, নরেশ আর অমূল্য, আর পাড় থেকে অনেক ওপরে, নদীরও অনেক ওপরে কাদাখোয়া আর সেই নতুন লোকটি।

'পাইছে, পাইছে, গুয়াবাড়ির মানষিটাকে পাইছে।'

'সেই ফরেস্টঠে সাবা বাতি ভাসি আসিছে।'

'সাবা বাতি গাছের উপর ভাসি-ভাসি আসিছে।'

'ভাইস্যা আসত্যাছিল, গাছগিলা পায়্যা ধইরছে।'

'এত বড় দড়ি পাইল কোথ থিক্যা? জলে ভাইসব্যার আগে কি গলায় দড়ি দিছিল নাকি?'

এ-সব নানা প্রশ্নোত্তরের মধ্যে নরেশ আর অমূল্য পাড়ে উঠে আসে। কাদাখোয়া আর বাঘারু নামে না—তারা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, তারা এখন নামবে কি না। নরেশ পাড়ে নেমেই জিজ্ঞাসা করে, 'কই, স্যার কই?'

নরেশের কথার প্রতিধ্বনিতে আরো দু-চারজন জিজ্ঞাসা করে, 'কই, অফিসার কই?'

আর, এর মধ্যেই কেউ নরেশকে বলে দেয়, অফিসার বাঁধের ওপরেই আছে। নরেশ বাঁধের ওপর উঠতে থাকে। তার পেছনে-পেছনে আরো অনেকে উঠলেও, সামনে কেউ থাকে না। সেই ঢাল বেয়ে নরেশের উঠে আসার জন্যেই যেন ঢালটা ফাঁকা। সেই ফাঁকার শেষ বাঁধের ওপরে অফিসার এসে দাঁড়ায়। বাঁধের ওপরে পৌঁছনোর আগে হঠাৎ পেছন ফিরে নরেশ হাত নেড়ে চিৎকার করে ওঠে, 'এই, দড়িখান বাইন্ধ্যা রাখ কোথাও, ছাইড়্যা দিস না, ভাইস্যা যাবে নে তালি।' চিৎকারটা শেষ করে বাঁধে পা দিয়েই নরেশ দেখে সামনে অফিসার। এক পা পেছনে গিয়ে, বাঁ হাতটা তার কোঁকড়ানো চুলের পেছনে দিয়ে, নরেশ তার শাদা দাঁতগুলো বের করে হাসে, তারপর, 'আইনছি স্যার, ঐ যে', বাঁ হাতটা নামায় বাঘারুকে দেখাতে, 'চলেন স্যার', বাঁ হাতটা নামিয়ে অফিসারকে পথ দেখায়। সেই পথ দেখানোর জন্যেই, নরেশের পেছনে যারা ছিল তারা, দুদিকে সরে যায়। মাঝখানে একটা পথের মত হয়ে যায়।

নরেশ ঐভাবে হাত দেখানোর জন্যেই হোক, অথবা নরেশের পেছনের লোকগুলো দুদিকে সরে গিয়ে পথ করে দেয়ার জন্যেই হোক, অফিসার নরেশের পিঠে সস্নেহ হাত রাখে। তারপর নরেশের দেখানো পথে বোল্ডারের ঢালে নামার জন্যে পা বাড়িয়ে একবার দুদিকে তাকায়, হাসিমুখে, যেন এই সময় ওখানে টি-ভি ক্যামেরা, অন্তত প্রেসের ফটোগ্রাফারদের থাকার কথা ছিল। না-থাকলেও, তারা আছে এমন এক বিশ্বাসে অফিসার ধীরে-ধীরে ঢালটা বেয়ে বোল্ডারের পাড়ে নামে। সামনে নদী। বোল্ডারের পাড় পেরিয়ে নদীর ধারে গাছগুলো আর নৌকোর সামনে গিয়ে অফিসারকে দাঁড়াতে হয়। যেন এই ঢাল আর বাঁধ ধরে এতক্ষণ সে বারবার ওঠানামা করছিল না, যেন এইমাত্রই সে গাড়ি থেকে নেমে পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী নদীর পাড়ে এসে দাঁড়াল।

অফিসার আর নরেশ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, তাদের পেছনে ভিড়। সামনে, প্রায় মাথার ওপরে কাদাখোয়া আর বাঘারু। তারা বোঝে না তাদের কী করতে হবে। নরেশ চেঁচিয়ে ওঠে, 'আরে, নাইমা আসেন, দ্যাহেন না স্যারে আইছে।'

শুনে, বাঘারু মাচানের ওপর থেকে তার কুড়ালিযাটা নিয়ে পেছনে নেংটির ওপরে গোঁজে। কাদাখোয়া লগিটা নিয়ে নীচের ডালে পা দেয়, তারপর বাঘারু একটু নিচু হয়ে কাদাখোয়াকে ডাল থেকে পাড়ে উঠতে সাহায্য করে ও নিজে মাচান থেকে নীচের ডাল, ডাল থেকে পাড়ে উঠতে সাহায্য নেয়। বাঘারুকে টেনে নেয়ার জন্যে পাড়ে নেমে কাদাখোয়াকে অফিসারের দিকে পেছন ফিরতে হয়, তারপর বাঘারু নামলে দুজনে এক সঙ্গে অফিসারের সামনে দাঁড়ায়। বাঘারুর গলায় হলুদ দড়ি দোলে। অফিসার ঠিক বুঝে উঠতে পারে না তাকে কী করতে হবে। নরেশ ওদের দেখিয়ে বলে, 'স্যার, ভাইস্যা আইসছে সেই ফরেস্ট থিক্যা—গাছগাছালি নিয়্যা।'

এরপর যেন অফিসারের একটা কাজ করাই বাকি থাকে। সে বাঘারুর হাতটা ধরে।

অফিসার হ্যান্ডশেকের ভঙ্গিতেই হাতটা এগিয়েছিল। কিন্তু বাঘারু হাতটা না বাড়ানোয় সে বাঘারুর শরীরের পাশে ঝুলে থাকা হাতের কব্জিটা ধরে ঝাঁকায়। তারপর ছেড়ে দেয়। এবার কাদাখোয়ার দিকে আর হাত বাড়ায় না—একবারেই কব্জিটা ধরে ঝাঁকায় ও ছেড়ে দেয়। অফিসার হয়ত ভেবেছে এই দুজনই ভেসে এসেছে—দুজন এমনই একরকম দেখতে। অথবা, দুজন এমনই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যে

তাদের সঙ্গে একই ব্যবহাব কবা ছাড়া অফিসাবের আর-কোনো গতি নেই। কিন্তু কাদাখোয়াকে ত বাঁধের বানভাসিরা সবাই চেনে। অফিসাব তাব হাত নেড়ে দেযায সবাই মজা পেযে হাততালি দিয়ে ওঠে। অফিসাব সেই হাততালিব দিকে তাকিযে হেসে মাথা নাডায।

একশ পঞ্চাশ

সংবর্ধনার পরে বাঘারু ও কাদাখোয়া

বাঘারু আর কাদাখোযা বোঝে না তাদের এখন কী কবতে হবে—নবেশ বা অফিসাবও বোঝে না। সবাই হাততালি দিযে ওঠায় নরেশ সেদিকে তাকিয়ে হাসে। এর মধ্যে অমূল্য এসে নরেশেব পাশে দাঁড়ায়। অফিসার আবার হাসিহাসি মুখে কাদাখোয়া আর বাঘারুব দিকে, তাদেব পেছনে নদীব দিকে, বাঁযে নরেশ-অমূল্যর দিকে, ও এমন-কি, ঘাড ঘুবিযে বাঁধেব দিকেও তাকিযে নেয। বাঁধেব ওপব যাবা দাঁড়িয়ে ছিল তাবা নীচে হাততালি শুনে ঢাল বেযে নীচে নামতে শুরু করে। অফিসাব নবেশেব দিকে তাকিয়ে এতক্ষণে বলে, 'তা হলে ত তোমাদের বেসকিউ হল ˆএবাব তা হলে আমাব ছুটি, কী বলো ?'

নরেশ আবার মাথা চুলকে বলে, 'হ্যাঁ স্যার, আপনাব কষ্ট হইল কত।'

বাঁধে উঠবার জন্যে ঘুরতে-ঘুরতে অফিসার বলে, 'আরে, আমার ত এইই কাজ, এতে আবার কষ্ট কী ?' এই কথাটা শেষ করার জন্যে অফিসাবকে হাত দিযে নরেশেব কাঁধ ছুঁতে হয। কিন্তু নরেশ এতটাই লম্বা যে তার কাঁধ ধরতে হলে অফিসারের হাতটা টানটান করতে হয়। তাই, অফিসার তাব পিঠের ওপর হাতটা রেখে নামিয়ে নেয়। সেই সুযোগে নবেশ ঘাড়টা নামিয়ে অফিসারকে বলে, 'স্যার, আমাগো পেমেন্টটা ?'

'হ্যাঁ, চলো, এখনই পাঁচশ দিয়ে দিচ্ছি। আব কাল আমার অফিসে এসো—'

'স্যার, আপনার অফিস ত চিনি না', নবেশ সোজা হযে অপবাধীর ভঙ্গি কবে।

'দীপ্তি টকিজ চেনো ত ?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'আর-একটু সোজা গেলেই ফায়ার ব্রিগেড—'

'চিনি স্যার', পেছন থেকে অমূল্য বলে।

'তার পাশেই', এবার অফিসার হাঁটতে শুরু কবে। কিন্তু নবেশ আবার বলে ওঠে, 'স্যার, আপনারে জিপ পর্যন্ত আগাইয়া দেই, ঐখানেই পেমেন্ট দিবেন।'

'জিপ ত ঠিক বাঁধের ঐ পাড়ে এনে রেখেছি। ঠিক আছে চলো।' অফিসার বাঁধে উঠতে শুরু করেন, পেছনে-পেছনে অমূল্য আর নরেশ। তার পেছনে ভিড়ের লোকজন। বাঁধেব ওপর থেকে যারা নেমেছিল তারাও এদের সঙ্গে মিশে যায়। কাদাখোয়া আর বাঘারু বোঝে না—তাদের কী করতে হবে। কিন্তু তাদের যখন গাছ থেকে নামতে বলা হয়েছে তখন তাদেরও নিশ্চয় বাঁধের ওপরই উঠতে হবে—এ-রকম একটা সহজ ধারণা থেকে তারাও এই ভিড়ের সঙ্গে বাঁধের ওপর উঠতে শুরু করে। বাচ্চারা ততক্ষণে কাদাখোয়া আর বাঘারুর ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে, তারা ওদের দুজনকে ধাক্কা দিয়ে-দিয়েই এগিয়ে যায়। বাঘারু আর কাদাখোয়া পেছনে পড়ে যায়। তারা ভিড়ের পেছনেই বাঁধের ঢাল বেয়ে ওপরে উঠতে থাকে।

একটু ওঠার পরই বাঘারুর গলা থেকে সেই হলদে দড়ি, গাছ পর্যন্ত, দুলতে থাকে। যারা এতক্ষণ দড়ি ধরে টেনে এনেছিল, তারা ত দড়িটাকে বোল্ডারের ওপর ফেলে রেখে বাঁধের ওপর-নীচে ভিড়ের নানা অংশে মিশে যায়। এখন বাঘারু যত উঁচুতে উঠছে, দড়িটাও তার সঙ্গে মাটি ছেড়ে ততটা উঠছে। আর, শেষে বাঁধের মাথা থেকে নদী পর্যন্ত ঝুলে থেকে দোলে।

বাঁধের ওপর উঠে কাদাখোয়া আর বাঘারু আবার দাঁড়িয়ে পড়ে। অফিসারকে নিয়ে ভিড়টা ঢাল বেয়ে বাঁধের বিপরীত দিকে নেমে যাচ্ছে। তারাও সেই ঢাল বেয়ে নামবে কিনা বুঝতে পারে না। কারণ,

বেশির ভাগ লোকই আর নামছে না, তারা বাকি ভিড়টার নামা দেখছে। কাদাখোয়া আর বাঘারুকে সেই ভিড়টাতে আটকা পড়ে যেতে হয়। তারা একবার অফিসারের ঢালের দিকে, আর একবার নদীর ঢালের দিকে এলোমেলো তাকায়। এমন সময় অশ্বিনী রায় ভিড়ের মধ্যে এসে ডাকে, 'হে-এ কাদাখোয়া।' কাদাখোয়া অশ্বিনী রায়ের ডাক শুনে সেদিকে এগিয়ে যায়।

অশ্বিনী রায় তাকে জিজ্ঞাসা করে, 'কী দেখি আসিছু রে? ঘরবাড়িখান ঠিকো আছে, না নাই?'

কাদাখোয়া প্রশ্নটার মানে না বুঝে বলে, 'ঐঠে ত জল—।'

'জল ত, ঐ মানষিখান গুয়াগাছের মাথাত কী কইরবার ধইর্চছিল?'

অশ্বিনী রায়ের প্রশ্ন শুনে ভিড়ের অনেকের মনে পড়ে ঐ লোকটি সুপুরি গাছে চড়ে আর নামে নি কেন সেটা দেখার জন্যেই এখান থেকে নৌকো ভাসানো হয়েছিল। হঠাৎ কাদাখোয়া আর অশ্বিনী রায়কে ঘিরে ভিড়টা জমে ওঠে। তাদের ভেতর থেকে একজন জিজ্ঞাসাও করে, 'কী দেখিলুরে কাদাখোয়া, ক কেনে।'

'কিছু দেখি নাই রো—'

'কী দেখলু নাই? ঐঠে যে এই মানষিডা আছিল, দেখলু নাই?'

'হয়। মানষিডা আছিল।'

'কোটত আছিল?'

'ঐঠে আছিল, জলের ভিতরত আছিল।'

'জলের ভিতরত ভাসি আছিল? না খাড়া আছিল?'

'বসি আছিল। বসি আছিল।'

'ঐটাক ছাড়ি দাও কেনে। নরেশুয়াখান আসুক কেনে, তার বাদে সবখান শুনা যাবে।'

লোকজনের এই সব কথা থামতেই অশ্বিনী রায় একটু যেন রেগেই জিজ্ঞাসা করে, 'এই মানষিডার গুয়াগাছে উঠিবার কামখান কী আছিল?'

অশ্বিনী রায়ের এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে কাদাখোয়া একবার শূন্যে তাকায়—যেন সেই শূন্যে অশ্বিনী রায়ের চাল, আর একবার মাটির দিকে তাকায়, যেন ঐ মাটিতে ফ্লাডের জল আর তাতে গাছগুলোর সঙ্গে বাঘারু ভাসছে। কিন্তু এই কথাটা বলার ভাষা না পেয়ে সে তার ডান হাতটা আকাশে তুলে ধরে বলে, 'ঐঠে ত চাল, আর এইঠে ত জল।'

'উঠিসেন ত উঠিসেন। স্যালায় আবার গুয়াগাছখানত উঠিবার কামটা কী?'

অশ্বিনী রায় তার রাগ বজায় রাখার চেষ্টা করে। নরেশ তার কথার জবাব দেবে না, বা তার সব প্রশ্ন সে সাহসে ভর দিয়ে নরেশ বা অমূল্যকে করতে পারবে না। তাই তারা আসার আগেই সে তার ব্যক্তিগত কথাগুলো তার ব্যক্তিগত 'মানষিডার' কাছ থেকে জেনে নিতে চায়। কিন্তু কাদাখোয়া জানাতে পারে না। সে আবার আকাশের দিকে তাকায়, যেন এখানে অশ্বিনী রায়ের চাল। সে আবার মাটির দিকে তাকায়, যেন ওখানে ফ্লাডে বাঘারু ভাসছে। আর, তারপর ডান হাতটা আকাশে তুলে সে শুধু আবারও বলতে পারে—'ঐ ঠে ত চাল আর এইঠে ত জল।'

'গুয়াগিলা আছে কি নাই?' অশ্বিনী রায় কাদাখোয়ার কাছে তার সুপুরি গাছগুলোর ফলের হিশাব চায়। কাদাখোয়া অশ্বিনী রায়ের প্রশ্ন শুনে সকলের মাথার ওপর দিয়ে বাতাস আর বৃষ্টি ভেদ করে সেই চরের দিকে তাকিয়ে দেখে নিতে চায় সপুরি গাছের সুপুরিগুলো আছে কি নেই।

অশ্বিনী রায় যতটা পারে গলা তুলে বলে, 'দেখিবার মনত খায় নাই?'

কাদাখোয়া সেই চরের ওপর থেকে অশ্বিনী রায়ের চোখের ওপর তার দৃষ্টি ফিরিয়ে আনে। অশ্বিনী রায় গলাটা আর-একটু তুলে বলে, 'যা কেনে; গরুগিলাক খোয়া দে—', সে আঙুল তুলে দেখায়ও কাদাখোয়াকে কোন দিকে যেতে হবে। সেই অঙ্গুলিনির্দেশিত পথে কাদাখোয়া চলে যায়।

বাঘারু যেখানে এসে উঠেছিল, সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। বাঁধের ওপরের ভিড়টা দুভাগ হয়ে গেছে—একটা ঢাল বেয়ে নীচে অফিসার, নরেশ আর অমূল্যর সঙ্গে, আর-একটা অশ্বিনী রায়-কাদাখোয়ার সঙ্গে। ফলে, বাঘারু একটু নির্জনেই পড়ে যায় বা দুটো ভিড়েরই পেছনে। ভিড়দুটোর বাইরেও কিছু লোক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। দু-একজন বাঘারুকে আপাদমস্তক দেখেওছে। দু-একজন বাঘারুর গলার দড়িটাও দেখেছে। কিন্তু বাঘারুকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করে না। বাঘারু যেমন

দাঁড়িয়েছিল, তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে। তার সামনে বাঁধের নীচে ও তার পাশে বাঁধের ওপরে নানা কথাবার্তার মধ্যে বাঘারুর গলা থেকে নদীর ভেতরে ভাসমান গাছ পর্যন্ত হলুদ রঙের মোটা নাইলনের দড়ি বন্যার বাতাসে দোল খায়।

একশ একান্ন

বাঘারুর দ্বিতীয় সংলাপ

বাঁধের নীচে অফিসার নরেশকে বলে, 'আরে, ঐ লোকটার নাম-ঠিকানা ত নেয়া হল না, আমাকে ত রিপোর্ট করতে হবে।'

নরেশ পেছনে ঘাড় ঘোরায়, তারপর নিজেই বাঁধ বেয়ে ওপরে উঠতে থাকে বাঘারু ডাকতে। মাঝামাঝি উঠতেই দেখে বাঘারুকে একা-একা দাঁড়িয়ে আছে। আর-না-উঠে বাঘারুকে নরেশ ডাকতে থাকে, 'হেই শুনিছেন, হে-ই শুইনছেন, আরে হে-ই—'

বাতাসের আওয়াজ, চারপাশে নানারকম কথবার্তা, এই সব কারণে বাঘারু নরেশের ডাক শুনতে পায় না। অথবা, তাকে যে ডাকা হতে পারে সেটা সে ভাবেই নি। অগত্যা, নরেশকেই আবার পা বাড়াতে হয়। পা বাড়িয়েও সে ডাকতে থাকে, 'হে-ই গাছুয়ামানষি, আরে এই গাছুয়ামানষি।'

বাঘারু তখন বাঁধের ঢাল বেয়ে অফিসারের গাড়ির দিকে তাকিয়ে ছিল, যেমন সে নানাদিকেই অলস তাকাচ্ছিল। অফিসারের গাড়ি থেকে চোখ সরিয়ে আবার বাঁ দিকে চোখ সরাতে গেলে নরেশ তার নজরে পড়ে যায়। বাঘারু যদি সোজা তাকিয়ে, সোজাই বাঁ দিকে ঘাড় ঘোরাত তা হলে নরেশকে দেখতে পেত না। কিন্তু অফিসারের গাড়িটার দিকে সে তাকিয়ে ছিল বলে তাকে মাটি থেকে কোনাকুনি চোখটা বাঁয়ে বাঁধের ওপর তুলতে হচ্ছিল। তাই নরেশ তার চোখে পড়ে যায়।

নরেশ তখন হাত দিয়ে তাকে ডাকতে-ডাকতে চেঁচায়, 'আরে কানে শুনেন না নাকি? আসেন এইখানে, স্যার ডাইকতেছে।'

নরেশের কথাটা বাঘারু শোনে কি না বোঝা যায় না, শুনে থাকলেও সেই কথার মানে বোঝার জন্যে তাকে আবার অফিসারের গাড়ির দিকে তাকাতে হয়। সেই গাড়ির কাছ থেকে সবাই তার দিকেই তাকিয়ে আছে। নরেশ আবার চেঁচায়, 'আরে, এই মানষিডা কালা নাকি। আরে, আসেন, স্যারে, ডাইকতেছে।'

এবার বাঘারু বোঝে। সে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করে। সে দু-এক পা নামার পর নরেশ পেছন ফেরে। নরেশ দু-এক পা নেমে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নেয় বাঘারু নামছে কিনা।

বাঘারু গিয়ে অফিসারের সামনে দাঁড়ায় না। বাঁধের ঢালটার পরে যেখানে জিপের সামনে ভিড় শেষ হয়েছে সে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। ততক্ষণে নরেশ অফিসারের সামনে পৌঁছে গেছে। সে পেছন ফিরে দেখে, তার পেছনের লোকজনের ওপরে বাঘারুর মাথা।

'আরে এইখানে আসেন না। স্যার, আইসছে,' নরেশ হাত দিয়ে তার পেছনে দাঁড়ানো লোকজনকে দুদিকে সরিয়ে দেয়, বাঘারুর আসার জন্যে পথ করে দিতে। কিন্তু পথ হওয়া সত্ত্বেও বাঘারু এগয় না—যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে।

অফিসার জিপের ভেতর বসেছিল। সেখান থেকে গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'এখানে আসুন, আপনার নামটা কী?' জিজ্ঞাসার জন্যে অফিসার হাত দিয়ে নরেশকে সরিয়ে দেয়। এখন জিপের ভেতর অফিসার আর মাটিতে বাঘারু সোজাসুজি, কিন্তু দুজনের মাঝখানে হাত পাঁচ-ছয় তফাত।

বাঘারু কোনো জবাব দেয় না। ইতিমধ্যে অফিসার বুকপকেট থেকে ডটপেন ও একটুকরো কাগজ বের করে ডান উরুর ওপর রেখেছে। শুনে, লিখবে বলে অফিসার মাথাও নিচু করেছে, কিন্তু শোনার সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর তাকে আবার চোখ তুলতে হয়। চোখ তুলে বাঘারুকে দেখে নিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করে, 'আপনার নাম কী?' তারপর নরেশকে বলে, 'দড়িটা কিসের?'

বাঘারুব গলা থেকে সেই হলুদ দড়িটা বাঁধের ঢাল বেয়ে উঠে আড়ালে চলে গেছে। এখানে বাঁধের ঢালের জন্যে বাতাসে আব সে-দড়ি দুলছে না।

নবেশ বলে, 'ও স্যার, ওব গাছবান্ধা দড়ি।'

'গলার সঙ্গে বাঁধা ?'

নবেশ হেসে ওঠে, 'গাছগুলো বাইন্ধ্যা গলায় ঝুল্যায়া বাইখছে।'

অফিসাব নবেশকে বলে, 'নামঠিকানাটা জিজ্ঞাসা করুন ত।'

নবেশ বাঘারুব কাছে গিয়ে বলে, 'আবে, আপনারে না স্যাব ডাইকতেছে, এহানে খাড়ায়্যা আছেন ক্যান ? আপনাব নামঠিকানা কন, স্যারে জিগায়। স্যাবেব লিখবার লাগব। আপনার নামঠিকানা কী ?'

'মোব নামঠিকানা নাই বো। মোব দেউনিয়া'। গযানাথ জোতদাব বাঘারু এতক্ষণে বলতে পারে।

শুনে নবেশ হেসে উঠে মুখে হাত চাপা দেয়। অফিসাব জিজ্ঞাসা করে, 'কী, হল কী ?'

'স্যাব, কয় যে এই মানিষডাব কুনো নাম নাই। গযানাথ জোতদারের নাম লিখবার কয়।'

অন্যান্য লোকজনেব চাপা হাসিটা শেষ হওযাব পর অফিসার বলে ওঠে, 'আচ্ছা, গয়ানাথ জোতদাবেব ঠিকানাটা জিজ্ঞাসা করুন না। তা হলেই ত ওব ঠিকানা জানা যাবে, কেয়ার অব গয়ানাথ জোতদাব।' অফিসাব কাগজেব ওপব মাথা নোযায।

নবেশ বাঘারুকে জিজ্ঞাসা কবে, 'গযানাথ জোতদাবেব ঠিকানাটা কন তালি।'

'মুই জানো না। লিখি দেন গযানাথ জোতদাব।'

'আবে তা ত লিখ্যাই ফেইলছে। সে জোতদাব থাকে কই ? ঘবডা কুথায সেডা কইবেন ত ?'

'সবঠে থাকে। এইঠে আসিবে।'

বাঘারুব কথা শুনে নবেশ আবাব হেসে ওঠে, মুখে হাত চাপা দিয়ে। এবার অফিসার জিজ্ঞাসা করে না, কী হল। হাসি শেষ করে নরেশই বলে, 'স্যাব, বলে, অব জোতদার গযানাথ সব জায়গাতেই থাকে, এইহানেও থাকে।'

অফিসাব একটু ভাবে, 'গযানাথেব নাম ত সবাইই জানে। ও কোথায় নদীতে পড়ল সেটা জিগগেস করো, তাহলেই হবে।'

নবেশ বাঘারুকে বলে, 'আপনে কোথ্ থিক্যা নদীত পইড়লেন, সেইডা কন।'

বাঘারু একটু ভাবে। নবেশ তাব নীববতাকে মনে করে উত্তব দেওযায় আপত্তি। সে তাই আবার প্রশ্নটা কবে, 'সেইডাও গযানাথ জানে নাকি ? ভাইসলেন আপনে, আর জাইনবে গয়ানাথ ?'

ততক্ষণে বাঘারু নবেশেব প্রশ্নটিব জবাব পেযে যায, 'মুই নদীত, পড়ো নাই।'

এতক্ষণে বোধহয বোঝা হয়ে গেছে যে বাঘারু আধপাগলার মতই জবাব দিতে যাবে, আর তাতে সবাইকে হেসে উঠতে হবে। নরেশেব হাসিটাকে মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে বাঘারু তার জবাবের বাকিটুকু বলে, 'মুই ফ্লাডত ভাসিছু।'

হাসি থামিয়ে নবেশ বলে, 'স্যার, বলতেছে নদীতে পইড়্যা যায় নাই, ফ্লাডে ভাইসছে।'

অফিসাব যেন একটা ইশাবা পায়। তাডাতাড়ি বলে ওঠে, 'হ্যাঁ, তাই ত, কোথায় ভেসেছে ফ্লাডে সেটা বলুক। আব নামটা ?'

অফিসাবেব কথা অনুযায়ী নরেশ বলে, 'ফ্লাডে ভাইসলেন কোত্থন ?' বলে নবেশের মনে হয়, এ ভাষাটা বাঘারু নাও বুঝতে পারে। সে বাজবংশী ভাষা মিশিযে আবার জিজ্ঞাসা করে, 'কোটত ভাসিলেন ফ্লাডত্ ?'

বাঘারু সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দেয, 'গাজোলডোবাত্। বাঘারুব উত্তর দেযার মধ্যে এমন একটা ভাব আসে যেন সে সব প্রশ্নেরই জবাব দিতে পারে, প্রশ্নটা যদি ঠিক ভাবে করা হয়।

একটা জাযগাব নাম পেয়ে নরেশ উৎফুল্ল হয়ে এক লাফে অফিসারের কাছে এসে বলে, 'স্যার, কইছে, কইছে।'

'কী বলেছে ?'

'জায়গার নাম কইছে।'

'বলেছে ত বলছ না কেন ? কৌথা থেকে ভেসে এসেছে ?'

'গাজোলডোবা।'

অফিসার উচ্চাবণ করে-করে কাগজেব টুকবোটাতে লেখে, 'জি, এ, জে, এ, এ, না, ও, এল.' তাবপর নবেশকে বলে, 'নামটা বেব কবো। ডি, ও, বি, এ।' নরেশ আবাব বাঘারুব কাছে ফিরে আসে—'শুনেন। আপনার নামটা কয্যা দ্যান, তাহালিই স্যাব চইল্যা যাবাব পাবে। ঐডা ত লিখ্যা নিছে—গযানাথ জোতদাব, গাজোলডোবা। এইবাব আপনার নামডা কন।'

'গযানাথ জোতদাব গাজোলডোবাত্ না থাকে'—বাঘারু বলে।

'খাইছে। এই না কইলেন, আপনে গাজোলডোবাত্ ভাইসছেন।'

'মুই ভাসিছু। গযানাথ না থাকে।'

'গয়ানাথ যেইখানে খুশি থাকুক গিযা—আপনে ত গাজোলডোবাব থিক্যা ফ্লাডে ভাইসছেন? তা হলিই হবে।'

'কী এক গাজোলডোবা-গাজোলডোবা কবছ, ওটা ত হয়েই গেছে,' অফিসার গলা তুলে নরেশকে বলে, এখন যদি বাঘারু আবাব কিছু বলে গাজোলডোবা নামটা প্রত্যাহাব কবে নেয তা হলে যেটুকু পাওযা গেছে, সেটুকুও হাবাতে হবে। অফিসাবেব দবকাব ছিল একটা জাযগাব নাম—সেটা সে পেয়ে গেছে। 'নামটা বেব কবতে পাবো কিনা সেটা দেখো—নইলে ছেড়ে দাও।' যেন গাজোলডোবা থেকে একটা মানুষ ভেসে যাচ্ছিল, গাছগাছালিব সঙ্গে ভেসে যাচ্ছিল, তাকে উদ্ধাব কবে আনা হযেছে—অফিসাবেব বিপোর্টেব পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট। এতক্ষণ ধবে এতটা দূবত্ব যে-ফ্লাডেব ভেতব ভাসতে-ভাসতে এসেছে, সে ত এতটাই অসুস্থ হযে পড়তে পাবে বা 'শক্‌ড' হয়ে থাকতে পাবে যে নিজেব নামটা আব বলতে পাবে না।

'আপনাব নামডা কন, নামডা, স্যার লিখবেনে।' বাঘারু চুপ কবে থাকে।

একটু সময নিয়ে নরেশ বলে, 'কী, কইবেন না নামডা?'

বাঘারু বলে, 'মোব নাম নাই বো।'

নরেশ এবার না হেসে বেগে যায়, 'ফ্লাডে ভাইস্যা আসাব আগে একখানা নাম দিবাব পাবেন নাই নিজেব? ত এইখানে কম্বল, কাপড, তিরপল, চিডাগুড—এইগুল্যা কুন নামে দিব আপনারে? না, এইগুলান লাগব না?'

নবেশ আশা কবেছিল, বাঘারু এত জিনিশেব সম্ভাবনায লোভী হয়ে উঠে নামটা বলে দিতে পাবে। কিন্তু বাঘারু বলে, 'গযানাথব নাম দেন কেনে।'

'আবে—গযানাথ আবাব? বিলিফ দিব আপনাক্, আব নাম লিখব গযানাথেব?'

'মোর ন্‌া নাগে।'

অফিসার ততক্ষণে 'গযানাথ জোতদারের জমিতে কর্মরত একজন কৃষিশ্রমিক' কথাকটি লিখে ফেলে, ড্রাইভারকে বলে, 'চলো', আব নবেশকে বলে, 'ছেড়ে দাও। কাল তোমরা যখন অফিসে যাবে তখন শুনে যেও।'

একশ বাহান্ন

দেড় হাতি ত্যানার বন্ধন, নাইলনের দড়ির বন্ধন ও টি-ভি ক্যামেরা ইত্যাদি নিয়ে বৃক্ষপর্বের শেষ অধ্যায়

বৃক্ষপর্ব এখানেই শেষ হতে পারে। বৃক্ষপর্বে ত বাঘারু কী করে গয়ানাথের গাছগুলোর সঙ্গে ভেসে এসে নিতাইদের চরে উঠল ও সেখান থেকে রংধামালির বাঁধে উঠল তার কাহিনী। রংধামালির বাঁধে সেদিন বিকেলে নরেশকে অফিসার যা টাকা দেয়ার দিয়েছে। পরদিন অফিসে যেতে বলেছে। আর-একটা রশিদে আরো কিছু টাকা দিয়ে দেবে। বাঘারু যে তার নামটা বলে উঠতে পারেনি সেটা সেদিক থেকে ভালই হয়েছে—অফিসার নিজের মত কিছু একটা লিখে নিতে পেরেছে। একটা লোক, বাঘারু, অথচ সে দুবার 'রেসকু' হয়েছে—তা হলে ত তার একটা নাম নতুন হতেই হয়। বেশি লোক 'রেসকিউ' করতে পারলে সেটা ত অফিসারের সার্ভিস ফাইলে লেখা থাকবে।

বাঘারু তার গাছগুলোকে নিয়ে একটু সরে গিয়েছে। সেখানেই বেঁধেছে। সে এই বাঁধের চরুয়াদের একজন নয়, কিন্তু আবার তাদেরই একজন। সে তার মাচানেই থাকে। মাঝেমধ্যে বাঁধের ওপরও ওঠে। কাদাখোয়ার সঙ্গে বাঘারুর আর দেখা হয় না। দেখা হয় না, মানে কথা হয় না। ওদের দুজনের পরস্পরকে বলার মতো কোনো কথা নেই। কাদাখোয়ার ত কাজকম্ম আছে—যদিও এখন কাজকম্ম কমই। বাকি সময় সে গামছা দিয়ে মাথা মুড়ে বোল্ডারের ওপর ঘুমবে। বাঁধের লোকজন কোনো সময় বাঘারুকে 'কাদাখোয়া' বলে ও কাদাখোয়াকে 'গাছারু' বলে ডেকে ফেলে।

বাঁধে এসে বাঘারু এই নতুন একটি নাম পেয়েছে, 'গাছারু'। সে তার নাম বলেনি কিংবা বললেও বাঁধসুদ্ধ লোক তা জানতে পারত না। তারা তাকে নিজেদের একটা ডাকনাম দিতই। বাঘারুর গলার নাইলনের দড়ির বান্ডিলটা নিয়ে সে-নামটা তৈরি হতে পারত। কিন্তু হয়ে ওঠেনি। অতগুলো গাছ আর সেই গাছের সঙ্গেই বাঘারুর শরীর বাঁধা, আবার, সেই গাছের মাচানেই বাঘারুর শোয়াবসা—এই সব কারণে 'গাছারু' নামটাই চালু হয়ে গেছে। এ-চরে পূর্ববঙ্গের লোকরা অনেকে আছে—সেদিক থেকে 'গাছুয়া'ই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের বহির্ভূত কারণে নামকরণ ইত্যাদির ব্যাপারে পূর্ববঙ্গের এই লোকরাও তিস্তাপারের আদি নিয়মকানুনই মেনে ফেলে।

বাঁধে বাঘারু, গয়ানাথ ও আসিন্দিরের জন্যে অপেক্ষা করে। এই অপেক্ষা করা ছাড়া তার আর-কোনো কাজ নেই। এই বন্যা, হাওয়া, বৃষ্টি থামতে-থামতে আসিন্দিরের ভটভটিয়াতে চড়ে গয়ানাথ ঠিক এসে যাবে। বেশি খুঁজতে হবে না গয়ানাথকে—ঠিক জেনে যাবে বাঘারু বাংধামালির বাঁধে এসে ঠেকেছে।

কিন্তু সে-সব কোনো কিছুতেই বাঘারুর কোনো ভূমিকা নেই। তাকে দূর থেকে নিয়ে এসে গাজোলডোবা থেকে ফ্লাডে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছিল। সে বিশ্বস্তভাবে ভেসে এসেছে। সে যেখানে ঠেকে যাবে সেখানেই যেন থেকে যায়। সে ফ্লাডের ভেতর ঐ চরে আটকে গিয়েছিল—এখন এই বাঁধে এসে আটকে আছে। এখন আর তার শরীর এই ফ্লাডের সঙ্গে জড়িয়ে নেই। গয়ানাথের জন্যে অপেক্ষা দিয়ে এই বৃক্ষপর্ব শেষ হতে পারে।

নিতাই যে-বিলিফের ব্যবস্থা করে ফেরে—তার ভাগ বাঘারুও পায়। এ-রকম বানভাসি বিলিফে ত প্রত্যেকের নামে আলাদা করে চিড়েগুড় লিখতে হয় না—তাই মোট হিশেবের মধ্যে বাঘারু ঢুকে যায়। কিন্তু ফ্লাড, হাওয়া ও বৃষ্টি না-কমলে চালগমের ব্যবস্থা হবে, ফ্লাডের জল নেমে যাওয়ার পরও নিতাইদের চর না শুকলে কাপড়, জামা, কম্বল ও ক্যাশডোলেরও ব্যবস্থা হবে—তখনো যদি বাঘারুকে চরুয়াদের একজন হয়ে থাকতে হয় তা হলে তার পুরনো নামধাম দরকার হবে, নতুন ডাকনামে চলবে না।

কিন্তু সে সম্ভাবনা দুই কারণে কম। চরের লোকজন ঐ চরেরই লোক বলে যে বিশেষ সুযোগসুবিধে পাবে তাতে বাঘারুকে ঢোকাতে চাইবে না। এই সব সুযোগসুবিধে দেয়া হয় পরিবারের ভিত্তিতে। বাঘারু চরের কারো পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়। তৎসত্ত্বেও ফ্লাডের তিস্তায় অনেকে যেমন ভেসে-আসা টিনের চাল পর্যন্ত পেয়ে যেতে পারে, বা, শালের খুঁটি, ভামনির চাল, বাঁশের খুঁটি ত পেতেই পারে—তেমনি বাঘারুর মত ভেসে-আসা জোয়ান কাজের 'মানষি'ও পেয়ে যেতে পারে। নরেশ বা অমূল্য তা হলে বাঘারুকে নিজেদের পরিবারভুক্ত দেখাতেও পারত ও বাঘারুর প্রাপ্য জামা-কাপড়, কম্বল, চালগম এ-সব পেতেও পারত। কিন্তু বাঘারু বড় বেশিবার গয়ানাথ জোতদারের নাম বলে-বলে এটা সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে—তার 'একখান দেউনিয়া' আছে, সেই দেউনিয়ার গাছগুলোই সে সঙ্গে নিয়ে এসেছে (এই শেষের কথাটি অবিশ্যি কোনো সময়ই খুব স্পষ্ট হয়নি)। তাছাড়া, অতগুলো গাছ ত একটা সম্পত্তির মত। বাঘারুকে দেখেই বোঝা যায়, এ-সম্পত্তি তার ত হতেই পারে না, বরং এই গাছগুলোর যেমন মালিক আছে, তারও তেমনি মালিক আছে। চরের লোকজন সম্পত্তির নিয়মকানুন জানে। তাই, নরেশ বা অমূল্যর মত সম্পত্তির মালিক, বাঘারু ও গাছের সম্পত্তির মালিকের সম্পত্তিতে ভাগ বসায় না। বাঘারু চরুয়াদের একজন হয়ে যেতে পারে না, এটা তার একটা কারণ। তাই চরুয়া বানভাসি হিশেবে তার নাম রেকর্ড হয় না।

দ্বিতীয় ও আর-একটি কারণ হল—বাঘারুকে ও গাছগুলোকে গয়ানাথ এতদিন এখানে কখনোই ফেলে রাখবে না। সে এই বৃষ্টি-হাওয়া ও বন্যার মধ্যে এসেই বাঘারুকে ও গাছগুলোকে ধরে ফেলবে।

বাঘারু গয়ানাথের যেমন তেমনি গয়ানাথেরই থাকবে। বরং গাছগুলো গয়ানাথ এখানেও বেচে দিতে পারে। কিন্তু বাঘারুকে আবার তার জায়গায় পাঠিয়ে দেবে।

এখন দেখে বোঝার উপায় থাকে না মাত্র দু-চারদিন আগেও তিস্তা এ-রকম ছিল না, সামনে নিতাইদের চরে ভরভরন্ত গ্রাম ছিল, এই বাঁধটা ফাঁকা ছিল। এখন দেখে মনে হয়, তিস্তায় যেন সারা বছরই এ-রকম ফ্লাড থাকে আর এই লোকজন এই বাঁধেরই বাসিন্দে। এরা সব এক গ্রামেরই লোক, ফলে বাঁধে এসে ওঠার পর সেই গ্রামের নিয়মেই বসবাস চালিয়ে যেতে কোনো অসুবিধে হয়নি। শুধু প্রতিদিনের কাজটা নেই—সেই কাকডাকা ভোর থেকে কাকের বাসায় ফেরা সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ। তার বদলে অবিশ্যি কেউ-কেউ রিলিফ-টিলিফ নিয়ে কিছু ব্যস্ত হয়ে পড়ে, কেউ-কেউ আবার শহরের জীবনযাপনের আস্বাদ ভোগ করতে থাকে। সিনেমা দেখা ত আছেই, তা ছাড়াও শহরের মধ্যেই ঘোরাফেরা। কেউ-কেউ আবার দিনবাজারের কাছে মেয়েদের পাড়ায় যাতায়াত করছে। ফলে, কখনো-কখনো যেন মনে হয়—এরা যেন এই বাঁধের স্থায়ী বাসিন্দে, তেমনি কখনো-কখনো আবার মনে হয়—এরা গ্রামসুদ্ধ লোক যেন ছুটি কাটাতে এখানে এসে উঠেছে। এর মধ্যে অনেক দিন ধরে জমিয়ে রাখা সর্ষে, বা তক্তা, বা বাঁশের জিনিশপত্র দিনবাজারে নিয়ে বিক্রি করার সুযোগ কারো-কারো এসে যায়।

বাঘারু অতগুলো গাছ নিয়ে বাঁধেরই এক কোণে, এদের মধ্যেই অথচ এদেরই একজন না-হয়ে যে দিন কাটাচ্ছে তাও নজরে পড়ে যায় কারো। এমনি বাঘারু যদি থাকত, তা হলে তাকে কেউ দেখত না, কিন্তু সে যে অতগুলো গাছ আগলে বসে আছে তাতেই যাদের দেখার তারা তাকে ও তার গাছগুলোকে দেখে ফেলে। তাদের কেউ-কেউ এসে বাঘারুর সঙ্গে কথাবার্তাও বলে।

রংধামালি হাটের এক কাঠের আড়তদার এসে বাঘারুর গাছগুলোর পাশে অনেকক্ষণ বসে ছিল। এর আড়তটা ছোট, কোনো ইলেকট্রিক করাত নেই। কিন্তু একটা করাতে গাছ কেটে তক্তা বানায় জনা তিন বিহারি মজুর। তার আড়তে আস্ত-আস্ত কিছু গাছ আছে আর একটা শেডের তলায় থাকে বিভিন্ন সাইজের তক্তাগুলো। লোকটি কোন দেশী তা জানা যায় না, নাম চরণ রায়। কথায় একটা বিদেশী টান আছে, চেহারায় নেপালি ধাঁচ আছে, রাজবংশীও মনে হতে পারে। সে একদিন গাছগুলো দেখে যাওয়ার সময় বাঘারুকে বলে, 'মোর স-মিলত আসেন না কেনে বাউ ? দিনরাতি এইঠে নদীর পাড়ে করিবেনটা কী ? রাতিত্ ঐঠে ঘুমাবার পারেন—'

বাঘারু যেন কথাটার কোনো মানেই বোঝে না। কথাটা যেন আর-কাউকে বলা, সে এমনই চুপ করে থাকে। কিন্তু লোকটা আবার এসে জিজ্ঞাসা করে—'আরে ক্যানং মানষি হে আপনে ? সাগাই (নেমন্তন্ন) দিছু, তাও না গেলেন।' বাঘারু এ-কথারও কোনো জবাব দেয় না। লোকটা তখন বিড়ি টানতে-টানতে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমরালার জোতদারের স-মিল আছে কি নাই ?'

বাঘারু অন্য দিকে তাকিয়ে জবাব দেয়, 'না, জানো।'

বাঘারুকে লোকটা একটা বিড়ি দেয়। সেটা নিতে বাঘারুকে গাছ থেকে নেমে আসতে হয়, তার জ্বালানো কাঠি থেকে বিড়িটা ধরাতে তার কাছাকাছি যেতে হয় ও বিড়িটা ধরিয়ে তার কাছাকাছিই বসতে হয়।

লোকটা তখন বলে, 'এ ত ফরেস্টের গাছ হে! তুমি ভাসি নিযা আইচছেন।'

বাঘারু চুপ করে থাকে। লোকটি বলে, 'পুলিশ দেখিলে ধরিবে।'

'কাক ধরিবে ?'

'তোমরাক্ ধরিবে। তোমরার গাছ, তোমরাক্ ধরিবে।'

'হামাক্ ?'

'হয়, তোমাক্ ধরিবে।'

লোকটার কথাটা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতেই বাঘারু যেন আরো গভীর ভাবে বিড়ি টানে। তার পর লোকটাকে বলে, 'মোক আর-একখান বিড়ি দাও কেনে।' লোকটি দিলে সেই বিড়িটা কানের পেছনে গুঁজে রাখে বাঘারু।

লোকটি বলে, 'গাছগিলা মোক বেচি দেন, মুই আড়তবাড়িত্ রাখি দিম। কায়ও জানিবার পারিবে না। স্যালায় তোমার জোতদারের ঘর আসিলে মোর পাকে নিগাও। টাকা দিয়া দিম।'

বাঘারু বিড়ি টানে। লোকটি নিজে বিড়ি ধরাবার আগে বাঘারুকে দেয়। বাঘারু সেটা আর-এক কানের পেছনে গোঁজে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ নিয়ে কোনো কিছু ঠিক হয় না। লোকটি উঠে যাওয়ার সময় যদিও বলে যায়, 'কালি আসিম মোর কবাতিয়ার ঘর নিয়া—', কিন্তু সত্যি-সত্যি সে আসে না।

তার বদলে এসেছে জগদীশ বারুই। এসেছে বলা ঠিক নয়, কারণ জগদীশ বারুই ত এই বাঁধের ওপরই থাকে, সে আর আসবে কোথা থেকে? কিন্তু বাঁধের ওপরে বা ঢালে যখনই বাঘারুর সঙ্গে জগদীশের দেখা হয়, তখনই সে বাঘারুকে একটা বিড়ি দিয়ে ফিসফিস করে বলে, 'আরে, তোর জোতদার কি গুইন্যা রাখছে কয়ডা গাছ তুই ধরছিস? একখান বেইচ্যা দে, ঐ চাঁপাগাছখানই দে, আর টাকা নিয়্যা লুকাইয়্যা থো।' তারপর নিজের মনেই হেসে বলে, 'টাকা থুবিই-বা কনে? আছে ত ঐ একখান নেংটি। তা থুস, ঐ হানেই থুস, নেংটির মইধ্যে? কী, রাজি ত?' জগদীশ বলে। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে, 'শালা বোগদা', বলে আবার সরে যায়।

মানুষ যেখানেই থাক, সেখানকার পরিবেশ-পরিস্থিতি, তাকে বুঝে নিতেই হয়। বাঘারুও বুঝে নেয় যে ঐ স-মিলের মালিক আর জগদীশ তাকে গাছগুলো, অন্তত একটা গাছ, বেচে দিতে বলছে। গয়ানাথের নানারকমের ব্যবসা, দশ রকমের জোতদারি। তার জোতজমি আছে, ডায়না নদীর পাহাড়ে তার মোষের বাথান থেকে মিলিটারিদের দুধ যায়, তার ফরেস্ট আছে, তার হাট আছে, তার নদী আছে। আর এই সব জায়গাতে কোনো-না-কোনো কাজে ত বাঘারুকে যেতে হয়, ঘুরতে হয়। তাকে অফিসারের পেছনে-পেছনে চেয়ার নিয়ে ছুটতে হয়, তাকে এম-এল-একে ঘাড়ে করে নদী পেরুতে হয়, তাকে বনের মধ্যে মোষের বাথান চরাতে হয়। গয়ানাথের এত কিছু করে যে-বাঘারু, সে কি আর বোঝে না যে এই চারটি গাছের মধ্যে একটি গাছ, ঐ চাঁপা গাছটাই, বেচে দিয়ে গয়ানাথকে বলে দেয়া যায়—অন্ধকারে কখন গাছটা খসে গেছে সে বুঝতেই পারে নি? গয়ানাথ এই কথা শুনে রাগতে পারে, গালাগাল করতে পারে, মারতেও পারে—কিন্তু তার বেশি আর কী করবে? টাকা যদি নেংটির মধ্যে নাও রাখে, এত বোল্ডার চারদিকে—কোনো একটা পাথরে ঢাকা দিয়েও ত রাখতে পারে। বাঘারু খুব ভাল করেই জানে—এ-সব হয়, এ-সব করা যায়। বাঘারুর মাও ছিল গয়ানাথের, বাঘারু গয়ানাথের। দুই-দুই পুরুষ ধরে গয়ানাথের সঙ্গে থেকে-থেকে বাঘারু এটুকু শেখেনি যে গয়ানাথের একটা গাছ বেচে দেয়াটা কত সহজ? ফরেস্টের ভেতর থেকে বন্যার তোড়ে আলগা হয়ে স্রোতে পড়ে যাওয়া গাছ কেটে বন্যার জলে ভাসিয়ে দেয়ার চাইতেও কত সোজা? বাঘারু একবার 'নিগাও কেনে' বললেই ত ঐ আড়তদারের লোকেরা এসে গাছ কেটে নিয়ে চলে যাবে। কিন্তু বাঘারু আড়তদারের আর জগদীশের দেয়া বিড়ি কানের পেছনে গোঁজে আর বুকে নাইলনের দড়ির বান্ডিল ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কেন বাঘারু 'নিগাও কেনে' বলে না, তা বাঘারুও জানে না। কিন্তু বাঘারু বলে না, বলার কথা ভাবেও না। বলা যায় এটা জেনেও, বলবে কি বলবে না এই নিয়ে, এমন-কি কোনো মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যেও যেতে পারে না বাঘারু। এতে মনে হতে পারে যে তার মন নেই, তাই মানসিক দ্বন্দ্বও নেই। তা মেনে নিলে বলতে হয়, তার মন নেই কিন্তু শরীর আছে—তার প্রতিদিনের বাঁচা এই শরীরের সর্বস্বতা দিয়েই বাঁচা। যদি বাঘারু তার নাইলনের দড়ির সঙ্গে বাঁধা চারটে গাছের মধ্যে একটা গাছ বেচে দেয়, তা হলে ঐ চারটে গাছ একসঙ্গে বেঁধে এই ফ্লাডের তিস্তায় তার শরীরের যে-বাঁচা, তা থেকে ত একটা গাছ কম পড়বে! দ্বন্দ্বে দীর্ণ হওয়ার মন পর্যন্ত নেই যে-বাঘারুর, শুধু শরীরটুকুই আছে যে-বাঘারুর, এমন-কি হাজার হাজার বছর ধরে তৈরি মানুষের এত পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যে মাত্র দেড় হাতি এক ত্যানা লেগে আছে যে-বাঘারুর সম্পূর্ণ মানবশরীরটিতে, সেই দেড় হাতি ত্যানাতেই মাত্র যে-বাঘারু মানবসভ্যতার সঙ্গে বাঁধা—সেই বাঘারু, প্লাবিত নদীতে, বৃষ্টিতে, ঝড়ে ও অন্ধকারে এতটা বন্যা পেরিয়ে আসা এই শরীরটা থেকে একটা গাছের বাঁচা বেচে দেবে কী করে? বাঘারুর যেমন মন নেই, তেমনি হয়ত মাথাও নেই। তাই সে কোনো কিছু করার পক্ষে যেমন যুক্তি জোগাড় করতে পারে না, তেমনি কোনো কিছু না-করার পক্ষেও যুক্তি বানাতে পারে না। সে হয় একটা কাজ করে ফেলতে পারে অথবা না-করতে পারে। যুক্তির প্রয়োজনীয় জোগান দেয়ার মত একটা মাথা পর্যন্ত নেই যে-বাঘারুর সে কী করে জগদীশ বারুইকে বা সেই কাঠের আড়তদারকে 'না' করবে? সে শুধু ঐ চারটি গাছের সঙ্গে নিজেকেও বেঁধে ঐ নাইলনের দড়ির বান্ডিলটা গলায় ঝুলিয়ে বাঁধের ওপর কখনো-কখনো দাঁড়াতে পারে, পাথরের আঙিনার ওপর দিয়ে কখনো-কখনো হাঁটতে পারে, নিজের গাছগুলোর মাচানের ওপর শুতে পারে। কুড়ালিয়াটা

এখন বাঘারু সব সময় পেছনে গুঁজে রাখে না—একটা গাছের একটা ভেতরের ডালে কোপ বসিয়ে রেখে দিয়েছে।

এ-রকম ভাবেই বাঘারু এখানে, এই রংধামালির বাঁধে গয়ানাথের, ও ফ্লাড কমে যাওয়ার, অপেক্ষায় দিন কাটায়।

বন্যা ত আর অনন্তকাল ধরে চলে না—একদিন না-একদিন শেষ হয়। কিন্তু কবে শেষ হয় তার ওপর নির্ভর করবে খবরের কাগজ, টেলিভিশন এ-সব এই বন্যার কথা কতটা বলবে, কতটা দেখাবে। বিদ্যুতের মত এসে বজ্রপাতের মত মৃত্যু ঘটাতে পারে যদি কোনো ফ্লাড, তবে দীর্ঘস্থায়ী না হলেও সেটা খবর হতে পারে। তিস্তার সেবারের বন্যাটাও খবর হয়ে উঠল—বেশ ক-দিন থেকে গিয়ে। ফলে কলকাতা থেকে কাগজের ফটোগ্রাফাররা আর টিভির ক্যামেরাম্যান এসে পড়তে পারে। কিন্তু তাদের সব সময়ই তাড়াতাড়ি ফেরার তাড়া থাকে। সেই জন্যে জেলার তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর থেকে শহরের পাশের এই দুটো জায়গা দেখিয়ে-দেয়া হত। জলপাইগুড়ি শহর থেকে আট মাইল ভাটিতে মণ্ডলঘাটের দু-নম্বর চর আর মাইল চার-পাঁচ উজানে এই বংধামালির বাঁধ। দুই জায়গাতেই কিছু বানভাসি পরিবার উঠে এসেছে, গরুবাছুরও আছে, গবর্মেন্টের ত্রিপলও আছে। বংধামালি হাটের বিশেষ সুবিধে এই যে দেখেই সোজা তিস্তা ব্রিজ দিয়ে ডুয়ার্সে চলে যাওয়া যায়।

এ-রকম সব সময়, বিশেষত টিভির লোকজন যখন এসেছিল, তখন ক্যামেরাম্যান ও কাগজের ফটোগ্রাফাররা বাঘারুকে আবিষ্কার করে ফেলে। জেলা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর অবিশ্যি একটা তালিকা দিয়েছে। তাতে কোথায় কত লোককে উদ্ধার করা হযেছে তার হিশেব ছিল। কিন্তু সে হিশেবের মধ্যে বাঘারুর কোনো আলাদা পরিচয় ছিল না। ততদিনে, সেদিন সন্ধ্যার বাঘারুউদ্ধার কাহিনী সরকারি সংখ্যাতত্ত্বের ভেতর একটা সংখ্যামাত্র হয়ে গেছে, বা তাও হয়েছে কিনা সন্দেহ। ফটোর লোকজনেরা বাঘারুকে আবিষ্কার করেছে নিজেদের গুণেই।

এমনি ত তিস্তার জল পেছনে রেখে বুড়োবুড়ি, মোষ, গরুমাছুর, বাচ্চাকোলে মা, জলের বিস্তার—এ-সব ছবি তোলা হচ্ছিলই। বাঘারু যে-জায়গায় তার গাছ বেঁধেছিল সেখানে ফটোর লোকজনদের পৌঁছুনোরই কথা নয়। কিন্তু টিভির ক্যামেরাম্যান একটা দূরদৃশ্যে বাঁধ থেকে তিস্তাটাকে গোল করে বাঁ থেকে ডাইনে ফিরে আসতে-আসতে ভিউফাইন্ডারে বাঘারুকে পেয়ে যায়—বাঘারু দাঁড়িয়ে আছে, দড়ির বান্ডিল গলায়, গাছের মাচানে, গাছপালার মধ্যেই, মনে হচ্ছিল যেন জল থেকে ফুঁড়ে বেরচ্ছে। প্যানিং শেষ হলে ক্যামেরা নিয়ে ক্যামেরাম্যান বাঘারুর সামনে চলে যায় , বাঁধ থেকে ঢাল বেয়ে নেমে বোল্ডারের শেষ পাড়টুকুতে জলের কিনারে হাঁটু গেড়ে বসে সে জলের ভেতর থেকে শাল গাছ-চাঁপা গাছ-খয়ের গাছ-সিসু গাছ সহ এক প্রায়-ফরেস্ট নিয়ে উত্থিত বাঘারুকে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের সামনে দাঁড় করাতে চায়। অতটা না পেলেও, অনেকটা পায়। সে যতটা চাইছিল ততটা পেতে গেলে তাকে জলের ওপর শুয়ে ক্যামেরা আকাশের দিকে তুলে ছবি তুলতে হত। সে অবিশ্যি বাঘারুকে একট 'মুভ' করতে বলে, কিন্তু বাঘারু নড়ে না। ফলে ছবিটাকে স্থিরচিত্র মনে হতে পারে বলে তার ভয় হয়।

টিভির ক্যামেরাম্যানের পেছনে-পেছনে কাগজের ফটোগ্রাফাররাও এসে দৌড়তে-দৌড়তে ছবি তুলতে থাকে। টেলি ও ওয়াইডে বাঘারুর নেংটিপরা শরীর, মুখরেখা ও বাঁধসহ বন্যার পরিধি ধরা পড়ে যায়। তারাও বাঘারুকে ঘুরেফিরে দাঁড়াতে বলে কিন্তু বাঘারু স্থিরই দাঁড়িয়ে ছিল। ফটোগ্রাফারদের মধ্যে ভাল ভিসুয়ালের জন্যে প্রতিযোগিতার উত্তেজনার মধ্যেই এমন রসিকতাও চলছিল, 'লোয়ার পার্টে টেলি ফেলো না,' 'দেখিস, আবার নেংটির ভেতরের লোমটোমসুদ্ধু তুলে ফেলিস না,' ইত্যাদি। এতটা নগ্ন অথচ এতটা গোটা একটা শরীরকে লেন্সে সামলানো শক্ত। টিভির ক্যামেরাম্যান অবিশ্যি একেবারে তলা থেকে আকাশ পর্যন্ত একটা দারুণ প্যানিং করেছে—বন্যার জল, ক্লোজ-আপে আবর্ত, গাছের ডালপালায় জলের স্রোতের আঘাত, আরো ডালপালা, বাঘারুর দুটো পা—ক্লোজ-আপে, ধীরে-ধীরে হাঁটু, উরু, কোমর, নেংটি। মিডিয়াম শটে পেট, বুক, তারপর মাথা। সেখান থেকে বাঘারু ধীরে-ধীরে, দিগন্ত থেকে দিগন্তে, আকাশে নদীতে, স্থাপিত হয়।

গয়ানাথের আসা পর্যন্ত এ-সবের মধ্যেই বাঘারুর বৃক্ষপর্ব কাটে।

মিছিলপর্ব

উত্তরখণ্ডের স্বতন্ত্র রাজ্য দাবি

একশ তিপ্পান্ন

গয়ানাথের স্বগত চিন্তা

গয়ানাথ জোতদার সাত-সকালে আসিন্দিরের মোটর সাইকেলের পেছনে বসে জলপাইগুড়ি শহরে তার উকিলবাবুর বাড়ি যাচ্ছিল। এখনো ঠিক আছে, ফেরার সময় বাসে ফিরবে, আসিন্দির তার কাজে চলে যাবে। সেই যে তিস্তা ব্যারেজের সেটলমেন্টের সময় শুরু হয়েছিল—এখন সে-ব্যারেজ গত কয়েক বছরে নদীর মাঝামাঝি পর্যন্ত চলে গেছে—আসিন্দির তার শ্বশুর গয়ানাথের ড্রাইভারই হয়ে গেছে অনেকটা। গয়ানাথ জোতদারের মত বিখ্যাত লোকের নাম এখন লাটাগুড়ি-বামসাই-ওদলাবাড়ি-ক্রান্তিহাট-মৌলানি, এমন-কি ময়নাগুড়িতেও, 'ভটভটি জোতদার' বলেই চালু হচ্ছে। প্রথম-প্রথম লোকে আড়ালে বলত, এখন অনেকে তাকে 'এ ভটভটি দেউনিয়া' বলে ডেকেও ফেলে। গয়ানাথ এই নিয়ে রাগারাগি ছেড়ে দিয়েছে।

মোটর সাইকেল ত আসিন্দিরের অনেক কালই আছে। কিন্তু আগে গয়ানাথ কখনো তার পেছনে উঠত না, ওঠার দরকারও পড়ত না। জলপাইগুড়ি শহরে তার বাবার আমলের বাঁধা উকিলবাবু আছেন। তার বাবা থেকে তার সময়ের মধ্যে 'বুড়া উকিলবাবু'র ছোয়া উকিল হল, 'বুড়া উকিলবাবু' মারাও গেলেন, এখন সেই 'ছোয়া' উকিলবাবু হয়েছেন। তেমন দরকারে উকিলবাবুই লোক পাঠিয়ে ক্রান্তিহাটে খবর দিতেন, পরদিন সকালের বাসে জলপাইগুড়ি গিয়ে উকিলবাবুর সঙ্গে কথা বলে বিকেলের মধ্যে গয়ানাথ ফিরে আসতে পারত।

কিন্তু তিস্তা ব্যারেজের সেই-যে স্পেশ্যাল সেটলমেন্ট শুরু হল, তারপর থেকে গয়ানাথের যেন আর বিশ্রাম নেই। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে তার অংশের খতিয়ান নিয়ে মামলা, ব্যারেজের জন্যে জমি নিয়ে নেয়া হয়েছে তার বিরুদ্ধে মামলা, ক্ষতিপূরণের হারের বিরুদ্ধে মামলা—যেন মামলার কুরুক্ষেত্র। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বিরুদ্ধে মামলায় ত কিছু স্টে অর্ডার গয়ানাথ বের করেত পেরেছে। কিন্তু ক্ষতিপূরণের মামলা আর জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে মামলা কলকাতার হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে। জলপাইগুড়ির উকিলবাবুর লোকই কলকাতার উকিল ধরে দিয়েছে। গয়ানাথকে যেতে হয় নি, কিন্তু প্রথম বার, উকিলবাবুর লোকের সঙ্গে আসিন্দিরকে যেতে হয়েছিল। তার পর সে মামলা চলছে ত চলছেই। একবার একটা ক্ষতিপূরণের মামলা গয়ানাথ জিতেওছে—সরকারও সেই আদেশের বিরুদ্ধে কোনো আপিল করে নি। বরং কোর্টের রায় অনুযায়ী নতুন হিশেবনিকেশ করে পাওনাগণ্ডা সাত-তাড়াতাড়ি মিটিয়ে দিয়েছে। গয়ানাথ যখন দেখল সরকার আপিল করল না, তখন সে আরো বেশি ক্ষতিপূরণের জন্যে আপিল করতে চাইলে তার উকিলবাবু বুঝিয়েছিলেন যে ও-রকম আপিল করা যায় না। গয়ানাথ বুঝে ফেলে সরকার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যারেজটা শেষ করতে চায় বলেই কোর্টের হুকুম মাথা পেতে নিচ্ছে। তা হলে ব্যারেজটা হচ্ছেই—এটা গয়ানাথ বুঝে নিয়ে আরো অস্থির হয়ে ওঠে।

আগে আসিন্দির তার মোটর সাইকেল নিয়ে ঘুরে বেড়াত আর গয়ানাথ তার জোতজমিতে হেঁটে বেড়াত। কিন্তু ঐ স্পেশ্যাল সেটলমেন্টের পর থেকে গত কয়েক বছরে আসিন্দির, তার মোটর সাইকেল, আর গয়ানাথ এক হয়ে গেছে। ময়নাগুড়ির চৌপত্তি দিয়ে গয়ানাথ-আসিন্দিরের যাওয়ার কথা নয়। 'ভারতী' সিনেমার কাছে ডান দিকের রাস্তা ধরে তারা বেরিয়ে যেতে পারত। কিন্তু ময়নাগুড়িতে মরণচাঁদের দোকানে মিষ্টি আর চা খাবে বলে তারা চৌপত্তিতে আসে। মোটর সাইকেলের পেছন থেকে নেমে গয়ানাথ চাদরটা ঝাড়ে। তারপর একবার তাকিয়ে দেখে, চেনাজানা কাউকে পায় কি না। সামনে, রাস্তার ওদিকে একটা মিনিবাসের ভেতরে লোকজন, গাড়িটা আরো দু-চারজন প্যাসেঞ্জার নেওয়ার জন্যে দাঁড়িয়ে। যতক্ষণ আসিন্দির তার মোটর সাইকেল দাঁড় করিয়ে মরণচাঁদের দোকানে ঢুকে—'দুই জায়গায় দুইটা করি বোল্ডার, দুই কাপ চা', বলে বসে, তার মধ্যে গয়ানাথ রাস্তা পেরিয়ে ঐ মিনিবাসটায় একটা পাক দিয়ে আসে—চেনা কাউকে পায় না। কিন্তু ফেরার সময় চৌপত্তিজোড়া ফেস্টুনটা তার নজরে পড়ে। উত্তরখণ্ড সম্মিলন হচ্ছে ময়নাগুড়িতে। গয়ানাথের কাছে ওরা একবার গিয়েছিল। কিন্তু

গয়ানাথ এ-সবের মধ্যে যায় নি। রাস্তা পেরবার জন্যে এদিক-ওদিকে তাকাতে গিয়ে গয়ানাথ দেখে উত্তরখণ্ডের অনেক পোস্টার।

মরণচাঁদের দোকানে ঢুকে, আসিন্দিরের পাশে বসতে-বসতে গয়ানাথ বলে, 'হেপাখে এই উত্তরখণ্ড মানষিগিলান খুব মিটিং দিবার ধরিছেন।' তারপর বিরাট সাইজের লালচে রসগোল্লা চামচ দিয়ে কাটে—রসগোল্লার ওপর থেকে মাছিগুলো উড়ে যায়।

আসিন্দিরের রসগোল্লা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। সে চায়ে চুমুক দিয়ে বলে, 'তোমাক কহিলাম জয়েন দেন। বোম্বাইঠে সিনেমার বেটিছোয়া আনিবার ধরিছে।'

প্রথম বার চামচে যতটা মুখে দিতে পেরেছিল সেটা চিবিয়ে গয়ানাথ গেলে। রস তার দাঁতে লাগলে সিড়্‌সিড়্ করে। তাই কৌশল করে রসগোল্লার টুকরোটা টাকরার পেছন দিকে নিয়ে জিভ দিয়ে চিপে খেতে হয়। একটু সময় লাগে।

দ্বিতীয় টুকরোটা মুখে ফেলার জন্যে চামচে তুলতে-তুলতে গয়ানাথ আসিন্দিরকে বলে, 'মোক কি বেটিছোয়ার নখত নাচিবার নাগিবে এলায়?'

আসিন্দির চা শেষ করে জিভ দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছিল শব্দ করে। সেটা থামিয়ে জবাব দেয়, 'আপনাক নাচিবার কায় কহে? ইমরায় ত রাজবংশীর তানে পার্টি খুলিছে। এলায় ত কংগ্রেস নাই, সগায় উত্তরখণ্ড হবা চাহে। তোমবালাই-বা হবেন না কেনে? কত ত মামলা ঠুকিছেন সবকারের তানে কী হইল?'

কথাটা বলতে-বলতে পকেট থেকে সিগারেট-দেশলাই বের করে আসিন্দির দোকানের বাইরে চলে যায়। বাইরে গিয়ে সে সিগারেট ধরায় আর ভেতরে গয়ানাথ অনেকক্ষণ ধরে দ্বিতীয় রসগোল্লাটা শেষ করে। পুরো এক গ্লাশ জল খায়। ততক্ষণে তার চায়ে পুরু সর পড়েছে। কিন্তু সেই চা-টাও গয়ানাথ তারিয়ে-তারিয়ে খায়। এই সমস্ত ত একা-একাই করতে হয়—উত্তরখণ্ডে যোগ দেয়ার ব্যাপারে আসিন্দিরের প্রস্তাবটায় অতক্ষণ নীরব থেকে।

পয়সা দিয়ে গয়ানাথ বাইরে আসতে-আসতেই আসিন্দির মোটর সাইকেলের ওপর বসে স্টার্ট দেয়। গয়ানাথ তার চাদরটা বুকের ওপর আড়াআড়ি দিতে-দিতে আবার সেই নীল ফেস্টুন ও পোস্টারগুলো দেখে। দুপা এগিয়ে যায় মোটর সাইকেলের পেছন দিকে। আবার বলে, 'খুব জোর শুরু করিবার ধরিছেন হে তোমার উত্তরখণ্ড।' কিন্তু মোটর সাইকেলের আওয়াজে কথাটা শোনা যায় না। আসিন্দির পেছন দিকে হাত বাড়িয়ে পান, আর চুন-লাগানো বোঁটা, দেয়। গয়ানাথ সেটা নেয় না। আগে পাদানিটার ওপর ভর দিয়ে আসনে বসে, নড়েচড়ে ঠিক হয়, তারপর পানটা ধরে। গয়ানাথ পানটা নিতেই আসিন্দির মুখ বাড়িয়ে পিক ফেলে মোটর সাইকেলটা চালাতে শুরু করে। আসিন্দিরের পেছনে মোটর সাইকেলে বসতে এতই অভ্যস্ত হয়ে গেছে গয়ানাথ যে সে পানটা ঝেড়ে মুখে ঢোকাতে পারে। দাঁতটাত পড়ে যাওয়ায় গয়ানাথের মুখটা এতই চুপসানো যে পানটায় তার মুখটা একেবারে ভরে যায়।

মোটর সাইকেলে চলতে-চলতে ত আর দুজনের কোনো কথা হতে পারে না কিন্তু গয়ানাথের মনে নানা প্রশ্ন উঠছিল উত্তরখণ্ড নিয়ে। সে-সব কথা আসিন্দিরকে বলা যায়, কিছু খবর জানা যায়। কিন্তু এখনই কথাটা না-বলে, পরে, ধীরেসুস্থে আলাপ-আলোচনার অভ্যেস ত গয়ানাথের নেই। তাই কথাগুলো তখন বলতে না পারায় সেটা তার নিজের সঙ্গেই সংলাপ হয়ে দাঁড়ায়। বরাবর কংগ্রেসের লোক গয়ানাথ, কংগ্রেসকেই ভোট দিয়ে আসে। কিন্তু গয়ানাথ জোতদারের মত বিখ্যাত লোক ত শুধু একজন ভোটার হতে পারে না—জোতজমিতে বসত দেয়া কয়েকশ লোক তার কথাতেই ত ভোট দেয়। নইলে তার সম্মান থাকে কোথায় যদি সে একা গিয়ে শুধু নিজের ভোটটাই দিয়ে আসে? ভোটের আগে তেমন কোনো আদেশনির্দেশ গয়ানাথকে কখনো দিতেই হয় নি—সবাই জানে কী করতে হবে। কিন্তু সবাই ত জানত ফরেস্টটা গয়ানাথের। সেই জানায় ত তার কোনো লাভ হল না। তা হলে, 'গয়ানাথ আর মানষির দল কংগ্রেসেরই পাকে থাকিবেন এই কথাটার ত কোনো লাভ নাই। তা হাইলে এই সব মানষিক নিয়া গয়ানাথ নিজের জোরখান ত দেখাবার পারে।'

উকিলবাবুর বাড়ির সামনের মাঠটুকুতে মোটর সাইকেল থেকে নামার আগে গয়ানাথ নিজেকে এই পর্যন্ত বোঝাতে পারে।

একশ চুয়ান্ন

উকিলবাবু বনাম উত্তরখণ্ড

উকিলবাবুর বাড়ির সামনের মাঠটাতে আসিন্দিরের মোটর সাইকেলের পেছন থেকে নেমে গয়ানাথ হাতদুটো মাথার ওপর তুলে আড়মুড়ি ভাঙে। আসিন্দির মোটর সাইকেলটা ঘুরিয়ে নিতে-নিতে বলে, 'আসিছু।' কিন্তু রওনা হয়েও আচমকা থেমে গিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করে—'এইঠে আসিম, না চলি যাম ?' আড়মুড়ি ভাঙার টানেই হাতদুটো পেছনে নিয়ে গয়ানাথ ঘাড়টা নিচু করে। শরীরের শক্ত টানটান ভাবটা শিথিল হওয়া পর্যন্ত রাস্তায় আসিন্দির ভটভট করতে-করতে দাঁড়িয়ে থাকে। গয়ানাথ মুখ খুলে জবাব দেয় না ডান হাত তুলে আঙুল দিয়ে দেখায়। আসিন্দির তার অর্থ বোঝে—কোর্টে যেতে হবে। গয়ানাথ এবার উকিলবাবুর সেরেস্তার দরজায় সোজাসুজি গিয়ে দাঁড়ায়। উকিলবাবু বা তার মুহুরি তাকে একবার দেখে নিলেই গয়ানাথের কাজ শেষ। যখন দরকার, উকিলবাবুই তাকে ডাকবেন বা কোনো খবর দেয়ার থাকলে মুহুরিকে বলে পাঠাবেন। মুহুরিবাবু হয়ত গয়ানাথকে বলবে—কোর্টে দেখা করতে। ততক্ষণে গয়ানাথ এই মাঠটাতে দাঁড়িয়ে বা ঘুরেফিরে একটু-আধটু রোদ পোয়াতে পারে। বাইরের বারান্দার বেঞ্চির ওপরও বসে থাকতে পারে। এমন-কি, উকিলবাবুর সেরেস্তার কাজ শেষ হয়ে যাবার পর, সব লোকজন চলে যাবার পর, মুহুরি বাবুও সাইকেলে তাঁর বাড়িতে চলে গেলে, গয়ানাথ হয়ত এখানে বসেই থাকবে। উকিলবাবু স্নানখাওয়াদাওয়া সেরে রিক্সায় কোর্টে রওনা হওয়ার সময় হয়ত বলবেন, 'কী গয়ানাথ বাবু ! চলেন, কাছারিতে চলেন।' উকিলবাবুর সঙ্গে রিক্সায় কোর্টে যাওয়ার অন্য লোক থাকলে হয়ত বলবেন, 'কী গয়ানাথ বাবু, আসেন, কোর্টে আসেন।' গয়ানাথ তখন হাঁটতে-হাঁটতে কোর্টে রওনা দেবে।

গয়ানাথ তার বাবার সঙ্গে এই উকিলবাবুর বাড়িতে এসেছে। তখন এই উকিলবাবুর বাবা বুড়া উকিলবাবুর সেরেস্তা। তিস্তা ব্রিজ হয় নি। ডুয়ার্স থেকে সকালে এসে বিকেলে ফিরে যাওয়া খুব কঠিন। তখন উকিলবাবুদের এই নতুন দালানঘর ওঠে নি। এখানে 'চেগারের বেড়া'য় টিনের দরজা ছিল—বাড়ির ভেতরের সঙ্গে বাড়ির বাইরের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এই মাঠটার পশ্চিম কোণে একটা কুয়ো ও পায়খানা ছিল। গয়ানাথ তার বাবার সঙ্গে আসত—শীতের সময় গরুর গাড়ি নিয়ে 'মার' নৌকোয় তিস্তা পার হয়েও এসেছে। এই মাঠে ইটের উনুনে রান্না হত। আর সন্ধ্যার পর সেরেস্তার বারান্দার চৌকিতে তারা শুয়ে থাকত। কোর্টকাছারির কাজ শেষ করে দু-একদিন পর আবার রওনা দিত। তখন, জলপাইগুড়ি শহরে একবার ঘুরে গেলেই মনে হত যেন দেশান্তরে বেরিয়ে এল। আর এখন, এই ত সকালে বাড়ি ছেড়ে এসেছে, দুপুরে গিয়ে আবার বাড়িতে ভা[illegible] খাবে। জলপাইগুড়ি শহরটাকে আর দেশান্তর মনে হয় না। আগে বছরে দু-একদিন কোর্টকাছারির কাজ ছিল কি ছিল না, এখন রোজ এলে রোজই কাজ থাকে।

গয়ানাথ উকিলবাবুর সেরেস্তায় ওঠে—দরজার কাছে গিয়ে মুহুরিবাবুকে বলবে যে উকিলবাবুকে যেন জানায় গয়ানাথ এসেছে। কিন্তু মুহুরিবাবু দেখার আগেই উকিলবাবু গয়ানাথকে দেখে ফেলেন, 'আরে গয়ানাথবাবু, আসেন, আসেন।'

উকিলবাবু তাঁর হাতের কলমটা কাগজের ওপর ফেলে হাতদুটো মাথার ওপর তুলে এমন আড়মুড়ি ভাঙেন যে মনে হয় তিনি গয়ানাথবাবুর জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। গয়ানাথ দু জন ভদ্রলোককে ছাড়িয়ে গিয়ে খালি চেয়ারটাতে বসেন। উকিলবাবু বলেন, 'কলকাতার উকিল চিঠি দিয়েছেন, এখান থেকে কয়েকটা কাগজ কপি করে পাঠাতে হবে।' উকিলবাবু এবার মুহুরির দিকে তাকান, 'সন্তোষ, তোমার কাছে লিস্টটা আছে ত ?'

মুহুরিবাবু জানান, 'হ্যাঁ, আছে।'

উকিলবাবু এবার আবার গয়ানাথের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'তা হলে আপনি কোর্টে গিয়ে সন্তোষের সঙ্গে দেখা করে যা করার করে দেবেন।'

গয়ানাথ উকিলবাবুর দিকে তাকিয়ে বলে, 'আপুনির শরীরখান ভাল ত ?'

উকিলবাবু, 'হ্যাঁ, ভালই আছি,' বলে হাতদুটো কাগজের ওপর নামান বটে কিন্তু কলমটা ধরেন না। কলমটা ধরে ফেললে গয়ানাথ আর কথা বলতে পাবে না অথচ যত দরকারই থাকুক, গয়ানাথের পক্ষে

ত আর উকিলবাবুকে সরাসরি কিছু জিজ্ঞাসা করা সম্ভব নয়। গয়ানাথ এবার পাশের দুই ভদ্রলোকের দিকে তাকায়। ঠিক তার বাঁ পাশের ভদ্রলোককে সে দেখতে পায় না, কিন্তু প্রথম চেয়ারটির ভদ্রলোক উকিলবাবুর টেবিলের ওপর দুই হাতের কনুই রেখে হাত দুটো ঠোঁটের কাছে এনে রেখেছেন। চিনতে পারে না গয়ানাথ। এখানে আসতে-আসতে উকিলবাবুর অনেক ভদ্রলোক-মক্কেল গয়ানাথের মুখ চেনা হয়ে গেছে। গয়ানাথ একটু সঙ্কোচ বোধ করে, এদের সামনে উকিলবাবুকে আর কী জিজ্ঞাসা করবে। উকিলবাবুও চেয়ারে সোজা হচ্ছেন। এখন তিনি আবার কলমটা তুলে নেবেন। গয়ানাথবাবুর সঙ্গে তাঁর এর বেশি কথা আর কবে হয়েছে। গয়ানাথ চেয়াব ছেড়ে ওঠে না। উকিলবাবু কলমটা তুলে নেয়ার আগেই বলে ফেলতে পারে, 'উকিলবাবু, কলিকাতার কুনো খবর কি পাওয়া গেল ?' কথাটা গয়ানাথ টেবিলের ওপর একটু এগিয়ে, একটু হেসে, খুব নিচু গলায় বলে যাতে পাশের ভদ্রলোক শুনতে না পান। কিন্তু উকিলবাবুও সম্পূর্ণটা শুনতে পান নি। তিনি চেয়ারে হেলান দিয়ে বলেন, 'হ্যাঁ ? কী বললেন ? কিসের খবর ?' গয়ানাথ এবার চেয়ারে আরো একটু এগিয়ে আসে, টেবিলের ওপর তার হাতদুটি আঙুলে-আঙুলে জড়িয়ে শুইয়ে রেখে। একটু হেসে বাধিত হওয়ার ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করে, 'বলিছি, কলিকাতার হাইকোর্টের মামলাখান শ্যাষ হইবার কুনো আন্দাজ কি পাওয়া গেইসে ? ওদিকে ত ব্যারেজের থাম্বাগিলান নদীখানক অর্ধেক করি দিবাব ধরিছে।'

'সে ত হবেই। আপনার জমির মামলাব জন্যে ত আব ব্যাবেজেব কাজ আটকে থাকবে না। তাও ত আপনার কাছে অন্তত একটা ভাল খবব পাওয়া গেল যে তিস্তা ব্যাবেজের কাজ তাড়াতাড়ি হচ্ছে। আমাদের ত একটা রাস্তা রিপেযার করতেই আঠার মাস।' উকিলবাবু কথাটা শেষ করেন ভদ্রলোক দুজনের দিকে তাকিয়ে। উকিলবাবু, সম্ভবত যিনি প্রথম চেয়ারটিতে বসে ছিলেন, তাঁব কাজই করছিলেন, ফলে, তিনি একটু বিরক্তির সঙ্গেই হেসে গয়ানাথের দিকে তাকান। গয়ানাথও হাসে—ভদ্রলোকদের সঙ্গে কোথাও বসলে ভদ্রলোকরা যা করেন তারও তাই করার অভ্যেস। হেসেও সে বলে, 'কিন্তুক ব্যারেজ শেষ হয়্যা গেইলে মোর জমিব কী হবে উকিলবাবু।'

উকিলবাবু বলেন, 'আপনার ত ক্ষতিপূরণের মামলা। জিতলেনও ত একটা। সে-রকমই হবে। কিন্তু ব্যারেজ যে-জমি নিয়েছে সেটা কি-আর ফেবত দেবে নাকি ?'

'হামরালা ত কহিছি—মোর ক্ষতিপূবণ না নাগে, মোর পুরানা ভেস্ট জমিঠে সমপরিমাণ জমি ফেরৎ দিক সরকার।' মামলার আলোচনা শুরু হতেই গয়ানাথ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পাবে।

'হ্যাঁ। সে রিট ত করা হয়েছে। আপনার কথার মধ্যে ত সত্যি একটা যুক্তি আছে। হাকিম এ-কথা মানতেও পারে। কিন্তু মামলার ব্যাপার। তার জন্যে ত আর ব্যারাজের কাজ আটকে থাকবে না।' উকিলবাবু একটু জোরে-জোরে বলেন, যেন গয়ানাথ কানে একটু খাটো।

গয়ানাথ একটু চুপ করে থেকে বলে, 'কাছারিও ত সরকারেবই অফিস, হাকিম ত সরকাবেরই মাহিনা পাছেন। একবার ব্যারেজঘান বান্ধা হই গেলে কি আর হামরালার মামলার কথা হাকিম ভাববেন ?'

উকিলবাবু একটু চুপ করে থাকেন, তারপর তাঁর সামনের কাগজের ওপর চোখ নামিয়ে বলেন—তাঁর গলার স্বর এবার উঁচুতে ওঠে না, 'গয়ানাথবাবু আপনাদের ত কয়েক পুরুষের জোতদারি, জোতদারি কত পালটি গেছে, দেখেন না ? আপনাকেও পুরানা জোতদারি ভুলতে হবে। কোর্ট-হাইকোর্টও বদলে গেছে। একটা ব্যারেজ তৈরি হবে—সেটা সরকারের কাজ। সেটা বন্ধ করে আপনার জমি উদ্ধার করে দেবে এটা আর ভাববেন না। কিন্তু ক্ষতিপূরণ যেন ন্যায্য হয়, বা, আপনি যা বললেন, ক্ষতিপূরণের বদলে কেউ যদি এই ব্যারেজের জন্যে নেয়া জমিটাকে ভেস্ট করে দিয়ে পুরনো ভেস্ট ফেরৎ পায় সেটা নিশ্চয়ই কোর্ট দেখবে', উকিলবাবু সোজা হয়ে বসে কলমটা তুলে নেন, এই পর্যন্ত আইনের কথা। আর তা না হলে ত আপনাকে পার্টি বানাতে হয়, উত্তরখণ্ড পার্টি। তারা ত কামতাপুর রাজ্য চায়, পশ্চিমবঙ্গ থেকে আলাদা রাজ্য। সেই রাজ্যের হাইকোর্ট হলে হয়ত আপনার পক্ষে রায় দেবে—ব্যারেজ ভেঙে গয়ানাথবাবুর জমি গয়ানাথ বাবুকে দিয়ে দাও। ময়নাগুড়িতে ত বিরাট কনফারেন্স হচ্ছে। না ?'

গয়ানাথ মাথা হেলিয়ে জানায়, 'হ্যাঁ।'

'আপনি আছেন নাকি উত্তরখণ্ডে ?' উকিলবাবু লেখা শুরু করতে-করতে জিজ্ঞাসা করেন। গয়ানাথ বোঝে না, কী জবাব দেবে। উকিলবাবুর কথা থেকে সে এটা বুঝে গেছে উত্তরখণ্ড উকিলবাবুর পছন্দ না—কিন্তু গয়ানাথের জমির কথা যদি উকিলবাবুর বদলে উত্তরখণ্ড বেশি জোর দিয়ে বলে, তা হলে

গয়ানাথ উত্তরখণ্ড হবেই-না কেন ? গয়ানাথ একটা জবাব ভাবতে-ভাবতে দেখে উকিলবাবু লেখা শুরু করে দিয়েছেন। সে আস্তে করে চেয়ার ছেড়ে ওঠে, খুব নিচু স্বরে 'নমস্কার' বলে চেয়ারের পাশ দিয়ে পেছনে চলে যায়। পেছনে তক্তপোশের ওপর মহুরিবাবু বসে আছেন। গয়ানাথ হাতের ভরে তার দিকে এগিয়ে নিচু স্বরে জিজ্ঞাসা করে, 'কী কী নকল কবিবার নাগিবে, কহেন।'

'বসেন', বলে মুহুরিবাবু তার ডায়রিব পাতা উল্টে অনেক ভাঁজ করা কাগজ খুলে-খুলে দেখে। শেষে না পেয়ে বলে, 'আপনি আসছেন ত কোর্টে, আমি বের করে রাখছি।' গয়ানাথ এবার জিজ্ঞাসা করে, 'যে-দলিলগিলা নকল করিবার নাগিবে সেগিলা কি আপনার কাছে, না মোর কাছে ?'

মুহুরি বলে, 'দেখতে হবে। আপনি কোর্টে আসেন ত। আমি বের করে রাখব।' গয়ানাথ আস্তে করে উকিলবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে।

একশ পঞ্চান্ন

গয়ানাথের পাবলিক সন্ধান

গয়ানাথ বারান্দায় বসে। এ-রকম বসাটাই তার অভ্যেস, তারপর উকিলবাবুর সঙ্গে, বা পেছনে-পেছনে কাছারি যাওয়া। গয়ানাথ ত কখনো ঘড়ি দেখে কাজ করে না—সারাটা দিনের হিশেবে কাজ করে। সকালে উঠে যেখানে যাওয়ার কথা সেই জোতের উদ্দেশে রওনা দিল। রাস্তায় আরো দু-চার জায়গা ঘুরেও যেতে পারে। দুপুরে খাওয়ার জন্যে তাকে ফিরতেই হবে এমন কোনো নিয়ম নেই। আর ফিরবে না, এমন কোনো কথাও নেই। ফিরল ত ফিরল। ফিরল না, ত ফিরল না। এখন সন্ধ্যার পরে বড় একটা কোথাও যায় না— সেই 'নাকশালিয়া হাঙ্গামা'র সময় থেকে রাতে বেরনো বন্ধ। একটা অভ্যেস নষ্ট হলে আর ফিরে আসে না।

জলপাইগুড়িতে এলে এটাই তার একটা অসুবিধে। 'ঘণ্টাখানেক পরে আসবেন', বা, 'সাড়ে বারটা নাগাদ দেখা করবেন', এই সব কথা অনুযায়ী নিজের যাতায়াত ঠিক করাটা তার পক্ষে একটু অভ্যেসের বাইরে। তা ছাড়া, শহরে তার এত বেশি কাজ হাতে থাকে না যে এক কাজ সেরে ফেলার মাঝখানে আরো একটা কাজ সেরে ফেলবে। অথচ জোতজমিতে চলাফেরার সময় ঘড়ি ছাড়াই গয়ানাথ সময়ের মাপ রাখে বৈকি। শহরে সে-মাপটাও হারিয়ে যায়। সে বুঝতে পারে না যে এখন যদি ধীরে-ধীরে হেঁটে কাছারিতে গিয়ে বসে থাকে, তা হলে, সেটা কত আগে পৌঁছুনো হবে।

উকিলবাবুর বারান্দায় বসে গয়ানাথ একটু ভাবেও বটে। উকিলবাবু যা বলেছেন সে যে তা মনে-মনে ভাবে নি, তা নয়। যে-সাংঘাতিক ব্যারেজ তৈরি হচ্ছে তাতে গয়ানাথের জমি ত নস্যি। কিন্তু যত বড় ব্যারেজই হোক, গয়ানাথের জমি ত গয়ানাথের জমি। সরকার একটা দাম ধরে ক্ষতিপূরণ দিলেই ত আর সেই ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়ে গয়ানাথ নতুন কোনো জমি কিনতে পারছে না। আর, কিনতে পারলেই ত আর পুরনো জমি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ক্ষতিটা পূরণ হয় না। জমি কি সরকারি অফিসের লোকদের মাইনে নাকি যে প্রত্যেক মাসের পয়লা তারিখে একই মাইনে পাবে ? এমনিই ত জোতজমি রাখার আর-কোনো আইন নেই। সব আইনই জোতজমি ছাড়ার। আধিয়ারকেও জমি রেকর্ড করতে দিলে আর জোতদারের হাতে খতিয়ানটুকুর কাগজ ছাড়া থাকেটা কী ? তাই হচ্ছে গত কয়েক বছর ধরে। গয়ানাথের জোতদারির-সময়টা ত এতেই গেল। জোতদারের থাকবে খতিয়ান আর জমি খাবে 'বারখান ভূত'।

এই রাগের হিশেবনিকেশের মধ্যে গয়ানাথ ভোলে নি যে জমি তার হাত থেকে যতই চলে যাক না—জোতদারি তার বাবার আমল থেকে অনেক বেড়েছে। 'সেইখান ত হবা ধরিছে চাষের তানে। এ্যালায় চাষ কতখান বাড়ি গিছে। সার কতখান বাড়ি গিছে। পতিত জমি কত কমি গিছে।'

কিন্তু সেটাও যে এই সরকারেরই সমর্থনে, নিজের সঙ্গে নিজের গোপন আলাপেও গয়ানাথ সেটা মানতে চায় না, 'এ্যালায় হামরালায় পুরা জমি থাকিলে ক্যানং ফলন হবার ধরিত।' কিন্তু এখনকার এই চাষ কি অত জমিতে করা সম্ভব হত, এবং এই ত বেশ ভাল ব্যবস্থা হয়েছে—জমি একটু কমেছে বটে

কিন্তু চাষ অনেক বেড়েছে। গয়ানাথ এটা জানে, না-জেনে উপায় নেই বলে। কিন্তু নিজের কাছেও তার না মানলে চলে, তাই মানে না।

মানে ত নাইই বরং গয়ানাথ মনে-মনে উকিলবাবুর কথাগুলোকে নিজের মত করে সাজিয়ে নেয়। 'জোতদারি আর আগের নাখান চলিবে না। হাকিম বদলি গেইছে। আইন বদলি গেইছে। ব্যারেজের জমি আর ফেরৎ পাওয়ার না-হয়। এই সরকারের আইনে ফেরৎ পাওয়ার না-হয়। কামতাপুরী রাজা করেন। স্যালায় নতুন রাজ্যের নতুন আইনত ফেরৎ পাইবেন।' জমি ফেরৎ পাওযার নিশ্চয়তা থাকলে ত গয়ানাথই উত্তরখণ্ডের নেতা হয়ে বসত। কিন্তু তারা এখানকার কিছু লোক মিলে গোটা একটা রাজ্য বানাতে পারবে—এটা গয়ানাথ বিশ্বাসই করে না। অথচ, তার চলাফেবায় সে বুঝে ফেলেছে উত্তরখণ্ড পাছে হয়ে যায় সেজন্যেও সবকার অনেক কিছু দিতে রাজি আছে। উত্তবখণ্ড পাছে হয়ে যায়, এটা নিয়ে সরকাব প্রায় সব সময়ই ভয়ে-ভযে থাকে। ভয়ে-ভয়েই যখন আছে তখন ভয় দেখাতে আর আপত্তি কী? আর, ভয় দেখালেই যদি সরকার ভয় পায় তা হলে গয়ানাথই-বা একটু ভয় দেখাবে না কেন?

তবুও উত্তরখণ্ড দলে যোগ দিতে গয়ানাথের যেটুকু সঙ্কোচ তা রাজনীতি না করাব সঙ্কোচ। তাব বাবার আমল থেকে সে দেখে আসছে এই সব পার্টিপুটি মানেই জোতদারির ক্ষতি। 'সে কংগ্রেসরই ঘর হোক আর কমিনিস্টেব ঘরই হোক। যায় জোতদারি করে স্যালায জোতদারি করে, স্যালায় পার্টি ধরিবার টাইম না পায়। স্যালায় পার্টি করিবার ধবিলে, স্যালায় জোতদারি উঠি যায। স্যালায জাতদাবি ছাড়ি দেউনিয়াগিরি করিবার ধরে। দেউনিয়াগিরির পয়সা বেশি, নগদ পয়সা, কিন্তু জোতদাবি নাই।'

অভিজ্ঞতা ও জীবনদর্শন মিশিয়ে গয়ানাথ এই ধারণাটা বানিয়ে ফেলেছে। কিন্তু সে যে বানিয়ে ফেলেছে, তা সে জানে না। তথ্য দিয়ে এ কথা সে প্রমাণ কবতেও পাববে না, পার্টি কবলে জোতদারি টেঁকানো যায় না। এটাও প্রমাণ করতে পারবে না, পার্টি করা মানেই দেউনিয়াগিরি করা। বর°. হযত উল্টোটাই সত্য। তার ধারণার পক্ষেও খুঁজে পেতে কিছু সাক্ষ্যপ্রমাণ জোগাড় করা যায়। কি- গয়ানাথের এই ধারণা তৈরি হওয়ার পেছনে এ-রকম সাক্ষ্য প্রমাণ বা অভিজ্ঞতা কাজ করে নি। গয়ানাথ এমনই আপাদমস্তক জোতদার যে সে জমি ও চাষের নিযমের বাইরের যে-কোনো নিয়মই অপ্রয়োজনীয় ভাবে। সেই ভাবনাকে তার জীবনদর্শন বলা যায়। তার জোতদারি তাকে কখনো কংগ্রেস করতে দেয নি—ভোটাভুটির সময় লোকজন নিয়ে গিয়ে একটা ভোট দিয়ে আসা সেটা ত বিয়েশাদিব নেমতন্ন খাওয়ার মত ব্যাপার। সেই জীবনদর্শনেই তার বেধেছে উত্তবখণ্ডে যোগ দেয়াব সিদ্ধান্ত নিতে। কিন্তু গয়ানাথ যেন গন্ধ পাচ্ছে—তাকে যোগ দিতেই হবে, সে যোগ দেবেও।

'এ্যালায় টাইম পড়ি গেইসে পাবলিকের। যে-কাম তোমরালা পাবলিক জোগাড় করি করিবেন না, সে-কাম হবার না-হয়। আধিয়ারগিলা পাবলিক হয়্যা গিছে, সেইলার কাম হছে। জোতদারগিলাবও পাবলিক হবা নাগিবে—স্যালায় কাম হবে।'

কিন্তু নিজের সঙ্গে এই সংলাপে গয়ানাথ এসে ঠেকে এই প্রশ্নে, 'কিন্তু মোর কামটা কী?'

এই প্রশ্নের কোনো সদুত্তর সে নিজের ভেতর থেকে টেনে বের কবতে পারে না; তার কারণ, গয়ানাথ নিজে নিজের সেই উত্তরের সবটুকু জেনে নিতে চায় না। 'উত্তরখণ্ড করিলে কি ব্যারেজত মোব যেই জমিগিলা গিসে, স্যালায় ফিরি আসিবে?' গয়ানাথ এর জবাব নিশ্চিত জানে, 'না।' তাই সে প্রশ্নটাকে এভাবে তুলতে চায় না। তবু জমি, তোমার বাপ-ঠাকুর্দার জমি, যদি কেউ নিতে আসে তাকে বাধা দিতে হয়, আটকাতে হয়। লাঠিসোটা নিয়ে দখল করতে এলে লাঠিসোটা নিয়ে বাধা দিতে হয়। আল কেটে জমির ভেতর ঢুকতে চাইলে আল বেঁধে আটকাতে হয়। ফসল তুলে জমির ওপর চাষ কায়েম করতে এলে, উপড়ে ফেলে বাধা দিতে হয়। সরকার নোটিশ জারি করে নিতে এলে কোর্টের নোটিশ দিয়ে বাধা দিতে হয়। গয়ানাথ তা দিচ্ছেও। 'পাট্টিপুট্টি যদি পাবলিক করি জমি নিবার আসে, স্যালায় পাবলিক করি বাধা দিতে হয়।' উত্তরখণ্ড গয়ানাথের পাবলিক।

গয়ানাথ যে এ-রকম উদাহরণ পরম্পরায় নিজের যুক্তিকে শক্ত করে, তা নয়। কিন্তু সে যখন বোঝে তাকে উত্তরখণ্ডে যেতেই হচ্ছে তখন তাকে তার জীবনদর্শন থেকেই ত যুক্তি সংগ্রহ করতে হয়। এমন যদি হত সে উত্তরখণ্ড করাটাকে বরাবরই জরুরি ভাবছে—তা হলে ত সে প্রথম থেকেই সেখানে থাকত। বরং গয়ানাথ বোঝে যে চাষ-আবাদের কাজে সরকারের সঙ্গে সাগাইকুটুমের মত সম্পর্করাখা ভাল। এখন যা চাষ-আবাদ দাঁড়িয়েছে তাতে সরকারের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক না থাকলে চাষ-আবাদ করাই

সম্ভব নয়। বরং উত্তরখণ্ড-টণ্ড এই সব পাট্টিপুট্টি ধরলে সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবে। আর গয়ানাথের মত একজন জোতদারের সমর্থন পেলে 'উত্তরখণ্ডিলা চাহিবে মোক উশুল করিবার, আর, লাল পার্টি চাহিবে মোর মার্নষিগিলাক উশুল করিবার।' তাতে ত গণ্ডগোল আরো বাড়বে। কিন্তু গয়ানাথের যে একটা পাবলিক দরকার, সেই পাবলিক সে পাবে কোথায়, এক উত্তরখণ্ড ছাড়া?

গয়ানাথ উকিলবাবুর বারান্দা থেকে নেমে কাছারির দিকে হাঁটা শুরু করে। রাস্তায় রিক্সা সাইকেল ভটভটিয়া নেমে গেছে—লোকজন অফিসে যাচ্ছে। ধীরে-ধীরে রওনা দিলে সে সময়মত কাছারিতে পৌঁছতে পারবে। মুহুরিবাবুর কাছ থেকে লিস্টটা নিলেই ত কাজ শেষ। তার মধ্যে আসিন্দির এলে হয়।

একশ ছাপ্পান্ন

গয়ানাথের উত্তরখণ্ডে যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা

গয়ানাথ যখন উকিলবাবুর বাড়ি থেকে বেরয় তখন তার মনে অন্য একটা হিশেবও ছিল। মুহুরিবাবু কোর্টে গিয়ে যদি অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তা হলে গয়ানাথকে সেই বিকেল পর্যন্ত বসিয়ে রাখবে।

সন্তোষ মুহুরি হয়ত রাখতও তাই। গয়ানাথকে দেখেই সে সামনের লোকজন দেখিয়ে বলে, 'গয়ানাথবাবু, এদের সবার কেস উঠেছে, আপনি একটু বসুন, এদের বিদায় করেই আপনার কাজে হাত দেব।'

গয়ানাথ হাতজোড় করে, 'অ্যাজি মোক ছাড়ি দিবার নাগিবে। যাবার তানে ময়নাগুড়িত্ থামিম। আপুনি মোর কাগজখান দেন। আর যদি না-দেন পাঠি দিবেন।'

গয়ানাথ জোতদারকে সাধারণত বসিয়ে রাখা যায় বটে কিন্তু সেরেস্তার এমন পয়সাঅলা মক্কেল যখন কাজটা করে দিতে বলে তখন সন্তোষ মুহুরি কেন, তার উকিলবাবুরও ক্ষমতা নেই কাজটা না-করার। গয়ানাথ তার নিজের এই ক্ষমতা সবটুকু জানে না। কিন্তু সে অন্তত এটুকু বোঝে যে ময়নাগুড়িতে নামতে হলে এখানে বিকেল পর্যন্ত থাকলে চলবে না।

মুহুরিবাবু বলে, 'আপনি বসেন, বসেন, ঐ চেয়ারটাতে বসেন,' একজন সেই [illegible]ভাঙা চেয়ারে বসে ছিল, সন্তোষ তাকে উঠিয়ে দিতে-দিতে নিজের বুকপকেট থেকে একগাদা কাগজ বের করে—নানা রকম ভাঁজ-করা কাগজ, একটা ছোট নোটবইসহ। প্রায় প্রত্যেকটা কাগজই দেখে সন্তোষ, কিন্তু অত্যন্ত দ্রুত। তার দেখার সঙ্গে তাল রেখেই জিভ দিয়ে দই খাওয়ার মত আওয়াজ ওঠে। 'নেই' বলে সন্তোষ সেই কাগজগুলি আবার বুকপকেটে ভরে, 'এই, গয়ানাথবাবুকে চা দাও, এই এক কাপ চা আনো ত'. সন্তোষ তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একজনকে বলে। তারপর নিজের সেই বড় ডায়রিটার পাতাগুলো উল্টে যায়। প্রায় প্রতিটি পাতাই উল্টোয় ও দই খাওয়ার শব্দ করে। উল্টোতে-উল্টোতে হঠাৎ থেমে যায় সন্তোষ, মুখের আওয়াজটাও বন্ধ হয়। যে-পর্যন্ত উল্টেছিল সেখানে একটা আঙুল রেখে সন্তোষ ডায়রির মলাটের খাপটার ভেতর দেখে। তার পর হাসি মুখে গয়ানাথের দিকে তাকিয়ে বলে, 'পেয়েছি, পেয়েছি।'

গয়ানাথ বলে, 'কী, কী নাগিবে দেখেন।'

ডায়রির ভেতর থেকে একটা ইনল্যান্ড বের করে খুলে পড়ে সন্তোষ বলে, 'আপনার ঐ ২৩১ নম্বর দাগের পর্চাটা।'

'সে ত আপনার প্রথমঠে আপনার কাছেই—'

'অ্যাঁ? তা হলে বোধহয় আর-এক কপি লাগবে। নাকি এটা ২৩৩ নম্বর দাগ?'

'২৩৩ নিয়া ত কুনো মামলা নাই।'

'সে না থাকলেও লাগতে পারে।'

সন্তোষ যে-লোকটিকে পাঠিয়েছিল সে এককাপ চা এনে গয়ানাথকে দেয়। গয়ানাথ চায়ে একটা

চুমুক দিলে সন্তোষ বলে, 'গযানাথবাবু, আপনি ববং এই চিঠিটা নিযে যান, কাউকে দেখিযে নেবেন কী কী লাগবে, সেগুলো নিযে আসেন, আমি তখন দেখে নেব। এদেব সবাব কেসেব ডাক পডবে, এখনি— ।'

'আচ্ছা, আচ্ছা আমাকে দিযা দ্যান', সন্তোষেব হাত থেকে চিঠিটা নিযে সেটা ভাঁজ করে পকেটে ঢোকাতে গয়ানাথকে চায়ের কাপটা টেবিলে বাখতে হয, 'কিন্তু যদি কুনো-কুনো দলিল আপনাবঠে থাকে ?'

'সে ত আমি যখন পাঠাব, তখন দেখেই দেব', সন্তোষ না-তাকিযে বলে।

চাটা আর-এক চুমুকে শেষ হয়ে যায। গযানাথ উঠে বলে, 'আচ্ছা মুহুবিবাবু, নমস্কাব।'

সন্তোষ মুখ তুলে 'হ্যাঁ, নমস্কাব', বলে আবাব টেবিলেব ওপব ঘাড নামিযে ফেলে।

গয়ানাথ রাস্তায় নেমে ভাবে, আসিন্দিবেব জন্যে কোথায দাঁডাবে ? সেটা ভাবতে-ভাবতেই আসিন্দিবের আসাব পথের বাঁকটা দিয়ে বড বাস্তার দিকে হাঁটে। হাঁটতে-হাঁটতে গযানাথ ঠিক কবে ফেলে সোজা পি-ডবলু-ডির মোডে গিযে অপেক্ষা কববে।

পি-ডবলু-ডির মোডে স্কুলবোর্ডের অফিসের সামনে অনেকগুলো চাযেব দোকান। তাব বাইবেব দিকের একটা বেঞ্চেব এক কোণে সে বসে। রোদের আঁচ গাযে লাগে—কিন্তু সে ত আব চা খাবে না তাই আর ভেতরে বসছে না। শহবেব ভেতব থেকে সব বাস-মিনিবাসই এখান থেকে তিস্তাব্রিজেব দিকে বাঁক নিচ্ছে, এখানে দাঁড়াচ্ছেও কিছুক্ষণ। যে-কোনো গাডিতে উঠলেই আধঘণ্টাব মধ্যে ময়নাগুড়ি। গয়ানাথ এক-একবাব ভাবে সে ববং মুহুবিবাবুকে বলে বাসে করে ময়নাগুডিতে চলে যাক। মুহুরিবাবু আসিন্দিরকে ময়নাগুড়ি চৌপত্তিতে মবণ ঘোষের দোকানে পাঠিযে দেবে। গযানাথ ইতিমধ্যে উত্তবখণ্ডের সভাপতি পঞ্চানন মল্লিকেব সঙ্গে দেখা সেবে ফেলবে।

তা করতে হলে তাকে আবাব কাছারিতে গিযে মুহুরিবাবুকে বলে আসতে হয। কিন্তু গযানাথ আন্দাজ কবছে যে আসিন্দির এখন যে-কোনো সময় এসে যেতে পাবে। মযনাগুডিতে পঞ্চানন মল্লিকের সঙ্গে দেখা করাব কথাটা তার মাথায আসাব ফলেই গযানাথের মনে হচ্ছে যে আসিন্দিব দেবি করছে। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে সে বোঝেও, আসিন্দিব যে-কোনো সময এসে যাবে এখন। গযানাথ চাযেব দোকানের বেঞ্চিটাতে বসেই থাকে। এদিক-ওদিক তাকায, বাস-মিনিবাস দেখে, বড ব্রিজ দিয়ে যে-সব রিক্সা কাছারির দিকে মোড নিচ্ছে সেটাও দেখে।

আসিন্দিরের যে-কথাটা শুনে গযানাথ চমকে তাকিযে দেখে তাব সামনে দাঁডিযে আসিন্দিব ভটভটিয়াতে আওয়াজ করছে তা হল—'নিদ যাছেন নাকি বাপা হে— ?' গযানাথ চমকে উঠে দেখে আসিন্দির তার ভটভটিয়ার ওপর বসেই হো-হো হাসছে। আসিন্দিবের হাসি দু-একজন দেখে আর গয়ানাথ বেঞ্চ থেকে উঠে চাদর ঠিক কবতে-কবতে নিজেব অপ্রস্তুতি কাটায।

হাসি থামিয়ে আসিন্দির বলে, 'এইঠে তোমার চক্ষুব ওপব দিযা গেছু আর তোমবালা দেখিবার পাও না ? ঐঠে কোর্টত্ তোমরা নাই রো। মুহুরিবাবু কহে উ ত চলি গেইছে। ত, ভাবিছু-কি, বাপোটা মোর ঠিক পি-ডবলু-ডির মোড়টাত্ বসি আছে। এইঠে আসি তোমাক দেখি প্যাঁক প্যাঁক দিছু, শোন নাই। ডাকিছু। শোন নাই—'

আসিন্দিরের এই কথা জুড়ে গয়ানাথ তার পেছনে ওঠে, বসে, চাদর ঠিক কবে। আসিন্দির গাডি চালানো শুরু করলে তার কথা থামিয়ে দিযে বলে, 'ময়নাগুড়িত্ পঞ্চানন মল্লিকেব ঘবত্ যাম।'

গাড়ি থামিয়ে আসিন্দির ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'পঞ্চানন মল্লিক ? বাপো, উত্তবখণ্ড ধবিবেন নাকি হে ?' তারপর রাস্তায় ওঠার মুখে মোটর সাইকেলটা থামিয়ে দেয়।

আচমকা থামানো মোটর সাইকেলটা কাঁপছে, তার ওপর গয়ানাথও কাঁপছে, আসিন্দির দু দিকে মাটিতে পা নামিয়ে দিয়েছে, তার ঘাড় ঘোরানো। এ-রকম অবস্থায গয়ানাথ তার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে, 'ধরিম ত, উত্তরখণ্ড ধরিম। মুই না ধরো, ত তোক দিয়া ধরাম। না ত তোব এই কোর্ট আর হাকিম করি আর-জোতজমি সামলিবার পারিবেন না হে।'

আসিন্দির তাঁর ডান হাতটা তুলে হ্যাণ্ডেলের ওপর ফেলে চেঁচিয়ে ওঠে, 'তাই কহ, বাপা আমারস এ্যালায় লিডার হওয়া ধরিবে, বাপা আমার লিডার হবে এ্যালায়, উত্তরখণ্ডের লিডার।' সে গাড়ি ছাড়ে।

একটু পরে পেছন থেকে গয়ানাথ চিৎকার করে, 'শুন্, এ্যালায় মুই না যাও, তুই যা কেনে—'

আসিন্দির কথাটা স্পষ্ট শুনতে পায় না। গতি না-কমিয়ে ঘাড়টা ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'কোটত যাম ? ময়নাগুড়িত যাছি ত।'

আসিন্দিরের পিঠে স্পর্শ দিয়ে গয়ানাথ বোঝায়—ঠিকই যাচ্ছে। সামনে তিস্তা ব্রিজের মাথা আকাশে।

আসিন্দির ঘাড় ঘুরিয়ে চিৎকার করে, 'কী ? কহিছেন কী ?'

আবার আসিন্দিরের পিঠে হাত দিয়ে গয়ানাথ চিৎকার করে, 'কহিম, কহিম। এ্যালায় চল কেনে ময়নাগুড়িত।' গলাটা আরো উঠিয়ে বলে, 'আগত চৌপত্তিতে নামিবু।'

একশ সাতান্ন

শব্দের অর্থ নিয়ে পঞ্চানন-গয়ানাথের বিচার ও সিদ্ধান্ত

ময়নাগুড়িতে পঞ্চানন মল্লিকের বাড়িতে যাওয়ার আগে চৌপত্তিতে মরণচাঁদ ঘোষের দোকানে দু-কাপ চা খেতে-খেতে গয়ানাথ ও আসিন্দিরের মধ্যে একটা আলোচনা হয়। গয়ানাথ বলে, প্রথমেই তার যোগ দেয়াটা ভাল হবে না। সে যোগ দিলে সরকার তার মামলা-মোকদ্দমা 'ডিসমিস' করে দিতে পারে। তা ছাড়া, সেই-বা একেবারে প্রথম থেকে পুরোপুরি যাবে কেন। সামনে ভোট আসছে। গয়ানাথের হাতে ভোট ও নেহাৎ কম নেই। আসিন্দির গেলে—সব পার্টিই ভয় পাবে যে জামাই শ্বশুরকে টেনে নিতে পারে। কিন্তু গয়ানাথকে কেউ জিগগেস করলে সে বলতে পারবে—'মোর জোয়াইখান ত জোতদারি না করে, কনট্রাক্টারি করে। মোর কথা ও না শুনে।'

গয়ানাথের এ-কথার আসিন্দির বলে, 'মোক হাউলি খাটাবার চাছেন ?' আসিন্দিরের ধারণা—এ-সবে এখন আর কেউ ভোলে না। সবাইই বুঝবে, গয়ানাথ নিজে না গিয়ে আসিন্দিরকে হাউলি খাটাচ্ছে। তাতে জাতও যাবে, পেটও ভরবে না। যেতে হলে গয়ানাথ-আসিন্দির দুজনেরই যাওয়া উচিত। তাতে সবাই একটু নাড়া খেতে পারে। 'লিডারি করিবার চাহেন ত লিডারি করিবার নাগিবে। লিডারি কি হাউলি দিয়া হয় ? না হয়।'

গয়ানাথ কিছুটা দুর্বলভাবেই বলে যে এদের লিডারটিডার সব ঠিক হয়েই আছে, সে গেলেই কি তাকে লিডার বানাবে নাকি।

আসিন্দির তাতেও তাকে বলে বসে, 'কহেন কী ? গয়ানাথ জোতদার জয়েন দিলে সেইটা ত একখান জোর খবর হবা ধরিবে উত্তরখণ্ডের পাকে। তোমরালা কি চ্যাংড়ার ঘর যে ভলান্টিয়ার করিবেন ? তোমরালা জয়েন দিলেই লিডার।' ফলে, চা শেষ করে মোটর সাইকেলে চড়ে যখন পঞ্চানন মল্লিকের বাড়িতে যায়, তখনো তারা কিছুটা দ্বিধার আছে। উত্তরখণ্ডে যোগ দেবে—এই পর্যন্তই ঠিক। আসিন্দির যেমন বলছে গয়ানাথ যোগ দিলে হৈ-হৈ বাধবেই, গয়ানাথ তেমনি চাইছে—অত হৈ-হৈ-এর দরকার কী ?

পঞ্চানন মল্লিক দুপুর বেলা ঘুমুচ্ছিলেন। তাঁর দারিঘরে গয়ানাথ ও আসিন্দিরকে বসানো হয়। একটি ছোট ছেলে একটা কাঁসার ঘটিতে জল আর স্টেইনলেস স্টিলের গেলাস দিয়ে যায়। পঞ্চানন মল্লিকের দারিঘরে একটা বড় তক্তপোশ আছে, আবার একটা টেবিল আর কিছু চেয়ারও আছে। দারিঘরে ঢুকে তাকিয়ে গয়ানাথ যেন স্থির করতে পারে না কোথায় বসবে। পেছন থেকে আসিন্দির বলে, 'চেয়ারঠে বসেন, মুই পাছত বসিছু।' আসিন্দির গিয়ে তক্তপোশটায় বসে। গয়ানাথ চেয়ারে বসলে আসিন্দির পেছনে পড়ে যায়, গয়ানাথ চেয়ারটা একটু-একটু ঘুরিয়ে বসে। কিন্তু হেলান দেয় না। গয়ানাথ যেন এখনো উঠে যেতে পারে—তার মুখচোখে সেই রকম অনিশ্চয়তা। আসিন্দির জিজ্ঞাসা করে, 'তোমরালা চেনেন ত পঞ্চানন মল্লিকক ?'

এ-কথার জবাব দেবার সময় গয়ানাথ পায় না। তার আগেই দারিঘরের দাওয়ার নীচে পঞ্চানন মল্লিক এসে যান। দারিঘরটা উঁচু—মাটির। দুটো দরজা, নীচে কাঠের একটা গুঁড়ি। সেটা অনেকদিন

ধরে সিঁড়ি হিশেবে ব্যবহৃত হতে-হতে এই মাটির ঘরের সঙ্গে মিশে গেছে। দুই দরজা মুখোমুখি বলে ঐ দরজা দুটো জুড়ে রোদ। ঘরেব বাকিটুকু আবছায়া। তবে ভামনির বেড়ার ফাঁক দিয়ে বাইরের উজ্জ্বলতা দেখা যায়।

ঘবেব ভেতব উঠবাব জন্যে দরজা ধরতে হয় পঞ্চানন বাবুকে। তাঁর পরনে গেঞ্জি ও ধুতি। গেঞ্জির ফাঁক দিয়ে পৈতে দেখা যাচ্ছে। ঘরেব ভেতর উঠে তিনি নমস্কার করেন গয়ানাথকে। গয়ানাথকে পার হয়ে তাঁকে টেবিলে বিপবীত দিকেব চেয়াবে বসতে হয়। সেখানে বসেও তিনি আসিন্দিবকে দেখতে পান না—দেখতে পান গয়ানাথের ওপব থেকে চোখ সরাতে গিয়ে।

গয়ানাথই কথা শুরু করে, 'গেছিলু জলপাইগুড়িব কোর্টত। যাবার তানে দেখি উত্তবখণ্ড সম্মিলন হবা ধবিছে। ত ভাবিছু—আপনাব নখত কনেক দেখা করি যাই। এ ত হামবালাবই সম্মিলন, রাজবংশী মানষিলার।'

পঞ্চাননবাবু গলাটা পবিষ্কাব কবে নিয়ে ধীবেসুস্থে বলেন, 'বলেন, প্রধানত বাজবংশীদেব। কেন ? না, বাজবংশীরাই উত্তববঙ্গেব প্রধান। কিন্তু উত্তরখণ্ড দল সব মানুষের। যারা কামতাপুব নামে স্বতন্ত্র বাজ্যেব দাবি সমর্থন কবে তাদেরই দল উত্তবখণ্ড।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়, সে ত হবাই নাগিবে। আপনারা কি তিস্তা ব্যারেজের তানে কিছু ভাবনাচিন্তা দিবাব চাহেন ?' গযানাথ জিজ্ঞাসা কবে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। উত্তরবঙ্গের সব বিষয়েই ত আমাদের বলতে হবে। আপনার ত অনেক জমি চলি গিছে।'

'সেই কথাখানই কহিবার চাহি। আমার সঙ্গে সবকারের ত মামলা চলিবার ধরিছে কলিকাতাব হাইকোর্টত আর জলপাইগুড়ির কোর্টত। ফরেস্ট ডিপাটমেন্টক কোর্ট স্টে-অর্ডার দেন নাই। কিন্তু ক্ষতিপূরণের একখান মামলা জিতি গেইছি। এ্যালায় মোব এই কাথাখান কহিবাব আছে যে যেইলা জোতদারের জমি আগত ভেস্ট হয়া গেইসে, সেইলার সেই ভেস্ট জমিঠে, এখন ব্যাবেজেব তানে যে নতুন জমি অধিগ্রহণ করা হইল্ তাব সমপবিমাণ জমি, জোতদাবকে ফিবি দিবাব নাগিবে।'

পঞ্চানন একটু ভেবে বলে, 'এইটা ত খুব ভাল প্রস্তাব। কিত "জোতদার" কহা না যায়।'

'কেনে ? জমি ত জোতদারেব ভেস্ট হইছে।' গযানাথ বলে।

'তা হইছে। কিন্তু আমাদেব পার্টিকে ত সরকারের লোক, কমিনিস্টিবা, জোতদাবেব পার্টি বলে। সেই কাবণে আমাদের প্রস্তাবে কি বক্তৃতায় "জোতদার" না বলিয়া "কৃষক" বলিবাব কথা। আমবা কৃষকের স্বার্থের কথা বলিব।'

গয়ানাথ চুপ করে যায়। চুপ করে থেকে তাকে শব্দার্থের এই গণ্ডগোলটা বুঝতে হয়। এতদিন সে শুনে এসেছে ও জেনে এসেছে, কৃষক মানে 'পার্টিব মানষি, লাল পার্টির মানষি। কৃষক একপাখে। আব জোতদার একপাখে। কিন্তু পঞ্চানন মল্লিক বলিছেন জোতদাবক কৃষক হবা নাগিবে।'

'কিন্তু "কৃষক" ত উমরালা কছে—কমিনিস্টেব ঘর, "কৃষক সমিতি জিন্দাবাদ," "কৃষকের দখল দিতে হবে দিতে হবে," "কৃষক উচ্ছেদ না চলিবে না চলিবে না"।'

পঞ্চানন এই প্রশ্নটির জবাব দিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। বোধ হয়, ভালও বাসেন—'কৃষক কথাটি ত সংস্কৃত। যে কৃষি কাজ করে সে কৃষক। জোতদারবা ত চব্বিশ ঘণ্টা কৃষি কাজ করে। জমি আপনি কেন চাহেন ? কৃষি করিবার তানে। সেই কারণে আমরা নিজেদের কৃষক বলিব। কমিনিস্টেব ঘর "কৃষক" কথাখান সম্পত্তি করিয়া নিছে। আর "জোতদার" কথাখান গালি বানাইছে। উত্তবখণ্ড দল "কৃষক" কথাখানের আসল অর্থ সবাইকে জানাইবে। আমবা ত কৃষক, সগায় কৃষক—সে আধিয়ার হউক, দেউনিয়া হউক আর খাটিবার মানষি হউক।'

এটা বুঝে নেয়ার জন্যে একটু সময় গয়ানাথ চুপ করে থাকে। তার কাছে 'কৃষক' কথাটিকে খুব সম্মানজনক ও 'জোতদার' কথাটিকে গালাগাল মনে হয় না। সে যেন জোতদারই থাকতে চায়। উত্তরখণ্ড যে তাকে 'কৃষক' হতে বলবে এর জন্যে সে যেন তৈরি ছিল না।

আসিন্দির তক্তপোশ থেকে উঠে এসে বলে, 'বাপা হে, যেইলা জোতদার ঐলাই কৃষক। উত্তরখণ্ডের কৃষক আর লাল পার্টির কৃষক এক নহে, আলাদা।' আসিন্দিরের নেতিবাচক বাক্যে পঞ্চানন মাথা দোলান আর আসিন্দিরের ইতিবাচক বাক্যে ঘাড় হেলান। যেন, কথাগুলি আসিন্দিরের, ভঙ্গি পঞ্চাননের।

'মানষিরা বুঝিবেন ক্যানং করি ? লালপার্টি কহিবেন, "কৃষককে উচ্ছেদ দেয়া চলিবেন না," আপনারাও কহিবেন, "কৃষক উচ্ছেদের অধিকাব দিতে হবে" মানষিব নখত ত সব কথা গণ্ডগোল হবা ধরিবে। মুইও কৃষক, মোব এই জোযাইও কৃষক, মোব মানষি সেই বাঘারুখানও কৃষক ?'

'শুনেন গয়ানাথবাবু, আমবা ত একটা দল গড়িবাব চাই—উত্তরখণ্ড দল। তার উদ্দেশ্য কী ? পশ্চিমবঙ্গ হইতে আলাদা রাজ্য গঠন। কোন বাজ্য ? কামতাপুর রাজ্য। সেই বাজ্যের দাবিতে ত সকল মানুষকে আসিতে বলিতে হবে। বাজ্যে ত অনেক মানুষ থাকিবে। কৃষক বলিলে সবাইকে বুঝায়। জোতদার বলিলে ত সবাইকে বুঝাইবে না। কিন্তু লোকে যখন শুনিবে যে উত্তবখণ্ড দল বলে—ভেস্ট জমি হইতে ব্যাবেজের জমি ফেবৎ দাও—তখন সগায বুঝিবে যার ভেস্ট জমি ছিল, আমরা শুধু সেই মানষিদেব কথা বলিবার চাহি।'

গয়ানাথ এবাব মাথা হেলিয়ে বলে, 'হ্যাঁ, এই কাথাটা ঠিক কহিছেন। মানষি আনিবার নাগিবে। জোতদাব বলিলে ত মানষি আসিবে না। আব, ভেস্ট জমি বলিলে লোকে বুঝি নিবে জোতদাবির কথা হছে।'

'তা কেন বলেন ? শুধু জোতদাবিব কথা নহে, ন্যায্য কথা, ধর্মের কথা। পাঁচখান টাডি (গ্রাম) দিলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইত না আব সবকার আপনাব এতগিলা জমি প্রথমে ভেস্ট নিল, পবে আবাব এতগিলা জমি ব্যাবেজেব জন্যে অধিগ্রহণ কবিল।' পঞ্চানন মহাভাবতেব উদাহবণ দিযে কী বোঝাতে চাইলেন, তিনি নিজেও বোঝেন না, গযানাথ ত বোঝেই না।

'আপনাদেব কামতাপুবী বাজ্যে এই তিস্তা ব্যাবেজ কী থাকিবে ?' গয়ানাথেব এই সবল জিজ্ঞাসায় পঞ্চানন গম্ভীব হয়ে যান। এই প্রশ্নেব জবাব তিনি ভাবেন নি। আসলে, গয়ানাথের মত বড় জোতদার উত্তবখণ্ড যোগ দিলে তাব স্বার্থে এই তিস্তা ব্যাবেজ সংক্রান্ত প্রস্তাব নিতেই হবে। কিন্তু সে-প্রস্তাব নিলেও পঞ্চানন এখন কী কবে বলবে—কামতাপুব বাজ্যে তিস্তা ব্যারেজ থাকবে কি থাকবে না।

পঞ্চানন বলে, 'ব্যাবেজ নিযা ত আপনাব কুনো অভিযোগ নাই। আপনার অভিযোগ জমি অধিগ্রহণ বিষয়ে। কামতাপুবে দবকাব হইলে ব্যাবেজ কবিতে হইবে কিন্তু কখনোই কৃষকেব জমি অধিগ্রহণ করা হইবে না। নদীব জমি দিযা নদীব ব্যাবেজ বান্ধো।' পঞ্চানন এত সুন্দব ভাবে কথাটির জবাব দিতে পেবে খুশি হন।

গযানাথ পাল্টা প্রশ্ন করে, 'আব, ফবেস্ট ডিপার্টমেন্ট ? কামতাপুরেও কি ফবেস্ট ডিপার্টেমন্টে থাকিবে ?'

পঞ্চানন জবাবেব যে-কাযদা বের করেছেন সেটা ছাডতে চান না, 'গয়ানাথবাবু, আমাদের কামতাপুর বাজ্য ত ভাবতেব মধ্যে একটি রাজ্য হইবে। ভাবতেব সব বাজ্যেব যে-নিয়মক..., কামতাপুরেও তা থাকিবে কিন্তু তা কখনোই কৃষকের বিরুদ্ধে যাইবে না, কৃষকেব স্বার্থে থাকিবে।'

'কৃষক মানে লালপার্টির কৃষক না হয়, উত্তরখণ্ড দলের কৃষক ?'

'নিশ্চয়ই। কৃষক বলিতে শুধু হালুযামানষি আধিযারমানষিক বুঝাবেন কেন ? যার জমি সেও ত কৃষক। শুনেন গযানাথবাবু, আপনি উত্তরখণ্ডে যোগ দিলে সেটা আমাদের গৌবব। এই ডুয়ার্সের সগায়, কোচবিহারেব সগায, তরাইয়ের সগায় আমাদের পুছিবার ধরে—গয়ানাথবাবু কেন আসেন নাই ? আপনারা কয়েক পুরুষের মধ্যস্বত্ব ভোগী। আপনি আসিয়া আপনার বক্তব্য বলেন, আমরা সে-সব নিয়া আলোচনা কবি, দশজনেব সঙ্গে আপনি বসেন।'

গয়ানাথ একটু চুপ করে থেকে বলে, 'সেই তানেই ত আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার আসিছু। কিন্তু মোর ত এতগিলা মামলা চলিছে। স্যালায় মুই আগত যাম না। মোর পক্ষে মোর জোয়াই এই আসিন্দির উত্তরখণ্ড করিবে। মুইও আপনাদের তামান কাম করিম কিন্তু মুই নাম লিখিবার আগে দুই-চারি মাস দেখিবার চাহি।'

'কী দেখিতে চান ? আমাদের কাজকর্ম ?'

'না-হয়, না-হয়। মোর মামালা-মোকদ্দমাগিলা কোটিত দাঁড়ায় ?'

'মামলা চলিবে মামলার মত, তাতে আপনার উত্তরখণ্ড করিবার বাধা কোথায় ? আপনি ত চাহেন তিস্তা ব্যারেজের বিষয়ে আমবা সম্মিলনে কথা তুলি ? আপনি নিজে না-আসিলে কে তুলিবে ? কী তুলিবে ? ব্যারেজের ব্যাপারখানে ত আপনাকে নেতৃত্ব দিতে হবে আমাদের। আপনি আমাদের লিডার

হবেন।'

আসিন্দির গয়নাথের পাশে দাঁড়িয়ে বলে ওঠে, 'মুই ত কহিছু বাপাক্‌। তোমার কি এ্যালায় লুকি থাকিবার বয়স, নাকি, ভলান্টিয়ার বানিবার বয়স ? তোমাক এ্যালায় লিডাব হবা নাগিবে। লিডার হও কেনে, বাপা, লিডার হও।' গয়ানাথ একটু চুপ করে থেকে বলে, 'আচ্ছা, ব্যারেজের তানে সুই আসিম। কিন্তু অন্য কাজ সব আসিন্দিব করিবে।'

তারপর আবার কী ভেবে বলে, 'না, মুই আসিলে আসিন্দিবকে বাদ দ্যান। দুইজন মিলি যোগদান হইলে সগায় ভাবিবে হামরালা সরকারেব বিরুদ্ধ যুদ্ধ ঘোষণা দিছু।'

'তাহলি জামাইঅক আমাদের সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পার্টনাব কবি দ্যান।'

'সেইখান কী ?'

পঞ্চানন দু হাত তুলে বলে, 'এক কাজ করেন। আপনি ঘরে ফিবিয়া যান। দু-এক দিনেব মধ্যে আমি আর আমাদের সম্পাদক বীরেন্দ্রনাথ বসুনিয়া আপনাব সঙ্গে দেখা কবিম।'

একশ আটান্ন

উত্তরখণ্ড সম্মিলন ও শ্রীদেবীর নাচ

ময়নাগুড়িতে 'নিখিল বঙ্গ উত্তবখণ্ড সমিতি'র প্রথম সম্মিলনের আয়োজন জমে উঠেছে। কিন্তু সেটা উত্তরখণ্ড সমিতির সম্মিলনেব জন্যে, নাকি সম্মিলনেব শেষে প্রত্যেক সন্ধ্যায় আযোজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্যে, তা বোঝা যাচ্ছে না, কারণ এখনো বোঝাব সময় আসে নি। কিন্তু সম্মিলন আব অনুষ্ঠান যখন শুরু হবে তখন সম্মিলনেব কথা যে কাবো মনে থাকবে না— তা এখনই আন্দাজ করা যায়। অবিশ্যি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যদি সত্যিই এতটা সফল হয় তা হলে সেটাও ত উত্তরখণ্ড সম্মিলনেরই সাফল্য হিশেবে ধবা হবে। ইতিমধ্যেই ত এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেব নাম লোকেব মুখে-মুখে 'উত্তরখণ্ড ফাংশন' হয়ে গিয়েছে।

সম্মিলনে আসার জন্যে কোনো পয়সা দিতে হবে না—'সকলে দলে-দলে যোগদান করুন।' কিন্তু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্যে টিকিট আছে—ফার্স্টক্লাশ পনেব টাকা, সেকেণ্ডক্লাশ দশ টাকা, থার্ডক্লাশ পাঁচটাকা। চেয়ারগুলো ডোনারদেব জন্যে ও কমপ্লিমেণ্টাবি কার্ড যাঁদের দেযা হবে তাঁদের জন্যে।

সম্মিলন হবে সকালে আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে বিকেলে। দুদিন 'নবরঙ্গ অপেবা'ব 'কুলটাব কুল' ও 'প্রমোদতরণী'। এতে তিনজন ফিল্ম এ্যাকটর আছে—সানু ব্যানার্জি, এলবার্ট সেন আর মোনা গুপ্তা। মোনা গুপ্তা সিনেমাতেও নাচে, যাত্রাতেও নাচবে। আছে হিন্দি-বাংলা গানের আসর। তাতে মান্না দে থেকে অনুপ জালোটা। চিত্রা সিং-এরও আসার কথা আছে, এখনো পাকা হয নি। আছে—কলকাতার একটি গ্রুপ থিয়েটারের সামাজিক নাটক। একদিন সারা রাত ভিডিওতে চারটি ফিল্ম দেখানো হবে। আর শেষ দিনে, ও সেটাই চরম দিন,—বম্বের ফিল্ম আর্টিস্ট শ্রীদেবীর প্রোগ্রাম। পরদিন সকালে সম্মিলন বা অনুষ্ঠান মণ্ডপ থেকে বিরাট শোভাযাত্রা যাবে জল্পেশ মন্দিবে। সেখানে জল্পেশ্বর শিবের সামনে শপথগ্রহণ।

উত্তরখণ্ড সম্মিলনের জন্যেই এ-রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হচ্ছে তা নয়। বরং সম্মিলনটাই নতুন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রতি বছরই কোথাও-না-কোথাও হয় পুজোর পর, এ-রকম সময়ে। অনকে বছর ধরে হতে-হতে ওটার একটা সংযোগ ব্যবস্থাও তৈরি হয়ে গেছে। আসাম থেকে ফিরতি পথে ডুয়ার্সের নানা জায়গায় শিল্পীদের পক্ষ থেকে বা কোম্পানীর পক্ষ থেকে উদ্যোক্তাদের কাছে লোকজন আসা-যাওয়া শুরু করে। ডুয়ার্সের কোথাও বা শিলিগুড়ি শহরে এ-রকম অনুষ্ঠান হয়। যারা অনুষ্ঠান করায় তারা ব্যবসার ভিত্তিতেই করে। ফলে কাছাকাছি দুটো অনুষ্ঠান হয় না বা একই জায়গায় পর-পর দু-বছর হয় না। যেখানেই হোক, বড় আর্টিস্ট থাকলে আসাম-বিহার থেকেও লোকজন আসে। উত্তরখণ্ডের ফাংশনে শ্রীদেবীর প্রোগ্রামের দিন ত এ-সব জায়গা থেকে প্রচুর লোক আসবে— আশা করা হচ্ছে।

উত্তরখণ্ড সম্মিলন এই বছরই প্রথম হচ্ছে অথচ এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামই হয়ে গেছে উত্তরখণ্ড ফাংশন। তেরজন মিলে শেয়ার কিনে ফাংশন করছে— তাদের সঙ্গে সম্মিলনের সরাসরি যোগ নেই। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পোস্টার লাগানো হয়েছে উত্তরবঙ্গের সর্বত্র—দার্জিলিং থেকে ফারাক্কা পর্যন্ত, এমন-কি কিছু-কিছু পোস্টার বহরমপুর পর্যন্তও। শিলিগুড়ি-কোচবিহার-ডুয়ার্স পোস্টারে-ফেস্টুনে ছেয়ে দেয়া হয়েছে। যে-বাসগুলো তিস্তা ব্রিজ পার হয়ে আসাম যায়, তার পেছনে পোস্টার ত আছেই, তা ছাড়াও বঙ্গাইগাঁও, চুটিয়াপাড়া, পাণ্ডু ও গৌহাটিতে ফেস্টুনও ঝুলছে। আবার আসাম থেকে কিষনগঞ্জ হয়ে পূর্ণিয়ার দিকে যে-সব ট্রাক যাতায়াত করে সেগুলোতেও পোস্টার সাঁটা। কিন্তু ট্রাকে পোস্টার থাকে না, ছিঁড়ে যায়। তাই কলকাতা থেকে কিছু প্লাস্টিক শিট ছাপিয়ে এনে ট্রাকের সামনের কাচে লাগানো হয়েছে। কিষনগঞ্জ-ডালখোলার রিক্সার পেছনেও পোস্টার। কথা আছে, ফাংশনের দু-একদিন আগে ময়নাগুড়ি আর জলপাইগুড়ির রিক্সাওয়ালাদের গেঞ্জি দেয়া হবে—শ্রীদেবীর ছবি ছাপিয়ে।

সেই আসাম, বিহার পাহাড়, ডুয়ার্স জুড়ে এত প্রচার—আসামি, হিন্দি, নেপালি ভাষায়। পাণ্ডুতে একটা বাংলা ফেস্টুনও লাগানো হয়েছিল—পরীক্ষার জন্যে। কেউ ছেঁড়ে নি দেখে আরো কয়েকটা ঝোলানো হয় রেলওয়ে কলোনির ভেতরে। কিষনগঞ্জে হিন্দি পোস্টার ও ফেস্টুন। ডালখোলার মোড়ে হিন্দি-বাংলা দুই পোস্টারই আছে, ডুয়ার্সেও তাই।

ডালখোলার মোড়ে তিনটি দোকানে, কিষনগঞ্জের ছটি দোকানে, পাণ্ডুতে একটি দোকানে, বঙ্গাইগাঁওয়ের হুইলারে, চুটিয়াপাড়ার সিনেমা হলে, গৌহাটির তিনটি দোকানের, আলিপুর দুয়ারের একটি মিষ্টির দোকানে ও আলিপুর দুয়ার জংশনে একটি অফিসে, দার্জিলিঙের একটি অফিসে ও দুটি দোকানে, কার্শিয়াঙের ট্যাক্সিস্ট্যাণ্ডে, শিলিগুড়িতে এয়ারভিউ হোটেলের মোড়ে ছাতার নীচে, জলপাইগুড়িতে নিরালা হোটেলে, পূর্ণিয়ায় এক ডাক্তারখানায়, কোচবিহারে একজন একাই কন্ট্রাক্ট নিয়েছে, ডুয়ার্সের নানাজায়গায় টিকিট বিক্রির ব্যবস্থা আছে। কিন্তু অনুষ্ঠানের পাঁচ দিন আগে বাইরের এই সব টিকিট বিক্রির জায়গা থেকে টিকিট ফেরৎ নিয়ে এসে শুধু কয়েকটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে বিক্রি করা হবে। লক্ষ-লক্ষ টাকা খাটানো হয়েছে এই অনুষ্ঠানে। সে-টাকা তুলে তার ওপর লাভ করতে হবে। এক ও একমাত্র উপায় টিকিট বিক্রি করা। উদ্যোক্তারা তাই প্রচারের ওপর যেমন জোর দিয়েছে, তেমনি জোর দিয়েছে টিকিট সব জায়গায় ছড়িয়ে দেয়ার ওপর। টিকিটের জন্যে কেউ অনুষ্ঠানে আসতে পারল না— এটা যেন না হয়। যদিও ছদিন ধরে অনুষ্ঠান ও ছদিনের টিকিটই যারা নিচ্ছে তাদের পাঁচ দিনের দাম দিতে হচ্ছে, কিন্তু সব ব্যবস্থাই শেষ দিনে শ্রীদেবীর অনুষ্ঠানের জন্যে। শ্রীদেবীর নাচ দেখতে কত লোক যে আসবে তার হিশেব করাও মুশকিল। এই শেষ দিনের অনুষ্ঠানের টানেই অন্য দিনের টিকিটগুলি এমন বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। শ্রীদেবীর অনুষ্ঠান আসাম-বিহার-ডুয়ার্স থেকে লোক যদি আসে তা হলে লাভ বেশ ভাল হবে।

দূর থেকে যারা আসবে তারা নিজেরাই ট্রাকবাস ভাড়া করে আসবে। এমন-কি চা-বাগান থেকেও যারা আসে, তারা চা-বাগানের ট্রাকেই আসে। কিন্তু পাশাপাশি ১৫ থেকে ৩০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের এলাকা থেকে অনুষ্ঠানের নিয়মিত দর্শকরা আসবে—এটা আশা করা যায়। তাদেরও অনেকেই গরুর গাড়িতে আসে বটে কিন্তু অনুষ্ঠানের শেষে কতকগুলি রাস্তায় কিছুদূর পর্যন্ত অনন্ত দুটি-একটি বাস যাওয়ার আশ্বাস থাকলে অনেকেই ভরসা পায়। সেই জন্যে প্রাইভেট বাস বা হাট বাসের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে।

এই অনুষ্ঠানে আসার জন্যে আসামে, বিহারে, দার্জিলিঙে, তরাইয়ে নানা রকম ব্যবস্থা শুরু হয়েছে। অনেকে শুধু শ্রীদেবীর অনুষ্ঠান দেখাবার জন্যে ডি-লাক্স বাসে যত জনকে আনা সম্ভব তত জনের টিকিট কেটে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে বাস ভাড়া ইত্যাদি মিলিয়ে একটা রেটে বিক্রি করছে। বাসওয়ালাদের মধ্যে ডি-লাক্স বাস, অর্ডিনারি বাস যেমন আছে, তেমনি ডি-লাক্সের মধ্যে ভিডিও বাস আলাদা। তারা যাওয়ার সময় ও ফেরার সময় ভিডিওতে শ্রীদেবীর ফিল্ম দেখাবে। দূরত্বের ওপর নির্ভর করে কোনো-কোনো বাসে একটা বড় খাওয়া, দুটো ছোট খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। কোনো-কোনো বাসে খাওয়া-দাওয়ার কোনো ব্যবস্থাই নেই। আবার অনেকে নিজেরাই বাসট্রাক ভাড়া করে আসছে।

ফলে, এই শেষ দিনের অনুষ্ঠানে, ময়নাগুড়ি শহর পুরো জ্যাম হয়ে যেতে পারে। এইটুকু ত শহর,

রাস্তাগুলোও সরু-সরু। যদি একবার কোনো গাড়ি আটকে যায়, সেটা বের করা প্রায় অসম্ভব। সেইজন্যেই পুলিশের ওপর পুরো নির্ভর। অনুমতি ত নেয়া হয়েইছে—পুলিশই বিভিন্ন মাসে বাস ও ট্রাস পার্কিঙেব ব্যবস্থা করে দেবে। কোম্পানীকে শুধু সেই মাঠে ঢোকার রাস্তা বানিযে দিতে হবে। আসাম থেকে আসা গাড়িগুলোকে চৌপত্তির আগেই পার্ক করাতে হবে আর বিহার বা তিস্তাব্রিজ পার হওয়া গাড়িগুলোকে পশ্চিম দিকে পার্ক করাতে হবে। মাঠগুলো বেশ বড়-বড় আছে, এই যা বাঁচোয়া। শ্রীদেবীর নাচের জন্যে ময়নাগুড়ির মত এইটুকু থানা শহরে সর্বভারতীয় ব্যবস্থা গড়তে হচ্ছে, যেন আসামের গাড়ির সঙ্গে বিহারের গাড়ি মুখোমুখি না হয়, ডুয়ার্সের গাড়ির সঙ্গে তরাইয়ের গাড়ি মিশে না যায়—সব গাড়িরই মুখ যেন থেকে শ্রীদেবীর মঞ্চের দিকে, কিন্তু নানা দিক থেকে।

একশ উনষাট

একটি প্রযোজনীয় জীবনী—সংক্ষেপে

বীরেন্দ্রনাথ বসুনিযা থানাব বড়বাবুর কাছ থেকে চিঠিটা পেয়ে যান সেদিন বিকেলের মধ্যেই। বীরেনবাবুকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেব সম্পাদক হিশেবে জানানো হয়েছে, যে-তেরজন আর্থিক দায়িত্ব নিয়ে ও একটি কমিটি তৈরি কবে এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেব অনুমতি প্রার্থনা কবেছিলেন তাদের জলপাইগুড়ি সার্কিট হাউসের সভায় উপস্থিত থাকতে জানানো হচ্ছে। ঐ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্যাণ্ডেলে একই সঙ্গে 'নিখিলবঙ্গ উত্তরখণ্ড সম্মিলন' নামে যে-সম্মিলন হচ্ছে ও যে-সম্মিলন সম্পর্কে সরকারকে এখনো পর্যন্ত কিছু জানানো হয় নি তাদের সংগঠকদেরও যেন সাংস্কৃতিক সম্মিলনের উদ্যোক্তারা নিয়ে আসেন—এই নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেযা হয়েছে যে মাননীয় পর্যটনমন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী ও বনবিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী দয়া করে এই মিটিঙে উপস্থিত থাকবেন।

বীরেনবাবু চিঠিটা বার দুয়েক পড়ে ফতুয়ার পকেটে রেখে আবাব তাঁব কপি খেতে নেমে যান। শীতকালের শুরুতে বাড়ির পাশেব ও পেছনের পড়ে থাকা বিরাট জমির মাত্র কিছু অংশেই পালং, ফুলকপি-বাঁধাকপি, মটর শাক করেন বীরেনবাবু। তাঁর কয়েকটা গরু আছে—সেই রাখালটাই বাগানেব দেখাশোনা করে থাকে : বীরেনবাবু সাত সকালে ঘুম থেকে উঠে চারাগুলোর ওপর কলাগাছের খোল কেটে বানানো ছোট-ছোট আড়ালগুলো দিয়ে দেন। আবার বিকেলের শেষ দিকে বীরেনবাবু সেই কলার খোলের আড়ালগুলো সরিয়ে চারাগুলোকে খুলে দেন। এদিকে এত শিশির আর হিম পড়ে যে এই একেবারে কচি চারাগুলো সারা রাত খোলা থাকলে সেই হিমে ভিজে ঝরঝরে হয়ে ওঠে। এই সকালে ও বিকেলে তাঁর লোকটি গরুগুলোকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তা ছাড়া মাত্র বছর তিনেক আগেও বীরেনবাবু নিজে হাতেই এই খেতটা করতেন। কিন্তু তিন বছর আগে বুকে শ্লেষ্মা জমায় আর ব্লাডপ্রেশার বাড়ায় তাঁকে জলপাইগুড়ি হাসপাতালে দিন দশেকের জন্যে ভর্তি হয়ে হয়েছিল। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে বীরেনবাবু আর আগের মত কাজে ফিরে যেতে পারেন নি। বোধহয় চানও না। তাঁর কিছু খেতি জমি আছে, তাতে বাড়ির সারা বছরের খাবার হয়ে, সরকারের লেভি শোধ করেও কিছু বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত ফসল থেকে যায়। চার মেয়েরেই বিয়ে হয়ে গেছে। বড় ছেলে জলপাইগুড়ি কলেজ থেকে বি-এ পাশ করে বাড়িতেই থাকে, জমিজমা দেখাশোনা করে, পুকুর কেটে মাছচাষের ব্যবসায় নেমেছে। সে ছেলের একটিই মেয়ে। ছোট ছেলে কলকাতায় ওকালতি পড়তে। এখন অবিশ্যি নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিতেও ল ফ্যাকাল্টি হয়েছে, জলপাইগুড়িতেও ল কলেজ আছে, সন্ধ্যায় ক্লাশ করে রাতে ময়নাগুড়িতে ফিরে আসে অনেকেই। কিন্তু বীরেনবাবু চেয়েছিলেন তাঁর ছেলে ওকালতি যখন পড়ছেই তখন কলকাতাতেই পড়ুক। সেই ছোট ছেলের জন্যেই এখনো সেরেস্তা আঁকড়ে আছেন বীরেনবাবু। নইলে হয়ত ওকালতি ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে বসে থাকতেন। ওকালতি পেশার ওপর বীরেনবাবুর যা টান, তার চাইতে অনেক বেশি টান তাঁর নিজের তৈরি এই সেরেস্তার ওপর। তিনি ময়নাগুড়িতে বসেই বরাবর প্র্যাকটিশ করে আসছেন জলপাইগুড়ি কোর্টে। আগে জলপাইগুড়িতে একটা ছোট বাড়ি ভাড়া করে থাকতেন। তিস্তা

ব্রিজ হয়ে যাওযার পর সেই বাড়িটা ছেড়ে দেন। বীরেনবাবু ওকালতি পেশাটাকে ভালবাসেন। আইনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নানা বিচার-বিশ্লেষণে তাঁব আগ্রহ আছে। বেশিব ভাগ উকিলেরই তা থাকে না, থাকার দবকাবও হয না। এমন কি জজকোর্টেও মাত্র দু-চাবজন উকিলই ঐ সব ল-পযেন্ট-টযেন্ট নিয়ে মাথায় ঘামায। ওকালতিব ভাষা জানলেই একজন উকিলের মোটামুটি চলে যায। কিন্তু বীরেনবাবু শুধু জামিনের উকিল হতে চান নি, ফৌজদাবি মামলা তিনি জীবিকাব জন্যে কবতেন—বেশিই কবতেন, কিন্তু তিনি তাঁর সেবেস্তা তৈরি করতে চেয়েছিলেন প্রধানত সিভিল কেসেব ওপর। আব সেইখানেই তাঁর সাবাটা জীবন তিনি সবচেয়ে বেশি বাধা পেয়েছেন, যেন, বাজবংশী উকিল বলেই তাঁর বুদ্ধিসুদ্ধি কিছু কম, মারদাঙ্গাব মামলা যদি-বা করতে পাবেন, তাই বলে সম্পত্তিব মামলায় তার ওপব ভবসা করাব মক্কেল পাওয়া যেত না। রাজবংশী সমাজের লোকবাই তাঁকে মামলা দিতে চাইত না। তাঁব কম বয়সে তিনি প্রথম একটা বড মামলা পান বাকালির গোলাম মুস্তফাব কাছ থেকে। গোলাম মুস্তফা মুসলমান রাজবংশী—বিবাট জোতদাব, জলপাইগুডি শহবেব নতুন পাডায তাঁব বাংলো বাড়ি 'বাকালি হাউস' সকলে চেনে। জলপাইগুডি শহবেব বড-বড উকিলবা তাঁব মামলা কবেন। তিনিই একদিন তাঁব বাকালিব বাডিতে বীবেনবাবুকে ডেকে পাঠিযে একটা মামলাব দাযিত্ব নিতে বলেন, কারো জুনিয়াব হিশেবে নয, পুবো দাযিত্ব, তবে বীবেনবাবু যদি মামলাব দবকাবে কোনো সিনিযাবেব সঙ্গে কথা বলতে চান বা সিনিযারকে দিয়ে ড্রাফট করাতে চান সেটা বীরেনবাবুব ব্যাপাব। 'কিন্তু, মামলায হারা চলিবে না, স্যালায হাইকোর্ট কবিবাব নাগে করিবেন, কিন্তু জিতিবাব নাগিবে।' গোলাম মুস্তফা সাহেব হেসে বলছিলেন, চেককাটা লুঙি আব ধবধবে গেঞ্জিতে কাঠেব হাতাওয়ালা ও হেলান দেয়া লম্বা বেঞ্চের কিনাব থেকে পিক ফেলে বলেছিলেন, হো-হো কবে হেসে পিক ফেলে বলেছিলেন, 'হাবিবার চাহিলে ত হামার ভদ্দবমানষি ভাটিযাব ঘব উকিল আছে—ননিলী ঘোষ, মকবুল হোসেন, খগেন মহলানবিশ—কিন্তু এই মামলাটা মুই হামার বাজবংশী উকিলক দিয়া জিতিবাব চাহি—'জিতন কেনে ভাই, জিতি আনেন।'

মামলাটা এমন কিছু না—জেতাবই মামলা। তখনকাব আইনকানুনও ছিল অনেক সোজা। কিন্তু গোলাম মুস্তফা, তাঁকে, বীবেন বসুনিযাকে উকিল বেখেছেন—এ থেকেই তাঁব পশার বাডতে শুরু কবে। মুস্তফা সাহেবই বীবেনবাবুকে বলেছিলেন, 'হামযালাব বাহেব ঘব তোমাক মামলা দেয না কেনে, কহেন ত?' তাবপর নিজেই উত্তব দিয়েছিলেন, 'এই আইনকানুন সম্পত্তি কোর্টকাছাবি এইগুলা সব ভাটিয়াব ভদ্দরমানুষেব তৈরি। তা সগায ভাবে—এই সব মামলা মোকদ্দমা ভাটিযাব ঘবই ভাল বুঝে, তোমার বাজবংশীয় ঘব কি আব অনং ইংবাজি কহিবাব পাবে হাকিম সাহেবেব মুখৎ?' মুস্তফা সাহেব পাকিস্তানে যান নি অনেক দিন, বোধহয যাবেন নাই ঠিক কবেছিলেন, কিন্তু স্বাতন্ত্র সালেব একটা ছোট দাঙ্গার পর হঠাৎ সমস্ত সম্পত্তি বিনিময করে চলে গেলেন। মুস্তফা সাহেবেব দৌলতেই বীবেনবাবু তাঁব সেরেস্তা তৈবি কবতে পেবেছেন। তাঁর ধাবণা মুস্তফা সাহেব দাঙ্গার জন্যে ইন্ডিযা ছেড়ে পাকিস্তানে যান নি। তিনি হঠাৎ বুঝতে পেবেছিলেন, ইন্ডিযার জোতদারি-জমিদারিব দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। এ কথা কোনো-দিন কাউকে বলেন নি বীবেনবাবু। কিন্তু মনে-মনে এটাই তিনি এখনো বিশ্বাস কবেন যে মুস্তফা সাহেব প্রথমত ছিলেন একজন জোতদাব, দ্বিতীয়ত ছিলেন একজন বাজবংশী আর তৃতীযত ছিলেন একজন মুসলমান। নইলে সেই লিগ আমলে গোলাম মুস্তফাব মত একজন মুসলমান ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেযারম্যান অন্তত হতে পাবতেন কিন্তু লিগ না কবেই মুস্তফা সাহেব চালিযে গেছেন। একবাব বীবেনবাবুকে বলেছিলেন, 'তোমরালা বাহেব ঘর 'ক্ষত্রিয সমিতি' বানাইছেন, ভাল, কিন্তু দেখেন ত কেনে তোমাব মহাভাবতত্ মুসলমান ক্ষত্রিয আছে কি নাই। না-থাকিলে হামবালা যাম কোটত—হামরালা বাহে মুসলমানের ঘব, যাম কোটত, কহেন!'

বীরেনবাবুও কি গোপনে-গোপনে প্রথমত একজন রাজবংশীই? নইলে উত্তবখণ্ড দল যখন তাঁকে সম্পাদক করে এই সম্মিলনের ব্যবস্থা করল তিনি রাজি হয়ে গেলেন কেন? আবার, নাগবিক কমিটিরও তিনিই সম্পাদক—যাবা এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করছে। নইলে তিনি এখনো তাঁর সেরেস্তাটা ছোট ছেলের জন্যে রক্ষা করতে নিয়মিত কোর্টে যাতায়াত করছেন কেন, একথা জেনেও যে তাঁর ছেলে ময়নাগুড়ি বা জলপাইগুড়িতে বসে প্র্যাকটিশ করবে না হয়ত, হয়ত কলকাতাতেই বসবে? বসুক, এটা যেন বীরেনবাবু চানও, না-জেনেই চান। আজকাল প্রায় কোনো মামলাই জজকোর্টে নিকেশ হয় না, সব

মামলাই হাইকোর্ট পর্যন্ত চলে। তা যদি চলে, তা হলে, একজন রাজবংশী উকিল তাঁর এই সেরেস্তার মামলা দিয়েই তার প্র্যাকটিশ শুরু করতে পারে— তাঁর সেই ভাবী এ্যাডভোকেট ছেলের জন্যে বীরেনবাবু সেরেস্তা আগলাচ্ছেন।

বীরেনবাবু সবগুলো কপিচাবার ওপর কলার খোলের ঢাকনি দেয়া শেষ করেন। কাজটা করতে তাঁর একটু সময় লাগে। দাঁড়িয়ে কোমর বেঁকিয়ে সবাতে গেলে তাড়াতাড়ি হত. কিন্তু তাতে তাঁর কোমরে ব্যথা হয়। সেজন্যে তিনি উটকো পায়ে-পায়ে এগিয়ে যান। এতেও ব্যথা হয—হাঁটুতে। কিন্তু এক-একটা সারির শেষে উঠে দাঁড়িয়ে পাটা টানটান করে নিলে ব্যথাটা থাকে না।

বীরেনবাবু তাঁর জমির ছোট দুই টুকরোয় এখন তরকারি লাগান—বাকি প্রায় বিঘে দেড়েক জমি ত পড়েই থাকে—গোয়াল, পোয়ালবাড়ি এ-সব সহ। আজকাল অবিশ্যি এদিকে একটা নতুন ব্যবসা চালু হচ্ছে। এ-রকম বড় জমির ওপর বাড়ি যাদের তাদের কাছে তরকারি চাষিরা এসে ঐ বছরের জন্যে জমিটা নিতে চায়। সমস্ত খরচ চাষির। তরকারি যা হবে তার একটা অংশ জমির মালিকের। কতটা জমির মালিকের আর কতটা চাষির তা এখনো স্থায়ী ভাবে স্থির হয় নি, কারণ এক-একজন এক-এক নিয়মে জমি, যদি দেয়, দিতে রাজি হয়। কেউ আধিভাগে দেয—তা হলে অবিশ্যি ফলনের খরচাও বার আনি-চার আনি ভাগ হবে। বীরেনবাবুর কাছেও এই প্রস্তাব দিয়ে দু-তিন বছর হল লোক আসছে। কিন্তু তিনি রাজি হননি। তিনি রাজি হন নি ওকালতি বুদ্ধিতে—একই জমিতে পর-পর দু-তিন বছর একই লোক তরকারি ফলালে একটা সম্পর্কে গড়ে ওঠেই, তারপর তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না। তাছাড়া তাঁর অতটা দরকারও নেই। কিন্তু যাদের দরকার আছে-—আগে সম্পন্ন পরিবার ছিল, এখন নানা কারণে পড়ে গেছে, অথচ বাড়িটা দু-বিঘে তিন-বিঘে জমির ওপর—তাদের কাছে ত এটা উপার্জনের উপায়। বীরেনবাবু চোখের সামনেই জিনিশ দেখছেন। এক ঃ বছর দু-চারের মধ্যেই শহরের বাড়িঘরের এই সব জমির ওপর তরকারি চাষিদের একটা দখল অন্তত আশ্বিন থেকে মাঘের শেষ পর্যন্ত, কায়েম হয়ে যাচ্ছে। আর, দুই ঃ এই তরকারি চাষিদের অনেককেই টাকার যোগান দিচ্ছে ডুয়ার্স ও জলপাইগুড়ি শিলিগুড়ির কাঁচা তরকারির বড়-বড় আড়তদাররা। বীরেনবাবুর হিশেব, আর দু-এক বছরের মধ্যেই এখানে আলু চাষ হবে, আলু রাখা যায় বেশি দিন, কোল্ড স্টোরেজও হবে। পুরনো বাড়ি ছাড়া কাদের আর দু-তিন বিঘে বাস্তু জমি থাকবে। সে-সব বাড়ির প্রায় চোদ্দ-পনের আনাই ত রাজবংশী বাড়ি। ময়নাগুড়ির মত শহরে যদি এই বাস্তুজমিতে তরকারি চাষের দাদন চলতে থাকে তা হলে দশ বছরের মধ্যে বাস্তুজমির ঐ অংশ বেচে দিতে হবে। আগে, জলপাইগুড়ি শহরে যত রাজবংশী পরিবার থাকত, এখন আর তা থাকে না। ময়নাগুড়িতেও বাস্তুজমির রাজবংশী মালিকানার অনুপাত কমে যাবে, দ্রুত। জলপাইগুড়ি শহরে রাজবংশী বাড়ি কমে যাওয়ার একটা বড় কারণ তিস্তা ব্রিজ, বাস-মিনি-ট্যাক্সির এ-রকম বাড়। আগে, জলপাইগুড়ি শহরে যেতে হলে তিস্তায় খেয়াপার হয়ে, হেঁটে, সাঁতরে, ট্যাক্সিতে চেপে যেতে হত। অথচ স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, অফিস, কাছারি সবই জলপাইগুড়িতে। তখন স্কুল বলতে ত যজ্ঞেশ্বর রায়ের বাঙ্গালিবাজনার স্কুল, দোমহানির রেল স্কুল আর ময়নাগুড়ির। আর, এখন কলেজইত একটা ফালাকাটায়, একটা ধূপগুড়িতে। স্কুলের ত কথাই নেই। কমার্স কলেজ আর ল কলেজের ছেলেরা রাত আটটায় শহরে ক্লাস শেষ করে ডুয়ার্সে ফিরে যেতে পারে। তারপর যারা ঐ মোটর সাইকেল কিনছে তাদের ত কথাই নেই। জলপাইগুড়িতে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্যে একটা বাড়ি রাখা ত খরচের ব্যাপার। সে-খরচ কেউ করবে কেন আর ? বীরেনবাবুরই ত আগে শহরে একটা বাড়ি ছিল, এখন নেই। সুতরাং জলপাইগুড়ি শহরে রাজবংশী পরিবারের আনুপাতিক সংখ্যাহ্রাসের কারণটা বোঝা যায়।

কিন্তু সে-সব কোনো কারণই ত ময়নাগুড়িতে নেই। এ-রকম একটা জংশন-গঞ্জের মত জায়গা ময়নাগুড়ি, যেখান থেকে শিলিগুড়ি হয়ে পাহাড়-বিহার, ধুবড়ি হয়ে আসাম পর্যন্ত ঘণ্টাকয়েকের মধ্যে মালপত্র পাঠানো যায়, সেখানে পুরনো রাজবংশী পরিবাররা দু-বিঘে চার-বিঘে জমির বেশির ভাগটাই ফেলে রেখে দুটো-একটা ছোট টিনের ঘরে মাত্র বসবাস করবে, তা তরিতরকারির আড়তদাররা চলতে দেবে কেন ? শুধু নগদ টাকার স্বাদ দিয়েই ত এ জমিগুলো তারা হাতিয়ে নেবে। এখনো নেয় নি বটে, কিন্তু জলপাইগুড়ির জজ কোর্টে গত পঁয়ত্রিশ বছর প্র্যাকটিশের অভিজ্ঞতা থেকে বীরেনবাবু বুঝতে পারছেন ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, ফালাকাটার মত জায়গায় ভূসম্পত্তির মালিকানার এই বদল আসন্ন,

সাত-আট মাসেব পোয়াতির মত আসন্ন। ডুয়ার্সে বাজবংশীবা সংখ্যালঘু হয়ে যাবে—সম্পত্তির মালিকানাতেও। আইনের পথে একে ঠেকানোর আর-কোনো উপায় নেই— একমাত্র উপায় সমস্ত রাজবংশীকে এক কবে আসামের মত কোনো আন্দোলন। তা হলে গোলমালের ভয়ে ভূসম্পত্তি এখনই কেউ কিনতে চাইবে না হয়ত। কিন্তু তাতেও ত স্থায়ী সমাধান হবে না। স্থায়ী সমাধানের জন্যে আসামের মত 'বিদেশী খেদাও' আন্দোলন হযত করা যাবে না, কিন্তু, অন্তত এটাও আদায় কবা যায় যে রাজবংশীদের কাছ থেকে কোনো সম্পত্তি অবাজবংশী কেউ কিনতে পাববে না। অর্থাৎ আদিবাসী-উপজাতি অঞ্চলেব এই নিযম জলপাইগুড়ি ও ডুয়ার্সেও প্রয়োগ করতে হবে। তার মানেই বাজবংশী-অঞ্চলেব জন্যে কিছু স্বতন্ত্রতা দাবি কবা। তার নাম হয়ত আপাতত দেয়া হয়েছে উত্তবখণ্ড। সে নাম পবে বদলাতেও পাবে। কিন্তু বাজবংশী বা উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদেব স্বার্থরক্ষাব জন্যে আর-কোন বিকল্প রাস্তা আছে? না হলে এটা মেনে নিতে হয়—সারা দেশে যা হচ্ছে এখানেও তাই হোক; সেখানে বাজবংশীব কথা আলাদা ভাবে তোলা কেন? তবকাবি খেতের কাজ বীবেনবাবুর হয়ে গিয়েছিল। তিনি সেখান থেকেই কুয়োপাড়ে গেলেন—জল তোলাই ছিল, একটা ঘটিতে তুলে খানিকটা মুখে দিলেন, খানিকটা পায়ে। বারটা সিঁড়ি ভেঙে তাঁকে বাবান্দায উঠতে হয। আগেকার দিনের বাড়িগুলো এ-বকম দেড়তলাব মত উঁচু হত। বীরেনবাবুও গল্প শুনেছেন—বাঘেব ভয়েই নাকি উঁচু কবা। কাঠেব বাড়ি, বাতে মইটা তোলা থাকত। কিন্তু তাঁর আমলেই ত কাঠের বাড়ি বদলে ইটেব হল, কই তিনি ত উচ্চতা কমান নি। এক-এক ধবনেব বাড়িতে থাকা অভ্যেস হয়ে যায়। বীরেনবাবুদের অভ্যাস এ-বকম উঁচু বাড়িতে থাকা।

বাবান্দায টাঙানো তাবে গামছা ছিল, তাতে মুখ আব পা মুছে, বীরেনবাবু ঘবে ঢোকেন। বাগানেব কাজ কবাব সময ধুতিটা একটু তুলে নিয়েছিলেন, এখন ঘবে এসে নামালেন। তাবপব ফতুযাব ওপব গরম কাপড়েব পাঞ্জাবি ও তুষটা নিয়ে, পাম্প শুটা পবে বেবিয়ে এসে একটু উঁচু গলায স্ত্রীকে বললেন, 'আমি উত্তবখণ্ডে যাচ্ছি।' সম্মিলন আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেব জাযগাটা এখন এই নামেই চলছে।

হঠাৎ সবকাবেব চিঠিটা পেযে ওঁর ওকালতি জীবনেব স্মৃতি, তাঁব ছোট ছেলেব কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিশেব স্বপ্ন, আব জলপাইগুড়িব ডুয়ার্সে বাজবংশীদের সম্পত্তিহ্রাস যে বীরেনবাবুর ধারাবাহিক মনে পড়ে গেল, তা নয। তিনি উত্তবখণ্ড ও শ্রীদেবীব অনুষ্ঠানেব কর্মকর্তা হলেন কী কবে—ঐ স্মৃতিসহ প্রত্যাশা তারই যেন কাবণপঞ্জি। বীরেনবাবুব মনে ঐ সব কথা একসঙ্গে এখন এই বৃত্তান্তেব প্রয়োজনেব সুযোগমত এসে যায় নি। বীরেনবাবুর নিজের কাহিনী, রাজবংশী হয়েও উকিল হিশেবে প্রতিষ্ঠার কাহিনীই ত একটা আলাদা বৃত্তান্তের লোভনীয বিষয় হতে পারে। তাঁর মত লোক কেন উত্তরখণ্ডের মত আন্দোলনে ঢুকে পড়েন সে-সবেব আভাস দেযাব জন্যেও বীরেনবাবু সম্পর্কিত এই সব কথা ওঠে নি। কিন্তু বীবেনবাবুর মত একজন উকিল মানুষ, ও বযস্ক লোক, যিনি সারাটা কর্মজীবন কাটিয়েছেন জেলা শহরের কেন্দ্রে, জেলার রাজনীতি ও প্রশাসনের মাঝখানটিতে, তাঁর কাছে, দারোগার এই চিঠিটা কী করে ও কেন লেখা হল সেটাব জলেব মত পবিষ্কার হয়ে যায় চিঠি পাওযার সঙ্গে-সঙ্গেই। ওরা চাইছে সম্মিলন ও অনুষ্ঠানেব মধ্যে একটা ভাগাভাগি ঘটিয়ে সম্মিলনটাকে বন্ধ করাতে ও অনুষ্ঠানটা করাতে। বামফ্রন্টের সরকার ও সরকারের পার্টিগুলির কাছে বম্বেব কোন সিনেমাওয়ালি শ্রীদেবীর নাচ অনেক নিবাপদ। কিন্তু রাজবংশীরা আলাদা ভাবে বসে কিছু কথাবার্তা বলাটা অনেক বেশি বিপজ্জনক—'উগ্রপন্থী', 'বিচ্ছিন্নতাবাদী'। তিনি অত্যন্ত কম কথা বলেন বলেই অমন চিঠি পেয়েও সেটা ফতুয়ার পকেটে ভরে ফুলকপির চারা থেকে কলার খোল খুলে দেয়ার কাজটা অব্যাহত রেখে, চিঠিটাকে উপেক্ষা ও অপমান করে, নিজের ও নিজেদের বহু-বহু প্রাচীন উপেক্ষা ও অপমানের শোধ নেন। তাঁর জীবনের এই খবরগুলি সেই সব উপেক্ষা অপমানেরই প্রাসঙ্গিক।

একশ ষাট

উত্তরখণ্ডের ফাংশনের আলোচনা—এক

বীরেনবাবুব বাড়ি থেকে সম্মিলন ও অনুষ্ঠানেব জাযগায যেতে বেশ কিছুটা হাঁটতে হয। তিনি হেঁটেই যান, রিক্সা নেন না। কিন্তু হাঁটার পক্ষে এই রাস্তাটা আব ভাল নেই। সব সময ট্রাক, বাস আর মিনি যাচ্ছে। রাস্তাটাও ছোট, দোকানপাট বসায় সেটা আবো ছোট হয়ে গেছে। একটু যে পাশ দিয়ে যাবেন, তেমন পাশও নেই। প্যান্ডেল তৈরি হচ্ছে ব্লক অফিসের পাশে। এখন পুবোদমে কাজ হচ্ছে—সকলকে সেখানেই পাওয়া যাবে। তবু যাওয়ার সময চৌপত্তিতে মরণচাঁদের দোকানটাতে একবাব উঁকি দিলেন—অনেক সময ওরা সন্ধ্যায এখানে বসে। কিন্তু এখন কেউ নেই।

প্যান্ডেলে নকুলকে পেয়ে গেলেন। পেযে যাবেন—সেটা আশাই কবেছিলেন। নকুলকে খবব দিলে ঐ ছোটাছুটি করে সবাইকে জড়ো কববে।

পাঞ্জাবির নীচে ফতুয়া, ফতুয়ার ভেতরে-পকেট। সেই পকেটের ভেতব থেকে চিঠি বেব করতে বীবেনবাবুকে কিছুটা সময নিতে হয়। তবে বীবেনবাবুকে সব কাজেই কিছুটা সময় দেয়াটা সকলেব অভ্যেস হয়ে গেছে।

বীরেনবাবুকে দেখে, 'আসেন, কাকা' বলে নকুল সিগাবেটটা ফেলে পাযেব তলায দলে দেয আর গিরিজা একটা ভাঁজ করা চেযাব এগিয়ে দেয। চিঠিটা বের করে নকুলের দিকে এগিয়ে দিতে-দিতে বীবেনবাবু বসেন। নকুল চিঠিটা না-নিয়ে জিজ্ঞাসা কবে—'কাকা কি আমাকে এই বয়সে আবার ক্লাশ পালানো শেখাবেন? সেই যে ক্লাশ এইটে জানলা দিযে পালিযেছি আব দরজা দিয়ে কখনো মা সরস্বতীর সামনে দাঁড়াই নি। টেন্ডার নোটিশ পড়তে পাবি না আব আপনি আমাকে চিঠি দেখাচ্ছেন? মা সরস্বতী লজ্জা পাবেন বলে সবস্বতী পুজোব দিন না খেয়ে থাকি কিন্তু অঞ্জলি দেই না।'

বীরেনবাবু চিঠিটাসহ হাতটা কোলেব ওপব বেখে নকুলেব পেটেব দিকে তাকিয়ে বলেন, 'জলপাইগুড়ির সার্কিট হাউসে মিটিং, নর্থ বেঙ্গলের মন্ত্রীবা থাকবে, তোমাদেব তেবজনকে থাকতে হবে আর উত্তরখণ্ডের লোকদের সঙ্গে নিতে হবে।'

'মানে? কবে?' নকুল যেন আকাশ থেকে পড়ে, 'সে হাঙ্গামা সেদিন থানাব মিটিঙে মেটে নি? তারপর ত ওরা আর-কিছু জানায় নি, কাকা? এখন ত চাবদিনেব মাথায ফাংশন—এখন মিটিং? মন্ত্রীরা আসবে?' নকুল থেমে যায়, দুপা হাঁটে, ফিবে আসে, তাবপর জিজ্ঞাসা কবে, 'কবে?'

'পরশুদিন।' বীরেনবাবু জবাব দিয়েও আবার খাম থেকে কাগজটা খুলে মিলিয়ে নিয়ে কাগজটা ভাঁজ করে খামে ভরে রাখেন।

'পরশু? মানে, বুধবার? আব শনিবার উদ্বোধন? এ সবের মানে কী? কী, চায় কী?'

বীরেনবাবু হাত তোলেন—নকুলকে থামানোব ভঙ্গিতে। নকুল থেমে গেলে আবাব তার পেটের দিকে তাকিয়ে বীরেনবাবু বলতে থাকেন, 'উত্তেজিত হয়ো না। সরকারেব উদ্দেশ্যে পরিষ্কার—উত্তরখণ্ড সম্মিলনটা হতে দেবে না। তাও প্রথম দিকে ও-সব হতে দিতে আপত্তি নেই। সবকার শেষ দিনের জল্পেশ্বর অভিযান ও তিস্তা বুড়ি পূজাটাকে ঠেকাতে চায়। সুতরাং উদ্বোধন-টুদ্বোধন নিয়ে ভেবো না। তোমরা,' কাঠের মিস্ত্রির হাতুড়ি ঠোকার আওয়াজে বীবেনবাবু থেমে যান। নকুল সেদিকে তাকিয়ে চিৎকার করে ওঠে, 'এই থামাও ত তোমাদের হাতুড়ি।' হাতুড়ির আওয়াজ থামলে বীরেনবাবু বলেন, 'আগে ফাংশনের ও কনফারেন্সের যারা রিয়্যাল লিডার তারা বসো, পারলে আজ রাতেই, আবার ওখানেও বসতে পারো। অন্তত, যে-কজন অ্যাভেইলেবল। তারপর তোমাদের তের জনের ও উত্তরখণ্ডের এক্সিকিউটিভ কমিটির একটা জয়েন্ট মিটিং করতে হবে—কাল বিকেলেই। সেখানে ফর্মাল প্রস্তাব নিতে হবে—না-হলে যারা ঐ মিটিঙে যাবে তারা বলবেটা কী?'

নকুল হঠাৎ হাত জোড় করে উটকো হয়ে বসে পড়ে, 'কাকা, আমাকে ছেড়ে দেন। এই মিটিং-মুটিং প্রস্তাব-ট্রস্তাব শুনলে আমার মাথা ঘোরে। আমি চললাম। যা টাকা এর মধ্যে দিয়েছি তা ফেরৎ চাই না—ও আমি একটা টেন্ডার পেলে সরকারের কাছ থেকে দশগুণ উশুল করে নেব। কিন্তু এ আমি পারব না কাকা। এলাম, একটু ফুর্তি করতে, আর এ ত শালা ফেঁসে যাচ্ছি মিটিঙে।'

বীরেনবাবু চুপ করে থাকলেন। প্যান্ডেলের অন্যান্য জায়গায় আরো দু-চারজন যারা ছিল, তারা,

হাতুড়ির আওয়াজ থামার পরে নকুলের চেঁচামেচি শুনে এগিয়ে আসে। নবীন দূর থেকেই বলে, 'কী হইল ? নকুলদা নিজেই যাত্রা ধরিলেন নাকি ?'

এবার নকুল দাঁড়িয়ে তাদের দিকে ফিরে বলে, 'এই ত ভাই, তোমরা আছ—উত্তরখণ্ড-শ্রীদেবী যা-ইচ্ছে বুঝে নাও, আমাকে ছাড়ো ভাই, আমার সাধ মিটে গেছে।'

ততক্ষণে ওরা এদের কাছে পৌঁছে গেছে। কী হল আর জিজ্ঞাসার দরকার হয় না। কিন্তু বীরেনবাবু কোনো কথা না বলায় নকুলকেই বলতে হয়—'পরশুদিন জলপাইগুড়ির সার্কিট হাউসে মন্ত্রীরা মিটিং ডেকেছে, উত্তরখণ্ড আর এই ফাংশন নিয়ে কথা বলতে হবে। সবাইকে যেতে হবে।'

নবীনের পাশে ছিল তিলক। সে জিজ্ঞাসা করে, 'কী কথা হবে ?'

'কী আর কথা হবে। গবমেন্ট চায় না উত্তরখণ্ড হোক, কিন্তু চায় শ্রীদেবী হোক।'

বীরেনবাবু মুখটা তোলেন কিছু বলতে কিন্তু তার আগেই তিলক বলে ওঠে, 'সে ত ভালই। কাইল কাগজে একখান বিজ্ঞাপন ছাড়েন যে সরকারের নির্দেশে শ্রীদেবীর অনুষ্ঠান বাতিল করা হইল। আমাদের কোনো কারণ জানানো হয় নাই। যাহারা কারণ জানিতে চান তাহারা মন্ত্রীদের কাছে যান—তা হলেই লোকে মন্ত্রীদের শ্রীদেবীর নাচ নাচাইয়ে ছাড়বে—একেবারে মিস্টার ইন্ডিয়া।' তাতে সামান্য যে সমবেত হাসি ওঠে তাতেও তিলকের কথার নিহিত রাগ চাপা পড়ে না। কিন্তু তিলকের কথা শোনামাত্র বীরেনবাবু তিলকের মুখের দিকে তাকাল। যেন, তিনি যাচাই করতে বলে এ-রকম একটা বিকল্প দেয়ার বাস্তবতা কতটা ?

তাতে বীরেনবাবু হাত তোলেন, সকলে একটু কাছে আসে। বীরেনবাবু সোজা তাকিয়ে তাঁর নিম্নস্বরে বলতে থাকেন, 'শোনো, পরশুদিন সকালে মিটিং, মন্ত্রীরা থাকবেন, মিটিঙে তাঁরা নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট প্রস্তাব দেবেন, তোমাদের সেই প্রস্তাবের জবাবে নির্দিষ্ট কথা বলতে হবে, হ্যাঁ কি না, বা নির্দিষ্ট প্রস্তাব দিতে হবে। সেটা তোমাদের নিজেদের মিটিং করে লিখিত প্রস্তাব নিতে হবে যে এই প্যান্ডেলে উত্তরখণ্ড সম্মিলন করতে দিতে সরকার যদি আপত্তি করে তা হলে শ্রীদেবীর অনুষ্ঠান, মানে কালচারাল ফাংশন, হবে কি হবে না। এক-একজন এক-এক মত দিলে হবে না। ঐ মিটিঙেও এক-একজন এক-এক রকম কথা বললে হবে না। এখন একটা লিস্ট করে যাদের-যাদের পার, খবর দিয়ে দাও।'

নকুল নবীনকে বলে, 'এই, লিস্ট বানাও, নবীন।'

নবীন বীরেনবাবুকে বলে, 'কাকা, আমরা যদি মিটিঙত না যাই কী হয় ?'

বীরেনবাবু মুখ তুলে নবীনকে দেখেন—যেন, তিনি যাচাই করতে চান এ-রকম একটা বিকল্পের বাস্তবতা কতটা ?

নবীন বলে যায়, 'কী করিবে ? পুলিশ আসি উত্তরখণ্ডক বাধা দিবে আর শ্রীদেবীকে ছাড়ি দিবে—তা কেমন করি করিবে ? আর যদি গ্রেপ্তার করে, ত করুক। আমরা গ্রেপ্তার হম।'

বীরেনবাবু হঠাৎ উঠে দাঁড়ান, 'তোমরা তা হলে লিস্ট বানিয়ে খবর দাও। আর এদেরও মিটিঙে আসতে বলো,' কথাটা নকুলকেই বললেন তিনি, 'তোমরা রাত্রিতে আমার বাড়িতে এসো, কী হল শুনব।' নকুল পাশে-পাশে হাঁটে, অন্যরা পেছনে-পেছনে। বীরেনবাবু হঠাৎ দাঁড়িয়ে নকুলকে বলেন, 'তোমাদের তের জন পার্টনারের মধ্যে কারো এটা বলা ঠিক হবে না কিন্তু নকুল, যে, উত্তরখণ্ড শেষ দিনের জল্পেশ্বর অভিযান আলাদা জায়গায় নিয়ে যাক।'

নকুল একটু চুপ করে থাকে, যেন সে বীরেনবাবুকে আভাসে জানাতে চায় সে-রকম কেউ-কেউ ভাবতেও পারে। কিন্তু নীরবতাটা ভেঙে সে বলে, 'সে আগে হলে না হয় ভাবা যেত, থানার মিটিঙে হলে কথা ছিল। কিন্তু এখন হলে ত মনে হবে সরকার জোর করে উত্তরখণ্ডকে শাস্তি দিচ্ছে আর আমরা তার সুযোগ করে দিলাম। সবাই সব জায়গায় একসঙ্গে কাজ করছে কে উত্তরখণ্ড আর কে শ্রীদেবী তা কে ঠিক করবে ? আর তা হয় কী করে কাকা, এখন আর তা হয় না।'

একশ একষট্টি

উত্তরখণ্ডের ফাংশনের আলোচনা—দুই

বীরেনবাবুর বাড়িতে রাত সাড়ে নটা নাগাদ নকুল, জগদীশ, সুরেন, নবীন, তিলক, তরণীবাবু আসতে পারলেন।

বীরেনবাবু মাঝের ঘরটাই তাঁর কাছারি ঘর। সে-ঘরে ওকালতির কাগজপত্রে ভর্তি টেবিলের সামনে গোটা চাবেক কাঠের চেয়ার, আর এক পাশে একটা লম্বা কাঠের বেঞ্চি—হেলান দেয়া ও হ্যান্ডেলওয়ালা। বীবেনবাবু আলো জ্বেলে পড়ছিলেন, এরা ঘরে ঢোকার পরও চোখ তোলেন না। কিন্তু চেয়ার-বেঞ্চে এরা বসে যাবার পর বইটার ভেতরে একটা কাগজ দিয়ে পাশে সরিয়ে রেখে তিনি বেঞ্চ ও চেয়ারে যারা বসে আছে তাদের সবাইকে দেখে নেন।

নকুল বলল, 'বেণীবাবুর শবীরটা খারাপ বলে আসতে পারলেন না, কাল প্যান্ডেলের মিটিঙে নিশ্চয়ই আসবেন।'

বীরেনবাবু কোনো কথা বলেন না, সামনে তাকিয়ে থাকেন।

সুরেন বলল, 'বীরেনকাকা, এখন এত রাতে আপনাকেও ত বেশিক্ষণ বসিয়ে রাখা যাবে না। আমরা মোটামুটি কথাবার্তা বলতে-বলতে এলাম। একটা জিনিশ আমবা ঠিক করেছি—উত্তরখণ্ড সম্মিলন আর আমাদের অনুষ্ঠানটাকে যদি আলাদা করে চায় আমবা তাতে রাজি হব না।'

কথাটা শুনে বীরেনবাবু আবার সকলের মুখ দেখেন যেন যাচাই করতে যে যারা এসেছে তাদেব মধ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা ক-জন আছেন। সম্মিলন আর অনুষ্ঠানকে আলাদা করার ব্যাপারে অনুষ্ঠানেই যারা টাকা খাটিয়েছে তাদের সমর্থন থাকতে পারে কিন্তু উত্তরখণ্ডী কারো সমর্থন ত থাকবে না। বীরেনবাবু এটাতে আশ্বস্ত হন যে যারা এসেছে অনুষ্ঠানের সঙ্গেই তাদের সম্পর্ক বেশি।

'সুস্থিরকে ত দেখছি না', বীরেনবাবু জিজ্ঞাসা করেন।

'ও ত সম্মিলনের কাজেই সব জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাতেই ফিরে আসবে। কালকের মিটিঙে থাকবে।' নকুল জানায়।

রামকিশোবের ময়নাগুড়ি বাজারে ব্যবসা আছে। সে বলল, 'স্যার, আমরা একটা কথা ভাবছিলাম। এই সরকারের মিটিঙে যদি বিলকুল সব লোগ আমরা গিযে হাজির হই ত কাজের কথা কেইসে হবে। আর আমরা ব্যবসায়ী লোগ। এই সব পার্টিটার্টির মিটিঙে গেলে কে গুসা হবে, কে খুশ হবে—আমাদের এই সব করা চবে না। আমাদের ছেড়ে দেন স্যার।'

বীরেনবাবু কথাগুলো শুনছিলেন টেবিলের দিকে তাকিয়ে। শেষ কথাটা শোনার পর চোখ তুলে রামকিশোরকে দেখেন, 'তুমি ত ঐ তেরজন পার্টনারের মধ্যে নেই।'

'না স্যার, তা নাই, লেকিন কমিটিতে আছি।'

'মানে, তুমি কমিটি ছেড়ে দিতে চাচ্ছ?'

'না, না, স্যার, কমিটিতে আমি থাকব, আছি—' রামকিশোর তাড়াতাড়ি বলে। তাকে থামিয়ে দিযে তরণীবাবু বলে ওঠেন, 'আমরা বলছিলাম বীরেনদা, আমরা যেমন আছি, থাকব, আপনারা যা ঠিক করবেন আমরা তাই মেনে নেব, আপনারা যে মিটিং-টিটিং ডাকবেন তাতেও থাকব, মানে যেমন ছিলাম থাকব। কিন্তু এই সরকারি মিটিঙে আমরা যেতে চাই না। আমরা ত কথাও বলতে পারব না, মাঝখান থেকে ভিড় বাড়বে আর ঐ-সব পার্টির লোকজন আমাদের ওপর খেপবে। আমাদের ত ব্যবসা করেই খেতে হয়।'

ময়নাগুড়ি বাজারে তরণীবাবুর বড় সাইকেলের দোকান। আরো নানা রকম জিনিশের এজেন্সি আছে। তরণীবাবুর কথা শুনে বীরেনবাবু রঘুনাথের দিকে তাকান—তারও দোকান আছে, তারও নিশ্চয়ই একই মত।

'কাকা, আমরা কথা বলে এটা বুঝে গেছি যে সরকারের প্রস্তাবে কেউ রাজি হবে না, কেউ ভয়ও পাবে না। আমাদের তের জন পার্টনারের পাঁচজনকে আপনি কোনো সময়েই পাবেন না। তারা টাকা দিয়ে খালাশ আর টাকা পেলেই খুশি। আর, ঐ পাঁচজনের কেউ-কেউ কেটেও পড়তে পারে হাঙ্গামার ভয়ে। কিন্তু সেসব দু-একজনের জন্যে ত আর আমরা পেছিয়ে যেতে পারি না। তাই আপনি বরং ঠিক

করুন কাকে-কাকে নিযে ঐ মিটিঙে যাবেন,' নকুল বলে।

'তোমাদের তেরজনকেই কিন্তু মিটিঙে ডেকেছে। আমাকে সেক্রেটারি হিশেবে চিঠি দিয়েছে। ঐ তেরজনকে খবর দিয়ে এই চিঠিতে তাদের সই নিযে রাখবে। কিন্তু ঐ তেরজনকে মিটিঙে অন্তত একবাব মুখ দেখাতে হবে। সেটা দেখো তোমবা। আর উত্তরখণ্ডের পক্ষে যারা ভাল করে কথা বলতে পারবে শুধু তাদের পাঠাও,' বীরেনবাবু বলেন।

'আমিও সেই বলছিলাম কাকা,' জগদীশ বলে, 'তা হলে, আপনি ত আছেনই, কিন্তু আপনি একা-একা কত কাথা কহিবেন। স্যালায় জুনিযাব উকিল দুই-একটা যদি নিগি যাওয়া যায় ত ভাল হয়। জুনিযাররা চিল্লামিল্লি করিবার পারিবে—আপনি শ্যাষ কথাটা কহি দিবেন।'

নকুল হেসে উঠে বলে, 'আবে কাকার ত মুখ তুলতে হবে, হাত তুলতে হবে, গলা পরিষ্কার করতে হবে—তার পরে কথাটা বলবেন। তার মধ্যে ত সবকারি পার্টির লোকরা জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ করে দেবে।' সকলে হেসে ওঠে। একটু মৃদু হেসে বীরেনবাবু বলেন, 'তোমরা কি কারো কথা ভেবেছ? রাজি হবে?'

'ভাবছিলাম দেবনাথ মাস্টারের কথা আর শিলিগুড়ির উমা উকিলের কথা,' নকুল বলে বীরেনবাবুর দিকে তাকিয়ে থাকে। বীরেনবাবু একটু ভাবেন। তাবপব চোখটা নামিয়ে বলেন, 'ওরা রাজি হবে?'

শুনে ওরা চুপ কবে থাকে।

বীবেনবাবু যোগ করেন, 'দেবনাথ উপস্থিত থাকলে খুব ভাল হয। বাজবংশী সমাজেব একমাত্র পি-এইচ-ডি। কিন্তু সে ত ইউনিভার্সিটিতে চাকবিব চেষ্টা কবছে, সে কি এ-সবে জড়িয়ে পড়তে চাইবে? আর উমাপদও খুব ভাল কিন্তু ওবা ত কংগ্রেসেব ছিল।'

'কংগ্রেস ত কাকা, উত্তবখণ্ডেব বেশিব ভাগই।' জগদীশ বলে।

'না, কিন্তু তাদেব ত সবাই চেনে না। উমাপদ শিলিগুড়ি কোর্টে অনেক দিন ধরে প্র্যাকটিশ কবছে। এখন সবকার যদি প্রমাণ করে দেয় যে উত্তরখণ্ডেব পেছনে কংগ্রেস আছে তা হলে ত সেটা এমন প্রচার করবে যে তোমবা আর কথা বলতে পাববে না।' বীরেনবাবুব কথাব পবে সবাই চুপ করে থাকে।

বীবেনবাবু আবাব বলেন, 'কিন্তু তোমবা এটা ভাল ভেবেছ। এক কাজ করো, দেবনাথকে রাজি কবাও, তাকে কোনো কথা বলতে হবে না। কিন্তু আমরা দরকাব হলে তার কথা বলব।' বীরেনবাবু একটু থেমে যান, তাবপর বলেন, 'দেবনাথকে বলো, এতে তার চাকরির সুবিধেই হবে। আর কোচবিহাবের সন্তোষকে আনো।'

'সন্তোষ মানে সন্তোষ মোক্তার?' সুবেন জিজ্ঞাসা কবে।

'এখন এ্যাডভোকেট। কিন্তু সন্তোষেব সঙ্গে তোমাদেব কি আগে কথাবার্তা হয নি? আমি ত যতদূর জানি ও এ-ব্যাপাবে সাপোর্টই করবে। সন্তোষ যদি সবটা না জানে, তা হলে ও রাজি নাও হতে পারে। ও এলে তোমরা যেটা চাইছ সেটা খুব ভাল হত—খুব স্ট্রংলি আবগু করতে পারত। তোমরা কালই চলে যাও। আমাব নাম করে বলো। ওকে আনো।' বীবেনবাবু থেমে যান। সবাই একটু চুপচাপ থাকে। তারপর তরণীবাবু বলেন, যেন বসে আছেন বলেই বলেন, নইলে বলতেন না—'একটা কিছু উপায় ভেবে গেলে হত না?'

'উপায মানে?' সুরেন জিজ্ঞাসা কবে।

'ধরেন, সরকার বলল—উত্তবখণ্ড কবা চলবে না আব আপনারা বললেন উত্তরখণ্ড আর ফাংশন দুটোই করতে হবে এতে ত আর সমাধান হবে না। আমি বলছিলাম—শেষদিনের মিছিলটা শুরু হওয়ার জায়গাটা যদি বদলাতে বাজি থাকেন তা হলে সরকার হয়ত আর-কিছু বলতে পারবে না, মানে ইচ্ছে থাকলেও বলতে পারবে না।'

'মিছিল মানে জল্পেশ্বর অভিযান?' তিলক জিজ্ঞাসা করে।

'হ্যাঁ', তরণীবাবু বলেন।

'মানে, মিছিল হবে না?' তিলক জিজ্ঞাসা করে।

'না, না, মিছিল হবে। ধরেন, আপনারা রাজি হলেন যে ঐ শ্রীদেবীব নাচ থেকে মিছিল বের না হয়ে চৌপত্তি থেকে হবে, তাতে ত আর-কোনো ক্ষতি নেই।' তরণীবাবু বলেন।

'সে রকম আপোশের কথা ভাবতে হবে বৈকি। তা হলে তোমরা এসো, কালকে ঘোরাঘুরি করে কী

হয় জানিও', বীরেনবাবু উঠে দাঁড়ান।

একশ বাষট্টি

জলপাইগুড়ি সার্কিট হাউসের স্থাপত্য

জলপাইগুড়ি সার্কিট হাউসে মিটিঙের ঘরটা খুব ছোট। আসলে এটা মিটিঙের ঘরই নয়, খাওয়ার ঘর। একটা ছোট্ট পার্টিশন দিয়ে বসার জায়গা আলাদা করা। সেই ইংরেজ আমলে টুরে আসা গবর্মেন্ট অফিসারদের জন্যে এ-রকম বাংলো ধরনের সার্কিট হাউসটা তৈরি হয়েছিল। জলপাইগুড়ি শহর জেলার সদর, তদুপুরি কমিশনার জলপাইগুড়িতেই থাকেন। সুতরাং জেলার অফিসারদের টুরে আসার কোনো সুযোগই ছিল না। এক আসতেন কলকাতা থেকে গবর্মেন্টের সবচেয়ে বড় কর্তারা। অন্য জেলা থেকে অফিসাররা কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে বা জেলা কোর্টে সাক্ষী দিতে আসতেন। ভারতীয় অফিসাররা স্বাধীনতার আগে এই সার্কিট হাউসে বোধ হয় খুব একটা উঠতেন না—তাঁরা বরং স্টেশনের কাছে ডাকবাংলোটা পছন্দ করতেন। সার্কিট হাউস প্রধানত ছিল সাহেবদেরই জন্যে। সাহেবদের কথা ভেবেই জায়গাটা বাছা হয়েছিল। এখন এই রাস্তার পুবে, তিস্তার পাড়ে কমিশনারের, ডিস্ট্রিক্ট জজের, ডেপুটি কমিশনারের ও ডিভিশন্যাল ফরেস্ট অফিসারের বিরাট-বিরাট বাংলো—লাল ইঁট, ঢালু ছাদ আর বিঘে-বিঘে বাগান। রাস্তার পশ্চিমে বিরাট জামবাগানের মাঠ, তার পাশে করলা নদী। এই করলা নদীর পাড়ে, জামবাগানের মাঠের দক্ষিণ সীমায়, একতলা ছিমছাম এই একটেরে সার্কিট হাউস।

এর স্থাপত্যও বাংলোগুলো থেকে আলাদা। তিনদিকে—সামনে, বাঁয়ে ও ডাইনে চওড়া বারান্দা, খিলান দেয়া। নিচু মেঝে—এতটা নিচু মেঝে এদিকে দেখাই যায় না। সামনের বারান্দা দিয়ে ঢুকে বসার জায়গা আর পার্টিশন দিয়ে ভাগ করা খাবার জায়গা। সেই ঘরটার দিকে মুখ করে পেছনে তিনটি মাত্র বড় শোয়ার ঘর। খিলানের সঙ্গে মিল রেখেই, ছাদটা একঢালাইয়ের নয়, বারান্দাগুলোর ওপর একটা ছাদ আর তার এক ধাপ ওপরে ঘরগুলোর ওপর আর-একটা ছাদ। ওপরের ছাদের মাঝখান দিয়ে একটা চিমনির বাঁধানো নল। সেটা এখন আর কোনো কাজে আসে না—শীত কমেছে বলে নয়, শীতে কাঠের আগুন জালানোর লোক আর-নেই বলে। কিন্তু রাস্তার বিপরীতের বাংলোগুলো ও এই সার্কিট হাউসের সারিতেই পরে, কোর্ট বিল্ডিঙের ইন্ডিয়ান রেড রঙের বিপরীতে এই ছিমছাম বাড়িটির আবছা হলদে রঙ এখনো যখন ফেরানো হয়, তখন এই চিমনির রঙও বদলায়।

সার্কিট হাউস এখনো সার্কিট হাউসই। মন্ত্রীরা, বড়-বড় অফিসাররাত এখানে এসে ওঠেন। কিন্তু মন্ত্রীদের আসার সুবাদেই সার্কিট হাউসের ব্যবহার একটু বদলেছেও। মন্ত্রীদের সঙ্গে মিটিঙগুলো সার্কিট হাউসেই হয়—সে-মিটিঙ অফিসারদের সঙ্গেও হতে পারে, তা সর্বদলীয় মিটিঙও হতে পারে। মিটিঙের জন্যে কোনো হল না থাকায় খাওয়ার জায়গায়, খাওয়ার লম্বা টেবিলটাকে ঘিরেই মিটিং বসে। অনেক সময়ই তাতে জায়গা কুলোয় না—তখন দ্বিতীয় সারি চেয়ার সাজাতে হয়। কিন্তু এই খাবার ঘরটার টেবিল ও এক সারি চেয়ারের পেছনে দ্বিতীয় সারি চেয়ার সাজালে নড়াচড়ার আর-জাগয়া থাকে না। ভেতর থেকে কেউ বাইরে বেরতে গেলে স্টিলের চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে চেয়ার ভাঁজ করে জায়গা দিতে হয়। তাই বেশির ভাগ সময়ই তেমন বড় মিটিঙের ভিড়টা ঘর থেকে বারান্দায় উপচে আসে। বারান্দার দরজায় লোকজন ভিড় করে থাকে। তা ছাড়াও বসার জায়গা ও খাওয়ার জায়গাটা ভাগ করে যে-পার্টিশন আছে, সেই পার্টিশনের কাছেও লোকে ভিড় করে আসে।

সেদিনের মিটিঙে ভিড় অতটা হয় নি—কারণ বিষয়টা শহর নিয়ে নয়, ময়নাগুড়ি নিয়ে। কিন্তু শ্রীদেবীর ফাংশন বাতিল হতে পারে এ-রকম একটা কথা মাত্র একদিনের মধ্যে জলপাইগুড়ি শহরে সামান্য একটু রটেছিল। ফলে, ব্যাপারটা কী জানতে কেউ-কেউ এসেছিল। কিন্তু মিটিঙের ভেতরে যাবে না অথচ মিটিঙে কী হচ্ছে সে ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ময়নাগুড়ির লোকজন অনেকেই চলে এসেছে। যারা এসেছে তাদের মধ্যে এই উত্তরখণ্ড সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নানা ধরনের কর্মী ত আছেই, তা ছাড়াও যারা টিকিট কিনেছে—ফাংশন দেখতে যাবে, তাদেরও একটা বড় অংশ আছে।

কর্মীদের মধ্যে যারা মিটিঙে ঢুকতে পারে নি তারাই যে শুধু বাইরে আছে, তা নয়। এমন অনেকেই বাইরে বারান্দায় ঘোরাফেরা করছে বা বারান্দার কিনারে মাটিতে পা ঝুলিয়ে বসে আছে, যাবা এই সম্মেলন অনুষ্ঠানের কর্মকর্তা ও তাদের সঙ্গে আলোচনার জন্যেই এই মিটিঙ ডাকা হয়েছে। কিন্তু এই কর্মকর্তারা যেন মিটিঙের দায়িত্ব অন্যদের ওপর ছেড়ে দিয়ে নিজেরা বাইবে দাঁড়িয়ে আছে—মামলা-মোকদ্দমার সময় যেমন এজলাশের বাইরে থাকে, উকিল-মোক্তারবা ভেতরে মামলা লড়ে।

যারা বাইরে বসে ছিল ও ঘোরাঘুরি করছিল, তাদের চোখের ওপর দিয়েই সম্মিলন ও অনুষ্ঠানের পোস্টারমারা বাস কোর্টের দিকে যাচ্ছিল, কোর্ট থেকে ফিরছিল। এমন-কি, একটা মিনি বাসের পেছনে 'মিস্টার ইন্ডিয়া' ফিল্মে শ্রীদেবীর একটা নীচেব রঙিন ছবি টাঙানো।

জলপাইগুড়ির এম-এল-এ আর কোচবিহাবের নাটাবাড়ির এম-এল-এ মন্ত্রী। ডুয়ার্সের আর-এক এম-এল-এ বনবিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী। এঁদের কাউকে বাইরে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু ময়নাগুড়িব এম-এল-এ বাইরে এসে অনেকের সঙ্গেই কথা বলছিলেন। এম-এল-এ যখন প্রথম বাইরে এসেছিলেন তখন তাঁর হাতে একজন নিজের কাজের কথা বলেই তিনটি কাগজ ধরিয়ে দেয়। সেই কাগজগুলি পাকিয়ে এম-এল-এ ডানমুঠোতে আলগা করে ধবে বেখেছিলেন। কিন্তু সেই ডান হাতটাই তিনি এত নাড়াচ্ছিলেন—কখনো মাথার পেছনে নিয়ে যাচ্ছিলেন, কখনো কারো পিঠে আলতো করে বাখছিলেন, কখনো কাউকে ছোট কিল মাবছিলেন যে মনে হচ্ছিল, ঐ কাগজগুলো পাকিয়ে হাতের মুঠোয় না রাখলে তিনি হাতটা অত ব্যবহার কবতে পাবতেন না। এম-এল-এর জামাকাপড়ের রঙটা আধ-ময়লা, গলায় একটা চাদর জড়ানো। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল, এ-মিটিঙের সঙ্গে তাঁব সম্পর্ক সবচেয়ে দূরের। অথচ আসলে, এ-মিটিঙের সঙ্গে তার সম্পর্ক দুদিক থেকে নিবিড। ঘটনাটা ঘটছে ময়নাগুড়িতে। সুতরাং সরকার পক্ষের আশা, যে, তিনি আগে কথাবার্তা বলে কোনো সমাধান ঠিক করে রাখবেন। আবার, অনুষ্ঠানকর্তাদেরও আশা যে তিনি একটা উপায বাৎলাতে পারবেন। কিন্তু এম-এল-এর কথাবার্তায় ও চলনবলনে কোনো উদ্বেগই ধবা পড়ছিল না।

এম-এল-এ বারান্দার ওপরে কিন্তু সিঁড়ির কাছাকাছি দাঁড়িযে ছিলেন, ফলে সবাই তাঁকে ঘিরেই গোল হয়ে কথা বলছিল। এম-এল-এ একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের ছেলের কাঁধে হাত দিয়ে তাকে বলেন, 'এ ক্যানং কথা কহিছিস তুই ? উত্তরখণ্ড পার্টি করিবারও ধরবু আবার মোব পার্টিও করিবার ধরবু ?' ছেলেটা হেসে বলে, 'কেনে ধরবু না, কহেন ?'

বোঝা যায় এরা একটু রসিকতা করেই রাজবংশী ভাষায় পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছে।

এম-এল-এ হেসে উঠে বলেন, 'মোক ধাঁধা ধইচছিস ? টিভির কুইজ ? আচ্ছা, মুই তোক ধরছু, তুই ক কেনে। হামরালার কমিউনিস্ট পার্টি চাহে এই সারা দুনিয়াডার বদল, আর তোর এই উত্তরখণ্ডটা চাহে এই তোর তিস্তা পারের বদল। ত, দুনিয়াটা বদলি গেলে ত তিস্তাপারটাও বদলিবে। কিন্তু তিস্তাপারটা বদলি গেলে কি দুনিয়াটা বদলিবে, ক কেনে, ক।'

ছেলেটি দুটো হাত মুখের কাছে এনে একটু-একটু হাসছিল। তার হাসির লজ্জায় অথচ তার সপ্রতিভার ঔজ্জ্বল্যে তাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। কোথায় যেন একটা মিল ছিল—ঐ এম-এল-এর জামাকাপড়ের মলিনতা আর পরিশ্রমী শরীবের স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে এই যুবকের সৌন্দর্যের। কিন্তু কোথাও একটা অমিলও যেন ছিল—এম-এল-এর মুখমণ্ডলের নিশ্চয়তাবোধের সঙ্গে এই যুবকের সলজ্জ অনিশ্চয়তাবোধের। এম-এল-এর কথার শেষে একটু হাসির গমক ওঠে। সেটা শেষ হয়ে গেলে, যুবকটি বলে ওঠে, 'সেই তানে ত দুনিয়া বদলিবার কাজে লালঝাণ্ডা করি তোমাক এম-এল-এ বানাছু, আর উত্তরবঙ্গের কাজে উত্তরখণ্ড পাকড়িছু।' এ-কথায় হাসিটা আরো বেড়ে যায়—এম-এল-এ ছেলেটির কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে তার পেছনে একটা ঘুসি মারেন। যুবকটি নাচের ভঙ্গিতে সরে যায়। ভিড়টা বদলে যায়।

পেছন থেকে একজন এগিয়ে এসে বলে, 'হে হেমেন দাদা, আজেবাজে কথা বাদ দাও। এই ফাংশন বাতিল করা ধরিলে কিন্তুক কুরুক্ষেত্র হবা ধরিবে। একখান বুদ্ধি করেন।'

এম-এল-এ হেমেনদা হেসে বলেন, 'আরে, কুরুক্ষেত্রখান বন্ধ করিবার তানেই ত মিটিঙখান ডাকোছি। তা তোমরালা করিছেন উত্তরখণ্ড আর আনিবার ধইচছেন সেই বোম্বাইঠে শ্রীদেবীক্।

স্যালায় আবার মাদ্রাজের বেটিছোয়া। এ ক্যানং উত্তরখণ্ড তোমরালার—ময়নাগুড়ি-মাদ্রাজ-বোম্বাই ?

পেছন থেকে একটা লুকনো গলা শোনা যায়, 'তোমবালা যা শিখাছেন—দুনিয়ার মজদুর এক হো।'

'কায় রে ?' বলে এম-এল-এ সমবেত হাসিব মধ্যে মাথা নিচু করে লুকনো গলাটিকে খোঁজেন।

'এই কায় রে ?' যে প্রথম কথাটা তুলেছিল সে ঘাড় ঘুরিয়ে ধমক দিয়ে আবার এম-এল-একে বলে, 'এখন আপনি মিটিঙের আগত একখান বুদ্ধি করি দেন, তারপর মিটিঙে যান।'

'বুদ্ধি আর আমারঠে কোটত। কংগ্রেসের তামান মানষিলা ত উত্তরখণ্ড করিবার ধরিছেন। য্যালায় বুঝি গেইছে পশ্চিমবঙ্গত আর কংগ্রেসের সরকার হওয়ার কুনো আশা নাই, স্যালায় এইঠে উত্তরখণ্ড বানি, ঐঠে গোর্খাল্যান্ড বানি, ঐঠে ঝাড়খণ্ড বানি বামফ্রন্টের সরকারক বাঁশ্ দিবার ধইচছে। বুদ্ধি ন্যান কেনে কংগ্রেসের দেউনিয়ারঠে। হামারঠে বুদ্ধি কোটত ?' এম-এল-এ হাসতে-হাসতেই কথা শুরু করেছিলেন, কিন্তু কথাটা শেষ করেন একটু রাগ মিশিয়েই। যে-লোকটি কথা শুরু করেছিল, সে বলে—'আচ্ছা ধরেন কেনে, কংগ্রেসই সম্মিলনও করিছে, শ্রীদেবীকও নাচাছে। স্যালায় ত তোমরালা কিছু করিতেন না। এই হেমেনদা, একখান বুদ্ধি করো।'

ঘরের ভেতর থেকে ডাক আসে, 'হেমেন, এসো।'

এতক্ষণ পর্যটনমন্ত্রী তৈরি হচ্ছিলেন। সকালে তৈরি হতে ওঁর কিছুটা সময় লাগে। তাঁর ডাক আসতেই এম-এল-এ ঘরের দিকে ঘোরেন, ভিডটা ছড়িয়ে যায়, অনেকে এম-এল-এর সঙ্গে-সঙ্গেই ঘরের ভেতরে ঢোকে। কেউ-কেউ আবার বারান্দা থেকে মাঠে নেমে যায়। দু-একজন মিটিঙের ঘবের জানলার কাছে দাঁড়ায়।

একশ তেষটি

সম্মিলন ও অনুষ্ঠান নিয়ে সরকারি আলোচনা

টেবিলটা ঘিরে সকলের বসতে একটু সময় যায়। ডেপুটি কমিশনাব, এ্যাডিশন্যাল ডি-সি, এ্যাডিশন্যাল এস-পি, সদর এস-ডি-ও, ডি-এস-পি, এঁরা বসাব জায়গার সোফাতে, ও ময়নাগুড়িব ও-সি, ভেতরে যাবার দরজার পাশে একটা কাঠের চেয়ারে বসে ছিলেন। পর্যটনমন্ত্রী বেরন নি বলে মিটিঙটা শুরু হচ্ছিল না বটে কিন্তু তার আগেই শিল্পমন্ত্রী বেবিয়ে এসে, 'কই, সুবিমলদার হল', বলে দাঁড়াতেই অফিসাররা সবাই উঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন। শিল্পমন্ত্রী তাঁদের 'বসুন' বললেও তাঁরা বসেন না। কিন্তু তাঁর লোকজন তাঁকে খাবার জায়গার ওদিকে মিটিঙেব জায়গার দিকে ডেকে নিয়ে যেতেই অফিসাররা আবার বসে পড়েন। এর কিছুক্ষণ পর বনবিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী বেরিয়ে এসে দরজায় দাঁডিয়ে একটু এদিক-ওদিক তাকান। ময়নাগুড়ি থানার ও-সি দাঁডিযে পড়েন। একটু পবে এস-ডি-ও। কিন্তু ডি-সি আর এ-ডি-সি ওঠার ভঙ্গিমাত্র করেন।

কিছু একটা মনে পড়ায় এস-ডি-ও, তাঁর কাছে গিয়ে বলেন, 'স্যার, এটা একেবারেই অন্য মিটিঙ বলে ডি-এফ-ও আসেন নি। কিন্তু উনি ওঁর অফিসে আছেন। আপনার সময় হলে বলবেন। আমি ওঁকে ফোন করে দেব।'

'সময় ত আপনাদের হাতে। মিটিঙ যখন শেষ করবেন, তখন। আচ্ছা', বলে তিনি আবাব ভেতরে চলে যান।

আরো কিছুক্ষণ পর পর্যটনমন্ত্রী বেরন। ওঁর একটু হাঁফানির কষ্ট আছে। খুব পাতলা ধুতির ওপর মোটা গরম পাঞ্জাবি, তার ওপর শাদা গরম চাদর—তুষ। তবু যেন মুখচোখ একটু ফোলা-ফোলা লাগছিল ! তিনি এসে দাঁড়াতেই সবাই উঠে দাঁড়ান, অফিসাররা বেরিয়ে আসেন, এবার মিটিং শুরু হবে। পর্যটনমন্ত্রী মিটিঙের জায়গার দিকে যেতে গিয়ে ঘুরে জিজ্ঞাসা করেন, 'হেমেন কোথায় ? তারই ত ব্যাপার।'

এস-ডি-ও বলেন, 'উনি বাইরেই আছেন স্যার।'

পর্যটনমন্ত্রী বাইরের দরজার দিকে দুপা গিয়ে জোরে ডাকেন, 'হেমেন, এসো।' তারপর তিনি মিটিঙের জায়গায় গিয়ে টেবিলেব মাথার চেয়াবটিতে বসে পড়েন। তাঁর পেছনে-পেছনে অফিসাররা এসে পর্যটনমন্ত্রীর বাঁ দিকের চেয়ারগুলোতে বসেন—একটা চেয়ার শিল্পমন্ত্রীব জন্যে খালি রেখে। প্রথমে ডি-সি, তারপর এ-ডি-সি, এ-ডি-সির পাশে এ-এস-পি, তাঁর পাশে এস-ডি-ও, ডি-এস-পি। ময়নাগুড়ি থানার ও-সি, ডি-এস-পিকে জিজ্ঞাসা করেন, 'স্যার, আমি তাহলে ওদিকে অপেক্ষা করি, দরকার হলে ডাকবেন।'

'না, না, আপনাকেই ত ব্রিফ করতে হবে, এখানে বসুন'—বলে নিজের পাশের চেয়াবটি দেখান। ও-সি চেয়ারটা একটু সরিয়ে ভেতরে ঢোকেন, আরো একটু সবিয়ে বসেন। কিন্তু চেয়ারটা টেবিলের প্রায় শেষ প্রান্তে বলে বোঝা যায় না তিনি চেযারটা একটু সরিযে বসলেন। মনে হতে পারে, তিনি পর্যটনমন্ত্রীব মুখোমুখি হওয়ার জন্যে একটু কোনাচে হলেন মাত্র।

এরা সব বসতে-বসতেই বাইরে যাবা ছিল, তারা ভেতবে ঢুকতে থাকেন। শিল্পমন্ত্রী ঢোকেন। শিল্পমন্ত্রী জলপাইগুড়ির এম-এল-এ। তাঁকে অফিসারদের পেছন দিয়ে এসে টেবিলেব মাথায় গিয়ে দাঁড়াতে হয়। তিনি দেখেন, তাঁব জন্যে একটা চেয়ার খালি রাখা হয়েছে। সে-চেয়াবটাকে টেনে তিনি একটু সরিয়ে এনে টেবিল থেকে একটু দূরে কিন্তু পর্যটনমন্ত্রীব প্রায় পাশে নিযে যান। তাতে ওদিক দিয়ে যাতায়াতের একটু অসুবিধা হবে কিন্তু তিনি ওখানেই বসে পড়েন। সাধারণত বীতি আছে, জেলায় এ-ধরনের মিটিঙে জেলাব কেবিনেট মন্ত্রী কেউ থাকলে তিনিই সভাপতিত্ব করেন। শিল্পমন্ত্রীরই সেক্ষেত্রে সভাপতিত্ব করার কথা। কিন্তু সুবিমলবাবু যে-কোনো মিটিঙেই প্রধান আসনটিতে গিয়ে বসেন। সেটা তাঁব বয়সের জন্যেও বটে আবাব হযত পার্টির সুবাদেও অনেকটা। অবিশ্যি এক্ষেত্রে ত আব সভাপতির নাম কেউ প্রস্তাব করে না। বিবরণ যদি লেখা হয়, তাতে মন্ত্রীদের নাম পরপর থাকবে। কিন্তু তবু সভা পরিচালনার একটা নিযম থাকেই। তা ছাড়া, এই ঘটনাটার সঙ্গে সুবিমলবাবু জড়িতও নন। ঐ চেয়াবটা যে সভাপতি᾽ চেযাব তাও ঠিক কবা নেই। তবু শিল্পমন্ত্রীবই ঐ চেয়ারে বসার কথা। তিনি যদি আগে এই জাযগাটিতে আসতেন তা হলে ঐ চেয়ারটাতেই বসতেন। কিন্তু এখন সুবিমলবাবু ঐ চেযাবটাতে বসে যাওযায় তিনি তাঁর চেযারটাকে একটু সবিয়ে এনে নিজের বসাব জাযগাটাকে বিশিষ্ট করতে চাইলেন।

সুবিমলবাবুর ডান দিকের প্রথম চেযারে বনবিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী ভুবনমোহন রায়—উনিই একমাত্র বাজবংশী মন্ত্রী। তাঁব পাশে ময়নাগুড়িব এম-এল-এ হেমেনবাবু। তারপর থেকে উত্তবখণ্ড ও অনুষ্ঠানের লোকজন বসেছেন। কিন্তু তাঁদের সবাব জায়গা হয় না, তখন প্রথম সারি: ়েছনে স্টিলের চেয়ার পাততে হয়। সেই দ্বিতীয় সারির সবার বসা শেষ হওয়ার আগেই সুবিমলবাবু একবার ডাইনে-বাঁয়ে তাকিয়ে বলেন, 'নিন শুরু করুন, বেশিক্ষণ মিটিঙ কবা যাবে না, আপনাদের যা সমস্যা সেগুলো প্রথমে বলুন।'

কথাটা কে শুরু করবে তা নিয়ে একটু ইতস্তত দেখা যায়। ডি-সি তাকান ডি-এস-পির দিকে, ডি-এস-পি তাকান ও-সির দিকে। সেটা ও-সি দেখতে পান না, কারণ তিনি ভেবেছেন উত্তরখণ্ডীরাই কথা আগে শুরু করবে, সেই জন্যে বীরেনবাবুর দিকে তাকান। বীরেনবাবু টেবিলের দিকে তাকিয়ে ছিলেন বলে ও-সির তাকানো দেখতে পান না। কিন্তু নকুল সবার দিকেই তাকাচ্ছিল বলে বুঝে ফেলে ও-সি বীরেনবাবুকে শুরু করতে বলছেন। নকু বীরেনবাবুর পাশে, সন্তোষবাবুর পরে। সন্তোষবাবুর পেছন দিয়ে বীরেনবাবুর পিঠে একটা ছোট খোঁচা দিতেই বীরেনবাবু ধীরে মাথা ঘোরান। নকুল মাথার ইশারায় শুরু করতে বলে। বীরেনবাবু খুব ধীরে সন্তোষবাবুকে বলেন, 'সন্তোষ, বলো।'

সন্তোষবাবুকে কোচবিহার থেকে আনা হয়েছে। তিনি গলা খাঁকারি দিয়ে বলেন, 'অনারেবল মিনিস্টারস, আমরা ত প্রপার পারমিশন নিয়ে ফাংশন করছি। আজ বুধবার। শনিবার আমাদের ফাংশন শুরু। শুধু যে লাখ-লাখ টাকা ইনভলভড তাই না, হাজার-হাজার লোক আসবে। এখন এই মিটিং ডাকা হল কেন আমরা বুঝতে পারছি না।' সন্তোষবাবুর গলার জোর আছে। সে-জোরটা এতই বেশি যে এইটুকু ঘরে এই ক-জনের মিটিঙে বেখাপ্পা শোনায়। এ-মিটিঙে পরে ও-রকম চড়া গলায় কথা হতে পারে বটে কিন্তু শুরু হওয়ার কথা ছিল যেন আরো অন্য রকম ভাবে।

সুবিমলবাবু শাদা চাদরে মুখ ঢেকে ছিলেন। মুখ থেকে চাদরটা নামান না কিন্তু চাদরের ভেতর

থেকে হাতটা সরান যাতে তাঁর কথাটা স্পষ্ট বোঝা যায়। তিনি তাঁর স্বাভাবিক স্বরেই কথা বলেন কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক স্বরটাই খুব ভারী। তাই সন্তোষবাবুর চড়া কথার জবাবে তাঁর কথাটা চড়া শোনাল না বটে কিন্তু কঠিন শোনাল, 'তোমাদের ত কিছু বলা হয় নি। তোমরা যে-ফাংশনের জন্যে পারমিশন নিয়েছ সেই ফাংশনটাই করবে। কিন্তু যারা পারমিশন নেন নি তাঁরা তোমাদের ফাংশনের সঙ্গে মিশে কোনো ফাংশন বা কনফারেন্স করতে পারবে না।'

সন্তোষবাবুব কথা ও সুবিমলবাবুর জবাবেব পর সবাই হঠাৎ চুপ করে যায়। কেউই বোঝেন না কোন কথা দিয়ে সভাটা আবার চালু হবে। সুবিমলবাবু চাদরের ভেতরে তাঁর হাতটা আবার মুখের কাছে নিয়ে এসেছেন।

সুস্থির একটু পরে বলে ওঠে, 'আমাদের একটা কথা বলার ছিল।' যেন কেউ তাকে অনুমতি দেবে সুস্থির এমন একটু অপেক্ষা করে। তারপর বলে, 'তা হলে আমাদের এই মিটিঙে ডাকার কোনো দরকার ছিল না। সরকার আমাদের জানিবার পারিতেন যে উত্তরখণ্ড সম্মিলনের পারমিশন নাই। আমরা স্থির করি নিতাম সরকারের নিষেধ সত্ত্বেও আমরা সম্মিলন করিব কি না করিব।' সুস্থিরের কথার সমর্থনে পেছনের সারি থেকে গুঞ্জন ওঠে। গুঞ্জনটা ওঠে এমন স্বরে যেন মনে হয় সেটাকে থামিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু অফিসাররা ও সুবিমলবাবু শুধু সেদিকে তাকিয়ে থাকেন। ফলে গুঞ্জনটা আরো একটু ওঠে। তারপর থেমে যায়।

তারও একটু পরে সুবিমলবাবু বলেন, এবার চাদরটা মুখ থেকে সরিয়ে, 'উত্তর খণ্ড কি কোন্ খণ্ড কোথায় কী সম্মিলন করবে তা নিয়ে সরকারের মাথাব্যথা নেই। যদিও আইন অনুযায়ী এই সম্মিলনের জন্যেও পুলিশের পারমিশন নিতে হয়। কিন্তু ফাংশনের জন্যে যে-জায়গার অনুমতি দেয়া হয়েছে, সেখানে ও-ধরনের কোনো রাজনৈতিক সম্মেলন হলে আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি খারাপ হতে পারে। সেই জন্যেই সরকার বলছে, ফাংশনের জায়গায় ফাংশনই হবে, কোনো সম্মিলন-টম্মিলন করা চলবে না। এটাই সোজা কথা।'

একশ চৌষট্টি

শ্রীদেবীর নাচ ও জল্পেশ অভিযান নিয়ে আরগুমেন্ট

মিটিঙটা আবার চুপ করে যায়। কিছুক্ষণ পর ডি-সি ডাকেন, 'স্যার।' সুবিমলবাবু ডি-সির দিকে তাকান। 'এই সব কালচারাল ফাংশনের ব্যাপার বলে আমরা দু-জনকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছি আসতে—উপেনবাবু আর সমীরবাবু। উপেনবাবুর শরীরটা খারাপ—'

পেছন থেকে শিল্পমন্ত্রী বলেন, 'উপেনবাবু মানে উপেনদা? মানে, উপেন বর্মন মশাই?'

ডি-সি সেদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলেন, 'হ্যাঁ, স্যার।'

'তিনি কি এ-সবের মধ্যে আছেন নাকি?'

'না স্যার। কিন্তু জেলার ওল্ড সিটিজেন হিশেবে তাঁর কথার ত একটা বিশেষ মূল্য থাকতে পারে। তিনি দুপুরের দিকে একবার আসার চেষ্টা করবেন বলেছেন। কিন্তু আমাদের কাছে বলেছেন, এই সব কালচারাল ফাংশনের সঙ্গে কোনো পলিটিক্যাল ব্যাপার যুক্ত করা উচিত নয়।' ডি-সি ঘাড় ঘুরিয়ে কথাটি শিল্পমন্ত্রীকে বলেন বলে মিটিঙে সবাই সেটা শুনতে পায় না। কিন্তু কথাটা শুনে শিল্পমন্ত্রী সোজা হয়ে বলেন, 'সেটা মিটিঙে বলুন যে উপেন্দ্রনাথ বর্মনের মত সিনিয়ার লোকও বলেছেন যে ফাংশন হোক কিন্তু সম্মিলন-টম্মিলন যেন না হয়।' শিল্পমন্ত্রী এত জোরে বলেন যে মিটিঙের সবাই নড়েচড়ে বসে। যেন উপেনবাবুর কথার পর এ নিয়ে আর-কোনো কথা হতেই পারে না, মিটিঙ যেন শেষ হয়ে গেল। উপেন্দ্রনাথ বর্মনের নামের একটা প্রতিক্রিয়া বিশেষত উত্তরখণ্ডীদের মধ্যে হয়। রাজবংশী সমাজে আর-কোনো লোক সারা দেশে এত সম্মানিত নন। কিন্তু তাঁর জীবনের এই সাফল্য সত্ত্বেও তিনি কখনো নিজের রাজবংশী পরিচয়কে ছোট করে দেখেন নি। রাজবংশী সমাজের আর-যাঁরা দেশের নানা জায়গায় নানা ভাবে কিছু-কিছু সম্মান পেয়েছেন তাঁরা হয় আর রাজবংশী নেই, বা, রাজা প্রসন্নদেব

রায়কতের মত জমিদার। উপেন্দ্রনাথকে অস্বীকার করার কোনো উপায় উত্তরখণ্ডীদেরও নেই, সবকারেরও নেই।

সন্তোষবাবু বীরেনবাবুর সঙ্গে কানে-কানে কথা বলে নিয়ে তাঁর পক্ষে যতটা আস্তে সম্ভব ততটা আস্তে বলে দেন, 'তা হলে অন্তত এটুকু প্রমাণ হল যে কংগ্রেসিরা উত্তরখণ্ড করছে না। কারণ, উপেনবাবু চিরকাল কংগ্রেসি।'

সন্তোষবাবুব কথাটা সবাই শুনতে পায়, সবাইকে শোনানোর জন্যেই তিনি বলেছেন। হয়ত তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল—উপেনবাবুর নাম কবায় মিটিঙে সরকাবেব বক্তব্যের পক্ষে যে-সমর্থন তৈরি হয়ে যাচ্ছিল সেটা নষ্ট করে দেয়া।

শিল্পমন্ত্রী মাথা ঝাঁকিয়ে বলে ওঠেন, 'সন্তোষবাবু, উপেনদাকে এ-সব কথার মধ্যে টানবেন না। আফটার অল হি ইজ অ্যাবাভ পেটি পলিটিক্স। আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধেয়। উনি যদি আসেন খুব ভাল হয়।'

সন্তোষবাবু বলে ওঠেন, 'আরে, আমবা কখন উপেনদাব নাম কবলাম, আপনারাই ত করলেন। উনি ত এ-সবের কিছু জানেনই না। আপনাবা কী ব্রিফ করেছেন তা আপনারাই জানান। এখন আপনারা তাঁর নাম করে একটা ডিসিশন আমাদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছেন।'

সুবিমলবাবু একটু হেসে, 'তোমাব মত এ্যাডভোকেটকে কুচবিহাব থেকে ধরে এনেছে—ডিসিশন কি আর সহজে হবে?'

সন্তোষবাবুও একটু হেসে বলেন, 'সে ত তোমাকেও ভাই কুচবিহার থেকেই ধরে এনেছে। তা হলে তুমিও কথা বলো না, আমিও বলব না—এবা জলপাইগুড়ির ব্যাপাব এখানে বসেই মিটিয়ে নিক।'

ময়নাগুড়ির এম-এল-এ হো হো করে হেসে ওঠেন। অফিসাববাও হেসে ফেলেন। সম্মিলন ও অনুষ্ঠানেব লোকজনের মধ্যেও একটা গুঞ্জন ওঠে—সমর্থনেব। এই হাসাহাসির ফলে মিটিঙে যে-একটা তাপ জমেছিল সেটা কেটে যায়।

সেই হাসাহাসিটা থামলে বীবেনবাবু গলা পরিষ্কার করেন কিন্তু কেউ খেয়াল করে না। তিনি একটা হাত তোলেন। সেটাও কেউ খেযাল কবে না। হঠাৎ সন্তোষবাবু ইংরেজিতে বলে ওঠেন, 'মিস্টার মিনিস্টার্স, দয়া কবে একটু মনোযোগ দিন, বীরেন্দ্রনাথ বসুনিয়া, এই জেলার একজন প্রথম শ্রেণীর উকিল, কলকাতা হাইকোর্টও যাঁব দ্বারা উপকৃত হতে পারত এবং শ্রদ্ধেয় উপেনবাবুর মতই যিনি শ্রদ্ধেয়, যদিও আপনাদেব কাছে এখনো সম্ভবত অজ্ঞাত, কিছু কথা বলতে চান। এবং আপনাদের অবগতির জন্যে এই সুযোগে জানিয়ে রাখি যে আজ আমাদের মধ্যে দেবনাথ রায়ও আছেন—রাজবংশী সমাজের প্রথম পি-এইচ-ডি।'

ময়নাগুড়ির এম-এল-এ হেমেনবাবু ও বনবিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী ভুবনমোহনবাবু টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে বীরেনবাবুর দিকে তাকান। বীরেনবাবু টেবিলের দিকে তাকিয়ে ছিলেন—তিনি হয়ত ওঁদের দেখতে পান না। হেমেনবাবু বলেন, 'কাকা, বলেন।' ভুবনমোহনবাবুও বলে ওঠেন, 'দাদা, বলেন, বলেন।' সবাই চুপ করে যায়। বীরেনবাবু গলাটা আবার পরিষ্কার করে বলেন, 'আমার একটা কথা জানার আছে—এটাকে কি আমরা আইনের দিক থেকে দেখছি, নাকি রাজনীতির দিকে থেকে দেখছি, নাকি প্রশাসনিক আইন-শৃঙ্খলার দিক থেকে দেখছি।'

বীরেনবাবু থেমে যান। তাঁর নিচু স্বরেব কথা শোনার জন্যে অফিসাররা টেবিলের ওপর এগিয়ে আসেন, সম্মিলন ও অনুষ্ঠানের লোকরাও মাথা এগিয়ে দেয়, শিল্পমন্ত্রী তাঁর চেয়ারে বসে থেকেই এগিয়ে আসেন। সন্তোষবাবুই একমাত্র চেয়ারে হেলান দিয়ে হাসিমুখে সকলের মুখের দিকে তাকান। যেন, তিনি জানেন বীরেনবাবু কী বলবেন ও তা বলার ফলে অবস্থাটা কী রকম বদলে যাবে। বা, বীরেনবাবুর একেবারে পাশে বসে তিনি কথাগুলো সবচেয়ে ভাল শুনতে পাচ্ছিলেন আর সেই কারণেই শোনার জন্যে তাঁকে কোনো অতিরিক্ত চেষ্টা করতে হচ্ছিল না। বীরেনবাবু যেন একটু সময় দেন তাঁর প্রশ্নের জবাবের জন্যে, তারপর আবার শুরু করেন।

'মাননীয় পর্যটনমন্ত্রী এই মিটিঙের শুরুতে বলেছেন যাঁরা অনুমতি নিয়েছেন তাঁরা ফাংশন করতে পারবেন। তার সঙ্গে সম্মেলন করা যাবে না। তা হলে এটা আইনের প্রশ্ন। আর, তারপরে আবার নানা কথায় মনে হল, সরকার সম্মিলন ও অনুষ্ঠান এক জায়গায় হলে আইনশৃঙ্খলা নিয়ে আশঙ্কা করছেন।

আমরা সম্মিলনই করি আর অনুষ্ঠানই করি শান্তিপূর্ণ ভাবে করতে চাই। তা ছাড়াও, এখানে কংগ্রেস ও উত্তরখণ্ডের কথা উঠেছে। সেটা রাজনীতির প্রশ্ন। আমরা কোনটা আলোচনা করব সেটা আগে ঠিক করে না নিলে, এ মিটিঙে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যাবে না। বা, আমাদের মনে হতে পারে, যে, সরকার যে-ভাবেই হোক তাঁদের ইচ্ছা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছেন'। বীরেনবাবু থেমে যান। কিন্তু তাঁর ভঙ্গি একটুও বদলায় না। সবাইকেই অপেক্ষা করতে হয় যে তিনি আরো কিছু বলেন কিনা।

শিল্পমন্ত্রী চেয়ারটা একটু এগিয়ে আনেন। সুবিমলবাবু চেয়ারের ওপর কনুই রেখে হাতদুটো খাড়া রাখেন আর পাদুটো নাড়াতে থাকেন। ময়নাগুড়ির এম-এল-এ মুখটা বাড়িয়ে বলেন, 'কাকা, আপনিই বলেন না কেন, আইনের কথা বাদ দেন, কিন্তু এক দিনে শ্রীদেবীর নাচ আর আপনাদের সম্মিলন হলে ত সাংঘাতিক অবস্থা হবে, পুলিশ দিয়েও ত সামলানো যাবে না, শ্রীদেবীর নাচে ত শুনছি আসাম বিহার থেকেও লোক আসবে ট্রাক-ট্রাক।'

সুবিমলবাবু পা নাড়াতে-নাড়াতেই মুচকি হেসে বলেন, 'সন্তোষই ত কুচবিহার থেকে দুই ট্রাক লোক নিয়ে আসবে।'

সন্তোষবাবু সঙ্গে-সঙ্গে বলে ওঠেন, 'দুই ট্রাক কেন ? তুমি যে সেদিন ফোন করে বললে তোমার একটা আলাদা ট্রাক চাই কিন্তু মন্ত্রীর নামে ভাড়া করলে খারাপ দেখায়, আমি যেন ভাড়া করে রাখি, সেটা ধরলে তিন ট্রাক।'

সকলে, এমন-কি অফিসাররাও, হো হো করে হেসে উঠতেই হেমেনবাবু দাঁড়িয়ে একবার সুবিমলবাবুর দিকে, আর-একবার সন্তোষবাবুর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে জোরে বলে ওঠেন, 'এই সুবিমলদা, সন্তোষদা, আপনাদের দুই বন্ধুর ফ্রেন্ডলি ম্যাচ থামান ত। মিটিঙটা ত শেষ করতে হবে। কাকা, বলেন।'

বীরেনবাবু গলা পরিষ্কার করে নিয়ে হাতটা তোলেন। সন্তোষবাবু সেই হাতটার দিকে তাকিয়ে একটু হাসেন। বীরেনবাবু যখন এজলাশে তাঁর সবচেয়ে শক্ত যুক্তিগুলো দেন তখন বাঁ হাতটা এ-রকম একটু খাড়া রাখেন। টেবিলেব দিকে তাকিয়েই বীরেনবাবু বলেন, 'ময়নাগুডির এম-এল-এ যে-কথা বললেন সেটাই যদি এই মিটিঙের আলোচ্য হয় তা হলে তার জবাব খুব সোজা—শ্রীদেবী রোজ নাচছেন না, আর রোজ আমাদের সম্মেলন বেলা একটার আগেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। তার পাঁচঘণ্টা পব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে। সুতরাং সম্মিলনের লোক আর অনুষ্ঠানেব লোক কোনো সমযই এক হচ্ছে না।'

বীরেনবাবু থামামাত্র হেমেনবাবু বলে ওঠেন, 'বাঃ, সেইটা নিয়েই ত ক্রাইসিস, শ্রীদেবীব নাচ হবে রাত্রিতে আর আপনাদের জল্পেশ্বর অভিযান হবে সকালে। তা হলে ?'

বীরেনবাবুর দিকে সবাই তাকায। তিনি তাঁর ভঙ্গি একটুও বদলান না, গলাব স্বব একটুও তোলেন না। অপরিবর্তিত স্বর ও ভঙ্গি দিয়ে তিনি সবচেয়ে বেশি মনোযোগ অনায়াসে টেনে নেন। কোনো-কোনো সময় এটাকে তাঁর কৌশলই মনে হয়—যখন প্রতিপক্ষ তাদের আক্রমণ গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু অনেক সময় এটা তাঁর স্বভাবই মনে হয়—যখন প্রতিপক্ষকে তিনি সবাসবি আক্রমণ কখনোই করতে পারেন না। বীরেনবাবু বলছিলেন, 'আমাদের কর্মসূচি অনুযায়ী শ্রীদেবীর অনুষ্ঠান হবে রাত নটা থেকে সাড়ে এগারটা। অনুষ্ঠানের সময় বেড়ে যাবার কোনো আশঙ্কা নেই। কারণ, অনুষ্ঠান শেষ করে শ্রীদেবী তাঁর থাকার জায়গা শিলিগুড়িতে ফিরে যাবেন। তা ছাড়াও, এমন-কি অনুষ্ঠান দেরি করে শুরু হলেও শ্রীদেবী সাড়ে এগারটাতেই তাঁর অনুষ্ঠান শেষ করবেন। প্রতিটি বেশি মিনিটের জন্যে আমাদের অতিরিক্ত এত টাকা দিতে হবে যা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। রাত সাড়ে এগারটায় আমাদেব অনুষ্ঠান শেষ আর সকাল ছটায় জল্পেশ্বর শিবের মন্দিরের দিকে যাত্রা। মাঝখানে সাড়ে ছ-ঘণ্টা সময়। সুতরাং শ্রীদেবীর নাচের ভিড় আর জল্পেশ্বর শিবমন্দিরের যাত্রীদের ভিড় কোনো সময়ই মিলে যেতে পারে না। তা ছাড়াও, এখানকার লোক হিশেবে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, বছরের এই সময় জল্পেশ্বর শিবের দিকে নানা জায়গা থেকে নানা তীর্থযাত্রীর দল আসে। তার সঙ্গে কোনো অনুষ্ঠান বা সম্মিলনের সম্পর্ক নেই। আমরা আমাদের সম্মিলন ও অনুষ্ঠানের শেষ দিন সেই চিরাচরিত তীর্থযাত্রায় যোগ দেব বলে স্থির করেছি। তীর্থযাত্রার জন্যে সরকারের অনুমতি কোনো কালে দরকার হয় না। বরং তীর্থযাত্রীদের যাতে অসুবিধে না হয় সেজন্যেই সরকার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করে থাকেন, এ বছরও করছেন ও নিশ্চয়ই আরো করবেন।'

সবাই একেবারে চুপ করে বীরেনবাবুর নিচু গলায় এই কথাগুলি শোনে। একজন কেউ জোরে-জোরে শ্বাস ফেলছিল, পাশের লোকটি তাকে খুঁচিয়ে থামিয়ে দেয়। বীরেনবাবুর কথা শেষ হওয়াব পব যে-অতিবিক্ত সময়টুকু চুপ কবে থাকতে হয়, তাঁর কথা শেষ হয়েছে কি না বুঝতে, সেটুকু সময় কেটে গেলে, সন্তোষবাবু ঘাড় দোলান, ওস্তাদি গানে বাহবা দেবার ভঙ্গিতে, 'আরগুমেন্ট, আরগুমেন্ট', চাপা স্বরে বলে ওঠেন, 'সুবিমল, কতদিন ধরে বলছি হাইকোর্টের একটা বেঞ্চ এখানে বসাও, বীবেনদার মত এই সব লিগ্যাল টেলেন্টকে কাজে লাগাতে পারতে ! তোমার উত্তরখণ্ডও হত না, কামতাপুরীও হত না। কী লিগ্যাল টেলেন্ট ! আরগুমেন্ট, আরগুমেন্ট !'

একশ পঁয়ষট্টি

শ্রীদেবীর নাচ ও জল্পেশ অভিযান নিয়ে রাজনীতি

শিল্পমন্ত্রীকে চেয়াবটা টেনে টেবিলের কাছে আনতে হয়। তারপব টেবিলেব ওপর দুই হাত রেখে তিনি বলেন' 'বীবেনদা, আপনাব কথা অঙ্কেব হিশেবে ত ঠিক কিন্তু বেঅঙ্কেব হিশেবটা মেলাবে কে ?'

শিল্পমন্ত্রী বীরেনবাবুকে চেনেন না। রাজনীতির ব্যাপাবেও ওঁর পরিচয় তিনি কখনো পান নি। কিন্তু তিনি বুঝে গেছেন—ইনিই পারেন অবস্থাটা সামাল দিতে। তা ছাড়া ডেপুটি কমিশনার একটা কাগজ আগেই দেখিয়েছিলেন—তাতে পার্টনারদের নাম ও পরিচয় ছিল। অনুষ্ঠানের ও সম্মিলনের সম্পাদক হিশেবে সেখানে এই বীরেন্দ্রনাথ বসুনিযার নামই আছে।

অতিবিক্ত একটা উদ্দেশ্যও শিল্পমন্ত্রীর ছিল। বীবেনবাবুব কথাগুলি যে-প্রভাব ফেলেছিল, সেটা কিছু নষ্ট করা।

অথবা হযত অভিজ্ঞতাব জোরেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, মিটিঙের সামনে সমাধানের একটা মুহূর্ত এসেছে, ওটাকে কাজে লাগানো উচিত। সুবিমলবাবু বাঁ হাঁটুর ওপর ডান পা তুলে ডান হাঁটু নাচাচ্ছেন—শাদা চাবদবটা ঠোঁট পর্যন্ত তোলাই কিন্তু একটু বাঁয়ে কেতরে বসেছেন। ওঁর চোখেমুখে বেশ একটা প্রশংসাব হাসি। আব, এই সবের ফলে যে-সুবিমলবাবু স্বনির্বাচিত সভাপতি হয়ে বসেছিলেন, মিটিঙেব এই চবম মুহূর্তে তাঁকেই সভাব বিষয় থেকে সবচেযে দূরবর্তী মনে হয। এমন-কি, তাঁকে বিপক্ষেব, প্রতি কিছু সহানুভূতিশীলও ঠেকে যায় যেন।

শিল্পমন্ত্রীব জিজ্ঞাসাব জবাবে বীবেনবাবু চোখ তুলে তাকান। সন্তোষবাবু জিজ্ঞাসা করেন, 'বেঅঙ্কের হিশেবটা কী সেটা বলুন।'

শিল্পমন্ত্রীব কথাব ভঙ্গিতে উত্তরখণ্ডীরা ও অনুষ্ঠানের লোকজন হঠাৎ যেন বুঝে যায় যে সম্মিলন বা অনুষ্ঠান বাতিল হচ্ছে না, বীবেনবাবু মোক্ষম যুক্তি দিয়েছেন। বা বীবেনবাবুর যুক্তিকে মোক্ষম বলে মন্ত্রীরা মেনে নিয়েছেন।

শিল্পমন্ত্রী সেটা ইচ্ছে করেই বুঝতে দিলেন কি না—সেটা বোঝাও যাবে না, জানাও যাবে না। অতটা সূক্ষ্ম হিশেব করে কথা বলা হয়ত সম্ভবও নয়। কিন্তু শিল্পমন্ত্রীব একটা স্থূল হিশেব ছিল যে আজ বাদে কাল সম্মিলন ও অনুষ্ঠান, কোনো অবস্থাতেই কিছু বাতিল করা যাবে না। যদি কোনো রকমে জল্পেশ্বর অভিযানটা ঠেকানো যায় বা পেছুনো যায়, বা সম্মিলনটাই একটু পেছিয়ে দিতে এদের রাজি করানো যায় তবে তাই যথেষ্ট।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, 'আমরা কেবল একেবারে আইন-শৃঙ্খলার দিক থেকেই শ্রীদেবীর নাচ ও আপনাদের ঐ মিছিলটা এক রাত্রিতে হবে এটাতে আশঙ্কা করছি। নানা জায়গার লোক আসবে, আপনাদের মিছিলেরও লোক আসবে, সারা রাতে ত সব লোক চলে যেতে পারবে না, বেশির ভাগ লোকই থেকে যাবে, যে-কোনো মিসক্রিয়ান্ট একটা গোলামল পাকিয়ে দিতে পারে।'

'সে ত যে কোনো দিনই পারে', সন্তোষবাবু বলেন।

'তা পারে। কিন্তু শ্রীদেবীর সিনেমা এলে কলকাতায় হলের কাছে এজন্য পুলিশ পোস্টিং করতে হয়

শুনি, আর এ একেবারে স্বশরীরে আবির্ভাব। আমি অবশ্য দেখি নি। কিন্তু যা রিপোর্ট পেলাম সে নাকি সেক্স সিম্বল। আপনারাই-বা আপনাদের রাজনৈতিক সম্মিলনের অনুষ্ঠানের ব্যাপারে এ-রকম আর্টিস্ট আনলেন কেন বুঝলাম না। যা-হোক, আপনারা মিছিলটা এক দিন পেছিয়ে দিন।'

'মিছিল, মানে জল্পেশ্বর অভিযান?' সন্তোষবাবু জিজ্ঞাসা করেন।

সম্মিলন ও অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের জায়গা থেকে সমবেত আপত্তির গুঞ্জন ওঠে। সন্তোষবাবু পেছন ফিরে একবার দেখেন। তারপর পাশে নকুলবাবুর সঙ্গে কথা বলে জেনে নিতে চান এটা কতটা সম্ভব বা কতটা অসম্ভব। সন্তোষবাবু তাঁর ওকালতি বুদ্ধিতে মুহূর্তে অনুমান করে ফেলেন যে শ্রীদেবীর নাচ ও জল্পেশ্বর অভিযানের দিনক্ষণ অপরিবর্তনীয়। এই বিষয়ে কোনো আপোশ হবে না। অন্য কোনো বিষয় নিয়ে হতে পারে।

সুস্থির দাঁড়িয়ে বলে, 'মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমরা উত্তরখণ্ডীরা একটা অনুরোধ করছি যে শ্রী বীরেন বসুনিয়া যে-যুক্তিগুলি দিলেন তার প্রত্যেকটি ধরি-ধরি আলোচনা করেন আর না-হয় ত আমরা যে-ভাবে সম্মিলন ও ফাংশন করিবার চাহি করিতে দিন। আমরা আমাদের কর্মসূচির কোনো পরিবর্তন করিব না।'

ময়নাগুড়ির এম-এল-এ হেমেনবাবু চট করে উঠে দাঁড়ান। তাঁর গলার চাদরটা অর্ধেক তাঁর গলায়, অর্ধেক চেয়ারে। তিনি ডান হাত দিয়ে চারদটাকে চেয়ারের ওপর ফেলে দিয়ে বলেন, 'শুনুন, আমি একটা কথা বলছি। বীরেনকাকাই কথাটি তুলেছেন। আমি দাঁড়িয়েই বলি, কারণ সবার মুখ দেখতে চাই। বীরেনকাকা বলেছেন বিষয়টির তিনটি দিক আছে—আইনগত দিক, আইনশৃঙ্খলার দিক ও রাজনীতির দিক। রাজনীতির দিকটা আমরা এখনো কেউ আলোচনা করি নাই কিন্তু করা উচিত। উত্তরখণ্ড আন্দোলন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন কিনা, উত্তরবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বাঁচবে নাকি বাইরে আসি বাঁচবে—এগুলি রাজনীতির কথা, এবং এ সব কথারই আলোচনা করতে হবে। এই মিছিলে না হোক, বাইরের মিটিঙে। পাবলিক মিটিঙে। বৈঠক মিটিঙে। সব জায়গায় এ-সব আলোচনা করতে হবে। আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে আমরা সেই রাজনৈতিক প্রচারে নামব। আপনারাও নামেন। কিন্তু শিল্পমন্ত্রী মশায়ের ভাল প্রস্তাব আপনারা প্রত্যাখ্যান করলেন। আপনাদের মিছিল একদিন পিছি দিলে আপনাদের কী ক্ষতি হত? কিন্তু আপনারা তাতে রাজি না হন। তা হলে আপনারাই বলেন—সরকারই-বা কী করে ময়নাগুড়ি ও পাশাপাশি অঞ্চলের সাধারণ নাগরিকদের নিরাপত্তা সম্পর্কে নীরব থাকবে? আপনারা কাদের নিয়ে এই অনুষ্ঠানের টাকা তুলছেন? কারা এর পার্টনার? রামগোপাল আগরওয়াল—সারা উত্তরবঙ্গে নেপালের সঙ্গে যে-চোরাবাজারের ব্যবসা চলে তাতে প্রধান টাকা খাটায় যে সে কমিটিতে আছে।' এতে উত্তরখণ্ডীদের মধ্যে একটু গুঞ্জন উঠতেই হেমেনবাবু তার গলা আর-একটু চড়িয়ে দেন। তাতে তাঁর বক্তৃতায় জনসভায় ভাষণের ভাব আসে। অফিসাররা মাথা নিচু করে শোনেন। 'আপনাদের আর-একজন পার্টনার সুখরাম বর্মন। সে তামাকের স্মাগলিঙে এখন বোধ হয় লক্ষপতি হয়ে নিজের নাম পর্যন্ত বদল করে ফেলেছে। এখন সে অমিতাভ বচ্চন। আপনাদের আর-একজন পার্টনার আসিন্দির রায়—গয়ানাথ জোতদারের জামাই। গয়ানাথ জোতদার সেটেলমেন্টের বিরুদ্ধে মামলা করে তিস্তা ব্যারেজের কাজ বন্ধ করার ষড়যন্ত্র করি যাচ্ছে আর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে মামলা করি ফরেস্টের গাছ কেটে বেচে নতুন বড়লোক হচ্ছে। আপনাদের পার্টনারদের অনেকেরই ত এই পরিচয়। আপনারা যদি উত্তরখণ্ড সম্মিলনই করবেন তা হলে আপনারা এই সব লোকদের ওপর নির্ভর করছেন কেন? কারণ, আপনাদের টাকার দরকার। এরা আপনাদের টাকা দিচ্ছে। এরা আপনাদের টাকা দিয়ে বম্বে থেকে শ্রীদেবী আনি দিচ্ছে আর আপনারা সেই টাকা সেই লোক নিয়ে জল্পেশ্বরের শিবের নামে সরকারবিরোধী মিছিল নি যাবেন। সরকারবিরোধী হলে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু আমরা জানি আপনারা জল্পেশ্বরের পবিত্র নামকে সংকীর্ণ স্বার্থে ব্যবহার করিবেন। সেখানে তিস্তাবুড়ির পূজা অনুষ্ঠান হবে। সেই পূজার শেষে আপনারা শপথ নিবেন তিস্তা ব্যারেজের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্যে। কী? না গয়ানাথ জোতদার বংশানুক্রমে যে-সব জমি বেআইনি ভাবে ভোগদখল করি আসছে গোচিমারিতে, বাসুসুবায়, গাজোলডোবায় সেই সব জমি তিস্তা ব্যারেজে নেয়া চলিবে না। তিস্তা ব্যারেজে হলে লাখ-লাখ কৃষকের উপকার। আপনারা সেইটা চাহেন না। আপনারা চাহেন গয়ানাথ জোতদারদের, রামগোপাল আগরওয়ালা আর অমিতাভ বচ্চনদের মত

জোতদার, কালবাজারি আর চোরাকারবারিদের উপকার। বীরেন কাকা এই সব কথার বিচার করেন। যা সাফ কথা, তা সাফ-সাফ হওয়াই ভাল। আপনারা শ্রীদেবীর নাচ দেখবেন কি হেমামালিনীর নাচ দেখবেন—তা দেখেন। কিন্তু ঐ নাচের নাম করি হাজার-হাজার মানুষকে জল্পেশ্বরের মত ধর্মস্থানে নি যাবেন আর তিস্তা ব্যারেজের বিরুদ্ধে অভিযান করিবেন তা আমরা হতে দিব না। আমরাও তাহলে পাল্টা মিছিল করিব। আমরা জানি মাসখানেকের মাথায় তিস্তা ব্যারেজের উদ্বোধন করিবেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী। সেই উদ্বোধনে বিক্ষোভ দেখাবার জন্যে উত্তরখণ্ড কামতাপুরী গোর্খাল্যান্ড সবাই জোট বাঁধছে। আপনাদের এই সম্মিলনের উদ্দেশ্যও সেই কারণে লোক জোগাড় করা। আমরাও ধানের বিচি খাই। আমরা জানি, বম্বের শ্রীদেবী আর কলকাতার যাত্রা আনতে কত খরচা হয়। আর এ-টাকা কোত্থিকে আসে। বীরেন কাকা খুব ভাল যুক্তি দিয়ে কথা বলেছেন। কিন্তু আমরা সোজাসুজি বলতে চাই কথাটা আইনশৃঙ্খলারও না, আইনেরও না, কথাটা রাজনীতির। আপনারা রাজনীতি করিছেন, আমরাও তাই রাজনীতি করব।'

একশ ছেষট্টি

উপেন্দ্রনাথ বর্মন ও উভয় পক্ষের ঐকমত্য

শেষ কথাটা হেমেনবাবু ধপ করে চেয়ারে বসে বলেন। বসেই তিনি চারদটা টানেন। কিন্তু নিজেই চাদরের ওপর বসে পড়ায় চাদরটা বেরয় না। ফলে হেমেনবাবু একটু উঠে চাদরটা টেনে বের করে নিয়ে ঘাড়ের ওপব ফেলেন।

হেমেনবাবুর বক্তৃতার শেষে সমস্ত মিটিঙের আবহাওয়া বদলে যায়। তাঁর পুরো বক্তৃতার সময় ধরেই অবস্থাটা বদলাচ্ছিল বটে কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল না কতটা বদলাবে। বীরেনবাবুর কথাগুলির পর মিটিঙের পরিস্থিতি যেমন বদলেছিল, এ বদল তেমন নয়। বীরেনবাবু মিটিঙের নিয়মকানুনের মধ্যে, মন্ত্রী ও অফিসারদের কথার ভেতরই একটা শক্ত পাল্টা যুক্তি খাড়া করেছিলেন। সেই পাল্টা যুক্তির জোরটা মেনেই শিল্পমন্ত্রী একটু নরম হয়ে মীমাংসার একটা প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সে-প্রস্তাবটা মেনে নিলে হেমেনবাবু হয়ত কিছুই বলতেন না। কিন্তু মেনে না নেওয়ায় হেমেনবাবু মিটিঙের এতক্ষণের সব আলোচনা নস্যাৎ করে দিয়ে সেই সব কথাই তুললেন যে-কথাগুলি এতদিন শু এতক্ষণ এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সম্মিলন ও অনুষ্ঠানের লোকজন অনেকখানি উদ্বেগ নিয়েই মিটিঙে এসেছিল। কিন্তু মিটিঙের পরিবেশ-পরিস্থিতি দেখে তারা একটু জোর পেয়েছিল যে শেষ পর্যন্ত সম্মিলনও হবে, অনুষ্ঠানও হবে। কিন্তু শিল্পমন্ত্রীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের পর হেমেনবাবু অবস্থাটা যে এ-রকম বদলে দেবেন এটা কেউই ভাবতে পারে নি।

হেমেনবাবু বসে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সুস্থির উঠে দাঁড়ায়, 'হেমেনবাবু এম-এল-একে ধন্যবাদ যে তিনি আমাদের বিরুদ্ধে তাঁর সমস্ত কথাই বলি দিছেন।' কিন্তু শিল্পমন্ত্রী হঠাৎ তাঁর চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে সুস্থিরকে বলেন, 'আপনি বসুন, বসুন, এখন কোনো কথা হবে না, বসুন।'

'আপনারা আমাদের মিটিঙে ডেকে এনে কথা বলতে দেবেন না?' বলে সন্তোষবাবু দাঁড়িয়ে ওঠেন, 'হেমেনবাবু যা ইচ্ছে তাই অভিযোগ করে যাবেন? আমাদের রাজবংশীদের ঐতিহ্য, ধর্ম, কালচার সব কিছু নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন?' তখন শিল্পমন্ত্রী, সুস্থির ও সন্তোষবাবু তিনজন দাঁড়িয়ে কিন্তু সন্তোষবাবু লম্বা বলে ও তাঁর গলার জোর বেশি বলে কথা বলে যাওয়ার সুযোগটা নিয়ে নেন, 'হেমেনবাবুর রাজবংশীদের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি এখন পছন্দ না হতে পারে ; তিনি কমিউনিস্ট হয়ে এখন জল্পেশ্বর মন্দিরের মাহাত্ম্য ভুলে যেতে পারেন, তিনি তিস্তাবুড়ির পুজোকে কুসংস্কার ভাবতে পারেন কিন্তু আমাদের কাছে জল্পেশ্বর সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। তিস্তাবুড়ি আমাদের কাছে মা গঙ্গা। তিস্তা নদী নয়, তিস্তা দেবতা। হেমেনবাবুর যদি ইচ্ছে হয় তিনি তিস্তা ব্যারেজের পুজো করতে পারেন কিন্তু আমরা তিস্তা বুড়িরই পুজো করব। তাতে যদি আমাদের অপরাধ হয়, অপরাধ হবে। কিন্তু এই ভাবে আমাদের—'

হঠাৎ খাবার জায়গায় পার্টিশনের কাছে কিছু যাওয়া-আসা শুরু হয় আর ডেপুটি কমিশনার চট করে চেয়ার ছেড়ে উঠে শিল্পমন্ত্রীর কানে-কানে কিছু বলে বেরিয়ে যান। 'উপেন বাবু, উপেনবাবু' কথাটা শোনা যায়। শিল্পমন্ত্রী বসার জায়গার দিকে একবার মুখটা বাড়িয়ে সন্তোষবাবুকে বলেন, 'উপেনদা এসেছেন, এখন আপাতত এই আলোচনা একটু বন্ধ থাক। উপেনদার সঙ্গে আমরা সবাই একটু কথা বলে নেই। তারপর, আবার আলোচনা শুরু হবে।' ফলে, সন্তোষবাবুকে বসে পড়তে হয়।

সুবিমল বাবু পা নামিয়ে বসেন, বনবিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী উঠে পড়েন, শিল্পমন্ত্রী বসার জায়গার দিকে চলে যান, ডি-সি ও এস-ডি-ওও তাঁর সঙ্গে যান, ফলে মিটিঙটা ভেঙেই যায়। উত্তরখণ্ডেব কেউ-কেউ বসার জায়গার দিকে যান উপেনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে, কেউ দরজা দিয়ে বাইরে চলে যান। বীরেনবাবু তাঁর জায়গাতেই বসে থাকেন।

কিছুক্ষণ পরই মিটিঙটা ভেঙে সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে, বসার জায়গায় উপেনবাবুকে ঘিরে মন্ত্রীরা, মিটিঙের টেবিলে বাকি অফিসাররা ও অন্যান্যরা কেউ-কেউ, বাইরে বারান্দায় ও মাঠে উত্তরখণ্ড ও অনুষ্ঠানের লোকজন এক-একটা দল পাকিয়ে উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে।

এ-রকম একটা দলে সুস্থির চিৎকাব করে নকুলকে বলে, 'আপনাদের যাকে ইচ্ছা তাকে নাচান, আমরা সম্মিলন করব, আমরা আর এই মিটিঙে থাকব না।'

সন্তোষবাবু হঠাৎ সুস্থিরের ঘাড়টা বাঁ হাত দিয়ে চেপে ধরে ডান হাতেব আঙুল নাচিয়ে বলে ওঠেন, 'তোমাদের মত ফায়াররইটারদের জন্যেই আমাদেব উত্তরখণ্ড মার খাবে। প্রথমত, তোমবা একটা বেআইনি কাজ করেছ—পারমিশনই নাও নি কনফারেন্সের। তার ওপর পারমিশন নিয়েছ কালচারাল ফাংশনের, করছ পলিটিক্যাল কনফারেন্স। গবর্মেন্ট যদি ইচ্ছে করে তোমাদের কনফারেন্স এক মিনিটে বন্ধ করে দিতে পারে। তার প্রতিক্রিয়া কী হবে সেটা আন্দাজ করতে পারছে না বলেই বন্ধ কবার সাহস পাচ্ছে না। সরকারের সবগুলি দল যদি তোমাদের এগেইনস্টে নামে তোমরা কী করতে পারবে? তার চাইতে এখনি একটা কমপ্রোমাইজে রাজি হয়ে যাও। জল্পেশ্বব অভিযানটা কবা দিয়ে কথা—সেটা যদি করতে না পার তাহলে ও-কনফারেন্সের কোনো মানেই নেই। তার জন্যে যদি একটা দিন পেছতে হয় বা জায়গাটা বদলাতে হয়—একটা চেঞ্জে রাজি হও। তোমরা যদি কিছু না ছাডো, তা হলে ওবাই-বা রাজি হবে কী করে? ডাকো, সবাইকে ডাকো, বীরেনদা কোথায়?'

সন্তোষবাবু সুস্থিরের কাঁধ থেকে হাতটা তুলে নেন। সুস্থির সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে—তার কাঁধে ঝোলা, বাঁ হাতটা কনুইয়ের সমকোণে ভেঙে পেট আর বুকের মাঝখানে, ডান হাতটা খাড়া ঠোঁটে, মুখে সামান্য দাড়ি। সেই মুহূর্তে তাকে খুব একা লাগে, যেন, সুস্থির বুঝে গেল যে বীরেনবাবু, নকুলবাবু, সন্তোষবাবু এরা সব একমত হয়ে গেলে তার আব-কিছু করার নেই। তখন সুস্থির শারীরিক ভাবেও একাই—সন্তোষবাবু তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে মাত্র, অন্য সবাই দৌড়ে গেছে আরো কয়েকজনকে ডেকে আনতে যাতে মিটিংটা শুরু হওয়ার আগে তারা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে নিতে পারে।

নকুল-জগদীশ মিটিঙের ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে। এসে বলে, 'বীবেন কাকাকে ডেকে নিয়ে উপেনবাবু গল্প করছেন। আমাদেরই ঠিক করতে হবে। এখানেই বসুন।' ততক্ষণে সুরেন, শান্তি, ভূপেনবাবু এদিকে এসে এদের সঙ্গে মাঠের মধ্যেই বসে যান। এখানে এঁদের এতজনকে মাঠের মধ্যে গোল হয়ে বসতে দেখে যারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল তারাও এসে গোল হয়ে বসে। এখানে চাপা স্বরে একটা পুরো দস্তুর মিটিঙ শুরু হয়ে যায়।

খানিকক্ষণ পর সার্কিট হাউসের বারান্দা থেকে ডাকাডাকি শুরু হয়,—'সগায় আইসেন, মিটিঙ-মিটিঙ।'

শুনে ওরা একসঙ্গে উঠে পড়ে মিটিঙের ঘরের দিকে চলে। নতুন লোক কেউ আসে নি—বরং দু-একজন চলে গিয়ে থাকতে পারে। কে কোথায় বসেছিল সে জায়গা নির্দিষ্ট হয়ে আছে। ফলে, মিটিঙটা আবার আগের অবস্থায় আসতে দেরি হয় না। শুধু এইটুকু তফাৎ—শিল্পমন্ত্রী বীরেনবাবুর বক্তব্য শোনার পর তাঁর চেয়ারটাকে যেখানে টেনে এনেছিলেন সেখানে উপেনবাবু বসে আছেন। আর উপেনবাবুর পাশের চেয়ারে শিল্পমন্ত্রী। অফিসাররা সবাই একটা করে চেয়ার সরে গেছেন।

শিল্পমন্ত্রী দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমরা উপেনবাবুকে অনুরোধ করেছিলাম আজকের সভায় থাকতে। কিন্তু তিনি খুব অসুস্থ। তাই সবার সঙ্গে একটু দেখা করে গেলেন। এখনই উনি চলে যাবেন। তাই

আপনাদের সবাইকে উনি দেখতে চাইলেন।'

উপেন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে নমস্কার করেন। সুস্থির ও আরো অনেকে দুই চোখ বড়-বড় করে দেখে সেই কিংবদন্তির নায়ককে। সেকালের একজন রাজবংশী এম-এ বি-এল শুধু নন—দেশের যে-দায়িত্ব তিনি পেয়েছেন সেখানেই নিজের কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন, দিল্লি, কলকাতা, লন্ডন, লস এঞ্জেলস ; এই রাজ্যের বিধান পরিষদ একদিন পরিচালিত হয়েছে এই রাজবংশীর নির্দেশে, আর জীবনে তিনি কোনো সময় ভুলে যান নি তিনি রাজবংশী। এখনো উপেন্দ্রনাথের লেখা জল্পেশ্বর মন্দিরের ইতিহাস প্রচার করছে সুস্থিররা তাদের জল্পেশ্বর অভিযানের জন্যে। উপেন্দ্রনাথের মোটা তুষ চাদর বাঁ কাধ আর ডান বগলের তলা দিয়ে ঘোরানো। মাথায় সামান্য চুল, গোঁফটা দুদিকে সরু ও লম্বা—প্রায় সবটাই পাকা। মুখে স্মিত হাসি—বিনয়ের ও আত্মবিশ্বাসের। চোখ তুলতে পারেন না—একটু যেন লাজুক। পাঞ্জাবির ঢোলা হাতা ঝুলিয়ে সকলকে নমস্কার করে আস্তে বলেন, 'আমি যাচ্ছি। আপনাদের নমস্কার। সকলে মিলেমিশে একমত হয়ে সব ঠিক করেন। আচ্ছা—' বলে একটু ঘুরে দাঁড়ান। শিল্পমন্ত্রী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান, সঙ্গে-সঙ্গে সবাই নমস্কার করে উঠে দাঁড়ান। শিল্পমন্ত্রী দুপা এগিয়ে যান, ডি-সি পেছন থেকে বলেন, 'স্যার, আমি ওঁকে তুলে দিয়ে আসছি, আপনি মিটিঙে বসুন।' উপেন্দ্রনাথ একটু ঘুরে নমস্কার করে ধীর পায়ে বেরিয়ে যান। শিল্পমন্ত্রী এসে তাঁর পুরনো চেয়ারেই বসেন।

শিল্পমন্ত্রী এসে বসতেই সন্তোষবাবু জিজ্ঞাসা করেন, 'উপেনদাকে আবার এটা বলেন নি ত যে শ্রীদেবী নাচবে ?

সকলে হো হো করে হেসে ওঠায় সুবিমলবাবু বলেন, 'উপেনদাকে দিয়ে শ্রীদেবীর নাচটা ওপেন করালে কেমন হয় হেমেন ?'

এতে আর-এক চোট হাসি ওঠে, যেন, এখানে সবাই পারিবারিক বয়োজ্যেষ্ঠের কাছে গোপন করে কোনো নিষিদ্ধ আনন্দ ভোগ করছে—সেখানে তাদের মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই। ডি-সি এসে তাঁর চেয়ারে বসেন। ফলে, শিল্পমন্ত্রী আর ডি-সির মাঝখানে একটা চেয়ার খালি পড়ে থাকে।

সন্তোষবাবু তাঁর লম্বা হাতটা তুলে বলেন, 'সুবিমল, দেখো, আমার একটা প্রপোজাল আছে। এনাফ হিট হ্যাজ বিন জেনারেটেড বাই দি ফায়ারি ওরাটরি অব আওয়ার এসটিমড এম-এল-এ ফ্রম ময়নাগুড়ি।
তার পাল্টা আরো তাপ বিকিরণ করার জন্যে আমাদের জ্বালাময়ী বক্তা সুস্থির উঠে দাঁড়িয়েছিল বটে কিন্তু উপেনদার উপস্থিতি আমাদের এ যাত্রা বাঁচিয়েছে।' সন্তোষবাবু কথা বলছিলেন সকলের দিকে মুখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে, বিশেষ করে উত্তরখণ্ডীদের দিকে, নিজে একটু হাসছিলেনও। তাঁর পাশে নকুল হাসি-হাসি মুখ করে বসেছিল, যেন তার হাসি দিয়েই সে সন্তোষবাবুর প্রস্তাবটাকে যতটা পারে সাহায্য করতে চায়।

সন্তোষবাবু বলে যান, 'আইনশৃঙ্খলার ব্যাপার নিয়ে সরকারের উদ্বেগ দেখে আমরা প্রস্তাব দিচ্ছি যে উত্তরখণ্ড সম্মিলন যেখানে যেমন হচ্ছে সে-রকমই হোক, কিন্তু শেষ দিন জল্পেশ্বর অভিযান সম্মিলনের জায়গা থেকে শুরু না হয়ে, চৌপত্তির এদিক থেকে শুরু হোক।'

হেমেনবাবু সঙ্গে-সঙ্গে বলেন, 'অভিযানটা বাদ দেন না, আর সবই করেন। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্যে অভিযান পরিত্যক্ত। চৌপত্তিতে দাঁড়াবে কোথায় লোকজন ?'

হেমেনবাবু ও সন্তোষবাবু হেসে ওঠেন বটে ও মুহূর্তে বোঝা যায় এই প্রস্তাবটা সকলে মেনে নেবে কিন্তু হেমেনবাবু অভিযান বাদ দেয়ার কথাটা নিয়ে আরো রগড়াবেন কি না এই নিয়ে একটি চাপা উদ্বেগও থাকে।

হেমেনবাবু বলেন, 'তার চাইতে জল্পেশ্বরের দিকে আর-একটু এগিয়ে আসুন, আপনারা বরং টাউনের বাইরে জমায়েতটা করুন।'

'বেশ, তাই হবে,' বলে নকুল হাত তুলে দেয়। আর-কেউ কোনো আপত্তি না করায় নকুল দাঁড়িয়ে উঠে বলে, 'আমরা যারা এই কালচারাল ফাংশনের পার্টনার তাদের পক্ষ থেকে মাননীয় পর্যটন মন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী, বনমন্ত্রী ও এম-এল-এ সাহেবকে অনুরোধ করছি এই ফাংশনে, বিশেষত শেষ দিন, সপরিবার উপস্থিত থাকতে।'

'আরে থাকব বলেই ত তোমাদের এত করে বললাম উত্তরখণ্ডটা সরাও, শ্রীদেবীটা রাখো, তা তোমরা

শুনলেই না', বলে সুবিমলবাবু অনেকক্ষণ ধরে চেয়ার ছেড়ে ওঠেন।

একশ সাতষট্টি

সম্মিলন ও অনুষ্ঠানপ্রাঙ্গণ

ময়নাগুড়ি ব্লক অফিসের পাশের মাঠে বিরাট প্যান্ডেল—হেশিয়ানের। ভেতরে খড়ের ওপর ত্রিপল ও হেশিয়ান বিছিয়ে বসার ব্যবস্থা। সামনের দিকে, একটু কোনাকুনি, স্টিলের ও কাঠের ভাঁজ করা চেয়ার—সেগুলো গিয়ে শেষ হয়েছে হেশিয়ানেরই বেড়ায়। ঐ চেয়ারগুলির জন্যে দর্শকদের কোনো অসুবিধা হবে না। খড়ের ওপর বেছানো হেশিয়ানের আসন আবার বাঁশ দিয়ে তিন ভাগ করা—ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড ক্লাশ। পুবদিকে কোন গেট নেই। পশ্চিমদিকে তিনটি বড় গেট, কিন্তু তাতেও পর্দা ঝুলছে। এই পুরো প্যান্ডেলটিকে ঘিরে চারদিকেই টিনের বেড়া, বেশির ভাগই কাঁচা বাঁশের কাঠামোতে। স্টেজের পেছন দিকে ও পাশে কাঠের কাঠামো—তাতে টিনগুলো স্ক্রু দিয়ে আঁটা। টিনের বেড়ায় ঢোকার রাস্তা বেশ চওড়া। সেই রাস্তাগুলি আবার বাঁশ দিয়ে দুভাগ করা—পুরুষদের ও মহিলাদের জন্যে। স্টেজের পেছনে স্টেজের চাইতে একটু কম উচ্চতায় কাঠের পাটাতন বিছিয়ে গ্রিনরুম। সেই গ্রিনরুম ও স্টেজ কাঠের কাঠামোতে টিন দিয়ে আলাদা করে ঘেরা। ঢোকার জন্যে দুদিকে দুটো কোল্যাপসিবল গেট—সেটা দিয়েই স্টেজে ঢোকা যায়। গ্রিনরুমের জন্যেই আবার একটা কাঠের দরজা—সেটা প্রয়োজনে ভেতর থেকে বন্ধ করা যায়।

এই প্যান্ডেলের বাইরের মাঠটাতে নানা রকম দোকান বসেছে। বেশির ভাগই খাবারের। একটা বেশ লম্বা দোকানের উনুনটা বাইরের দিকে। সেখানে জিলিপি আর সিঙাড়া ভাজা হয়। সেই দোকানটিতে ভেতরে বসার ব্যবস্থা আছে। অনেকে বসেও বটে, কিন্তু বেশির ভাগই বাইরে উনুনের সামনে দাঁড়িয়ে গরম-গরম জিলিপি আর সিঙাড়া খবরের কাগজের টুকরোর ওপর নেয়। তাই দোকানটাতে দুটো ক্যাশ বাক্স, একটা দোকানের ভেতরে আর একটা ঐ উনুনের পাড়ে। এই দোকানটি ছাড়া ছোট ও মাঝারি দোকানও আছে। শুধু একটা টেবিল ও একটা উনুনি নিয়ে চায়ের দোকান। মাঠের ওপর প্লাস্টিকের চাদর বিছিয়ে চিনির রসে পাকানো শুকনো মিষ্টি। এলুমিনিয়ামের সসপ্যানে রসগোল্লা আর লাড্ডু নিয়ে বসে একজন একটা টুলের ওপর। মাথার ওপর ভামনির ছাউনি দিয়ে তার তলায় শোয়ানো কাচের শো-কেসে মেয়েদের নানা রকম নকল গয়না—কাগজে সাঁটা। পেছনে কাঠের তাকে প্লাস্টিকের নানা রকম খেলনা। একটা দোকানে প্লাস্টিকের বালতি-গামলাও বিক্রি হচ্ছে। খোলা মাঠের মধ্যে পেছনে টাঙানো একটা পর্দায় সারি-সারি বেলুন। একটু দূরে একটা টেবিলের ওপর রাখা একটা খেলনা বন্দুক। ঐ বেলুনগুলিতে নম্বর দেয়া আর নীচে সারি-সারি প্রাইজেও নম্বর দেয়া। কুপির আলো জ্বালিয়ে চানাচুর-বাদামওয়ালা আর তিলেরখাজাওয়ালা। রাস্তা দিয়ে ঢুকলে বাঁয়ে-ডাইনে দু-দুটো পান-সিগারেটের দোকান—চৌকির ওপর। ঢোকার সময় ডান দিকের পান-সিগারেটের দোকানের পেছনে সাইকেল, মোপেড, স্কুটার ও মোটর সাইকেল রাখার জায়গা।

এই মাঠটা ব্লক অফিসের পাশে কিন্তু রাস্তা থেকে এই মাঠে আসার কোনো ব্যবস্থা নেই। রাস্তাটা মাঠ থেকে অনেক উঁচু। রাস্তা থেকে মাটি ভাঙতে-ভাঙতে গড়াতে-গড়াতে বিরাট নালায় এসে পড়েছে। নালাটার ভেতর এখন এই শীতে ভেজা কাল মাটি আর সেই মাটির ওপর সবুজ শ্যাওলার আস্তরণ। কিন্তু সব জায়গায় সমান নয়। কোথাও কাল ভেজা মাটির ঢিবি, কোথাও কাল ভেজা মাটির গর্ত। এই নালীটা সরকারি জমি। তাই এখান থেকে যে যার খুশিমত মাটি কেটে নিয়ে নিজের জমি উঁচু করে নিয়েছে। ফলে, রাস্তার পাশে টানা একটা শুকনো খালের মত নালীটা পড়ে থাকে।

রাস্তা থেকে সরাসরি খাল পেরিয়ে মাঠে উঠে আসা সম্ভব নয় আর এই খালটার ওপর বাঁশ বা কাঠের কোনো অস্থায়ী সাঁকো তৈরি করা হয় নি। কিন্তু শ্রীদেবীর গাড়ি ঢোকানোর জন্যে সাধারণের পক্ষে নিষিদ্ধ একটা কাঠের কালভার্ট তৈরি করা হয়েছে। ব্লক অফিসে ঢোকার বড় ক্যালভার্টটাই প্রধান প্রবেশ

পথ। সেই ক্যালভার্ট দিয়ে খালটা পেরিয়ে ব্লক অফিসের দেয়াল ডান হাতিতে রেখে বেঁকলেই মাঠটাতে ঢোকা যায়। সেখানে যে একটু-আধটু গর্ত ছিল খালের মাটি কেটে সেগুলো ভর্তি করা হয়েছে। দু-চার ট্রাক বালি ঢেলে লেবেল করে দেয়ায় ঐ জায়গাটাকে প্রায় সদর রাস্তার মতই লাগছে—এক ঐ ব্লক অফিসের দেয়ালের পাশের জায়গাটা একটু সংকীর্ণ, তবু সেখান দিয়েও মোটর সাইকেল চলে আসছে।

কিন্তু সদর রাস্তার ওপর এই সম্মিলনের জন্যেই পাবলিকের একটা সাঁকো তৈরি না হওয়ায় বেশ জুতমত একটা গেট বানানো যায় নি। 'নিখিল বঙ্গ উত্তরখণ্ড সম্মিলন' লেখা•নীল রঙের ফেস্টুন—একটা টাঙাতে হয়েছে প্যাণ্ডেলের পেছনের হেশিয়ানের ওপর রাস্তার দিকে মুখ করে। আর, একটা টাঙানো হয়েছে পান-সিগারেটের দোকানটায় পাশে কোনাকুনি, সেটাও রাস্তার দিকে মুখ করে। কিন্তু গেট না থাকায় সেই ফেস্টুন দুটো কেমন আলগা হয়ে ঝোলে। রাস্তা থেকে ও-দুটো দেখা যায় ঠিকই, বাসের লোকজনও দেখতে পায়, কিন্তু এই সম্মিলনের লোকজনের চোখের আড়ালেই থেকে যায় ফেস্টুনদুটো। টিনের বেড়ার গায়ে দড়ি দিয়ে আর-একটা ফেস্টুন ঝোলানো আছে কিন্তু দড়িগুলো টানাটান হয় নি বলে সেটাতে এত নানা রকম ভাঁজ পড়েছে যে ঠিক পড়া যায় না। তা ছাড়া, টিনের ওপর কাগজে লেখা নানা পোস্টার আছে—কোন দিন কী অনুষ্ঠান হবে সে-সব জানিয়ে, সেগুলোই বেশি চোখে পড়ে।

গেট একটা বানানো হয়েছে ময়নাগুড়ির চৌপত্তিতে, পেট্রল পাম্পের কাছে, একেবারে ন্যাশন্যাল হাইওয়ের ওপরে। হাইওয়ের ওপর বলেই গেটটা উঁচু করতে হয়েছে, যাতে আসাম থেকে ও আসামের দিকে যে-সব ট্রাক পাহাড়প্রমাণ মাল নিয়ে যায় সেগুলোর মাথা না ঠেকে। অত উঁচু করার জন্যে ইলেকট্রিক ও ফোনের তারের ওপরে গেটটাকে তুলতে হয়েছে বটে কিন্তু তাবও ওপরে হাই ভোল্টেজ লাইন থেকে অনেকটা নামিয়ে রাখতে হয়েছে। অত বড রাস্তাব এপাব-ওপার জুড়ে গেটটা এত চওড়া আর উঁচু হয়েছে যে চোখে পড়লে তাক লেগে যায়। মাথার ওপর লেখা 'নিখিল বঙ্গ উত্তরখণ্ড সম্মিলন, ময়নাগুড়ি।' কিন্তু চোখে পড়াটাই মুশকিল। গেটটার পুরো মাথাটা যত বড়, এক-একটি স্তম্ভ তত মোটা নয়। দুই স্তম্ভকে যুক্ত করেছে আড়াআড়ি মাথার ওপরের যে-অংশ সেটাও সরু। ফলে, গেটটা কেমন দু-পাশের ও মাথার ওপরের দোকানপাট, বাড়িঘর, গাছপালার সঙ্গে মিশে আছে। এতই মিশে আছে যে ট্রাক বা বাস থেকে নজরে ত পড়েই না, এমন-কি রিক্সায় চডে যেতেও চোখে পড়ে না। কিন্তু একবার যদি নজরে পড়ে যায়, তা হলে বারবারই দেখতে হয়—'হ্যাঁ, গেট একখান হইছেন বটে।' সাত দিনের এই সম্মিলনে যারা আসে-যায় তাদের আর এই গেট না দেখে উপায় কী আছে ? কিন্তু সম্মিলনের মূল জায়গায় রাস্তার ওপর কোনো গেট না থাকায়—চৌপত্তির এই গেটটা যে ঐ সম্মিলনেরই গেট তা বোঝা যায় না।

সম্মিলনের মাঠের ভেতর সাইকেল, মোপেড, মোটর সাইকেল, স্কুটার রাখার ব্যবস্থা হয়েছে বটে কিন্তু গরুর গাড়ি রাখার কোনো জায়গা নেই। যদি রাস্তা থেকে সাঁকো একটা তৈরি করা যেত, তা হলে অত বড় মাঠের একটা দিক গরুর গাড়িতে ভরে যেত, যেমন সব হাটে হয়। সাঁকো না-থাকায় গরুর গাড়িগুলোকে রাস্তার পাশেই লাইন দিয়ে দাঁড় করাতে হয়। তাতেও অসুবিধে। ন্যাশন্যাল হাইওয়ে হলেও রাস্তাটা তত চওড়া নয়। আপ-ডাউনের গাড়ির রাস্তা ছেড়ে দিলে আর-কতটুকু জায়গা থাকে ? সেখান থেকেই ত খালের ঢাল। সে-ঢালে গরুর গাড়ি নামিয়ে দিলে তোলা মুশকিল। অথচ, গরুর গাড়ির সংখ্যাও ত নেহাৎ কম নয়। সন্ধ্যাবেলার ফ্যাংশন দেখার জন্যে সেই দুপুরের পর থেকেই পাশাপাশি গাঁয়ের মেয়েরা বাচ্চারা হেঁটে, রিক্সায় ও গরুর গাড়িতে আসতে শুরু করে। ফাংশন শুরু হওয়ার আগেই মাঠ-রাস্তা মিলে একটা মেলার মত হয়। এক-একটা বড় গাছের নীচে রাস্তার ওপর, গরুর গাড়িগুলোকে রাখা হয় আর গরুগুলোকে, হয় গাড়ির চাকার সঙ্গে, আর না-হয় খুঁটি পুঁতে তাতে, দড়ি ছোট করে বেঁধে দেয়া হয়। মেয়েরা ও বাচ্চারা নানা রঙিন শাড়ি-জামায় সেই গাছতলাতেই অপেক্ষা করে—যতক্ষণ ভেতরে নিয়ে যাবার জন্যে দেউনিয়া না আসে।

একশ আটষট্টি

উদ্বোধন অনুষ্ঠানের বিভিন্ন বক্তৃতার সংক্ষিপ্তসার

শনিবার সকালে সম্মিলনের উদ্বোধন হল। সময় ছিল সকাল আটটা। কিন্তু মোটামুটি লোকজন জমতে-জমতেই বেলা নটা হয়ে গেল। সকালে শুধু পতাকা উত্তোলন ও কয়েকজন বিশেষ বক্তার বক্তৃতা ছিল। পতাকা তুললেন বাজবংশী সমাজেব প্রধান নেতা পঞ্চানন মল্লিক। আর বক্তৃতা করলেন আসাম ও দার্জিলিং থেকে আসা দুই প্রতিনিধি আব কয়েকজন স্থানীয় ব্যক্তি। স্থানীয় যাঁরা বললেন তাঁরা সরাসরি উত্তরখণ্ড আন্দোলনে যোগ দেন নি, কেউ-কেউ পার্টিতেও নেই, কিন্তু বিভিন্ন পেশায় ও রাজনীতিতে নিজেরা প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন।

শেষ পর্যন্ত অত বড় প্যান্ডেলে শ-দেড়েক মত উপস্থিত ছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই বিকেলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত কর্মী। সুস্থিরের সঙ্গে কাজ করেন এমন কয়েকজন প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠিত ভাবে এসেছিলেন। আর, ময়নাগুড়ি বাজারের যে-ব্যবসায়ীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত তাদেরও কেউ-কেউ। এ-ছাড়া বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসেছিলেন কয়েকজন—তাঁদের প্রতিনিধিই বলা যায়—যে-কদিন সম্মিলন চলবে সেই ক-দিনই তাঁরা থাকবেন। এ ছাড়াও সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন কয়েকজন যাঁবা রাজবংশী নন, কোনো ভাবেই উত্তরখণ্ড আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত নন। তাঁদের একজন ৭০-৭১ সালে লাটাগুড়ি এলাকায় কৃষকদের মুক্ত এলাকা তৈরি করতে গিয়ে কৃষকদের হাতে মার খেয়ে হাসপাতালে যান, হাসপাতালের বেডেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়, তাঁর বেডের পাশে কয়েকজন পুলিশ বসে, কিছুদিন পর তাঁকে কলকাতার এক হাসপাতালে বদলি করা হয়, সেখানে হাড়টাড়ের ওপর অনেক অপারেশন হয়, তাবপব জেলেও থাকতে হয়। সব মিলিয়ে সাত-আট বছর পর ছাড়া পান। দাড়ি তখনো ছিল, এখনো আছে। কিন্তু সে-দাড়িতে এখন বেশির ভাগই শাদা ছোপ। এখন থাকেন জলপাইগুড়ি শহরেই, বাবাব বাড়িতেই। কিছু করেন না। কিন্তু মাঝেমধ্যে এখানকার-স্থানীয় নানা আন্দোলনে উপস্থিত থাকেন। তাঁর কিছু করারও নেই—কিন্তু এই ধরনের স্থানীয় সমস্যার ব্যাপারে তাঁর যেন এক ধরনেব আগ্রহ আছে। ইনি এসেছিলেন সঙ্গে একজন বন্ধুকে নিয়ে। কেউ তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছে কি না বা আসতে বলেছে কি না—সে-সব প্রশ্ন ওঠেই না। পাজামা-পাঞ্জাবি-দাড়ি আর একটা চাদরে এমন পরিচিত একজন ভদ্রলোককে দেখলে এ-সব সম্মিলনে একটু জোর আসে।

এ-রকমই এসেছিলেন ধূপগুড়ি ও বীরপাড়া অঞ্চলে কংগ্রেসি নেতা বলে পরিচিত দুজন—অনিল রায় ও দেবকান্ত ক্ষত্রিয়। জেলাতে কংগ্রেস নেতা বলে এঁদের কেউ তেমন চেনে না কিন্তু স্থানীয়ভাবে কংগ্রেস নেতা বলে এঁদের যে-প্রতিপত্তি সেটা বিশেষত ভোটের সময় কাজে লাগে। কংগ্রেসের সরকার থাকলে স্থানীয় ব্যাপারস্যাপাব নিয়ে এঁদের একটা ভূমিকা থাকে। এখন বয়স হয়ে গেছে। নিজেদের জমিটমি কিছু আছে কিন্তু এঁদের প্রধান একটা আয় হত নানা লোকের মামলা মোকদ্দমা বা সরকারের কাছে নানা কাজকারবারের ছোটখাট তদ্বির-তদারকি থেকে। এমন কিছু বড় কাজ নয়—এই সব কাজকেই খারাপ অর্থে এ-দেশী ভাষায় বলা হয় দেউনিয়াগিরি। এখন অনেক দিন সেই আয়টা নেই, সেই ভূমিকাটাও নেই। কংগ্রেসের সরকাব থাকলে রাজনৈতিক মাতব্বরিব যে-আত্মবিশ্বাস এদের চেহারার ফুটে ওঠে তাও নেই। ওরা স্থানীয় ভাবে নেতৃত্ব দিতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। পঞ্চায়েত-টঞ্চায়েত হয়ে গ্রামে নতুন সব নেতা তৈরি হয়ে গেছে। সেই নতুন নেতৃত্বের এরা কেউ নয়। অথচ পঞ্চায়েত যখন ছিল না তখন এরাই ছিল পঞ্চায়েত। উত্তরখণ্ডের আন্দোলন প্রধানত গ্রামাঞ্চলকে কেন্দ্র করেই হবে বলে আশা। সে-কারণেই এদের চোখেমুখে যেন কিছু অসহায় ভরসা যে উত্তরখণ্ড তাদের পুরনো নেতৃত্ব ফিরিয়ে দিতে পাবে। কিন্তু উত্তরখণ্ড যে-রকম মিছিল, মিটিঙ, সম্মিলন, দাবিদাওয়া—এ-সব করছে, তাতে তারা অভ্যস্ত নয়। বরং এ-সব থেকে তারা দূরেই থাকতে চায়।

উদ্বোধনের দিনের বক্তৃতাগুলো নানা রকম। উত্তরখণ্ডের নিজস্ব দলীয় পতাকা তোলা হল। লাল তেকোনা কাপড়ের মাঝখানে শ্বেত পূর্ণ সূর্য। পরে, এই নতুন পতাকা ব্যাখ্যা করে সভাপতি পঞ্চানন মল্লিক বলেছিলেন—ঠিক বলেন নি, তাঁর ছাপানো সভাপতির ভাষণে ছাপা হয়েছিল, 'কামতাপুর রাজ্যের মুক্তির আন্দোলনের এই মুহূর্তে পতাকা রক্তবর্ণ ত্রিকোণ এবং মধ্যে মধ্যাহ্নকালীন শ্বেত সূর্য ঘোষণা করা হয়েছে। উত্তরখণ্ড দল প্রাচ্যদর্শনে বিশ্বাসী। পৌরাণিক যুগ থেকে প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগ

পর্যন্ত ত্রিকোণ পতাকা প্রচলিত। ত্রিকোণ অর্থ ত্রিগুণ—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। রক্তবর্ণ মাতৃরজঃ সুতরাং শক্তির প্রতীক। শ্বেতবর্ণ পিতৃওজঃ বীজ সুতরাং জ্ঞানের প্রতীক অর্থাৎ সূর্য জ্ঞানের প্রতীক। শক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয়েই উন্নয়নের পথ। জৈবিক ত্রিগুণাত্মিক ত্রিকোণ শ্বেতসূর্যসমন্বিত পতাকা সম্পূর্ণ অহিংস গণতান্ত্রিক পথে জ্ঞানের আলোকে দলের বিপ্লবাত্মক চিন্তাধারাকে লক্ষ্যে পৌছানোর দৃঢ়তা ঘোষণা করে।'

সভাপতি, উদ্বোধক ও প্রধান নেতা পঞ্চানন মল্লিকের বক্তৃতাতেও এই বিষয়টিই প্রাধান্য পেল—ভারতীয় হিন্দুদর্শনে বিশ্বাস, ভারতের সংবিধানের প্রতি বিশ্বাস, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি বিশ্বাস ও কলকাতার নেতৃত্বের প্রতি সম্পূর্ণ অনাস্থা। তাঁর বক্তৃতাতেই স্বাধীন কামতাপুর রাজ্য প্রতিষ্ঠার দাবি তোলা হল। সেই দাবির সমর্থনে ইতিহাস থেকেও কিছু-কিছু যুক্তি এসেছে বটে কিন্তু বারবারই নিজেদের উপজাতীয় অস্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণার সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল বর্ণ হিন্দু সমাজের প্রতি আনুগত্যের সংস্কার।

তাঁর বক্তৃতা শুরুই হল গীতার উদ্ধৃতি দিয়ে, তাও অনুবাদে নয়, সংস্কৃতে,

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং
জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীং।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ
সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি।।

তিনি প্রথমেই বলে নেন, 'ভারতবর্ষ মাতৃভূমি। ভারতবর্ষের অখণ্ডতা ও জাতীয় সংহতি রক্ষা করার প্রতিটি ভারতবাসীর মত আমরাও সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত আছি।' তারপরই যোগ করেন, 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তরাংশের মানুষের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আজ পর্যন্ত যা করার দরকার ছিল, তা করেন নি।....সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত ও শোষিত হচ্ছেন এখানকার বসবাসকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজবংশী, সংখ্যালঘু মুসলমান, বাস্তুহারা নমশূদ্র, বহু উপজাতি ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ। এই সকল অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছে উত্তরখণ্ড দল। উত্তরখণ্ড দলের উদ্দেশ্য হল উত্তরবঙ্গকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে পৃথক করে ভারতীয় সংবিধানের ৩নং ধারা অনুযায়ী "কামতাপুর" নামে এক ভারতভুক্ত সমৃদ্ধিশালী অঙ্গরাজ্য গঠন করা এবং কলকাতা কেন্দ্রিক রাজনৈতিক কুচক্রী পুঁজিবাদী নেতাদের শোষণের থেকে উত্তরবঙ্গবাসীকে রক্ষা করে তাদের মুখে হাসি ফোটান।...আপনারা জানেন যে ভারতবর্ষের প্রাচীনকালে "কামরূপ" নামে এক রাজ্য ছিল। এই কামরূপ রাজ্যের পশ্চিম অংশে গঠিত হয় "কামতাপুর রাজ্য"। মহারাজা নরনারায়ণের রাজত্বকালে এই কামতা রাজ্যের সীমা আসাম ও উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত হয় কিন্তু কালক্রমে কামতা রাজ্যের সীমা কিছু পরিবর্তিত হয়ে সমস্ত উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে।.... উত্তরবঙ্গের কোনো অংশ সিরাজদৌল্লার শাসনাধীন ছিল না। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন পলাশি প্রান্তরে সিরাজদৌল্লা ইংরাজের হাতে পরাজিত হলে বাংলাদেশ ইংরাজ শাসনাধীন হয় কিন্তু এ-কথা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে কামতা রাজ্য কোনোকালেই বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকার উত্তরবঙ্গকে পৃথক ভাবে শাসন করার জন্যে চেয়েছিলেন। "ভাষা ভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন" উত্তরবঙ্গে এলে সেই কমিশনের কাছে উত্তরবঙ্গকে কামতাপুর নামে এক রাজ্য হিশাবে ঘোষণা করার দাবি জানানো হয় ১৯৫৫ সালের ১৩ই মে তারিখে। এই কমিশনের মাননীয় সদস্য হৃদয়নাথ কুঞ্জরু, মিঃ পানিকর ও অন্যান্য সদস্যগণ কামতাপুর রাজ্য গঠনের যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কিন্তু তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে নানা ভাবে বুঝিয়ে "কামতা রাজ্যকে" পশ্চিমবঙ্গের ভেতরে রাখেন।' এরপর বোম্বাই ভেঙে মহারাষ্ট্র ও গুজরাট গঠন (১৯৬০), আসাম ভেঙে নাগাল্যাণ্ড (১৯৬২), পাঞ্জাব ভেঙে হরিয়ানা (১৯৬৬), আসাম ভেঙে মেঘালয় ও অরুণাচল (১৯৭১), মাদ্রাজ ভেঙে অন্ধ্র (১৯৫৩),—এই সব উদাহরণ দেন।

কিন্তু পঞ্চাননবাবুর বক্তৃতার প্রধান অংশ খানিকটা আলগা ভাবে এই ইতিহাসের ওপরই নির্ভরশীল হয়ে থাকল। বর্তমান অবস্থার বিশেষত্বের প্রসঙ্গে তিনি বিশেষ কিছু প্রায় বললেনই না।

সেটা বরং একটু বেশি মাত্রায় স্পষ্ট করে দিলেন নকশালবাড়ি থেকে আসা সম্পৎ রায়। প্রথম যখন নকশালবাড়ি হয় তখন সেখানকার নকশাল-আন্দোলনের বিরুদ্ধে সম্পৎ রায় জোতদারদের একটা

'কৃষক সমিতি' তৈরি করে নকশালপ্রভাবিত কৃষকদের বিরুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধ নেমে পড়েন। তখন সম্পৎ রায়ের বয়স বছর চল্লিশ, এখন বছর ষাট। চারু মজুমদার, কানু সান্যালের নেতৃত্বে নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলন শুরুতে ত ছিল কৃষকদের ন্যায্য ভাগের আন্দোলন, কোথাও-কোথাও আধিয়ারির দখলের আন্দোলন। ও-সব এলাকায় কোনোদিনই গোলমাল-টোলমাল হত না, ফলে থানাপুলিশের ব্যাপার ছিল না বললেই চলে। সম্পৎ রায়ই প্রথম স্থানীয় জোতদারদের দ্রুত সংগঠিত করে পূর্ণিয়া থেকে ভাড়া করে লোক নিয়ে এসে পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। সম্পৎ রায় মাইক ফাটিয়ে বললেন, 'অনেকে বলেন এটা রাজবংশীদের দল—এই উত্তরখণ্ড দল। আমি এ কথা মানি না। উত্তরবঙ্গে রাজবংশী বেশী—যা কিছু করবেন তাতেই রাজবংশী বেশি হবে। কমিউনিস্টরা যখন মিছিল করে তখন সেখানেও রাজবংশী বেশি থাকে—তাকে ত কেউ রাজবংশী পার্টি বলে না। আবার চা-বাগানের মজুরদের নিয়ে সিটু বা আই-এনটিইউসি যখন আন্দোলন করে, তখন তাকে ত কেউ মদেশিয়া আন্দোলন বলে না—কিন্তু তাতে ত মদেশিয়ারাই বেশি থাকে। আপনারা ভাবেন উত্তরবাংলায় রাজবংশীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ অথচ দেখেন, কোনো জায়গায় রাজবংশীরা চাকরি পায় না, রাজবংশী কৃষক ব্যাঙ্কের লোন পায় না। গত চল্লিশ বছর দেশ স্বাধীন হল—তাতে রাজবংশীদের কোন উপকার হল ? প্রত্যেক সরকার একজন করে রাজবংশী মন্ত্রী রাখে। আগে পুরা মন্ত্রী রাখত, এখন আধামন্ত্রী একজন রাখে। তাতেই রাজবংশীদের বাপঠাকুর্দা উদ্ধার হয়ে গেল। কিন্তু আমাদের এ-আন্দোলন—উত্তরবঙ্গের সকলের জন্যে আন্দোলন, শুধু রাজবংশীদের আন্দোলন এটা নয়। আমরা চাই উত্তরবঙ্গের সবাই আমাদের সঙ্গে আসেন।'

আসাম থেকে যিনি এসেছিলেন তিনি আসামের কোন পার্টির প্রতিনিধি বা কেন এসেছেন সেটা বোঝা গেল না। কিন্তু তাঁর বক্তব্যটা খুব নির্দিষ্ট ছিল। তিনি বললেন, 'ভারতবর্ষের রাজনীতিতে একটা গুরুতর পরিবর্তন ঘটছে। এতদিন পর্যন্ত দিল্লি থেকে সারা ভারতের শাসন চালানো হত, কিন্তু এখন একটা সময় এসেছে যখন আঞ্চলিক শক্তিগুলিই আলাদা-আলাদা অঞ্চল থেকে মিলিভাবে ভারতবর্ষ চালাবে। কেন্দ্রে একটা সরকার থাকতে পাবে, থাকবেও, থাকা দরকার। কিন্তু সে-সরকারকে চলতে হবে এই আঞ্চলিক শক্তিগুলোর ওপর নির্ভর করে। এইভাবে এই আঞ্চলিক শক্তিগুলির সঙ্গে কেন্দ্রের একটা লেনদেনের সম্পর্ক তৈরি হবে। কেন, সে সম্পর্ক এখনই তৈরি আছে। তামিলনাড়ুর কথাই ধরুন। সেখানে কত দিন হল স্থানীয় ডি-এম-কে বা এ-আই-এ-ডি-এম-কে দলেব সঙ্গে কেন্দ্রের কংগ্রেসের একটা বোঝাপড়া হয়ে আছে। রাজ্যে ডি-এম-কে বা এ-আই-এ-ডি-এম-কে ক্ষমতায় থাকবে—সেখানে কংগ্রেস কোনো ভাগ বসাবে না, কেন্দ্রে কংগ্রেসকে ক্ষমতায় থাকতে এরা সাহায্য করবে—সেখানে এরা কোনো ভাগ চাইবে না। একবার কংগ্রেস হিশেবে ভুল করেছিল, রাজ্যে ক্ষমতাব কে আসবে। সেবার কংগ্রেসও সেই ভুলের খেশারত দিয়েছে। শুধু কংগ্রেস নয়, কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় যারাই থাকবে তাদেরই রাজ্য বা আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে এ-রকম বোঝাপড়া করে নিতে হবে। ধরুন, ১৯৭৭ সালের ভোটে তামিলনাড়ুতে এ-আই-এ-ডি-এম-কে ভোটে জিতল আর সারা ভারতে কংগ্রেস হারল। এই এ-আই-এ-ডি-এম-কের সঙ্গে কেন্দ্রের জনতা পার্টির আপোশ-সমঝাওতা হল। ১৯৮০-তে ইন্দিরা গান্ধী ফিরে এলেন, তামিলনাড়ুর এ-আই-এ-ডি-এম কে সরকারকে কংগ্রেসবিরোধী বলে বরখাস্ত করে ডি-এম-কের সঙ্গে সন্ধি করলেন। ছ মাস পরের ভোটের কংগ্রেস ডুবল, ডি-এম-কেও ডুবল। এ-আই-এ-ডি-এম-কে জিতে গেল। ইন্দিরা গান্ধী তাঁর ভুল বুঝতে পেরে সাত তাড়াতাড়ি এ-আই-এ-ডি-এম-কের সঙ্গে রফা করে নিলেন—রাজ্য তোমাদের, কেন্দ্র আমাদের। এই রাজনীতির ধরনটাই এখন ভারতে নতুন ভাবে এসেছে আপনাদের উত্তরখণ্ড আন্দোলনকে সেইভাবে পরিচালিত করতে হবে।'

এই আসামের 'প্রতিনিধি' রাজনীতির কায়দাকানুন নিয়ে আর-একটা কথা বলেন, 'এতদিন ভারতের রাজনীতি এই রকম ভাগে ভাগ হয়ে এসেছে— কংগেসবিরোধী ও কংগ্রেসসমর্থক। বা, এটাকে উল্টেও বলতে পারেন— কমিউনিস্টবিরোধী ও কমিউনিস্টসমর্থক। বা, এটাকে আর-এক ভাবে বলতে পারেন—কংগ্রেস-কমিউনিস্টবিরোধী ও কংগ্রেস-কমিউনিস্টসমর্থক। কংগ্রেস ভেঙে যে-সব দল তৈরি হয়েছে সেই সব দল ও বি-জে-পি, কংগ্রেস-কমিউনিস্ট বিরোধী। এ রকম শাদায়-কালয় রাজনীতিকে ভাগ হতে হবে কেন? কেন একদলকে কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের সমর্থক বা বিরোধী হতেই হবে? এই দুই দল কিন্তু সে-রকম কোনো বাধানিষেধ মানে না। এরা যখন যার সঙ্গে ইচ্ছে রফা করে, যখন যার

বিরোধিতার ইচ্ছে তার বিরোধিতা করবে। আমরাও সে-ভাবেই চলব। আমরা কংগ্রেসও না, কমিউনিস্ট না। প্রত্যেকের সঙ্গেই আমাদের লেন-দেনের সম্পর্ক। এখন কমিউনিস্টরা এখানে ক্ষমতায় আছে। কমিউনিস্টরা যদি আপনাদের দাবি মেনে নেন—রাজবংশীপ্রধান অঞ্চলে যদি রাজবংশীদের প্রাধান্য স্বীকার করে নেন, যদি রাজবংশীদের চাকরির ব্যবস্থা করেন, বা, রাজবংশী ভাষার প্রাধান্য দেন, তা হলে আপনাদের আপত্তি কী? তেমনি আবার এই সব দাবি আদায়ের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের কংগ্রেস যদি আপনাদের সাহায্য করে তা হলে আপনারা কেন্দ্রীয় সরকারের বা কংগ্রেসের সাহায্য নেবেন। গোর্খাল্যাণ্ড হবে কি হবে না সেটা এখনই বলা যায় না বটে কিন্তু রাজ্যেব মুখ্যমন্ত্রী যখন গোর্খাল্যাণ্ডের নেতা ঘিসিংকে 'জাতিদ্রোহী' বলেছিলেন, কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রী তার বিরোধিতা করেছিলেন। আবার রাজীব গান্ধী যখন দার্জিলিং সফবে গেলেন, তখন ঘিসিং হরতাল ডেকে দিলেন। এটাই হওয়া উচিত। আপনাদেব পক্ষে যা-কিছু যীক কাজে লাগানো, আপনাদের বিপক্ষে যা-কিছু তার বিরোধিতা কবা। তার জন্যে কংগ্রেস বা কমিউনিস্টের স্থায়ী সমর্থক বা স্থায়ী বিরোধী হাওয়ার কোনো দরকার নেই। দেশের ভেতবে কি কংগ্রেস আর কমিউনিস্টই আছে—আর-কিছু নেই? দেশের বেশির ভাগ মানুষই কংগ্রেসও নয, কমিউনিস্টও নয়। আপনাদের এই আন্দোলনকে সেই কংগ্রেস-কমিউনিস্ট বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কবতে হবে।'

দার্জিলিং থেকে যিনি এসেছিলেন, তাঁব বক্তৃতাব পর জানা গেল তিনি অধ্যাপক। তিনি সম্পূর্ণ নতুন কথা বললেন, 'দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ তৈরি করার প্রতিশ্রুতি কংগ্রেস দিয়েছিল, সব দল সেটা সমর্থন করেছিল। কেন? না, ব্রিটিশরা তাদের নিজেদের দরকার অনুযায়ী দেশটাকে যখন যেমন ইচ্ছে ভাগ করে চালাত। মাদ্রাজ ছিল বিবাট একটা প্রদেশ। এখনকার কেরালা বা কর্ণাটক ছিলই না। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন, পেপসু এ-সব প্রদেশ বা রাজ্য হয়েছিল। বাংলা-বিহার-ওড়িশা একসঙ্গে ছিল, আবার আলাদা হয়ে যায়। উত্তরপ্রদেশ ছিল না, ছিল ইউনাইটেড প্রভিন্স। স্বাধীনতার পরে রাজ্যসীমা পুনর্নির্ণায়ক কমিটি নতুন-নতুন রাজ্য তৈরির সুপারিশ করেন, ভাষার ভিত্তিতে নতুন-নতুন বাজ্য তৈবি হয়। ভাষার ভিত্তি মানে ত জাতি-ভিত্তি। জাতি ও ভাষাগত এক-একটা রাজ্য—এটাই ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের আদর্শ। যেমন, পাবলিক সেকটর ভারতীয় শিল্পনীতির আদর্শ। যেমন, পরিকল্পনা ভারতীয় উন্নয়নেব আদর্শ। একটাব পব একটা পাবলিক সেকটরের কারখানা তৈরি হয়। একবার কতকগুলি কারখানা তৈরি করে দিয়েই ত আর বলা হয় নি যে, ব্যাস এই হয়ে গেল আমাদেব পাবলিক সেকটর। তেমনি, একটা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা করেই ত আর বলা হয় নি, ব্যাস এই হয়ে গেল আমাদের পরিকল্পনা। তা হলে রাজ্যসীমা পুনর্নির্ণায়ক কমিটিই-বা চিরকালের জন্যে একবার সব রাজ্যের সীমা ঠিক করে দিয়ে কেন বলবে, ব্যাস এইগুলিই আমাদের একমাত্র রাজ্য। ভারতবর্ষের নিজেরই সীমা গত চল্লিশ বছরে কত বদলে গেছে, বলুন। সিকিম আগে ভারতের মধ্যে ছিল না, সিকিমের বাইরে দিয়ে এখন ভাবতের সীমা চলে গেছে। তেমনি আকসাই চীন কার্যত আমাদের হাতে নেই, কার্যত ভারতের মধ্যে নেই। এক আমাদের সার্ভে অব ইন্ডিয়ার মাপেই এ-সব জায়গাকে ভারতের জায়গা বলে দেখানো হয়, পৃথিবীর আর-সব দেশের ম্যাপে এ-সব জায়গাকে চীনের বলে দেখানো হয়, যেমন, আজাদ কাশ্মীরকে দেখানো হয় পাকিস্তানের জায়গা বলে। তা হলে, ভারতের সীমাই যদি এ-রকম বদলাতে পারে তা হলে রাজ্যের সীমাই-বা বদলাবে না কেন? যখন ১৯৫৩ সালে রাজ্য সীমা স্থির হয়েছিল তখন বিহারের ও বাংলার আদিবাসীরা কিছুই জানত না, গোর্খারাও কিছু জানত না, আপনারাও কিছু জানতেন না। এখন আমরা যদি জেনে-বুঝে বলি আমাদের ভাষা ও জাতির জন্যে আলাদা রাজ্য দাও, তার মধ্যে দোষটা কোথায়? বাঙালিরা তখন বলেছিল, বিহারের কিছু জায়গায় বাংলা ভাষা চালু আছে, যারা থাকে তারা বাঙালি, সেই জায়গাটা পশ্চিমবাংলায় দিয়ে দাও। দিয়ে দেয়া হল। এখন আমরা যখন বলছি যে যারা নেপালি ভাষা বলে তাদের একটা রাজ্য করে দাও—তখন আমাদের বলা হল, বিচ্ছিন্নতাবাদী। আপনারা যদি বলেন আমরা রাজবংশীরা একটা আলাদা রাজ্য চাই--তা হলে বলা হবে বিচ্ছিন্নতাবাদী। আমরা ত আসলে এখনই বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি—নিজের ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন, নিজের হকের জায়গা থেকে বিচ্ছিন্ন, নিজের হক থেকেই বিচ্ছিন্ন। আর যাই হোক, এ কথা ত কেউ বলছে না যে নেপালিরা বাঙালি। তা যদি না বলো, তা হলে আমাদেব আলাদা রাজ্য হবে না কেন। আপনাদের আলাদা রাজ্য হবে না কেন? রাজ্য পুনর্নির্ণায়ক কমিটি আবার কাজে হাত দেবে না

কেন? নাকি তা হলে পশ্চিমবাংলা ছোট হয়ে যাবে। তা হলে এ কথা ত ব্রিটিশরাও বলতে পারত—বাংলাকে ভাগ করলে ছোট হয়ে যাবে, সবটাই পাকিস্তানে যাক। ১৯৫৩ সালে যখন রাজ্য ভাগ বাঁটোয়ারা হয় তখন আমরা ছিলাম না। ছিলাম না বলে আমাদের কাকা-জ্যাঠারা আমাদের সম্পত্তি দেখাশোনা করেছেন। এখন সাবালক হয়ে যখন আমরা সম্পত্তিতে আমাদের ভাগ চাইছি তখন সেই কাকা-জ্যাঠারা বলছেন—এ ছেলেটা বড় বেয়াদপ, আমাদের সুখের সংসারটাকে ভেঙে আলাদা হতে চাইছে। তা আমরা বলি, কাকা শোনো, জ্যাঠা শোনো, সংসারটাও তোমাদের, সুখটাও তোমাদের, আমার থাকল কী? ছেলে লায়েক হলে তার বিয়েশাদি দিয়ে তাকে সংসার তৈরি করে দিতে হয়। ত, আমার ত দাড়ি গজিয়ে এখন পাকতে শুরু করেছে, গোঁফ পাকার ভয়ে গোঁফ ছেঁটে দিয়েছি, কিন্তু তবু ত আমাকে বিয়েশাদি দিয়ে সংসার করানোর দিকে আপনাদের মন নেই। এ কেমন ব্যবহার। তা, এতদিন যে আমাদের দেখভাল্ করলেন তার জন্যে আপনাদের প্রণাম করছি, কিন্তু এখন আমার দেখ্ভাল্ আমাকেই করতে দিন। আপনারা রাজ্যের সীমা নতুন করে ঠিক করার কমিটি আবার চালু করুন, তার রায় মেনে নিন।'

একশ উনসত্তর

তিস্তা ব্যারেজ প্রসঙ্গে বক্তৃতা

জলপাইগুড়ি শহর থেকে যে-দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক কৃষকদের মুক্ত এলাকা তৈরির জন্যে অনেক বছর জেল খেটেছেন তাঁকে বক্তৃতা করতে ডাকা হয়। কিন্তু তাঁর সঙ্গে এই সম্মিলনের সম্পর্কটা নিয়ে কেউই নিশ্চিত নয়—কে তাঁকে নেমন্তন্ন করেছে, এখন ইনি কী করেন। সাধারণ ভাবে এ-রকম ভদ্রলোকদের 'নাকশালিযা' বলেই ডাকা হয়। নাকশালিযাই হোক আর যাই হোক একজন ভদ্রলোকের ছেলে, বা পড়াশোনাজানা একজন ভদ্রলোকই, যদি এ-রকম সম্মিলনে হাজির থাকেন তা হলে তাঁকে কিছু না বলতে দিলে হয়? কিন্তু ভদ্রলোক সবচেয়ে দরকারি কথা বললেন একেবারে উত্তরখণ্ড আন্দোলনের বর্তমান কর্মসূচির প্রধানত বিষয়টি নিয়ে। সরকার জানিয়ে দিয়েছেন আর-মাসখানেকের মধ্যেই তিস্তা ব্যারেজের প্রাথমিক উদ্বোধন হবে। মুখ্যমন্ত্রী উদ্বোধন করেন। তার জন্যে সেদিন সারা উত্তরবাংলা থেকে বামফ্রন্ট মিছিল নিয়ে আসবে। উত্তরখণ্ড দাবি করেছে যে তিস্তা ব্যারেজ এখন উদ্বোধন করা চলবে না। কৃষকদের জমি অধিগ্রহণ করা চলবে না, যে-জমি ব্যারেজের জন্যে অধিগ্রহণ করা হয়েছে তার ক্ষতিপূরণের বদলে সমপরিমাণ জমি কাছাকাছি এলাকায় সরকারি খাশজমি থেকে কৃষকদের দিতে হবে, যে-কৃষকদের জমি ব্যারেজের জন্যে অধিগ্রহণ করা হয়েছে তাদের মধ্যে যদি এমন কেউ থাকে যার অন্য জমি ইতিপূর্বে ভেস্ট হয়ে গেছে, তাহলে অধিগৃহীত জমির সমপরিমাণ জমি তার সেই ভেস্ট জমি থেকে ফিরিয়ে দিতে হবে। এই সব দাবির ভিত্তিতে উত্তরবঙ্গের, বিশেষত জলপাইগুড়ি জেলার, নানা জায়গা থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে যাওয়া হবে তিস্তা ব্যারেজ উদ্বোধনের দিন। উত্তরখণ্ডের এই সম্মিলন থেকে বলা হচ্ছে আগামী একমাস ধরে সেই বিক্ষোভ মিছিল সংগঠনের জন্যে। এই নাকশালিয়া ভদ্রলোক এই বিষয়টি নিয়েই বললেন, শুধু এই বিষয়টি নিয়েই। 'ভারতে ভাকরা-নাঙ্গাল হয়েছে, হীরাকুঁদ বাঁধ হয়েছে, নাগার্জুনসাগর হয়েছে, আরো কত-কত জায়গায় কত নতুন-নতুন ড্যাম হয়েছে, বাঁধ হয়েছে। এই পশ্চিমবঙ্গেই দামোদর হয়েছে, ময়ূরাক্ষী হয়েছে, মাইথন হয়েছে, পাঞ্চেৎ হয়েছে। কিন্তু যেখানেই হোক না কেন তাতে সর্বনাশ হয়েছে এই সব জায়গায় গরিব অধিবাসীদের, বিশেষত আদিবাসীদের। কেন? এই সব ব্যারেজ, ড্যাম ইত্যাদির জন্যে বাছা হয় পাহাড় ও জঙ্গলের এমন দুর্গম জায়গা যেখানে বন্য পশুর সঙ্গে লড়াই করে পশুর মতই জীবনযাপন করে আদিবাসী মানুষজন, গরিব মানুষজন। কেন? না, ঐ রকম দুর্গম জায়গায় তারা এই ভদ্রলোকদের শোষণের হাত থেকে বাঁচবেন। কিন্তু যখন ব্যারেজ বা ড্যামের জন্যে জমি বাছা হয় তখন সেই জমি থেকে এদের উচ্ছেদ করা হয় প্রথম। উচ্ছেদ করে ঐ ব্যারেজ বা ড্যামেই শ্রমিক হিশেবে নিয়োগ করা হয়। তারপর, ঐ ব্যারেজ বা ড্যামের জলে যখন জমিতে ফসল ফলাবার অবস্থা তৈরি তখন সেই জমির দাম ত সোনার দাম। তখন

বড-বড ব্যবসায়ীরা সেই জমিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সবুজবিপ্লব তৈবি কবে। ভাবতে একটা উন্নয়ন পবিকল্পনাব নাম বলুন, যেখানে একটা ব্যাবেজ বা ড্যামেব ফলে আদিবাসীদেব বা গবিব মানুষদের এক ফোঁটা উপকার হয়েছে। আপনাদের এখানে এতদিন এই উপদ্রব ছিল না। তিস্তা ব্যাবেজেব চেহাবায় সেই উপদ্রব শুরু হল। তিস্তা ব্যাবেজেব জলে নাকি লক্ষ-লক্ষ জমি উর্বব হবে, তাতে চায হবে, তাতে সোনা ফলবে, সেই সোনা বেচে কৃষকবা বডলোক হবে, কিন্তু তাব আগেই, ঐ ব্যাবেজ থেকে এক ফোঁটা জলও কৃষির কাজে লাগাব আগেই কৃষকবা জমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে, কৃষকেব জমি নামমাত্র মূল্যে অধিগ্রহণ কবা হয়েছে, যে-কৃষককে জমিব মালিক থেকে তিস্তা ব্যাবেজেব শ্রমিকে পবিণত কবা হয়েছে সেই কৃষককে কি ব্যাবেজেব জল সোনাব ফলন দেবে? ব্যাবেজ হওযাব আগে তাও কৃষক তিস্তার জল আঁজলা ভবে খেয়ে নিজেব খিদে চাপা দিতে পাবত, তিস্তাব চবে বাঘভালুকেব সঙ্গে লডাই কবে দু-এক মুঠো ধান ফলাতে পাবত, ব্যাবেজ হওযাব পব কৃষক তাও পাববে না, কাবণ আগে ত তিস্তাব জল ছিল আকাশেব বাতাসেব মত—যাব খুশি নিশ্বাস নাও। কিন্তু এখন ত তিস্তাব জল সবকাবি ব্যাবেজেব জল, এখন ত সে-জলেব দাম আছে, যাব ইচ্ছে সে ত এখন এই জল দুহাত ভবে তুলে নিতে পাববে না, খাওযাব জন্যেও নিতে পাববে না। তিস্তার চব ত আব পতিত জমি নয় যে হাল যাব ফলন তাব। ব্যাবেজের ফলে তিস্তাব দামও ত হুহু কবে বাড়ছে। এ কেমন উন্নয়ন যেখানে নদীব জলের ওপব তাব স্বাভাবিক অধিকার কৃষক হাবাবে? চরেব জমিব ওপব তাব স্বাভাবিক দখল সে হাবাবে? বনেব জমিব ওপব বাঘভালুকেব স্বত্ব আছে কিন্তু সে-জমি কৃষক চাষ কবলেই হয়ে যাবে স্কোযাটাব বা অনধিকাবী দখলদাব। এতদিন ভাবতেব মানুষকে বোকা বানিয়ে এই সব ব্যাবেজ, ড্যাম তৈবি করা হয়েছে কিন্তু নিজেদেব অভিজ্ঞতা থেকে লোকজন শিক্ষা নিয়েছে। ওড়িশাতেই দুটো ঘটনা ঘটেছে—একটা বালিযাপোলে, আব-একটা কোথায় আমাব মনে পডছে না। বালিযাপোলে সরকার কামানেব গোলা পবীক্ষাব জন্যে সমুদ্রেব ধাবেব জমি অধিগ্রহণ কবেছে। কিন্তু সেখানকাব লোকজন তাদেব দখল ছাডছে না। সেখানে তুমুল আন্দোলন চলছে। সবকাব এখনো তাব দখল নিতে পাবছে না। আব-একটি জাযগায় এক পাহাডে নতুন একটি উদ্যোগ নেযা হলে সেখানকাব আদিবাসীবা প্রবল প্রতিবোধ তৈবি কবে বলেছেন তাঁবা এই উদ্যোগ চান না। আপনাদেব উত্তবখণ্ড আন্দোলনেব বাজনৈতিক ভবিষ্যৎ আপনাদেব হাতে। সে বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। কিন্তু মাসখানেক পরে তিস্তা ব্যাবেজেব উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিক্ষোভ দেখাবাব যে-কর্মসূচি আপনাবা নিয়েছেন—সেই কর্মসূচিকে সমস্ত শক্তি দিয়ে সফল করুন। আপনাবা যদি চেষ্টা কবেন, তা হলে তিস্তা ব্যাবেজ বন্ধ করে দিতে পাববে, যা হয়েছে তাও অকেজো কবে দিতে পাবেন। সেটাই হবে আপনাদের প্রধান সাফল্য।'

ভদ্রলোক যে এ-বকম বক্তৃতা দেবেন তা সভাব উদ্যোক্তাবা নিশ্চয়ই জানতেন না। তাঁরা ভেবেছিলেন, গয়ানাথ জোতদারকে দিয়েই তিস্তা ব্যাবেজ সম্পর্কিত কথা বলাবেন। গয়ানাথ জোতদার উত্তরখণ্ডে যোগ দিয়েছেন তাঁব এই কথাটা উত্তবখণ্ডকে দিয়ে বলাবাব জন্যেই, কিন্তু এই ভদ্রলোকই যখন সে-কথা তুলে দিলেন, তখন তাঁব পবেই সভাব সভাপতি পঞ্চাননবাবু গয়ানাথ জোতদারের নাম ডেকে দিলেন এইটুকু যোগ করে যে 'গয়ানাথবাবুবা এই ডুয়ার্স অঞ্চলে পুরুষাণুক্রমিকভাবে বসবাস করে আসিতেছেন এবং তিস্তা ব্যাবেজেব বিষয়ে তিনি অনেক কিছু জানেন'।

গযানাথ কোনোদিন বক্তৃতা করে নি। নাম শোনাব পব থেকেই তার বুক ধুকপুকুনি শুরু হয়। নাম ডাকার সঙ্গে ঐটুকু জুড়ে দেবার জন্যে যে-সময় লাগে তাতে তাব বুকটা একটু শান্ত হয় বটে কিন্তু গলা শুকিয়ে যায়। অথচ ইতিমধ্যেই তাকে পাশ থেকে দু-একজন বলে, 'গযানাথবাবু যান।'

গযানাথ যেখানে বসে ছিল সেখানে বসে থেকেই যদি বলত, হয়ত তাব খুব অসুবিধে হত না, কিংবা অসুবিধেটা সামলে নিত। শেষ পর্যন্ত ত তাকে উঠে মঞ্চে যেতে হয় ত মাইকের সামনে দাঁড়াতে হয়। গয়ানাথ তার কথা তাড়াতাড়ি শেষ করে দেবার বাস্তব বুদ্ধি থেকে প্রথমেই চিৎকার করে ওঠে, 'মোর কিছু কহিবার নাই। মোর একোটা কাথাই কহিবার আছে।' গয়ানাথ এত জোবে চিৎকার করে যে মাইকে কুঁই কুঁই আওয়াজ শুরু হয়, মাইকওয়ালা তাড়াতাড়ি আওযাজটা কমিয়ে দেয। তখন গয়ানাথ বলে চলেছে, 'এই সব সরকারগিলান ভাবিবাব ধরিছেন যে ধান, চাল, আলু, কুমড়া সব নদীর জলত ভাসি আসে। তার তানে জমির কুনো দরকার নাই। যেইলার ঘরত যতখান জমি আছিল সব ত সরকারের ঘরত সিন্ধাইছে। ত সরকারই চাষ করিবার ধরুক কেনে ঐ সব জমিত্। এ্যালায় একখান নতুন ঢক

ধরিছে তিস্তা ব্যারেজের নামত। যার ঐঠে জমি আছিল, সব জমি নদীর ভিতর সিন্ধাই নিছে। আগত মানষিলা নদীর ভিতর চরত গিয়া চাষ করিবার ধরিতেন। এ্যালায় তিস্তা ব্যারেজের তানে ডাঙ্গা জমি নদীর ভিতর টানি নিবার ধরিছে। তা, চাষ করো কেনে। তিস্তা নদীর জলত ধান চাষ করো। এইলা মানষিগিলা কোটত আসিছেন হে? হামার তিস্তাত্ যে কুনোকালে ব্যারেজ-বুরেজ না আছিল্, তাহাতে ধান চাষ হইল্ কি না হইল্। এ্যালায় জমিও টানিবার ধরিছে, নদীও টানিবার ধরিছে। মুই এইসব ব্যারেজবুরেজ না চাও। এইখানই মোর কাথা'। গয়ানাথের বক্তৃতার শেষে হাততালি পড়ে। এতক্ষণ বক্তৃতাগুলো কেমন বানানো ও কঠিন মনে হচ্ছিল, গয়ানাথের বক্তৃতাটা সিধে ও সরল মনে হয় শ্রোতাদের কাছে।

একশ সত্তর

রাজবংশী সমাজের রূপান্তর সম্পর্কে আলোচনা

এইভাবেই উত্তরখণ্ড সম্মিলন শুরু হয়। ছ-দিন ধরে চলতে থাকে। একদিকে পঞ্চানন মল্লিকের মত প্রবীন লোকজন যাদের কাছে উত্তরখণ্ড বলতে এক অস্পষ্ট অতীতের কিছু আনুমানিক গৌরবের দিন ফিরে যাওয়া বোঝায়—কিন্তু কী ভাবে সে-প্রত্যাবর্তন বা পুনবাগমন ঘটবে সে-বিষয়ে কোনো ধারণাই নেই। অন্যদিকে, সুস্থির রায় বর্মনেব মত টগবগে তরুণ যারা উত্তরখণ্ড বলতে বোঝায় তাদের আদিবাসীসত্তার এক লড়াকু সংগঠন—যে-সংগঠন নিজেদের কৌম-সংহতির জোরে আদায় করে নেবে রাজশক্তির কাছ থেকে তাদের নিজস্ব ভূমিখণ্ড। পঞ্চানন মল্লিক আর সুস্থিরের মধ্যে সম্ভবত এই মিল ঘটে যায় যে তাদের উভয়েরই দরকার রাজবংশী অতীতের এক গৌরবময় লোককথা যা ইতিহাসে সমর্থিত। সেই হাজোর কাহিনী, শিশু-বিশুর কাহিনী, সেনাপতি চিলা রায়ের দিগ্বিজয়ের কাহিনী। তাদের চোখের সামনে এই প্রবল বর্তমানটা ত সব সময়ই হাজির থাকে যে কোচবিহারে এক রাজবংশী রাজবংশ সেই ১৫১০ থেকে ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীনভাবে, তারপর ১৯৪৯ পর্যন্ত করদ দেশীয় রাজ্য হিশেবে, ক্ষমতা ভোগ করেছে প্রায় মোট ৪৪০ বছর। পূর্ব আর পশ্চিমবঙ্গ মিলিয়ে আর-কোথাও এমন আব-কোনো দেশীয় রাজ্য ছিল না, নেই। এখনো সে-রাজপ্রাসাদ দাঁড়িয়ে আছে। সেই রাজবংশেরই আর-একটি ভাগ বৈকুণ্ঠপুরের জমিদারি স্বাধীন রাজত্বের মতই ভোগ করেছে প্রায় এই পুরো সময়টাই। সেই সুবাদেই ত মালদহ থেকে দার্জিলিঙের তরাই পর্যন্ত এই বিরাট জনগোষ্ঠী নিজেকে 'রাজবংশী' বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু পঞ্চানন মল্লিক আর সুস্থিরের মধ্যে এই মিল সত্ত্বেও এই অমিলও যে-কোনো উপলক্ষে বেরিয়ে পড়ে যে পঞ্চাননের কাছে এই অতীত গৌরব বিষয়ে আত্মসচেতনতাই রাজবংশী সমাজের পক্ষে অনেকখানি বা প্রধান অবলম্বন—জনগোষ্ঠীর আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে। আর সুস্থিরের কাছে এই অতীত গৌরব রাজবংশী সমাজের নিজস্ব ভূমি-অধিকারের একটা অবলম্বনমাত্র, একটা অবলম্বনই—তার বেশি কিছু নয়।

এই উত্তরখণ্ডের আওতার মধ্যে এসে যেতে চায় সম্পৎ রায়—যে নকশালবাড়ি আন্দোলনের মুখেই ভূমিহীন আদিবাসী কৃষকের ভূমিদখলের অভিযানের বিরুদ্ধে নিজস্ব এক সৈন্যবাহিনী তৈরি করে ছিল প্রায় বিশ বছর আগে, আর, জলপাইগুড়ির সেই ভদ্রলোকের 'নকশালিয়া' ছেলে—যে নকশালবাড়ি আন্দোলনের মধ্যেই এখনো খুঁজছে ভারতীয় কৃষকের অধিকার অর্জনের উপায়। সম্পৎ রায়ের কাছে উত্তরখণ্ড আন্দোলন শুধুমাত্র রাজবংশী সমাজের আন্দোলন নাও হতে পারে—সে চায় উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জোতদারের হাতে যে-টাকা আছে তা এই উত্তরবঙ্গেই নানা ভাবে খেলাবার হক, সম্পৎ রায় পাঞ্জাব-রাজস্থানের সবুজ বিপ্লবের 'এনট্রেপ্রানিয়ুর' কৃষিবিনিয়োগকারীর উত্তরবঙ্গ সংস্করণ। সে আলাদা রাজ্য চায় না, আলাদা কিছু অধিকার চায়—সে-সব তার কাছে তুচ্ছ, যেমন, পুরনো কামতাপুরী রাজত্বের গৌরবগাথা তার খুব দরকারে লাগে না। তার হাতে অনেক টাকা ও তার আরো অনেক টাকা আসছে—সে সেই সব টাকার বিনিয়োগক্ষেত্র চায়, সেই বিনিয়োগক্ষেত্রের নাম যদি 'উত্তরখণ্ড' হয় ত উত্তরখণ্ডই হোক। আর তার সঙ্গে অনায়াসে মতৈক্য ঘটে যায় সেই 'নাকশালিয়া' ভদ্রলোকের। কারণ,

সম্পৎ-এর বিদ্রোহ সেই ভদ্রলোকের কাছে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। কারণ, সম্পৎ এখানে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থাকেই চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। সেই কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় দিল্লিতে কংগ্রেস আর কলকাতায় বামফ্রন্ট, এ-পার্থক্য তার কাছে পার্থক্যই নয়। যে-কোনো রকম বিদ্রোহ ও নৈরাজ্যের প্রতি আবেগে ও বুদ্ধিসর্বস্ব সমর্থনে সে সম্পৎকে তার মিত্র মনে করে আর শত্রু ভাবে, একই রকম শত্রু ভাবে, দিল্লির সরকারকে ও রাজ্যের সরকারকে। সম্পৎ জানে যে তিস্তা ব্যারেজের জলের পুরো লাভ সে ঘরে তুলতে পারবে—কিন্তু তিস্তা ব্যারেজের জন্যে যে-সব জোতদারের কিছু-কিছু জমি সরকার নিয়ে নিয়েছে তাদের যদি দলে রাখতে হয় তা হলে তিস্তা ব্যারেজের বিরুদ্ধেই প্রধান আওয়াজ তুলতে হবে। তিস্তা ব্যারেজ সম্পৎ-এর কাছে হয়ে ওঠে রাজবংশীদের, জোতদার ও কৃষক রাজবংশীদের, কাছে একটা গ্রহণযোগ্য প্রতীক। কবে জল বেরোবে, সেই জলে এক বিঘেজমিতেই দশ বিঘের ফলন উঠবে, এ-হিশেবের চাইতেও অনেক বেশি প্রত্যক্ষ ঐ এক বিঘে জমির অধিগ্রহণ। আবার, সেই একই তিস্তা ব্যারেজ ঐ নকশালিয়া ভদ্রলোকের কাছে ভারতের মুচ্ছুদ্দি পুঁজির আরো এক কারখানা যা দিয়ে গ্রামের গরিব মানুষকে আরো গরিব করে ফেলা যায়। অথচ মুচ্ছুদি খোঁজার অন্ধতায় সম্পদৎ রায়কে আর মুচ্ছুদ্দি মনে হয় না—বরং সম্পৎ রায়ের মত জোতদারও যদি রাজবংশী-আদিবাসীদের ভেতর একটা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন তৈরি করে তুলতে পারে তা হলে সম্পৎ রায়ের সঙ্গে কিছুদূর চলতেই-বা আপত্তি কিসের ? যা কিছু কেন্দ্রীয় শাসনক্ষমতাকে আঘাত করে আর যা-কিছু আদিবাসীদের সংগঠিত করে তাই তার কাছে গ্রহণীয়।

এর সঙ্গে প্যান-বোরো সংস্কৃতির একটা ছোঁয়াও লাগছে যাতে উত্তরপূর্ব বা নর্থইস্টের বিরাটতর একটা অঞ্চল জুড়ে সংস্কৃতিক ঐক্য খোঁজ হচ্ছে।

এই সব কিছুর মধ্যে কোনো দৃঢ় মিল নেই, অনেক সময় এর ভেতর বৈপরীত্যও আছে। উত্তরখণ্ডের ভেতরে এমন কোনো লোক নেই যে বা যারা এই আন্দোলনকে সংগঠিত একটা তত্ত্বের ভিত্তি দিতে পারে। বীরেন বসুনিয়া বা কোচবিহারের সন্তোষবাবুর মত লোকজন উত্তরখণ্ডকে কোনো-কোনো সময় বৃহত্তর সমাজে বা প্রশাসনে যোগ্যতার সঙ্গেই দাঁড় করাতে পারে কিন্তু সেটা ত আন্দোলনের একটা ছোট অংশ মাত্র, পুরো অংশও নয়। তাঁদের পক্ষে ত জননেতা হওয়া সম্ভব নয়।

আবার হয়ত উত্তরখণ্ড আন্দোলনের মত ঘটনা এ-রকম নানা পরস্পরবিরোধী স্বার্থ মিশিয়েই তৈরি হয়। কখনো এই স্বার্থ, কখনো ঐ স্বার্থ প্রাধান্য পায়। কিন্তু রাজবংশী জোতদারের নতুন টাকার যোগ্য বিনিয়োগক্ষেত্র খোঁজার জন্যে এ-ধরনের আন্দোলন এখন অনেক দিন পর্যন্ত তৈরি হয়ে উঠবে, তৈরি থাকবে। বৃহত্তর ভারতে ব্যবসা ও শিল্পের বাড়তি, হিশেববহির্ভূত, অসংখ্য টাকায় যে-সামাজিক শ্রেণী তৈরি হয়ে গেছে—রাজবংশীরাও তা থেকে আলাদা নয়। ভারতের অর্থনৈতিক নিয়মেই তাদের সমাজের ভেতরে এখন তাদের বোরো ও কোচ রক্তের শুদ্ধতা খোঁজার এই ঝোঁক সংগঠিত হচ্ছে, যেমন ভারতের অর্থনীতির নিয়মেই শিখরা আরো কত ভাল শিখ হতে পারে সেটা একটা রাজনৈতিক বিষয় হয়েছে ; যেমন, সেই একই নিয়মে তেলুগুরা কত বেশি তেলগু সেটাই রাজনীতি হয়ে উঠেছে ; যেমন সেই একই নিয়মে অহোমরা অহোম-ঐতিহ্যের প্রাগেতিহাস থেকে তাদের আত্মপরিচয় জোগাড় করে ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনীতিতে ঢুকছে। ইতিহাসেরও অতীত, বর্তমানে এই কাজে লাগছে, রাজনীতির-অর্থনীতির ভারতীয় ভবিষ্যতের প্রয়োজনে।

কিন্তু নিজেদের উপজাতিত্বের অতীতকে বর্তমানের মধ্যে আবিষ্কার করার মধ্যে, অন্তত রাজবংশীদের ক্ষেত্রে, একটা এমন গোঁজামিল আছে, যা মীমাংসা করা অসম্ভব। রাজবংশীরা রাজবংশীও থাকবে, আবার কোচ-বোরো উপজাতিও হবে—এ ব্যবস্থা কোনো ভাবে সম্ভব নয়।

কেউ যদি বলেন, এখন আর রাজবংশীদের উপজাতিত্ব নির্ণয় করা যাবে না, তাই তাদের পক্ষে উপজাতিত্বে প্রত্যাবর্তন সম্ভব হবে না—তা হলে সে-কথা ধোপে টিকবে না। কারণ ধোপটা দিচ্ছেন রাজবংশীরাই। তারা নিজেদের যে-উপজাতিত্ব স্বীকার করবে, সেই উপজাতিত্বই তাদের পরিচয়। তাতে হজসন, ডালটন, বেভারলি, হান্টার, রাউনি, বোয়লো, ম্যাগোয়ার, ওডোনেল, রিজলি, গ্রিয়ারসন, গেইট, ওমেলি, টমসন—এ-সব সাহেবদের লিস্ট করা জাতি-উপজাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে মিল হল কি হল না সেটা অবাস্তব। কারণ, এই সব সাহেব যে-লিস্ট বানিয়ে দিয়েছে সেটা কোনো নতুন স্মৃতিশাস্ত্র নয় যে তাতে গাঁই-গোত্র মিলিয়ে তবে একটি উপজাতিকে উপজাতি হতে হবে।

কিন্তু এই উপজাতির-পরিচয় পুনরুদ্ধারেব পথে বাধা বাজবংশীবা নিজেরাই। কারণ, তারা এতদিন ধরে নিজেদেব এই উপজাতি-পবিচয় অস্বীকাব করে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধবে হিন্দু হতে চেয়েছে, হিন্দু হয়ে উঠেছে।

কোচবিহারের রাজপবিবাব আর জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুবেব রায়কত পরিবার ত বাজবংশীদের প্রধান ঐতিহাসিক প্রতিনিধি। কোচবিহাবের আদি পুরুষ বিশু বা বিশাই। সেই বিশাইই হয়ে গেল বিশ্বসিংহ। এই বিশাই পুবে ব্রহ্মপুত্র থেকে পশ্চিমে ঘোবাঘাট পর্যন্ত নিজের রাজত্ব কায়েম কবলে ব্রাহ্মণবা তাকে হিন্দু বানিয়ে ফেলল। পাজি-পুথি ঘেঁটে তাবা আবিষ্কাব কবল যে আসলে বিশাই ও তাব জাতির লোকজন ক্ষত্রিয়, পবশুবামেব ভয়ে তাদেব পৈতে ছিঁড়ে ফেলে তাঁবা এই বনে পালিয়ে আসে। আব বিশাই হরিযা চাঁড়ালেব ছেলে নয়, আসলে শিবেব ছেলে। তেমনি বিশাইয়েব ভাই শিশাইও শিবেব ছেলে। বিশ্ব সিংহ সিলেট থেকে একদল ব্রাহ্মণ আমদানি করে 'কামরূপী ব্রাহ্মণ' বলে একটি শ্রেণীই তৈরি করল। বিশ্ব সিংহের পর থেকে কোচবিহাবের বাজপবিবাব 'নাবায়ণ' পদবী ব্যবহাব করে। তারা মদনমোহন ঠাকুরবাড়ি বানায়। আব জলপাইগুড়িব বাযকতবা হয়ে যায় বৈকুণ্ঠপুবেব অধিবাসী।

কিন্তু এটা কেবল বাজপরিবাবের ব্যাপাব নয়। বাজপবিবাব সেই জনগোষ্ঠীর প্রধান পবিবার হিশেবেই এই ব্যবস্থা নিয়েছে এবং সেই জনগোষ্ঠীও নিজেদেব 'বাজবংশী' বলেই পরিচয় দেবে বলে ঠিক করে নেয। সেটাই হযে দাঁড়ায় তাদেব গৌবেবেব পবিচয়, তাদেব উপজাতিত্ব অস্বীকাবের পবিচয়, তাদের বৃহত্তব হিন্দু জাতিব ভেতব ঢুকে পড়ার প্রধান ছাড়পত্র। তিনশ বছবেব বেশি সময় ধবে এই হিন্দু পবিচয় রাজবংশী সমাজের এত ভেতবে সেঁদিযে যায যে উনিশ শতকেব শেষ থেকে এই হিন্দু ক্ষত্রিয আত্মপবিচয় হয়ে দাঁডায তাদের একটা আন্দোলনেরই বিষয়। সেটা ১৯২১ সাল নাগাদ, আদমশুমাবির সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় পর্যন্ত। ১৮৯১-এব আগেই বৈকুণ্ঠপুবেব জমিদাবি নিয়ে একটা মামলা প্রিভি কাউন্সিল পর্যন্ত গড়িযেছিল। তাতে বলা হয়েছিল, বৈকুণ্ঠপুব পবিবারের প্রধানের নাম রাযকত, এবা বাংলার উত্তব-পূর্ব সীমান্তের কোচ উপজাতিব অন্তর্গত এবং হিন্দু নয। ১৮৯১-এব সেন্সাস রিপোর্টেও রাজবংশীদেব কোচচরিত্র স্বীকাব করে নেয়া হযেছে। কিন্তু এই ১৮৯১-এর বিজলি মন্তব্য করেছেন, 'উত্তরবঙ্গের কোচ অধিবাসীবা নিজেদেব বাজবংশী ও ভঙ্গক্ষত্রিয় বলে পবিচয় দেয়। তাদেব ব্রাহ্মণ আছে, তারা ব্রাহ্মণ্য বীতিনীতি অনুসরণ করে ও ব্রাহ্মণদেব গোত্র গ্রহণ কবতে শুরু করেছে।'

কিন্তু ১৯১১-তেই এই দ্বিধার ভাব চলে গেছে। ওমেলি তাঁর সেন্সাস রিপোর্টে লেখেন, 'নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দেওয়ার অধিকার চেয়ে উত্তরবঙ্গের বাজবংশীদের মধ্যে একটা স্থায়ী ও গভীর আন্দোলন চলছে। তারা "কোচ"দের থেকে পৃথকভাবে বর্ণিত হতে চায়। শুধু তাই নয়, তারা নিজেদেব "ক্ষত্রিয়" নামে নির্দিষ্ট করতে চায়। প্রথম অনুরোধটি কোনো ইতস্তত না করেই বক্ষা কবা হযেছে। কারণ তাদের উৎপত্তি কী ভাবে হয়েছে সে-প্রশ্ন নিরপেক্ষভাবেই, এ কথা এখন সন্দেহাতীত সত্য রাজবংশী ও কোচ আলাদা জাত ("কাস্ট")। যাই হোক, তাবে বংশোৎপত্তিগত উপাধি ও প্রাচীন পদবী "ক্ষত্রিয়" নামে তাদের চিহ্নিত করার কোনো প্রশ্নই আসে না।' ১৯২৩-এর সেন্সাস রিপোর্টে টমসন লেখেন, '১৯০১-এ অনেক কোচ নিজেদের রাজবংশী বলে চিহ্নিত করেছে, এবং এখন রাজবংশীবা অনেকেই নিজেদের ক্ষত্রিয় পরিচয় লিপিবদ্ধ করানোর জন্যে শক্তি প্রয়োগ পর্যন্ত করে।' এই ১৯২১-এই রাজবংশীদের ভেতর পৈতে পরা ও ক্ষত্রিয় সমিতি আন্দোলন এ-রকম ছড়িয়ে পড়ে যে তাদের ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দিতে না দিলে রঙপুর থেকে কোচবিহার পর্যন্ত আদমশুমারি অচল হয়ে পড়ত। এই ক্ষত্রিয় পরিচয় অর্জনের আন্দোলন স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গেও অনেকখানি যুক্ত। যেন, নিজেদের হিন্দু পরিচয় প্রমাণ করাটা নিজেদের ভারতীয় পরিচয় প্রমাণ করারই সমার্থক। যেন, স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় জনসাধারণের যে-একটা পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল, নিজেদের হিন্দু বলে বর্ণনা দিলে সেই পরিচয়ের অন্তর্গত হওয়া যায়। তেমনি, আবার ততদিনে হিন্দু মধ্যবিত্তের প্রতিষ্ঠা হিন্দু মধ্যবিত্ত আদর্শকে রাজবংশীদের গ্রাহ্য করে তুলেছে। সেই পরিচয় যেন তাদের সামাজিক মর্যাদা পাওয়ার ছাড়পত্র। ক্ষত্রিয় সমিতি আন্দোলন—রাজবংশী সমাজের সবচেয়ে ব্যাপক ও গভীর আন্দোলন। তার ফলে রাজবংশী পরিবারের গঠন ও জীবনযাপন পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হয়।

একশ একাত্তর

বাজবংশী সমাজেব জাতিপবিচয় ও উপজাতি পরিচয়

বাজবংশী সমাজের ঐতিহাসিক কাল জুড়ে নিজেদেব উপজাতি পবিচযকে জাতি পরিচয়ে এমনভাবে মিশিয়ে দেবার চেষ্টা সত্ত্বেও সেই উপজাতির স্মাবক থেকে গেছে তাদেব চাপা নাক, ছোট চোখ, একটু ফর্শা বং ও চিবুকেব উঁচু হাড়ে। যে-বৃহৎ হিন্দু সমাজের সঙ্গে মিশে যেতে বাজবংশী সমাজেব এমন শত-শত বছরব্যাপী চেষ্টা সেই বর্ণ হিন্দু সমাজ তাব দবজা কোনো সময়েই বাজবংশী সমাজেব জন্যে খুলে দেয় নি। নরনাবীব যে-সম্পর্কের ভেতব দিয়ে বক্তেব মেলামেশায় উপজাতি পরিচয় খসে যেতে পারত শবীর থেকে, সে-সম্পর্ক কোনো সময়ই তৈবি হয় নি বর্ণ হিন্দু সমাজের লোকজনেব সঙ্গে রাজবংশী সমাজের লোকজনেব। যে-দুই বাজপবিবাব বাজবংশী সমাজেব প্রধান পবিবাব তারা নানাভাবে নিজেদের বর্ণ হিন্দু কবে ফেলতে পেবেছে, বর্ণ হিন্দু সমাজও তাদেব নিজেদের ভেতব নিয়ে নিয়েছে। অত বড-বড বাজপবিবাবে বা জমিদাব পরিবাবে ছেলেমেয়ের বিয়ে দিতে কাবই-বা আপত্তি হবে? তখন ত তাদের 'রাজা' হিশেবেই দেখা হয়, বাজবংশী হিশেবে দেখা হয় না। কালাপাহাড যে-কামাক্ষা মন্দির ধ্বংস কবে দেন (১৫৬৩), কোচবিহাবেব বাজা নরনাবাযণ সেই কামাক্ষ্যা মন্দিব পুনর্নির্মাণ কবেন ও সেখানে দুর্গাপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা কবে নিজেব হিন্দু হওযার পথ তৈবি কবেন। এই উপলক্ষে ১৫০ জন মানুষকে বলি দিয়ে তাম্রপত্রে মন্দিরেব দেবীদের সামনে দেয়া হয। রাজবংশী বা কোচ থেকে হিন্দু হওয়ার এমন রক্তপিচ্ছিল পথ সকলের পক্ষে বা সাধারণের পক্ষে সুলভ ছিল না। বাজারা কখনো রক্ত ঢেলেছেন, কখনো বক্তেব প্রতীক সিঁদুব ঢেলেছেন। লক্ষ্মীনারায়ণ বলে কোচবিহাবের কে রাজা আকবরেব সেনাপতি মানসিং-এব সঙ্গে তাঁর এক মেয়ের বিয়ে দেন (১৫৮৫)। আর-এক বাজা প্রাণনাবায়ণ (১৬২৫-১৬৬৫) তাঁর বোন রূপমতীব বিয়ে দেন নেপালেব রাজা প্রতাপমল্লব সঙ্গে। ১৮৭৮-এ কোচবিহাবেব বাজা নৃপেন্দ্রনাবাযণের সঙ্গে বিয়ে হল ব্রাহ্মসমাজের কেশবচন্দ্রেব কন্যা সুনীতি দেবীব। নৃপেন্দ্রনাথেব বড ছেলে জিতেন্দ্র নাবায়ণেব বিয়ে হল বরোদার ইন্দিবা দেবীব সঙ্গে। তাঁব মেয়ে গাযত্রী দেবীব বিয়ে হল জযপুবেব মহারাজাব সঙ্গে। আর-এক বোনেব বিয়ে হল আগরতলাব বাজাব সঙ্গে। ভারতীয় বাজাব স্বীকৃতিব মূল্য হিশেবে কোচবিহারের রাজা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করলেন নিজের রাজবংশী পবিচয়।

বৈকুণ্ঠপুবেব বাজপবিবাবের ইতিহাসও প্রায় একই বকম। কিন্তু তাবা ত দেশীয় রাজ্য হিশেবে স্বীকৃত নয়, তাই, অন্যান্য দেশীয় রাজারা তাদের পবিবারেব সঙ্গে বিয়েশাদি দেন নি। কিন্তু টাকা দিয়ে বর্ণ হিন্দু ঘর থেকে জামাই ও মেয়ে তারাও জোগাড কবেছেন।

বাজবংশী পবিচযেব সুবাদে যে-বাজ্য ও প্রায-বাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, রাজবংশী পরিচয় অবলুপ্তির মধ্যে দিয়ে সেগুলি নিজেদের হিন্দু সমাজের ভেতর ঢুকিয়ে নিয়েছে। কিন্তু ঠিক বিপবীত পদ্ধতিতে বর্ণ হিন্দু সমাজ এই রাজবংশীদের দূবে ঠেলে রেখেছে। ফলে তারা গত প্রায় পাঁচশ বছর এক অদ্ভুত বিপবীত জীবন যাপন কবে আসছে। তাদের সমস্ত অবয়বে কোচ জন্মচিহ্ন, তাদেব পোশাক-আসাকে কোচ উপাজাতির অভ্যাস, তাদের অলঙ্করণে কোচসংস্কার, তাদের তৈজসপত্রে কোচঐতিহ্য, তাদের পরিবারের লোকজনের ভেতরকার সম্পর্ক কোচঐতিহ্য সম্মত, তাদের বাড়িঘর কোচরীতি অনুযায়ী তৈরি হয়, অথচ তারা কিছুতেই নিজেদের কোচ বলে স্বীকার করে না, কোচপরিচয় তাদের পক্ষে প্রায় নিকৃষ্ট অপমান।

বিশাই বা বিশ্বসিংহকে (১৪৯৬—১৫৫৩) যদি ঐতিহাসিক কালে কোচদের সংগঠিত আত্মপ্রকাশের প্রথম চরিত্র বলে ধরে নেই তা হলে পাঁচশ বছর ধরেই রাজবংশী মানুষ নিজের এই দুটি জীবন মেনে নিয়েছে। সে নিজেকে মনেপ্রাণে হিন্দু মনে করে। তার পরম দেবতা জল্পেশ্বর শিব। কিন্তু বর্ণ হিন্দুরা তাকে হিন্দু মনে করে না, তাই বর্ণ হিন্দু সংস্কৃতিও সে আয়ত্ত করে নিতে পারে নি।

এখন ভারতের অর্থনীতির রাজনীতির নিয়মে এই রাজবংশী তার কোচপরিচয় পুনরুদ্ধার করতে চাইছে। যে-হিন্দুত্ব ছিল তার আদর্শ, সেই হিন্দুত্ব থেকে সে বেরিয়ে আসতে চাইছে। শরীরে ও সংস্কৃতিতে যে-কোচ সে থেকেই গেছে, সেই কোচই সে হয়ে উঠতে চায়। আর, এই কোচপরিচয়ের সুবাদেই ভারতের রাজনীতি-অর্থনীতিতে ভারতীয় হিশেবে সে তার বিশেষ সুবিধে আদায় করে নিতে

চায়। হিন্দু হওয়ার পাঁচশ বছর পর সে অহিন্দু হতে চাইছে। কিন্তু এই অহিন্দু হতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তার কোচঐতিহ্যের গৌরববোধ থেকে ও চৈতন্য থেকে জন্মাচ্ছে না, জন্মাচ্ছে তার টাকাপয়সার নগদ হিশেব থেকে। যে-কোচ পাঁচশ বছর ধরে রাজবংশী থেকেছে সে কি আর ইচ্ছে করলেই আজ কোচ হতে পারে?

হতে পারার একটা উপায় অবিশ্যি তার ছিল। হিন্দু সমাজের প্রত্যাখ্যানের ফলেই সে তার কোচ জীবনযাপনের যে-অভ্যাস অব্যাহত রাখতে পেরেছে সেই অভ্যাসটাকে প্রায় আক্রমণের ভঙ্গিতে হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারত। কিন্তু তা হলে ত তাকে অস্বীকার করতে হয় এই 'রাজবংশী' নামটিই। কোনো রাজপরিবারের সঙ্গে উপজাতি পরিচয়ের ঐক্যসূত্রে সে তার কোচপরিচয় ফিরে পাবে না। সেই রাজপরিবারের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক অস্বীকার করলেই তার উপজাতিপরিচয় সে ফিরে পেতে পারে। কিন্তু ১৮৯০ থেকে শুরু করে ১৯৩০-৩৫ পর্যন্ত যে নিজেকে শুধু রাজবংশী নয়, ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দিতে চেয়েছে, সেই পরিচযই তার সামাজিক আন্দোলনের প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে, সে কী করে এখন নিজেকে 'রাজবংশী' না-বলে কোচ বলবে? 'কোচ' ত নয়ই, 'রাজবংশী'ও নয়—হিন্দু 'ক্ষত্রিয়'—এই পরিচয় এখন উল্টে যাবে কী করে—'হিন্দু' ত নয়ই, 'রাজবংশী'ও নয়—'কোচ'?

উল্টে যেতে পারত যদি সত্যি আত্মপরিচয়ের এক প্রখর বেদনায় ও অভিমানে এই সমাজ নিজের ওপর বদলা নিতে চাইত, নিজের পাঁচশ বছরের হিন্দু হওয়ার ইতিহাসের বদলা নিতে চাইত, নিজেকে আঘাতে-আঘাতে পর্যুদস্ত করতে চাইত। তা হলে এক উদ্ভট প্রতিক্রিয়ায় সে নিজের সংস্কৃত নাম ত্যাগ করত, সে এমন-কি রায় বা বর্মন উপাধিও ছেড়ে দিত, সে বিয়ে-শাদি-শ্রাদ্ধে পুরুত-বামুনকে আসতে দিত না, উদ্ধার করে আনত নিজের পাঁচশ বছরের পুরনো কোনো রীতি, এমন-কি জল্পেশ্বর শিবকেও অস্বীকার করত, এমন-কি কোচবিহারের মদনমোহনকেও অস্বীকার করত, কামাক্ষ্যা মন্দিরের বিগ্রহকেও অস্বীকার করত—বদলে গড়ে তুলত নিজের নতুন তীর্থ, তা হলে সেই অভিযান এই বিরাট রাজবংশী সমাজকে ইতিহাসের এক অবাস্তব পুনরাবৃত্তির প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে ফেলত ঠিকই কিন্তু সেই পুনরাবৃত্তি হয়ত নতুন একটা আরম্ভও ঘটাতে পারত। এই উত্তরখণ্ড আন্দোলন ত তা নয়ই, বরং তার উল্টো।

কংগ্রেসের আর ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই বলে কংগ্রেসের যে-জনভিত্তি গ্রাম-গ্রামান্তরে আছে, সেই জনভিত্তির ওপর তৈরি হচ্ছে এই ধরনের আঞ্চলিকতাবাদী আন্দোলন। কিন্তু এটা হয়ত পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ পরিস্থিতি। পশ্চিমবঙ্গ বাদ দিয়ে সারা ভারতেও ভারতীয়তার বিপরীত যে-রাজনৈতিক প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, এর সঙ্গে হয়ত তারও সম্পর্ক আছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের সেই নির্দিষ্টতা বাদ দিলেও, আসলে ভারতের অর্থনীতিতে মুনাফা ভাগাভাগি এত স্পষ্ট চেহারা নিয়েছে যে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জোতদারও তার ভাগ চায়।

এমন একটা সম্মিলন যেমন হওয়ার কথা তেমনিই হতে লাগল। ছদিন ধরে এই সম্মিলন সকালের দিকে প্রতিদিনই ঘন্টা দু-তিন করে হয়েছে। কিন্তু তাতে প্রতিদিন একই বক্তৃতা হয়েছে। এমন-কি প্রতিদিন বক্তৃতা করার লোক পাওয়া যায় নি। পুরো সম্মিলনটা একদিনেই শেষ হতে পারত—যদি একটু সাজানো যেত। কিন্তু সে-রকম সাজানোর লোকও নেই, সে-রকম সাজানোর কোনো উদ্দেশ্যও ছিল না। মাঝখানে, একদিন দেবনাথ রায় পি-এইচ-ডি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা বিভাগের কয়েকজন অধ্যাপককে এনে 'উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি'র ওপর একটা আলোচনা সভার ব্যবস্থা করে। তাতে বরং এমন কিছু শোনা গিয়েছিল, যা সম্মিলনের অন্যান্য বক্তৃতায় আসে নি।

সম্মিলন সকালে শুরু হতে-হতে প্রায় দশটা হয়ে যেত, তারপর বারটা-সাড়ে বারটার মধ্যেই শেষ। দু-একদিন এমনও হয়েছে যে দশটাতেও আরম্ভ করা যায় নি। কিন্তু একটি অধিবেশন সম্পূর্ণ বাদ দেয়া ঠিক নয় বলে যে-কেউ একটা বক্তৃতা করে অধিবেশন শেষ করে দিয়েছে।

শেষ পর্যন্ত জানা যায় যে সম্মিলনে অনেকগুলি প্রস্তাব নেয়া হয়েছে। তার মধ্যে এইগুলি আছে। এক : উত্তরবঙ্গের রাজবংশী অধ্যুষিত এলাকাকে স্বতন্ত্র অধিকার দিতে হবে, প্রয়োজনে এর জন্যে 'রাজ্য সীমা পুনর্নির্ণায়ক কমিটি'কে নিয়োগ করতে হবে। দুই : উত্তরবঙ্গে সমস্ত সরকারি কাজকর্মে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, মেডিক্যাল কলেজে, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে রাজবংশী ছাত্রদের জন্যে শতকরা অন্তত ৫০ ভাগ আসন নির্দিষ্ট রাখতে হবে ও তাদের ভর্তির জন্যে প্রবেশিকা পরীক্ষার ব্যবস্থা তুলে দিতে হবে।

তিন : তিস্তা ব্যারেজের জন্য অধিগৃহীত জমির সমপরিমাণ জমি খাশ জমি থেকে কৃষকদের দিতে হবে এবং আর-কোনো জমি অধিগ্রহণ করা চলবে না। চার : কৃষিপণ্যের সর্বোচ্চ দাম ও লেভির বাধ্যতা উত্তরবঙ্গের প্রযোজ্য হবে না, কারণ উত্তরবঙ্গে কৃষির জন্যে কোনো সেচ ব্যবস্থা নেই ও এখানকার ফলন কম।

কিন্তু এগুলি ত নীতিমূলক প্রস্তাব। কার্যকরী প্রস্তাব নেয়া হয়েছে দুটো।

প্রথম প্রস্তাবটিতে বলা হয়েছে—যে-ভাবে তিস্তা ব্যারেজ তৈরি হচ্ছে তাতে এই সম্মিলন গভীর উদ্বেগ প্রকাশ না করে পারে না। সরকার যদৃচ্ছভাবে জমি অধিগ্রহণ করেছেন। অধিগ্রহণের সময় এমন-কি জমির দাঁড়ানো ফসল পর্যন্ত বিবেচনা করা হয় নি। অথচ যদি তিস্তা ব্যারেজ কোথা দিয়ে যাবে তার একটা মানচিত্র আগে প্রচার করা হত তা হলে কৃষকরা আগেই সতর্ক হতে পারতেন ও অধিগ্রহণের আশঙ্কা আছে এমন জমিতে ফসল বুনতেন না। তদুপরি তিস্তা ব্যারেজের কাজে স্থানীয় লোকজনদের নেয়া হয় নি। তা ছাড়াও তিস্তা ব্যারেজের ফলে কোথায় কী ভাবে জল যাবে তার কোনো হিশেব জনসাধারণকে দেয়া হয় নি। ফলে, এ-রকম আশঙ্কা দেখা দিয়েছে যে তিস্তা ব্যারেজের ফলে উত্তরবঙ্গের কৃষিপণ্যের ধারা ব্যাহত হবে। অথচ এই আশঙ্কা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার তাড়াতাড়ি তিস্তা ব্যারেজ চালু করতে চাইছেন। অতি শীঘ্র পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তিস্তা ব্যারেজের প্রথম পর্যায়ের উদ্বোধন করবেন বলে যে-ঘোষণা করা হয়েছে তাতে সম্মিলন গভীর উদ্বেগ প্রকাশ না করে পারছে না। তিস্তা ব্যারেজের কাজ কতটা এগিয়েছে সে-বিষয়ে জনসাধারণকে কিছু না-জানিয়েই সরাসরি উদ্বোধন করে দেয়া অন্যায় ও অগণতান্ত্রিক। পরন্তু, তিস্তা ব্যারেজের কাজ এখনো উদ্বোধনের পর্যায়ে আসেই নি। এমতাবস্থায় সম্মিলন উত্তরবঙ্গবাসীকে সতর্ক করে দিচ্ছে—এই উদ্বোধনের বিরুদ্ধে গর্জে উঠুন। তাই সম্মিলন আহ্বান করছে—মুখ্যমন্ত্রী তিস্তা ব্যারেজ উদ্বোধন করতে এলে আপনারা নির্দিষ্ট দিনে সারা উত্তরবঙ্গ থেকে মিছিল নিয়ে এসে এই উদ্বোধনের প্রতিবাদ করুন, মুখ্যমন্ত্রী যাতে এই উদ্বোধন না করতে পারেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাবটি আরো দূরপ্রসারী। তাতে বলা হল—উত্তরবঙ্গের উন্নতির প্রতি কোনো রাজ্য সরকারই কোনোদিন মনোযোগ দেন নি। অথচ উত্তরবঙ্গ থেকে চা, তামাক ও কাঠের শুল্কবাবদ রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার কোটি-কোটি টাকা পেয়ে থাকেন। উত্তরবঙ্গের প্রতি এই উপেক্ষার প্রতিবাদে সম্মিলন আহ্বান করছে যে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গবাসী যোগ দেবেন না। সম্মিলনের পক্ষ থেকে উত্তরবঙ্গবাসীকে আহ্বান করা হচ্ছে, তাঁরা যেন বিধানসভায় ভোট বয়কট করেন। উত্তরবঙ্গের কেউ প্রার্থী হবেন না। উত্তরবঙ্গের কেউ ভোট দেবেন না। সম্মিলনের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে উত্তরখণ্ড হিংসায় বিশ্বাস করে না, তাই কোনো হিংসাশ্রয়ী উপায়ে ভোট বন্ধ করার আহ্বান দেয়া হচ্ছে না। সম্মিলন শুধু শান্তিপূর্ণ উপায়ে আগামী বিধানসভা নির্বাচন বয়কট করার আহ্বান দিচ্ছে।

একশ বাহাত্তর

সাংস্কৃতিক ফাংশনের বিবরণ—যাত্রা

শনিবার ছিল কলকাতার নবরঞ্জন অপেরার 'কুলটার কুল' আর রবিবার ঐ একই অপেরার 'প্রমোদতরণী'। সোমবার ছিল 'গানের আসর'। তাতে চিত্রা সিং শেষ পর্যন্ত জোড়ায় আসেন নি, একাই এসেছেন। কিন্তু অনুপ জালোটা এসেছিলেন, মান্না দে ছিলেন, তা ছাড়া অন্যান্য আর্টিস্টরা ত ছিলেনই। মঙ্গলবার কলকাতার 'গ্রুপ থিয়েটার' নামে একটা দল ব্রেখটের 'ককেসিয়ান চক সার্কল' করে। বুধবারের অনুষ্ঠানটা সন্ধ্যায় শুরু হয় নি, শুরু হয়েছে রাত আটটায় আর শেষ হয়েছে সকাল চারটেয়—সারা রাত ধরে ভিডিওতে চারটি ফিল্ম দেখানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার একটিই অনুষ্ঠান ও সেটিই সম্মিলনের শেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—শ্রীদেবীর নাচ।

এর ভেতর যাত্রার অনুষ্ঠানটা দুদিনই খুব জমে গিয়েছিল। তবে একটা পৌরাণিক হলে আরো ভাল হত। দুটোই খানিকটা ঐতিহাসিক আর খানিকটা সামাজিক। নবাবি আমলে একটি মেয়ে কুলত্যাগিনী হয়ে কী করে অত্যাচারী নবাবের প্রতিরোধ সংগঠন করেছিল তার কাহিনী—'কুলটার কুল'। মেয়েটি হিন্দু, হিন্দু জমিদারের গাঁয়ে থাকে। সে একটি যুবকের সঙ্গে এক রাত্রিতে বাড়ি ছেড়ে, গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। সে জন্যেই সে 'কুলটা'। কিন্তু পরে ধীরে-ধীরে জানা যায় ঐ হিন্দু জমিদার ঐ হিন্দু মেয়েটিকে মুসলমান মনসবদারের কাছে ভেট দিতে চায় এই খবর পেয়ে মনসবদারের এক যুবক সৈন্যাধ্যক্ষ পালিয়ে এসে মেয়েটিকে বাড়ি থেকে সরিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে রক্ষা করে। কিন্তু ইতিমধ্যে সেই জমিদার, মনসবদারের ঐ ছেলেটিকে 'তনখাইয়া' ঘোষণা করে, তার খোঁজে সমস্ত জায়গায় সৈন্য পাঠায় ও গ্রামে-গ্রামে সেই সৈন্যরা অত্যাচার শুরু করে। বিশেষত মেয়েদের ওপর। এক-একদল মেয়েকে ধরে আনা হয়—জমিদারকে দেখানোর জন্যে যে তার ভেতর সেই মেয়েটি আছে কি না। আর, আত্মগোপন করে গ্রাম থেকে গ্রামে পালিয়ে বেড়াতে-বেড়াতে সেই ছেলেটি ও মেয়েটি হঠাৎ একটা সময় থেকে নবাবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনের সংগঠক হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত ঐ মুসলমান সেনানী ও হিন্দু নারীর নেতৃত্বে স্বতঃসংগঠিত গ্রামবাসীদের বাহিনী গেরিলা যুদ্ধে সেই মুসলমান মনসবদার ও হিন্দু জমিদারের ভাড়াটে সৈন্যদের পর্যুদস্ত করে ফেলে।

খানিকটা দেবী চৌধুরানীর আদল আসে, 'জোয়ান অব আর্ক'ও একটু আছে। যারা ঐতিহাসিক নাটক ভালবাসে তাদের কাছে মনসবদার, জমিদার আর ঐ গ্রামের মেয়েটি কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিচিত হয়ে যায়। আর, তারপরই হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের ওপর মাঝেমধ্যেই কথাবার্তা আসতে থাকে। গেরিলা যুদ্ধের ব্যাপারে নকশালদের 'খতম অভিযান'-এর কথা মনে পড়ে আবার পাঞ্জাবের সন্ত্রাসবাদীদের কথাও মনে আসে। এই সব মিলিয়ে যাত্রাটি প্রায় সব রকম দর্শকের কাছে অনায়াসে পৌঁছে যায়। এমন-কি আধুনিক ছেলেপিলে, যারা ইতিহাসের ততটা ধার ধারে না, তারাও অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের সংগঠিত বিদ্রোহের কাহিনীতে নিজেদের বিষয় পেয়ে যায়। একদিকে মনসবদার ও জমিদারের অত্যাচার দেখানোর সুযোগ নরনারীর কিছু ঘনিষ্ঠ দৃশ্যও ছিল, সেখানে হিন্দি গজল গানই গাওয়া হয়েছে, সঙ্গে মেয়েটি নেচেছেও। এই মোনা গুপ্তা মেয়েটি ফিল্মে ক্যাবারে নাচের জন্যে খুব নাম করেছে। মনসবদারের এক মদ্য পানের দৃশ্যে মোনা গুপ্তার ক্যাবারে নাচ ছিল। এই নাচটা যে আছে তা অনেকেই জানত। আসলে, এই নাচটার জন্যেই 'কুলটার কুল' যাত্রা হিশেবে হিট করেছে। ক্যাবারের বেশ কিছুটা জুড়ে বেলিডান্স। শেষের দিকে এক সময় মেয়েটা প্রায় আর্চ করে স্টেজের মাঝখানে ঘোরে, তার পেটের ওপর, তলপেটের ওপর আর বুকের ওপর আলো পড়ে, অন্য সব আলো নিবে যায়, মেয়েটিকে ঐ আর্চ করেই স্টেজজুড়ে ঘুরতে হয়, যাতে সব দিকের দর্শকরা দেখতে পায়, দর্শকদের ভেতর থেকে হাততালি, চিৎকার, শিস ওঠে। যখন যেদিক থেকে তার পেট আর বুক দেখা যায়, তখন সেদিক থেকেই হাততালি, চিৎকার আর শিস ধ্বনিত হয়। কিন্তু এ-স্টেজ ত যাত্রার মত চারদিক খোলা নয়, থিয়েটারের মত একদিক খোলা। মোনা গুপ্তার শরীর ঘোরানোর ফলে সব দর্শকই তার বুক ও পেটের নতুন-নতুন দৃশ্য পায়। ফলে, তারাও হাততালি, চিৎকার আর শিস দেয়। এই দৃশ্য একটু যেন বেশি সময় ধরেই হয়। তারপরই বাইরে বোমার আওয়াজ, চকিত অন্ধকারে মোনা গুপ্তা উঠে দাঁড়ায়, হাত বাড়িয়ে নেয়া একটা কাল কাপড়ে সে নিজেকে সম্পূর্ণ আবৃত করে নিতে-নিতেই আলো সম্পূর্ণ জ্বলে ওঠে ও সেই নায়ক-নায়িকার গেরিলাবাহিনী স্টেজে ঢুকে পড়ে। তখন বোঝা যায়, ঐ নর্তকীও ছিল ছদ্মবেশী গেরিলা। সেখানে মনসবদারের পরাজয় ও হত্যাতেই যাত্রার সমাপ্তি—তার আগে কিছু ছোটাছুটি ও সংক্ষিপ্ত তলোয়ার খেলা আছে।

'প্রমোদতরণী'-ও এ-রকমই কিছুটা ঐতিহাসিক ও কিছুটা সামাজিক। 'কুলটার কুল'-এ যে-রকম, 'প্রমোদতরণী'তেও সে-রকম, নায়ক-নায়িকার সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট হয় না—অর্থাৎ ভাইবোন, স্বামীস্ত্রী, প্রেমিক-প্রেমিকা—এ রকম নির্দিষ্ট পরিচয়ের চাইতেও তাদের একসঙ্গে থাকা ও বাঁচাটাই প্রধান ব্যাপার। 'প্রমোদতরণী'র বেশ অনেকটা জুড়ে প্রথমেই মোনা গুপ্তাসহ অন্যান্য মেয়েদের নাচ আছে। মোনা গুপ্তা এখানে মাইক হাতে নিয়ে পাশ্চাত্য ফিল্মের কায়দায় ঘুরে-ঘুরে গানও গায়। নীলকর সাহেবের বাংলোতে বড়দিনের উৎসব ছিল এ-রকম দীর্ঘ ও সমবেত নাচের উপলক্ষ। সেখানেও 'নীলদর্পণ'-এর তোরাপের মত চরিত্র আছে, সংখ্যায় কিছু বেশি। ক্ষেত্রমণির ধর্ষণ দৃশ্য আছে বার

দুয়েক—একবার সাহেব করে, একবার নায়েব-গোছের বাঙালি একজন। কিন্তু ঐরকম কিছু অংশ ছাড়া 'নীলদর্পণ' আর মনে পড়ে না। সেখানেও দেখা গেল অনেকেই ঐ আরম্ভের সমবেত নারীনৃত্য ও ভেতরের ধর্ষণের দৃশ্যের কথা জানে। তাই সেই নৃত্যের পরই প্যান্ডেল থেকে অনেকে বেরিয়ে যায়, আবর ধর্ষণের আগে ঢোকে। নাচের সময় আলো খুব চড়া, রঙিন ও ঘূর্ণন্ত—ফলে সেই ঘূর্ণনের একটা মাদকতা আসে। সেই মাদকতা দর্শকদের মধ্যে ছড়ায় বটে কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে কাহিনীর ইঙ্গিত বুঝে নিতে হয় বলে এতটা ছড়ায় না যে দর্শকরা নিজেদের আসন ছেড়ে উঠে নাচতে থাকবে। সেটা বরং ঘটে ধর্ষণ দৃশ্য দুটিতে। দুটি দৃশ্যই একটু বিস্তারিত ভাবে দেখানো হয়। সেখানেও আলো খুব পরিকল্পিত ভাবে ব্যবহৃত হয়। ধর্ষণদৃশ্য দুইবার কেন, তার একটা জবাব কাহিনী থেকে পাওয়া যায়—পালাকার দেশীয় তাঁবেদার শ্রেণীর চরিত্রও দেখিয়েছেন। সেটা অবিশ্যি অন্যভাবেও দেখানো যেত। কিন্তু দর্শকদের প্রতিক্রিয়া থেকে বোঝা যায়, প্রথম বারের ধর্ষণটা কিছু প্রত্যাশিত ও কিছু দুর্ঘটনা। সেখানে অত্যাচারের আবহ সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় না। কিন্তু একই মেয়ের দ্বিতীয় ধর্ষণের দৃশ্য দর্শকদের নাটকীয় ও অপ্রত্যাশিত ঠেকে। শরীরজীবিনী কোনো মেয়ের শরীরের ওপর কোনো যৌন আঘাত এলে যেমন দর্শকের শারীরিক পবিত্রতাবোধ আহত হয় না, তেমনি, একবার ধর্ষিতা মেয়েকে দ্বিতীয়বার ধর্ষিতা হতে দেখলে দর্শকদের সামাজিক নিরাপত্তাবোধ হয়ত ব্যাহত হয় না। বরং, এই দ্বিতীয় ধর্ষণটাকে যাত্রার দৃশ্য হিশেবে অনেক নিরপেক্ষভাবে ভোগ করা যায়। সেই ব্যাপারে আলোকসম্পাতের সাহায্যও পাওয়া যায়। প্রথমবার ঘটনা ঘটে সাহেবের কুঠিতে। সেখানে ততক্ষণ বেশ প্রকাশ্য আলো থাকে যতক্ষণ সাহেব সেটা চায়, আর সাহেব বেশ অনেকক্ষণ ধরে। সেখানে অজ্ঞাত কোনো উৎস থেকে সাহেবি বাজনাও বাজে ধর্ষণের আয়োজন জুড়ে। আর দ্বিতীয়বার ধর্ষণ ঘটে মেয়েটির নিজের ঘরে, অন্ধকারে। সেখানে দর্শকরা নটনটীর শ্বাস, দীর্ঘশ্বাস, কাতরতার আওয়াজ বেশ ভালভাবে শুনতে পায়।

প্রত্যেকটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেই দেখা গেল যে দর্শকদের বড় একটা অংশ প্রায় সবটাই আগে থেকে জানে। সেই অংশটা সংখ্যার দিক থেকে বড় কিনা তা বলা যাবে না। বরং অনুমান হয়, তা নয়। কারণ প্যান্ডেলভর্তি অত মানুষের মধ্যে কত মেয়ে এসেছে কাছাকাছি গ্রাম থেকে, অনেক দর্শক এসেছে দূর থেকে বাসে করে। তাছাড়া সে-রকম পুরুষের সংখ্যাও কম নয়। তারা এ সব যাত্রা, থিয়েটার ফিল্ম আগে দেখে নি। তারা এ-সব গান বরং কিছুটা রেডিওতে আগে শুনেছে। কিন্তু সংখ্যার দিক থেকে, এ-সব দেখা বা জানা দর্শকের সংখ্যা বেশি না হলেও, ঐ দর্শকরাই অত বড় প্যান্ডেলের ভেতরে প্রধান। তারা নানা জায়গায় বসে থাকে বটে, কিন্তু ঢোকে আর বেরয় প্রায় একসঙ্গেই। তাদের বয়সের সীমাটাও বেশ বড়—বিশ-বাইশ থেকে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত। এদিককার আলোর ভোল্টেজ কম। সেই কম আলোয় খুব পরিষ্কার বোঝাও যায় না এরা সবাই স্থানীয় ছেলে কি না। তার ওপর এ অনুষ্ঠানের টিকিট বিক্রি হয়েছে পাহাড়ে, আসামের কাছাকাছি এলাকায়, বিহারের এলাকায়, বালুরঘাট রায়গঞ্জ শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি এই সব শহরেও। সুতরাং হিমঝরা রাত্রির আধো-আলোর এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় রাজবংশী যুবকের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল চা-বাগানের মজুরদের মদেশিয়া মুখ, গোর্খা মুখ, বিহারী বা আসামী মুখ। পলিথিনের জ্যাকেট, টুপি আর একই ধরনের জুতোয় শহরের যুবকদের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল ট্রাক বা বাসের ড্রাইভার-ক্লিনাররা বা ট্রাকভর্তি করে দূর থেকে আসা নানা পেশার নানা মানুষ। এই ভিড়টাই কিন্তু দর্শকদের প্রধান অংশ—তারাই যেন ঠিক করছিল কোথায় কতটা শিস বাজবে, কতটা আওয়াজ উঠবে, কোথায় একজনের একটা মন্তব্য শোনা যাবে, কোথায় হাততালি আর চিৎকার একসঙ্গে চলবে।

একশ তিয়াত্তর

সাংস্কৃতিক ফাংশনের বিবরণ—গান

দর্শকদের এই অংশের অনুষ্ঠানগুলো সম্পর্কে পূর্বজ্ঞানই এই সাংস্কৃতিক অধিবেশনগুলির প্রধান দিক। শিশুরা যেমন শোনা গল্পটাই একাধিকবার শুনতে চায় ও গল্প শুনতে-শুনতে তার মনের পরিচিত

প্রতিক্রিয়াটাই আস্বাদ করতে করতে এগয়, এই দর্শকরাও সে-রকম অনুষ্ঠানটির পরিচিত অংশগুলিই বারবার শুনতে চায়, দেখতে চায়। এমন হতে পারে যে এই দর্শকদের মধ্যেও বড় একটা অংশ ফিল্ম দেখে, টিভি দেখে, বা নানা জায়গায় এই সব অনুষ্ঠান দেখে-দেখে পাকা দর্শক হয়ে গেছে।

দর্শকদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে এই পূর্বজ্ঞানই সবচেয়ে বেশি বোঝা গেল গানের আসরে। কারণ, এমন-কি মেয়েদের মধ্যেও অনেকে এই সব গায়কের গলার সঙ্গে ও তাদের নির্দিষ্ট গানের সঙ্গে পরিচিত। মেয়েদর্শকদের ভিডও অবিশ্যি পুরুষদর্শকদেব মতই বিচিত্র। সংখ্যায় অনুপাতে সেখানে রাজবংশী ও মদেশিয়া মেয়েদেরই ভিড় বেশি। কিন্তু এই গানের অনুষ্ঠানে শহরের মেয়েরাও অনেকে এসেছে—জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, ধূপগুড়ি, আলিপুর দুয়ার থেকেও। গায়কেব সংখ্যা খুব বেশি ছিল না—চিত্রা সিং, অনুপ জালোটা, মান্না দে। তা ছাড়া আরো তিনজন, তত খ্যাতনামা নয় এমন, গায়ক। তাদের দিয়েই অনুষ্ঠান শুরু হয়, ভিড় তখনো জমাট নয়। অনেকেই বাইবের মাঠে, এমন কি রাস্তাতেও, জটলা পাকায়, চা-সিগারেট খায়। একটা ছোট্ট তাড়িব দোকান বসেছে মাঠের ভেতর সেই ইমিটেশন গহনার দোকানের পেছনে। অনেকেই একটু এলোমেলো হাঁটতে-হাঁটতে অন্ধকারেব দিকে গিয়ে সেই তাড়ির দোকানে এক পাক ঘুবে আসছে। বাইরের দলগুলি অত গা ঢাকাও দেয না। তারা বেশ হৈ-হৈ করতে-করতে সেদিকে যায়, ফিরে আসে।

মান্না দে-কে দিয়েই অনুষ্ঠান আসলে শুরু হল। একটা ভজন দিযে শুরু করলেন। তারপর, একটা রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইলেন। এই দুটো গানের পর একটু বিরতি নিলেন, কিছুক্ষণ হার্মনিযাম বাজালেন, তবলা, গিটার এগুলো একটু বাঁধাবাঁধি হল, তারপর একটু গুনগুন করলেন—সেটাও মাইকে শোনা গেল, তারপর একেবারে হঠাৎ একটা কলি গেয়ে উঠে থেমে গেলেন, দর্শকরা হাততালি দিযে উঠল। হাততালি শেষ হলে তিনি গানটা গাইবার মত করে গাইতে আবম্ভ করেন মাইক থেকে মুখটা একটু সরিয়ে। সে-গানটা খুব তালের গান নয়, কিন্তু টানা সুবেব চলন আছে। উঁচু পর্দায় টানা সুরের সেই চলনে একটা উত্তেজনা ছড়াচ্ছিল। ছড়াচ্ছিল কিন্তু পুরো ছড়াতে না-ছড়াতেই গানটা, যেন খানিকটা আচমকা শেষ করে দিয়ে বানলা লোকসঙ্গীতের সুরে একটা আধুনিক গানেব প্রথম স্তবকটি গেয়ে দেন। প্রথম চরণটি শুরু হতেই দর্শকদের ভেতর 'ই-স' এ-বকম একটা আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সেই আওয়াজের ভেতর আকস্মিকের উত্তেজনার চাইতে হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ার বিস্ময ছিল। সেই প্রাথমিক উচ্ছ্বাসের পর দর্শকবা গানটা যেন আস্বাদ করে। আর, এই গানটাতেই মান্না দে যেন বুঝে যান, দর্শকদের একটু অন্য রকম ভাল লাগছে। গানটা তিনি ফিবে-ফিরে গান আর সেই ফিরে-ফিরে গাওয়ায় প্রক্রিয়ায় দ্রুত হওয়া সত্ত্বেও গানটা থেকে নাটক ঝরে যেতে থাকে।

মান্না দের পরে এলেচ চিত্রা সিং। কিন্তু দলবলসহ মান্না দের প্রস্থান, তারপর পর্দা নেমে আসা, দর্শকদের অনেকেরই বাইরে বেরিয়ে আসা, এই সব মিলে একটা বিবতির মতনই হয। বেশ কিছুটা পরে, চিত্রা সিং মঞ্চে বসলে পর্দা ওঠে। তারপর যন্ত্রপাতি বাঁধাবাঁধি শুরু হয। তখন বোঝা যায় দর্শকরা বেশ স্থির হয়ে বসেছে, তখন, চিত্রা সিং মাইকেই একটু গুনগুন কবে নেন। বেশ নরম গলাব সেই গুনগুনানিতে সাড়া প্যান্ডেল ভরে যায়। তারপর গুনগুনানি থামে, বাজনাগুলো হঠাৎ জোরে একসঙ্গে বেজে উঠে একটা সুর বাজিয়ে ফেলে আধ মিনিটটাক। সেটা থেমে গেলে মাইকে ঘোষণা শোনা যায়, 'শ্রোতাদের কাছে শ্রীমতী চিত্রা সিং-এর পক্ষ থেকে বিশেষ অনুরোধ তাঁরা যেন এই অনুষ্ঠান ক্যাসেট বা টেপ না করেন। যদি এ-রকম করা হয় তাহলে তিনি তখনই অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেবেন।' এই ঘোষণাটা দু-বার করা হয়। চিত্রা সিং হার্মমিয়ামটা একটু জোরে বাজিয়ে নিয়ে দু হাত তুলে নমস্কার করেন। তারপর তাঁর প্রথম গানটি ধরেন।

শুরু করতেই মেয়েদের ভেতর থেকে আবছা একটা গুনগুনানি ওঠে, সমবেত গুনগুনানি। উঠেই থেমে যায়। কিন্তু তাতে বোঝা যায়, গায়িকার সঙ্গে-সঙ্গে অনেকেই মনে-মনে সুর ভাঁজছে। চিত্রা সিং-এর অনুষ্ঠানেরই মাঝামাঝি এই মনে-মনে সুর ভাঁজাটা প্রকাশ্য হয়ে পড়ল। মনে হয়, গায়িকা কিছুটা উৎসাহই দিলেন দর্শকদের এই সক্রিয়তায়। একটু মৃদু হাসলেন। তারপর সে-গানটা শেষ হতেই একটা দ্রুত লয়ের ভজন গেয়ে উঠে, দর্শকদের দিকে হাত বাড়িয়ে বলেন, 'আপনারাও গান', তারপর একটা লাইন গেয়ে যেন অপেক্ষা করেন দর্শকদের প্রতিধ্বনির জন্যে। আর প্রতিধ্বনি ওঠেও। একটু ধীরে বটে কিন্তু বেশ উল্লসিত প্রতিধ্বনি। আরো দু-তিন চরণ এ-রকম গাইবার পর চিত্রা সিং হঠাৎ

হার্মনিয়াম ছেড়ে উঠে দাঁড়ান—ভজনের ছন্দে-ছন্দে দু হাত দু দিকে প্রসারিত করে নিজে ত যেন প্রায় ভজনতাড়িত হয়ে ওঠেনই, সঙ্গে-সঙ্গে দু-হাতের ইঙ্গিতে দর্শকদের গাইতে বলেন, উইং থেকে ছুটে এসে একজন তাঁর হাতে একটা মাইক ধরিয়ে দেয়, তিনি বাঁ হাতে মাইকটা নিগে, ডান হাতে বাতাসে হাততালি দেন, মাথাটা তালে-তালে দোলান, তাঁর নিমীলিত চোখে ভজনের ঘোর বোঝা যায়, তাঁর চুলের দোলনেও সেই একটু চাপা নেশা। দর্শকরা প্রথমে তাঁর মাথার দোলনের সঙ্গে তাল রেখে মৃদু হাততালি দিতে থাকে, কিন্তু গানের দ্রুততার সঙ্গতিতে সে-হাততালি উচ্চকিতও হয়, দ্রুতও হয়, অনেকটা কীর্তনের আসরের মত, চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনি অনেক সময় চুপ করে শুধু মাথা দুলিয়ে যান আর দর্শকরা হাততালি দিয়ে গাইতে থাকে। সেটাও আরো একটা পর্যায়ে উঠে সেই চূড়াতেই শেষ হয়। চিত্রা সিং দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আনত হন। ধীরে-ধীরে পর্দা নেমে আসে। সমস্ত আসরটা যেন একটু আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

সেই আচ্ছন্নতা কাটতে একটু সময় লাগে কিন্তু দর্শকরা বড় একটা বাইরে যান না, মোটামুটি যে যার আসনে বসেই থাকেন। পর্দাও তাড়াতাড়িই ওঠে। স্টেজের আলো ও চিত্রা সিং-এর পোশাক একটু বদলেছে। এবার তাঁর গলাতে অন্য সুর খেলা করে—একটু আদরকাড়া সুর, বালগোপালকে নিয়ে। কিন্তু সে বালগোপালও দর্শকদের চেনা। এটাও যেন তাদের জানা যে এই দ্বিতী৲ বৈঠকে তাদের গলা মেলানো বারণ, গানগুলোও গলা মেলানোর নয় অবিশ্যি।

অনুপ জালোটার বেলায় দর্শকদের এই পূর্বজ্ঞানই প্রকাশিত হয় অন্য ভঙ্গিতে। চিত্রা সিং-এর পর তাঁর আসর বাসার আগেও একটা বিরতি-মত হয়। পর্দা ওঠার পর তিনিও কিছুটা সময় নেন দর্শকদের সঙ্গে তাঁর উপস্থিতির একটা সংযোগ তৈরি করতে। বারবার হার্মনিয়াম বাজান আর দর্শকদের দিকে তাকান, যেন চেনা লোক খুঁজছেন এমন ভঙ্গিতে। কিন্তু ওটা একটা ভঙ্গিই মাত্র। মঞ্চের সব আলো তাঁরই ওপর। সেই আলোর পর্দা ভেদ করে তাঁর পক্ষে দশর্কদের কাউকে দেখা সম্ভবই নয়! কিন্তু দর্শকরা ত তাঁর এই ভঙ্গি দেখছিল ও সেই ভঙ্গিতে সাড়াও দিচ্ছিল গানেব জন্যে প্রয়োজনীয় পবিবেশ তৈরি করে। অনুপ জালোটা ঐ রকম আঁতিপাঁতি খুঁজতে-খুঁজতেই খুব চাপা স্বরে একটা উর্দু গজল ধরেন, যেন গাঢ় স্বরে কেউ নিভৃতে নিজের সঙ্গে কথা বলছে। ময়নাগুড়ির মত একটা জায়গায় প্রধানত রাজবংশী শ্রোতাদের সামনে উর্দু শায়েরের মেজাজে অনুপ জালোটার সেই গান কেমন মোহ তৈরি করে। যতই কেন না আসাম-বিহারের দর্শক আসুক, যতই কেন না শিলিগুড়ি-বালুরঘাটের দর্শক আসুক—এদের মধ্যে বড জোর কেউ-কেউ হিন্দিভাষী। কিন্তু উর্দুর সূক্ষ্ম রসিকতায় আপ্লুত হয়ে যায় উর্দু ভাষা থেকে এত দূরবর্তী এই দর্শক আর গায়ককে বাহবাও জানায় উর্দুরীতিতেই। অনুপ জালোটা যে এই উর্দু গজলেই আটকে থাকেন তা নয়। কিন্তু প্রথম দুটি গজল ঐ ধরনের গেয়ে যেন ভুলিয়েই দেন একটু আগে চিত্রা সিং এখানে আর-এক রকম গানে কী রকম মোহ তৈরি করেছিলেন শ্রোতা-দর্শকদের মধ্যে। অনুপ জালোটা এ-রকম দুটি গান গাওয়ার পর মৃদু হেসে হিন্দিতে বলেন, 'আমি আপনাদের সেবার জন্যে এখানে এসেছি। আপনাদের হুকুম মত গাইব। কিন্তু সবাই মিলে হুকুম করলে ত শুনতে পাব না। আমার একটা গান শেষ হলে আমিই জানতে চাইব। তখন আপনাদের যাঁর গলা আমার কানে পৌঁছবে, তার ফরমায়েশ মত আমি গাইব।' অনুপ জালোটা তাঁর এক-একটা গানে দর্শকদের স্তব্ধ করে দিয়ে, রুমালে মুখে মুছে, হেসে বলেন, 'ফরমাইয়ে।' সমবেত চিৎকার শেষ হওয়ার আগেই তিনি একটা গান ধরে বসেন। হয়ত গানটি তাঁর আগেই ঠিক করা ছিল কিন্তু দর্শকদের ঐ ফরমায়েশের অধিকারের ফলেই অত বড় প্যান্ডেলভর্তি হাজার-হাজার দর্শকের সঙ্গে গায়কের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। যতক্ষণ গান হয়, ততক্ষণ দর্শক গায়কের এই সম্পর্কেরই নানা দিক উন্মোচিত হতে থাকে। কখনো তিনি হেসে দর্শকদের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দেন। কখনো মাথা ঝাঁকিয়ে একটা লাইন ফিরে-ফিরে গাইতেই থাকেন এক নিশ্চয়তায় যে, যে-দর্শকদের তিনি দেখতে পাচ্ছেন না তারা কী ভাবে তাঁকে ও তাঁর গানকে নিচ্ছে।

একশ চুয়াত্তর

সাংস্কৃতিক ফাংশনের বিবরণ—ভিডিও

এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হচ্ছে ত উত্তরখণ্ড সম্মিলন উপলক্ষেই—যদিও যারা অনুষ্ঠান করছে তারা উত্তরখণ্ডী নাও হতে পারে। কিন্তু উত্তরখণ্ডের সঙ্গে তাদের কোনো এক ধরনের সহানুভূতি যদি না থাকত তবে ত তারা নিজেরাই আলাদা ভাবে টাকা খাটিয়ে এ-রকম অনুষ্ঠান করতে পারত। সে-সহানুভূতি হয়ত রাজনৈতিক নয়, বা শুধুমাত্র রাজনৈতিক নয়। সে-সহানুভূতি হয়ত তৈরি হয়েছে এই উত্তরবঙ্গের সঙ্গে ব্যবসাপাতি বা কাজকর্মেরই সূত্রে। এমন-কি, হয়ত ব্যক্তিগত চেনাজানারই সূত্রে। কিন্তু যে-সূত্রেই হোক, সহানুভূতিটা ত সত্য। আবার উল্টো দিকে উত্তরখণ্ডের এত বড় একটা সম্মিলন যারা সংগঠিত করেছে তারা ত জানে এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এই সম্মিলনেরই একটা অংশ। একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করলে উত্তরখণ্ড সম্মিলনের কথা সারা উত্তরবঙ্গে অন্তত সবাই ভালভাবে জানতে পারবে—প্রচারের এমন সহজ উপায় হিশেবেও তারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটিকে দেখে থাকতে পারেন।

কিন্তু প্রথম ধাক্কায় মনে হয় উত্তরখণ্ড সম্মিলন আর এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেন পরস্পরের বিপরীত কাজ করছে। সম্মিলনে উত্তরখণ্ড বলতে বোঝায় বাজবংশীদেব স্বাতন্ত্র্য, অতীত গৌরব, বর্তমান বঞ্চনা, বিক্ষোভ, ভবিষ্যতের কর্মসূচি। আর সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে চলতে থাকে প্রধানত হিন্দি-উর্দু গান বা অন্তত বাঙালি সংস্কৃতির অংশ হিশেবে ঐতিহাসিক নাটকের ধারায় যাত্রা, বা, এমন-কি ব্রেখটের নাটকের বাংলা অনুবাদ, তা ছাড়া ভিডিও ফিল্ম। এর প্রত্যেকটাই ত দর্শকদের ভারতের বৃহত্তর সত্তা, এমন-কি বিশ্বের সত্তার কথাও মনে করিয়ে দেয়, অন্তত সেরকমই মনে করিয়ে দেয়ার কথা। তা যদি হয়, তা হলে সকালে সম্মিলনে যে-স্বাতন্ত্র্যের দাবি তোলা হচ্ছে, সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে ত সেই স্বাতন্ত্র্যের দাবিই নাকচ হয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যই আরো বেশি করে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তা হলে, এই সম্মিলনের সঙ্গে এমন অনুষ্ঠান যুক্ত হল কেন?

কথাটাকে আরো একটু বাড়িয়েও ভাবা যায়। অনুষ্ঠানগুলিতে দর্শকদের পূর্বজ্ঞানের ব্যাপারটি এতই প্রতিষ্ঠিত যেন মনে হয় এই অনুষ্ঠানগুলি না হলেও দর্শকরা এ গুলিতেই সব সময় আবিষ্ট থাকে। তাই যদি হবে, তা হলে এই উত্তরখণ্ডের ত কোনো ভিৎ গাড়বার মত মাটিই নেই।

নাকি কোথাও কোনো সংযোগ অদৃশ্য থেকে যাচ্ছে? কোথাও কোনো সংযোগ আরো দৃঢ় হচ্ছে—অদৃশ্য? পরিচিত ঐতিহাসিক কাহিনীর ভেতর বম্বে ফিল্মের দেখা ক্যাবারে আর বেলিডান্সের জায়গা হয়ে যায় যে-প্রক্রিয়ায়, খবরের কাগজে গণধর্ষণের রিপোর্ট পড়তে অভ্যস্ত দর্শকের সামনে একই মেয়ে দুবার দুভাবে ধর্ষিত হয় যে-কারণে, চিত্রা সিং-এর ভজন গানের উন্মাদনা আর অনুপ জালোটার দরবারি গানের কারুকাজ দর্শকের ভাল লেগে যায় গান শোনাবার যে-বৈষয়িক কৌশলে, এমন-কি ভিডিওর মত আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার এই পশ্চাত্তম অঞ্চলে ঘটে যায় যে-স্বাচ্ছন্দ্যে—সেই প্রক্রিয়া, কারণ, কৌশল ও স্বাচ্ছন্দ্যের ভেতরই নিহিত থাকে বিচ্ছিন্নতার এক প্রবল টান। নদীতে যেমন অনেক সময় ওপরের স্রোত যত বেগে ছোটে, তার নীচে এক স্রোত তত বেগেই তার বিপরীতে ছোটে, সমাজবদ্ধ মানুষের বেলাতেও হয়ত তেমনি। এই সব যাত্রা-গানবাজনা যত বেশি সমস্ত মানুষকে এক করে ফেলে, ততই বেশি মানুষ নিজের ভেতর গুটিয়ে যেতে চায়। শামুকের মত নয়, কারণ, শামুকের গুটিয়ে যাওয়ার মধ্যে আত্মরক্ষাই মাত্র থাকে, কোনো প্রতি-আক্রমণের হিংস্রতা থাকে না।

সারা রাত্রি ধরে ভি-সি-আর-এ চারটি ফিল্ম দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল বুধবার। পরদিন শ্রীদেবীর অনুষ্ঠান। আগের দিনটা এতে একটু হালকা থাকে। কারণ, ভিডিও-ফিল্ম দেখতে দূরের দর্শকরা নিশ্চয়ই আসবে না, গ্রামের দর্শকরাও আসবে না—স্থানীয় দর্শকরাই সারা রাত ধরে যতটুকু পারে দেখবে। একটা দিন বাদ দিলেই ভাল হত, কিন্তু বাদ দেওয়াটা নেহাৎ খারাপ দেখায় বলেই ভিডিও ফিল্মের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। একটা ইংরেজি—'ড্রাকুলা'। দুটো হিন্দি—'শোলে' আর 'শাহেনশা'। একটা বাংলা—'প্রতিকার'। এখন জলপাইগুড়ির ডুয়ার্সে হাট অনেক বেড়েছে। বড়-বড় কয়েকটি হাটে ভিডিও-পার্লারও হয়েছে। প্রথমে কথা ছিল, কলকাতায় কোনো ভিডিও-পার্লারের মালিকের সঙ্গে ব্যবস্থা করা হবে। সবই যখন বাইরে থেকে আসছে, ভিডিওটাকে আর 'লোক্যাল' রেখে কী হবে? কিন্তু হলদিবাড়ি হাটের ভিডিও-পার্লারের মালিক-ভদ্রলোক এখানে এসে ধরাধরি করেন।

ভদ্রলোকের বাবা হলদিবাড়ির বিখ্যাত জোতদার ছিলেন। ছেলেরা জমিজায়গা বিক্রি করে দিয়ে প্রায় সবাই বাইরে চলে গেছে। এক ছেলে ত বিদেশেই থাকে। এক এই ভদ্রলোকই এখানে থেকে গেছেন। পৈতৃক বাড়ির অংশ আছে। নানা রকম ব্যবসা নানা সময় করেছেন—কিছুদিন হল এই ভিডিও-পার্লার খুলেছেন ওদের পরিবার বীরেনবাবুর পুরনো মক্কেল—এখন যদিও মামলা-মোকদ্দমার কোনো ব্যাপার নেই। ভদ্রলোক এসে বীরেনবাবুকে ধরেন। বীরেনবাবু তাঁকে, নকুলবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। উনি কথা দেন, এঁদের লিস্ট অনুযায়ী কলকাতা থেকে নতুন প্রিন্ট নিয়ে আসবেন। উদ্যোক্তাবাও চাইছিলেন না ভিডিও-ফিল্ম ব্যাপারটা নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করতে। শেষে, এই ভদ্রলোকের প্রস্তাবেই রাজি হন।

কিন্তু কী-কী ফিল্ম আনা হবে—এটা ঠিক করতে অনেক সময় যায়। একটা গোপন প্রস্তাব নিয়ে কিছু নাড়াচাড়া হয় যে শেষের দিকে একটা ব্লু ফিল্ম দেখানো হোক। অত রাতে তেমন কেউ থাকবেও না, যদি থাকেও ঘুমিয়ে পড়বে। কিন্তু, শেষে, গোপন ভাবেই ঠিক হয়ে যায় যে ব্লু ফিল্ম আনা হবে না কারণ পুলিশ ঝামেলা করতে পারে। তার চাইতে 'এ্যাডাল্ট-হরব' অনেক নিরাপদ। খানিকটা ব্লু থাকে কিন্তু টানা হয়, মাঝে-মাঝে হঠাৎ। তা ছাড়া 'হরর'টাই প্রধান। কিছু 'এ্যাডাল্ট-হরর' ছবি নিয়ে কথাও হয়। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় 'ড্রাকুলা'ই ভাল। ঐ ভিডিওর ভদ্রলোকই খবর দেন, এটা নতুন ড্রাকুলা, সম্পূর্ণ নতুন ভাবে শুধু ভি-সি-আরের জন্যেই তৈরি। 'শোলে'র ব্যাপারে মতৈক্য হয় সবচেয়ে দ্রুত। ভদ্রলোকই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যদি 'শাহেনশা'র একটা প্রিন্ট পান, আনবেন কি না। অমিতাভ বচ্চনের 'শাহেনশা'র পোস্টার বারবার দেয়া সত্ত্বেও, মুক্তির তারিখ বারবার স্থির হওয়া সত্ত্বেও কিছুতেই 'মুক্তি' করতে দেয়া হচ্ছে না। বাংলা ছবির বেলায় কোনো পছন্দ ছিল না—এমন একটা ছবি হলেই বেটা সবার ভাল লাগে, মেয়েরা এলে ত ঐ প্রথম ফিল্মটা দেখেই চলে যাবে।

শেষ পর্যন্ত এই চারটি ফিল্মই এসে যায়। ঐ ভদ্রলোকই ঠিক করে দিলেন, প্রথমে বাংলা ফিল্মটাই হোক, তারপর 'শোলে'। তারপর 'ড্রাকুলা'। শেষে 'শাহেনশা'। কিন্তু পরে এটা বদলাতে হল। 'শোলে' লম্বা ছবি, অনেকের দেখা। সেটা বরং শেষে থাকুক। 'শাহেনশা' একেবারে নতুন ছবি—সেটাই বরং আগে দেখানো হোক। শেষে তাই ঠিক হল। কিন্তু সে-ঠিক হওয়ার পথেও নানা বাধা। কারণ, বেশ জাগ্রৎ অবস্থায় 'শোলে'র ঐ পরিচিতি সংলাপগুলি শোনার ইচ্ছে অনেকেরই ছিল। শেষ রাতেব ঠাণ্ডায় ঘুমের মধ্যে 'শোলে' জমবে না। তখন যেন রাত-কাটানোব জন্যেই ঝিমুতে-ঝিমুতে দেখা।

'শোলে' আগে দেখার পেছনে আর-একটা মতলব ছিল। তাড়ির দোকানটা তখন পর্যন্ত চালু থাকবে। মদ খেতে-খেতে 'শোলে' দেখা—এ-রকম সুযোগ ভাবা যায় না। কিন্তু 'শাহেনশা'র পক্ষেই মত বেশি হল। যারা 'শোলে'র পক্ষে ছিল, তারাও রাজি হয়ে যায়। যাই হোক অমিতাভ বচ্চনের না-দেখা ছবি! কত আর খারাপ হবে?

বাংলা ফিল্মটা সাড়ে দশটার মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। মাঝখানে কোনো ইন্টারভ্যাল দেয়া হয়নি। বাংলা ফিল্মটা মেয়েরাই বেশি দেখল। কিন্তু সে-ফিল্ম শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই প্যান্ডেল প্রায় ভরে যায়। এত লোক হবে এটা আশা করা যায় নি। টেলিভিশন সেটটা একটু উঁচু টুলের ওপর বসানো হয়েছে—টিনের বেড়ার ওপরের স্ক্রু আঁটার জন্যে সে-টুলটা বানানো হয়েছিল। কিন্তু স্টেজের ওপর না রেখে, টুলটা রাখা হয়েছে প্যান্ডেলের মাঝামাঝি—পুব দিকের বেড়া ঘেষে। দর্শকরা বসেছে টিভিটা ঘিরে। সামনের দিকে যারা, তারা বেশি পাশে যেতে পারে নি, কিন্তু পেছনে যারা তারা পাশেও অনেকটা ছড়িয়েছে।

ঐটুকু স্ক্রিনের আলো থেকে প্যান্ডেলেব ভেতরে মুহূর্তে-মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে ভারতবর্ষের নানা প্রান্তরের নানা দৃশ্য, পাহাড় থেকে সমদ্র মধ্য যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বিস্তারিত হয়ে যায়। আর সেই প্রায় তিন ঘন্টা ব্যাপী বাস্তবের ওপরেই নেমে আসে মধ্যযুগের এক পাশ্চাত্য প্রাসাদ—তাতে মৃত্যুর পর নির্বিকল্প এক মুখোশের মত মুখ নিয়ে এক দীর্ঘদেহী মানুষ, তার বয়স বোঝা যায় না, তার চোখের দৃষ্টিতে পলকের ছায়া পড়ে না। ময়নাগুড়ির ঐ প্যান্ডেলের মাথায় শেষ রাতের শিশির পড়ে টুপ টুপ, অঝোরে, আর, প্যান্ডেলের ভেতরে দর্শকদের নিদ্রালু চোখের সামনে একটার পর একটা হত্যা ঘটে যায়। প্রত্যেকটা হত্যাকাণ্ড দেখানো হয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে। যাকে খুন করা হচ্ছে তার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ নানা ক্লোজ-আপে দর্শকের সামনে ঘোরাফেরা করে। হত্যার পর হত্যার পর হত্যা, রক্তের পর

রক্তের পর রক্তে মানবশরীর যখন অবান্তর হয়ে যায়, তখন সেই যান্ত্রিক অবান্তরতায় মেয়েদের শরীর মোমের শরীরের মত পর্দা জুড়ে শুধু ঘোরে। যেন, কোনো উচ্চারণ নেই, কোনো ভাষা নেই, বোমায় বিধ্বস্ত কোনো নগরের মত নারীশরীর আছে ; শুধু শরীর। সেই সম্পূর্ণ অচেনা কাহিনীর শেষে গব্বর সিং-এর চিরপরিচিত কণ্ঠস্বরে ড্রাকুলাও উত্তরখণ্ড সম্মিলনের আত্মীয় হয়ে ওঠে।

একশ পঁচাত্তর

শ্রীদেবীর নাচের জন্য ট্রাফিক কন্ট্রোল

বৃহস্পতিবার সকাল দশটা নাগাদ মনে হল ময়নাগুড়ি শহরটা পুলিশ দখল করে নিয়েছে। তিস্তা ব্রিজ থেকে যে-রাস্তা ময়নাগুড়িতে ঢুকেছে, আর ময়নাগুড়ি থেকে যে-রাস্তা দুটো মালবাজারের দিকে ও আসামের দিকে চলে গেছে—সেই তিনটি রাস্তাতেই পুলিশভর্তি গাড়ি চলে গেল। মালবাজারের রাস্তায় একটি, আসামের বাস্তায় তিনটি, আর ব্রিজের রাস্তায় দুটি। তা ছাড়া একটা জিপ গাড়ি নিয়ে ডি-এস-পি সাহেব চৌপত্তিতে দাঁড়িয়ে থাকলেন। আসামের রাস্তায় চলে গেলেন ময়নাগুড়ি থানার ও-সি আর জলপাইগুড়ির দিকে থাকলেন জলপাইগুড়ির ও-সি। বেলা দশটা থেকে বারটা এই সব ছোটাছুটিতেই কাটল। বেলা বারটার পর থেকেই বোঝা গেল পুলিশ সমস্ত ট্রাফিকের দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে। আসামেব রাস্তায় মাইল-তিন আগে থেকে, জলপাইগুড়ির রাস্তায় তিস্তা ব্রিজ পর্যন্ত, কোনো গাড়িকে দাঁড়াতে দিচ্ছে না কিন্তু কোনো গাড়ি আটকাচ্ছেও না। মিনি বাস বা লাইনের বাসগুলোকে স্পিডও কমাতে দিচ্ছে না—প্যাসেঞ্জার নামানো-ওঠানোর জন্যে অনুষ্ঠানের জায়গায়, চৌপত্তিতে, চৌপত্তির পরে এক জায়গায় মাত্র এক মিনিটের জন্যে দাঁড়াতে দিচ্ছে। মালবাজাবের দিকে গাড়িগুলোকে টাউনের ভেতর ঢুকতেই দিচ্ছে না—'ভারতী' সিনেমার কাছ থেকে বের করে দিচ্ছে। ফলে, ময়নাগুড়ির চৌপত্তির অন্য দিনের তুলনায় গাড়ির ভিড় প্রায় নেই বললেই চলে যদিও মানুষের ভিড় অনেক বেড়ে গেছে। অনেকটা হরতালের দিনের মত লাগছে।

বেলা একটা-দেড়টা থেকে বাইরের ট্রাক-বাস আসতে শুরু করে। পুলিশ কোনো ট্রাক-বাসকেই শহরের ভেতরে ঢুকতে দেয় না। অনুষ্ঠানেব জায়গা থেকে মাইলখানেক দূরে আসামের বাস্তায় একটা বড় মাঠে সেই ট্রাক-বাসগুলোকে ঢোকানো হচ্ছে। সারি দিয়ে দাঁড়ানো ট্রাক-বাসগুলোকে একটা টোকেনও দেয়া হচ্ছে—গাড়ির নম্বর ও ড্রাইভারের নাম লিখে রাখা হচ্ছে। প্রথম দিকের কয়েকটা বাসট্রাকের পারমিট আছে কিনা দেখা হয়েছিল। তা নিয়ে একটু গোলমাল দেখা দিতেই ডি-এস-পি সাহেব এসে ময়নাগুড়ির ও-সিকে বলে দেন, পারমিট দেখতে হবে না। ডি-এস-পি সাহেব চলে যাওয়ার পর দুই হেড কনস্টেবল মাঠের ভেতরে সারি দিয়ে দাঁড়ানো গাড়িগুলোতে গোপনে পারমিট দেখতে চায়। পারমিটের বদলে তারা দশটা টাকা দেয়। পাঁচটাকাই দিতে চেয়েছিল কিন্তু কনস্টেবলরা তাদের বোঝায় কত ভাগ করতে হবে। তখন থেকে দশ টাকাই ঠিক হয়ে যায়। কয়েকটা ট্রাক-বাস আসতে-আসতেই এই সব হাঙ্গামা মিটে যায়। নতুন গাড়ি মাঠে ঢুকেই জেনে যায়—কনস্টেবলকে দশ টাকা দিতে হবে। ঐ দুই কনস্টেবলকে আর-কেউ ডাকাডাকি করে না, তারা ওখানে একটা বাসের ছায়ায় পাতা শতরঞ্জির ওপর বসে থাকে।

তিস্তা ব্রিজ দিয়ে প্রথম গাড়ি আসতে শুরু করে আর-একটু পর, বেলা তিনটে নাগাদ। ওদিকে কাছাকাছির মধ্যে খালি মাঠ না থাকায় গাড়িগুলোকে একটু বেশি দূরে, প্রায় মাইল দেড়েক দূরে এক মাঠের ভেতর ঢোকানো হয়। সে মাঠটাও নিচু। ফলে রাস্তা থেকে মাঠের ভেতর নামতে গাড়িগুলোকে একটু সামলাতে হয়। মাঠটা বড় হলেও একটু দূরেই জংলা গাছপালা শুরু হয়ে গেছে। সেদিকে কোনো ট্রাক বা বাসই যেতে রাজি হয় না।

তিস্তা ব্রিজের দিক থেকে প্রাইভেট গাড়ি ও ট্যাক্সি অনেক বেশি আসতে থাকে। তারা ঐ মাঠে নামতে অস্বীকার করে আর ঐ মাঠে নেমে অতটা হেঁটে যেতেও তাদের আপত্তি। সেখানেও বেলা

চারটে নাগাদ বেশ একটা গোলমাল পেকে ওঠে। ডি-এস-পি সাহেবকেও আসতে হয়। যাঁরা ডি-এস-পি সাহেবের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা অনেকেই দার্জিলিং, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ির ব্যবসায়ী বা চাকুরে। কলেজের শিক্ষকরাও দুটো ট্যাক্সিতে এসেছে। ব্যাপারটা পাকিয়ে ওঠার আগেই ডি-এস-পি বলে দেন, 'দেখুন, ট্রাক, বাস বা মিনিবাসকে এখানে নামতে হবেই, প্রাইভেট গাড়ি ও ট্যাক্সির জন্যে সামনে একটা পয়েন্ট আমরা করে দিচ্ছি ঐ পয়েন্টে গিয়ে প্যাসেঞ্জারদের নামিয়ে আবার এখানে চলে আসতে হবে। এতে আপনারা রাজি থাকলে, বলুন, নইলে, সবাইকেই এখানে নামতে হবে।'

সমর্থন ও আপত্তির একটা গুঞ্জনের মধ্যে হঠাৎ একজন জিজ্ঞাসা করে, 'তার মানে ফেরার সময় আবার এখানে এসে উঠতে হবে? এতটা হেঁটে এসে?'

ডি-এস-পি ধমকে ওঠেন, 'বাস-ট্রাকের প্যাসেঞ্জারদের যে এখান থেকেই হাঁটতে হচ্ছে সেটা দেখছেন না। আপনারা সময় নষ্ট করবেন না, যা করার এখনি করুন।' এর মধ্যে আবার একটা কণ্ঠস্বর শোনা যায়, 'অত রাতে এতটা রাস্তা হেঁটে আসার সময় ছেনতাই-টেনতাইয়ের দায়িত্ব কে নেবে।'

ডি-এস-পি সাহেব বলেন, 'রাস্তায় কাল সকাল পর্যন্ত পুলিশ থাকবে।' বলে রাস্তার ওপর দাঁড়ানো একটা 'মারুতি'কে সোজা চলে যেতে বলেন। 'মারুতি'র ড্রাইভার অত কিছু না বুঝে সোজা চলে যায়। তার পেছনে দাঁড়ানো গাড়িগুলোও না জেনে তার পেছন-পেছন যায়। জলপাইগুড়ির ও-সিকে সেই আগের পয়েন্টে পাঠিয়ে দিয়ে ডি-এস-পি তাঁর গাড়িতে ওঠেন।

জলপাইগুড়ির ও-সি তাঁর জিপগাড়িটা রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে নামে—তারপর ডি-এস-পির এগিয়ে আসা জিপের দিকে হাঁটে। ডি-এস-পি গাড়ি থামাতেই ও-সি বলে, 'স্যার, আগে যে-ব্যবস্থা ছিল সেটাই রাখুন স্যার, না-হলে এইটুকু রাস্তায় সেই মানুষ আর গাড়িতে গোলমাল বেধে যাবে।'

ডি-এস-পি গাড়ি থেকে নামেন। তারপর ও-সিকে নিয়ে আবার আগের জায়গায় আসতে থাকেন হেঁটে। প্রাইভেট গাড়ির ধুলোয় রাস্তা অন্ধকার হয়ে আসে। ডি-এস-পি চাপা গলায় বলেন, 'ঠিকই বলেছেন, গাড়িফাড়ি মিলিয়ে একটা স্ট্যামপিড হয়ে যাবে।'

সেই পার্কিঙের মাঠটাতে এসে ডি-এস-পি হাত দেখিয়ে বাকি প্রাইভেটগাড়িগুলোকে আটকে দিয়ে মাঠে ঢুকতে বলেন। সেই সব নতুন গাড়ির লোকরা জানেও না যে ইতিমধ্যে এখানে কী হয়েছে। ফলে তারা মাঠে ঢুকে যায়। আর যে-সব প্রাইভেট গাড়ির লোকজন ওখানে নামতে আপত্তি করেছিল, তারাও অনেকে মাঠে নেমে গেছে। কারণ, গাড়ির ভেতর কারো-কারো ফ্লাস্কে চা আছে, কারো-কারো মদের বোতলও আছে। গাড়ি তাদের খানিকটা দূর এগিয়ে আবার যদি ফিরেই আসে তা হলে লাভটা কী? তার চাইতে বরং এখানে এই মাঠের মধ্যেই গাড়িটা রেখে হেঁটে-হেঁটে যাওয়া ভাল—এ-রকম ভেবে তারাও মাঠের ভেতরই ঢুকে যায়। এ নিয়ে আর-কোনো গোলমাল হয় না। যে-গাড়িগুলোকে প্রথমে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল, সেগুলো ফিরে এলেডি-এস-পি, ও-সিকে বলেন, 'আপনি এখানেই থাকুন।'

ততক্ষণে যে-তিনটি দিক থেকে ট্রাক-বাস গাড়ি আসছিল সেই তিনটি দিকই সংগঠিত হয়ে গেছে। আকাশ থেকে যদি তাকানো যেত, তা হলে দেখা যেত তিস্তাব্রিজ থেকে, আসাম রোড থেকে, ডুয়ার্সের রাস্তা থেকে আর এ-ছাড়াও মাঠ দিয়ে, মেঠো পথ দিয়ে, যেন এইটুকু জায়গার সব দিক থেকে পায়ে হাঁটা মানুষ একটা কেন্দ্রের দিকে চলছে। এই এত সব পথ দিয়ে এত হাজার-হাজার মানুষ আস্তে-আস্তে হেঁটে-হেঁটেই সেই কেন্দ্রের দিকে যাচ্ছে—খুব বড় মেলায় তীর্থ যাত্রীরা যেমন হাঁটে। তাতে ধুলো উড়ছে। আকাশ আর মাটির মাঝখানে ধুলোর একটা পর্দাও তৈরি হচ্ছে। সেই পর্দার আড়ালে মানুষজনকে একটু অস্পষ্টও দেখাচ্ছে। কিন্তু অত মানুষের একসঙ্গে এক গতিতে একটি কেন্দ্রের দিকে হাঁটার সঙ্গে সেই ধুলোওড়াটুকু মানিয়েও গেছে। এত আর ট্রাক বা বাসের ধুলোর ঝড় নয়, মানুষের পায়ে-পায়ে ওড়া ধুলো। একই কেন্দ্রের দিকে এত মানুষ যায় বলে ধুলোরও যেন একটা প্রবাহ পথ তৈরি হয়।

একশ ছিয়াত্তর

শ্রীদেবীব নাচ : প্রত্যাশা ও প্রতীক্ষা

ময়নাগুডিব কাছেই জল্পেশে প্রতি বছবই শিববাত্রিতে মেলা বসে। জল্পেশের কাছাকাছি ময়নাগুড়িই সবচেয়ে বড শহর আর জল্পেশেব মেলাও চলে প্রায় মাসখানেক। ফলে নানা জায়গায় তীর্থযাত্রীরা ময়নাগুডিব ওপব দিয়ে যায, ময়নাগুডির মাঠেঘাটে, বারান্দায়, গাছের তলায় অস্থায়ী ডেরা বাঁধে। শিববাত্রিব দিন ময়নাগুডিব ওপব দিযে আগে পায়ে হাঁটা তীর্থযাত্রীরা যেত, এখন বাস-মিনিবাসেব ভিড় লেগে যায। এ-সব দেখাব অভিজ্ঞতা মযনাগুড়ির লোকজনেব আছে।

কিন্তু শ্রীদেবীব নাচের অনুষ্ঠানটিব দিন বেলা চারটে থেকে মযনাগুড়ি ও তাব আশেপাশের যে-চেহারা হল তা সেই বাৎসবিক অভিজ্ঞতাব সঙ্গে কণামাত্র মেলে না। মনে হল, ময়নাগুডিতে ও তাব আশেপাশে কযেকটা জল্পেশ মেলা একসঙ্গে বসেছে।

আসাম ও বিহাবেব দিক থেকে যাবা ট্রাক-বাসে এসেছে তাদেব ট্রাকে ও বাসেই খাবাবদাবার পোশাক-আশাক বিছানাপত্র। ডিলাক্স বাসেব যে-যাত্রীরা কোনো কোম্পানির দায়িত্বে এসেছে তাদের ত বাসটায ঘববাডি। ফলে, মাঠেব ভেতব গাডিগুলোকে ঢুকিয়ে দেয়ার পর গাডির যাত্রীবা নিজেদেব পবিবাবেব লোকজন বা বন্ধুবান্ধব নিয়ে দুটো-একটা শতরঞ্জিতে আলাদা-আলাদা হয়ে ছডিয়ে যায়। কোথাও টিনেব মুখ খুলে ডালপুর, আচার, ডালমুট, চানাচুর, প্যাবা বেরচ্ছে। শালাপাতাব ঠোঙাও সঙ্গে আছে, আর আছে জেলিক্যানে জল। কোথাও পাম্প দেয়া কেরোসিন স্টোভের সাঁ-সাঁ আওযাজেব ওপর কডাই চাপানো হযেছে—লুচি ভাজা হচ্ছে। এমন-কি মাত্র এই স্বল্প অবকাশেও কোথাও-কোথাও তাসেব আসর বসে গেছে। মেযেবা আছে কিন্তু সংখ্যায় তত বেশি নয়—এ-বকম সব অনুষ্ঠানে মেয়েদের সংখ্যাই যেমন বেশি থাকে, তেমন নয়। তবে লুচি ভাজা, টিনের বাক্স থেকে খাবার বের কবে দেয়া এ-সবেব জন্যে ত মেয়েদেবও দবকাব হয়। কোনো-কোনো ডিলাক্স বাসে মেয়েদেব সংখ্যা বেশ বেশি। সেখানে বড-বড কলসীর সাইজের ফ্লাস্কে চাও আছে, ঠাণ্ডা জলও আছে।

ট্রাক, বাস, গাডি পার্কিঙেব জায়গায় খাবারের গন্ধ ভেসে বেডাচ্ছে, তাব সঙ্গে মিশে আছে একটু-আধটু মদের গন্ধও। কিন্তু খাবারেব গন্ধ এত জটিল যে মদের গন্ধটাও তার সঙ্গে মিশে গেছে—আলাদা করা যাচ্ছে না। অথচ আওয়াজগুলোকে আলাদা করা যাচ্ছে। মেলাব মত খুব হৈ-হৈ নেই—মানুষজন নিজেদের ভেতবই কথা বলছে। সে-আওয়াজ আর-কতটা দূরেই-বা যেতে পারে। দোকানপাটের চিৎকার নেই, গাড়িঘোড়ার আওয়াজ নেই। মানুষজনের গলার স্বরের সঙ্গে ভেসে বেড়াচ্ছে ক্যাসেটে শ্রীদেবীর সব বিখ্যাত গান। ক্যাসেট প্লেয়ারগুলো কাঁধে বা হাতে ঝুলিয়ে লোকজন চলাফেরা করছে বলে এক একটা গানের সঙ্গে অন্য গান চকিতে মিশে আবার আলাদা হয়ে যাচ্ছে। কোনো-কোনো ক্যাসেটে অন্য গানও বাজছে। কেউ-কেউ খালি গলায় এই সব গানের সঙ্গে গলায মেলাচ্ছে। কিন্তু তবুও কোনো হট্টগোল তৈরি হচ্ছে না। এমন-কি ক্যাসেটও কেউ যেন খুব জোবে বাজাচ্ছে না। কিংবা, হয়ত জোরে বাজানো সত্ত্বেও এতটা বড় জায়গা ও এত মানুষজনের ফলে আওয়াজগুলো চাপা পড়ে থাকছে। এত মানুষজন, এত গাড়িঘোড়ার সঙ্গে আজকাল মাইকের আওয়াজটা এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছে, যে, শুধু মাইকটা না-থাকার ফলেই মনে হচ্ছে সব কেমন চুপচাপ।

এই হাজার-হাজার মানুষ অপেক্ষাকৃত শান্ত অনুত্তেজিত হয়ে ঘোরাফেরা করছে, ধীরস্বরে ক্যাসেট বাজিয়ে যাচ্ছে, খাওয়াদাওয়া-তাসখেলার মধ্যেও একটু আনমনা হয়ে আছে, চায়ে বা মদে গলা একটু ভেজালেও তাতে কখনোই মজে যাচ্ছে না, তার কারণ, এই হাজার-হাজার মানুষ একটা স্থায়ী ও অনাটকীয় প্রত্যাশার আবহের ভেতরে ঘোরাফেরা করছে। যদি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কোনো কিছু নিয়ে গড়ে উঠত, তা হলে সেই প্রত্যাশাটাকে এতটা ধীর ও নিশ্চিত লয়ে তাতিয়ে তোলা যেত না—একটা অনিশ্চয়তার উদ্বেগে সে-প্রত্যাশা ফেটে পড়ত। কারণ, শ্রীদেবী এই ভিড়ের প্রায় কারো কাছেই অপরিচিত নয়। শ্রীদেবীর ফিল্ম দেখে, নাচ দেখে এই ভিড় আজকের অনুষ্ঠানে কী দেখতে পারে তা নিশ্চিতভাবেই জানে। এমন-কি, এই ভিড় তার সেই দেখা ও চেনা শ্রীদেবীকেই রক্তমাংসে দেখতে চায়। এমন-কি, যেন শ্রীদেবী যদি এই রাস্তা দিয়ে খোলা গাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে চলে যায়, তাতেও এই

ভিড়েব অনেকটা তৃপ্তি ঘটবে এটুকু জেনে যে শ্রীদেবীর একটি বক্তমাংসেব শবীব আছে। শ্রীদেবী তাব বক্তমাংসের শবীব নিয়েই এই সব মানুষেব কাছে পবিচিত। সেই বক্তমাংসেব শবীর থেকে যে-যৌনতা সিনেমাহলেব অন্ধকাবে ছড়িয়ে পড়ে এই ভিড় সেই যৌনতাব টানেই এসেছে। এই ভিড়েব যেন এ-রকম একটা কাণ্ডজ্ঞানও আছে যে, ছবি থেকে বিচ্ছুবিত যৌনতাব একটা মানবিক উৎস আছে এটুকু জানাই যথেষ্ট। কিন্তু সেই কাণ্ডজ্ঞানেবও সীমা একটা খুব শিথিল আছে। এই ভিড়ের ভেতর এমন একটা অসম্ভবেব প্রস্তুতিও যেন থাকে যে সিনেমাব পর্দা ছাড়াও মঞ্চেব বাস্তবতায় বক্তমাংসেব শ্রীদেবীকে দেখা ত তাব ঐ সিনেমা হলেব অভিজ্ঞতারই সম্প্রসাবণে, তেমনি, হতেও ত পারে শ্রীদেবীব বক্তমাংসেব শবীবকে ছুঁয়ে ফেলা যাবে বা, প্রায় ছুঁয়ে ফেলা যাবে। সিনেমাব পর্দায় শ্রীদেবীর বাহুমূলের ভাঁজ বা পিঠেব তিনকোনা হাড়েব ওপবকাব পেশীব কম্পন পর্যন্ত যাব চেনা, সে সেই শবীরটাকে অতটা স্পর্শাতীত নাও ভাবতে পাবে—যদি সুযোগ পাওয়া যায়। তাই এই ভিড়ের শান্ত বা অনুত্তেজ প্রত্যাশাব ভেতবে একটা হিংস্রতাব ইচ্ছাও যে মিশে থাকে না তা নয়। এতটা শান্ত ও অনুত্তেজিত না থাকলে সেই হিংস্রটাও অনুমান কবা যেত না।

অথবা, সে-হিংস্রতাটাকে সব সময়ই সত্য বলে ধবে নেয়া হয়।

তাই, পুলিশেব পবামর্শ অনুযায়ীই শ্রীদেবী শিলিগুড়িব হোটেল থেকে তাঁর তিন গাড়ি নিয়ে জলপাইগুড়ি হয়ে তিস্তা ব্রিজ দিয়ে ময়নাগুড়িতে এলেন না। কাবণ, এই বাস্তা দিয়েই দর্শকরা আসছে। যে-কোনো জায়গায় গাড়ি আটকে যেতে পাবে, মানুষজন শ্রীদেবীকে চিনে ফেলতে পাবে। শ্রীদেবী ময়নাগুড়িতে এলেন শেবক ব্রিজ হয়ে, ওদলাবাড়ি পাব হয়ে, চালসাব মোড় দিয়ে, লাটাগুড়ির ওপর দিয়ে। কাবণ এই বাস্তাতেই দর্শকদেব গাড়ি সবচেয়ে কম, যা আসছে তাও চা-বাগানেবই। বাস্তাটাও একটু চওড়া, অনেকটা পাহাড়, ফবেস্ট ও চা-বাগান। ফলে হঠাৎ চিনে ফেললেও লোকজন জমে যাওয়াব ভয় ততটা নেই।

শ্রীদেবীব তিনটি গাড়িব প্রথমটিতে তাঁব দেহবক্ষীবা, দ্বিতীয়টিতে তিনি নিজে এবং হয়ত আব-কেউ। সে-গাড়িব কাল কাচ তুলে দেয়া। তৃতীয়টিতে তার অন্যান্য সহকাবীবা, যারা যন্ত্রপাতি বাজাবে, যাবা মেক-আপ দেবে। এই তিন গাড়ি থেকে একটু দূবত্ব রেখে পুলিশের একটা জিপও ছিল।

ময়নাগুড়িব কাছাকাছি এসে পুলিশেব গাড়ি আব-দূবে থাকে না—প্রথম গাড়িটার আগে-আগেই চলে। ময়নাগুড়িব বাস্তায় তখন হাজাব-হাজাব লোক চলছে। পুলিশের গাড়িটা সাইবেন বাজিয়ে দেয়। সেই উচ্চকিত সাইবেনেব আওয়াজেব সঙ্গে মিলে চাব-চারটি গাড়ির হেডলাইট এই রাস্তাভর্তি মানুষজনেব গায়েব ওপব হামলে পড়ে। আব, এত মানুষজন এত বেগে রাস্তার দু পাশে ছিটকে যায় যে গাড়িগুলোকে কোথাও বেগ কমাতেই হয় না। চাব-চারটি গাড়ি সেই একই বেগে অনুষ্ঠানের জায়গায় এসে নতুন তৈবি ক্যালভার্ট দিয়ে প্যান্ডেলেব বাঁ পাশে একেবারে গ্রিনরুমের গেটের সামনে গিয়ে পৌঁছয়। পুলিশের গাড়িটা সবে যায়, তার পেছনে প্রথম গাড়িটাও সরে যায়। দ্বিতীয় কাচতোলা গাড়িটা এগিয়ে আসে। তৃতীয় গাড়িব দবজা খুলে কয়েকজন নামে, নেমে দাঁড়িয়েই থাকে। কেউ বুঝতেই পারে না দ্বিতীয় গাড়িটার দরজা খুলে শ্রীদেবী কখন কোল্যাপসিবল গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে গেছেন। গাড়িগুলো থেকে তখন নানা যন্ত্রপাতি নামাচ্ছে নানা লোক।

একশ সাতাত্তর

শ্রীদেবীর আগমনের প্রতিক্রিয়া

শ্রীদেবী যে এসেছেন এটা বোঝার আগেই শ্রীদেবী গ্রিনরুমের ভেতরে কয়েকটা কোল্যাপসিবল গেটের আড়ালে চলে যান। শুধু সবচেয়ে বাইরেব কোল্যাপসিবল গেটটায় শ্রীদেবীব ব্যক্তিগত দেহরক্ষীদের সঙ্গে উত্তরখণ্ড সম্মিলনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কর্মকর্তাদের একজন দাঁড়িয়ে থাকেন—ভেতরে ও বাইরে আর-সর্বত্রই শ্রীদেবীরই লোকজন। গ্রিনরুমের বা স্টেজের প্রধান দরজা প্যান্ডেলের যে-পুব

দিকে সেদিক দিয়ে প্যান্ডেলেব ভেতরে ঢোকাব কোনো পথ নেই। বাইরের বড় রাস্তার নীচের নালার ওপরে যে-ক্যালভার্টটা দুদিনের মধ্যে বানাতে হয়েছে সেটা দিয়ে শুধু এই পুব দিকটাতেই আসা যায়। এখন এই পুব দিক দিয়ে গিয়ে স্টেজ-গ্রিনরুমের পেছন দিয়ে ঘুরে আবার প্যান্ডেলের পশ্চিমে যাওয়া যায় বটে কিন্তু সেটা অনেক ঘুরপথ। একটা গাড়ি রাস্তার দিকে মুখ করে গ্রিনরুমের প্রধান কোল্যাপসিবল গেটেব সঙ্গে লাগানো। আর একটা যে-ছোট গেট আছে গ্রিনরুম থেকে বেরবার, ঠিক এর বিপরীত দিকে, সেখানেই বাকি দুটো গাড়ি পার্ক করা। কয়েকটি পুলিশ ও একজন অফিসার গোছের ভদ্রলোক এই পুরো এলাকাটাতে ঘোরাফেবা করছে।

গাড়ি তিনটি ও পুলিশের গাড়িটি এই ক্যালভার্ট দিয়ে ঢুকে যাবার ও লোকজন নেমে যাবার পর সারা রাস্তায় একসঙ্গে আওয়াজ ওঠে—'এসে গেছে, এসে গেছে, শ্রীদেবী এসে গেছে।' শ্রীদেবী ঐ ভিড়ের মধ্য দিয়েই এসেছেন, পুলিশের গাড়ি সাইরেনও বাজিয়েছে, লোকজন তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে জায়গাও দিয়েছে—কিন্তু তখন তাবা বুঝতে পাবে নি যে শ্রীদেবীই আসছেন। কাবণ, এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দর্শক হিশেবে আসার পর থেকে লোকজনকে আজ যে-অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে সে-অভিজ্ঞতা তাদের আগে কখনো হয় নি। ফলে, ময়নাগুড়িতে পৌঁছুনোর পর শ্রীদেবী-ব্যাপারটি আর তাদের কাছে প্রধান ছিল না, তাদেব কাছে প্রধান হয়ে ওঠে এই ব্যবস্থাটিই। কোথায় বাস বা ট্রাক দাঁড়াবে, কোথায় নামতে হবে, কখন হাঁটতে হবে, কোথা দিয়ে হাঁটতে হবে, কোথা দিয়ে ঢুকতে হবে ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত ব্যবস্থাটা এমনই প্রাধান্য পেতে থাকে যে লোকজন যেন ভুলেই যায় তারা এখানে একটা বিশেষ অনুষ্ঠানে এসেছে—মাত্র গান শুনতে আব নাচ দেখতে। এ যেন হয়ে দাঁড়ায় সারা দেশের খুব বড় কোনো নেতাব মিটিঙ শুনতে আসার মত ব্যাপার। বাড়ি থেকে বেরনো আব বাড়িতে ফেবা পর্যন্ত সমস্তটাই ঐ মিটিঙের উদ্যোক্তাদের ব্যাপাব—তার সঙ্গে মিছিলের বা মিটিঙেব লোকের কোনো সম্পর্ক নেই। যে-রাস্তায় আজ যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ সে-রাস্তায় যখন তিন-তিনটি গাড়ি ও পেছনে-পেছনে একটা পুলিশের গাড়ি একই গতিতে ছুটে আসে আব লোকজনকে মুহূর্তে সরে গিয়ে জায়গা করে দিতে হয়, তখন সে-গাড়িতে আব-কে থাকতে পারে, একমাত্র সেই ব্যক্তি ছাড়া যার জন্যে এই রাস্তায় বাকি যানবাহন আজ নিষিদ্ধ, যার জন্যে এই রাস্তায শুধু মানুষ আর মানুষ? এই সোজা হিশেবটি আর মানুষের মাথায ঢোকে না।

কিন্তু একবার যখন রটে যায় যে শ্রীদেবী এসে গেছেন, তখন রাস্তায় একটা হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। রাস্তায় এমনিতে কোনো লাইন ছিল না—সকলেই যে-যাব মত হেঁটে যাচ্ছে। প্রায সব রাস্তাই কার্যত ওয়ান ওয়ে হয়ে গেছে বলে লোকজনের কোনো ধাক্কাধাক্কিও নেই। আসামের রাস্তার লোকজন আসছে পুব থেকে পশ্চিমে। তিস্তাব্রিজের রাস্তার লোকজন আসছে পশ্চিম থেকে পুবে। আর ডুয়ার্সের বাস্তায় লোকজন আসছে উত্তর থেকে দক্ষিণে।

কিন্তু সবাইকেই ত ব্লক অফিসের ক্যালভার্টটা দিয়ে সম্মিলনের মাঠে ঢুকতে হচ্ছে। সম্মিলনের তিনটি গেট থেকে লাইন রাস্তায় বহু দূর পর্যন্ত গেছে। রাস্তার লোকজনকেও লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে। ফলে রাস্তায় যাবা হেঁটে একমুখো আসছে তাবাও আসলে পাঁচ-ছ জনের সারির একটা লাইনেই থাকে। শ্রীদেবী এসে গেছে বটে যাওয়ার পর রাস্তার ওপরের এই লাইনগুলোতে ঠেলাঠেলি পড়ে যায় যেন, এখানে ঠেলাঠেলি করলে তাড়াতাড়ি প্যান্ডেলের ভেতরে ঢুকে যাওয়া যাবে।

এত মানুষ যেখানে সেখানে সামান্য ঠেলাঠেলিতেই একটা হুল্লোড় বেধে যায়। কিন্তু প্যান্ডেলের কাছে ও রাস্তায় পুলিশ অফিসাররা খুব দৌড়োদৌড়ি করছিলেন। এক জায়গায় একটু ধাক্কাধাক্কি শুরু হতেই তাঁরা তিনজন ব্যাটনগুলো ধরে দাঁড়িয়ে পড়ে লোকজনকে ঠেকিয়ে দেন, তারপর ঠেলে একটু সরিয়েও দেন। ডি-এস-পি সাহেবও সেখানে পৌঁছে যান। তিনি জিজ্ঞাসা করেন—'পুলিশের মাইকটা কোথায়?'

'সে ত পেট্রল পাম্পে স্যার, ঐ দিকে।'

ডি-এস-পি নিজেই দৌড়ে চলে যান। এ-দিকের ধাক্কাধাক্কিটা অবিশ্যি থেমে যায়—লোকজন আবার চলতে শুরু করে। একটু পরে মাইকে শোনা যায়—'পুলিশের পক্ষ থেকে বলছি। আপনারা হুড়োহুড়ি করবেন না। লাইন ভাঙবেন না। লাইন রাখুন। আপনারা প্রত্যেকে নিজেদের জায়গায় বসার আগে অনুষ্ঠান শুরু হবে না। আপনারা ঠেলাঠেলি করলে আপনাদেরই ঢুকতে দেরি হবে।' এরপর গলাটা

একটু ওঠে. প্রায় চিৎকার করে বলা হয়, 'গেটে যাঁরা টিকিট চেক করছেন তাঁরা তাড়াতাড়ি কাজ করুন, দেরি করবেন না. রাস্তায় ভিড় জমে যাচ্ছে, গেটে যাঁরা টিকিট চেক করছেন তাঁরা তাড়াতাড়ি কাজ করুন, দেরি করবেন না, রাস্তায় ভিড় জমে যাচ্ছে।'

পুলিশের নাম শুনেই লোকজন ঠেলাঠেলিটা বন্ধ করেছিল। টিকিট তাড়াতাড়ি দেখে দেয়ার নির্দেশে লোকজন যেন আশ্বস্ত হয় যে পুলিশ তাদের তাড়াতাড়ি প্যান্ডেলের ভেতরে ঢোকাতেই ব্যস্ত।

ডি-এস-পি সাহেব পুলিশের গাড়ি থেকে নেমে আবার সেই জটলার কাছে আসেন—ব্লক অফিসের ক্যালভার্টের ওপরে যেখানে তিন দিক থেকে আসা লোকজন মিলছে। সেখানে ইতিমধ্যে আরো দু-জন সেকেন্ড অফিসার এসে গেছেন। তাঁরা তিনদিকের লোকজনকে একটা লাইনে ফেলে ছাড়ছেন আর মাঝে-মাঝে এক-একদিকের লোক আটকাচ্ছেন। ডি-এস-পিকে দেখে একজন বলে ওঠেন, 'স্যার, স্যার, এখনো এত লোক বাইরে, যদি তাড়াতাড়ি না ছাড়ে তা হলে ত এখানে আটকে যাবে।'

ডি-এস-পি বলেন, 'দাঁড়াও, আমি গেছে দেখছি, দাঁড়াও, আমি এসে বলছি। ডি-এস-পি ঐ লাইনের পাশ দিয়ে, ভেতর দিয়ে, মাঠের মধ্যে পৌঁছে যান। তিনি সবচেয়ে শেষের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকতে গেলে গেটের ছেলেটি তাঁকে না দেখে আটকায় আর গেটের কনস্টেবলটি ছেলেটির হাত তুলে দেয়। ছেলেটি দেখেই 'সরি স্যার' জিভ কাটে। 'তাড়াতাড়ি করুন, তাড়াতাড়ি করুন', বলে ডি-এস-পি ভেতরে ঢোকেন জায়গার অবস্থা দেখতে। তাঁকে দেখে নকুল রায়, বটুক বর্মন ছুটে আসে।

'শুনুন, আপনারা আমাদের যা একাউন্ট দিয়েছেন তার বাইরে কোনো টিকিট বাজারে ছাড়েন নি ত?' ডি-এস-পি জিজ্ঞাসা করেন।

'না, স্যার। এ-কথা জিগেস করছেন কেন স্যার?' নকুল বলে।

'না, না, অন্য কারণে না। বাইরে লোক ত দেখেছেন, এ্যাকমোডেশন হয়ে যাবে ত?'

'হ্যাঁ, স্যার এখনো ত অর্ধেক প্যান্ডেল খালি স্যার! আমরা ত স্যার আপনাদের স্কোয়ার ফুটের হিশেব দিয়েছি স্যার, প্ল্যান জমা দিয়েছি স্যার।'

'আরে মশাই, সে-সব আপনাদের কে জিগেস করছে। বাইরে লোকজন একটু ইমপেশেন্ট হয়ে পড়তে পারে, কত দূর-দূর থেকে এসেছে, তাই বলছিলাম আপনারা জায়গার তুলনায় যদি আমাদের গোপন করে বেশি টিকিট ছেড়ে থাকেন তবে কিন্তু কেলেংকারি হবে। আপনাদের ত সিট নাম্বার নেই?' ডি-এস-পি বলেন।

'না স্যার, আপনাকে সত্যি বলছি স্যার আপনাদের যা বলেছি সেই টিকিট ছেড়েছি স্যার। এ রিস্ক স্যার কে নেবে?' নকুল প্রায় ডি-এস-পির হাত ধরে। ডি-এস-পি বলেন, 'তা হলে টিকিট পাঞ্চ করছেন কেন? প্রত্যেককে টিকিট হাতে তুলে দেখিয়ে ঢুকে যেতে বলুন—তা হলে দেখবেন বাইরের প্রেসারটা কমে যাবে।'

নকুল বটুকের দিকে তাকায়। বটুক বলে, 'স্যার, ভেতরে ঢুকে যদি টিকিট বাইরে পাঠিয়ে দেয়?'

'আরে, কেউ ঢুকতেই পারছে না মশাই আর টিকিট বাইরে পাঠিয়ে দেবে? আমরা এ্যানাউন্স করে দিচ্ছি কাউকে বাইরে বেরতে দেয়া হবে না। আপনারাও এ্যানাউন্স করে দিন।'

'আপনারাই যা করার করেন স্যার। আমাদের ত স্যার স্টেজে উঠতেই দেবে না।' নকুল বলে।

'কে দেবে না?'

'স্টেজ ত এখন স্যার শ্রীদেবীর কন্ট্রোলে, কাউকে ঢুকতে দেবে না স্যার', বটুক বোঝায়। ডি-এস-পি হেসে বলেন, 'আপনাদের এখান থেকে শ্রীদেবীর কী দেখা যাবে আর?'

'থার্ড ক্লাশ থেকে স্যার ওর বেশি দেখা যায় না,' নকুল হে-হে করে হাসে। ডি-এস-পি বলেন, 'তা হলে গেটকে বলে দিন শুধু টিকিটটা তাকিয়ে দেখে ছাড়তে, আমরা বাইরে মাইকে বলে দিচ্ছি।'

নকুল, বটুক আর ডি-এস-পি বাইরে বেরিয়ে যান। ডি-এস-পি আবার লোকজনের ভেতর দিয়ে-দিয়ে পথ করে নিয়ে রাস্তায় উঠে যান। তারপরই মাইকে শোনা যায়, 'পুলিশের পক্ষ থেকে বলছি। যাঁরা গেটে টিকিট পাঞ্চ করছেন তাঁরা টিকিট পাঞ্চ করবেন না। দর্শকদের হাতে টিকিট দেখে ছেড়ে দিন।' এই ঘোষণার সঙ্গে-সঙ্গে একটা আওয়াজ ওঠে। সেটা থেমে গেলে মাইকে আবার শোনা যায়, 'দর্শকদের কাছে অনুরোধ। আপনারা আপনাদের হাতে টিকিটটা উঁচু করে ধরে নির্দিষ্ট গেট দিয়ে প্রবেশ করুন যাতে যাঁরা টিকিট দেখছেন, তাঁরা দেখতে পান।' এই ঘোষণার সঙ্গে-সঙ্গে আবার একটা

সমবেত আওয়াজ ওঠে—সমর্থনেব। মাইকে শোনা যায়, 'লাইন ভাঙবেন না, হুড়োহুড়ি করবেন না, নিজেব টিকিট নিজেব হাতে উঁচু করে ধবে নির্দিষ্ট গেট দিয়ে প্যান্ডেলে ঢুকুন। প্যান্ডেলে ঢোকাব পব কাউকে বেবতে দেযা হবে না। মনোযোগ দিয়ে শুনবেন, প্যান্ডেলে ঢোকার পর কাউকে বেরতে দেযা হবে না।'

এই ঘোষণাব কিছুক্ষণের মধ্যেই লাইনটি বেশ তাড়াতাড়ি এগতে থাকে। ঘোষণার পর লোকজনেব মধ্যে দু-ধবনের ব্যস্ততা দেখা যায়। বড়-বড দলে যারা এসেছে বা শুধু বাড়ির লোকজন নিয়েও যারা এসেছে, তাবা সব টিকিট একজনেব কাছে জমা বেখেছিল। এই ঘোষণা শুনে যাব-যার টিকিট তাব-তাব হাতে দেয়া শুরু হযে যায়। এত হাজার-হাজাব লোকেব হাতে টিকিট বিলি একটা ঘটনা ত বটেই। আর, প্যান্ডেলে ঢুকলে আব বেবতে দেযা হবে না শুনে হঠাৎ-হঠাৎ লাইন ভেঙে পেচ্ছাব করতে রাস্তার ধারে দাঁড়িযে পডা বা বসে পডা শুরু হয। এত হাজার-হাজার মানুষেব মধ্যে এ-হিড়িক পডলে সেটাও একটা ঘটনা বটে।

একশ আটাত্তর

শ্রীদেবী : চেনা ও অচেনা

শ্রীদেবীর নাচের অনুষ্ঠানটা শুরু হযে যায় কিন্তু খুব সহজ ভাবে। শুরুব ধরন দেখে মনেই হয না যে এই অনুষ্ঠানের জন্যে গত মাস দুই ধরে এত প্রচাব, বাংলা-বিহাব-আসাম জুড়ে দর্শকদেব আসাব নানা আয়োজন, প্রায় মাসখানেক ধবেই বাজনৈতিক স্তবে ও প্রশাসনেব স্তবে মিটিঙ, কলকাতা থেকে মন্ত্রীদের আসা আর এখন এই প্রায় লক্ষ দর্শকের উপস্থিতি। অনুষ্ঠানেব শুরু দেখেই হতাশ হওযাব জন্যে ত এত দর্শক আসে নি, তাই দর্শকবা হতাশ হয় না নিশ্চয়ই। শুরু থেকেই এই সমস্ত দর্শক শ্রীদেবীকে তাদেব মধ্যে পেয়ে যাবে—এমন একটা আবহ হযত আলাদা-আলাদা ভাবে কোনো-কোনো দর্শকগোষ্ঠীর মধ্যে ছিল। কিন্তু এই প্যান্ডেলের ভেতব বসাব পর দেখা যায দর্শকদেব একটা বেশ বড অংশই রাজবংশী ও চা-বাগানের মদেশিয়া। এদের মধ্যে শ্রীদেবী সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট প্রত্যাশা ছিল না, ফলে শুরু দেখে তারা হতাশ হয় নি। সেই কাবণে, অনুষ্ঠান শুরু হওযাব সঙ্গে-সঙ্গেই প্যান্ডেলটা চুপ করে যায়। সেই নীরবতার মধ্যে কিছু সম্ভ্রমও ছিল।

বোধ হয়, এ-ধরনের অনুষ্ঠান নানা জায়গায় নানা ধরনের সমাবেশে কবতে-কবতে অনুষ্ঠানেব প্রধান শিল্পী, যিনি পয়লা নম্বরেব ফিল্মস্টার ও হিন্দি ফিল্মে যাঁকে যৌন বিষযেব সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয, একটা পদ্ধতি-প্রক্রিয়া তৈরি করে ফেলতে পেরেছেন। তাই তাঁব প্রথম চেষ্টা হয, তাঁকে ঘিরে দর্শকদেব মধ্যে যদি কোনো জ্বরের মত তাপ তৈরি হয়ে থাকে, সেটাকে নষ্ট কবা।

স্টেজটার পর্দা খুলে যাওয়ার পর ধীরে-ধীরে খুব কম আলো দর্শকদেব বাঁ দিক থেকে স্টেজের পেছনে দর্শকদের ডান দিকে পড়ে। পুরো স্টেজটা কিছুক্ষণ খালি পডে থাকে শুধু এই গবাক্ষ পথে আসা আলোটুকু নিয়ে। সেই সময়টুকু জুড়ে দর্শকরা ধীরে-ধীরে চুপ করতে থাকে ও যে যাব দেখাব রাস্তা ঠিক করে নেয়। ঠিক যখন মনে হতে শুরু করেছে যে স্টেজে দেখার কিছু নেই তখনই একটি ঘুঙুরের আওয়াজ শোনা যায়। তারপর একটি মেয়ের প্রবেশ অনুসরণ করতে-কবতে বোঝা যায স্টেজে এতক্ষণে আবছা একটা আলোও ফুটে উঠেছে যে-আলোতে মেয়েটি দৃশ্যমানা হয়ে উঠছে। মেয়েটিকে দেখেই প্যান্ডেলে শ্বাসপতনের আওয়াজ হয়। কিন্তু এই দর্শকদের ভেতর ত এমন কয়েক হাজার আছে যারা শ্রীদেবীর দৈর্ঘ্য জানে, শ্রীদেবীর হাঁটার ছন্দ চেনে। তাদের প্রতিক্রিয়াতে বাকি সবাই মুহূর্তে বুঝে যায়, এ মেয়েটি শ্রীদেবী নয়। কিন্তু সেই জানাটুকুসহই সবাই দেখে মেয়েটি সেইখানে হাঁটু গেড়ে বসে যেখানে এতক্ষণ আলো ফেলে রাখা হয়েছিল। সে একটা দেশলাই কাঠি জ্বালে, তাতে একটি প্রদীপ জ্বলে ওঠে, স্টেজের আলো একটু বেড়ে যায় আর দেখা যায় মেয়েটি নটরাজের ছোট মূর্তির সামনে প্রদীপ জ্বালাচ্ছে। প্রণাম সেরে মেয়েটি প্রায় পূর্ণ আলোকিত মঞ্চ ছেড়ে চলে যায়, ঘুঙুরের আওয়াজ

তুলতে-তুলতেই। আর, সে-আওয়াজ মিলিয়ে যেতে দেয়া হয়। কিন্তু সম্পূর্ণ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই আর-একটা ঘুঙুরের আওয়াজ স্পষ্ট হতে থাকে—কেউ হেঁটে আসছে। দর্শকদের বাঁ দিক থেকে স্টেজের একেবারে সামনে দিয়ে ঢুকে শ্রীদেবী দর্শকদের দিকে একবারও না তাকিয়ে কোনাকুনি স্টেজটা হেঁটে পার হয়ে গেলেন স্টেজের পেছনে দর্শকদের ডান হাতি কোণে, যেখানে প্রথমে আলো পড়ে ছিল অনেকক্ষণ, পরে, প্রদীপ জ্বালানো হয়েছিল। সেখানে শ্রীদেবী হাঁটু গেড়ে বসে কোমর থেকে মাথা মাটির ওপর হেলিয়ে নটরাজকে প্রণাম করেন। তাঁর প্রণামের ভঙ্গি জুড়ে, স্টেজের আলো কমে আসে কিনা বোঝা যায় না, কিন্তু তাঁর লম্বা পিঠটুকু জুড়ে একটা অতিরিক্ত আলো মাথা দিয়ে গলে হাতটুকু দিয়ে মাটিতে মিশে যায়। লম্বা বেণীটা তাঁর গলা থেকে ডাইনে দর্শকদের দিকেই পড়ে থাকে।

ফিল্মে-ফিল্মে যারা শ্রীদেবীকে চেনে, তারা তাঁর এই হাঁটার ভঙ্গি, তাঁর ডান হাতটা হাঁটার সময় কনুইয়ের কাছে একটু ভাঁজ ফেলে যে শরীরের বাইরে থাকে, তাঁর শরীরের উর্ধ্বাঙ্গ যে হাঁটার তালে-তালে একটু-একটু দোলে, তিনি প্রণাম করার সময় যে এ-রকম বেণী লুটিয়েই প্রণাম করেন—এ-সবই চেনে। ফলে শ্রীদেবী ঢোকামাত্র তারা শ্বাস বন্ধ করে প্রায় মিলিয়ে নেয় ফিল্মের প্রাণহীন শরীরের চলাফেরা এই প্রাণময় শরীরে সবটুকুই উপস্থিত।

প্রণাম সেরে উঠে শ্রীদেবী স্টেজের মাঝখানে এসে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে ঘাড়ের একটা ভঙ্গিতে লম্বা বেণীকে পিঠে ফেলেন—এ ভঙ্গিটাও কতবার চেনা। তখন স্টেজের সব আলো জ্বলে উঠেছে, একটুও ছায়া নেই। শ্রীদেবী দুই হাতে নমস্কার করে একটু হাসেন। সেই হাসিটা সহই তিনি দর্শকদের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে তাকান—বাঁয়ে, ডাইনে, বাঁয়ে, ডাইনে ও নমস্কার করেন। শ্রীদেবীর দিঘল চেহারার ওপর ছোট মুখটাতে ছোট ঠোঁটে হাসিটা খুব খোলামেলা নয়। কিন্তু এই যে-হাসিতে মুখটা ছড়িয়ে যায় না, সেই হাসিটাতেই তিনি তাঁর দর্শকদের এত পরিচিত। সেই পরিচয়ের কথা মনে পড়িয়ে দিতেই শ্রীদেবী তাঁর খুব পরিচিত আর-একটা ভঙ্গিতে মাথাটাকে একটু হেলান, কপালে কয়েকটা ভাঁজ ফেলেন, যেন ঐ ভঙ্গি দিয়ে দর্শকদের জানাতে চাইছেন, আরে, আমিই, আমিই। দর্শকরা হাততালি দিয়ে ওঠেন, হাততালি যেন থামতে চায় না। শ্রীদেবী দুই হাত ওপরে তুলে থামাতে বললে হাততালি আরো বেড়ে যায়। তখন তিনি দুই হাত দুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে ছোট্ট একটা কাঁধঝাঁকুনি দেন—'মিস্টার ইন্ডিয়া'তে এ-রকম কাঁধঝাঁকুনি তিনি প্রায়ই দিয়েছেন। দর্শকদের হাততালি বেড়ে ত যায়ই, তার সঙ্গে হাসি মেশে, বেশ উচ্চকিত হাসি। যেন তারা এতক্ষণে পেয়ে গেছে, ছবিতে-ছবিতে তাদের এত পরিচিত নায়িকাটিকে পেয়ে গেছে। আর এটাই যেন শ্রীদেবীর প্রাথমিক দায় ছিল—দর্শকদের চেনা ফিল্মের শ্রীদেবীর সঙ্গে নিজেকে মেলানো। তারপরই তিনি স্টেজ থেকে চলে যান। হাততালিও ধীরে-ধীরে কমে আসে। সম্পূর্ণ থেমে যাবার আগেই মাইকে একটু গম্ভীর গলায় ঘোষণা করা হয় যে শ্রীদেবী প্রথমে আপনাদের সামনে ভরতনাট্যম পেশ করবেন। এই ঘোষণার সঙ্গে-সঙ্গেই মাইকে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি শুরু হয় আর শ্রীদেবী মাথায় মুকুট পরে পোশাক সামান্য বদলে মঞ্চে ঢোকেন।

শ্রীদেবী প্রথম প্রবেশ, নটরাজ প্রণাম ও নমস্কারের নানা ভঙ্গির মধ্যে দিয়ে দর্শকদের স্মৃতি জাগিয়ে দিয়েছিলেন, এবার ভরতনাট্যমের নানা ভঙ্গি দিয়ে স্মৃতির সেই পরিচয় নষ্ট করতে লাগলেন। কোনো-কোনো ফিল্মে শ্রীদেবী ভরতনাট্যম নেচেওছেন হয়ত, কিন্তু দর্শকদের সঙ্গে তিনি তাঁর ভরতনাট্যম দিয়ে বাঁধা নন, যেমন ছিলেন একসময় বৈজয়ন্তীমালা, বা তার পরে এমন-কি হেমামালিনীও। ফলে ভরতনাট্যমের নান্দীমুখ থেকেই যতই তিনি অভিনয়ের প্রবলতার মধ্যে ঢুকছিলেন ও মাইকের তবলা-মৃদঙ্গবাদ্য ও বোলের সঙ্গে-সঙ্গে নিজের ক্ষমতার জোর দেখাচ্ছিলেন, ততই এই দর্শকদের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে সম্ভ্রম তৈরি হচ্ছিল। প্রথম পরিচয়ে নিজেকে দর্শকদের কাছে তাদের পরিচিত নায়িকা হিশেবে প্রতিষ্ঠিত করে প্রথম কর্মসূচিতেই তিনি নিজেকে আলাদা করে নেন। সিনেমায় তাকে একই নাচের রকমফেরে বারবার দেখে-দেখে, তার শরীরের নানা প্যাঁচঘোঁচ বারবার দেখে-দেখে যে-দর্শক তার যৌনতাকেই প্রধানত বা একমাত্র চিনে নিয়েছে, সেই দর্শক এই ভরতনাট্যম দেখে হতাশ হবে। ভরতনাট্যমটা বেশ খানিকক্ষণ ধরেই হয়। কিন্তু কোনো সময়ই একঘেয়ে হয় না—শ্রীদেবী এতই পরাক্রমে আলোময় স্টেজটাকে দখল করে রাখেন। সেই পরাক্রম দেখানোর সময় তিনি যেন প্রতিশোধের মত করে দর্শকের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে যা কিছু স্মৃতি আছে সব কিছুকে মুছে দেন—যে-শ্রীদেবীকে তোমরা দেখো আমি সে শ্রীদেবী নই।

কিন্তু শ্রীদেবী নাচতে-নাচতে স্টেজেব বাইরে চলে যান না। নাচটা তিনি স্টেজের ওপরই থামান। থামান, স্টেজের পেছন দিকে। তারপর, সেখান থেকে হাঁফাতে-হাঁফাতে হাঁটতে-হাঁটতে আসেন স্টেজের একেবারে সামনে। একটু দাঁড়িয়ে থাকেন। সবাই দেখে, যেমন অনেক ফিল্মেই দেখেছে, বড চেনা শ্রীদেবীকে—ঘামছেন, বুক ওঠানামা করছে, ঠোঁটটা একটু ফাঁক, কপালে চূর্ণ চুল। ভরতনাট্যমেব বাধা ভেঙে ফেলে দর্শকদের শ্রীদেবীসংক্রান্ত স্মৃতি হুহু কবে ফিবিয়ে এনে নমস্কার করে শ্রীদেবী স্টেজ থেকে চলে যান।

একশ উনআশি

শ্রীদেবী কতটা দেখান

এত-এত টাকার টিকিট কিনে এত কাছ ও দূর থেকে যারা শ্রীদেবীর নাচ বা শ্রীদেবীকেই দেখতে এসেছে, আর এত টাকা খাটিয়ে যারা শ্রীদেবীকে দেখানোর অনুষ্ঠান কবছে তাবা ত আব মাত্র কিছু সময়ের এই কার্যসূচিতে আসল শ্রীদেবী তাদের চেনা শ্রীদেবী থেকে কত আলাদা তা দেখতে বা দেখাতে চায় না—তারা ছবির শ্রীদেবীকে বক্তমাংসেব হিশেবে মিলিয়ে নিতে চায়। সেই মিলিয়ে নেয়া কতটা সম্ভব তা জানা নেই, জানা নেই বলে ইচ্ছেটাই প্রবল। শ্রীদেবীরও নিশ্চয় এ হিশেবটা খুব ভাল জানা। তিনি যদি নিজেকে ছবির সঙ্গে মিলিযে দিতে না পারেন তা হলে ছবির বাইরে এই লাখ-লাখ টাকার অনুষ্ঠানেব অর্ডার তিনি পাবেন কেন ? কিন্তু ছবির পর্দায় যা দেখানো যায় তা ত আর স্টেজে সকলের চোখেব সামনে দেখানো যায় না। তাঁবও কখন কোন নাচটি নাচবেন, তাব হিশেব আছে। সেই হিশেব হল দর্শককে একটু চিনিয়ে দেয়া, আর একটু অচেনা রাখা। মাত্র এইটুকু সময়েব একটা অনুষ্ঠানে দর্শক তাব নিজের মত করে বুঝে নেবে—ক্যামেবার লেন্স দিয়ে শ্রীদেবীব যতটা দেখা যায়, ফিরে-ফিরে দেখা যায়, নিজের দুটো চোখ দিয়ে ততটা দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু দর্শককে ত সেই লোভের জায়গা পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে যাতে তাবা বোঝে ফিল্মের শ্রীদেবী আরো কত লোভনীয়। তাতে শ্রীদেবীর ফিল্মগুলো হিট হবে, সুপার হিট হবে, সুপাব-সুপার হিট হবে। ফিল্মেব পর্দা থেকে মঞ্চে দেখাব লোভ জাগানো, আর মঞ্চ থেকে ফিল্মের পর্দায় দেখার লোভ জাগানো—এর ভেতরেই শ্রীদেবীর নিজেকে দেখানোব হিশেব-নিকেশ কাজ করে।

ভরতনাট্যমেব পর একটু বিরতি যায়, পর্দা অবিশ্যি পড়ে না। তাবপরেই স্টেজেব নিজস্ব মাইক্রোফোনে গান বেজে ওঠে, 'হাওয়া খাওয়া ই'। বেজে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গেই হাততালি, চিৎকার, দু-চারটে সিটি—'মিস্টার ইন্ডিয়া'র গান। দর্শকদের চোখের সামনে 'মিস্টাব ইন্ডিয়া' শ্রীদেবীর সেই দৃশ্যটি ভেসে ওঠে যাতে মনে হচ্ছিল শ্রীদেবী কাল একটা ব্রার ওপর দিয়ে গোলাপি একটা ওড়না ফেলে পর্দা জুড়ে ওড়াচ্ছিলেন। ছবির গানটিতে শ্রীদেবীর কথার পর বাচ্চারা কোরাসে 'উই উই উই উই উই' আওয়াজ করে ওঠে। মাইক্রোফোনের গানটিতে সেই জায়গাটি আসতেই, তখনো শ্রীদেবী মঞ্চে ঢোকেন নি, দর্শকরা কোরাসে গেয়ে ওঠে, 'উই উই উই উই উই'। আর, সঙ্গে-সঙ্গে স্টেজের একেবারে সামনে দিয়ে শ্রীদেবী গোলাপি ওড়না উড়িয়ে নেচে যান—'হাওয়া খাওয়া ই।' আবার হাততালি, চিৎকার ও সিটি। সেটা শেষ হতে না-হতে শ্রীদেবীর স্টেজে দু-চক্কর ঘোরা হয়ে যায়। দর্শকরা একটু ঠাণ্ডা হয়ে যেন তাড়াতাড়ি দেখে নিতে চায় ফিল্মের মতই মঞ্চেও শ্রীদেবীর কাল ব্রাটা দেখা যাচ্ছে কিনা। কিন্তু নানা জায়গায় বসে নানা দর্শক একই ব্রা একই রকম ভাবে দেখবে কী করে ? অথচ যে যার জায়গায় বসে ঐ ব্রাটুকুই খুঁজতে চায়—তার ওড়নার আড়াল থেকে কাল কাপড়ের সীমানায় তার গলাটুকু যে দেখা যায়ও। কিন্তু এ-নাচটি ত ছোটাছুটির নাচ। শ্রীদেবীর সারা স্টেজ জুড়েই ছুটছেন। ফিল্মে যেমন মনে হয়েছিল সেই হলঘর, বাগান সব কিছুর ওপর দিয়েই শ্রীদেবী উড়ে বেড়াচ্ছেন—'হাওয়া খাওয়া-ই', আর তার সঙ্গে-সঙ্গে বাচ্চারাও সমবেত স্বরে 'উই-উই-উই' করে উঠছে, এখানে তেমনি শ্রীদেবী পুরো মঞ্চটা জুড়ে ছুটছেন, উড়ছেন। মঞ্চের ওপরের অংশটাতে তাঁর গোলাপি ওড়না উড়তে থাকে, উড়তে-উড়তে আবার তাঁর কাছে চলে আসে। ফিল্মে শ্রীদেবীর ছোটাছুটিটাকে এত স্পর্শগ্রাহ্য মনে হয়

নি, যদিও তাঁর কাল ব্রাটি অনেক বেশি দৃশ্য ছিল। দর্শকরা সমবেত স্বরে বাচ্চাদের 'উই উই উই' করে ওঠে আব শ্রীদেবী দর্শকদেব দিকে ঘাড বেঁকিয়ে বাহবা দিয়েই পরের লাইনকটি নাচেন।

ঐ দ্রুততাতেই নাচটা শেষ করে দিয়ে শ্রীদেবী মঞ্চ থেকে চলে যাওয়া মাত্রই আবার হাততালি, চিৎকার, সিটি। দর্শকবা গবম হয়ে উঠছে। চিৎকার থামে না। নানা জায়গা থেকে আওয়াজ ওঠে, 'সোলভা সাঁওন,' 'নগিনা', 'মিস্টার ইন্ডিয়া'। সে সব চিৎকার থামতে না-থামতেই স্টেজের মাইক্রোফোনে একটা গানেব মুখ যন্ত্রে বেজে ওঠে। একটু হতচকিত বিশৃঙ্খলা হাততালি পডতে-পডতেই গানেব মুখটাব সঙ্গে-সঙ্গে ঘাঘবা পরা শ্রীদেবী মঞ্চে লাফিয়ে ঢুকে একটা চক্কর মেরে দেন—ঘাঘবা ফুলে ওঠে, শ্রীদেবীব গায়েব চুমকি বসানো জামা ঝলসায় আর ঘোমটা হিশেবে চুলের সঙ্গে ঝোলানো ওডনা বাতাসে ওডে। 'আউলাদ' 'আউলাদ'—চিৎকার করে দর্শকরা জানিযে দেন যে তাঁবা চিনতে পেরেছেন। শ্রীদেবী একটা ছোট্ট লাফে দর্শকদেব দিকে মুখ কবে দাঁডান, বাঁ পাটা এগিয়ে দেন, ঘাঘবাটা ঘেব খায়, আব শ্রীদেবী বাঁ হাতেব তালুর ওপব ডান হাতেব তালু রেখেই আবার একটা পাল্টা পাক খান। 'আউলাদ' ফিল্মেব প্রথম দিকে বাস্তায় নেচে-নেচে সওদাবেচাব দৃশ্য আছে। মঞ্চে বাস্তা নেই, সওদা নেই কিন্তু শ্রীদেবীব পোশাকটা এবাব অবিকল ফিল্মেব মতই। চুমকি বসানো জামায় আলো ঠিকরে পডছে। শ্রীদেবী যখন স্টেজেব উইঙ থেকে উইঙে যাচ্ছেন দর্শকদেব দিকে নিজেব শবীবেব পার্শ্ববেখাটিকে ধবে বেখে আব মুখটা কখনো শবীবেব বেখাব সঙ্গে মিলিযে, কখনো মুখটাকে শরীব থেকে সমকোণে দর্শকদেব দিকে ঘুবিযে, তখন, বুকেব ওপব থেকে চুমকি চমকায়, সেই চমকে সেই বুকেব দোলন বোঝা যায়। দর্শকবা প্রবল হাততালিতে ফেটে পডে। দর্শকদেব হাততালি দেওয়াব ক্ষমতা শেষ কবে দিতেই যেন শ্রীদেবী আবাব বিপবীত উইঙ থেকে ঘুরে আসতে শুরু করেন। দর্শকবা যেন তাদেব ইচ্ছে অনুযায়ী দেখে নিতে পাবে, যতটা ইচ্ছে ততটা। সেই হাঁটাটুকু শেষ হয়ে গেলেই শ্রীদেবী একলাফে পেছন থেকে এগিয়ে আসেন, তার পব দুটো পাক খেয়ে স্টেজেব একেবাবে সামনে এসে দর্শকদেব মুখোমুখি দাঁডিয়ে পড়েন। তখন সেই ফেবিওযালিব গানেব দ্রুত লয়েব সঙ্গে তাল বেখে শ্রীদেবীব বুকদুটো দর্শকদের সামনে ওঠে, নামে। দর্শকবা যেন এতটা আশাই কবে নি। তাবা ভুলে যায়—ফিল্মটাতে এতটাই ছিল কিনা, এ যেন ফিল্ম থেকেও বেশি। শ্রীদেবী তাব নমনীয় দীর্ঘ শবীবকে আনত কবে গানেব তালে-তালে তালি দিতে-দিতেই উইঙ দিযে বেবিযে যান। সঙ্গে-সঙ্গে দর্শকদের বেশির ভাগই উত্তেজনায দাঁডিযে উঠে হাততালি দিতে-দিতে প্রায যেন নেচেই ওঠে। কেউ-কেউ চিৎকাব কবে শ্রীদেবীব গানটাই হাততালি দিয়ে-দিয়ে গেয়ে ওঠে, কেউ-কেউ অবাব সেই হাততালির সঙ্গে মিলিযে নেচে ওঠে। সেখানে নাচেব সঙ্গে-সঙ্গে আবাব হাততালি পডতে থাকে। মনে হয়, অনুষ্ঠান যেন ভেঙেই গেল। কিন্তু এই সবই হতে থাকে প্যান্ডেলেব ভেতবে, প্যান্ডেল থেকে কেউ বাইবে যায না। বাজবংশী মেযেদেব ভেতব কেউ-কেউ খানিকটা বিহ্বল হযে দর্শকদেব এই হাততালি, গান আব নাচ দেখতে থাকে। তাদেব চোখেমুখে, ভয যদি নাও হয়, একটু অনিশ্চযতা দেখা যায় যেন। মঞ্চে আলো, গান, নাচ—এটা তাবা বুঝতে পাবে। কিন্তু দর্শকদেব নাচ-গান বুঝতে পারে না। ববং চা বাগানেব মদেশিযা মেযেবা দর্শকদের নাচ দেখে খিলখিল হেসে এ ওব গাযে গড়িয়ে পড়ে, তাদেব মধ্যে কেউ-কেউ হাততালিও দিয়ে ফেলে।

এই অবকাশে পুলিশেব লোকজন আব উদ্যোক্তারা মিলে প্যান্ডেলের একেবারে পেছনের টিনের বেড়াটা দ্রুত খুলতে শুরু কবে। তাতে আওযাজও হতে থাকে—টিন থেকে পেরেক খোলার আওয়াজ। দর্শকদের নাচগান তাতে থেমে যায়। দর্শকবা নিজের জায়গা থেকে নড়তেও চায় না অথচ এ-রকম অদ্ভুত আওয়াজেব ব্যাপারটা জানতেও চায। সামনের দুদিকে কোনাকুনি চেয়ারে জেলার সব অফিসারদের আর হর্তাকর্তা লোকদেব বসে থাকতে দেখে দর্শকরা কিছুটা আশ্বস্তও হয়। এর মধ্যেই সবাই জেনে যায—পেছনেব বেডাটা পুলিশ সাহেবেব নির্দেশে খুলে দেযা হচ্ছে। সে-জন্যেই স্টেজও খালি।

টিকিট কেনা দর্শক ছাড়াও নতুন দর্শনার্থীর সংখ্যা ক্রমেই বাডতে-বাড়তে এমন একটা অবস্থা হয়েছে যে তাদের দেখার ব্যবস্থা করাটা অনিবার্য হয়ে ওঠে। ডি-এস-পি সাহেব উদ্যোক্তাদের বলেন—টিকিট বিক্রি করা চলবে না, কাবণ প্যান্ডেলে একটুও জায়গা নেই। তখন ঠিক হয় অনুষ্ঠান মাঝামাঝি হয়ে গেলে পেছনের বেড়াটা খুলে দেযা হবে। শ্রীদেবীর লোকজনকেও তাই জানানো হয়।

একশ আশি

সমবেত রমণনৃত্য

অঘোষিত ঐটুকু বিবতিব পর শ্রীদেবীর অনুষ্ঠান আবার শুরু হয়। আর চলতেও থাকে সেই খানিকটা ঠাণ্ডা খানিকটা গবম—এই ছন্দে। দুটো-একটা নাচগানের পর শ্রীদেবী তাঁর সুপাবহিট ফিল্ম 'নগিনা'র একটা গানের সঙ্গে স্টেজে কিছুটা হাঁটেন—'ভুল যাযে তুম এক কহানী।' ফিল্মে এই জায়গাটিতে ভাঙা শিবমন্দিরের প্রাসাদেব সিঁড়ি দিয়ে, অলিন্দ দিয়ে, মাঠ দিয়ে শ্রীদেবী কখনো তুঁতে রঙের, কখনো গোলাপি রঙের পোশাকে আপাদমস্তক নিজেকে ঢেকে, শুধু মুখটুকু বের করে রেখে গেয়ে-গেয়ে যান ঈষৎ বিলম্বিত লযে, 'ভুল যাযে তুম এক কহানী।' এ যেন জন্মান্তরের কাহিনী মনে পড়িয়ে দেয়া। ফিল্মে এই দৃশ্যে শ্রীদেবীব পাশে-পাশে ঋষিকাপুর ছুটে-ছুটে যান। আর শ্রীদেবী কখনো আধো ঘোমটা খুলে, কখনো বা না-খুলে, তাঁকে জন্মান্তরের কাহিনী শুনিয়ে যান। এখানে মঞ্চে শ্রীদেবী একা—শিবমন্দিবেব অলিন্দ নেই, প্রাসাদ নেই, ঋষিকাপুরও নেই। কিন্তু শ্রীদেবী এমন ভাবে হাঁটেন আর হাঁটাটাই এমন নাচ হযে ওঠে, আধো ঘোমটা খোলেন বা খোলেন না যে দর্শকদের মনে হতে শুরু করে যে তাবাই ঋষিকাপুর। এ গানটিতে সেই উল্লাস নেই, ববং যেন বিষণ্ণতা আছে।

এ-রকম আবো দুটো-একটা নাচগানের পর স্টেজেব আলো কমে আসে। ফলে প্যান্ডেলটাতেও আবছায়া ছড়িয়ে পড়ে। দর্শকদেব অনেকেব জানাই আছে যে শ্রীদেবী মোট কত ঘণ্টাব অনুষ্ঠান করবেন, সব মিলিয়ে রাত নটা থেকে সাড়ে এগারটা, তাব মানে আর বড় জোর দুটো-তিনটে নাচগান হবে। দর্শকরা এব মধ্যে হিশেব-নিকেশও একটা করে ফেলেছে যে অনুষ্ঠানটিতে যা তারা চেয়েছিল, তা পেয়েছে কি না। এখন যেন সেই প্রত্যাশাটা চবমেব দিকে যাচ্ছে—আলো কমে আসায় ও সেই আধা-আলোর স্টেজ খালি ও নীরব থাকায প্রত্যাশাটা এমনই পর্যায়ে ওঠে যে দর্শকরা কোনো কথা পর্যন্ত বলে না। হঠাৎ খুব চাপা স্ববে মাইকে অত্যন্ত দ্রুত লয়ে একটা বাজনা বেজে ওঠে। একটু পরে তার সঙ্গে আরো চাপা গলায়, যেন ফিসফিসিয়ে গাওযা হচ্ছে—'থাকা থাকা দ্রি-ই-ম,' 'থাকা থাকা দ্রি-ই-ম।' মাইকে কানে-কানে কথা বলার মত করে এই আওয়াজটা ছডিয়ে পড়ে। চাপা আলো, চাপা স্বর আর ঐ ছন্দিত দ্রুত লয়ে দর্শকদের শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে যেন—'থাকা থাকা দ্রি-ই-ম,' 'থাকা থাকা দ্রি-ই-ম।' কেউ-কেউ হিসিয়ে ওঠে—'হিম্মৎ ঔর মেহনৎ।' শ্রীদেবী সেই আধো আলোর সঙ্গে মিশে মঞ্চে একটা বিড়ালীর মত উঁচু লাফে ঢোকেন। তাঁব গলা থেকে হাঁটুর ওপর পর্যন্ত টাইট একটা পোশাক—রংটা ঐ ধোঁয়াটে আলোয় বোঝা যায় না। বিড়ালীর মত দুটো-একটা লাফ মেরেই শ্রীদেবী হাঁটুতে আর কোমরে বিপরীত মোচড় দিয়ে নিজেকে গানের তালে-তালে কাঁপাতে থাকেন।

আলো বাড়ে না, গানের আওয়াজটাও বাড়ে না। শ্রীদেবী মঞ্চের এক জায়গা থেকে আব-এক জায়গায় যান এক-একটা লাফ দিয়ে। তারপর আবার সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কোমবে মোচড় দিয়ে নিজের সারা শরীরকে কাঁপাতে থাকেন। স্টেজের একটু পেছন দিকেই এখনো তিনি লাফালাফি কবেন। দর্শকরা খুব একটা স্পষ্ট দেখতেও পায় না। কিন্তু তার জন্যে কোনো আওয়াজ দিয়ে ওঠে না। যেন দর্শকরা জানেই—এটা তত স্পষ্ট দেখা যাবে না। জানে বলেই দর্শকদের ভেতর যতখানি দেখা সম্ভব ততখানি দেখে নেয়ার জন্যে একটা টানটান উত্তেজনা সঞ্চারিত হয়। আলো একটু হয়ত বাড়ে কিংবা হয়ত দর্শকরাই একটু বেশি দেখতে পায়—তখন দেখা যায় শ্রীদেবী স্টেজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, কোমরে সেই একই মোচড়, কিন্তু শরীরের সেই কম্পনের ফলে কখনো তার স্তন দুটি শরীর থেকে আলাদা হয়ে কাঁপছে—কিছুটা ছায়ায় স্তনের রেখা এত খোদাই হয়ে ওঠে যেন সে-স্তনের কোনো আবরণ নেই। আবার, কখনো 'থাকা-থাকা দ্রিইম'-এর তালে-তালে শ্রীদেবীর নিতম্ব ছায়াতে খোদাই হয় ওঠে। সেই নিতম্বের কম্পনে মনে হয় ঐ শরীরে কোনো আবরণ নেই। অত বড় প্যান্ডেলে ঐ প্রায় লক্ষ লোকের মধ্যে নীরবে একটা চাপা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে, যেন, এইটির প্রত্যাশাতেই তারা এতক্ষণ ছিল। আলো একটু বাড়ে অথবা দর্শকরাই আরো একটু বেশি দেখতে পায়। শ্রীদেবী হাত দুটো মাথার ওপরে সোজা তুলে ফেলেন, তাঁর শরীরের সব রেখা দর্শকদের চোখের সামনে খোদিত হয়ে যায়। তারপর দর্শকদের মুখোমুখি সেই শরীরটা যেন এক অনন্ত রমণের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই নিজেকে মোচড়ায়। শ্রীদেবীর কোমর থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সেই রমণে আবর্তিত হতে থাকে, আবর্তিত হতে থাকে। এর যেন আর

শেষ নেই। মাইকের সেই চাপা স্বর শীৎকারের মত শোনায়—'থাকা থাকা ড্রি-ই-ম', 'থাকা থাকা ড্রি-ই-ম।'

প্যান্ডেলেব ঐ প্রায় লক্ষ মানুষ তখন পরস্পব থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে সমবেত এক বিচ্ছিন্ন নিষিদ্ধ সম্ভোগে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সকলে কেমন অধৈর্য হয়ে ওঠে—এই সম্ভোগের জন্যে আর-বেশি সময় হাতে নেই যেন। মাইকের চাপা শীৎকারে আর দ্রুত শ্বাসপতনের আওয়াজে এই দৃশ্যের নিষিদ্ধ ব্যক্তিগত যেন আরো সার্বজনীন হয়ে ওঠে। একটি বাচ্চা হঠাৎ চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে—সে এই চাপা আলো, চাপা স্বর, মঞ্চের আধা স্পষ্ট দৃশ্য আব তার চারপাশের চাপা উদ্বেগে ভয় পেয়ে গেছে। বাচ্চাটি একবারই মাত্র চিৎকার করে উঠতে পারে। তার মা তীব্র চাপা স্বরে হিসিয়ে ওঠে, 'চুপ যা চুপ যা কেনে।' মায়ের হাতচাপা তার কান্না থেকে একটা নিশ্বাসের আকুলতা শুধু ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তাতেই দর্শকদেব অনড়তা ভেঙে যায়। কয়েকজন ছায়াচ্ছন্ন যুবক দূরে শ্রীদেবীর নাচের সঙ্গে মিলিয়ে প্যান্ডেলে বমণনৃত্যে মেতে ওঠে। 'থাকা থাকা ড্রি-ইম', 'থাকা থাকা ড্রি-ইম।' আরো একদল যুবক আর-এক কোণে নাচ শুরু কবে। তাতে কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা ঘটে না। 'হিম্মৎ ঔর মেহন্নত' ফিল্মে এই দৃশ্যে শ্রীদেবী নেচেছিলেন জিতেন্দ্রর সঙ্গে। এখন মঞ্চে তিনি একা নাচছেন। এই প্যান্ডেলের নানা কোণে অনেকে তাদেব আসন ছেড়ে উঠে ঐ চাপা শীৎকারের তালে-তালে মঞ্চের শ্রীদেবীকে সঙ্গ দিতে চায়।

মাইকে বমণেব কাল্পনিক ধ্বনিপুঞ্জ দ্রুত ছন্দে তখন আরো চাপা স্বরে বেবিয়ে আসছে—'থাকা থাকা ড্রি-ইম', 'থাকা থাকা ড্রি-ইম।' চাপা নিশ্বাস, দ্রুত নিশ্বাস, পশুধ্বনি। শ্রীদেবী মঞ্চেব আবো সামনে চলে এসেছেন। এখন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই তিনি কোমব থেকে তাঁর শরীরের ওপরের অংশটাকে আর্চের মত বাঁকিয়ে দিয়েছেন—তাতে তাঁর স্তন দুটির বাঁক তীব্র হয়ে ওঠে, আর কোমব থেকে নীচের অংশটি এগিয়ে দিয়েছেন—তাতে তাঁর উরু দুটি শক্ত ও প্রখর দেখায়। সেই অবস্থাতেও তাঁব শরীরে ঐ শীৎকাবেব প্রবল আন্দোলন। সে-আন্দোলনের মধ্যে কোনো বৈচিত্র্য নেই, কিন্তু সে-আন্দোলন যেন কখনোই থামবে না।

একটা দল প্যান্ডেলের একেবাবে পেছন থেকে—বেড়াটা খুলে দেয়ায় এখন ত রাস্তা পর্যন্ত প্যান্ডেল—বাঘারুকে মাঝখানে নিয়ে নাচতে-নাচতে এগিয়ে আসে। গয়ানাথ আব আসিন্দিব সপরিবাব অনুষ্ঠান দেখতে এসেছে—কাজকর্মের জন্যে বাঘারুকে সঙ্গে আনা। বাঘারু অনুষ্ঠানেব ভেতরে ঢোকে নি—সে বাস্তাব ওপরেই ছিল কিন্তু যেন তাকে অনুষ্ঠানের ভেতবে টেনে আনার জন্যেই পেছনেব বেড়াটা খুলে দিয়ে রাস্তাটাকেও প্যান্ডেলের ভেতর নিয়ে আসা। কিছু যুবক রাস্তাব ওপর ও রাস্তার ঢালে বসে-বসে গোপনে দ্রুত মদ খেতে-খেতে অনুষ্ঠান দেখছিল। এইবার তাবা তাদের, জ্যাকেট ও জিনসসহ রাস্তার ওপব রাস্তার ঢালে জেগে ওঠে—'থাকা থাকা ড্রি-ইম।' তারা কোনো আওয়াজ করে না কিন্তু নিজেদেব শবীরেব দ্রুততম আবর্তনে নেচে ওঠে—রাস্তায় ও বাস্তার ঢালে। বাঘারু সেই দলের মধ্যে পড়ে যায় কিংবা সেই দলটাই বাঘারুকে নিজের মধ্যে টেনে নেয়। অত দ্রুত অতটা মদ খাওয়ায় তাদের পা টলছিল বা রাস্তা ও রাস্তার ঢালে ঐ নাচ নাচছিল বলে তারা গড়িয়ে নীচে নেমে যায় দ্রুত—বাঘারুকে নিয়েই। নীচে যাওয়া মানেই প্যান্ডেলের ভেতবে ঢুকে পড়া। তখন ত প্যান্ডেলেব ভেতরেও নানা জায়গায় নানা দল নাচছে, নীরবে নাচছে, মাইকের চাপা থেকে চাপা শীৎকারের সঙ্গে নাচছে। এই দলটি বাইরে থেকে নাচতে-নাচতে সেই সব নাচের সঙ্গে মিশে যায়। মিশে যায় আর এগিয়ে যায় মঞ্চের দিকে। তাদেব মাঝখানে আপাদমস্তক প্রায়নগ্ন বাঘারু।

একশ একাশি

শ্রীদেবী ও বাঘারু

বাঘারুকে নিয়ে দলটা প্যান্ডেলেব প্রায় মাঝামাঝি চলে আসে। আরো অনেকে অনেক জায়গাতেই নাচছিল বলে এই দলটার এগিয়ে আসায় তেমন কোনো বিশৃঙ্খলাও দেখা যায় না, যেন এদের এতটা চলে আসার জন্যে জায়গা প্রস্তুতই ছিল।

কিন্তু বাঘারু কী করবে বুঝে উঠতে পারে না। এই দলটা ত তাকে টেনে হিঁচড়ে নিজেদের মাঝখানে নিয়ে আসে নি। এমন-কি দলটা যেন জানেও না বাঘারু তাদের মধ্যে আছে—এমনই তাদের মাতাল পা ফেলা। তারা কোনো চিৎকার চেঁচামেচিও করছে না। বাঘারু তার শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা খুঁটির মত আর সেই খুঁটি ঘিরে এই ছেলেরা ঘুরে-ঘুরে নেচে চলেছে।

বাঘারু দেখে, মঞ্চে তখন 'চিকুরের নাখান' (বিদ্যুতের মত) আলো চলকাছে। আর সেই চিকুরের আলোত্ বেটিছোয়াখান (মেয়ে) শুই পড়িছে। শুই পড়ি উমরার শরীলখান্ আথাল-পাথাল করিবার ধইচছে। আথাল-পাথাল করিছে আর বেটিছোয়াখান ঘুরপাক খাছে। ঘুরপাক খাছে আর উমরার তলপেটখান মাটিথে উপরত উঠি আসিবার চাছে। 'থাকা-থাকা ড্রি-ইম', 'থাকা থাকা ড্রি-ইম'। মাইকের চাপা শীৎকার দ্রুততায় এখন এমন চরমে উঠেছে যে বোঝা যায় স্বরটা যে-কোনো মুহূর্তে থেমে যেতে পারে। মঞ্চে শ্রীদেবী তখন শুয়ে-শুয়ে ঘুরপাক খাচ্ছেন। তাঁর তলপেটের ওপর আলোর ঝিলিক—সেই তলপেট সঙ্গমের কাল্পনিক আশ্লেষে উঠছে-পড়ছে। যে-কোনো মুহূর্তে ঐ শরীর থেমে যেতে পারে। থেমে যেতে পারে, কিন্তু যাচ্ছে না। ঐ মাইকের শীৎকারও থেমে যেতে পারে। ফলে প্যাণ্ডেলের ভেতরের সেই রাজবংশী-মদেশিয়া-নেপালি ও বর্ণহিন্দু বাঙালি ভিড়ের কিছু অংশ উত্তেজনার চরম বিন্দুতে বসে-বসে শক্ত হয়ে যাচ্ছে, আর-এক অংশ নাচকে উত্তাল করে দিচ্ছে।

বাঘারু ঐখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শ্রীদেবীকে দেখতে-দেখতে ভুলে যায় তাকে খুঁটির মত দাঁড় করিয়ে রেখে একদল ছেলে নাচছে—যেন ঐখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তার শ্রীদেবীব ঐ আক্ষেপ দেখাবই কথা। বাঘারু ও-রকম দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তাকে ঘিরে ছেলেদের নাচ ভেদ করে মঞ্চে শ্রীদেবীকেই যেন শুধু দেখে। দেখে, বেটিছোয়াখান ক্যানং তলপ্যাটখান উঠাছে-নামাছে, উঠাছে-নামাছে। এই ভঙ্গির একটা অর্থ যেন বাঘারুর আপাদমস্তক প্রায় নগ্ন রাজবংশী শরীরে ঢুকতে চায় কিন্তু মঞ্চেব ঐ শরীরের ওপর আলোর খেলা, মাইকে আরো চাপা ও আরো দ্রুত শীৎকার আর চারপাশে নীরব শরীরমন্থন সেই অর্থটা তার শরীরে সঞ্চারিত হতে বাধা দিচ্ছে। তাই বাঘারু মেয়েটির শরীরের আর্তনাদ দেখতে-দেখতে কেমন বিমূঢ় বোধ করতে থাকে। সেই বিমূঢ়তায় সে তার শরীরের ভেতর যেন এমন-কি ঐ মঞ্চের আহ্বানও বোধ করে ফেলতে চায়। বাঘারুর ঐ শালপ্রাংশু রাজবংশী শরীরের নগ্নতার সঙ্গে মঞ্চে বম্বে ফিল্মের যৌন প্রতীক নায়িকা শ্রীদেবীর জ্যান্ত শরীরের একটা অর্থগত সংযোগ প্রতিষ্ঠা হওয়ার মুহূর্তে গানটা হঠাৎ থেমে যায়, অনেকক্ষণ আগেও যেমন থামতে পারত। শ্রীদেবী এতক্ষণে মঞ্চের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, হেঁটে মঞ্চ থেকে চলে যান, মঞ্চেব আলো জ্বলে ওঠে, একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে দর্শকরা উত্তেজনা মোচন করে অথচ বাঘারু যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। এখন মঞ্চের আলোতে ও প্যাণ্ডেলের বাইরে থেকে আসা আলোতে দেখা যায়—বাঘারু প্যাণ্ডেলে ঐ লক্ষ লোকের মাঝখানে তার উদোম শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে, পরনের নেংটিটুকু যেন থেকেও নেই। বাঘারুই যখন দৃশ্য হয়ে ওঠে, তখন অনেকে তাকে দেখেও দেখে না। কিন্তু দেখেও না দেখে থাকার সময়টা পেরিয়ে যায়—সকলে বসে আছে যেখানে সেখানে নিজের নগ্নতা নিয়ে বাঘারু এমনই বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। যে-কোনো মুহূর্তে পরের কর্মসূচি ঘোষিত হবে, তখন বাঘারু অবান্তর হয়ে যাবে—এই সময়টাও পার হয়ে যায়। তখন শ্রীদেবীহীন মঞ্চের শূন্যতাটাও যেন বাঘারুর এই নির্লজ্জ নগ্নতায় অপমানিত হতে শুরু করে। এই মাত্র যে-নাচটি শেষ হল, সে-নাচে ত পুরো প্যাণ্ডেলটাই মঞ্চ হয়ে উঠেছিল। বাঘারুর ঐ নগ্নতা যেন তাই দর্শকদেরও অপমান। বাঘারু নিজের ঐ নগ্নতা নিয়ে মঞ্চের দিকে এমনই অনড়, যেন ঐ দাঁড়িয়ে থাকাটাই একটা বিদ্রোহ। শেষ পর্যন্ত যখন মনে হতে শুরু করে যে ঐ নির্লজ্জ রাজবংশী নগ্নতার জন্যেই মঞ্চটা এমন শূন্য পড়ে আছে, শ্রীদেবী ঢুকছেন না, যেন ঐ নগ্নতার সামনে শ্রীদেবীর পক্ষে মঞ্চে প্রবেশ সম্ভব নয়—তখন ডি-এস-পি সাহেব পেছন থেকে এসে বাঘারুর কাঁধে দূর থেকেই তার ব্যাটনটা ছুঁইয়ে বলেন, 'বসো, বসো।' কিন্তু বাঘারু সে-ইঙ্গিতও না বোঝায় ডি-এস-পি সাহেবকে অগত্যা হাত ধরে বাঘারুকে টেনে আনতে হয়, পেছনে। টুপি থেকে বুট পর্যন্ত পুরো ইউনিফর্মের ডি-এস-পি সাহেবের পাশে-পাশে হাঁটতে হাঁটতে ঐ ভিড়ের ভেতর দিয়ে বাঘারু প্যাণ্ডেলের বাইরে চলে যায়।

মাইকে শোনা যায়, 'এইবার আজকের সন্ধ্যার শেষ অনুষ্ঠান পরিবেশন করবেন বম্বের প্রখ্যাত চিত্রতারকা শ্রীদেবী। তার সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের উত্তরখণ্ড সম্মিলনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও শেষ হবে। আগামীকাল সকালে জল্পেশ্বর শিব-মন্দির অভিযান। আপনাদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ যে আপনারা

এই শোভাযাত্রায় দলে-দলে যোগ দিয়ে উত্তরবঙ্গের পবিত্রতম তীর্থ জল্পেশ্বর মন্দিরে যাবেন ও জল্পেশ্বর শিবের পূজা দিবেন। আমাদের অনুরোধে শ্রীদেবী তাঁর এই শেষ অনুষ্ঠানে নাগিনা সিনেমার শেষ দৃশ্যে তিনি শিবলিঙ্গের সামনে যে-নৃত্য পরিবেষন করেছিলেন সেই নৃত্যটি পরিবেষন করবেন। পুলিশ কর্তৃপক্ষ অনুরোধ করেছেন যে-ভাবে আপনারা প্যান্ডেলে ঢুকেছেন সে-ভাবেই লাইন করে অনুষ্ঠানের শেষে বাইরে যাবেন।'

ঘোষণার সঙ্গে-সঙ্গেই মাইকে গান বেজে ওঠে, 'ম্যায় তেরি দুষমন, দুষমন তু মেরা। ম্যায় হ্যায় নাগিন, তু সাপেরা।' গানের মুখটা দুবার হয়ে যাওয়ার পর শ্রীদেবী মঞ্চে ঢোকেন। এখন মঞ্চভর্তি আলো। শ্রীদেবীর পরনে ফিল্মের সেই সাপের খোলশের মত* টাইট পোশাক নেই—একটা আলখাল্লা-মত পরা, তাতে খোপ-খোপ ঘর আঁকা। শ্রীদেবী ফিল্মের নাচটাও পুরো নাচেন না, বরং একটু ভজনের মত নাচতে থাকেন। মাঝে-মাঝে হাততালি দিয়ে ওঠেন। মাঝে-মাঝে দুলে-দুলে গান। এই গানটির সুরের ভেতরও সেই উপাদান ছিল। মঞ্চে কিছুক্ষণ এ রকম ঘোরাফেরা করার পর শ্রীদেবী সামনের দিকে মাঝামাঝি বসেই পড়েন—জোড়াসনে, তারপর মাথা দুলিয়ে গানের তালে-তালে শুধু হাততালিই দিয়ে যান। সেই সময়ই একটি মেয়ে মাথায় একটা থালা নিয়ে ঢোকে। শ্রীদেবীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে সে-থালাটা খুব ভক্তিভরে তার সামনে নামিয়ে রাখে। তখন দেখা যায়, থালাটির ওপর একটি বড় শিবলিঙ্গ, একটি সাপ শিবলিঙ্গের ওপর ফনা মেলে আছে। সম্ভবত টিন বা ও-রকম কিছু কেটে করা। 'নগিনা' ফিল্মটিতেও শিবলিঙ্গ ছিল। মেয়েটি আবার প্রণাম করে উঠে যেতেই ধীর গম্ভীর একটি আওয়াজ ওঠে, 'জয় বাবা জল্পেশ্বর।' দর্শকরা করজোড় কপালে তোলে। এর মধ্যেও গানটা হয়ে যেতে থাকে—'ম্যায় তেরি দুষমন দুষমন তু মেরা। ম্যায় হ্যায় নাগিন তু সাপেরা।' সেই গানের তালে-তালে শিবলিঙ্গের সামনে শ্রীদেবী হাততালি দিয়ে যান, চোখ বুজে, মাথা দুলিয়ে-দুলিয়ে, যেন ঐ গানটি জল্পেশ্বরের ভজন—এ-রকম ভাবে দর্শকরাও চোখ বুজে হাততালি দিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু গানটার সঙ্গে তেমন কেউ গলা মেলাতে পারে না। গানের নিয়মে গান শেষ হয়। কিন্তু শ্রীদেবী মঞ্চ ছেড়ে যান না। তিনি শিবলিঙ্গের সামনে নত হয়ে প্রণাম করেন, তারপর উঠে দাঁড়ান। একটু কৃতজ্ঞ হাসি ঠোঁটে রেখে শ্রীদেবী দাঁড়িয়ে বাঁয়ে, ডাইনে, সামনে, আবার বাঁয়ে, আবার ডাইনে নমস্কার করেন। দর্শকরা তুমুল হাততালি দিয়ে ওঠে। শ্রীদেবী আবার ঘুরে-ঘুরে নমস্কার করেন। দর্শকরা আবার হাততালি দিতে-দিতে উঠে দাঁড়ায়। শ্রীদেবী এবার নত হয়ে শিবলিঙ্গটা মাথায় তুলে উইঙের দিকে হাঁটা দিতেই 'জয় বাবা জল্পেশ্বর' ধ্বনিতে প্যান্ডেল ভরে যায়। শূন্য, আলোকিত মঞ্চের ওপর পর্দা নেমে আসে।

একশ বিরাশি

জল্পেশ অভিযানের কিছু অসুবিধে

পরদিন শুক্রবার সকালে জল্পেশ অভিযানের জন্যে জনসমাবেশ শুরু হয়ে যায় সকাল সাতটা নাগাদ। বৃহস্পতিবার রাতে শ্রীদেবীর অনুষ্ঠান শুনতে স্থানীয় যারা এসেছিল তাদের একটা অংশ এই দুটো কার্যসূচিই মাথায় রেখে এসেছিল, বা, এই দুটো কার্যসূচির জন্যেই তাদের অনেককে আনা হয়েছিল। তারা অনুষ্ঠানের শেষে বাইরে এসে খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার ঐ প্যান্ডেলে গিয়েই ঘুমিয়ে থাকে। সকালে উঠে এখন জমা হচ্ছে জল্পেশ অভিযানের জন্যে।

জল্পেশ অভিযানের জন্যে যারা থেকে গেছে তাদের প্রায় সবাই উত্তরখণ্ডের নেতাদের প্রভাবিত এলাকার লোকজন। উত্তরখণ্ডের নেতাদের প্রায় প্রত্যেকেই কিছু-কিছু জমি-জিরেতের মালিক—কারো-কারো ত এক-এক অঞ্চলে জোতদার বলে প্রতিষ্ঠাই আছে। বিশেষত গয়ানাথ জোতদার ও তার জামাই আসিন্দির উত্তরখণ্ডে যোগ দেয়ায় সম্মিলনের ঠিক মুখেমুখে ডুয়ার্সে উত্তরখণ্ডীদের প্রতিপত্তি বেশ বেড়ে যায়। কিন্তু ফালাকাটা, আলিপুর দুয়ার, সাঁওতালপুর বা কোচবিহার পর্যন্ত নানা জায়গাতে উত্তরখণ্ডের বড়-বড় নেতারা যতই থাকুন, সেখান থেকে ত আর জল্পেশ

অভিযানের জন্যে বেশি লোক নিয়ে আসা সম্ভব নয়। নকশালবাড়ির সম্পৎ রায় ত বড় নেতা, কিন্তু জল্পেশ অভিযানের জন্যে নকশালবাড়ি থেকে সব মিলিয়ে জনা পঁচিশ-তিরিশের বেশি আসে নি। তাও আসত না—যদি কাল শ্রীদেবীর অনুষ্ঠান না থাকত।

এটা অবিশ্যি উত্তরখণ্ড নেতাদের খানিকটা জানাই ছিল। তাই তাঁরা বিশেষ জোর দিয়েছিলেন ময়নাগুড়ি, বাকালি, পদমতী, জোড়পাকুড়ি, বার্নেশ এই সব জায়গা থেকে এই অভিযানের লোকসংগ্রহ করতে। সাংগঠনিক দিক থেকেও ময়নাগুড়িই উত্তরখণ্ড আন্দোলনের কেন্দ্র। ময়নাগুড়িকে কেন্দ্র করে লোকসংগ্রহ করা তাই সহজও।

প্রচারের সময়ও এই কথাই বেশি বলা হয়েছিল—'শ্রীদেবীর নাচ দেখি প্যান্ডেলত্ থাকি যাবেন, জল্পেশ করি ঘরত ঘুরিবেন।' কথাটা ধরেওছিল ভাল। এই পাশাপাশি এলাকার লোকজনের পক্ষে আজ বাড়ি থেকে বেরিয়ে কাল দুপুরে ফিরে আসা বেশ লোভনীয়, বিশেষত, ময়নাগুড়িতে থাকার জন্যে প্যান্ডেলটা যখন পাওয়াই যাচ্ছে।

শুধু যে সুবিধে তাই নয়। যদি পরদিন জল্পেশ অভিযান নাও হত তা হলেও এরা সবাই ত আর রাত্রিতেই ফিরতে পারত না—রাতটুকু তাদের ময়নাগুড়িতে কাটাতেই হত। জল্পেশ অভিযানের কর্মসূচি ঘোষিত থাকায়—প্যান্ডেলটাতে রাত কাটানো, তারপর দল বেঁধে জল্পেশে যাওয়া এটা ব্যবস্থার মধ্যেই চলে আসে। কে আর এখানে এমন আছে যে জল্পেশ যাওয়ার সুযোগ পেলে যাবে না।

উত্তরখণ্ডের নেতারা চেষ্টা করলে যে দূর-দূর জায়গা থেকেও কিছু-কিছু লোক আনতে পারতেন না, তা নয়। প্রথম দিকে তাঁরা হয়ত সে-রকম ভেবেও থাকবেন। কিন্তু গয়ানাথ জোতদার যোগ দেয়ার পর তিস্তা ব্যারেজ উদ্বোধনের দিন বিক্ষোভ মিছিল সংগঠনের দায়দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়। জল্পেশ অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—উত্তরবঙ্গের প্রাচীনতম ও পবিত্রতম তীর্থের নাম আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে উত্তরখণ্ডের দিকে সবাইকে টেনে আনা। সেই প্রচারের জন্যে শ্রীদেবীকেও আনা। যদিও শ্রীদেবীকে আনাটা ব্যবসার মত করেই হয়েছে কিন্তু উত্তরখণ্ড সম্মিলনের সঙ্গে যুক্ত করেই ত তাঁকে আনা। মাসখানেকের মাথায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তিস্তা ব্যারেজ যখন উদ্বোধন করবেন, তখন নানা জায়গা থেকে ট্রাকে করে, বাসে করে মিছিল নিয়ে আসা হবে—এটা স্থির হয়ে যাওয়ার পর জল্পেশ অভিযানের জন্যেও বাইরে থেকে লোক নিয়ে আসার কথা আর-কেউ ভাবে না। মাত্র মাসখানেকের মধ্যে দু-দুটো মিছিল ত আর করা সম্ভব নয়।

সরকারি মিটিঙে উত্তরখণ্ডের পক্ষ থেকে যুক্তি হিশেবে যেটা বলা হয়েছিল, পুলিশ সেটা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করে। অর্থাৎ অনুষ্ঠান শেষ হওয়ামাত্র বাইরের সমস্ত ট্রাক ও বাসকে ময়নাগুড়ি ছাড়তে হয়। তাদের রাখাই ত হয়েছিল এমনভাবে যাতে উত্তরখণ্ড সম্মিলনের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক তৈরি না হয়। শ্রীদেবীর নাচের জন্যে এসেছ, শ্রীদেবীর নাচ দেখে চলে যাও। রাত তিনটের মধ্যে ময়নাগুড়ি প্রায় খালি করে দেয়া হয়। উত্তরখণ্ড সম্মিলনের নেতারা আশা করেছিল যে আসাম ও বিহারের দিক থেকে যারা এসেছে, তাদের একটা অংশ এই সুযোগে জল্পেশে পুজো দেযার জন্যে জল্পেশ অভিযানে যোগ দিতে শ্রীদেবীর নাচের পর থেকে যাবে। থাকতও হয়ত। কিন্তু জল্পেশ অভিযানের প্রচারের সে-রকম কোনো সুযোগ বৃহস্পতিবার উত্তরখণ্ড পেলই না।

সবটা যে পুলিশের দোষ তাও নয়। শ্রীদেবীর অনুষ্ঠানে হাজার-হাজার লোক আসবে—এটা জানা কথাই। কিন্তু কথাটা জানা এক ব্যাপার আর সেই হাজার-হাজার লোক দেখা আর-এক ব্যাপার। বৃহস্পতিবার সারাদিন ও সারা রাত ময়নাগুড়ির মত ছোট শহরের যে-অবস্থা তাতে উত্তরখণ্ডের নেতারাও পরস্পরের সঙ্গে তেমন কথাবার্তা বলতে পারে নি। বরং অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার পর, প্যান্ডেলের ভেতর ও বাইরে নেতারা নিজেদের মধ্যে কিছুটা কথা বলতে পেরেছে। তারা যদি প্যান্ডেলের ভেতরে বা রাস্তায় জল্পেশ্বর অভিযানের কথা বলতে চাইত তা হলে নিশ্চয়ই পুলিশ বাধা দিতে আসত না। আসলে, এই জনসমুদ্র দেখে নেতারাও এমন অভিভূত হয়ে পড়ে যে তারা আর-কোনো কথা মনে করতেই পারে নি।

জল্পেশে যাবার জন্যে যারা তৈরি ছিল তারা ভোর না-হতেই মিছিলের জায়গায় এসে জমা হয়ে গিয়েছিল। সাতটা নাগাদ মিছিল সাজানো শুরু হয়। তখন দেখা যায়, এর মধ্যে অনেকে আবার বাসে জল্পেশে গিয়ে সেখানে মিছিলে যোগ দেয়ার কথা ভাবছে। ময়নাগুড়ি থেকে জল্পেশ বাসে যাওয়ার কথা

আগে ভাবাই যেত না, বাসও ছিল না। আজকালও বাস খুব বেশি নয়। কিন্তু একটা লাইনের বাস এই সকালেই ছাড়ে। আর, ময়নাগুড়িতে কালকের ফাংশন উপলক্ষে কিছু মিনিবাস এসে জুটেছিল, তারা দুটো-একটা সাটল ট্রিপের আশায় 'জল্পেশ-জল্পেশ' বলে চেঁচাচ্ছিল।

একটা গেরুয়া ফেস্টুন মাটিতে পোঁতা ছিল—তাতে লেখা, 'নিখিল বঙ্গ উত্তরখণ্ড সমিতি।' উত্তরখণ্ড দলের একটা বড় তেকোনা নিশান পোঁতা আছে—একটা বড় বাঁশের মাথায় পতাকাটা দুলছে। আরো কিছু ছোট-ছোট পতাকা আশেপাশে মাটিতে পোঁতা।

মনে হচ্ছিল, সবাই যেন কোনো কিছুর জন্যে অপেক্ষা করছে। সেই আলগা-আলগা জোটের মধ্যে আগের রাতের অনুষ্ঠান নিয়েই কথা হচ্ছিল বেশি। এক জায়গায় একজন বেশ রেগেই ওঠে, 'আরে তোমরালা না-হয় সিনেমাখান দেখিছেন, মুই ত দেখো নাই, স্যালায় কি করি বুঝিম কোন ফিল্মের কোনখান গান আর কোনখান নাচ!'

'তোমার খেপিবার কী আছে ভাই! তোমরালা সিনেমা দেখে নাই ত দেখেন নাই, এ্যালায় নাচোখান দেখো।'

'কী দেখিম? মাটিত পড়ি গড়াগড়ি যাছে, য্যান্ দেও ধরিছে। তোময়ালা কহিছেন—আহা-হা, মুই ত বুঝিবারই পারো না।'

যাকে বলা সে হো হো করে হেসে ওঠে, 'আরে, মাটিত্ পড়ি একখান জোয়ান বেটিছোয়া ঐনং আলাংপালাং করিছেন কেনে, বুঝো না ত চুপ করি থাকো কেনে। বুঝিবার কী আছেন হে। দেখিবার জিনিশ দেখো কেনে। কী? দেখিবার কি খাবাপ নাগিছে? হ্যাঁ। উত্তরখণ্ড পার্টির এ্যালায় একেরে জয়জয়। কংগ্রেসের ঘর পারো নাই, কমুনিশের ঘর পারো নাই, এই উত্তরখণ্ডটা পারিছে—স্যালায় বম্বাইঠে শ্রীদেবীক এইঠে ময়নাগুড়িত আনিবার। উত্তরখণ্ড পার্টিটা শ্রীদেবীব পার্টি হয়্যা গেইছে।' লোকটি হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে চিৎকার করে 'শ্রীদেবীর পার্টি জিন্দাবাদ।'

কেউ সাড়া দেয় না—সাড়া দেয়ার জন্যে কেউ তৈরি ছিল না বলে। কিন্তু সেই অপ্রস্তুতির কারণেই সবাই হেসে ওঠে, হাততালি দেয় যেন লোকটি আর-একবার চিৎকার করলে সবাই সাড়া দিত।

একশ তিরাশি

বাঘারুর হাতে ঝাণ্ডা দিতে সুস্থিরের দ্বিধা

একটু পরেই দূব থেকে একটা আওয়াজ ভেসে আসে, সবাই উঠে দাঁড়িয়ে তাকায় আওয়াজটা কোত্থেকে আসছে দেখতে। কয়েকটা মোটর সাইকেল ও সাইকেল নিয়ে সুস্থির এগিয়ে আসছে—'উত্তরখণ্ড পার্টি জিন্দাবাদ।'

সুস্থিরের দলটা এসে পড়া মাত্রই সাজো-সাজো পড়ে যায়। সুস্থিরে দলে গোটা পঞ্চাশেক সাইকেল, মোটর সাইকেল খানদশেক—মোপেড-স্কুটাবসহ। দলটা এসে রাস্তার ওপর দিয়ে চলে গিয়ে সেই ফেস্টুনটা পেরিয়ে থামে, কিন্তু স্টার্ট বন্ধ করে না, থামেও না। একটা মোপেডের পেছন থেকে সুস্থির নেমে চিৎকার করতে-করতে আসে, 'মিছিল সাজান, মিছিল সাজান।'

সুস্থির বড় ফ্ল্যাগটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে দাঁড়ায়, 'আসেন আসেন, কায়ো জোয়ান মানষি আসি ধরেন ঝাণ্ডাখান।' পঞ্চাননবাবু আর গয়ানাথ জোতদার এসে সুস্থিরের পাশে দাঁড়ান। সুস্থির চেঁচিয়ে ওঠে, 'হে ই নবীন, ফেস্টুনখান ধরি খাড়া কেনে, মিছিল সাজো, মিছিল সাজো।'

নবীন আর তিলক ফেস্টুনটা মাটি থেকে তুলে এনে রাস্তার ওপর আড়াআড়ি দাঁড়ায়। সুস্থির চিৎকার করে, 'আরে, তোমরালা ধরিলেন কেনে, দুইখান বেটিছোয়াক ধরি দেন, এই, দুইখান বেটিছোয়াক ডাকেন কেনে।' পঞ্চাননবাবু এগিয়ে যান। সুস্থির এবার গয়ানাথকে বলে, 'আরে একখান জোয়ান মানষিক আসিবার কহেন না, ঝাণ্ডাখান ধরিবে।'

গয়ানাথ তাড়াতাড়ি মিছিলের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনের দিকে গিয়ে চিৎকার করতে থাকে, 'হে-এ বাঘারু, বাঘারু হে-এ।' কিন্তু বাঘারুকে কাছাকাছি কোথাও দেখা যায় না। গয়ানাথকে তখন আরো খানিকটা যেতে হয়, 'হে-এ বাঘারু, বাঘারু হে-এ।'

এখানে বেশির ভাগই এদিককার লোকজন। তারাও গয়ানাথকে চেনে না, নাম হয়ত জানে আর গয়ানাথও এদের মুখ চেনে না। ফলে, গয়ানাথের ডাক শুনেও কেউ বাঘারুকে খুঁজে দিতে এগতে পারে না। গয়ানাথকেই রাস্তাটা ধরে 'হে-এ বাঘারু, বাঘারু হে-এ' ডাকতে-ডাকতে এগিয়ে আবিষ্কার করতে হয় যে বাঘারু সব জায়গাতেই যেমন একা দাঁড়িয়ে থাকে, এখানেও তেমনি 'বলদেব নাখান' দাঁড়িয়ে আছে। গয়ানাথের ডাক সে শুনতে পায় না, বা, শুনলেও বুঝতে পারে না তাকে ডাকা হচ্ছে। গতকাল গয়ানাথের বাড়ির লোকজনকে নিয়ে এখানে আসার পর থেকেই বাঘারু খানিকটা অলসভাবে ঘোরাঘুরি করছে। এখানে তার ত কোথাও নির্দিষ্ট কোনো কাজ নেই। তাই সে স্রোতে ফেলে দেয়া কাঠের মত যেখানে-সেখানে পড়ে থাকছে।

বাঘারুকে দেখে গয়ানাথ একটু দূরেই দাঁড়িয়ে পড়ে অভ্যেসে। বাঘারু তার চাইতে এত লম্বা যে সামনে গেলে গয়ানাথকে ঘাড় বেঁকিয়ে কথা বলতে হয়।

'হে—এ বাঘারু, এইঠে খাড়ি-খাড়ি কী করিবার ধইচছিস ?' বাঘারু চমকে তাকাতেই বলে, 'চলি আয় হিপাখে', গয়ানাথ এবার একেবারে দ্রুত পা ফেলে মিছিলের মাথার দিকে এগিয়ে যায় আর গয়ানাথের ডাকে চমকে বাঘারু গয়ানাথের পেছনে-পেছনে হাঁটতে শুরু করে।

এতক্ষণে মিছিলের মাথায় সুস্থিরের মোটর সাইকেল বাহিনী রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে একটু ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেছে। সামনে দুইটি ফোতাপরা মেয়ে ফেস্টুনটা ধরে আছে—সেই দুজনের পেছনে-পেছনে সবাইকে লাইন করে দাঁড় করাচ্ছে নবীন আর তিলক। মেয়েরা প্রথমে, ছেলেরা তার পরে।

সুস্থির বড় ঝাণ্ডাটি তুলে, মাটিতে দাঁড় করিয়ে ডান হাতে ধরে রেখেছিল। তার সামনে গিয়ে গয়ানাথ আঙুল দিয়ে বাঘারুকে দেখিয়ে বলে, 'ইমরাক নিশানখান দেন।' সুস্থির তখন ডাইনে ঘাড় ঘুরিয়ে কথা বলছিল। গয়ানাথের কথা' শুনতে পায় না। গয়ানাথকে দাঁড়াতে হয় সুস্থিরের কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত। সুস্থির ঘাড় সোজা করলে বলে, 'ইমরাক দিযা দেন নিশানখান।'

'হ্যাঁ ? বলে সুস্থির বাঘারুর নেংটিপরা বিশাল চেহারাটা দেখে। দেখবার জন্যে তাকে বাঘারুর মাথা থেকে পা আর পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বোলাতে হয়। সে রকম দেখার পরও সুস্থির ঝাণ্ডাটা দেয় না, যেন কিছু ভাবে। বাঘারুর এমন লম্বা পেশল নগ্ন চেহারা রাজবংশী সমাজে এত দুর্লভ নয় যে সুস্থিরকে এমন দেখে যেতে হবে। এই রাজবংশী মিছিলটা রাজবংশী সমাজে এখন নতুন। রাজবংশী বলেই এই মিছিলটাতে এরা এসেছে এবং এখানে এসে এমন কিছু শ্লোগান দেবে যা অন্য মিছিলে দেয়া যায় না। সুতরাং রাজবংশী সমাজের এমন নিজস্ব মিছিলটাকেও সুস্থির সাজাতে চায় শহরের অন্যান্য পার্টির বড় বড় মিছিলের মত করে। অন্যান্য পার্টির মত মিছিল সাজাতে পারলেই উত্তরখণ্ড একটা পার্টি হয়ে উঠতে পারবে যেন। অন্য কোনো পার্টি কি এই রকম মিছিলে বাঘারুর সাইজের নেংটিপরা একটা লোককে মিছিলের শুরুতে প্রধান ঝাণ্ডা দিয়ে দাঁড় করাত ? বাঘারু নেংটিপরা বলে সুস্থিরের কিছু মনেই হয় নি। বাঘারুর এত বড় শরীরটা দেখেও সুস্থিরের কিছু মনে হয় না। কিন্তু মিছিলের শুরুতে বাঘারুকে কতটা মানাবে এটা নিয়ে আরো যেন একটা গোপন বিচার করতে হয়। যদি উত্তরখণ্ড পার্টির এ-রকম মিছিল করা অভ্যেস থাকত তাহলে সুস্থির ভাবত না। কিন্তু সেই অভ্যেসটা এই মিছিলগুলি থেকে তৈরি হবে বলেই সুস্থিরের ভাবনা। সুস্থির যতক্ষণ ভাবে, তার মধ্যে মিছিলটা বেশ তাড়াতাড়ি সাজানো হয়ে যায়। সবাই যখন বোঝে কী ভাবে দাঁড়াতে হবে, তখন সবাই নিজের মত করে দাঁড়িয়ে যায়।

গয়ানাথ বলে, 'নিশানখান ইমরাক দেন কেনে, এ ধরিবার পারিবে।' সুস্থির বাঁশটা বাঘারুর দিকে এগিয়ে দেয়। বাঘারু ধরে না। সুস্থির বলে, 'ধরেন কেনে।' বাঘারু যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে দাঁড়িয়ে থেকেই বাঁশটা ডান হাতে ধরে। সে ঘাড় তুলে দেখেও না সেই বাঁশের মাথায় কোন ঝাণ্ডা ঝুলছে।

বাঘারুকে বাঁশটা ধরিয়ে সুস্থির নেতাদের ডাকতে শুরু করে, 'এই কাকা, কাকা, অমনী কাকা, এইঠে

আসেন— ।' সুস্থিরকে গিয়ে হাত ধরে নেতাদের টেনে-টেনে এনে সেই ফেস্টুনের সামনে দাঁড় করাতে হয় । নেতারাও লাইন দিয়ে দাঁড়ান । তখন মিছিলের একটা চেহারা এসে যায় । সামনে মোটর সাইকেল বাহিনী । তার পর নেতারা । তাবপর ফেস্টুন । তারপর মেয়েরা । তারপর পুরুষরা । সুস্থির যেন এখানো ঠিক করতে পারে না, ঐ অত উঁচু বাঁশের মাথায় নিশানটা কোথায় থাকবে, নিশানটা বাঘারুর হাতেই থাকবে কিনা, যদি থাকেই তা হলেই-বা বাঘারু কোথায় দাঁড়াবে । সুস্থির চিৎকার করে বলে, 'মোটর সাইকেলত্‌ সগায় খানিকখন আস্তে-আস্তে চলিবে । তাব বাদে—সাইকেল মিছিলখান আগত চলি যাবে শ্লোগান তুলি-তুলি আর হাঁটা মিছিলখান পাছত-পাছত যাবা ধরিবে । জল্পেশত হামরালা শপথ নিম আর তিস্তাবুড়ির একখান পূজা করিম ।' থেমে সুস্থির মিছিলটা একবার দেখে ও কিছুটা অন্যমনস্ক ভাবেই বাঘারুকে হাত ধরে টেনে মিছিলের সামনে, নেতাদেরও সামনে দাঁড় করিয়ে দেয় । নিশানটির ত ঐখানেই থাকার কথা, মিছিলের মাথায় । মোটর সাইকেলগুলো চলে গেলে বাঘারুই থাকবে এই এত বড় ঝাণ্ডা হাতে মিছিলের শুরুতে, তাবপব নেতারা, তারপব ফেস্টুন, তারপর মেয়েরা, তারপর পুরুষরা ।

সুস্থির আওয়াজ তোলে—'উত্তরখণ্ড পার্টি' 'জিন্দাবাদ' । কোন শ্লোগানের কী উত্তর হবে সেটা যারা জানে তারা মিছিলের নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে বলে মিছিল থেকে শ্লোগানটা তত জোরে ওঠে না । কিন্তু সাইকেল আর মোটর সাইকেলেব লোকজন শ্লোগান খুব ভাল জানে । তারা চিৎকারে-চিৎকারে শ্লোগানগুলো জমিয়ে দেয় । 'কামতাপুর রাজ্য, কায়েম করো, কায়েম কবো ।' 'উত্তরখণ্ড দিচ্ছে ডাক, ভোটের বাক্স খালি যাক ।' 'কৃষকেব জমি কাড়ি তিস্তা ব্যারেজ চলিবে না ।' 'তিস্তা ব্যাবেজের মিছিলে যোগ দিন, যোগ দিন ।'

একশ চুরাশি

মিছিলের মাথায় বাঘারু

ময়নাগুড়ি ছাড়াতে না-ছাড়াতেই মিছিলটা তিন টুকবো হযে যায় । শ্লোগান দিতে-দিতে মোটর সাইকেলওয়ালারা আগে-আগে ছুটে যায় । সাইকেলওয়ালাবা প্রাণপণে সাইকেল চালিয়ে মোটর সাইকেলওয়ালাদের সঙ্গে থাকতে চায় । কিন্তু তাদের সবার পক্ষে অত জোবে সাইকেল চালানো সম্ভব হয় না । ফলে তারা মোটর সাইকেল আর পায়ে হাঁটা মিছিলের মধ্যে ভাঙা সাঁকোর মত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে । তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকার অনেক জায়গায় বর্ষাব শুরুতে এ-রকম ভাঙা সাঁকো দেখা যায় । কনট্রাক্টারদের ভাষায় যাকে বলে 'ফেয়ার ওয়েদাব ব্রিজ', বর্ষার প্রথম চোটেই তা ভেঙে নদীর বুক জুড়ে এ-রকমই ছড়িয়ে থাকে ।

কিন্তু ময়নাগুড়ির বাইবে জল্পেশের দিকের এখনকার পাকা রাস্তায় মিছিলটাকে অতটা টুকরো-টুকরো দেখায়ও না যেন । রাস্তার দুপাশে খেতবাড়ি, মাঠ, চাষেব কাজ একটু-আধটু শুরু হয়েছে, কিন্তু বেশির ভাগ জমিই ফাঁকা । রাস্তাটা এঁকেবেঁকে যেভাবে গেছে তাতে বহুদূর পর্যন্ত ফাঁকা রাস্তাটা একসঙ্গে দেখা যায় । যদি-বা কোথাও কোনো টাড়ির বাড়িঘরে বা গাছপালায় রাস্তাটা আড়ালে পড়ে তা হলেও, সেটুকু বাদ দিয়ে তার পরের অংশটা দেখা যায় । এই এত দীর্ঘ, প্রায় পুরো রাস্তাটা একবারে দেখা যায় এই মিছিলের গোটাটাসহই । এতবড় রাস্তাটা একসঙ্গে যে দেখা যাচ্ছে তাতেই মিছিলের টুকরোগুলো জোড়া লেগে যায় কারণ রাস্তায় আর-কোনো গাড়ি নেই, আর-কোনো লোকও নেই । এতগুলো মোটর সাইকেলের আওয়াজে কোথাও-কোথাও কিছু-কিছু লোক বেরিয়ে আসে কিন্তু তারা রাস্তায় ওঠে না । নানা পাড়ার কুকুরগুলো মোটর-সাইকেলের আওয়াজে সেই আওয়াজ ছাপিয়ে চিৎকার করতে-করতে ছোটে তাদের স্বনির্ধারিত সীমানা পর্যন্ত । কিন্তু তারপর নতুন এলাকার কুকুর চেঁচাতে শুরু করে । পুরনো এলাকার কুকুর তখন ফিরে আসতে-আসতে সাইকেলওয়ালাদের দিকেই ঘাড় উঁচু করে চেঁচায় ।

কিন্তু সাইকেলওয়ালারা এতটা রাস্তা জুড়ে এতটাই ছড়ানো যে কুকুরগুলো ঘাড় নিচু করে ফেলে দাঁড়িয়ে পড়ে, মূল মিছিলটা পৌঁছুবার আগেই পাড়ায় ফিরে যায়।

মূল মিছিলটা কিন্তু ভাঙে না। ঠিক যেভাবে ময়নাগুড়ি থেকে বেরিয়ে জল্পেশের রাস্তায় উঠেছে, সেভাবেই জল্পেশের রাস্তা ধরে এগিয়ে যায়। মিছিলের হাঁটার যেন একটাই ছন্দ তৈরি হয়ে যায়। সে-ছন্দটা কেউ ভাঙে না। এ-রকম ছন্দ অবিশ্যি দূরের রাস্তার মানুষদের ভেতর তৈরি হয়ে যায় রাস্তার নিয়মে বা হাঁটার নিয়মে। হাট বা মেলায় যাওয়ার সময় বা হাট বা মেলা থেকে ফেরার সময় বড় আলপথে মানুষের চলার এই ছন্দ দেখা যায়—প্রত্যেকেই নিজের মত করে হাঁটছে কিন্তু মনে হয় সবাই মিলে হাঁটছে। ময়নাগুড়ি থেকে জল্পেশেব এই রাস্তাটাও প্রায় বড় একটা আলের মতই। এই রাস্তাটা বাঁধানো—আলের সঙ্গে এইটুকু তফাত। কিন্তু আলের ওপর দিয়ে যেমন গাড়িঘোড়া গিয়ে মানুষের চলমান সারিকে ভাঙতে পারে না, এই রাস্তাতেও কোনো গাড়ি ত আর মিছিলের ভেতর দিয়ে যায় না। অনেক মানুষ অনেক দূরের পথ একসঙ্গে বাধাহীন পার হতে পারলে এ-রকম মিছিলেরই মত দেখায়।

এই রাস্তাটাতে মিছিলটা কী-রকম মানিয়েও যায়।

পুরো রাস্তাটা না-হলেও তার অনেকখানিই যে দেখা যায় তাতেই এই এতগুলো মানুষের একসঙ্গে হেঁটে আসার যেন একটা মানে আসে। এরা কতটা দূরত্ব হাঁটবে তা সকলে দেখতে পায়। যে-'বেটিছোয়া'-দুজন ফেস্টুন ধবেছিল তাবা ফেস্টুনটা টান-টান বাখতে পারে না। কিছুক্ষণ পরই তাদের হাত পরস্পরের দিকে নেতিয়ে যায়। কেউ কিছু না-বলায় হাত দুটো আরো নেতিয়ে পড়ে। ফেস্টুনের কাপড়টা পেছনের দুই সারির মাঝখানে প্রায় গড়িয়েই পড়ে কিন্তু বাতাসের জন্যে পুরো গড়িয়ে যায় না। ফেস্টুনটা ওভাবেই চলে। তাতেও একটা দৃশ্য তৈরি হয়। ফেস্টুনটা যদি ঝাণ্ডার মত একজনের হাতে থাকত তাহলে এতটা বাতাসে সেটা সেই একজনের হাত থেকে পুরো মিছিলের মাথার হাতখানেক উঁচুতে স্রোতের মত উড়ত।

বাঘারুর হাতেই ঝাণ্ডাটা শুরুতে যেমন, শেষেও তেমন। ঐ লম্বা বাঁশের মাথায় তেকোনা ঝাণ্ডা আর বাঘারু বাঁশের গোড়াটা ধরে আছে দুই হাতে, কাঁধের ঠেকনো দিয়ে। যে-রকম বাতাস, এমন খোলা মাঠে এমনই বাতাস ওঠে অবিশ্যি, তাতে বাঘারুর চাইতে কম জোরালো কেউ ঝাণ্ডাটা এমনি সোজা রেখে ময়নাগুড়ি থেকে জল্পেশ নিয়ে আসতে পাবত না। এই মিছিলটার কাজ ত হেঁটে-হেঁটে জল্পেশ পৌঁছানো। এক বাঘারুরই কাজ এই বাঁশটাকে এত বাতাসের মুখে খাড়া রাখা। ফলে মিছিলের মাথায় তার নেংটিপরা শরীরটা এমনই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে যে সেই সূত্রে বাকি মিছিলটা অর্থ পায়। বাঘারুর শরীরের এই অর্থটা বুঝে ওঠা, অন্তত দেখে ওঠাও, সুস্থিরের হয় না, কারণ, সুস্থির মোটর সাইকেলে আগে জল্পেশে চলে গেছে—শপথ গ্রহণ ও তিস্তাবুড়ির পূজা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাদির জন্যে। মিছিলটা বাঘারুর শরীর থেকেই বেরচ্ছিল। বাঘারুর পেছনে আর ফেস্টুনের সামনে ছিলেন পঞ্চানন মল্লিক, বীরেন বসুনিয়া, গয়ানাথ জোতদার, দেবমোহনবাবু, নবীন, তিলক, ধৈর্যমোহনবাবু, সম্পৎ রায়। এঁরা ছাড়াও আরো জনা ছয়-সাত। এদের সঙ্গে মিছিলের বাকি অংশের তফাতটা পোশাকেই ধরা পড়ছিল। জামা-পরা বা জুতা-পরা আরো অনেক ছিল বটে কিন্তু যাদের জামা আছে তাদের অনেকেরই ধুতি নেই, যাদের ধুতি আছে তাদের অনেকেরই জামা নেই। ময়নাগুড়ি ছাড়িয়ে এই রাস্তায় পড়তেই মিছিলটার পোশাক অনুযায়ী এই দুই ভাগ ধরা পড়ে যায়।

বাঘারুটা মিছিলের মাথায় থাকে বলে ও তার পেছনে-পেছনে এমন-কি এই জোতদার-দেউনিয়া লোকজনও যাচ্ছে বলে মিছিলটাকে যেন রীতিনীতি মেনে চলা একটা পুজোটুজোর মতই ঠেকে। নইলে বাঘারু অতটা আগে থাকে কী করে? বাঁশের ওজনটা আন্দাজ করলে এর একটা সহজ জবাব পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ঐ অত জন জোতদার আর দেউনিয়া যে-রকম পায়ে-পায়ে বাঘারুর নেতৃত্ব মেনে নেয় তাতে ঐ সঙ্গে জবাবটাও জটিল হয়ে যায়। কোনো-কোনো পূজা যেমন শুধুই মেয়েদের—মেচেনি খেলা বা হুদ্মার নাচ, কোনো-কোনো পূজা যেমন শুধু চ্যাংড়াদের—দোলখেলার দ্বিতীয় দিন কাদাখেলা, তেমনি যেন এই মিছিলের আচারই এই যে বাঘারু তার বাহু, কব্জি, বুকপিঠের পেশিগুলোকে এই রকম স্পষ্ট করে এই ঝাণ্ডা বইবে আর তার পেছনে-পেছনে এই 'বড়-বড় মানষির ঘর' চলে।

বাঘারু ত কোনোদিন মিছিলে চলে নি। কিন্তু তাকে ডেকে এনে তার 'গিরি' জোতদার এই বাঁশটা

তার হাতে ধরিয়ে দিতেই সে মিছিলের লোক হয়ে যায়। এখন দুপাশে এই নাড়া খেতের মাঝখান দিয়ে পড়ে থাকা এই রাস্তাটায় বাঘারু মিছিলের পরিচালক। পবিচালনার জন্যে তার কোনো বিশেষ ভূমিকা নেই—যদি না এই ঝাণ্ডা ধরে রাখাটি বিশেষ ভূমিকা হয়। কিন্তু এই মিছিলের পরিচালক হওয়ার জন্যে তার কোনো বিশেষ ভূমিকাব তত প্রয়োজনও ছিল না—প্রয়োজন ছিল, যারা তার পেছন-পেছন আসছে তাদের বিশেষ-বিশেষ ভূমিকা। বাঘারুর ঠিক পেছন-পেছন যারা আসছে তারা ঠিক করেছে বলেই বাঘারু তাদের সামনে হাঁটছে, বাঘারু এই মিছিলেব পরিচালকই হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাদের মধ্যে একজনও যদি ইচ্ছে করে তাহলে যে-কোনো মুহূর্তে সে বা তারা বাঘারুর আগে এসে দাঁড়াতে পারে। সেই এগিয়ে দাঁড়ানোর জন্যে তাদের এক পাও নড়তে হবে না। বাঘারুকে পেছনে চলে যেতে বললেই তারা সামনে পড়ে যাবে।

কিন্তু তা ত এখন আর বলা যায় না। এখন এই মিছিল যে-অর্থে নিজেকে অর্থবান করে তুলতে চায় তার সঙ্গে বাঘারুর এই সবাব আগে থাকাটা মিশে গেছে। সেই মিশ্রণটা এই মিছিলেব পক্ষে খুব দরকারি। সেই মিশ্রণটাকে এখন আব নষ্ট কবা যায় না। তাই, বাঘারু না-জেনেও এই মিছিলের প্রতীক হয়ে ওঠে, প্রতিনিধি হযে ওঠে। জল্পেশ পর্যন্ত দূরত্বটুকু সেই প্রতীক ও প্রতিনিধিকে রক্ষা করতে হয়।

বাঘারুর হাঁটার মধ্যে কোনো নতুনত্ব ছিল না। তাকে যে এ-রকম মিছিলে জীবনে কখনো হাঁটতে হয় নি, মিছিলের একেবারে মাথায হাঁটা ত দূরেব কথা, তা তার হাঁটার স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বোঝা যায় না। একটু অসুবিধে তাব হয় না, তা নয়। পিচ রাস্তার ওপর দিযে হাঁটা ত তার অভ্যেস নেই, ফলে পায়ের তলায় লাগছিল। মাইল-মাইল বিস্তার যে এক-একদিনে পায়ে হাঁটে তার পায়ের তলায় ঐ কাঁকর, ছোটখাট পাথর, ফুটে যাচ্ছিল। কিন্তু বাঘারুকে বাঁচিযে দেয ঐ নিশানেব বাঁশটাই। শুধু তার নিজের শরীরটার ভার বইতে হত যদি বাঘারুকে এখানে এই আলের মত ফাঁকা পিচ রাস্তায়, তা হলে অনেক বেশি পাথর ফুটত তার পায়ে। একে অনভ্যস্ত বাঁধানো রাস্তা, তায় অনভ্যস্ত ভাবহীনতা। বাঁশের ভারটা থাকায় ও এত লম্বা বাঁশটাকে সোজা রাখতে বলপ্রয়োগ করতে হয় বলে, বাঘারু কিছুক্ষণের মধ্যেই এই পথটাকে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে দলতে পারে, এই নিশানও অভ্যস্ত ভঙ্গিতে ওড়াতে পারে। তার মানে, এমন মিছিলের নেতৃত্ব দেয়াব অভূতপূর্ব ব্যাপারটাকেও বাঘারু তার অভ্যাসের মধ্যে নিয়ে নিতে পারে। তার পেছনে যে তারই জোতদার, আর অনেক জোতদারের সঙ্গে তাকে অনুসবণ করে আসছে—এটা তার মগজেই ঢোকে না।

বাঘারুকে নেতা সাজিয়ে যে-নেতারা তাকে অনুসরণের ভঙ্গিতে হাঁটছিল তারাও কেউ হাঁটায় কম যায় না। তাদের প্রায় প্রত্যেককেই মাইল-মাইল হাঁটতে হয় রোজ। তাদেরও বরং অসুবিধে এই পিচের রাস্তা বলেই। তাদের সবারই পায়ে এখন জুতো—ক্যামবিসের, রবারের, চায়নিজ . একটু কমবয়েসিদের পায়ে স্যান্ডেলও আছে। তাই কাঁকর লাগে না। কিন্তু তারা মাঠ দিয়ে, আল দিয়ে মাইল-মাইল হাঁটে যখন, তখন মাটিতে পা ফেললে বোঝা যায় মাটিতে পা ফেলছে। মাটিটা একটু দেবে যায়, বা বালিটা একটু সরে যায়, বা ঘাসগুলো নুয়ে পড়ে। কিন্তু এই পিচেব রাস্তায় পা ফেললে পা-টা সে-রকম কোনো সাড়া পায় না। নিজের পায়ের আন্দাজে বোঝা যায় না—তারা হাঁটছে।

তবু ত হাঁটছেই। হাঁটছে বাঘারুর পেছনে-পেছনে, বা বাঘারুবাহিত নিশানের নির্দেশ অনুসারে। বাঘারুর নিশানটা যে কত উঁচুতে উঠে আকাশে পতপত করে সেটা এই নেতারা খুব ভাল দেখতে পায় ও দেখে। তাতে তাদের একটা বেশ গর্বও হয়। রাজবংশী সমাজের ভেতরে কয়েক শ বছর ধরে জমা হয়ে আছে বর্ণহিন্দু সমাজের সঙ্গে তুলনা থেকে আসা এক হীনম্মন্যতা। এখন এই বাঘারুর হাতে ধরা নিশানাটার পেছনে সেই তরাইয়ের সম্পৎ রায় থেকে পুণ্ডিবাড়ির কালিপ্রসন্নর বড় ছেলে পর্যন্ত যে এমন ফাঁকা মাঠের ভেতর দিয়ে এমন একসঙ্গে হেঁটে যাচ্ছে তাতেই যেন তাদের অভীষ্ট অনেকটা সিদ্ধ হয়ে যায়। অন্তত এখানে ত তাদের রাজবংশী পরিচয় ছাড়া আর-কোনো পরিচয় নেই। এই পরিচয়টুকু নিয়ে ত তারা গত কয়েকদিন ধরে সম্মিলন করে আসতে পারল, কাল রাত্রিতে ঐ রকম এক শ্রীদেবীকে এনে এমন অনুষ্ঠান করে ফেলতে পারল ও এখন এতটা রাস্তায় মিছিল করে জল্পেশে যেতে পারছে।

একশ পঁচাশি

মিছিলহারা ঝাণ্ডা নিয়ে তিস্তাবুড়ির পূজা দেখতে-দেখতে বিব্রত বাঘারু

কিন্তু জল্পেশে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান ও তিস্তাবুড়িব পুজো তেমন জমল না।

মিছিলে বেশির ভাগই ছিল এদিককাব লোক। যাদেব গাঁ বা টাড়ি রাস্তায় পড়েছে তারা মিছিল থেকে সরে গেছে। গাঁ বা টাড়িপিছু হয়ত দু-একজন কবে থেকে গেছে। জল্পেশ পার হয়ে যে-সব গাঁ বা টাড়িতে যেতে হয় সে-সবেব লোকজন অবিশ্যি জল্পেশ মন্দিরে বসে, চলে যায় না। সুস্থিরের মোটর সাইকেলের দলটারও অনেকে মোটর সাইকেল চালানোর আনন্দে জল্পেশ ছাড়িযে আরো দূরে চলে গেছে। তাদেব কেউ-কেউ ফিরে আসে বটে কিন্তু তাদের সঙ্গে ত এই মিছিল বা অনুষ্ঠানের কোনো সম্পর্কই তৈরি হয় না। এক সাইকেলওয়ালাবা সবাই এতটা এসে হাঁফিয়ে পড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বিশ্রাম নেয়। যখন মূল মিছিলটা বাঘারু ও নেতৃবৃন্দসহ জল্পেশ পৌঁছয় তখন মনে হয এখানে এসে পড়াটাই তাদেব উদ্দেশ্য ছিল, এব পর আর-কোনো অনুষ্ঠান নেই।

কিন্তু সুস্থির সমস্ত ব্যবস্থা কবে রেখেছিল। মিছিলটা সোজা জল্পেশের মন্দিরেব দিকেই হাঁটে, তার জন্যে সুস্থির বাঘারুকে প্রায় হাত ধরে পথ দেখায়। বাঘারু এর আগেও জল্পেশ্বর মন্দিবে হযত এসেছে গয়ানাথের দবকারে কিন্তু সে যে শিবলিঙ্গ পর্যন্ত যেতে পারে এটা তার ধারণাই ছিল না। অথচ তার বাহু ধরে টানতে-টানতে সুস্থির একেবারে মন্দিরের সিঁড়ি পর্যন্ত নিয়ে যায়। মন্দিবের সিঁড়ির গোড়ায় যখন বাঘারু প্রায় পৌঁছে গেছে, তখন তার মনে হতে শুরু করেছে শেষ পর্যন্ত সুস্থির কি তাকে সিঁড়িগুলো দিয়ে ওপবেও তুলবে নাকি? যদি তোলে তা হলে ঝাণ্ডাটা কী কববে, এ-কথাটা যেমন সে ভাবে, তেমনি ভাবে, সে উঠবে না। কিন্তু ঐ সিঁড়ির গোড়াতে এসেই সুস্থির তাকে ছেড়ে দেয, সঙ্গে-সঙ্গে 'জয বাবা জল্পেশ্বর' আওয়াজ ওঠে। বাঘারু দুই হাতে বাঁশটা ধরে সেই বাঁশের গোডাতেই নত হয়ে ভক্তিভরে কপাল ঠেকায়। বাঘারুকে হামেশা এমন কপাল ঠেকাতে হয় না বলে সে বোঝেও না কতক্ষণ কপাল ঠেকিয়ে রাখবে। বুঝলেও যে খুব সুবিধে হত তা নয়, কারণ, তার সময়ের বোধ অত সঠিক নয়। কিন্তু এতটা পথ এত বড মিছিলের আগে-আগে ঝাণ্ডা বয়ে আনার প্রতিক্রিয়াতেই হয়ত তাব মনে হতে শুরু করে যে তার বোধহয় একটু বেশি সময়ই প্রণাম করা উচিত। একে বাবা জল্পেশ্বব, তাতে মিছিল, তাতে মিছিলেব নিশান। তা ছাড়া—জল্পেশ্বর মন্দিরে এমন একটা মাথা নোয়ানোব সুযোগ ত সারা জীবনে তার আর নাও আসতে পারে। বাঘারু যে মাথা নিচু করে তার গত ও আগামী জীবনের পবিপ্রেক্ষিত ভেবে ফেলে তা নয়—সে বেশ অনেকক্ষণ ঝাণ্ডার বাঁশটা দুই শক্ত হাতে ধরে বাঁশের গোড়ায় মাথাটা নুইয়ে রাখে। যখন সে মাথাটা তোলে তখন পাশাপাশি কাউকে দেখতে পায় না, পেছনেও কাউকে দেখতে পায না। এতক্ষণ চোখ বুজে থাকায় চোখটা আঠা-আঠা লাগে। সে একটা হাত আলগা করো চোখটা একটু কচলে নেয। কিন্তু তারপরও পাশে বা পেছনে কাউকে পায় না।

বাঘারু এবার তার মিছিলের ঐ অত লম্বা বাঁশের মাথায় নিশান নিয়ে একা-একা, যেন মিছিলটা খোঁজে। পেছনে লোক নেই অথচ নিশানটা এমন পতপত করে উড়ছে এটা খুব বেমানান ঠেকে বাঘারুর কাছে। এই বাঁশ আর ঝাণ্ডাটা থাকায় সেও একা-একা হাঁটার মত করে হাঁটতে পারছে না। 'মিছিলের বাঁশ আর ঝাণ্ডাখান মোর কাঁধত রাখি কোটত গেইল হে গয়ানাথেব মিছিল?' মন্দিরেব প্রধান এলাকা থেকে বাঘারু বাইরে বেরয়।

বেরতেই দেখে মিছিল বলে আর চেনার উপায় নেই, পুকুরের পাড়ে এমনই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে সব। বাঘারু ত ঐ মিছিলের কারোই মুখ দেখে নি। সে শুধু মিছিলটাকেই দেখেছে। মিছিলে যে-মুখগুলি ছিল সেগুলিকে সে মিছিলের বাইরে চিনবে কী করে? কিন্তু তবু যে বাঘারু আন্দাজ করতে পারে যে পুকুরের পাড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে থাকা এই মানুষগুলি মিছিলেরই লোক তার কারণ মন্দিরের মাঠে মিছিল ছাড়া আর-কোনো লোক ছিল না।

বাঘারু ঐ বাঁশটা ধরে কোনদিকে যাবে বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়ে থাকে, বাঁশটা ধরেই। সেখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই সে দেখে ও শোনে একটু দূরে একটা জায়গায় গয়ানাথ, আসিন্দির, 'আরো সগায় দেউনিয়ার ঘর খাড়ি আছে', আর একদল মেয়ে, 'বেটিছোয়ার ঘর ঘুরি-ঘুরি গান গাবার ধরিছে।' একটু দাঁড়িয়ে শুনতেই বাঘারু বোঝে, তিস্তাবুড়ির পুজো হচ্ছে। ওখানে নিশ্চয়ই পাটকাঠি দিয়ে তিস্তাবুড়িও

একটা বানানো হয়েছে। গানগুলো খুব মন দিয়ে যে শোনে বাঘারু তা নয়, কিন্তু জন্ম থেকে শুনতে-শুনতে এ গান এতই জানা যে শুনতে না-চাইলেও শোনা হয়ে যায়।

সগগ হতে নামিল তিস্তাবুড়ি
মনচে দিয়া পাও
মনচ হতে নামিল তিস্তাবুড়ি
চ্যাতন কবিল গাও
কাচা দুধ আলোযা ক্যালো
ভইক্ষণ করো।

দেখতে-দেখতে তিস্তাবুড়িব পুজো শেষ হয়ে যায়। এ-সব পুজো যেমন চলতেই থাকে, চলতেই থাকে, তেমন কিছুই হয় না। পঞ্চানন মল্লিক উঠে বলেন, 'তিস্তাবুড়ি আমাদের দেবতা হন। সেই তিস্তাবুড়িকে বান্ধা আমবা সহ্য করিব না। আব এক মাস পবে তিস্তা ব্যারেজেব উদ্বোধনেব দিন আমবা প্রতিবাদের মিছিল নিয়া ঐ তিস্তা ব্যাবেজেব কাছে যাইব। আপনাবা সব জাযগা হইতে সেদিন মিছিল লইয়া তিস্তা ব্যাবেজে যাইবেন। তিস্তা ব্যাবেজে প্রতিবাদ কবাব জন্যে আপনাবা আজি হইতে এক মাস নিজেব-নিজেব টাডিতে, হাটে, গাঁয়ে, গঞ্জে প্রচাব কবিবেন ও সেদিন সব জাযগা হইতে মিছিল লইয়া যাইবেন। এখন শপথপত্র পাঠ হইবে। আমি পডিব, আপনাবা সঙ্গে-সঙ্গে পডিবেন। জয় বাবা জল্পেশ্বব। জয় তিস্তাবুড়িব জয়।'

এখানে মিটিঙেব মত সবাই এক জায়গায় জড়ো হয়ে নেই। যে যার মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মাইকও নেই। ফলে কী বলা হচ্ছে, কী পড়া হচ্ছে সেটা কেউ একটা খুব খেয়ালও কবে না। যেখানে তিস্তাবুড়িব পুজো হচ্ছিল সেখানে নেতাবা যে-কয়েকজন ছিল, গয়ানাথও ছিল, তাবা একসঙ্গে কিছু পড়ে বা বলে। তবে যখনই একটু উঁচু গলায় 'জয় বাবা জল্পেশ্বব' আব 'জয় তিস্তাবুড়িব জয়' ধ্বনি উঠছিল তখন যে যেখানেই থাকুক সাড়া দিচ্ছিল, সে-সাড়া খুব জোবে না উঠলেও, উঠছিল।

উত্তবখণ্ড সম্মিলনেব সবাই যে নাটকীয় পবম্পবায এই কর্মসূচিটি ভেবেছিল, সেটি ঘটে উঠল না। পবপব ক-দিন সম্মিলন, তাতে নানাবকম আলোচনা। পব-পব কদিন অনুষ্ঠান, তাতে নানারকম প্রোগ্রাম। শেষেব দিন শ্রীদেবীব নাচে একটা চূড়ান্ত নাটক। তাব পবদিন জল্পেশ্বব অভিযানে উত্তবখণ্ডেব আবো চূড়ান্ত নাটক।

কিন্তু 'জল্পেশ্বব অভিযান', 'শপথগ্রহণ', তিস্তাবুড়িব পূজা', এ-সব কথা কাগজে ছাপাব হরফে যে-বকম দেখায় বা বক্তৃতায় মুখেব কথায় যে-বকম শোনায়, বাস্তবে সে-বকম দেখায় না বা শোনায় না। শ্রীদেবীব নাচটুকু ছিল বলে, তাতে এদিক থেকে এত লোক গিয়েছিল বলে, ও তাদের প্যান্ডেলে থাকাব জায়গা দেয়া হয়েছিল বলে—এই মিছিলটা ময়নাগুড়ি থেকে জল্পেশ পর্যন্ত হেঁটে আসতে পাবল। নইলে তাও হত না। তাহলে সুস্থিরের সাইকেল বা মোটব সাইকেল মিছিল পর্যন্ত হযত হত। কিন্তু সাইকেল বা মোটব সাইকেলে মিছিল কবে এসে ত আব তিস্তাবুড়ির পূজা, জল্পেশ্বরের পূজা, শপথবাক্য পাঠ এ-সব কবা যায না। কবা যাবে না কেন, যায, কিন্তু সেটা যাবা কবল তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, আব-দশজনেব মধ্যে প্রচাবিত হবে না। কিন্তু এখানে এই জল্পেশ্বব অভিযান আর তিস্তাবুড়িব পূজা আর শপথবাক্য পাঠ যাই হোক না কেন, খবরের কাগজেব রিপোর্টারদের কাছে এগুলো বললে এব চেহাবাই অন্যবকম হয়ে যাবে।

উত্তবখণ্ডেব নেতাবা এখানে জল্পেশ্বব মন্দিবেব নিভৃতিতে খববেব কাগজের জন্যে একটি খবর তৈরি কবছিলেন মাত্র।

সব যখন শেষ হয়ে যায় তখন বাঘারু বোঝে না যে এখন এই বাঁশ ও বাঁশেব মাথায় ঝাণ্ডা নিয়ে কী কবে। নিজেব ভেতব সে একটা যুক্তি পায—'মিছিল না থাকিলে ঝাণ্ডাখান কেনে থাকিবে? মিছিল নাই ত ঝাণ্ডা নাই।' সে জল্পেশ মন্দিবেব একটা গাছেব গায়ে ঐ বাঁশটা হেলান দিয়ে রেখে দেয়।

একশ ছিয়াশি

উত্তরখণ্ডের হাটমিছিল

বাঘারু যদিও জল্পেশ মন্দিরের গায়ে উত্তরখণ্ডের লম্বা ঝাণ্ডাটা বেখে দিয়েছিল—কিন্তু পরেব এক মাস ঐ ঝাণ্ডা তাকে ছাড়ে না।

তিস্তা ব্যারেজ উদ্বোধন উপলক্ষে বিক্ষোভ দেখানোর জন্যে উত্তরখণ্ড দলেব মিছিল সাজানোব সব দায়দায়িত্ব যেন গয়ানাথ আর আসিন্দিবেব ওপবই এসে পড়ে। অথবা, তারা নিজেবাই সে দায় মেনে নেয়। অন্যদের কাছে তিস্তা ব্যাবেজ ত খবর, বিক্ষোভ দেখাতে এসেও নদীব ভেতবে অত বড় কাণ্ডকারখানার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে না-থেকে পারবে না। কিন্তু গয়ানাথ-আসিন্দিবের কাছে ত তিস্তা ব্যারেজ সে-রকম ব্যাপার না—সেই বছর দশ-বারব আগের সেটলমেন্ট থেকে শুরু করে এই বছব দশ বারর নানা মামলা-মোকদ্দমা পর্যন্ত এই ব্যারেজটা ত তাদের চোখের সামনেই ঘটে গেছে আব যত ঘটে গেছে ততই যেন সেটা তাদের উল্টো দিকে ঠেলে দিয়েছে। সেই উল্টো ঠেলায এতদিন পর্যন্ত মামলা-মোকদ্দমাই চলছিল, এখন এই উত্তরখণ্ডের সুযোগে আর তিস্তা ব্যাবেজের উদ্বোধনেব উপলক্ষে তারা যেন হাতের কাছে নতুন একটা উপায়ই পেযে যায তিস্তা ব্যাবেজকে ঠেকানোব জন্যে। তিস্তা ব্যারেজ যে ঠেকানো যাবে না, সেটা গয়ানাথ-আসিন্দিব তাদেব নিজেদেব বৈষযিক বুদ্ধিতেই বুঝে ফেলে। তিস্তা ব্যারেজ যে ঠেকানো গেল না, এটা ত তাবা নিজেদেব চোখেই দেখতে পায। তিস্তা ব্যারেজ ঠেকিয়ে যে মামলাগুলি জেতা যায় না—সেটা বুঝতে ত আর বেশি বুদ্ধিব দবকাব হয না। তবু তিস্তা ব্যারেজের উদ্বোধন নিয়ে গযানাথ আর আসিন্দিব যে এতটাই মেতে ওঠে তাব একটা কাবণ হয়ত এই যে উত্তরখণ্ড সম্মিলনে এই প্রথম তারা, বিশেষত গযানাথ, একটা স্বাদ পেল যে অনেক মানুষকে জড়ো করতে পারলে একটা কাজ আদায় কবে নেযা যায।

এতদিন এই মানুষকে একসঙ্গে মেলানোব ব্যাপারটাকে গযানাথ সন্দেহ কবেই এসেছে। এমন-কি, কংগ্রেস ছাড়া ভোট দেয়ার কেউ না-থাকলেও গযানাথ এই মানুষজনকে নিযে হৈ-হৈ কবাব ব্যাপাবে কংগ্রেসকেও বিশ্বাস করে না, অন্য পার্টিদেব ত করেই না। কিন্তু এখন, এই মানুষগুলোকে একসঙ্গে করে আন্দোলনেব ব্যাপারটা সে বুঝে ফেলে নতুন ধবনেব 'পদ্মা', 'আই আব' এইসব বিছন দিয়ে ধান চাষ করার নিয়মে। গয়ানাথ ত আর সবকাবের হাতে তামাক খেতে যায় নি। সে যখন চোখের সামনে দেখেছে যে এই সব 'হাইইল' চাষে সময় কম লাগে, ফলন বেশি হয, তখন সে তাব জমিতে এই বিছনে চাষ লাগিয়েছে। সে যখন বুঝেছে মানুষ ছাডা তাব উপায নেই তখনই উত্তবখণ্ডে যোগ দিয়েছে আব 'তিস্তা ব্যারেজ বন্ধ কবো', 'বন্ধ করো', শুরু কবেছে।

কিন্তু শুরু করলেও এই সব মিছিল-মিটিঙেব নিয়মকানুন ত আর গয়ানাথের জানা নেই। উত্তরখণ্ডের চ্যাংড়া নেতারা তার এই বাড়িতে বসে মিটিঙ করে তাকে বলে গেছে, অন্তত কাছাকাছি প্রত্যেকটা হাটে হাটের দিন যেন মিছিল তোলা হয়। তাব একটা লিস্টিও করা হয়। আজকাল যেখানে-সেখানে হাট বসে যাচ্ছে। কোন হাটে মিছিল তোলা যাবে আর কোন হাটে যাবে না তা ঠিক করতেই সময় যায়। গোচিমারির হাটটা পুরনো আবার কুমারপাড়ার হাটটা নতুন হলেও বড়। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় সবসুদ্ধ প্রায় বিশটা হাটে মিছিল তুলতে হবে।

'মিছিল ত তুলিবেন, নেকচার করিবেন কায় ?' গয়ানাথের এমন প্রশ্নের জবাবে সেই চ্যাংড়া নেতারা কথাবার্তা বলে ঠিক করে যে অন্তত সাতটা হাটে তারা কেউ এসে 'বক্তব্য রাখিবেন।' 'আখিবেন ত আখিবেন আর তেরডা হাটত কি বলদ দিয়া হাম্বা ডাকাম ?' গয়ানাথের এমন চড়া প্রশ্নে আবার এক দফা আলাপ-আলোচনার পর ঠিক হয় যে এই এলাকার দু-জনকে জোগাড় করা হবে। কিন্তু তাতেও গয়ানাথের প্রশ্ন ছিল—ঐ সব কাথা তিস্তাপাড়ত্ ফেলান! একখান মাস্টার মানষি দ্যাও, সাইকেলআলা। স্যালায় এই দিন গিলা হাটত মিছিল তুলিবেন, নেকচার করিবেন আর স্যালায় ঐ মিটিঙের দিন মিছিল নিগাবেন। হামরালা তোমাক্ মানষি দিবা পারি, সেই মানষিগিলার মিছিল বানিবার না পারি। মোর মানষি নিয়া মিছিল্ বানিবার নাগিবে তোমরালাক্।'

গয়ানাথের বাড়ির এই মিটিঙে সুস্থির ছিল। শেষ পর্যন্ত তার কথামতই ঠিক হয় প্রথম কয়েক দিন

তিলক রায়বর্মন গয়ানাথের বাড়িতে থেকে কয়েকটা হাটে মিছিল তুলবে, তারপব সুস্থির নিজেই এসে থাকবে, সঙ্গে আরো দু-একজন আসতে পারে—একেবারে উদ্বোধনেব দিন বিক্ষোভ মিছিল তোলার পব সুস্থির ফিরে যাবে, তার আগে নয়।

তিস্তা ব্যারেজেব বিক্ষোভ মিছিলে লোক প্রধানত গয়ানাথেব এলাকা থেকেই জড়ো কবতে হবে—এটা সুস্থির ও তার দলবল বুঝে গিয়েছিল।

তারপর থেকেই শুরু হল তিলক বায়বর্মনেব নেতৃত্বে কাছাকাছি সব হাটে গয়ানাথেব 'মানষিলার' মিছিল তোলা।

আর গয়ানাথের 'মানষিলা' মানেই ত সর্বপ্রথম বাঘারু। নেওডাবস্তিব হাটেব দিন তিলক তার সাইকেল নিয়ে আর বাঘারু তার ঝাণ্ডা নিয়ে গয়ানাথের বাড়ি থেকে বেরয বেলা একটা নাগাদ। গয়ানাথেব নির্দেশ অনুযায়ী বাঘারু তিলককে এক-এক পাড়ার ভেতর দিয়ে-দিয়ে নিয়ে যায়। সে-সব পাড়ায়, 'টাড়ি'তে বাঘারু সরু বাঁশের, বা মোটা কঞ্চি বনাই ভাল, মাথায় তিনকোনা এক লম্বা নিশান ধবে দাঁড়িয়ে থাকে আব তিলক সাইকেলটা এক জাযগায হেলান দিযে রেখে এক-এক ঘরেব সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকাব করে ডাকে। নতুন গলার এ-বকম ডাকাডাকিতে সবই বেবিযেও আসে। তখন তিলক তাদেব প্রায নির্দেশেব মত কবেই বলে, যে, হাটে গিযে সবাই যেন বাঘাকর হাতে ধবা ঝাণ্ডাটার কাছে জড়ো হয়। তাবপব, হাটমিছিল হবে।

তিলককে প্রায কেউই চেনে না কিন্তু বাঘারুকে ত সবাই চেনে। সুতবাং গয়ানাথের নির্দেশ বুঝতে কাবো কোনো অসুবিধে হয় না। বাচ্চাবা ত 'চলবে না, চলবে না' শুরুই করে দেয। কিন্তু হাটে বাঘারুব ঝাণ্ডার কাছে কেউ জড়ো হয়ে থাকে না, তিলকও কাউকে চেনে না যে হাট ঘুবে ডেকে-ডেকে আনবে। তাই খানিকক্ষণ অপেক্ষাব পর তিলককে তাব সাইকেল নিয়ে বাঘারুব সঙ্গে হেঁটে-হেঁটেই হাটে ঘুবতে হয।

বাঘারুব কাঁধে ঝাণ্ডা। সুতবাং তাকে আগে যেতে হয। আর, তাব পেছনে-পেছনে সাইকেল ঠেলতে-ঠেলতে তিলক। তিলক শ্লোগান দেয—'তিস্তা ব্যাবেজ চালু কবা', কিন্তু বাঘারু তার জবাবে কিছু বলে না। প্রথম হাটে দু-একবাব বাঘারুকে বলা সত্ত্বেও বাঘারু বলতে না-পারায় তিলক একাই পুরো শ্লোগান দিতে থাকে—'তিস্তা ব্যাবেজ চালু করা চলবে না, চলবে না' ,তিস্তা ব্যাবেজ উদ্বোধনেব বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দেন, যোগ দেন।' এ-বকম ঝাণ্ডাসহ একজনের মিছিল বেবলেও হাটে লোক জুটে যায়। সে-রকম লোক তিলক-বাঘারুব যুগ্ম মিছিলেও জোটে। সন্ধ্যা হওযার মুখে বাঘারু ও তিলকেব এই গোটা মিছিলটাই একা-একা গয়ানাথেব বাড়িতে ফেবে। বেলা একটা-দেড়টায় বাঘারুর হাতে যে-ঝাণ্ডাটা জ্বলজ্বল ও পতপত করে, সন্ধ্যাব পব সেটা কলাপাতার মত নেতিয়ে যায। কিন্তু আলে-আলে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায—সেই ঝাণ্ডাটা আরো দূবে চলে যাচ্ছে। গোলাবাড়ির ঢাল বেয়ে ওপরেব ববমতলে ওরা উঠলে তিলকের সাইকেলেব স্পোকগুলোও ছায়াব মত দেখায, বাঘারুব পুবো শরীরটাকে আকাশে খোদাই করা মনে হয।

এ-রকম প্রথম দু-চাবটি হাট থেকে ফিবতে-ফিবতে তিলক ও বাঘারুব কিছু কথাবার্তা হয। কোনো এক সন্ধ্যাতেই যে সামান্য এই কটি কথা হযেছিল তা নয়। ঐ দু-চার সন্ধ্যা জুড়েই নানা সময়ে কথাগুলি হয়ে থাকবে। কিন্তু সে-রকম টুকরো-টুকরো উপলক্ষের মধ্যে কথাগুলি ছড়িয়ে দেওয়াব সুযোগ এখন আর এ-বৃত্তান্তের নেই। তাই একসঙ্গেই সবটুকু দেয়া হল। তাতে এই কথোপকথনের মধ্যে থেকে কোনো নতুন অর্থ তৈরি হয়ে উঠবে না, আশা করা যায়। এই কথোপকথন বাদ দিলেও হত, কিন্তু তা হলে, এই দু-চার হাটেব অভিজ্ঞতার পর গয়ানাথ ক্রান্তিহাটে কী করল বোঝা যেত না।

একশ সাতাশি

বাঘারুর তৃতীয় সংলাপ

তোমরালাব মানষিলা আসিছেন না কেনে হে ?' তিলক জিজ্ঞাসা করে।

'হামরালার কুনো মানষি নাই', বাঘাক জবাব দেয়।

এই জিজ্ঞাসা ও জাবাবের ভেতর কোনো নাটকীয় অবস্থান নেই। আলপথে-পথেই তাদেব ফিরতে হয়। আলপথে একবার যে আগে যায় তাকে আগেই যেতে হয। বাঘারুর হাতে ঝাণ্ডা আছে বলেই হয়ত বেশির ভাগ সময় বাঘারুকে আগেই থাকতে হয়। তাছাড়া, তিলক ত এই জায়গার লোক নয়, তাই কোন-কোন আল দিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি হবে সেটা বাঘারুই ভাল জানে। কথাবার্তা যখন হয় তখন সব সময় প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গিতেই হয়, তাও নয়। একজনের কথার জবাবে আর-একজন হয়ত নীরবই থাকে। পবস্পর কথাবার্তা বলতে-বলতে যে এরা প্রায় একটা আলোচনা করে ফেলে, তাও নয। অনেক সময়ই কথাগুলো পরস্পব নিরপেক্ষ ও স্বাধীন।

'এইঠেকাব মানষিলা গয়ানাথবাবুর কথা না-শোনে ?'

'হামবালার কুনো মানষি নাই।'

'গয়ানাথবাবুর ত মানষি আছে ? এ্যানং বড় জোতদার !'

'আছে, গযানাথেব মানষি আছে।'

'তোমরালা ত গয়ানাথের মানষি।'

'হয়। হামরালা গয়ানাথের মানষি।'

'তোমবালা একা-একা ঝাণ্ডাখান খাড়ি কবি এ্যালায টাবিঠে বাহির হবা ধবছু; আর এ্যালায় হাট শেষ করি টাবিত ফিরিবার ধইচ্চু একা-একা। তোমরালার আর-কুনো মানষি নাই ?'

'মোর আব-কুনো মানষি নাই। মোব একেলা মুই আছো।'

'তোমবালা কি উত্তবখণ্ডিত জয়েন দিছেন ?'

'হামরালার কুনো খণ্ড নাই, কুনো জয়েন নাই।'

'না, না, কহিছু, তোমরালাব জোতদাবখান ত জয়েন দিবার ধইচছে।'

'না জানো।'

'না জানো ত ঝাণ্ডাখান কান্ধত করি একেলা-একেলা হাট-হাট ঘুরিবার ধরিছেন কেনে ?'

'মোর গয়ানাথ কহিছে তাই ঘুরিবার ধরিছু। মোক ত আগতও ঝাণ্ডা দিচ্ছে গয়ানাথ।'

'আগতও ঝাণ্ডা দিছে ? কোটত ?'

'স্যালায় জল্লেশত—'

'তোমরালা জল্লেশত গেইছু হে ? স্যালায় ত তোমরালা পুরাপরি উত্তরখণ্ড পার্টি হে।'

'নাই রো। মোর খণ্ডটণ্ড নাই, মোর পার্টি-টার্টি নাই।'

'নাই, ত ধরিলেন কেন ঝাণ্ডা জল্লেশত ?'

'গয়ানাথ দিছে।'

'আরে, গয়ানাথ ত দিছে, ধরিছেন ত আপনি, স্যালায় ঝাণ্ডাখান ত আপনার।'

'না-হয়। মোর ঝাণ্ডা নাই।'

'ত ছাড়ি দে ঝাণ্ডার কাথা। ক কেনে, ক্যানং করি মানষি জুটাবার যায়। মিছিল তুলিবার নাগে। তিস্তা ব্যারেজ খুলিবার দিন মিছিল নিগিবার নাগে।'

'গয়ানাথক কহেন। মিছিল নিগিবার কহিলে গয়ানাথ নিগাবে।'

'ত গয়ানাথ তোমাক ছাড়ি আর কাহাকও কহে না ?'

'না জানো।'

'গয়ানাথ কহিলে সব মানুষ মিছিল ধরিবে—হাটত ?'

'ধরিবে।'

'গয়ানাথ কহিলে সব মানুষ মিছিল ধরিবে—তিস্তা ব্যারেজের দিন ?'

'ধরিবে।'

'এর বাদে কুন হাট বড় হাট ?'
'ক্রান্তির হাট।'
'মুই কম গয়ানাথক ঐ হাটত থাকিবাব ?'
'কহেন।'
'গয়ানাথ ঐ তিস্তা ব্যারেজের দিন মিছিলত থাকিলে মানষিলা আসিবে ?'
'আসিবা পারে।'
'ত কহিম গয়ানাথক। কিন্তু তোমরালা জয়েন দিবেন না উত্তরখণ্ড পার্টিত্ ?
'মোর জয়েন নাই।'
'আরে তোমরালাও ত একটা আলাদা মানষি। রাজবংশী মানষি।'
'মুই রাজবংশী না হও।'
'ধুৎ বোকা! এইঠে হামরালা যত মানষি আছি, এইঠেকার আদিবাসী আছি—'
'মুই এইঠেকার না হয়।'
'ধুৎ বোকা। তুই এইঠেকাব না হন, কি বিলাতের মানষি হবার ধরিছেন ?'
'না হই, মুই বিলাতের না হয়।'
'বিলাতেব না হন ত এইঠেকার হন ত ? এইঠেকাব রাজবংশী ?'
'মুই রাজবংশী না হও।'
'ধুৎ বোকা, রাজবংশী না হবি ত তুই কি ভাটিয়া হবা ধইচছিস ?'
'না হও। মুই ভাটিযা না হও।'
'ধুৎ বোকা—একখান ত তোর হবা নাগিবেই, হয় রাজবংশী, না-হয় ভাটিয়ার ঘর।'
'না হও। মুই রাজবংশী না হও। মুই ভাটিয়া না হও।'

'হয়, হয়। তুই একেলা একো পার্টি ? রাজবংশী না হন, ভাটিয়া না হন! আব ঘাড়ৎ করি উত্তরখণ্ডের ঝাণ্ডাখান ধরি জল্পেশ যাবার ধরিছেন! ঝাণ্ডাখান ধবি-ধরি হাট-হাট ঘুবিবাব ধরিছেন! এইঠে ত সগায় জানে তোমরালাই উত্তবখণ্ড পার্টি।'

'না জানে। মোর কুনো পার্টি নাই। মোব কুনো মানষি নাই।'
'হ-অ-য। ঠিকোই কহছেন, তোর শুধু একখান ঝাণ্ডা আছে হে।'
'না হয! মোর কুনো ঝাণ্ডা নাই।'
'হ-অ-য়! ঠিকোই কহছেন, তোর শুধু একখান ঝাণ্ডা আছে হে।'
'না হয! মোব কুনো ঝাণ্ডা নাই।'
'হ-অ-য! ঝাণ্ডাখানের তুই আছিস।'

এ-সংলাপ এভাবে আরো কিছু নিশ্চয় হয়ে চলতে পারে। কিন্তু, এটুকুতেই ত তিলক আর বাঘারুর নানা হাটে ঘোবাফেবাব ঘটনা বোঝা যাচ্ছে। সে-বোঝার চাইতেও বেশি-বাঘারুকে গত দশ-বার বছবে মাত্র এই তৃতীয়বার আত্মপরিচয় সংক্রান্ত সংলাপে বাধ্যত অংশ নিতে হল। দশ-বার বছর আগে এক এম-এল-একে নদী পার করাবার সূত্রে বাঘারু স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এক দীর্ঘ-দীর্ঘ আত্মপবিচয় দিয়েছিল। তখন তার একটা ছোট দাবিও ছিল, এম-এল-এ যেন তাব নামটা ছোট করে দেয়। কিন্তু এম এল-এ সে-বিষয়ে কিছু করতে পারে নি। আর বাঘারুর নামটা আরো-আরো বদলেছে। তিস্তার এক বন্যার সময় চার-চারটে গাছ নিয়ে বাঘারু যখন রংধামালির কাছে বাঁধে গিয়ে ওঠেন, তখন তাকে এক অফিসারের সঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদে ঢুকতে হয়। সেখানে অফিসার শুধু তার নাম-ঠিকানা জানতে চেয়েছিল। কিন্তু বাঘারু সেটুকুও দিতে পারে না। আবার এখন উত্তরখণ্ড পার্টির সময় উত্তরখণ্ডের নেতাদের সঙ্গে তাকে এ-রকম একটা কথাবার্তায় ঢুকতে হয়। এবার বাঘারু যেন তার নিজের সম্পর্কে কিছু আরো বলতে পারে না। এখন সে শুধু বলতে পারে সে কী কী নয়, তার কী কী নেই। দশ-বার বছরে মাত্র তিন-তিনটি সংলাপ—তাও ক্রমসংক্ষিপ্ত! দশ-বার বছবে মাত্র তিন-তিনটি সংলাপ—তাও ক্রমেই নেতিবাচক। বাঘারু কি তার জীবনে ক্রমেই নিজের কাছে নিজে অবান্তর হয়ে পড়ছে—ধারাবাহিকভাবে ?

একশ আটাশি

আবার ক্রান্তিহাট, আবার গয়ানাথ

ক্রান্তিহাটে গয়ানাথ নিজে হাজির ছিল। সে আসার আগেই ঝাণ্ডা কাঁধে বাঘারুকে হাটের নিমগাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। পরে, তিলকও এসে সেখানে দাঁড়ায়। হাট শুরু হয়ে যায় অনেকক্ষণ আগে—বাঘারু দাঁড়িয়েই থাকে, তিলকও। নিমগাছটা হাটের একদিকে—সেই হাট কমিটির ঘরের লাগোয়া মাঠ আর হাটের সীমান্তে—যেখানে হাঁড়িয়া বিক্রি হয়। বাঘারুর দিকে তাকিয়ে হাটের লোকজন হাটে চলে যায়। এমন-কি, তিলকও মুদিখানা দোকানের পাশে তার সাইকেলটা তালা আটকে রেখে বাঘারু থেকে অনেক দূরে মিষ্টির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। বাঘারুর সঙ্গে যেন এই হাটের, এই হাটের মানুষজনের কোনো সম্পর্ক নেই। সে নিমগাছের তলায় আর-একটা গাছের মতই দাঁড়িয়ে থাকে। তার ঝাণ্ডা নারকেল গাছের ডালের মত বাতাসে দুলতে থাকে।

গয়ানাথ ঐ মিষ্টির দোকানের সামনের রাস্তা দিয়ে হনহন করে এগিয়ে এসে বাঘারুকে বলে, 'মানষিলা কই, যেইলা মিছিল তুলিবে ?'

বাঘারু তার ভঙ্গি অপরিবর্তিত রেখে বলে, 'কায়ও না আসে।'

'কায়ও না আসে ? শালো বলদের দল! তোর সেই উত্তরখণ্ডেব চ্যাংড়াখান কোটৎ!'

গয়ানাথকে দেখে তিলক ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে। তাকে দেখে গয়ানাথ চিৎকার করে, 'এইঠে আসিছেন কি খাড়ি থাকিবার তানে ? মিছিল তুলিবে কায় ? মুই ? আর আপনি লিডার হবার ধবিবেন ?'

তিলক বলে, 'আমি ত কাউকে চিনি না। কায়ও ত আসে না!'

'আসে না ? শালো বলদেব দল!' গয়ানাথ এসে পড়ায় ও চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করায় ছোট একটা ভিড় জমে যায়। সেদিকে তাকিয়ে গয়ানাথ চিৎকার করে একজনকে ডাকে, 'এই কানকাটু, যা কেনে, হাটত য্যায়লা আসিছে সগাক ডাকি নিয়া আয়, শালো বলদের দল।'

কানকাটু হাটের দিকে দৌড়য়। গয়ানাথ বলতে চেয়েছে, তার যে সব লোক হাটে আছে তাদের ডেকে আনতে। কিন্তু পেছন থেকে একজন মুখ লুকিয়ে চিৎকার করে ওঠে, 'হাট ভাঙি সগায় চলি আইসেন, ভটভটি জোতদারের মিছিল নাগিবে।'

'শালো, তোর বাপের বলহরির মিছিল নাগিবে', গয়ানাথ ভিড়টার দিকে চিৎকাব করে বলে।

তিলক বাঘারুকে হাত ধরে এগিয়ে এনে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে দেয়, তাবপর ভিড়টার দিকে তাকিয়ে বলে, 'লাইন নাগান, লাইন নাগান, মিছিল করিবার নাগিবে।'

তিলক একটা ভুল করেছিল। সে ভেবেছে এই ভিড়টার সবাই মিছিলে যাবে। কিন্তু ভিড়টা জমা হয়েছিল গয়ানাথকে দেখে, গয়ানাথের চেঁচামেচিতে। তা ছাড়া ক্রান্তি হাটে উত্তরখণ্ডের মিছিল উঠবে—এর ভেতর একটা উত্তেজনাও ছিল। সেই ভিড়ের দু-একজন এসে বাঘারুর পেছনে দাঁড়ায় বটে, কিন্তু বাকিরা একটু-আধটু সরে যায়। তা ছাড়া, যারা ছিল তাদের তিলক যখন আবার ডাকে, 'আসেন আসেন, মিছিল করিবার নাগিবে', তখন তাদের একজন ঠাণ্ডা গলায় বলে দেয়, 'হামরালা উত্তরখণ্ড না হই। বামফ্রন্ট।'

গয়ানাথ ভিড়টার দিকে তাকিয়ে চিৎকার কবে, 'শালো, ফন্ট ? কাম নাই কুত্তার নহরে সার। বামফ্রন্ট ত এইঠে কী ? শালো, বাম ? পাছাত বাঁশ সিন্ধাইছে—স্যালায় বাম ?'

যে নিজেকে বামফ্রন্ট বলে পরিচয় দিয়েছিল সে একই বকম ঠাণ্ডা গলায় বলে, 'এ্যাল্যাং-প্যাল্যাং কথা না কহেন দেউনিয়া—।' তার এই প্রতিবাদে দৃঢ়তা ছিল বটে কিন্তু একটু যেন দ্বিধাও ছিল, গয়ানাথ জোতদারের একেবারে মুখোমুখি তাকে অপমানকব কিছু বলার দ্বিধা।

এর মধ্যে হাটের ভেতর থেকে কিছু লোক বেরিয়ে গয়ানাথের দিকে আসতে শুরু করেছে। তাদের প্রায় প্রত্যেকের হাতেই বাজারেব থলি বা ঝুড়ি। তারা আসে বটে, কিন্তু কেউই এসে বাঘারুর পেছনে লাইনে দাঁড়ায় না, একটু ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। কেউ-কেউ বসে পড়ে। গয়ানাথ বাঁ থেকে ডাইনে মাথাটা ঘুরিয়ে তাদের সবাইকেই বলে, 'শালো, বলদের ঘর, সব এইঠে আসিছেন বাপের বিয়া দেখিবার তানে ? লাগা কেনে, মিছিল লাগা, লাগা।' গয়ানাথ একদিকে মারমুখো হয়ে এগিয়েই যায় কিন্তু লোকজন ছড়িয়ে ছিল বলে দিকটা ঠিক করতে পারে না।

গয়ানাথের এ-চিৎকারে যারা বসেছিল তারা শুধু উঠে দাঁড়ায়, আর যারা দাঁড়িয়ে ছিল তারা মুখটা ঘুরিয়ে বাঘারুর দিকে দু-এক পা আসে কি আসে না।

গয়ানাথ এবার তিলককে বলে, 'এইঠে খাড়ি-খাড়ি করিছেনটা কী ? সগাক দাঁড়ি করি ধরেন মিছিলত্।'

তিলক আগে একবার অপ্রস্তুত হয়েছে। কিছুটা সঙ্কোচের সঙ্গেই একজন আলগা দাঁড়ানো লোককে গিয়ে বলে, 'খাড়ি যান, লাইন নাগান।' সে লোকটি তিলকের নির্দেশ অনুযায়ী গিয়ে লাইনে দাঁড়ালে, আরো কয়েকজন তার পাশে ও পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

'হেই ভাদই, হেই কাতুরা, ঐঠে কি বাংকুযাখান ধরি, তোর ধোকর বাপের সম্পত্তি বেচিবার ধরিছিস ?' ভাদই ও কাতুবা একটু অন্যমনস্ক পায়ে এসে লাইনে দাঁড়ায়। তাদের হাতে বাঁক। হয়ত কিছু বেচাব জন্যে বাঁকে করে নিয়ে এসেছিল—নযত কিছু কিনে বাঁকে বযে নিয়ে যাবে। এখন বাঁকটা তারা হাতে ঝুলিযেই রাখে।

গযানাথ হুকুম দেয়, 'চিক্কাব ধবেন, মিছিল শুরু করি দেন, আর যালায় আছে স্যালায় সব হাটের ভিতরত যোগদান দিবে।'

তিলক খুব জোরে শ্লোগান দেয়, 'উত্তবখণ্ড পার্টি।' তাব উত্তরে কেউ কোনো-সাড়া দেয় না। গযানাথ চিৎকার কবে লাইনবাঁধা ঐ কটি মানুষেব মধ্যে ঢুকে পড়ে, 'শালো, বামের নামে ত জিন্দাবাদ করিবার ধবিস, এ্যালায মৃক-ভুঁদবাব (বোবাব মত) নাখান চুপ করি আছিস।' গয়ানাথেব এই পুরো বাক্যটাই যেন শ্লোগানেব প্রথমাংশ, এমন ভাবে এই লোকগুলি ক্ষীণ এক সমবেত স্বর তোলে—'জিন্দাবাদ।'

তিলক আবাব চিৎকাব কবে, 'উত্তবখণ্ড পার্টি।' কিন্তু যেন তারই জবাবে যে-ভিড়টা এতক্ষণ এই মিছিলের প্রস্তুতিব পাশে জমা হযে উঠেছে তাব ভেতব থেকে একজন দক্ষ উঁচু নিশ্চিত গলায় হেঁকে ওঠে, 'বামফ্রন্ট জিন্দাবাদ।' সেই 'জিন্দাবাদ'-এব সঙ্গে আবো দু-একটি গলা মিশে যায়।

গযানাথ তিলককে বলে, 'মিছিল হাটেব ভিতরত নিগান। হে-ই বাঘাক হেট, হেট—'

'বামফ্রন্ট জিন্দাবাদ', চিৎকাবে মিছিলটা তাড়াতাড়ি চলতে শুরু করতেই পেছনের সেই ভিড়টা থেকে নেতৃত্বেব আত্মবিশ্বাসে কেউ আহ্বান দেয়, 'হে-ই সগায বামফ্রন্টের মিছিল সাজাও, মিছিল সাজাও। উত্তবখণ্ড পার্টিব মিছিল চলিবে না, চলিবে না।' সেই আহ্বানেব সঙ্গে-সঙ্গে ঐ ভিড়টার অনেকে দৌড়ে সেই মিষ্টিব দোকান আব মুদির দোকানেব মাঝখানে, হাটের পাকা রাস্তাটার দিকে ছোটে।

গয়ানাথ মিছিলটা থেকে একটু দূরে মিছিলের পেছনে হাটে ঢোকে। মিছিলটাতে আরো কিছু লোক ঢুকিযে সে কোনো দোকানে বসবে। কিন্তু হাটের ভেতবে ঢোকার পব মিছিলটার [illegible] যেন শোনাই যায় না—এক বাঘারুব লম্বা ঝাণ্ডাটাব জন্যে এটা যে মিছিল সেটা তাকিয়ে অনুমান করতে হয়। 'উত্তরখণ্ড পার্টি জিন্দাবাদ', 'তিস্তা ব্যারেজ বন্ধ করো', 'ব্যারেজ বিরোধী মিছিলে যোগ দিন'—এ সমস্ত নির্দিষ্ট ও পবিকল্পিত শ্লোগান মিছিলটা থেকে কেমন অর্থহীন হযে ঝবে যায়।

একশ উননব্বই

সেই ক্রান্তি হাট, সেই রাধাবল্লভ

এদিকে সারা হাটে মুহূর্তের মধ্যে রটে যায় যে উত্তরখণ্ড মিছিল বের করেছে, এই-বার বামফ্রন্ট মিছিল করবে। রটে যাওয়ায় হাটের ঐ চেঁচামেচির ভেতবেও এক-একদিকে দৌড়োদৌড়ি শুরু হয়ে যায়। কিন্তু কেউই ঠিক বুঝে উঠতে পারে না—উত্তরখণ্ডের মিছিলটা কোথায়। সেই অনিশ্চয়তার ভেতরই হাটের এক কোণ থেকে হৃষিকেশ চিৎকার করে, 'তিস্তা ব্যারেজ জিন্দাবাদ-জিন্দাবাদ' আর দেখতে-দেখতে কাছাকাছি জায়গা থেকে অনেক লোক দৌড়ে এসে হৃষিকেশের পেছনে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করে দেয়। বেঁটে একটা লাঠিতে একটা লাল ঝাণ্ডাও কোথা থেকে এসে যায়। রাধাবল্লভ আর আলবিশ ভগৎ

রাস্তার পাশে এক পান-সিগারেটের দোকানের বেঞ্চিতে বসে ছিল। একজন দৌড়ে এসে তাদের বলে, 'মিছিল, মিছিল, উত্তরখণ্ড মিছিল দিবার নাগিছে।' রাধাবল্লভ আর আলবিশ চকিতে উঠে দাঁড়িয়ে চার পাশে তাকায়। বামফ্রন্টের আর-একটা ছোট মিছিল সুধন সাহাবা বের করে ফেলেছে। রাধাবল্লভ আর আলবিশ প্রায় দৌড়ে সেই মিছিলের সামনে চলে যায়। মিছিলের সামনে গিয়েই রাধাবল্লভ তার ছাতাটা বাঁ বগলে নিয়ে ডান হাতের কনুই ভেঙে আঙুলগুলো মাথার ওপর দিয়ে পেছনে নিয়ে চিৎকার করে বসে, 'বন্ধুগণ।' সুধন সাহা তাকে টেনে মিছিলের ভেতর এনে বলে, 'বন্ধুগণ পরে, এখন মিছিল তোলেন, মিছিল তোলেন।' রাধাবল্লভ মুঠি আকাশে তুলে হাঁক দেয়, 'ক্রান্তি হাটে উত্তরখণ্ড চলবে না চলবে না।' শ্লোগানটা মুহূর্তে ধরে যায়, যেন, মিছিলটা এই মুহূর্তে এ-রকম একটা কথাই বলতে চাইছিল। রাধাবল্লভ দ্বিতীয় শ্লোগান তোলে, 'গয়ানাথ জোতদারের বামফ্রন্ট-বিরোধী চক্রান্ত খতম করো, খতম করো।'

এর মধ্যে হাটের আরো কয়েকটি জায়গা থেকে চা-বাগানের শ্রমিকরা, ফুলবাড়ি বস্তির লোকজন ইত্যাদি আরো সবাই যে যেখানে ছিল বামফ্রন্টের মিছিল বের করে দিয়েছে। সে-সব মিছিলের ক্ষিপ্রতা, দক্ষতা ও নিশ্চয়তা এত বেশি, সে-সব মিছিলের শ্লোগানগুলি রাজনৈতিক ভাবে এত নির্দিষ্ট যে অত বড় ক্রান্তি হাট জুড়ে শুধুই বামফ্রন্টের মিছিল উঠেছে, মনে হয়।

উত্তরখণ্ডের মিছিলটাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। এমনিতেই গয়ানাথের চিৎকার-চেঁচামেচিতে যে-কটি লোক জুটেছিল, বামফ্রন্টের এতগুলো মিছিলের এত হৈ চৈ-এ তারা ভয় পেয়ে সরে যায়। ভয় পাওয়া সত্ত্বেও তারা হয়ত সরতে পারত না যদি গয়ানাথ তাদের পাশে থাকত। কিন্তু গয়ানাথ তাদের একটু পেছনে ছিল—তার পক্ষে ত আর মিছিলে হাঁটা সম্ভব না। কিন্তু সে একে-ওকে ডেকে মিছিলে পাঠাচ্ছিল, তারা গিয়ে মিছিলে দাঁড়াচ্ছিলও। এর মধ্যে বামফ্রন্টের এতগুলো মিছিল যে হাটে নেমে পড়েছে তা গয়ানাথ, তিলক বা তাদের লোকজন টেরও পায় নি। কারণ, তারা এই মিছিলটা নিয়েই ব্যস্ত ছিল—শ্লোগান কী দিতে হবে কেউ জানে না, হাঁটতেও ঠিকমত পারে না, শুধু বাঘারুর ঘাড়ের ঝাণ্ডাটার জন্যে তাও মিছিলটাকে মিছিল বলে তারা নিজেরা চিনতে পারছিল। কিন্তু সেই সরু লম্বা বাঁশের মাথার লম্বা তিনকোনা ঝাণ্ডাটাও কম-ঝামেলা করে না। হাটের দোকানগুলোর মাথার প্লাস্টিক বা চটের ছাউনির দড়ি এদিক-ওদিক করে বাঁধা। তার তলা দিয়ে বস্তা মাথায় মানুষ না-হয় যেতে পারে, কিন্তু এত বড় ঝাণ্ডা কাঁধে কারো পক্ষে যাওয়া অসম্ভব। হাট মিছিলের জন্যে দরকার ছোট ঝাণ্ডা। আর, বাঘারুর কাঁধের ঐ লম্বা ঝাণ্ডা মাঝে-মাঝেই নামিয়ে মাটির সমান্তরালে ঝুলিয়ে এক-একটা বাধা পার হতে হয়। আর, দু-পা ফেলতে না-ফেলতেই ত সে-রকম আরো সব বাধা আসে। এই সবের ফলে উত্তরখণ্ডের মিছিল বা গয়ানাথের মিছিল কখন শুরু হয় আর কখন ভেঙে যায় সেটা বোঝাই যায় না। বামফ্রন্টের নানা মিছিল যখন সেই গোহাটা থেকে এই হাঁড়িয়াহাটা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে আর আত্মবিশ্বাসে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তখন তামাকহাটি আর গামছাহাটির মাঝখানের মোড়টায় বাঘারু একা ঝাণ্ডাটা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, যেমন সে নিমগাছের তলায় ছিল। এখানে ঝাণ্ডাটা অবিশ্যি খাড়াই ছিল। তার একটু দূরে তিলক দাঁড়িয়ে। আরো একটু দূরে গয়ানাথ দাঁড়িয়ে। এই তিনজনের দাঁড়ানোর মধ্যে কোনো যোগসূত্রও থাকে না—এটুকু ছাড়া যে তিনজনের দাঁড়ানোর জায়গা একটু অদ্ভুত। বামফ্রন্টের কোনো-কোনো মিছিল উত্তরখণ্ডের ঝাণ্ডাটার দিকে প্রায় ছুটতে-ছুটতে এসে দেখে—কোমরে দেড়হাতি ত্যানা জড়ানো একটা লোক ঝাণ্ডা নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে। যেন, কোনো বটগাছের উঁচু ডালে কেউ মানতের ঝাণ্ডা বেঁধে গিয়েছে। দু-একজন যে বাঘারুকে দুটো-একটা ধাক্কা দেয় না, তা নয়, কিন্তু বাঘারু দৃশ্যতই এত অবান্তর যে সে-ধাক্কাতেও কোনো জোর ছিল না। তার চাইতে গয়ানাথ জোতদারকে দেখে সেদিকে মিছিলটা নিয়ে যাওয়া অনেক লোভনীয় ঠেকে। গয়ানাথ কিন্তু দাঁড়িয়েই থাকে।

একশ নব্বই

বাঘারুর মিছিলমুক্তি ও মিছিলপর্বের শেষঅধ্যায়

তিস্তা ব্যারেজ উদ্বোধনের দিন উত্তরখণ্ডরা চ্যাংমারি-ব্যারেজের রাস্তাটাই বেছে নেয়, কারণ, ক্রান্তি হাটের পাকা রাস্তা সেদিন বামফ্রন্ট ও সরকারের দখলে। গয়ানাথের যা লোকজন তা ত প্রধানত এই রাস্তাটারই এদিক-ওদিক। এই বাইরে দূরে-দূরে গয়ানাথের জোতজমির লোকজনের সঙ্গে ত আর তার রোজ দেখা হয় না, তাই, সে-সব লোক আর গয়ানাথের 'মানষি' নেই।

সুস্থিররা নানা জায়গা থেকে ছেলেপিলে জোগাড় করে একটা সাইকেল মিছিল নিয়ে আসে। খান পঞ্চাশেক সাইকেল দেখতে বেশ লম্বাই হয়। সেই মিছিলটা চ্যাংমারি হাটের পাকা রাস্তা ধরে, চ্যাংমারি ফরেস্টের পাশ দিয়ে, গোলাবাড়ি আর পশ্চিম দোলাইগাঁওয়ের মাঝখান দিয়ে, নেওড়াবস্তির ওপর দিয়ে, সোজা ব্যারেজের দিকে যায়।

আর শ-খানেক লোকের একটা মিছিল পায়ে হেঁটে এই দিকেই চলে, কিন্তু তারা পায়ে হেঁটে যাচ্ছে বলে পাকা রাস্তা অনুসরণ করার কোনো বাধ্যতা তাদের নেই। তারা পাকা রাস্তা ছেড়ে মাঠের মধ্যে দিয়ে পশ্চিম দোলাইগাঁও থেকে বাঁয়ে ঘুরে নেওড়াবস্তিতে গিয়ে ওঠে। নেওড়াবস্তিতে সাইকেল মিছিল আর পায়ে হাঁটা মিছিল মিলে খানিকটা যায়। কিন্তু তার পর সাইকেল মিছিলটাকে সোজাই যেতে হয়, আর পায়ে হাঁটা মিছিলটা বাঁয়ে সোজা তিস্তার দিকে পুরনো সিদাবাড়ির মুখে চলে যায়। সেখান থেকে তিস্তার পাড় দিয়ে-দিয়ে হেঁটে আপলচাঁদের মুখে পৌঁছয়। সেখানে আবার সাইকেল মিছিল আর পায়ে হাঁটা মিছিলটা মেলে। তারপর আপলচাঁদের ভেতর দিয়ে একসঙ্গে গাজোলডোবা-তিস্তা ব্যারেজের দিকে চলে।

মিছিলের কাহিনী ত এক কথাতেই শেষ করে দেয়া যায়, কারণ, শেষ পর্যন্ত ত কেউ জানলই না উত্তরখণ্ডের মিছিল একটা এ-রকম হয়েছে। আর, তা ছাড়া এই মিছিলটা যাচ্ছিলই প্রায় চুরি করে। সারা জেলা আজ মেতে উঠেছে। ন্যাশনাল হাইওয়ে ল্যাটার‍্যাল রোড, ক্রান্তি মোড়-ওদলাবাড়ির রাস্তা ধরে ট্রাকে-ট্রাকে মানুষ যাচ্ছে। আর এরা সেখানে যেন সবচেয়ে গোপন রাস্তা দিয়ে লুকিয়ে-লুকিয়ে কোনো রকমে বিক্ষোভ দেখাতে যাচ্ছে। কিন্তু মিছিলপর্বের শেষ অধ্যায়ে আমাদের জানা দরকার বাঘারু কোথায় ছিল? এই মিছিলেও উত্তরখণ্ডের সেই বিরাট তেকোনা ঝাণ্ডা লম্বা বাঁশের মাথায় বাঘারুর কাঁধেই ছিল।

মাত্র শ-খানেক লোককে ঐ নেওড়াবস্তির বরমতলে বা সিদাবাড়ির তিস্তাপাড়ে কী তুচ্ছ মনে হয়। আর তাও ত এরা কোনো লাইন করে যাচ্ছিল না। একমাত্র বাঘারু ও তার সেই লম্বা ঝাণ্ডাটাই ঐ বিশাল ছড়ানো প্রকৃতিতে এই লোকগুলিকে একটা অর্থে গেঁথে দিচ্ছিল।

আপলচাঁদের ভেতরে ঢুকে দুই মিছিল এক হয়ে যায়। এরাও নিজেদের একটু মিছিলের মত সাজিয়ে নেয়। সবচেয়ে আগে বাঘারু—ঝাণ্ডাসহ। তারপর পায়েহাঁটা মিছিল। শেষে সাইকেল। সাইকেলের অনেকে নেমে সাইকেল হাঁটিয়েও নেয়।

আপলচাঁদ বাঘারুর। বাঘারু আপলচাঁদের। তার পায়ের চাপে এর শুকনো পাতা ভেঙে যায়। তার হাত নাড়ালে এ-ফরেস্টের আপাতদুর্ভেদ্য বাধা দূর হয়ে যায়। এই ফরেস্টের ভেতরই কোথাও তার জন্ম হয়েছিল। এই ফরেস্টের ভেতরই কোথাও বাঘ তার পিঠে ও ঊরুতে সিল মেরে দিয়েছে যে সে আপলচাঁদের। এতগুলো লোক তার পেছনে থাকা সত্ত্বেও বাঘারু আপলচাঁদে যেন একা-একাই হাঁটে। শুধু কাঁধের অত বড় ঝাণ্ডাটার জন্যে তার চলার ছন্দটা একটু আলাদা হয়ে যাচ্ছে।

তিস্তার পাড় দিয়ে-দিয়েই ত বাঘারু অনেকটা এল—এখন তিস্তা দুপাড় থেকেই অনেকটা সরে গেছে। বালি চমকায়, জল চমকায়, আর বাতাস তিস্তার মতই ধীরে বয়ে আসে। আপলচাঁদের ভেতর থেকে এক-একটা ফাঁক দিয়ে কখনো-কখনো সেই তিস্তাই দেখা যাচ্ছিল। আবার তিস্তা ঢেকে যাচ্ছিল। কিন্তু তিস্তার ওপর দিয়ে বাতাস অব্যাহত বইছিল।

এ-রকম যেতে-যেতে—বাঘারুর জন্মস্থান, বা দেশ, বা বাঘারুর পৃথিবীই বলা যায় যে-আপলচাঁদকে, তার ভেতর দিয়ে যেতে-যেতে—বাঘারুর চোখে পড়ে যায় তিস্তা ব্যারেজ। বাঘারু আপলচাঁদের সব দৃশ্যই ত চেনে। কিন্তু এ দৃশ্য তার চেনা নয়। একবার দেখা যাবার পর থেকে সে-দৃশ্যও মাঝে-মধ্যে

ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল কিন্তু ক্রমশই বেশি স্পষ্ট হচ্ছিল। তারপব, সেটা চোখেব সামনেই থাকে—তিস্তার ভেতরে আড়াআড়ি বিরাট প্রাচীর, তিস্তার নতুন একটা পাড়ই যেন, তাতে নানা রঙের গেট, নানা বঙের নিশানের মত কিছু উড়ছে।

এমন দৃশ্যে বাঘারু থমকায় না। আপলচাঁদের ভেতরে কোনো নতুন দৃশ্যই বাঘারুকে থমকে দিতে পারে না। তার শুধু একটু সময় দবকাব—দৃশ্যটাকে আপলচাঁদেরই অংশ-হিশেবে গেঁথে নেয়ার। শরীর ছাড়া ত কিছু নেই বাঘারুব। সেই শরীর দিযে যে আপলচাঁদ আর ঐ তিস্তা ব্যারেজটাকে মিলিয়ে নিতে চায়। বাঘারুর কাছে কোনো দৃশ্যই আপলচাঁদে অসংলগ্ন থাকতে পারে না। সে ব্যারেজকে আপলচাঁদের ও নিজের সংলগ্ন করে নিতে চায়।

এই প্রক্রিয়াটা কিছুক্ষণ ধরে চলছে আর বাঘারু মিছিলটা নিয়ে ঐ নতুন প্রাচীর, নানা রঙেব ঝাণ্ডা, নানা রঙের মঞ্চেব দিকেই এগচ্ছে। এগতে-এগতে রাস্তাটা প্রায় শেষ হযে আসে, সামনে যদিও ফরেস্টের গাছ-গাছালি আরো একটু ছড়ানো, তবু ওখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়—তিস্তা ব্যারেজ। একটু ডাইনে। পাহাড়ের মত প্রাচীব। তার ওপর প্রায় আকাশের কাছাকাছি মঞ্চ। লাল-নীল কত রং। কত গেট। মানুষজন ততটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না কারণ এটা ত প্রায় পেছন দিক। নিশ্চযই সামনে মানুষজন থৈ থৈ করছে। এত বড গেট আর মঞ্চ দেখলেই ত বোঝা যায়, তার সামনে কত লোক থাকতে পারে।

সুস্থির পেছন থেকে চেঁচায়, 'এইঠে খাড়ান।' তারপর সাইকেলটাতে দুবার প্যাডল করে মিছিলে সামনে আসতে-আসতে বলে, 'ভাল করি খাড়িবেন আব শ্লোগানগিলা একটু প্র্যাকটিস করি নেন।' সাইকেলটা বাঁ হাতে ধবে সুস্থিব ডান হাত আকাশে তুলে শ্লোগান দেয়, 'উত্তরখণ্ড পার্টি', 'জিন্দাবাদ।'

সুস্থির বলে ওঠে, 'দেখিলেন না ক্যানং বড মিটিং হবা ধরিছে? আরো বড় কবি কহেন—"উত্তরখণ্ড"—।' ঐ মঞ্চ, নিশান এইসব এদের উৎসাহিত কবে থাকবে। বেশ জোব গলায় তারা জবাব দেয়, 'জিন্দাবাদ।'

'তিস্তা ব্যারেজ' 'বন্ধ করো, বন্ধ করো।'

'বামফ্রন্টের পৌষ মাস', 'রাজবংশীদের সর্বনাশ।'

'তিস্তা ব্যারেজের জলে ভাসিবে কায়', 'বাজবংশী সমাজ হায-হায়।'

'তোমার আমার সর্বনাশ', 'তিস্তা ব্যারেজ নিপাত যাক।'

সবগুলো শ্লোগান যখন তারা বেশ রপ্ত করে নিচ্ছে এ-বকম ভাবে, তখন ঐ মঞ্চেব দিক থেকে একটা জিপ ছুটে আসে। এরা নিজেদের শ্লোগানের আওযাজ শুনছিল বলে হয়ত গাড়িব আওযাজ শুনতে পায়নি। তিস্তার এমন আরণ্যক পাড়ে গাড়ির আওয়াজ-টাওয়াজ তেমন বোঝাও যায় না।

গাড়িটা একেবারে বাঘারুর সামনে এসে দাঁড়ায। সুস্থির বাঘারুর একটু পেছনে দাঁড়িয়ে মিছিলকে শ্লোগান দেয়াচ্ছিল। গাড়িটা থামামাত্রই গাড়ির পেছন থেকে লাঠি ও বন্দুক হাতে কয়েকজন পুলিশ নেমে এগিয়ে আসে আর ড্রাইভারের পাশ থেকে এক অফিসার নেমে ড্রাইভারকে পেছিয়ে খোলা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতে বলে—ব্যারেজের দিকে আঙুল তুলে। জিপগাড়িটা পেছিয়ে গিয়ে তিস্তার পাড়ে ডাইনে ঘোরে, ঘুরে আবার একটু পেছিয়ে তিস্তা ব্যারেজের দিকে মুখ করে দাঁড়ায়, স্টার্ট বন্ধ করে কিনা বোঝা যায় না। আর, সেই অফিসার এসে বাঘারুর সামনে কিন্তু একটু বাঁয়ে সরে দাঁড়িয়ে সুস্থিরকে বলে, 'মিছিল এখনই ভেঙে দিন, শ্লোগান দেবেন না।'

এমন আচমকা পুলিশ, লাঠি, বন্দুক দেখে মিছিলটা কেমন নড়ে ওঠে। সুস্থির পুলিশ অফিসারের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে মুঠো পাকানো ডান হাত তুলে চিৎকার করে ওঠে, 'উত্তরখণ্ড পার্টি।' মিছিলের মাত্র কয়েকজন যেন অভ্যেসে 'জিন্দাবাদ' বলতেই পুলিশ অফিসার দুপা পেছিয়ে গিয়ে বাঁ হাতের আঙুল নেড়ে পুলিশদের নির্দেশ দেয়।

বন্দুক হাতে পুলিশরা দাঁড়িয়ে থাকে কিন্তু দুপা এগিয়ে আসে। আর লাঠি হাতে পুলিশরা ছুটে আসে—লাঠি উঁচিয়ে নয়, বরং লাঠি নামিয়ে। মিছিলের দু-এক জন দৌড়ে পালাতে হবে বুঝতে না-বুঝতেই পুলিশরা মিছিলের দুপাশে দাঁড়িয়ে পড়ে লাঠি মাথার ওপর তুলে মিছিলের দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোকে পিটুতে থাকে। মুহূর্তের মধ্যে মিছিলটা ছত্রখান হয়ে যায়—যে যেদিকে পারে দৌড়য়, সাইকেলওয়ালারা সাইকেল ফেলে দৌড়য়। আর, পুলিশরা বেশি ছোটাছুটি করে না বটে কিন্তু প্রায়

সবাইকেই লাঠির নাগালে টেনে আনে আর এক-এক মারে মাটিতে শুইয়ে দেয়। সেই অফিসার এক পুলিশকে ডেকে সুস্থিরকে দেখায়। সে বেশ তাগ করে সুস্থিরের পিঠের মাঝখানে লাঠিটা মারে। সুস্থির উপুড় হয়ে পড়ে গেলে পুলিশটা লাঠি দিয়েই তাকে চিৎ করে নিয়ে লাঠিটা মাথার ওপর তুলে সুস্থিরের হাঁটুটাতে প্রচণ্ড জোরে মারে। মাত্র মিনিট কয়েকের মধ্যে ফরেস্টের ঐ জায়গায়, তিস্তা ব্যারেজের অত কাছে, উদ্বোধন মঞ্চের পেছনে অতগুলো মানুষ কেমন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকে। কোনো চিৎকার চেঁচামেচি পর্যন্ত হয় না। একটা জিপে আর কটা পুলিশ আঁটে ? সে-কটাও ছিল কিনা সন্দেহ ! তারা মাত্র কয়েক মিনিটে উত্তরখণ্ডের স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবি আপলচাঁদের এক টুকরো জমিব ওপর মেবে, ভেঙে, থেঁতলে ফেলে দিয়ে চলে যায়।

বাঘারু যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। ঝাণ্ডাটা তার কাঁধেই থাকে। সে পালাতে পারে না, বা, পালাতে পারেনি, বা, পালায়নি, বা, পুলিশের সামনে তার শরীরের পালানোর প্রতিক্রিয়া ঘটেনি। জিপটা তার একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। অফিসারও তার সামনে তার একটু বাঁয়ে দাঁড়িয়েছিল। পুলিশ তাকে এড়িয়ে পেছনের মিছিলটাকে ধরেছে, যেমন, পেছনের মিছিলটাকে ধরতে একটা বা দুটো গাছও এড়াতে হয়েছে। এড়িয়ে যেতে-যেতেও তারা বাঘারুকে লাঠি দিয়ে মেরে গেছে কিন্তু কখনোই বাঘারুকে প্রধান লক্ষ্য করে নি। হয়ত, বাঘারু, অত লম্বা বলেই পুলিশদেব লাঠি তাব শরীরের তেমন কোনো লোভনীয় অং কে লাঠির আওতায় আনতে পারে নি। হয়ত, বাঘারু, তার ঐ অত লম্বা একটা ন্যাংটো শরীরে, এমন-কি পুলিশের পক্ষেও অযোগ্য ঠেকেছে। মিছিল উপলক্ষে গয়ানাথ তাকে অন্তত একটা জামা আর খাটো ধুতি দিলেও পুলিশ হয়ত, তাকে চিনে নিতে পারত।
পুলিশ বাঘারুকে মারেনি বা মারের প্রধান লক্ষ্য করেনি ; বাঘারুও পুলিশের লাঠি-বন্দুক-গাড়ি দেখে পালায়নি। হয়ত এটা আপলচাঁদ বলেই পালায়নি। এই আপলচাঁদের, এই জংলাজমির, এই গাছ-গাছালির সবটুকু তার এত বেশি চেনা যে সে বুঝেই উঠতে পারে না এখানে সে কোথার আত্মগোপন করতে পারে। একটা মানুষ ত তার বাড়িতেই লুকনোর কোনো জায়গা পায় না—সমস্তটাই তার কাছে এত প্রকাশ্য। তাই তাকে পুলিশ আর মিছিল সব মিশিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। গয়ানাথ তাকে ঝাণ্ডা দিয়ে দাঁড করিয়েছে। ঝাণ্ডার পেছনে মিছিল। সে-মিছিল এমন তছনছ হয়ে গেলেও বাঘারু দাঁড়িয়েই থাকে।
মিছিলপর্ব এখানেই শেষ হোক। এর পবেব পর্বে পুলিশদেব পেছন-পেছন যাওয়া যাবে—পুলিশ কেন আসে, কোত্থেকে আসে।
মিছিলেব লোকজন যে-যাব মত ফিরে গিয়েছে। সাইকেলওয়ালারা সাইকেল নিয়েই ফিবে গেছে। কেউ বাঘারুকে কিছু জিজ্ঞাসা করে নি। কিন্তু এই সব প্রস্থান ঘটে যাওযাব পব এই আপলচাঁদ, গাছ-গাছালি, জংলাজমি, সামনের তিস্তা আবাব বাঘারুব কাছে পুরোপুরি ফিরে আসে। শুধু তিস্তাব ভেতরে ঐ বিরাট প্রাচীর, প্রাচীরের ওপব অত গেট আব মঞ্চ, গেটে আর মঞ্চে এত ঝাণ্ডা—এই সব ঐ তার স্বদেশের সঙ্গে ঠিক মেলে না।
কিন্তু মেলাতে ত হবে। বাঘারুকেই মেলাতে হবে। এখানে এই আপলচাঁদে বাঘারু না-দেখলে একটা বিরাট লাম্পাতি গাছের বাড় আটকে যায়। কী লাভ বেড়ে যদি বাঘারুই না দেখে ? এখানে এই আপলচাঁদে একটা লতার কুঁড়ির ফুল হওয়া আটকে যায় বাঘারু না-দেখলে। কী লাভ বেড়ে যদি বাঘারুই না দেখে ? এখানে এই তিস্তার একটা স্রোতের একটু উদাসীন সরে যাওয়াও থমকে যায় বাঘারু না-দেখলে। কী লাভ সরে গিয়ে যদি বাঘারুই না দেখে ? আর, এই আপলচাঁদের পাশে এই তিস্তা নদীর ভেতর এমন একটা আড়াআড়ি পাহাড় পুঁতে দিয়ে উত্তব আর দক্ষিণের নদীটাকে আলাদা করে দেয়া হবে বাঘারু না-দেখতেই ? সেই পাহাড়ের গায়ে এত গেট আর এত মঞ্চ আর এত স্টেজ হবে বাঘারুকে না-দেখিয়েই ? এই আপলচাঁদ ফরেস্ট আর তিস্তা দিয়ে তৈরি তার স্বদেশে ঐ তিস্তা ব্যারেজটাকে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে বাঘারু সেই উদ্বোধন মঞ্চের দিকে এগিয়ে যায়। দুপা গিয়েই বোঝে কাঁধে তার ঝাণ্ডাটা তখনো আছে। সে বাঁ হাত বাঁশটা থেকে সরিয়ে নেয় আর বাঁ কাঁধে একটা ঝাঁকি দেয়। ঝাণ্ডাটা মাটিতে পড়ে যায়, বাঁশের গোড়াটা পড়ে বাঘারুর পরবর্তী পদক্ষেপের নীচে। সেটা মাড়িয়ে বাঘারু এগিয়ে যায়।

এবার বাঘারুর দুই হাত খালি, কাঁধ খালি, সারা শরীর হাল্কা। একটুকরো নেংটি ছাড়া তার আর-কোনো আবরণ নেই। এখানে, আপলচাঁদে, তিস্তার পাড়ে, যেমন পা ফেলতে সে আজন্ম অভ্যস্ত: সেই ছন্দে তার শরীরটা দুলে ওঠে। দোলে। বাতাসে দুলতে-দুলতে বাঘারু তিস্তা ব্যারেজ উদ্বোধনের ঐ রঙচঙে স্টেজ আর প্যান্ডেলের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে—'দেখিবার নাগে ঐঠে কি সত্যিই একখান নতুন নদী বানিবার ধরিছে, নাকি, ময়নাগুড়ির ঐ বেটিছোয়াখানের নাখান নাচানাচি নাগাবার ধরিছে।'

অন্ত্যপর্ব

মাদারির মায়ের স্বতন্ত্র রা

একশ একানব্বই

মাদারিব মায়ের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র

হাট থেকে ফিরে মাদাবি বলে, 'মা, কাল জলুশ হবে, হাটত ট্রাক আসিবে।'

জলুশ, বা মিছিল হতে পারে, আর মিছিল হলে তা ট্রাক আসেই। লোকজন, না-হলে, যাবে কী কবে ? মাদাবির মা-র তাই আব-কিছু জিজ্ঞাসাব থাকে না। মাদাবিব আব-কিছু বলাবও থাকে না।

হাটেব দিন তাদেব ঘুমিযে পড়তে বোধহয একটু দেবিই হয। হাটফেবতা গরুর গাড়িগুলো কঁকাতে-কঁকাতে বাস্তা দিযে যায। তাদেব যাওযাও যেন ফুবয না, কঁকানিও যেন ফুরয না। সন্ধে থেকে কঁকানি শুরু কবে, কতক্ষণ চলে তা মেপে দেখে কে ?

মাদাবির মা-ব ঘব ফবেস্টেব সীমায—বাস্তা থেকে দেখলে ওটাকে ফবেস্টেব সীমা মনে হতেই পাবে। ন্যাশন্যাল হাইওযেব পবে খানিকটা জমি তাবপব ফবেস্ট। ফবেস্ট ত আর এ-বকম নদীব মত পাড় মেনে চলে না। কিন্তু সে যা-হোক, এখানে ঐ চাষেব জমিটুকুব ছাড থাকায ফরেস্টটা হাইওযেব ওপব একেবাবে উঠে আসে নি। ঠিক এই জায়গাটাতে মনে হয, ফবেস্টেব সঙ্গে ন্যাশন্যাল হাইওয়ের একটা ভদ্রগোছের দূবত্ব আছে। কিন্তু এব দুদিকেই ফবেস্টেব জঙ্গল বাস্তাব ওপব এমন উঠে এসেছে যে ভয হয় সেই জঙ্গল থেকে একটা বাঘ লাফিযে পডতে পাবে, বা, হাতির একটা শুঁড এগিয়ে আসতে পাবে, বা, গণ্ডাব ঠিক ঐ মুহূর্তেই ছুট লাগাতে পাবে। এমন গা ছমছম অবস্থা থেকে একটু স্বস্তি জোটে মাদারিব মা-ব ঘবেব সামনেই, এই জাযগাটিতে। মনে হয, বা, ভুল হয়, ফবেস্টেব হাত থেকে বাঁচা গেল। কিন্তু এই ঢালটা পেবিয়ে একটু উঁচুতে উঠে খানিকটা এগলেই ফবেস্ট আবার বাস্তায় উঠে আসে।

এই ঢালেব জন্যেই বোধহয এই ফাঁকাটা তৈবি হয়েছে। জমিব ঢাল ত বোঝা যায না, বাস্তাব ঢাল বোঝা যায। ঠিক ঐ-জাযগাটিতেই বাস্তাটা বেশ ঢালু হয়ে অনেকখানি নেমে আবাব অনেকখানি উঠে, বাস্তাব স্বাভাবিক উচ্চতায পৌঁছেছে। এই জাযগাব পুবো জমিব ঢালটাই বাস্তায় ধরা পড়েছে। জমি জঙ্গল, শালগাছ-খয়েবগাছসহ পুবো জমিটাই এখানে ঢালে নেমে গেছে। তাব একটা কারণও আছে। ফবেস্টের ভেতব থেকে একটা ছোট ঝোবা বয়ে এসে এখানে বাস্তা পেবিয়েছে। সারা বছব ঝোবার খাত থাকে, শুধু বর্ষাকালে জল থাকে, বা জল আসে। বাস্তাটা তাই এমন করা যাতে বর্ষার জল ফবেস্টেব ভেতব দিযে বযে এসে রাস্তাব ওপব দিয়ে চলে যেতে পারে। বাস্তাব অপর দিকে আবাব ঝোবাব খাত, তাই বাস্তাব ওপব কোনো সময়ই জল জমে থাকে না, কিন্তু রাস্তাটা সব সময়ই ভেজা থাকে, শুধু ভেজাই নয, বাস্তাব ওপর দিযে সাবাটা বর্ষাই তিরতির কবে স্রোত বয়ে যায়। ফবেস্টের ভেতব দিযে কিছু বোদ মাটিতে এসে পডলে, বা, বাতে ট্রাকেব হেডলাইটে, সেই স্রোতের ছোট-ছোট রেখা বেশ দূর থেকে দেখা যায। বেশ লোভনীয দেখা যায়। বাস্তাটাও এই জাযগায চওড়া, বেশ চওডা। একটা ট্রাক সাইড করে রাখলেও বাকি বাস্তাটায় দুটো ট্রাক পবস্পরকে 'সাইড' দিতে পারে। অনেক সময অনেক ড্রাইভাব সে-বকম কবেও। গাড়ি থামায়। গাড়িতে একটু জল ভরে। নিজেরাও নেমে ঝোবাব জল একটু চোখেমুখে দেয়, তারপর চলে যায। স্টার্ট বন্ধ করার মত বেশি সময় নয়, ঐ একটুখানি দাঁড়ানো, তাও ক্বচিৎ।

তবে, শুধু বর্ষাকাল মানেই ত ছমাস থেকে আটমাস। আসলে, জল থাকে না, বা বাস্তাটা ভেজা থাকে না—খুব শীতেব ঐ মাস চাব-পাঁচ মাত্র। মাদাবির মা, বাস্তার ঠিক পাশে, ঝোরার ভেতর থেকে ওঠা একটা শ্যাওড়া গাছের তলায কয়েকটা পাথব বসিযে একটা বেদিমত বানিয়েছে। গাছটা উঠেছে ঝোরাটা যেখানে ফরেস্টেব জমি ছেড়ে রাস্তায় পড়েছে ঠিক সেই জায়গাটায়। সাধারণভাবে গাছটা ওখানে থাকার কথা নয়, বা, মাটি ক্ষযে গিয়ে অমন সীমান্তে গাছটাব ঢলে যাওয়ার কথা নয়। এমন হতে পারে, ওখানে হয়েছে বলেই গাছটা ওখানে আছে, এর বেশি কোনো কাবণ নেই। আর-এক হতে পারে রাস্তা তৈরিব সময়ই গাছটা ওখানে ছিল ; যারা রাস্তা তৈবি করেছে, তারা ওব গায়ে হাত দেয়নি। শ্যাওড়া গাছ কাটতে নেই। আর, এখানে, রাস্তাটাকে এতটা ঢালু করতে এতটা চওড়া করতে, ঝোরার মুখ আর ঐ-দিকে ঝোরা যেখানে নতুন ঢালুতে গেছে রাস্তাব সেই মুখটিকে, সিমেন্ট বাঁধাই

কবতে—বাস্তা-তৈবিব লোকজনকে বেশ কিছু দিন এখানে থাকতে হযেছে। হযত সেই কারণেই সামনে এতটা জমি ফাঁকা—হযত ওখানে রাস্তা-তৈবির লোকজনেব তাঁবু গাড়া হযেছিল। এত পোড়া গাছের গুঁড়িও হয়ত সে-কাবণেই—জ্বালিযে বাখা হত, বাতে, হাতিব দল যাতে না আসে। বাস্তার উল্টোদিকে পিচ গলানোব জন্যে দুদিকে হাড়িকাঠেব মত পোঁতা দুটো গাছেব পোড়া ডাল এখনো পোঁতাই আছে, তাদেব মাঝখানে গর্তেব মধ্যে এককালে জ্বালানো আগুনেব ভস্মাবশেষ, বা অঙ্গারাবশেষ, চিরকালীন।

মাদারির মা তখন কোথায় ছিল সেটা মাদারির মা-ই জানে না। কিন্তু সে যখন এখানে এসে ডালপালা পাতা দিয়ে ঘব ছেয়ে বসবাস শুরু কবে, তখন তাব কাছে, আব, যে-কাবো কাছেই, জাযগাটা শ্যাওড়াঝোরা বলেই পবিচিত হয়ে যেতে পাবে, ঝোবাব মুখে শ্যাওড়া গাছটাব একাকিত্ব ঐ নির্জনেও এতই একাকী।

শ্যাওড়া গাছের বযস বোঝা যায় না—যে-গাছ দেখে মনে হয় চারা, সেটা আসলে কযেক দশকেব পুরনো। এ-গাছটা মোটেই তত তরুণ ছিল না। ববং ফবেস্ট থেকে অতটা আলগা, বাস্তা থেকেও একটু বিচ্ছিন্ন ঐ গাছটাকে চোখে পড়ে যায়, তাব অবস্থানেব জন্যে ত বটেই, কিন্তু অনেকখানিই তাব অবযবেব জন্যে। নইলে, ঐ অবস্থানে গাছটা হারিযে যেতে পাবত। গাছটা যে শুধু বেড়েই উঠেছে, তা নয়, তাব একটা শাখা বাস্তার দিকে এগিযে এসেছে। এগিযে আসাব পব আবাব সেখান থেকে একটা শাখা ওপবের দিকে বেড়ে গেছে, একটা মাত্র সবল বেখায। আব-একটা শাখা নীচের দিকে বেড়ে গেছে, আর-একটু ঝাপটা হযে, জলেব দিকে। সেটাব মাথাটা জলেব ওপর দোলে, হযত কোনো-কোনো সময জল ছোঁযও। আর ওপবের ডালের মাথাটা বাতাসে দোলে। এই ফবেস্টে, এই বাস্তায, এমন একটা কোণে, আকাশে বেড়ে ওঠা কোনো দোলা দেখলেই হাতিব কথা মনে না হযেই পাবে না। আবছাযায, পেছনে ফরেস্টেব একীভূত আঁধাব, আর মাথাব ওপবে পাতাচেবা আকাশেব নীল—ঐ একাকী গাছেব শাখার অমন নিঃসঙ্গ আন্দোলন দেখলে হাতি বলে ভযও হতে পাবে আচমকা। জল, জলে ছাযা, বিচ্ছিন্নতা আব অবযব নিযে শ্যাওড়া গাছটা যেন বৃক্ষদেবতা বা পথদেবতা হওযাব জন্যে তৈবি হযেই ছিল—কে চিনতে পারে, তাব অপেক্ষায।

মাদারিব মা চিনতে পেরেছিল—কতটা গাছটাকে দেখে, আব কতটা ওখানে মাঝে-মাঝে ট্রাক দাঁড়ায বলে, তা নির্ণয় করা যাবে না। কিন্তু সে দুহাতে তোলা যায এমন সব পাথব এনে-এনে জলেব ভেতব গাছের গোড়ার কাছে পেতে দিয়েছে। সেই পাথবেব স্তব জলেব ওপবও উঠে এসেছে—পব-পব বসানো, গোল করে সাজানো, যে-ভাবে প্রাচীন মিশবীয়বা 'ওবেলিস্ক' বানাত, বা এখনো এদিককাব পাহাড়ের লোকরা মহাযানী বৌদ্ধচৈত্য বানায। জলে-জলে সেই পাথবের স্তূপের তলাব দিকটা পুরু শ্যাওলায় ছেয়ে গেছে। শীতেও সে-শ্যাওলা ঘোচে না।

একশ বিরানব্বই

শ্যাওড়াঝোরা-রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য

মাদারির মা ভেবেছিল, এ-রকম দেবতাব মত দেখতে শ্যাওড়া গাছটাকে যদি পাথব দিয়ে ঘিবে সত্যি দেবতা বানানো যায়, তা হলে চলতি ট্রাক-বাস থেকে ড্রাইভাররা দু-চার পযসা ছুঁড়ে দেবে। সে দেখেছে, ড্রাইভাররা এ-রকম ছোঁড়ে, বাসের লোকজনও ছোঁড়ে। এ-রাস্তায় বাস যায বটে কিন্তু তাবা হয়ত নতুন করে একটা পয়সা দেয়ার জায়গা বাড়াতে চাইবে না, তবে এত যে ট্রাক যায এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে এদিক, মাদারির মা এটাও জানে আসাম থেকে কলকাতা আব কলকাতা থেকে আসাম, তারা ত এখানকার সব কিছু জানে না, তা হলে, এ-রকম দেবতার মত দেখতে গাছটাকে দু-দশ পয়সা তারা ছুঁড়ে দেবে না কেন?

এমন একটা ফরেস্টের কিনারায়, শ্যাওড়া গাছটার মতই, মাদারির মা কেন থাকে, তাব কোনো ইতিহাস নেই। আর-কোথাও থাকার জায়গা নেই, তাই থাকে। কিন্তু এখানে এসে বসবাস শুরু করাব

পর সে এই শ্যাওড়া গাছটাকে দেবতা বানাবার কাজে সর্বক্ষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তখন মাদারি হয়নি। মাদারির আগের ভাই, কিংবা তার আগের ভাই, কে তখন মাদারির মার সঙ্গে, সেটা মনে করে ওঠা খুব কঠিন। কিন্তু সেই ছেলেকে মাদারির মা খুব শিখিয়েছিল কয়েক মাইল দূরের গণেশমোড় থেকে গণেশের মূর্তিটা চুরি করে আনতে। মাদারির মা তখন তার যে-ছেলের নামে পরিচিত ছিল, সে, প্রায় করেই ফেলেছিল। কিন্তু পরে তার মাথায় বুদ্ধি গজায় যে মাত্র কয়েক মাইল দূরের গণেশমোড় থেকে মূর্তি আনলে ত সবাই টেরই পেয়ে যাবে।

তা হলে? আর-কোনো উপায় মাদারির মা-র হাতে বা মাথায় ছিল না। পরপর কয়েক বছর গণেশের মোড়ে হাতির পাল রাস্তা আটকানোয় ওখানে মাটির গণেশ মূর্তি বসিয়ে পুজো হল, এখন ট্রাক-বাস সব কিছু থেকেই ওখানে পয়সা ছোঁড়ে। মাদারির মা ত আর ফরেস্টের হাতির পালকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলতে পারে না, তোমরা এখানে এসেও রাস্তা আটকাও। অন্তত এই ঢালটাতে যদি দুটো-একটা ট্রাক ওল্টাত তা হলেও লোকজনের একটু ভয়-ভক্তি হত, তা হলে তারা হয়ত দেবতার মত দেখতে শ্যাওড়া গাছটাকে পয়সাও ছুঁড়ত। কিন্তু মাদারির মা অত, বড়-বড় ট্রাক ওল্টায় কিসে, তা কী করে জানবে? সেগুলো রাস্তা দিয়ে গেলে তার ঘরের মাটি থরথরিয়ে কাঁপে।

কিন্তু খুব ভ্যাপসা গরমের বিকেলে মাদারির মা যখন পথে এসে বসে, দেখে—আসন্ন গোধূলিতে শ্যাওড়া গাছের ওপরের শাখাটা হাতির শুঁড়ের মতই নড়ে। নিশ্চিত নড়ে। 'কায়ও দেখিবার না পায় রে, কায়ও দেখিবার না পায়।'

মাদারির মা কী ভেবেছিল, সেটা মাদারির মা-ই জানে। কিন্তু তার ভাবনারও ত একটা সীমা আছে। সারা দুনিয়ায় এত জায়গা ছেড়ে যাকে এসে থাকতে হয় এই ফরেস্টের কাছে, বা, ভেতরেই, এমন একটা অস্পষ্ট ঝোরার পাশে, ন্যাশন্যাল হাইওয়ে বানানোর সময় ফাঁকা-করা খানিকটা জমিতে, তার ভাবনার জোর নিশ্চয়ই খুব বেশি নয়।

কিন্তু ঐ ঝোরা, ঐ শ্যাওড়া গাছ আর এই মাদারির মা—এই তিনটির কোনটির সুবাদে এই ফরেস্টের মধ্যে মাইল-মাইল চলা ন্যাশন্যাল হাইওয়েটার এখানকার নাম হয়ে যায় শ্যাওড়াঝোরা?

শ্যাওড়া গাছটা ত আছেই, ঝোরাটাও আছে, কিন্তু, এখানে এই একটু ফাঁকাতে, নানা পাতায় ছাওয়া মাদারির মা-র ঐ ঘরটা না-থাকলে, সেই ঘরের সামনে একটু জমিতে গাছের ডালপালায় বেড়া-মত দেয়া না থাকলে, কি এই ঝোরার বা এই শ্যাওড়া গাছের নামকরণ প্রয়োজন হত? ঐ ঘরটাকে যারা হঠাৎ ঘর বলে চিনতে পারে, তারাই হয়ত এখানে ট্রাক গাড়ি থামায়, গাড়িকে একটু জল খাওয়ায়, নিজেও একটু হাতেমুখে জল দেয়। তাদেরই মুখে-মুখে হয়ত এই জায়গার একটা নামকরণের দরকার হয়েছিল।

কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও, মাদারির মা যা চেয়েছিল সেটা কিছুতেই ঘটে ওঠে না। বেদিসহ শ্যাওড়া গাছটাকে দেবতার জায়গা বলে মনে হয় না। যদি এক নজরেই মনে হত, তা হলে দশ-বিশ পয়সা ছুঁড়ে দিতে তাদের কারো আপত্তি হওয়ার কথা নয়, যারা হাজার-হাজার মণ মাল নিয়ে দেশের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে এমন নদীর মত ছুটে যাচ্ছে। কিন্তু মাদারির মা কিছুতেই এই জায়গাটিকে দেবতার জায়গা বলে চিনিয়ে দিতে পারে নি।

অগত্যা, গাড়ি থামলে মাদারিকেই দৌড়ে যেতে হয়। পাহাড়ের মত গাড়িটার চাকার মাঝখান থেকে সে আকাশের দিকে ঘাড় হেলিয়ে হাত পাতে, প্রার্থীর সনির্বন্ধ হাত। ঐটুকু এক শিশুকে ঐ বনের মধ্যে কেমন অনৈসর্গিক বোধ হয়, যেন, আকাশে ডানা মেলে নেমে এল বা মাটি ফুঁড়ে উঠে এল। তার ঐ ছুটে আসাটুকুকেই, মাদারির মায়ের ঘর থেকে সেই ছোট্ট ঢাল পেরিয়ে এই রাস্তায় নেমে আবার রাস্তার ঢাল দিয়ে এই ট্রাকের কাছে ছুটে আসা—কেমন অপ্রাকৃত ঠেকে। কিন্তু তারপর, ট্রাকের, পাহাড়প্রমাণ মালবোঝাই ট্রাকের প্রায় চাকার তলা থেকে তার বাড়িয়ে দেয়া সনির্বন্ধ একজোড়া কাঠির মত হাত দেখলেই সে বড় বেশি চেনা ঠেকে, বড় বেশি চেনা, বিশেষত তাদের কাছে যারা সারা দেশের এমন বন, নদী, পাহাড় সমুদ্রপার চিরে-চিরে ছুটছে। হাতমুখ ধোয়ার পর, ট্রাককে জল খাওয়ানোর পর, ড্রাইভার তার বিরাট বুকপকেট থেকে কিছু খুচরো পয়সা মাদারির হাতে দেয়। তারপর, আবার গাড়িতে উঠে স্টার্ট দেয়ার আগে তাকিয়ে দেখে, ফিরবার সময় মাদারি রাস্তার চড়াইটা বা মাঠের উঁচুটা দৌড়ে উঠতে পারে না, হেঁটেই ওঠে, ধীরে-ধীরে। মাদারির মায়ের ঘরটার সামনে মাদারির মাকেও দু-এক সময় দেখা

যায়। সাবা দেশের নানা দৃশ্য দেখতে-দেখতে যে-ড্রাইভার বন, নদী, সমুদ্রপার চিরে-চিরে ছুটছে, তার পক্ষেও এই দৃশ্যটা সম্পূর্ণ না দেখে গাড়ি ছেড়ে দেয়া সম্ভব হয় না—মাদারি গাড়ির তলা ছেড়ে এই ন্যাশন্যাল হাইওয়েব দীর্ঘতায়, এই ঘন ফরেস্টের বনস্পতিগুলির নীচে কেমন সাবালক পদক্ষেপে ধীরে-ধীরে চড়াই ভেঙে, মাঠের ডাঙা ভেঙে উঠে যাচ্ছে, উঠে যাচ্ছে।

কিন্তু এমন ট্রাক থামা, এখানে, এই শ্যাওড়াঝোরাতে, এতই অনিশ্চিত। যদি আরো একটু নিয়মিত থাকত, যাতে মাদারি পয়সাটাও আর-একটু নিয়মিত পেতে পারত!

কিন্তু, তা হলে ত আব মাদারিকে চাকার তলায় দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে পয়সা চাইতে হত না। মাদাবি এখন ত হাটের দিন, মিষ্টির দোকান থেকে একটা ন্যাকড়া চেয়ে নিয়ে দাঁড়ানো ট্রাকগুলোর অত বড় শরীবে কিলবিল করে। ট্রাকটার অত বড় বনেট দুহাতে বগড়ে-বগড়ে মোছে, বনেটেব ওপব উঠে ট্রাকেব মাথাব নকশা মোছে, কাচ মোছে, ড্রাইভারেব দরজা মোছে, চাকার ওপর দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ট্রাকের গা মোছে। প্রথম দিকে ট্রাকেব ক্লিনার তাকে তাড়িয়ে দিত। কিন্তু ধীরে-ধীরে, মাদারি এই কাজটা প্রায় আদায় কবে নিয়েছে। দুই হাটেই আসে এক চা-বাগানের ট্রাকগুলো। চা-বাগানে ট্রাকে মাল আসে না, মানুষ আসে। সেগুলো মুছলে কেউ পয়সা দেয় না। সেগুলোকে বাদ দিলেও মাদারির ট্রাকেব সংখ্যা নেহাত কম নয়। এক-একটা হাটে সে চার-পাঁচ টাকা পর্যন্ত পেয়ে যায়। তার মধ্যে কতকগুলি ট্রাক ত যেন তাব নিজের—'এম-পি-সিং-এর ট্রাক', 'হরিয়ানার ট্রাক', 'জনের ট্রাক'—জন ক্লিনার। শ্যাওড়াঝোরায় নিয়মিত ট্রাক দাঁড়ালে মাদারি ত সেগুলোও মুছতে পারত।

একশ তিরানব্বই

মাদারিহাটে জলুশের ঢোলাই

জলুশের কথা হাটেই শুনেছিল মাদারি। টিন পিটিয়ে-পিটিয়ে হাটে ঢোলাই দিচ্ছিল লাল শুকবা। হাট তখনো বসে নি। মাদারি তার পেছন-পেছন খানিকটা ঘোরে। লাল শুকবা টিন পেটাচ্ছিল আব বলছিল—'কাল তিস্তা ব্যারাজ যাবার লাগেক, জলুশ হবেক।'

শুকরার গলা কফে ঘরঘর করে আর এই কথাগুলো লোকজনকে শোনানোর জন্যে সে গলা তুলছিলও না। ফলে কী যে সে বলছে সেটা কিছুটা শোনা গেলেও, বোঝা যায় না। হাটের লোকজনের অবিশ্যি তা নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না—হয় তারা সব কিছুই জানে, নইলে তারা কোনো কিছুই জানতে চায় না।

কিন্তু 'জলুশ' শব্দটি শুনে মাদারি আর শুকরার পেছন ছাড়তে পারে না। সে জানে 'জলুশ'-এর নানা রকম আছে। শুধু হাটের মধ্যে ছোট 'জলুশ' ওঠে। চা-বাগানের 'জলুশ' ওঠে—সেখানে মাদারির কিছু করার থাকে না। আর বড়-বড় 'জলুশ' মাঝে-মাঝে হয়—তখন ট্রাকে করে শহরে নিয়ে যায়, কখনো আলিপুরদুয়ার, কখনো জলপাইগুড়ি। গতবছর মাদারি একবার আলিপুরদুয়ার শহরে, এ-রকম 'জলুশ'-এর সঙ্গে গিয়ে, 'জলুশ'-এর সঙ্গেই ফিরে এসেছিল। জলপাইগুড়ি শহর তার দেখা হয়নি।

লাল শুকরা খুব রোগা, মনে হয় যেন হাঁটতে গেলে পড়ে যাবে। তার ওপর সকালেই হাড়িয়া খেয়েছে। নেশা বা শরীরের জন্যেই তার পা ঠিকমত পড়ছিল না। কিন্তু সেই টলমলে পায়ে ঘড়ঘড় গলায় সে বলে যাচ্ছিল, 'জলুশ হবেক, জলুশ হবেক'। দেখে মনে হতে পারে, জলুশের কথাটা তার নেশার কথা।

লাল শুকরার পেছনে-পেছনে ঘুরতে-ঘুরতে মাদারি তার সামনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'বড় জলুশ না ছোট জলুশ?' আর-একবার সামনে গিয়ে বলে, 'ট্রাক আসিবে, ট্রাক?'

এ-সব জিজ্ঞাসার সময় সে খানিকটা দূরত্ব রাখে, অভ্যাসেই। কারণ, উত্তরের বদলে শুকরার হাতের কাঠি তার পিঠে পড়তে পারে। শুকরা এমনিতেই আধা পাগলা, আধা মাতাল—কী যে করবে, কেউ বলতে পারে না।

কিন্তু দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসার পরই শুকবা একটা অদ্ভুত কাজ করেছিল। সে টিনটা আব কাঠিটা মাদারির দিকে বাড়িয়ে দেয়। মাদাবি আবো খানিকটা পেছিয়ে যায়। 'লে লে' বলতে-বলতে টলটলায়মান শুকবা তার পেছনে দু-এক পা আসতে-আসতেই কেশে ফেলে। তাবপব টিন আব কাঠি-ধরা বাড়িয়ে-রাখা হাতেই দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কাশে, কেশে যায়। তাব ঠোঁট বেয়ে লালা গড়াতে থাকে, চোখ দুটো যেন বেবিয়ে আসবে এতটাই বড় হয়ে যায়।

শুকরার হাত থেকে টিনটা আব কাঠিটা নিলে সে অন্তত একটু স্বস্তি পেতে পাবে এই আশায় মাদাবি এগিয়ে গিয়ে টিন আর কাঠিটা নিযে নেয়, কিন্তু, তাতেও শুকবা তাব দুই বাড়ানো হাত শবীরেব পাশে নামিয়ে নিতে পারে না—এমনই তাব দুর্দম কাশি।

সেটা থামলে, ঢোক গিলে, হাত দুটো নামিয়ে, বাঁ হাতেব পাঞ্জা দিয়ে মুখেব ঘাম একবাব মুছে ফেলে, ডান হাতটা তুলে সাবা হাটেব ওপব বুলিয়ে শুকবা বলে, 'যা হে মাদাবি, ঢোলাই দে, কালি তিস্তা ব্যারাজমে জলুশ হবেক, মিনিস্টার আবেক, ট্রাক আবেক—'

'ট্রাক আসিবে ?' মাদাবি জিজ্ঞাসা কবে।

'জরুব আবেক। ট্রাক জরুব আবেক। সব কোইকো যাবাব লাগেক। যাও, ঢোলাই লাগাও মাদারি।' বলে শুকবা ডান দিকে ঘুবে মাটিব হাঁড়িব দোকানগুলোব পেছনে গাছতলায প্রথমে গা এলায, তারপর শুয়ে পড়ে।

আর, মাদাবি লাফাতে-লাফাতে টিন বগলে নিযে কাঠি পেটায—'জলুশ জলুশ, কালি জলুশ, ট্রাক আসিবে, সগায় যাবেন, সগায় যাবেন।'

মাদারিব বগলে টিনটা আঁটছিল না। তাকে বাববাব হাত বাড়িয়ে টিনটা তাব শবীরেব সঙ্গে চেপে রাখতে হচ্ছিল। আর সেই বাঁকা অবস্থায কাঠি দিযে পিটতে হচ্ছিল। কিন্তু সে এত তাড়াতাড়ি দৌড়ে-দৌড়ে, সাবা হাটে ঘুবছিল যে মনে হচ্ছিল সে কোথাও থেকে টিন পেয়ে শখ কবে পিটিয়ে বেড়াচ্ছে। তাব কচি গলাব চিৎকাবে 'জলুশ, জলুশ' আওযাজটা তখনো না-বসা হাটেব মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছিল—পাখির চিৎকারেব মতন।

হাট তখনো বসেনি, তাই দোকানেব সাবিব ভেতব দিযে দৌড়োদৌড়ি কবা সম্ভব হচ্ছিল। দোকানিদের সামনে সাজানো দোকানে তখনো প্রায় হাত পড়েনি। তাবাও মাদাবিব এই ঢোলাইয়ে অংশ নিতে পাবে। ফলে, মাদারি একটু মজাই পাচ্ছিল।

কিন্তু মজা পেতে-পেতে ঘোষমশাইযেব মিষ্টিব দোকানেব সামনে আসতেই ঘোষমশাই চিৎকাব কবে ডাকেন, 'এ-ই মাদারি।' নিজের টিনেব আওয়াজে মাদাবি সে-ডাক শুনতেই পায় না। ফলে ঘোষমশাইকে আবো জোবে হাঁক দিতে হয়, 'এ-ই মাদারি।'

সে-হাঁক শুনে মাদারি চমকে, থেমে, ঘুবে, মিষ্টিব দোকানেব দিকে তাকায। দেখে, ঘোষমশাই চোখ গরম করে তাব দিকে তাকিযে। সে বগল থেকে টিন নামিয়ে দুই হাতে টিনটা সামনে ধরে, পাযে-পাযে ঘোষমশাইযেব সামনে যায।

ঘোষমশাই ধমকে ওঠেন, 'কে দিয়েছে তোকে, ঢোলাই দিতে ?'

'শুকরা।'

'কোন শুকরা ?'

'লাল শুকরা।'

'যা, এখনই দিয়ে আয় তাব্র টিন। ঢোলাই দিচ্ছে ! জলুশ হবে কি না-হবে তাতে তোর কী ? যা, টিন দিয়ে এসে কাপ ধুয়ে রাখ—'

মাদারি চড় খাবে—ভয় পেয়েছিল। না-খাওযায় দৌড়ে লাল শুকবার খোঁজে গিয়েছিল। গিয়ে অবিশ্যি তাকে বেশি খুঁজতে হয় না। লাল শুকরা সেই গাছটার তলাতেই শুয়ে আছে আর হাপরের মত শ্বাস ফেলছে।

মাদারি আস্তে-আস্তে পা ফেলে শুকরার কাছে যায়। একটু দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর লাল শুকরা আর গাছটার মাঝখানের একটা ফাঁক দেখে সেইখানে টিনটাকে রেখে দেয়, সাবধানে, যাতে, কোনো আওয়াজ না-হয়, যাতে, লাল শুকরার গায়ে ধাক্কা না লাগে, যাতে, লাল শুকরা জেগে না ওঠে। টিনটা সে ঠিকমত রাখতে পেরেছিল। তারপর কাঠিটা টিনের ওপর রেখেছিল। কিন্তু কাঠিটা টিনের ঠিক

মাঝখানটাতে রাখতে পাবে না। খানিকটা বেরিয়ে থাকে। সে কাঠিটা ঠিকমত বাখতে আবার হাত বাড়াতেই কাঠিটা গড়িয়ে লাল শুকবাব পেটেব ওপব পড়ে তাব শ্বাসেব সঙ্গে ওঠানামা করে। ততক্ষণে মাদাবি দৌড়ে আবাব ঘোষমশাইয়ের দোকানে।

ঘোষমশাইযেব দোকানে মাদাবি দুই হাটবাবে দবকাবেব সময কাপড়িশ ধুযে দেয়। দু-এক সময় চাও দেয, খদ্দেবদেব। চা বানায বাহাদুব—সে বলেছে, মাদাবিকে চা বানানো শিখিয়ে দেবে। ঘোষমশাই তাকে সব সময়ই দু-চাব পয়সা দেন। যদি বাহাদুব সত্যি মাদাবিকে চা বানানো শিখিযে দেয, তা হলে, সে ঘোষমশাইযেব দোকানে চাকবিও পেতে পাবে। কিন্তু চা বানানোব টেবিলটা এখনো তাব থুতনি পর্যন্ত। চা বানানো শেখাব আগে তাকে আবো লম্বা হতে হবে।

হাট শেষ হওযাব আগে দেখা গেল—'জলুশ' একটা না, অন্তত দু-তিনটি। হাতুড়িপাটি বাগানের লোকজন এনে মিছিল তুলে দিল, আব পাহাড়িবা ফবেস্ট থেকে লোকজন এনে মিছিল সাজাল। দেশি মানষিবও একটা মিছিল উঠল। সবাইই বলে—কাল তিস্তা ব্যাবেজে জলুশ।

একশ চুরানব্বই

তিস্তা ব্যাবেজ কী করে হল

এ গল্পটা জলুশেব সঙ্গে তিস্তা ব্যাবেজেই যাবে। তাই, তিস্তা ব্যাবেজের কথাটা এখানে সেবে নেযাই ভাল।

তিস্তা ব্যারেজেব পবিকল্পনা কী, কবে থেকে তাব কাজ শুরু হযেছে, কাজ শুরুব আগে কী গোলমাল হযেছে, রাজ্যের কোন সবকাব আর কেন্দ্রেব কোন সরকাব কী করেছে—সে-সব ত সাতকাহন কথা। তিস্তার জল কোথাও আটকে সেখান থেকে জলবিদ্যুৎ বানানো যায় কিনা—এ নিয়ে নানাবকম কথাবার্তা নানা সময়ই হয়েছে। সবকাবের ঘরে কাগজপত্রও কিছু কম জমা হয নি, সে-সুবাদে। কিন্তু জলঢাকা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের হালেব পব কাবো ঘাড়ে আব দুটো মাথা ছিল না যে উত্তবঙ্গেব এই সব পাহাড়ি নদী নিয়ে কোনো কথা জোর দিয়ে বলে।

কিংবা, তাও হযত নয়। কারণ, জলঢাকা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের বিপর্যযেব পব কারো গর্দানই কাটা যায়নি। সবকাবি কোনো প্রকল্পেই কোনো একজনকে দাযী করা যায় না। এত নানা স্তব দিয়ে, এত নানা লোক, এত বিভিন্ন পর্যায়ে একটা প্রকল্পের রূপ দেয যে কোনো এক স্তরেব কোনো একজনকে কোনো একটি কাজের জন্যে দায়ী কবা যায় না। জলঢাকায় সব হিশেবই ঠিক ছিল—জল বছবে কোন-কোন সময় কত পবিমাণ আছে, জলেব বেগ কত থাকে, সেই বেগেব আঘাতে টারবাইন কত জোরে ঘুরতে পারে, তাতে কতটা শক্তি তৈরি হতে পারে—এ-সব হিশেবেব কোনো জায়গায় কোনো ভুল ছিল না। পৃথিবীব সব জাযগায যে-অঙ্ক মিলিয়ে বিখ্যাত-বিখ্যাত সব জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি হযেছে, জলঢাকাতেও সেই অঙ্ক ছিল নির্ভুল। কিন্তু পৃথিবীর বিখ্যাত-বিখ্যাত জলবিদ্যুৎ-প্রকল্পের অঙ্ককষা বইগুলিতে শুধু ছিল না এখানকার পাহাড়ের বৈশিষ্ট্যের 'লোকাল ফ্যাক্টার'। তাই সেই স্থানিক উপাদান অঙ্কের হিশেবে ধরা হযনি। এখানকার পাহাড়ে পাথরের চাইতে মাটি অনেক বেশি। জল যখন পাহাড় বেয়ে নীচে নামে, স্বাভাবিক খাতে বা ঢলে, তখন জলের সঙ্গে-সঙ্গে নামে পাহাড়ের মাটিও। পাহাড় থেকে মাটি অত খসে যায় বলেই এদিকের পাহাড়ে এত ধস নামে। আর সেই মাটি, জলে গোলা মাটি টারবাইনের ঘূর্ণন যে থামিয়ে দিতে পারে, তা জানা গেল যখন টারবাইন থেমে গেল, তখনই।

জলঢাকার এই অভিজ্ঞতার ফলে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি নদী সম্পর্কে সবাই একটু অনিশ্চিত হয়ে যায়। এরা ঠিক চেনা নদী নয়। এদের স্বভাবও সব সময় বই-পড়া নদীবিজ্ঞানের সঙ্গে মেলে না। বা, এই ধরনের ভৌগোলিক অবস্থানের নদীর বৈশিষ্ট্য নিয়ে তেমন কোনো বইপত্র এখনো লেখা হয়ে ওঠেনি। সুতরাং যতদিন তা না হয়, অর্থাৎ এই সব নদীর ধর্ম পাকাপাকি জানা না যায়, ততদিন নদীগুলো নদীগুলোর মতই থাকুক। মে থেকে অক্টোবর, মৌসুমি বাতাসের প্রথম অভিঘাত থেকে সে-বাতাসেব

প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত ছয়-ছয়টি মাস, নদীগুলি নানা খাতে বয়ে যাক, নানা ধরনের বন্যায় নানা জায়গা ভাসাক, একই নদীতে ছোট-বড় নানা বন্যা আসুক। ববং, বন্যাব হাত থেকে মানুষজনকে বাঁচানোব চেষ্টা কবা ভাল, বন্যাব মানুষজনেব যা ক্ষতি তা পূবণ কবে দেওয়া নিবাপদ, কিন্তু, নদীব গায়ে হাত দেয়ার দবকাব নেই।

এই সংস্কাব করে কাটিল তাব সাল-তাবিখ খোঁজাব দবকাব নেই। মোটামুটি বলা যায় ১৯৬৮ সালে তিস্তাব সব চাইতে বড় বন্যাব পব, ৬৯ সালেব দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সবকাবেব সময় তিস্তাপ্রকল্প কথাটা প্রথম খববেব কাগজেব পাতায় আসে। তিস্তা-মহানন্দা মাস্টাব প্ল্যান কথাটিও সেই সময়েব। কিন্তু তখন এ-সব কথা কাগজে উঠতে-উঠতেই যুক্তফ্রন্টেব সবকাব চলে যায়। তাবপব, আব এ-নিয়ে বিশেষ সাড়াশব্দ হয় নি।

তাবপব, আবাব উঠল বছবছয়েক পবে। তিস্তা ব্যাবেজ প্রকল্পেব কাজে প্রথম হাত দেয়া হবে, তিস্তা-মহানন্দা মাস্টাব প্ল্যান এক-একটা পর্যায় ধবে রূপায়িত হবে, তিস্তা ব্যাবেজ ডিভিশন তৈবি হয়ে গেল—এই সব খবব খুব ঘন-ঘন কাগজে তখন বেবতে শুরু কবে এক কেচ্ছাব সূত্রে। মালদাব এক মন্ত্রী ছিলেন এই সবেব দায়িত্বে। তিনি নিউ জলপাইগুড়িতে তিস্তা ব্যাবেজের এক অফিস আর কোয়ার্টাব খুললেন আব তিস্তা ব্যাবেজেব প্রধান অফিস খুললেন মালদায়।

এই নিয়ে কেচ্ছা তখন বেশ জমে উঠেছিল, কাবণ, নিউ জলপাইগুড়ি বা মালদা কোথাওই তিস্তা নেই। যেখানে তিস্তা নদীব নামগন্ধ নেই, সেখানে প্রকল্পেব মূল অফিস খোলাব একটাই উদ্দেশ্য, যাতে, মন্ত্রীব জায়গাব লোক এই প্রকল্পে বেশি চাকবি পায়। সুতবাং জলপাইগুড়ি-কোচবিহাব থেকে প্রতিবাদ শুরু হল যে ব্যাবেজেব অফিস নদীগুলিব জেলাতে কবতে হবে।

কিন্তু মন্ত্রীব যদি ইচ্ছাই হবে যে তাঁব জেলাব বা শহবেব লোকবা কাজ পাক, তা হলে ত তিনি মহানন্দা ব্যাবেজেব কাজেই আগে হাত দিতে পাবতেন। তা ত তিনি দেননি। আসলে, মালদায় মূল অফিস হলে তিনি নিয়মিত দেখাশুনা কবতে পাববেন। তাঁব প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে উত্তববঙ্গেব, তথা, পশ্চিমবঙ্গেব অন্যতম বৃহৎ নদী তিস্তাব প্রকল্পটি যাতে দ্রুততম বেগে ও অল্পতম সময়ে সম্পূর্ণ হয়—তাই তিনি প্রকল্পেব মূল অফিসটি মালদা শহবে বসিয়েছেন। তা ছাড়া অফিসে আব ক-জন লোক কাজ কবে? নতুন লোক ত নেয়া হবে ব্যাবেজ যেখানে হবে, সেখানে। আব লোক ত নেবে, কনট্রাকটাববা। তাতে মন্ত্রীব কী কবাব আছে?

এই দুই মতেব মাঝখানে একটা তৃতীয় মতও ছিল। তাবা বোধহয় বিশ্বাস কবে না যে কোনো কিছু নিজ অধিকাবে পাওয়া যায়। তাই তাবা বলে—যেখানে খুশি সেখানে অফিস হোক ব্যাবেজটা ত তিস্তাতেই হচ্ছে। তিস্তায় ব্যাবেজ কবে মন্ত্রীব কী লাভ? সে তাই অফিসটুকু মালদায় নিয়ে গেছে। মন্ত্রীব এইটুকু লাভ মেনে নিলে ব্যাবেজটা হয়ত হত। আব, তা না হলে, মন্ত্রী হয়ত ব্যারেজটাই তুলে নেবে, বাগ কবে আব কাজে হাত দেবে না।

কিন্তু এ-সব ঝগড়াঝাটি, তর্কবিতর্ক শেষ হওয়াব আগেই 'জরুবি অবস্থা', ৭৭-এব ভোট ও ইন্দিবা গান্ধীব হাব। কংগ্রেসই যদি কেন্দ্রে হেবে যেতে পাবে, প্রধানমন্ত্রী যদি ভোটে গড়াগড়ি খায়—তা হলে তিস্তা ব্যাবেজই-বা কী? মহানন্দা ব্যাবেজই-বা কী? ১৯৭৭ সালেব ভোটে রাজ্যে বামফ্রন্টের সরকাব হল। ৬৭ আব ৬৯-এব বাজনীতিব ধাবাবাহিকতা যেন আবাব ফিবে এল—মাঝখানেব দুটো-একটা ভোট আব দুটো-একটা সবকাব যেন এলেবেলে হয়ে গেল, যদিও এলেবেলে হতে বছব দশেক লেগেছে।

স্পেশ্যাল সেটলমেন্টেব জরিপেব কাজ শুরু হল ৭৭-সাল নাগাদই। মালদায় ব্যাবেজ-অফিস হওয়ার কোনো প্রশ্নই আর ওঠে না। কিন্তু একটা অফিস নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনেব কাছে থাকল, কোয়ার্টার-টোয়ার্টাবও হল। সংযোগ বাখা, জিনিশপত্র আনা, কলকাতায় ছোটাছুটি, এ-সবেব জন্যে এ-রকম একটা জায়গায় এ-বকম একটা ক্যাম্পাস দবকাব বোধ কবল সবাই। বিশেষত ব্যাবেজ শেষ হলে তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও ত আছে।

এ-সবের মধ্য দিয়ে তিস্তা-মহানন্দা মাস্টাব প্ল্যানেব একটা পর্যায় হিশেবে তিস্তা ব্যাবেজেব কাজটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়িই হতে লাগল। গাজোলডোবা গ্রাম হয়ে উঠল প্রধান কর্মকেন্দ্র। দেখতে-দেখতে, এপারে গাজোলডোবা আর ওপারে বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্টের মাঝখানে, চওড়া-চওড়ি, তিস্তার মাঝখান দিয়ে

ব্যারেজ তৈরি শুরু হয়ে যায়। স্লুইস গেট, রিজার্ভোয়ার সহ, তিস্তা ব্যারেজ। সে-কাজ এখনো শেষ হয় নি। কিন্তু তার উদ্বোধন এখনই করা হচ্ছে, অন্তত আংশিক উদ্বোধন। সেই উদ্বোধনেই এত 'জলুশ' যাচ্ছে।

একশ পঁচানব্বই

শেষ-না হতেই উদ্বোধন

কিন্তু অসম্পূর্ণ ব্যাবেজ উদ্বোধনের দরকারটাই-বা পড়ল কেন ?

সেটাই সাম্প্রতিক ইতিহাসের ব্যাপার এবং এ গল্পেব পক্ষে জরুবি।

এত বড় একটা কর্মযজ্ঞে স্থানীয় লোকজন কিছু সুযোগ-সুবিধে পেয়েই থাকে। কিন্তু সেই সুযোগ-সুবিধের ব্যাপারেই প্রথম থেকে গণ্ডগোল। কাজটা হচ্ছে নদীর ভেতরে চওড়া-চওড়ি। এই ব্যারেজের ফলে তিস্তার জলকে তাব মূলখাতে শাসনে রাখা যাবে। এ-বর্ষায় এক খাত, পরের বর্ষায় অন্য খাত, বা, একই বর্ষায় প্রথম দিকে বাঁ-পাড় ঘেঁষে, শেষ দিকে ডান-পাড ঘেঁষে—এই সব আর চলবে না।

কিন্তু ফলে, তিস্তার এই স্বভাবের ফলে, তিস্তার যে-খাত বিরাট হয়ে গেছে, তার মাঝখানে-মাঝখানে অনেক চর তৈরি হয়েছে। সে-সব চর প্রায় ডাঙার মত উঁচুও হয়ে গেছে। তিস্তা ব্যারেজের ফলে নদীখাতের এই সব চরে ত আর বসতি বা চাষবাস চলবে না—কারণ, তিস্তাকে তার মূলখাতেই রাখা হবে। সঞ্চিত জল যখন ছাড়া হবে, তখন সেই জলস্রোতের ধাক্কায় এই মধ্যবর্তী চরগুলো ভেসে যাবে।

এই সব চরে প্রধানত পূর্ববঙ্গেব নমশূদ্র চাষিরা বসতি করেছে, আবাদ করেছে। কোনো-কোনো জায়গায়, যেমন মউয়ামারির চরে, তাদের কোঅপাবেটিভ পর্যন্ত আছে। তিস্তা ব্যারেজেব জল কবে ছাড়া যাবে সে-হিশেব এখনো কেউ কষছে না বটে কিন্তু যখনই ছাডা হোক, এ-সব চর-বসতি তার আগে উঠে যাবে। ইতিমধ্যেই এরা হয়ত অন্য-কোনো জায়গায় খোঁজ-খবর করছে। সরকারের সঙ্গেও কথাবার্তা চলছে—এদেব আর-কোথাও পুনর্বাসন দেয়া যায় কিনা।

ভবিষ্যতের ব্যবস্থা কী হবে, সেই সব নিয়ে নানা চেষ্টাব মধ্যেও ত এরা বর্তমানকে ছেড়ে দিতে পারে না। তাই তিস্তা ব্যারেজের শুরুতেই তাদের দাবি হল—যে-ব্যারেজের ফলে তাদেব উচ্ছেদ হতে হবে, সেই ব্যারেজের কাজে তাদেবই নিতে হবে। বিশেষ কবে মাটিকাটাব প্রাথমিক কাজে।

ব্যারেজ-কর্তৃপক্ষের এ নিয়ে কিছু বলার নেই। কাবণ, কাজ করাবে কনট্রাকটাব। সে কোথা থেকে লোক এনে কাজ করাবে, এটা সম্পূর্ণতই তার ব্যাপাব। কিন্তু তবু যাতে কাজের শুরুতেই কোনো গোলমাল না বাধে সেইজন্যে সরকারি ইনজিনিয়াববা একটা আপসের চেষ্টা করে।

আপসের পথে বাধা ছিল। কারণ এ-কনস্ট্রাকশন কোম্পানির সারা ভারত জুড়ে কাজ। তাদের সাব-কনট্রাকটার, লেবার, এ-সব বাঁধা। এমন-কি তারা এসে গাজোলডোবার জঙ্গল পরিষ্কার কবে তাঁবু গেড়ে ফেলেছে, ইলেকট্রিক লাইন টানবার জন্যে শালগাছের ডালপালা ছেঁটে দিয়েছে। এই অবস্থায় তাদের অভ্যস্ত ব্যবস্থা বদলাতে কোম্পানি কেন রাজি হবে ? এ-কথা আগে ওঠেনি। ফলে, কোম্পানির সাব-কনট্রাকটাররা তাদের লোকজনকে আনতে টাকা-পয়সা নিয়ে নানা জায়গায় চলে গেছে। প্রতিদিনই বেশ কিছু মজুর এসে পৌঁছচ্ছে। আপলচাঁদ ফরেস্টের মধ্যে তাদের অস্থায়ী আস্তানার সীমা প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে। এমন-কি, ট্রাক আসার জন্যে যে-রাস্তাটা এখন কিছুটা মাত্র তৈরি হয়েছে, তার পাশে, খানিকটা জায়গা জুড়ে ছোটখাট একটা বাজারও কিছুদিন থেকে বসতে শুরু করেছে। এই অবস্থায় এই সব লোককে বসিয়ে রেখে কোম্পানি কি চরের লোকদের কাজ দিতে যাবে ?

আসলে, কোম্পানি একটা গোপন হিশেব করে ফেলেছিল। ব্যারেজের কাজে আসতে পারে কাছাকাছি চরের বাড়তি লোকজন, যারা কৃষিকাজে খাটে না। দূরের চর থেকে কেউ এ কাজে আসবে না। আর, এই কাছাকাছির চরগুলো থেকে যত সংখ্যক লোক ব্যারেজের কাজে আসতে পারে, অন্য জেলা থেকে সাব-কনট্রাকটারদের সূত্রে তার চাইতে অনেক বেশি লোক কোম্পানির নিজের হাতেই চলে

আসবে। এই সব চরেব লোকবা যদি বাধা দিতে চায়, শুধু সংখ্যাতেই তারা হেরে যাবে। এই পরিস্থিতির জন্যে কোম্পানির আরো কিছু দিন সময় দরকাব ছিল। ইনজিনিয়ারদের সঙ্গে কথা বলে, চরের লোকদের সঙ্গে কথা বলে, পবে কথা বলার দিন ঠিক করে—কোম্পানি এই সময়টা নিচ্ছিল।

এই কোম্পানি ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় এই রকম বিরাট-বিরাট কাজ বছরের পর বছর ধরে করে থাকে। এ-রকম সমস্যা মেটানোর ব্যাপারে তাদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা দুইই যথেষ্ট আছে।

সেই অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাও তারা কাজে লাগায় সাব-কনট্রাকটারদেরও নীচের স্তরে।

সাব-কনট্রাকটারদের কাজের জন্যে আবার কিছু সাব-কনট্রাকটার দরকার, বা, বলা ভাল, এক-একটি কাজেব জন্যে এক-একজন সাপ্লায়াব দরকাব হয়। এ-সব সাপ্লায়ার লোক্যাল লোক হওয়া ভাল ও নিরাপদ। কারণ স্থানীয় ভাবে কোথায় কোন জিনিশ পাওযা যায়, তাবা ভাল জানে, জোগাড করে নিয়েও আসতে পাবে, একজন না পারলে আর-একজন সাহায্যও করে।

স্থানীয় ছোটখাট কনট্রাকটারদেব হদিশ করে তাদেব সঙ্গে কথাবার্তা বলার কাজে কোম্পানি সাব-কনট্রাকটারদেব লাগিয়ে দেয়। মাটিকাটাব কাজের শুরুতেই বাঁশ লাগবে গাড়ি-গাড়ি। শাল-বরগা লাগবে—কত তাব শেষ নেই। পাথর ফেলাতে হবে পাহাড-পাহাড় জলের স্রোতের ধার ভাঙতে। এই বকম একটা ব্যাবেজেব কাজের একটা অংশেরও অংশে শুধু বাঁশ, বা শাল-বরগা, বা পাথর সববরাহের কাজ যদি স্থানীয় কোনো কনট্রাকটাব পায় সে ত হাতে চাঁদ পেয়ে যাবে।

সাব-কনট্রাকটাবরা সেই মালবাজাব, ওদলাবাড়ি, জলপাইগুড়িব সব কনট্রাকটারদেব সঙ্গে এই নিয়ে কথাবার্তা বলে। আর, তাদেব প্রত্যেকেই জেনে যায়, ব্যারেজেব কাজ শুরু করতে দিচ্ছে না চরের লোকজন। কোম্পানির এ-হিশেবটা পাকা ছিল যে এ-সব জাযগাব জনাপঞ্চাশ, বা শ-খানেক, বা শ-দেড়েক কনট্রাকটারকে সাপ্লাইয়েব কাজ দেয়া যাবেই।

এই সব কথাবার্তার সূত্রে জেলাব এই কনট্রাকটাররাও কোম্পানিব সমর্থনে এসে দাঁড়ায়। তাদের মধ্যে যাদেব বাজনৈতিক ক্ষমতাও কিছুটা আছে, তারা চরের লোকজনের ওপর রাজনৈতিক প্রভাবও খাটাতে থাকে যে এত বড় একটা কাজে ও-রকম বাধা দেয়া ঠিক হচ্ছে না।

কিন্তু কোম্পানি সবচেয়ে দক্ষতা দেখায় স্থানীয় গ্রামাঞ্চলে বাজবংশীদের একটা সংগঠন প্রায় তৈরি কবে ফেলায়। চরেব নমশূদ্রদেব সঙ্গে রাজবংশীদেব সম্পর্ক কোনোদিনই খুব ভাল নয়। কী করে এ-কথা কাছাকাছি সব গ্রামে বটে যায়—সেই ক্রান্তিব হাট ছাড়িযে, সেই ওদলাবাড়ি ছাড়িয়ে যে চবের লোকরা কোম্পানিকে বলেছে—তাদের কাজে নিতে হবে, রাজবংশীদের কাজে নেয়া চলবে না।

ব্যাপারটা আইন-শৃঙ্খলার মধ্যে গিয়ে পড়ে।

কোম্পানি পবিষ্কার জানায় যে—চবের লোকদের কাজ দিলে বাজবংশীরা দাঙ্গা বাধাবে। রাজবংশীদের কাজ দিলে চরের লোকরা দাঙ্গা বাধাবে। দু-দলকে কাজ দিলে কাজের জায়গায় দাঙ্গা বাধবে। সুতরাং কোম্পানি সবকারেব অনুমতি অনুসারে নিজের লোকদের দিয়ে কাজ শুরু করে দেয়।

একশ ছিয়ানব্বই

ব্যারেজের আগেও ইতিহাস আছে

কিন্তু সে ত কাজ শুরুব ব্যাপার। তার সঙ্গে এই এখনকার উদ্বোধনের সম্পর্ক কী। উদ্বোধন মানে ত কাজ শেষ। আংশিক উদ্বোধন মানে অন্তত আংশিক কাজ শেষ। কিন্তু এই ব্যারেজ ছাড়াও ইতিহাস আছে। সে-ইতিহাস ত প্রতিদিন, প্রতি বছরের নানা ঘটনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এখন যেমন তিস্তায় ব্যারেজ বেঁধে তিস্তার খাত পাকাপাকি স্থির করা হচ্ছে, সে-ভাবে ত আর ইতিহাসে ব্যারেজ বেঁধে ইতিহাসের খাত ঠিক করা যায় না। ইতিহাসের খাত সব সময়ই মুক্ত তিস্তার মতন। কখনো সে ডাইনে পাড ভাঙে, কখনো বাঁয়ে। একই বর্ষার শুরুতে সে তার পুরনো চর উৎখাত করে বয়ে চলে। সে-বর্ষার শেষে নতুন চর ফেলে সরে যায়। সে-ইতিহাস এই গোটা ভারতেরই হোক, বা, এই তার এক রাজ্য

পশ্চিমবঙ্গেরই হোক, অথবা, পশ্চিমবঙ্গেরই একটা অংশ এই উত্তরবঙ্গেরই হোক। খবরেব কাগজ, বা রেডিও, বা টিভি পড়ে শুনে দেখে মনে এই ধারণা প্রায় অনড হয়ে ওঠে যে ইতিহাসের মত বড ব্যাপার দিল্লি-বম্বের মত বড শহরে, বা কলকাতাব মত বাজধানীতেই ঘটে উঠতে পারে, তারপব সেখান থেকে অন্যত্র ছডাতে পারে। কিন্তু কোনো-কোনো সময় দেখা যায় উত্তববঙ্গেব মত এক অনির্দিষ্ট ভূখণ্ডেও ইতিহাস একটা নির্দিষ্ট আকাব পেতে চায়। বা হযত সব খণ্ড অংশেবই একটা নিজস্ব ইতিহাসেব গতি আছে। বড ইতিহাসের গতিব সেটা অনুকূলও হতে পারে, প্রতিকূলও হতে পাবে। বড ইতিহাস নিজের বড়ত্বের চাপে কখনো-বা সেই প্রতিকূলতাকে দুমড়ে-মুচড়ে দিতে পাবে, কখনো-বা সেই প্রতিকূলতাকে নানা মোড়ে ঘুরিয়ে-ঘুবিয়ে অনুকূলতাব স্রোতে মিশিয়ে দিতে পাবে। কিন্তু কখনো-কখনো দেখা যায় সেই আঞ্চলিক খণ্ডের ইতিহাসেব বাঁকা পথ কিছুতেই আব সোজা হচ্ছে না, শেষ পর্যন্ত তা হয়ে দাঁডায মূল ইতিহাসেব অসম কিন্তু প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। তিরিশের দশকেব মাঝামাঝিব আগে কেউ কখনো ভাবতেও পাবে নি যে ভাবতীয ইতিহাসেব মূল ধারাব বিরুদ্ধে মুসলমানেব একটা বিচ্ছিন্ন ধাবা কোথাও কোনো স্বীকৃতি পেতে পারে। ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনে সেই বিচ্ছিন্নতার ধারাকে আবো বড প্রবাহপথ দেওয়া হল। আব তারই ফলে মাত্র দশ বছরেব মধ্যে পাকিস্তানের দাবি হয়ে উঠল স্বাধীনতাব দাবিবই সমতুল্য। ১৯৪৭-এ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে পাকিস্তানেব সেই দাবিব বয়স মাত্র সাত বছব—১৯৪০-এব মার্চে লাহোবেব সম্মিলনে পাকিস্তানেব দাবি প্রথম তোলা হয়—অথচ তা মাত্র এই সাত বছবেই অখণ্ড ভারতের অখণ্ড স্বাধীনতার প্রায় একশ বছরেব স্বপ্ন, কল্পনা ও প্রয়াসেব প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পেরেছিল।

তিস্তা ব্যারেজ সে-রকম একটা আঞ্চলিক খণ্ড ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছে। সেই আঞ্চলিক ইতিহাসের চেহাবাটাও এক বকমেব নয় কিন্তু সব চেহাবাতেই তাব আঞ্চলিকতার চবিত্র অত্যন্ত স্পষ্ট :

যেমন, মালদহ-দিনাজপুবেব পোলিযা-বাজবংশী থেকে শুরু কবে কোচবিহাব-জলপাইগুডিব রাজবংশী পর্যন্ত মিলিত ভাবে নিজেদেব আদিবাসীসত্তার প্রাধান্য চেয়ে বাস মাঝে-মাঝেই।

সেই 'উত্তবখণ্ড পার্টি' বা, পার্টি, না-বলে উত্তবখণ্ড আন্দোলনেব কিছুটা বিববণ ত আমরা এব আগেব পর্বেই পেয়েছি। সেই উত্তবখণ্ড আন্দোলন বা পার্টি কখনোই খুব বড় হয়ে উঠতে পাববে কিনা সেটা আলাদা প্রশ্ন ; বরং সে-আন্দোলনেব ভেতব এত নানা ধরনেব স্বার্থ ও উদ্দেশ্য এসে মিশেছে তাদের সব নেতার একসঙ্গে কাজ করাই মুশকিল। কিন্তু যত মুশকিলই হোক, তেমন দবকাবে ত বম্বেব ফিল্ম-আর্টিস্ট শ্রীদেবী আব জল্পেশ মন্দিরেব শিবলিঙ্গ—একাকাব কবে দিয়ে এবা এমন একটা অবস্থা তৈরি কবে তুলতে পারে যাতে মনে হয় সত্যি বুঝি এদের পেছনে অনেক লোক আছে। লোকবল, বা, জমায়েতই যদি শক্তি দেখানোব প্রধান উপায় হয়, সে-উপায ত নানা ভাবেই ব্যবহৃত হতে পারে।

প্রাচীন ইতিহাস, জনবৈশিষ্ট্য এই সব নিয়ে একটি অঞ্চলের বিশিষ্টতা যখন তাব বিচ্ছিন্নতার উপাদান হয়ে ওঠে, তখন, ইতিহাসের কোনো উপাদানই অব্যবহৃত থাকে না। উত্তববঙ্গ শুধু সমতল নয়—তার বিস্তৃত পার্বত্য অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গেরই অংশ। সেই পার্বত্য অঞ্চল প্রধানত দার্জিলিং জেলাব মধ্যেই ছড়িয়ে, আর-একটা অংশ জলপাইগুড়ি জেলার উত্তরভাগ দিয়ে অনেকখানি নেমে এসেছে। প্রকৃতপক্ষে, জলপাইগুড়ি জেলা যত উত্তরে গেছে ততই তার জনমণ্ডলীব চেহারা বদলে যায়। প্রায় মাঝখান দিয়ে যদি পূর্ব-পশ্চিমে একটা বেখা টেনে জলপাইগুডি জেলাকে দুভাগ করা যায়, তা হলে ওপরের ভাগের তিন ভাগের দুই ভাগ রাজবংশী এলাকার বাইবে। এই ভাগে প্রধানত চা-বাগান—সেই সূত্রে কোল-মুন্ডা-সাঁওতালরাই প্রধান অধিবাসী। আরো একটু উত্তরে গেলে, নেপালি অধিবাসীরাই প্রধান। এই উত্তরের জলপাইগুড়ির সঙ্গে জলপাইগুড়ির জনবসতিগত পার্থক্য নির্বাচন কমিশনও পরোক্ষে মেনে নিয়েছেন। দার্জিলিঙের লোকসভা আসন বলে যা পরিচিত, তার মধ্যে জলপাইগুডি জেলার উত্তরাঞ্চলের অনেকটা পড়ে। অর্থাৎ জলপাইগুড়ি জেলার উত্তরের নেপালিরা, কোল-মুন্ডা-সাঁওতালরা দার্জিলিং লোকসভা আসনের ভোটার। এ-ব্যবস্থা দু-তিনটে ভোট ধরে চালু হয়েছে। ফলে পার্বত্য এলাকার সঙ্গে জলপাইগুড়ির একটা সম্পর্ক প্রায় স্থায়ী হয়ে গেছে।

একশ সাতানব্বই

পাহাড় থেকে সমতল

ভৌগোলিক আরো একটা কারণ আছে জলপাইগুড়ির মধ্য দিয়ে পাহাড় আর সমতলেব এই সংযোগের।

দার্জিলিঙের সঙ্গে শিলিগুড়িব সমতলভূমির সম্পর্কটাই চোখে পড়ে বেশি, সেই সম্পর্কটাতেই অভ্যস্ততাও বেশি। শিলিগুড়ি থেকে হিলকার্ট রোড দিয়েই দার্জিলিঙের সঙ্গে প্রধান সংযোগ। কিন্তু সেটাই পাহাড়ের সঙ্গে সমতলের একমাত্র সংযোগ নয়। জলপাইগুড়ি জেলাব ওদলাবাড়ি থেকে গরুবাথানেব রাস্তা সোজা উঠে গেছে লাভা-আলগাড়া হয়ে কালিম্পং। দার্জিলিং পাহাড় থেকে কালিম্পং পাহাড আলাদা। আব, এই কালিম্পং পাহাড়েব সঙ্গে জলপাইগুড়িব সংযোগ অনেক প্রাচীন। এই গরুবাথানের বাস্তায়, বা লাভা-আলগাডার রাস্তায়, বা সরকারি ভাষায় ওল্ড মিলিটাবি রোডে জলপাইগুড়ির অনেক চা-বাগান ধীরে-ধীরে ধাপে-ধাপে পাহাডে উঠে গেছে, পাহাড়েব আনাচে-কানাচে ঢুকে গেছে, পাহাডের আডাল থেকে গড়িয়ে নেমে এসেছে। পাথরঝোবা, গুড়িবাড়ি, ছোট ফাগু, বড ফাগু। আবার, এই সব পাহাড জুড়েই উঠে গেছে জলপাইগুড়ি ডিভিশনেব অধীনে ফবেস্টের নানা রেঞ্জ। কোনো একটা জায়গায় জলপাইগুড়ির জেলা শেষ হয়ে দার্জিলিং জেলা শুরু হযে যায় বটে, কিন্তু বাইবে থেকে তা বোঝাই যায না। সর্বত্রই নেপালি শ্রমিক, নেপালি অধিবাসী। মানুষের মুখ আর মুখের ভাষায় কোনো ছেদ ধরা পড়ে না।

সেই নিববচ্ছিন্ন মুখ আর ভাষার সূত্রেই সম্প্রতিকালে পাহাড়ি মানুষদের এক স্বাতন্ত্র্যেব দাবি পাহাড় থেকে জলপাইগুড়িব এই সমতলে নেমে এসেছে। সে-দাবিকে কাগজে-কাগজে গোর্খাল্যান্ডই বলা হচ্ছে বটে যেহেতু পাকিস্তান, খালিস্তান, ঝাড়খণ্ড ইত্যাদির পব যে-কোনো স্বাতন্ত্র্যেব দাবিকেই—স্তান বা ল্যান্ড দিয়ে বোঝানো সহজ, কিন্তু আসলে সেই স্বাতন্ত্র্যেব দাবিব ভেতব নিহিত আছে—পশ্চিমবঙ্গের এই পার্বত্য এলাকার প্রতি দীর্ঘ-দীর্ঘ দিনের উপেক্ষা, পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তর সমাজে পাহাড়েব মানুষদের যোগ্য ভূমিকাব অভাব, নিজেদেব মাতৃভাষাব অস্বীকৃতি আব, সবচেযে বড কথা, আহত আত্মসম্মানবোধ।

আত্মসম্মান একবার আঘাত পেলে তার নানা বিকার দেখা দিতে পারে যেমন তেমনি আবার সেই আহত আত্মসম্মানবোধ থেকেই আত্মপরিচয় লাভের সুযোগও খুলে যেতে পাবে।

পাহাড়েব মানুষ যখন হিশেব দাখিল করে যে পার্বত্য এলাকা থেকে কত কাঠ, কত চা, নীচে যায় আব সেই বাবদ সরকাব কত টাকা আয় করে অথচ পাহাড়ের মানুষজনের জন্যে ম[illegible]পিছু কত কম ব্যয় করে—তখন তার ভেতর নিহিত থাকে বাজ্যেব সবকারেরই ভাষা ও বচন।

রাজ্যের সরকারও ত প্রায় একই ভাষায় হিশেব দিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে কত টাকা সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার, পায়, অথচ পশ্চিমবঙ্গকে কত কম ফিরিয়ে দেয। রাজ্যেব সরকাব যখন মাতৃভাষাব গৌরব প্রচার করে, মাতৃভাষাকে এ-রাজ্যের সব কাজেব ভাষা হিশেবে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি স্মরণ করে, মাতৃভাষাকে উচ্চতম শিক্ষার বাহন করতে চায়, তখন, এই রাজ্যের একটি অঞ্চলের প্রধান যে-অধিবাসীদের ভাষা বাংলা নয়, তাবা ত নিজের উপেক্ষিত ভাষার জন্যে দুঃখ বোধ করতেই পারে।

আর, এ-রকম উদ্ভট সময়ে পাহাড় অঞ্চল থেকে কথা ওঠে—তিস্তা ব্যারেজের আসল মতলব পাহাড়ের নদীর জল সমতলের জন্যে টেনে নেয়া।

এ-কথার কোনো যুক্তি নেই কারণ পুরো পাহাড় এলাকা পেরিয়েই ত ব্যারেজের জায়গায় জল আসছে। এ-কথা ইতিহাসের দিক থেকেও ঠিক নয়—কারণ উত্তরবঙ্গে সবচেয়ে বেশি নদী নিয়ে প্রকল্প তৈরি হয়েছে দার্জিলিং জেলাতেই। এ-কথা পাহাড়ের স্বার্থেও ঠিক নয়—কারণ তিস্তা প্রকল্পে ত পাহাড়ি অঞ্চলও উপকৃত হবে।

কিন্তু কথাটা রাজনীতির দিক থেকে বড় বেশি লাগসই কথা।

চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে, নীচে তিস্তার জলকে এক জায়গায় আটকে, তিস্তাকে একটা মূলখাতে বইয়ে দেয়ার কাজ চলছে, কাজ এগচ্ছে। দেখতে দেখতে ফরেস্টের ভেতর, এক নির্জন জায়গার চেহারা বদলে গেল সেই কাজের বেগে। দেখতে-দেখতে তিস্তার বুকে অন্ধকার রাত্রিতে আলো জ্বলে

তি : পা . বৃ . ২৯

উঠল—রাতেও কাজ চলছে। সেদিকে আঙুল দেখিয়ে বলা যায়—ঐ দেখো, তিস্তা ব্যারেজের কাজ চলছে ; তিস্তা ত পাহাড়ের নদী, কালিম্পঙের নদী, আমাদের নদী ; কিন্তু এই যে আমাদের নদী সে যতক্ষণ পাহাড়ের ভেতর বয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ তার দিকে রাজ্য সরকারের নজর নেই ; এমন-কি সেই ইংরেজরা তিস্তার ওপর যে-কটা সাঁকো পাহাড়ে তৈরি করেছিল তারপর দেশী সরকার একটি সাঁকোও তৈরি করে নি ; অথচ দেখো, নীচে, সমতলে কত বড় তিস্তা ব্রিজ তৈরি হল ; ওবা আমাদেব নদীও লুটে নিচ্ছে ; আমরা এ হতে দেব না ; তিস্তা ব্যারেজ ভাঙতে হবে।

এই সব যুক্তি বড় তাড়াতাড়ি লোকের মনে ধরে। বঞ্চিত মানুষ বড় তাড়াতাড়ি হিংসুটে হয়ে উঠতে চায়, তাতে তার মনে একটা সান্ত্বনা অন্তত পায়। আর, চোখের সামনে গড়ে ওঠা একটা জিনিশকে ভাঙার আহ্বান দিলে লড়াইটা একটা প্রত্যক্ষতা পায়। তাই পাহাড় থেকে পাহাড়ি মানুষের আওয়াজ উঠেছে—তিস্তা ব্যারেজ ভাঙতে হবে। সে আওয়াজ হাজার-হাজার বছরেব প্রাচীন রাস্তা বেয়ে জলপাইগুড়ির সমতলে যে-পাহাড়ি মানুষ আছে তাদেরও মুখে উঠে এল—তিস্তা ব্যাবেজ ভাঙতে হবে।

উত্তরখণ্ড, কামতাপুর, গোর্খাল্যান্ড ও পুরনো চরের নমশূদ্রদের সংগঠন—এই এতগুলো আন্দোলনের বিরোধিতার সামনে সবকার তিস্তা ব্যাবেজেব কাজের গতি বাড়িয়ে দিল। প্রথমত, এই এতগুলো বিরোধিতার মধ্যে কোনো ঐক্য নেই। প্রত্যেকেরই আলাদা-আলাদা কারণ আছে এবং সে-কারণগুলি পরস্পরের বিরোধী। উত্তরখণ্ড চায় 'ভাটিয়া' তাড়াতে। নমশূদ্ররা চায় উপযুক্ত পুনর্বাসন। উত্তরখণ্ড চায় স্বতন্ত্র রাজ্য। কামতাপুর চায় আসামের একটা অংশেব সঙ্গে মিলন। গোর্খাল্যান্ড চায় স্বাতন্ত্র্য—আলাদা রাজ্য হিশেবে হলেই ভাল হয়।

প্রতিপক্ষদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া অসম্ভব, সুতরাং রাজ্য সরকাব তার নিজের রাজনৈতিক শক্তিকে সংহত করতে পারে। বামফ্রন্টেব ভেতরকার পার্টিগুলো ত আছেই, বাইরের পার্টির মধ্যে কংগ্রেস-এর পক্ষে রাজনীতিগত ভাবে এই সব দলের কোনোটিকে প্রকাশ্যে সমর্থন দেয়া অসম্ভব। সুতরাং এই অভূতপূর্ব রাজনৈতিক ঐক্যের সঙ্গে তিস্তা ব্যারেজের আংশিক কাজ সম্পূর্ণ কবে যদি উদ্বোধন ঘটানো যায়, তা হলে উত্তরবঙ্গের লোক হাতেনাতে প্রমাণ পাবে যে এই সরকার তাদের কথা কতটাই ভাবছে।

এরই সঙ্গে-সঙ্গে সরকার, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার চা-বাগানগুলিতে, যেখানে-যেখানে তাদের ইউনিয়ন আছে সেখান থেকে, প্রধানত পাহাড়ি মানুষদের একত্রিত করেছে। জলপাইগুড়ি-কোচবিহারে তাদের কৃষক সংগঠনগুলিকে প্রচারে নামিয়েছে। তারা রাজনীতির দিক থেকে অনেক সুসংহত। তারা পাহাড়ের মানুষজনের ও রাজবংশীদের মধ্যে প্রায় এক বছর ধবে 'বিচ্ছিন্নতাবাদ'-এর বিরুদ্ধে প্রচার করে আসছে। এবং সংখ্যার দিক থেকে তারাই গরিষ্ঠ।

তাই, তিস্তা ব্যারেজের উদ্বোধন উপলক্ষে—উত্তরখণ্ড, কামতাপুর, গোর্খাল্যান্ডেব দল আজ বিক্ষোভ করছে বটে কিন্তু সে-বিক্ষোভ তিস্তা ব্যারেজ পর্যন্ত পৌঁছবে না, পৌঁছতে দেওয়া হবে না। সবকাবের দলগুলিও সারা জেলা থেকে মিছিল নিয়ে ব্যারেজে যাচ্ছে সমর্থন জানাতে। কেন্দ্রীয় সবকাবেব জলবিষয়ক রাষ্ট্রমন্ত্রী, বাজ্য সরকারের সেচমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং আসছেন উদ্বোধন করতে। আর এবই ফলে ব্যারেজ ঘিরে পুলিশ, সি-আর-পি, বি-এস-এফের পাকের পর পাক, পাকেব পব পাক।

একশ আটানব্বই

নির্বাচন ও উদ্বোধন

তিস্তা ব্যারেজের উদ্বোধন তাই একটা সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধনমাত্র নয়, হয়ে উঠেছে একটা রাজনৈতিক ঘটনা।

সরকার ও সরকারের অন্তর্ভুক্ত দলগুলি পরিষ্কার শক্তিপরীক্ষায় নেমেছে। তারা এটা প্রমাণ করে দিতে চায় যে এই সব কামতাপুর, উত্তরখণ্ড, নমশূদ্র সমিতি, গোর্খাল্যান্ড ইত্যাদির কোনো রাজনৈতিক ভিত্তিই নেই। নেহাত, সরকারে পক্ষে এদের দমন করাটা একটা কৌশলগত প্রশ্ন, তাই, দু-পাঁচজন

লোক এক হয়েই একটা স্তান বা ল্যান্ডের শ্লোগান দিতে পারে। তারা ত শ্লোগান দিয়েই খালাশ। সরকারের পক্ষে ত আর সব সময় তাদের জেলে ভরা সম্ভব নয়। জেলে ভরলে ত তাদের নেতা বানিয়ে দেয়া হবে। আর-এক হয়, হাঠে-মাঠে যেখানেই তারা মিটিং-মিছিল করবে—সেখানেই পুলিশ দিয়ে মেরে ছাতু করে দেয়া। পুলিশের মারের অনেক সুফল আছে। কিন্তু মার দিতে বললে পুলিশ ত আর রয়ে-সয়ে মার দেবে না। তাতে যদি দু-একটা মারা যায়, তা হলে তাই নিয়ে সারা দেশে গোলমাল বাধবে। মারা না গেলেও, পুলিশের মারের খবর কাগজে-পত্রে এমন ফলাও হয়ে বেরবে যে আন্দোলন থামার বদলে চাগিয়ে উঠবে।

তার চাইতে বরং এ-রকম কর্মসূচিই ভাল। দীর্ঘদিন ধরে সরকারেব দলগুলি প্রচার করেছে, নিজেদের কথা লোকজনকে বুঝিয়ে বলেছে, সরকারের দলগুলির নানা নেতা নানা জায়গায় নানা দফায় মিটিং করেছে। একই সঙ্গে তিস্তা ব্যারেজের পর্যায়ক্রমিক কাজের মধ্যে অদল-বদল ঘটানো হয়েছে, চিফ ইনজিনিয়ার ও মন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক হয়েছে—এক বছরের মধ্যে উদ্বোধন করা হবে সাব্যস্ত হয়েছে। রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলেছে। সরকারের দলগুলির প্রথমে ইচ্ছে ছিল প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে উদ্বোধন করানো। তা হলে—কামতাপুর, উত্তরখণ্ড, নমশূদ্র সমিতি, গোর্খাল্যান্ডের পেছনে যে-কংগ্রেসি জনসাধারণের সমর্থন আছে, তারা দ্বিধায় পড়বে। কারণ ঐ মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে বলতেই হবে। প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী বাজনীতিগত ভাবে একই কথা বললে, তাব একটা অন্য ধরনের প্রভাব পড়বেই। কিন্তু এই প্রস্তাবে বাদ সাধেন বাজ্যের বড-বড অফিসাররা দু-চারজন। তাঁরা প্রথমে বলেছিলেন—এ-বকম সময়ে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্ব ও-রকম ভৌগোলিক অবস্থানে রাজ্য সরকারের পক্ষে পালন করা সম্ভব হবে না। বা, সে দায়িত্ব নেয়া উচিত হবে না। আর, প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে উদ্বোধন করালে এই ঘটনা একটা জাতীয় গুরুত্ব পাবে। সেই গুরুত্বের কারণেই আন্দোলনকারীরা নতুন ভাবে উৎসাহিত হতে পারে। সেই সুবাদে তারা হয়ত সত্যি একটা সক্রিয় বিক্ষোভ দেখিয়ে বসতে পারে। বিশেষত, গোর্খারা। পরন্তু হাসিমারায় সেনাবাহিনীর এযারস্ট্রিপেই নামুন আর বাগডোগরা এয়ারপোর্টেই নামুন—প্রধানমন্ত্রীকে গাডিতে করে এতটা পথ জঙ্গল ও পাহাডের মধ্য দিয়ে যেতে হবে, সে-সব পাহাড় ও জঙ্গলের গাছে কোনো গোপন আততাযীর লুকিয়ে থাকা অসম্ভব নয়।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ত হ্যালিকপ্টারে চড়ে একেবারে তিস্তা ব্যাবেজেব ওপরেই নামতে পারেন!

এতখানি আলোচনার পর দু-চার জন অফিসাব তাঁদেব আসল বক্তব্য পরস্পরের আড়ালে মুখ্যমন্ত্রীকে জানান—তিস্তা ব্যারেজের মত এত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কৃতিত্বের ভাগ কেন্দ্রকে দেয়া রাজনীতিগত ভাবে ঠিক নাও হতে পারে। কারণ, প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করলে তঁ'র ওপরই 'মিডিয়া' নজর দেবে বেশি। এখন, বিশেষত নির্বাচনের যখন মাত্র কয়েক মাস বাকি, এ-রকম কিছু করা অনুচিত হবে।

নির্বাচনটা এসে যাচ্ছে বলেই, তিস্তা ব্যাবেজের উদ্বোধন, সেই উদ্বোধন নিয়ে জনসমাবেশ, 'বিচ্ছিন্নতাবাদীদের' আলাদা-আলাদা সমাবেশের মিলিত সংখ্যার চাইতেও বড় সমাবেশ করে সরকারের ও সরকারি দলগুলিব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা—এগুলো এতই জরুরি। সরকারি দলগুলি স্থির করেছে যে তিস্তা ব্যারেজ উদ্বোধন আসলে হবে নির্বাচনী অভিযানের শুরু। এই সমাবেশের শক্তিকে, তিস্তা ব্যারেজের সাফল্যকে এমন ভাবে সেদিন তুলে ধরতে হবে যে সেই ধাক্কায় সামনের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে। উত্তরবঙ্গের মোট আসন সংখ্যা যদি সরকারি দলগুলি রাখতে পারে—দুটো-একটা সিটের অদলবদলের দুর্ঘটনা সত্ত্বেও—তা হলেই যথেষ্ট। আর, যদি সেই সিটের সংখ্যা দুটো-একটাও বাড়াতে পারে, তা হলে ত কথাই নেই। সেটা একমাত্র সম্ভব যদি সরকার ও সরকারি দলের রাজনৈতিক অভিযান তীব্র করে তুলে, কংগ্রেসের সঙ্গে এই সব 'বিচ্ছিন্নতাবাদী'দের প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য কোনো আপস-সমঝাওতা অসম্ভব করে তোলা যায়। নির্বাচনী কৌশলের দিক থেকে, এই সব উটকো দলগুলির ফলে, তা হলে, বামফ্রন্ট ও তার অন্তর্গত দলগুলির উপকারই হবে। কংগ্রেস-সমর্থক ভোট যদি সরকারি কংগ্রেস প্রার্থী ও এই সব উটকো দলের প্রার্থীদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়, তা হলে, বামফ্রন্ট গতবারের চাইতেও বেশি আসন পাবে—উত্তরবঙ্গে। সুতরাং, তিস্তা ব্যারেজ উদ্বোধন উপলক্ষে বামফ্রন্ট তার দলগুলির ও তার সরকারের সমস্ত শক্তি বিনিয়োগ করেছে।

কোথায় ভুটান সীমান্তের চা-বাগানের কোল-মুন্ডা-সাঁওতাল শ্রমিক—সেই সাঁওতালপুর, কালচিনি, রাঙ্গালিবাজানা, রাজভাতখাওয়া থেকে তারা রাজবংশীদের সঙ্গে ট্রাকে-ট্রাকে মিছিল করে আসবে। একটা মস্ত বড় সুবিধে হয়েছে, চা-বাগানগুলি নিজেরাই ট্রাক দিয়েছে। অন্য দিকে জয়ন্তীর রাস্তা ও বিন্নাগুড়ি থেকে শুরু করে ঐ তল্লাটের সব উজাড় করে আনা হবে। ময়নাগুড়ি থেকে শুরু করে একদিকে লাটাগুড়ি পর্যন্ত লোকজন ত মিছিল করেই আসবে—তাদের ত ঘরের ব্যাপার। মাদারিহাট-বীরপাড়া-হাসিমারা থেকে ট্রাক আসবে ল্যাটার‍্যাল রোড ধরে। মেটেলি থেকে শুরু করে মেটেলির পেছন দিয়ে সেই মাইল-মাইল দূরের গরুবাথান রোডের চা-বাগানগুলির ভেতর থেকে নেপালি শ্রমিকদের খুব সংগঠিত ভাবে আনা হবে।

রাজবংশী বা মদেশিয়া জনসাধারণ জুটে যাবে, কিন্তু নেপালিদের সংগঠিত ভাবে নিয়ে না-এলে নিজে থেকে জুটে নাও যেতে পারে। ওদিককার পাহাড়ি চা-বাগানগুলির আয়তন ছোট—ফলে নেপালি শ্রমিক থাকলেও সংখ্যা খুব বেশি নয়। সেই জন্যে সরকার ও সরকারি দলগুলি অন্য ব্যবস্থাও নিয়েছে। কয়েক বছর আগে ফরেস্টের 'পতিত জমি' দখল করার জন্যে নেপালিরা প্রায় মিছিল করে এক-একটা ফরেস্টে ঢুকেছিল। তখন এ নিয়ে খুব হৈ-হৈও হয়েছিল। পরে, সরকার চুপ করে যায়—ভাবখানা যেন এদের জবরদখল মেনেই নিল। আসলে, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে নির্দেশ দেয়া হয়, মাস তিন-চার পর থেকে নতুন গাছ লাগানোর কর্মসূচি হিশেবে জবরদখলকারীদের তারা তুলে দেবে। সব জায়গায় একসঙ্গে নয়। বড় জবরদখল কলোনিতে আগে নয়। এমনকি পর-পরও নয়। যেন জবরদখলকারীরা মনে করে যেন গোলমালে দরকার নেই বরং একই ফরেস্টের নতুন জায়গায় বসতি করা নিরাপদ। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট দরকার হলে পুলিশের সক্রিয় সাহায্য নেবে। এই পদ্ধতিতে নতুন জবরদখল ঠেকানো গেছে, কিন্তু পুরনো জবরদখলকারীদের সব জায়গা থেকে তুলে দেয়া এখনো শেষ হয়নি। নির্বাচনের আগে এ-কাজ আর করাও হবে না। এমন জবরদখলকারীর সংখ্যা এখনো কয়েক হাজার। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের ও ফরেস্টের কনট্রাকটারদের অসংখ্য ট্রাকে এই জবরদখলকারীদের ব্যারেজে নিয়ে আসা হচ্ছে। তাদের আশা, সরকারকে সমর্থন করলে স্থায়ী বসবাসের পাট্টা মিলতে পারে।

সরকার ও সরকারি দলগুলি এই অভিযানে 'বিচ্ছিন্নতাবাদীরা' যেন কোনো বিক্ষোভ প্রদর্শনের মত সাহসও না পায়।

একশ নিরানব্বই

মাদারির মা জলুশে যায় কেন

কিন্তু যার জলুশ যেখানেই যাক, মাদারির মা জলুশে যায় কেন ? মাদারি হাট থেকে জলুশের খবর নিয়ে এসেছে বলেই ত আর মাদারির মা জলুশে যেতে পারে না ? যে-জলুশে লোক দরকার, লোক বাড়ানোর দরকার, সে-জলুশের মাতব্বরদেরও ত মাদারির মাকে মনে পড়বে না। এই এত-এত বাড়ি-টাড়ির মধ্যে মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই জোগাড় করার ক্ষমতা যার নেই, এই এত ঘন এত বড় ফরেস্টের মধ্যে কোনো এক জায়গায় কোনো ঝোরার পাশে যাকে একটা শ্যাওড়াঝোবা বানাতে হয়, তার কোনো জলুশ থাকে না। এক দিন জলুশে যাবার অর্থ ত তার কাছে একটি দিন না-খেয়ে থাকা। একটি দিন না-খেতে পাওয়া বা না-খেয়ে থাকা মাদারির মায়ের কাছে কোনো অদ্ভুত ব্যাপার নয়। এমনও নয় যে সে তার একটা পুরো দিন নষ্ট হওয়াটা মাপতে পারে হাজিরা কত নষ্ট হল তার হিশেব দিয়ে। পেটের খিদে বা শ্রমের পয়সা—এর কোনোটাই মাদারির মায়ের দিনযাপনের মাপ নয়। তাহলে তার দিন নষ্ট হল কি হল না সেটা মাপা যায় কী করে ?

এই ফরেস্টে, এই শ্যাওরাঝোরায় তাকে প্রতিদিন, প্রতিটি দিন, নিজের খাবার জোগাড়ে বেরতে হয়—যেভাবে ফরেস্টের মুরগি বেরয়, পাখি বেরয়, বড়-বড় জীবজন্তু—যেমন হাতি, গণ্ডার—এরাও, বেরয়। আর, তার নিজের খাবারের পরিমাণটা ত ঠিক করা নেই যে সেইটুকু সংগ্রহ হয়ে গেলেই তার

কাজ ফুরিয়ে যাবে। সারা দিন ফরেস্টের ভেতরে-ভেতরে তাকে ঘুরে বেড়াতে হয়—ঘুরে বেড়াতে হয় মাটিতে চোখ রেখেই। ফরেস্টের ভেতরে ত আর মাটি দেখা যায় না, শুধু বুনো লতা-পাতা আর ঘাস। কখনো সে-লতা-পাতা আর ঘাসে মানুষ ডুবে যেতে পারে, ঠেলে এগনো যায় না। কখনো আবার, ছোট-ছোট খোলা রাস্তা পাওয়া যায়। এ-সব ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বানানো রাস্তা—জীবজন্তুদের যাতায়াতের সুবিধের জন্যে, বা, ভেতরের গাছ কেটে জমা রাখার সুবিধের জন্যে। এ-রকম বেশ মাঠের মত চওড়া বড় রাস্তাও ফরেস্টের ভেতরে-ভেতরে আছে। সেই সব রাস্তা দিয়ে ট্রাক ঢোকে, হাতির পালদেরও অভ্যেস হয়ে যায় এ-রকম রাস্তা দিয়ে হাঁটা। মাঝে-মাঝে আবার মাটির ছোট-ছোট ঢিবলি লবণ দিয়ে মুড়ে দেয়া হয়। জীবজন্তুরা এসে সেগুলো চাটে।

মাদারির মায়ের তাই দুটো জিনিসের কখনো অভাব হয় না—উনুন জ্বালাবার জন্যে শুকনো, পাতলা, ছোট খড়িকাঠের, আর লবণের। কিন্তু সেই শুকনো খড়িকাঠে আগুন দেবার জন্যে তার কাছে কোনো দেশলাই থাকে না, সেই আগুনের ওপর দেবার জন্যে একটা ভাঙা পাত্র তার কাছে আছে বটে কিন্তু সেই পাত্রের ভেতর দেযার কিছু থাকে না। এত নুন পেতে পারে মাদারির মা, কিন্তু নুন নিয়ে মাখবে এমন কিছু সে রোজ পায় কোথা থেকে?

সকাল থেকে ফরেস্টের ভেতর মাটির দিকে তাকিয়ে ঘুরে বেড়ানোরও ত একটা মানচিত্র আছে। বেশি বনবাদাড়ের মধ্যে ঢুকলে খোঁজা যায় না, জঙ্গল চারদিক থেকে এমন চেপে ধরে যে জলের মধ্যে শ্বাস নেযার জন্যে যেমন নাক উঁচু করে রাখতে হয় তেমনি নাক উঁচু করে চলতে হয়। তা হলে আর মাটির দিকে তাকাবে কী করে? ঐ সব বনবাদাড়ের ভেতরই কিছু চট করে পেয়ে যাওয়ার আশা থাকে—বনমুরগির ডিম, বা বনমুরগির ডিম থেকে বেরনো অথচ দৌড়তে না-শেখা ছোট ছানাই গোটা একটা, মেটে ইঁদুরের গর্তের ভেতর হাত ঢুকিয়ে ইঁদুরের ছোট-ছোট বাচ্চাও জুটে যেতে পারে। সুতরাং বনবাদাড়ের ভেতর না ঢুকে ত মাদারির মাযের কোনো উপায় নেই। তার শরীরের অভ্যাসও কেমন এই বনবাদাড়ের সঙ্গে মানিয়ে গেছে। মুখটা একটু উঁচুতে রাখলেও সে ঠিক জঙ্গলের মাটি দেখতে পায়, দেখতে-দেখতে খুঁজতেও পারে। মাদারির মা-র চোখদুটো থুতনির নীচে থাকলে ভাল হত।

এটাই ত তার সারা দিনের কাজ। হাতে একটা শক্ত লাঠি থাকে, বেশ ভারী, শালগাছের ডাল—ভেঙে নেয়া। খুব খিদের সময় লাঠিটাকে তার ভার মনে হয়। তা ছাড়া ঐ লাঠিটাই ত অস্ত্র। লাঠিটার তলার দিকটায় একটা কোণ আছে। ঐ কোণটুকু রেখেই লাঠিটা ভাঙা হয়েছে। ফলে, লাঠির আওতায় যদি কোনো ছোট প্রাণী পড়ে যা মাদারির মার খাদ্য হতে পারে, তা হলে ঐ লাঠি নিশ্চিত তার ঘাড়ে গিযে পড়ে। কোনো-কোনো সময় চলতে-চলতেই লাঠিটাকে বর্শার মত বিঁধিয়ে দেয়—যেভাবে মাছ মারে। আর কোনো-কোনো সময় মুহূর্তে লাঠিটাকে মাথার ওপর তুলে এনে শরীরের সমস্ত জোর দিয়ে সেটাকে নামিয়ে নিয়ে আসে—কুড়ুলের মত। সেই সমস্ত সময় মাদারির মায়ের পুরো শরীরটা জেগে ওঠে। ফরেস্টের ঐ আবছায়ায়—শাল-সেগুন-খয়ের-অর্জুনের পরিপ্রেক্ষিতে মাদারির মাও যেন একটা গাছই হয়ে ওঠে এমনই তার হাত দুটো ঋজু উঠে যায় মাথার ওপরে আর খর নেমে আসে, যেন, ঝড়ে কোনো গাছ হঠাৎ প্রাণ পেয়েছে। সেই দাঁড়িয়ে ওঠায় আর নেমে আসায় মাদারির মার এই শরীর ক্ষোদিত হয়ে যায়, যে-শরীর শুধু শরীরের জোরেই বেঁচে আছে, যে-শরীর শুধু শরীরের জোরেই আটটা না-দশটা সন্তানের জন্ম দিয়েছে।

আসলে এই ফরেস্টে খুব ভাল সাপ পাওয়া যায়। সাপের মাংসে তেল খুব আর ঝলসে নিতে আগুনের তাপও লাগে কম। চার পেয়ে মুখ-উঁচু সাপ পেলে ত কথাই নেই—অমৃত। কিন্তু ছোটখাট সাপও ত নেহাত কম নেই। মাদারির মা বিষধর সাপ চেনে। তাই চোখের সামনে পিঁপড়ে না-ধরা কোনো টাটকা মরা খরগোশ বা ধেড়ে ইঁদুর পেলেও সে ছোঁয় না, এমন-কি লাঠি দিয়ে উল্টেও দেখে না। ফরেস্টে যা মরে তাকে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে দিতে হয়। মরা জীবজন্তু খেয়েই বেঁচে থাকে এমন পাখি-পোকামাকড়ও ত ফরেস্টে থাকে।

ট্রাকমোছা আর ঘোষমশাইয়ের দোকানে কাপডিশধোয়া বাবদ মাদারি ত আজকাল ভাঁজ করা টাকাও আনে, মাঝে-মাঝেই, প্রায় এক হাট বাদে-বাদে ত বটেই। মাদারির মা তাই কোনো-কোনো হাটে চাল কিনতে পারে—চা-বাগানের যে-মজুররা রেশনের চাল এনে হাটে বেচে দিয়ে হাড়িয়া খেয়ে গান গাইতে-গাইতে বাগানে ফিরে যায়, তাদের কাছ থেকে।

কিন্তু চাল কেনা যত সহজ, আগুন কেনা তত সহজ নয়। একটা আস্ত দেশলাই কেনা আর একটা আস্ত আগ্নেয়গিবি কেনা ত মাদারিব মার কাছে একই কথা। চাল সে পেতে পারে, কিন্তু আগুন সে পাবে কোথায় ?

মাদাবির মাকে তার জন্যে কত কৌশল করতে হয়।

হাটে কোনো একটা জায়গায় সে চুপচাপ ঠেস দিয়ে থাকে। সাধারণত, একটা বড় গাছের তলায় ছোটখাট দু-তিনটে দোকান বসে। তৎসত্ত্বেও সেখানে, সেই গাছের গুঁড়িতে, মাদারির মায়ের ঠেস দেবার মত জায়গা বাকি থাকে। মাদারির মা সেখানে ঠেস দিয়ে বসে। বসেই থাকে। ঠিক বসা নয়, আধশোয়া হয়ে থাকে। ফরেস্টের ভেতর রোজ সারাদিন যে মুরগির মত সাবধানী, গুঁইসাপের মত নিভৃতচারী, গোখরোর মত কালান্তক, সে কিনা এখানে, এই হাটে তিনকাল-পেরনো এক বুড়ির মত শিথিল শরীর এলিয়ে দেয়।

মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তা তৈরি হয় বা ঘুচে যায় রহস্যময় সব কারণে। মানুষের সমাজ থেকে সরতে-সরতে যে এখন ফরেস্টের ভেতর সেঁদিয়ে গেছে, সে এতক্ষণ একই গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে আছে এই সুবাদে দোকানির আত্মীয় হয়ে যায় আর দোকানি, তার দিকে না-তাকিয়েই, একটা বিড়ি বাড়িয়ে দেয়—হাতটা পেছনে ছড়িয়ে। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে নিজেরটা ধরিয়ে একটু কোমর বেঁকিয়ে মাদারির মা-রটাও ধরিয়ে দেয়। কাঠি নিবে গেলে, নিজের জ্বালানো বিড়িটাই এগিয়ে দেয়। এ-রকম বার-দুই বিড়ি খেয়ে মাদারির মা তার কাছ থেকে দেশলাইয়ের বাক্সের গায়ে বারুদের ভাঙা একটা টুকরো আর দুটো কাঠি চেয়ে নিতে পারে। এ-রকম চাওয়ার ফলে পাঁচ-সাতটা কাঠিসমেত একটা আস্ত বাক্সই কেউ-কেউ দিলে তখন দুশ্চিন্তা আসে এই কাঠিগুলো সতেজ থাকতে-থাকতে ব্যবহার করার সুযোগ পাবে ত ? কেউ তাব প্রথম বিড়িটা লাইটারে জ্বালিয়ে দিলে মাদারির মা তার ঠেস দেয়ার গাছ বদলায়। আর, নেহাত যদি দেশলাই না পায় সেদিন মাদারি ঘোষমশাইয়ের দোকান থেকে বেশ খানিকটা আগুন নিয়ে যায়।

দুশ

মাদারি কী করে আগুন নিয়ে যায়

এই আগুন নিয়ে যাওয়ার বিশেষ একটা পদ্ধতি আছে মাদারির।

কলাপাতা বা কচুপাতায় সে ছোট-ছোট কয়লার কুচি প্রথমে ছড়িয়ে দেয়। তারপর কয়লার কুচি দিয়ে গতি মত বানায়। তার ওপর গনগনে দুটো কয়লা বসিয়ে, আবার গুঁড়ো কয়লায় ঢেকে কুচো কয়লা ছড়িয়ে দেয়। দুই হাতে সেই কলাপাতার কয়েকটি টুকরো বা কচুপাতার ওপরে আগুন নিয়ে তারা মা-ছেলে হাটখোলা থেকে শ্যাওড়াঝোরার দিকে রওনা হয়।

এটা তাকে করতে হয় ঘোষমশাই দোকান ছেড়ে চলে যাবার পরে অর্থাৎ হাট ভেঙে গেলেই শুধু নয়, হাট খালি হয়ে গেল। বাহাদুর উনুনের আঁচ ফেলে দেয়। তারপর, বাহাদুরই একটু সাহায্য করে গনগনে কয়লাটা বাছতে।

কিন্তু আগুনটা এমন দুই হাতের পাঁজায় এতগুলো মাইল নিয়ে যাওয়া বেশ কষ্টকর। হাত ধরে আসে—সেটা বড় কথা নয়। আসলে বিপদ আগুনটাকে বাঁচিয়ে রাখা। বৃষ্টি-বাদল হলে ত গেল। তবু কচুপাতার ঢাকনার নীচে আগুনটাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চলে। যদি একটু বাতাস থাকে, বা এমন-কি পাশ দিয়ে একটা ট্রাক চলে যাওয়ার ফলেও যদি বাতাস লাগে, কয়লার কুচি উড়ে যায়, গায়ে পড়ে, চোখে লাগে, আগুন বেরিয়ে পড়ে। তাই তখন মাদারিকে বাতাসের দিকে পিঠ ফেরাতে হয়, বা, সামনের ট্রাকের দিকে। ট্রাক চলে গেলে আবার সোজা হওয়া যায় কিন্তু বাতাসের দিকে পিঠ ফেরালে ত সেই সারা রাস্তাটাই আগুন বাঁচাবার জন্যে পেছন ফিরে হাঁটতে হয়। তাতে সময় অনেক বেশি লাগে। এক ঘুম পাওয়া ছাড়া তাতে আব মাদারির আপত্তি কী ? তার কাছে ঘরে গিয়ে আগুনটাকে

বাঁচানোর কাজ যেমন কঠিন, রাস্তাতে আগুনটাকে বাঁচিয়ে রাখার কাজও ততটাই কঠিন। এ-রকম করে বয়ে নিয়ে যাওয়া আগুনের পরিণতি নানা-রকম হতে পারে—নিভে ছাই হয়ে যাওয়া ছাড়াও। বাতাসের কী ট্রাকের আসা-যাওয়ায় ওপরের কয়লায় তাড়াতাড়ি আগুন লেগে যেতে পারে। তাড়াতাড়ি আগুন লাগা মানেই তাড়াতাড়ি ছাই হওয়া। আর আগুন যদি একবার ভেতর থেকে এ-রকম ওপরে উঠে আসে, তা হলে জ্বলন্ত কুচি কয়লা আর গুঁড়ো কয়লা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ওড়া শুরু করে, তখন ফেলে দেয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। আর-এক বিপদ হতে পারে, ঠিক এর বিপরীত পদ্ধতিতে। আগুন তাড়াতাড়ি নীচের দিকে নেমে গেল আর নীচের গুঁড়ো কয়লা আর কুচি কয়লায় লেগে আগুন ত পাতার ওপরে চলে আসে। তখন অবিশ্যি মাদারি তার মাকে বলে, রাস্তার ধার থেকে কিছু পাতা ছিঁড়ে আনতে। নীচে পাতার পলেস্তারা আরো বাড়িয়ে দিলে হাতে আগুনের আঁচ লাগে না।

যে-ন্যাশন্যাল হাইওয়ের ওপর দিয়ে এই দেশ ভারতবর্ষের কোনো এক রাজ্য থেকে আর-এক রাজ্যে মাল নিয়ে দিনরাত ট্রাক চলে—কত নতুন-নতুন সাঁকো পেরিয়ে, কত নতুন-নতুন রাস্তা দিয়ে পথ ছোট করে-করে, কত নতুন-নতুন পদ্ধতিতে গতি বাড়িয়ে বাড়িয়ে—সেই ন্যাশনাল হাইওয়ের স্বাদেশিক বিস্তারের অতি ক্ষুদ্র বা আণবিক এক ভগ্নাংশে পূর্ব গোলার্ধের এই রাত্রির কয়েকটি মাত্র ঘণ্টা জুড়ে এক মা তার সন্তানের সঙ্গে আগুন দিয়ে পথ হাঁটে, বা এক অগ্নিবহ বালক মায়ের সঙ্গে তার অরণ্যনিবাসে ফিরে চলে। কাল ন্যাশন্যাল হাইওয়ে কালই থাকে কিন্তু চারপাশের অন্ধকারে সেই রাস্তাটা আর দেখা যায় না, কেবল পায়ের তলায় অনুভব করা যায়—জলের ভেতর দিয়ে হাঁটলে যেমন জলের ভেতরের মাটিটুকু শুধু পা দিয়ে অনুভব করতে হয়। মাটিতে এমন অন্ধকার থাকলে সাধারণত আকাশের নক্ষত্রের দীপ্তি বেড়ে যায়, এতই বেড়ে যায় যে মনে হয়, নক্ষত্রের আলো পৃথিবীর মাটি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। এক্ষেত্রে, সে-সুবিধাটাও থাকে না। কারণ ভারতবর্ষের গভীরতম এক অরণ্য দিয়ে ভারতবর্ষের জাতীয় এই পথ গেছে। ঠিক সেই পথটুকুতেই এই রাত্রিতে মা ও ছেলে হাঁটছে। দুপাশের আকাশ-ঢাকা গাছ থেকে অন্ধকার পড়ছে। সেই গাছের পাতার ঘন বুনটের ভেতর দিয়ে আকাশটাকে কোথাও-কোথাও আলোয়-আলোয় বুটিদার দেখায় বটে কিন্তু সে যেন নদীর অন্য পারের মত, যার বাস্তবতার সঙ্গে এই বাস্তবতার কোনো সম্পর্ক নেই, একেবারে কোনো সম্পর্কই নেই। বরং এই সময় আকাশের দিকে দু-একবার চোখ তুলে তাকানো বিপজ্জনক। পরে, চোখ নামালে এই অন্ধকারে আর-কিছুই দেখা যায় না। রাস্তার দুপাশ থেকে, ফরেস্টের গাছ-গাছালির ভেতর থেকে যে-অন্ধকার আড়াআড়ি উঠে আসছে সেটা বরং এদের কাছে কিছুটা পরিচিত। এই নিশ্চিদ্র কালর মধ্যে এই মাদারির হাতে শুধু কমলা রঙের একটা চাপা আগুন। এই আগুনটা যদি শ্যাওড়াঝোরা পর্যন্ত পৌঁছয় তা হলে মাদারির মায়ের আনা শুকনো খড়িকাঠ লেলিহান জ্বলে উঠবে আর ঘরের সেই একটি মাত্র পাত্রটি নি . ়াদারি ঝোরা থেকে জল নিয়ে আসবে। সেই আগুনে, ধোঁয়ায়, চাল সেদ্ধ হওয়ার এক আদিম মানবিক গন্ধ ঐ আরণ্যক রাত্রিকে হঠাৎ কোমল করে তুলবে, অন্ধকার তত আর অন্ধকার থাকবে না। সেই আগুনের শিখার পাশে ছেলের সঙ্গে মায়ের আর-এক সংলাপ শুরু হতে পারে। কিন্তু সেই আর-এক সংলাপের কাছে পৌঁছনোর জন্যে এই রাস্তার কয়েক মাইল তাদের দুজনের সহযাত্রিক নীরবতা এই রকম নানা কথা দিয়ে-দিয়েই খচিত হতে থাকে, নইলে, তাদের নীরবতাও ত প্রাকৃতিক হয়ে যেত।

'মাই গে'

'হয়'

...

'হে-এ মাদারি'

'হয়'

...

'মাই গে'

'হয়'

'মুই ভুলি গেইছু রে—'

'কী ভুলিছিস ?'

'লড্ডু আর নিমকি—'

'কায় দিছে তোক ?'

'ঘোষমশাই কইছিল দোকান বন্ধ করিবার আগত একখান লাড্ডু আর একখান নিমকি নিবার তানে। কইছিল। মুই নিবার ভুলি গেইছু।'

'কেনে ? ভুলি গেইছিস কেনে ?'

'তোর এই আগুনটার তানে—'

'আগুনটার তানে লাড্ডু খোয়ার কাথা ভুলি গেছিস ? লাড্ডু ত মিঠা লাগে।'

'হয়। খুব মিঠা। তক খোয়াম মুই সামনের হাটবার।'

'সব হাটবারত তক লাড্ডু দেয়, খোয়ার তানে ?'

'না দেয়, শুধু একখান হাটত দেয়। তোক খোয়াব সামনের হাটবার।'

মাদারির মা তার জিভের স্বাদের স্মৃতিতে 'মিষ্টি' কাকে বলে তার এক সন্ধান চালায়।

'মাই গে'

'হয়'

'বাহাদুরদাখান কইছে মোক চা বানিবার শিখাবে।'

'কী হবে তার বাদে ?'

'মোক চাকরি দিবে, চায়ের দোকানত—'

'ত শিখায় না কেনে ?'

'টেবিলখান এ্যালায়ও মোর মাথার উপরত।'

মাদারির মা সেই অন্ধকারে ছেলের দৈর্ঘ্যের মাপ যেন প্রথম পায়। টেবিলের উচ্চতা পর্যন্ত গেলে মাদারি এখানে থাকবে না। মাদারির দাদারা, মাদারির মায়ের আরো আট-না দশ সন্তান কেউ থাকেনি। থাকে না। তা হলে মাদারির মা জলুশে যাবে কেন ?'

দুশ এক

মাদারির মা কতবার মা

মাদারির মা এখন মাদারির মা, বড় জোর আট-দশ বছর, তার আগে সে আরো অনেকবার আরো অনেকের মা হয়েছে। কতবার কত মাদারির মা, তা এখন হিশেব কষে বের করতে পারবে না। এখানে, এই শ্যাওড়াঝোরায় মাদারির মা কত বছর আছে সে হিশেবও তার জানা নেই। কিন্তু মাদারির জন্মের আগে থেকে মাদারির মাকে চেনে এমন লোকজন মাদারিহাটে এখনো অনেকেই আছে। চেনে, মানে, মুখটা চেনা—এই পর্যন্তই। তাই চাইতে গভীর ভাবে আর মাদারির মাকে কেউ-বা চিনবে। যাদের তার মুখটা মনে আছে, তারাও এই হিশেব দিতে পারবে না, কতদিন থেকে চেনা। মাদারির মার মুখ এমন নয় যার সঙ্গে চেনা-পরিচয়ের ইতিহাস মনে থেকে যায়, দরকার হলে মনে পড়াবার জন্যে মনে থেকে যায়। দেখলে চেনা লাগে—বড় জোর এই পর্যন্ত। তারাও এখন মনে করতে পারবে না, মাদারির মা, মাদারি হওয়ার আগে আর-কার-কার মা ছিল। অথবা, তাদের পক্ষে মনে করা সম্ভবই নয়। কারণ, তারা জানবে কী করে যে মাদারির মার সঙ্গে যে-মাদারি এখন ঘোরাফেরা করে, বা, একা-একা হাটে আসে, সে, সেই ছেলেটিই নয়, যে, মাদারির জন্মের আগে তার মার সঙ্গে চলাফেরা করত ? তা হলে ত শুধু মাদারির মাকে চিনলেই হয় না, তার ছেলেপুলে ইত্যাদিও সবাইকেই জানতে হয়। তেমন জানা কি সম্ভব ?

কিন্তু মাদারির মা-র ত সব সময়ই একটা না-একটা ছেলে দরকার। একটা প্রমাণ সাইজের পুরুষমানুষ তার সব সময় দরকার কী না সেটা কখনোই তার মনে আসেনি। কিন্তু একটা ছেলে তার নেহাতই প্রয়োজন। আর, মায়ের ওপরই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল এমন ছেলে ছাড়া কে তার সঙ্গে থাকবে ?

মাদারির মায়ের একটা মাপ আছে। সে জানে ঐ মোটামুটি যখন চায়ের দোকানের টেবিলের সমান মাথা হয়, বা নিজে থেকেই ট্রাকের চাকার ওপর ভর দিয়ে ট্রাকের পেছনে উঠতে পারে, বা, যা পয়সা

পায় তার সবটা মাকে আর দেয় না তার কিছুদিনের মধ্যেই সে-ছেলে এই শ্যাওড়াঝোরা ছেড়ে চলে যায়। কোথায় যায় তা খুব ঠিক করে মাদারির মা জানে না। কিন্তু আন্দাজে জানে যে তারা মাদারিহাট থেকে বীরপাড়া বা হাসিমারায় যায়। সেখানে বাসট্রাকের ডিপো বা অন্য কোনো কাজ একটু-আধটু শিখতেও পারে। মিলিটারির বিরাট ছাউনি আছে এ-সব জায়গায়। সেখানে চোরাই মালের আড়তে এমন অনেক ছেলেরই নাকি কোনো-না-কোনো কাজ জুটে যায়। সেখান থেকে সেই ছেলেরা একই পদ্ধতিতে শিলিগুড়ি পৌঁছয়। সেখানে আবো বড় চোরাই চালানের আড়ত হয়ত আছে। আরো বড়-বড় ট্রাকে আরো বেশি-বেশি মাল হয়ত আসে : তা ছাড়াও আছে রেলের ইয়ার্ড, ওয়াগন—এই সব। সেখানে ছেলেগুলো হয়ত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যায়। কেউ-কেউ নাকি, এমন-কি, নেপালে চলে যায়, সেখান থেকে অনেক নতুন মাল এনে অনেক-অনেক টাকায় বেচে। সে-সব মাল ভদ্রলোকরাও কেনে। তার কিছু-কিছু জিনিশ, এই যেমন গায়ে দেয়ার জামা, ছাতা এই সব, মাদারিহাটেও ওঠে।

মাদারির আগে তার কটা ছেলে এ-বকম মাথায় একটু টান দিতেই, বা, ট্রাকে একা-একা চড়তে পেরেই চলে গেছে, তা তাব মনে নেই। তবে, তেমন চলে যাওয়ার আগে ছেলেগুলো রোজ ফেরা ছেড়ে দেয়। প্রথমে ছাড়ে খাবার খুঁজে বেড়ানো। তারপর, হাটখোলাতেই সাবা দিন-বাত থাকতে শুরু করে দেয। অনেক দিন না ফিবলে মাদারির মা বুঝে নেয, চলে গেছে।

কিন্তু তার ত ছেলে ছাড়া চলবে না। তাই এক ছেলে লম্বা হওয়া শুরু কবতেই সে আর-এক ছেলে আনে, যাতে, আগেব ছেলে খাবার খুঁজে বেড়ানো বা ঝোরায় আচমকা দাঁড়ানো ট্রাকের কাছে হাত পেতে দাঁড়ানো বন্ধ কবার সঙ্গে—ঙ্গেই পবের ছেলে একটা বয়সে পৌঁছে যেতে পারে।

এত হিশেব-নিকেশ করে ছেলে পেটে ধবতে হেলে ছেলের একটা বাপ ত মাদারির মার হাতের কাছে সব সময় বহাল থাকা দরকার।

প্রথম দিকে তার কোনো অসুবিধে হয়নি। আর, তখন সে ত এই শ্যাওড়াঝোরা পর্যন্ত পৌঁছয়ও নি। প্রথম ছেলেটাব কথা তাব সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন মনে আছে, কারণ, তখনো তার জানা হয়ন যে ছেলেও চলে যায়, ছেলেব বাপও চলে যায়। এক নেপালি আধবুড়োর একটা মুদিখানা দোকান ছিল হাটের ঠিক উল্টো দিকে। তার কোনো বউবাচ্চা ছিল না। সেই দোকানের লম্বা বারান্দায় তখন মাদারির মা পৌঁছে গেছে। নিজে থেকেই বারান্দা-টারান্দা ঝাড় দিত। দোকানি তাকে দোকানেব ভেতরটাও একদিন ঝাড় দিতে বলল। আরো একদিন একটা সাবান দিয়ে বলল, ভেতরেব কুয়োপাড়ে গিয়ে ভাল করে স্নান করতে। তার পরেও তাকে সাবান মাখতে হয়েছে বটে, কিন্তু, সে-সব সেই দিনের সাবান মাখাটার মত রোমাঞ্চকব ঠেকেনি। স্নানেব পব সে শাড়িজামাও পেয়েছিল। সেই রাত থেকেই দোকানি তাকে নিয়ে প্রথম রাতে বিছানায় শুত। পবে, তাকে দোকানির বিছানা ছেড়ে নিজের বিছান[illegible]লে আসতে হত। অত ছোট বিছানায দোকানিব ঘুম আসত না—আর-এক জনের সঙ্গে শুলে। কিন্তু তার প্রথম বাচ্চা হওয়াব পর দোকানি নিজেই একটা বড় চৌকি এনে জোড়া লাগিয়ে নেয়। বাচ্চা নিয়ে দোকানির সঙ্গে তখন সে অনেকগুলি দিন ও কিছু বছর কাটল। দোকানিটাও ছেলেটাকে এত ভালবাসত যে দোকানে গদির ওপর বসিয়ে রাখত। মাদারিব মার সময়ের বোধের সঙ্গে ত আর দিন-মাস-বছরের হিশেব মেলে না। কত দিন পর কে জানে দোকানি দোকানটোকান বেচে, একটা বাক্স নিয়ে বলল, চললাম রে। ছেলেটাকে একটু আদর করে গিয়ে বাসে উঠল। আর-সব লোকজন গিয়ে তাকে হেসে-হেসে বিদায় জানাল। মাদারির মা বুঝেছিল—বাস পর্যন্ত তার যাওয়া চলে না।

কিন্তু সে এটা বোঝেনি, দোকানের সঙ্গে তার ব্যবস্থাও নতুন মালিকের হাতে গেল কি না। বুঝতে অবিশ্যি বেশিক্ষণ লাগেনি। নতুন মালিকের লোক এসে সে-রাত্রিতেই দোকানে তালা লাগিয়ে তাকে বলে গেল, আজ রাত্রিটা থাকো, কাল সকালে জিনিশপত্র-বাচ্চা নিয়ে চলে যেও।

অতদিন বাড়ির খেয়ে, বাড়িতে থেকে, তার চেহারা ভাল হয়ে গিয়েছিল। নতুন মালিকের যে-লোকজন তাকে আগের রাত্রিতে বলে গিয়েছিল সকালে চলে যেতে, তাদেরই একজন, সহরাই উরাঁও, পরদিন কাক না-ডাকতে তাকে এসে বলে— চল্, আমার সঙ্গে বাচ্চা নিয়ে থাকবি।

লোকটার ঘর গিয়ে ওঠার দুদিন পর সে বুঝতে পারে লোকটি স-মিলে কাজ করে, স-মিলের মালিকই দোকানটার নতুন মালিক হয়েছে। লোকটি আগে কাজ করত চা-বাগানে। সেখান থেকে ছাঁটাই হয়ে স-মিলে এসেছে। লোকটার ঘর ছিল শাল-বাকলা দিয়ে তৈরি। শীতকালে হাওয়া দিত।

আর-একটা বাচ্চা হওয়াব পর লোকটা কাঠের ছোট-ছোট টুকরো দিয়ে ফাঁকগুলো বন্ধ করে দিয়েছিল।

সহরাই আগে চলে গেল, নাকি, তার প্রথম ছেলেটি—সে আর তার মনে পড়ে না।

সেই ঘরটাতে কিন্তু সে অনেক দিন থেকে গিয়েছিল। স-মিলের মালিক তাকে উঠে যেতে বলেনি। অনেক বৃষ্টিতে, রোদে, শীতে সেই কাঠগুলো পচে যেতে লাগল ; যে-পাতলা কাঠগুলো ঘরের চাল হিশেবে ছিল তার কিছু পচে খসে গেল, কিছু উড়ে গেল ; ঘরের পাটাতন নিজে থেকেই একে-একে খুলে গেল। এই সব হতে-হতে ত কয়েক বছরই যায়। এই ঘরটায় শেষ পর্যন্ত যতদিন সে থাকতে পেরেছে তাতে এক রাজবংশী বুড়ো জোতদার সপ্তাহে একদিন সন্ধ্যাবেলায় আসত, এক চা-বাগানের বাঙালিবাবুও কয়েক দিন এসেছিল, এক মিলিটারি এসেছিল এক দিন, আর তার বাচ্চারা তখন নিয়মিতই হয়ে যাচ্ছে আর চলে যাচ্ছে। ততদিনে সে-ঘর কবে যে ভেঙে গেছে।

দুশ দুই

মাদারির মা-র ও মাদারির ঘুম ভাঙে

মাদারির মার ঘরে মাদারির আর তার মার ঘম ভাঙে সাত-সকালে মুরগির ডাকে আর ময়ূরের ডাকে। ঠিক শ্যাওড়া গাছটা বরাবর ঝোরার ওপর দিকে একটা শুকনো খটখটে গাছে ময়ূরটা রাত কাটায় আর সকালবেলা ওদের ঘুম ভাঙিয়ে চলে যায়। গরমের সময় কোনো-কোনো সন্ধ্যায় দেখা যায় ময়ূরটা সন্ধ্যা হওয়ার একটু আগে ঐ মরা গাছটাতে এসে বসে আছে। মরা গাছটারও অনেক দিন আগেই মরাব কথা, কিন্তু, ময়ূরটার জন্যেই যেন মরে না, বছরের পর বছর বেঁচেই থাকে।

আর বনমোরগ-বনমুরগি ত প্রায় তাদের ঘরের মধ্যেই এসে ডাক দিয়ে যায়।

শীতকালে কষ্ট হয়। ঐ পাতার ঘরের ভেতর কাঠকুটো দিয়ে আগুন জ্বালানো যদি সম্ভব হয়, সম্ভব কবতেই হয়, তা হলেও সেল-আগুন শেষ রাতে নিবে আসে। সূর্যের আলো এই ফরেস্টের মধ্যে সোজাসুজি কোথাও ত ছড়িয়ে পড়ে না। কিন্তু কোনো একটা ফাঁক-ফোকর দিয়ে রাস্তার উল্টোদিকের ঢালটাতে রোদ আসে। সে-রোদ না-আসা পর্যন্ত তারা ঐ পাতার ঘর ছেড়েও বেরতে পারে না, পাথরের মত যেখানে পড়ে থাকার সেখানেই পড়ে থাকে।

এখন বর্ষা শেষ হয়ে গেছে প্রায়, শীত আসেনি। আকাশ শাদা হয়েই আসছে কিন্তু আচমকা বৃষ্টিপাত ঘটে যাচ্ছে যখন-তখন। দুপুরবেলায় ফরেস্টের ভেতর থেকে পচা জলের বাতাসে দম বন্ধ হয়ে আসে। এই সময় শরীর খুব গরম হয়ে যায়। আর, সকালে, সমস্ত গাছপালা যেন বৃষ্টিভেজা হয়ে থাকে, হিমে। সেই হিমেল সকালে মাদারি জেগে ওঠে, 'হে মা, চল্ যাবি কেনে জলুশে।'

মাদারি এখনো জানে, মা গেলেই তার যাওয়া হবে। মাদারির মা একবার ভাবে, বলে দেয়, তুই যা কেনে, মুই না যাও। কিন্তু, তা হলে ত মাদারি তার মায়ের কাছ থেকেই প্রথম জেনে যাবে যে এখন মা ছাড়া জলুশে, এত বড় জলুশে যেতে পারে। যতদিন মাদারি সেটা নিজের থেকে না বোঝে ততদিন মাদারির মা তাকে বোঝাতে চায় না, এখন। এইবার বোধহয় তার হিশেবের গোলমাল হল। আর একটা ছেলে পেটে না-আসতেই, এই ছেলেটা চলে যাবার মত লম্বা হয়ে গেল। কিন্তু পেট ত তার আছে, সে এখন এই শ্যাওড়াঝোরায় ছেলে পেটে আনার জন্যে ছেলের বাপ পায় কোথায় ? গাছ থেকে, বনমোরগ থেকে, ময়ূর থেকে ত আর মানুষের পেটে বাচ্চা হয় না। কিন্তু, এমন ত হতেও পারে যে তার আর বাচ্চার দরকার হল না। মাদারিকে বাহাদুর চা বানানো শিখিয়ে দিলে ঘোষমশাইয়ের দোকানে সে একটা চাকরি পেয়ে গেল—চা বানানোর চাকরি। বা, ট্রাক মোছামুছিটা তার আরো খানিকটা বাড়ল, এই হাটেই।

এতগুলো কথা এতটা পরপর সাজিয়ে যে সে ভেবে উঠতে পারে তা নয়, কিন্তু, এমন ভাবনা তার মাথা বা মনের চারপাশে জমা হয়েই থাকে।

তাই মাদারি ডাক দিতেই সে সাড়া দেয়, 'যাবু নাকি তুই, সত্যিই ?'

মাদারি শুয়ে-শুয়েই তার মাকে ডেকেছিল। মার এই জিজ্ঞাসাতে ধড়ফড় করে উঠে বসে, 'কহিছিস কী মাই গে ? কালি হাটত কতবার মারামারি আর কতখান ঢোলাই। তিনচাবি ট্রাক যাবার ধরিবে। এ্যালায় নাকি সগায় যাবার ধরিবে, মারামাবি হবে—'

মাদারির মাও উঠে বসে, একটু হেসে বলে, 'তুই কি মাবামাবি করবু না মাব খাবু ?'

'কায় মারে ? মোক ? ঘোষমশাইঅক ছাড়ি দাও, কায়ও মারিবার পারিবেন না, চল্ চল্, ট্রাক চলি যাবে।' মাদারি ঘরের ভেতর দাঁড়ায় আব মাদারির মা সেই আবছায়ায় দেখে স্বস্তি পায মাদারি দাঁড়ালে এখনো এই ঘরে এঁটে যায়। মাদারির মা শুয়ে থাকে আব মাদারি বাইবে গিয়ে পেচ্ছাপ করে। করতে-করতেই চিৎকার করে—'মা গে'

'অয়'

'কুয়া (কুয়াশা) দিছে, ঘন কুয়া।'

'ত চলি আয় ভিতরত—'

'এই কুয়ার ভিতরত ট্রাক আসিবা পাবিবে ?' মাদারি দুই হাত বুকেব ওপব আডাআডি বেখে বাঁ হাতে ডান কাঁধ ধরে, ডান হাতে বাঁ কাঁধ ধবে একটু কেঁপে নেয়। মাদারির মা মনে-মনে ততক্ষণে জলুশে যাবার জন্যেই তৈরি হয়ে গেছে। কিন্তু, সে এটা বুঝতে পারে—তাদের আগে-আগেই বওনা হতে হলেও—এতগুলো মাইল হেঁটে ত তাদের হাটখোলায পৌঁছতে হবে—এত আগে নিশ্চয়ই নয়। সেও জলুশে যাবে—এটাতে তারও মনে একটু ফুর্তি আসছে বটে, কোথাও যাওযার ফুর্তি। কিন্তু, সেই যাওয়ার প্রস্তুতির জন্যে সে এখনি ব্যস্ত হতে বাজি নয়। নিজেকে ব্যস্ত করে তোলার পক্ষে এখনো কিছু সময় তার হাতে আছে।

'মাদারি, এইঠে শুই থাক্ কেনে, এ্যালায় দেরি আছে।'

'মুই চলি যাও, তুই আয় কেনে পাছত', পেছন ফিরে ঘরের প্রবেশপথের দিকে তাকিয়ে, আবো একবার কেঁপে উঠে মাদাবি বলে।

'তয় মুই না যাও', মাদাবির মা বলে।

মাদারি তাব মায়ের কাছে চলে এসে বলে, 'আচ্ছা, আচ্ছা, মুই এইঠে আসিছু, যাবি ত মাই ?'

মাদারির মা কোনো জবাব দেয় না।

'মাই গে-এ'

'অয়'

'কখন যাবু— ?'

'খাড়া কেনে, এ্যালায় ত বাতি পোহায় নাই। তোব জলুশ কি আন্ধারত হবে ?'

'না। বাতি পোহাইছে। কুঁয়া। চারিপুহে কুঁয়া।'

'কনেক আলো ধরুক। না-হয় ত ঐঠে হাট বসি থাকা নাগিবে।'

'কালি মুই শুনি আসিছু এইঠে ট্রাকগিলা আগত ছাড়ি দিবে, অনেক-অনেক দূর যারা নাগিবে ত ! এইঠে দেরি বা ধরিলে আর পৌঁছিবে কখন ?'

'কোটত যাবা নাগিবে ? তুই চিনিস ?'

'মুই ক্যানং করি চিনিম ? স্যাই তিস্তা নদীর মুখত, বান্ধ বান্ধিবার তানে সব মন্ত্রী মানষিলা আসিবে। তা এইঠে তাড়াতাড়ি রওনা না ধরিলে পৌঁছিম ক্যানং করি।'

'পৌঁছিবে, পৌঁছিবে, ট্রাকগাড়ি কত জোরত যায় দেখিস না ?'

'হয়। ট্রাকগাড়ি জোরত- যায়। দেখিছু।'

মাদারি চুপ করে যায়। ট্রাক গাড়ির সঙ্গে মায়ের চাইতে তার সম্পর্কই ত বেশি। সে এখন চুপ করে সেই ট্রাকগাড়ির গতি কল্পনা করে। তার এই ঘর থেকে, তার ঘরের সামনের রাস্তা থেকে, হাটের সামনে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সে ত এই ট্রাকগাড়ি কত জোরে ছোটে তা দেখে। পাশ দিয়ে চলে গেলে, গায়ে বাতাসের একটা ঝাপটা লাগে। অনেক সময় ঘাড় ঘুরিয়ে ঝাপট সামলাতে হয়। মাদারি তার মায়ের পাশে, রাশি-রাশি শুকনো পাতার ওপর ফেলে দেয়া চটের ওপর, যেন ট্রাকের ঝাপটা সামলাতে ঘাড় ঘোরায়। ঘোরাতেই সে পাতার নরম শয্যায় ডুবে যায়। এইটি এ-ঘরের গোপন এক বিলাসিতা। শুকনো পাতা এনে গদি বানানো। পাতাগুলো যখন ভেঙে যায় তখন কিছুটা ফেলে দিয়ে আবার নতুন

শুকনো পাতা ছড়িয়ে দেয়া হয়। তাহলে মাটি থেকে শীতের ঠাণ্ডা ওঠে না। বর্ষার জলও মাটি থেকে ভেজায় না।

পাশ ফিরে মাদারি বোধহয় তার ট্রাকের কথা ভাবতে-ভাবতেই একটু ঝিমিয়ে পড়ে। কিন্তু তার মার যেন আরো কিছু জানার ছিল। সে একবার ডাকে, আস্তে, 'হে মাদারি।' কিন্তু মাদারি জবাব না দেয়ায় চুপ করে যায়। চুপ করে বাইরের আওয়াজ শোনে। জোর বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পর জঙ্গলের ভেতর থেকে টুপটাপ আওয়াজটা অনেকক্ষণ ধরে শোনা যায়। যে এই আওয়াজ জানে না, তার মনে হতে পারে বৃষ্টিরই আর-এক ছন্দ। সেই আওয়াজের নানা আযতন আছে—কত ওপর থেকে কোন গাছ বা পাতার ওপর পড়ছে তার ওপর সেই আয়তন নির্ভর করে। মাদারির মা শোনে—জঙ্গলের ভেতর থেকে সেই টুপটাপ আওয়াজ উঠছে, ছড়িয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে আসছে। হিম পড়ছে। সে আবো দুটো-একটা আওয়াজের অপেক্ষা করে—রওনা হওয়ার জন্যে।

দুশ তিন

মাদারি প্রথম চা বানায়

কিন্তু এত করেও মাদারি আর মাদারিব মা এতগুলো মাইল হেঁটে যখন হাটখোলায় পৌঁছয় তখন হাটখোলাতে একটা বড় ট্রাক শিশিরে ভিজে দাঁড়িয়ে আছে বটে, আর-কোনো জনমনিষ্যি নেই। এতটা খালি দেখে মাদারি দূর থেকেই বলে ওঠে, 'হেই মাই গে, জলুশ চলি গেইসে—।'

মাদাবির মা বলে, 'একখান মানষিও নাই আব তোর জলুশ চলি গেইল্, ক্যানং তোব জলুশখান ? ঐ ত ঐঠে একখানা ট্রাক কুঁয়াত ভিজি খাড়া হয়্যা আছে।'

মাদারি তার মাকে ধমকে ওঠে, 'তুই চুপ্ কর্, ঐখান ত এইঠেই থাকে, সিঙ্গিবাবুব ট্রাক, কাঠ নিগায়।'

মাদারির মা বলে, 'চল, কনেক বসি, দেখিবু, মানষি আসিবাব ধরিবে। তোক বাববার কহিছু এ্যালায়ও টাইম হয় নাই, টাইম হয নাই।'

এ-রকম কথা বলতে-বলতে ওরা হাটখোলায় ঢোকে। ঢুকতেই দেখে ঘোষমশাইযেব দোকানের ঝাঁপটা আধখোলা। মাদারি দৌড়ে উল্টো দিকে গিয়ে দেখে বাহাদুর টিউবওয়েলেব সামনে উবু হযে বসে আঙুল দিযে দাঁত ঘষছে।

'হেই গে বাহাদুর দাদা, জলুশ কখন যাবা ধরিবে ?'

মুখের ভেতর থেকে আঙুল বের করে বাহাদুর মাদারিকে চোখের ইশারায় টিউবওয়েল টিপতে বলে। এই টিউবওয়েলের হ্যাণ্ডেলটা শক্ত, ওপরেই থাকে, একবার নামালে ধাক্কা মেরে উঠে আসতে চায়। বাহাদুরের ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র মাদারি দৌড়ে এসে হ্যাণ্ডেলটা ধরে। হ্যাণ্ডেলটা একটু লম্বা ও একটু উঁচু। লোকের হাত যে-জায়গাটায় পড়ে, সেটুকু বাদে বাকিটুকুর রং কালচে—ব্যবহারের উজ্জ্বলতাসহ কালচে। লোকের হাত যতটা জায়গাকে ইস্পাতের মত রুপালি করে রেখেছে, মাদারির হাত, তার একটা খুব ছোট অংশেরই ওপর পড়ে।

মাদারি হ্যাণ্ডেলটাকে তার মাথার ওপর থেকে নামানোর জন্যে একটা হ্যাঁচকা টান দেয়। কিন্তু প্রথম টানে হ্যাণ্ডেলটা নামে না। তখন মাদারি আর-একটা টান দিতেই হ্যাণ্ডেলটা কিছুটা নেমে আসে আব মাদারি তার পেট দিয়ে হ্যাণ্ডেলটার ওপর ঝুলে পড়ে, তার বাঁ পায়ের আঙুলগুলো মাটিতে ছোঁয়ানো থাকে, ডান পাটা শূন্যে উঠে যায়, তার প্যান্টটাও কোমর থেকে নেমে যায়, হ্যাণ্ডেলটা নেমে আসে আর টিউবওয়েলের বড় মুখ দিয়ে হড়হড় করে জল পড়ে। এই টিউবওয়েলটার এটাই মজা। হ্যাণ্ডেল একবার চালাতে পারলেই প্রায় এক বালতি জল হয়ে যায়। বাহাদুর জলের কাছে এগিয়ে যায়, তারপর দু-আঁজলা মিলিয়ে জল নিয়ে সারা মুখে ছড়ায়, মুখের ভেতরে টানে, জোরে-জোরে কুলকুচি করে, হ্যাক থুঃ বলে জোরে-জোরে গলা ঝাড়ে আর মাদারির হাতের হ্যাণ্ডেলটা খটাস করে ওপরে উঠে যায়।

মাদারি আবাব দুই হাতেব এক হ্যাঁচকা টানে হ্যান্ডেলটাকে নামায়, এবার এক টানেই হ্যান্ডেলটা নেমে আসে, আবার পেটের ভর দিয়ে হ্যান্ডেলটার ওপর ঝোলে আর শরীরেব ভর দিয়ে হ্যান্ডেলটাকে নামিয়ে এনে নামিয়ে রাখে। হড়হড় কবে জল পড়তে শুরু করলে বাহাদুর মুখধোয়া শেষ করে হাতেরও কিছুটা ধুয়ে ফেলে উঠে দাঁড়ায়, কলপাড় থেকে সরে আসে। মাদাবি হ্যান্ডেলটা ছেড়ে দিলে একটা আওয়াজ কবে সেটা ওপরে উঠে যায়। আনাড়ি লোক এই কল চালাতে গিয়ে থুতনিতে, বা কপালে, হ্যান্ডেলের ধাক্কা খায়।

মাদাবির মা ততক্ষণে পায়ে-পায়ে বাস্তার ওপরেই এদিকে সবে এসে দাঁড়িয়েছে— যেখান থেকে এই কলতলাটা সোজা দেখা যায়। মাদারির মা এদিকে তাকিয়ে ছিল না—সে তার বাঁ দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে ছিল। ঐ দিক থেকেই তাবা এসেছে। ঐ বাস্তাটাই তার বেশি চেনা।

বাহাদুব দোকান ঘবেব ভেতব ঢুকে যায়, পেছন-পেছন মাদারি। আর, মাদারির মা রাস্তা ধরে আবাব খানিকটা আনমনা হেঁটে আড়ালে সরে যায়। মাদারি বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করে, 'হে-এ বাহাদুরদা, জলুশ কখন যাবে?'

বাহাদুব একটা ছোট তোয়ালে দিয়ে হাত মুছতে-মুছতে বলে, 'যাবে, যাবে তর জলুশখান কি পাখা মেলি উড়ি যাবে? মানষিলা উঠিবে, চা-পানি খাবে, খোযাদোযা করিবে, স্নান কবিবে, চুলখানা বান্ধিবে এ্যানং-এ্যানং কবি, তাবপব ত জলুশ ধবিবাব তানে হাটত আসিবে। নাকি তোব নাখান ঘুম থিকা উঠি দৌড় ধবিবে, এ্যা?' এই সব বলতে-বলতে বেড়ায় গোঁজা একটা ছোট আযনাব সামনে বাহাদুর অনেকক্ষণ ধবে চুল আঁচড়ায়, চিরুনিটাতে বুড়ো আঙুল চালিয়ে একটা আওয়াজ তোলে, তারপর চিরুনিটা তাব ছোট হাফপ্যান্টেব পেছনেব পকেটে গুঁজে দেয়।

'হে-এ মাদাবি, ঐঠে দেখ, চুল্লিব উপব, গবম জল ফুটিবাব ধবিছে, চা বানিবাব ধর, তিন কাপ, তর মাযেব তানে একখান--' বলে দোকানেব আব-এক জায়গায় গোঁজা একটা পোঁটলা নামিয়ে বাহাদুর একটা রঙচঙে কাপড় বের করে। সেটা ফাঁক করে গলায় ঢুকিযে দেয এমন কায়দায় যে তাব চুলে স্পর্শ লাগে না। তাবপব হাত ঢোকায়। কোমব পর্যন্ত নামিয়ে নেয়ার পর বোঝা যায় এটা একটা খুব বঙচঙে ছবি আঁকা গোল গলাব গেঞ্জি।

আবাব সেই আযনাটাব সামনে এসে মাথাটা নিচু কবে বাহাদুর নিজেকে একটু দেখে।

'জল ত ফুটি গেইছে, হে-এ বাহাদুরদা'—মাদারি নিবস্ত আঁচেব যে-চুল্লিতে বাতভর জল ফুটছে তার পাশ থেকে জিজ্ঞাসা কবে।

'টেবিলেব উপব দেখ, কেনে মখগান আছে, ঐঠে জল ঢাল আধাআধি', বলে বাহাদুর দোকানের আব-এক কোনায় গিয়ে ওপরেব বাতায গোঁজা একটা ফুলপ্যান্ট নামায, তাবপর সেখানে দাঁড়িয়েই ফুলপ্যান্টটা পবতে থাকে। প্রথমে টেনে তোলে কোমর পর্যন্ত, তারপর ফুলপ্যান্টটাকে শরীরের সঙ্গে মিলিয়ে নেবাব জন্যে কোমবটা একবাব ডাইনে বেঁকায, একবার বাঁয়ে বেঁকায়, একবার সামনে এগিয়ে আনে। চিরুনিটা হাফপ্যান্টেব পকেট থেকে বেব করে হাতে রাখে। তারপর সে কোমরে বোতামটা আটকে চেনটা টানতে পারে ও চিরুনিটা পেছনের পকেটে গুঁজতে পারে। সেই সময় মাদারি তার পায়েব আঙুলেব ওপব ভব দিয়ে টেবিল থেকে মগটা আনে। সেই হাঁড়ি থেকে আধ মগ জল সে তুলতে পারে একটা এলুমিনিযামেব গ্লাশের সাহায্যে। দুই গ্লাশ ঢালতেই তাব মনে হল আধাআধি হয়ে গেছে। সেই মগটাব সামনে থেকে ঘাড় ঘুবিয়ে দোকানেব ভেতর দিকে তাকিয়ে সে বলে, 'হে-এ বাহাদুরদা, এ্যালায় কী করবু?'

বাহাদুব তখন তার কোমবে একটা চকচকে চওড়া বেল্ট লাগাচ্ছিল। সেই বেল্টটা টাইট দিতে-দিতে সে বলে, 'খাড়া, আইচ্চু।' তারপব বেল্টটা আঁটতে-আঁটতেই চুল্লির দিকে এগিয়ে আসে। তাকে দেখে মাদারি চিৎকার করে, 'হে এ বাহাদুর দাদা, তোমাক ত মিলিটারির নাখান দেখাছে।'

বাহাদুর একটা কৌটো তুলে এনে একটু নিচু হয়ে মগটার মধ্যে তিন-চার চামচ চিনি ফেলে দেয়, তারপর একটা কড়াই থেকে একটা ছোট হাতভর্তি দুধ তুলে মাদারির পাশ দিয়ে মগটাতে ঢালে। হাতটা কড়াইয়ের ভেতর রেখে দিয়ে বাহাদুর একটা চায়ে ভেজা মরচে রঙের ন্যাকড়ার ভেতরে একটা কৌটো থেকে খানিকটা ডাস্ট চা ঢেলে পোঁটলা করে মাদারির হাতে দেয়—'এটা নিয়া নাড়া কেনে। চায়ের রঙ যেইলা ধরিবে স্যালায় তুলি ফেলি চামচ নাড়াবি।'

'চামচা কোটত ?'

'টেবিলের উপর', বলে বাহাদুর আবার দোকানের ভেতর দিকে চলে যায়। মাদারি চায়ের পোঁটলা হাতে আবার টেবিলের কাছে যায়, আঙুলে ভর দিয়ে এলুমিনিয়ামের একটা চামচ নিয়ে আসে। তার কাছে চামচটা খুবই জরুরি। মগে ঐ চামচের আওয়াজ তুলেই বাহাদুর তার কাছে এমন মাহাত্ম্য পেয়েছে। আজ জলুশের সুযোগে এই প্রথম সে চামচ নাড়ার অধিকার পেল।

চায়ের পোঁটলা সেই দুধ-চিনি ভেজানো গরম জলে মেশানো হল কি হল না, মাদারি চামচের আওয়াজ তোলা শুরু করে। বাহাদুর যে-বকম দ্রুত ও উচ্চ শব্দ তোলে, সে-রকম। তাতে মগ নড়ে গিয়ে খানিকটা চা মাটিতে পড়ে যায়। তখন সে মগটাকে বাঁ হাতে আরো জোরে চেপে ধরে।

দুশ চার

বাহাদুরের সাজসজ্জা ও সমবেত চা পান

'হে-এ বাহাদুরদা, গেলাসে ঢালিম ? চা ?' তার চামচ নাড়ানোর তৃপ্তির পর মাদারি জিজ্ঞাসা করে।

'খাড়া কেনে, না ঢালিস, মুই যাছ', বাহাদুর চিৎকাব করে বলে।

মাদারি একটু চুপ করে থাকে, মগে তার তৈরি চায়ের দিকে তাকায়, সত্যিই বাহাদুরদার তৈরি চায়ের মতই রঙ হয়েছে। সে বাহাদুরের দিকে তাকায়, তাবপর আবার চিৎকার করে, 'টেবিলের উপর রাখি দিম ? মগখান ?'

'দে, রাখি দে', বাহাদুর আস্তেই বলে।

ঘোষমশাইয়ের দোকানটা একটু বড়। খড়েব দোচালা, মাটির ভিটে, শুধু চুল্লি আর এই আলমারি রাখার জায়গাটা বাঁধানো। বাঁধানো বটে, কিন্তু মাটিতে-মাটিতে এখনই এমন ময়লা যে সিমেন্ট আর দেখা যায় না। দোকানে সাবি-সারি বেঞ্চি পাতা, একটা উঁচু বেঞ্চি, একটা নিচু—ইস্কুলের ক্লাশের মত। সেই চালের বাতার এক-এক জায়গায় এক-একটি জিনিশ গোঁজা। নামিয়ে-নামিয়ে বাহাদুর সাজগোছ করছিল। ঘরের ঐ দিকগুলোতেও ঝাঁপ আছে। সেগুলো খুলে দিলে মনে হয় যেন মাথার ওপরেও কোনো চাল নেই। শুধু পেছনের ঝাঁপটা হাটের দিন খেলা হয় না—পাছে কেউ পয়সা না দিয়ে পেছন থেকেই কেটে পড়ে। এখন ঝাঁপগুলো সব নামানো। শুধু এই চুল্লির পাশের ছোট ঝাঁপটা খোলা। ফলে, এত বড় দোকানের ভেতরটা অন্ধকারই লাগছে। সেই কারণেই বাহাদুর আর মাদারি এমন চিৎকার করে কথা বলছে।

অথবা, হাটের দিন দোকানের ভেতর এ-রকম চিৎকার করে কথা বলার অভ্যেস থেকেই এখনো বলে যাচ্ছে।

মাদারি মগটা দুই হাতে তোলে। তারপর, আবার নামিয়ে রাখে—মগটা নিয়ে উঠতে গেলে যদি চলকে পড়ে যায়। মাদারি দাঁড়িয়ে মগটার ওপর নিচু হয়ে তার কানায় দুহাত লাগিয়ে তোলে। কিন্তু, সোজা হওয়ার আগেই আবার নিচু হয়ে মগটা রেখে দিল। কানা ধরে এ-রকম করে তুলে সে ত টেবিলের ওপর রাখতে পারবে না। সেখানে ত তাকে আবার আঙুল উঁচু করতে হবে। এবার নিচু হয়ে সে মগটার দুটো পাশ বাইরে থেকে চাপ দিয়ে ধরে, তারপর তোলে। গরম আছে, তবে চা ত আধা-আধি, হাতে অত লাগছে না। ডান হাতটা একটু পিছলে নেমে যায় বটে কিন্তু ঐ ভাবেই মাদারি কয়েক পা হেঁটে টেবিলের কাছ পর্যন্ত যেতে পারে। সেখানে গিয়ে সে একটু দাঁড়ায়, তারপর মগসহ হাত দুটো নিজের মাথার ওপর তুলে ঠক করে মগটা টেবিলের ওপর নামায়।

নিজের হাত দুটো নিজের শরীরের দুপাশে ঝুলিয়ে মাদারি বয়স্ক লোকের মত একটা শ্বাস ফেলে। তারপর নাক টেনে আবার চেঁচায়, 'হে-এ বাহাদুরদা—'

বাহাদুর এবার যেন খুব কাছ থেকে বলছে এমন স্বরে বলে, 'ক কেনে।'

'রাখিছু। মগখান টেবিলত রাখিছু।'

'খাড়া। আসিছু—'

মাদারি, যেখানে বসে চা বানিয়েছিল সেই জায়গাটার দিকে তাকায়। দেখে, চামচটা পড়ে আছে। চামচটা তুলে এনে টেবিলের ওপর রাখতেই গটগট আওয়াজ তুলে বাহাদুর এসে হাজির। মাদারি যেন তার এত সাধনায় তৈরি চা ভুলে যায়—মুগ্ধ হয়ে দেখে বাহাদুরের টেরি, গোল ছবি-আঁকা গেঞ্জি, লোহার নাল লাগানো চওড়া বেল্ট, নীল রঙের সরু প্যান্ট ও পায়ে একটা বড় জুতো। বড়, মানে, জুতোটা যেন গোড়ালি থেকে অনেকটা উঁচু পর্যন্ত পা ঢেকে রেখেছে। এর মধ্যে বাহাদুরের টেরিটাই একমাত্র তার চেনা। বাহাদুরকে এত অচেনা লাগে মাদারির যে দু-এক পা পেছনে সরে গিয়ে বাহাদুরকে দেখে।

বাহাদুর এসে তিনটে কাচের গ্লাশ সাজিয়ে মগ থেকে চা ঢেলে ভর্তি করে দেয়। একটা গ্লাশ শুধু হাত বাড়িয়ে, শরীর না ঘুরিয়ে, মাদারির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, 'তোর মাক দিয়া আয়—'

মাদারি পাশ দিয়ে বেরতে গেলে বাহাদুর বলে, 'খাড়া কেনে।'

তাবপর মিষ্টির আলমারির তালাটা খুলে ঘোষমশাইয়ের চৌকির ওপর রেখে, তালাটার চাবি ছিল না, ভেতর থেকে একটা প্লাস্টিকের বয়ম বের করে, খুলে, একটা লম্বা 'কুকিস' বিস্কুট মাদারির হাতে দিয়ে বলে, 'যা, মাক দিয়া আয়।'

গ্লাশ আর বিস্কুটটা নিয়ে দুপা গিয়ে মাদারির কেমন সন্দেহ হয় যেন, সে দাঁড়িয়ে পড়ে, না ঘুরে, মাথাটা একটু হেলিয়ে বলে, 'চা আর বিস্কুট দুইখানই মাইঅক দিম ?'

'হয়, হয়। আর তোরটা এইঠে থাকিল্', বলে বাহাদুর তার চায়ের গ্লাশ আর বিস্কুট নিয়ে সেই ছোট ঝাঁপটা দিয়ে বাইবে বেবয়।

ঘোষমশাইয়ের দোকানটা হাটখোলার একেবারে দক্ষিণ সীমায়, বড় রাস্তার প্রায় গা ঘেঁষে। বলা উচিত দক্ষিণ-পশ্চিম কোনায়। কিন্তু টিউবওয়েলটা দোকানেবও দক্ষিণে। এই দক্ষিণ দিকটা দোকানের পেছন দিক হয়ে যেত টিউবওয়েলটা না থাকলে। এখন সেদিকের ঝাঁপটা দিয়ে বেরিয়ে দোকানটা ঘুরে ওদের হাটখোলা রাস্তা এ-সবের ভেতরে পড়তে হয়।

সেই বাইরে এসে বোঝা যায়—হঠাৎ যেন সকালটা অনেক বেড়ে গেছে। কোথাও কুয়াশা নেই। রোদ এসে পড়েছে হাটখোলার নানা ভাঙা চালে, নানা খোলা ভিটেয়, রাস্তায়। হাটের অসমতল ধুলো, মানুষেব পায়ে-পায়ে এলোমেলো ধুলো, হিমে ভিজে নেতিয়ে। মাদারির মা রাস্তায়, একটু রোদে বসে। রাস্তাতেই আরো দু-চারজন লোক ঘোরাফেরা করছে। হাটখোলার একটা ভিটের ওপর জনাদশ-বার লোকের একটা ভিড দাঁড়িয়ে আছে, রোদেই।

এই বকম প্রকাশ্য জাযগা দিয়ে, এত লোক পেরিয়ে, এতটা হেঁটে মাদারি তাব মাকে চা-বিস্কুট দিচ্ছে—এটা যেন মানায না। মানায কি না-মানায় সেটা না-জেনেই মাদারি ঘোষমশাইয়ের দোকান ঘুরে এদিকে এসে তার মাকে খুঁজতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে কেমন অপ্রস্তুত বোধ করে। কেন অপ্রস্তুত বোধ করে সেটা ত সে বোঝে না। তাই মাকে খুঁজে পেয়ে চায়ের গ্লাশ আর বিস্কুট নিয়ে তার দিকে এগিয়ে যায়।

মাকে চা দিয়ে মাদারি বলে, 'মুই বানাইছু, বাহাদুরদা মোক শিখাইছে।'

চা নিয়ে মাদারির মা বলে, 'টেবিলত্ ?' যেন এটা জানা তার পক্ষে সবচেয়ে জরুরি যে হঠাৎ আজ জলুশের সকালে মাদারি মাথায় চা-বানানোর টেবিলের সমান উঁচু হয়ে গেল নাকি ?

মাদারি হেসে বলে, 'না। মাটিত্। এইঠে ত চুল্লিটা, তার সমুখত্, মাটিত্'— সে যেন তার মাকে ঘরের অবস্থানটা খুব ঠিক করে বোঝাতে চায়।

মাদারির মা বিস্কুটটা তাকে এগিয়ে দেয়। মাদারি কোমরে দুহাত দিয়ে বলে, 'এইটা তোর, বাহাদুরদা দিছে, তুই খা কেনে, মাই, খা, বাহাদুরদা দিছে, বিস্কুট, আর মুই বানাইছু চা, খা।' মায়ের চা খাওয়া দেখাটাই যেন তার প্রধান কাজ এমন অনড় হয়ে থাকে সে।

মাদারির মা চায়ে বিস্কুট ভিজিয়ে একটা কামড় দেয় আর তার মুখটা চায়ের ঈষদুষ্ণ তরল স্বাদে ভরে যায়, সহজে শূন্য হয়ে যায় না। মুখের সেই বিবর ভরে থাকে বিস্কুটের নরম অথচ তখনো অখণ্ড টুকরোয়। সে চিবয় না। মুখের ভেতরের সব অঙ্গ দিয়ে—তালু, মাড়ি, দাঁত, জিভের পাশ, মাথা দিয়ে সেই নরম অখণ্ড টুকরোটা আস্বাদ করতে থাকে। বাহাদুর হাঁক দেয়, 'হে-এ মাদারি, তোর চা নিগা।'

সেই ভিড়টা থেকে একজন জিজ্ঞাসা করে, 'চা পাওয়া যাবু নাকি ?'
বাহাদুর তার হাত তুলে ঘোষণা করে দেয়, 'আজ জলুশ, আজ দোকান বন্ধ

দুশ পাঁচ

হাটখোলায় নাচ গান

সকাল আটটা-সাড়ে আটটা নাগাদ পুরো হাটখোলাব 'কম্যান্ড' যেন বাহাদুরের হাতে চলে যায়।

তখন থেকেই লোক জুটতে শুরু করেছে। রাস্তা জুড়ে সারি দিয়ে ত লোক আসছেই, রাস্তা ছাড়াও নানা দিক থেকে লোক উঠে আসে। হাটখোলাব উত্তরেব রাস্তা দিয়ে গান গাইতে-গাইতে দেবপাড়া বাগানের মেয়ে-মজুররা ফরেস্ট উতবে আসে। তাদেব পেছনে ঢোল বাজাতে-বাজাতে মরদরা। প্রায় প্রত্যেকেই স্নান করেছে, অন্তত তেল মেখেছে প্রচুর। মেয়েরা মাথাব চুলে ফুল গুঁজেছে—হাতেব কাছে যে-ফুল পেয়েছে তাই। কিন্তু হাতের কাছেও সবাই ফুল পায়নি, তখন পাতা গুঁজেছে—হাতেব কাছে যে-পাতা পেয়েছে তাই। দু-একজনের মাথায় চা পাতাব তোড়া। তারা নদী, টিলা আর ফরেস্ট পেরিয়ে যে এল সেটা বোঝা যায় পায়ের দিকে তাকালে। কিন্তু হাটখোলায় এসেও তাদের নাচ থামে না—বরং এতক্ষণ যেন ফরেস্টের ভেতর দিয়ে আসতে-আসতে তারা নাচার ঠিক জায়গা পায়নি। তা ছাড়া, সময় মত হাটখোলায় পৌঁছবার তাড়াও ছিল। এখন এখানে এসে যখন দেখছে, হাতে সময় আছে, হাটখোলায় জায়গাও আছে প্রচুব, আর তাদেব পায়ে নাচও জমা আছে—তারা গাইতে-গাইতে নাচতে শুরু করে দেয়। আর, তাদেব পেছনে-পেছনে মরদরা ঢোল বাজায় আব দোলে, দোলে আর ঢোল বাজায়। একজন একটা বাঁশিও এনেছে। কিন্তু এতটাই হাড়িয়া খেয়েছে যে কিছুতেই বাঁশিটা ঠোঁটে লাগাতে পারে না। সে ঠোঁটে লাগাতে গিয়ে একবার থুতনিতে, একবার গালে, এমন-কি একবার গলায় লাগায়। লাগিয়ে ফুঁও দেয়। যখন বাজে না, তখন বাঁশিটা তুলে এনে তাকিয়ে পরীক্ষা করে। আবার বাঁশি ঠোঁটে লাগাতে চায়।

দেবপাড়ার দলের সঙ্গে কখন যে হামিরপাড়া, খয়েববাড়ি, মুতামবাড়ির মজুররা মিশে যায়— তা কেউ টেরও পায় না। একটা দল বেশি বড় হয়ে গেলে আর একটা দল তৈরি হয়ে যায়। তাদের ঢোল বাজতে থাকে, বাজতেই থাকে। বুড়িতোরসার চর থেকে একদল সাঁওতাল এসেছে, তাবা চা-বাগানের এদের কাউকে চেনে না, কিন্তু ওদের নাচ আর ঢোল বোঝে—তারাও এদের সঙ্গে নাচতে শুরু করেছে। মনে হয়, আজ হাটখোলায় নাচ হবে—এটাই কথা ছিল।

পাশাপাশি গ্রাম থেকে রাজবংশীরাও উঠে এসেছে। তারাও তাদের সবচেয়ে পরিষ্কার জামা-কাপড় পরে সেজেছে। মেয়েরা আর বয়স্ক পুবরুষরা, মনে হয়, স্নান করেই এসেছে—নইলে মাথায় মুখে তেল মেখেছে। তাদের নাচ নেই—তারা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে এই নাচ দেখে যাচ্ছে।

বাহাদুর একটা ব্যাটনও জোগাড় করেছে।

সে সেই ব্যাটন নিয়ে নাচ যারা দেখছে তাদের লাইন রাখতে ব্যস্ত। লম্বা-লম্বা পা ফেলে মিলিটারির মত হাঁটছে। আর বাচ্চাদের বসিয়ে দিচ্ছে, মেয়েদের এক পাশে সরিয়ে দিচ্ছে, অকারণে 'এই পাছত যাও, পাছত যাও' বলে চেঁচিয়ে উঠছে। বাহাদুরকে এরা প্রায় প্রত্যেকেই চেনে। তাই তার এই পরিবর্তনকেই সবচেয়ে নাটকীয় লাগে—নাচ আর ঢোল ত তারা প্রায়ই দেখে থাকে।

ভিড়ের ভেতর থেকে কে চিৎকার করে, 'হে-এ বাহাদুর, ঘোষমশাই ডাকোছে।'

বাহাদুর তার দিকে ব্যাটন উঁচিয়ে বলে, 'আইজ দুকান বন্ধ, আইজ জলুশ।'

হঠাৎ একটা হৈ-হৈ আওয়াজে সবাই পেছনে তাকিয়ে দেখে তিনটি ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে, রাস্তার ওপর, ভর্তি মেয়ে-পুরুষ, একটা ঝাণ্ডা-মতও কী আছে, তারা নাচ আর ঢোলের আওয়াজ পেয়ে ট্রাকের ভেতরই যেন নেচে উঠতে চায়। বাহাদুর দৌড়ে তাদের কাছে যায়। একজন ড্রাইভারের পাশের আসন থেকে গলা বাড়িয়ে কী জিজ্ঞাসা করে, বাহাদুর তাকে জবাব দেয়, 'ট্রাক ত এ্যালায়ও আসে নাই,

আসিবার টাইম হই গিছে।' সেই ট্রাক একটু আওয়াজ তুলে চলে যায়। বাহাদুর পেছনে ট্রাকটাব পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। আর ড্রাইভারকে উদ্দেশ্য করে যেন বলে—'চলি যান, মোবা যাছি— ।' তৃতীয় ট্রাকটাকে সে হাত তুলে চালাতে নিষেধ করে, তাবপর বাস্তাটা পেবিয়ে গিয়ে ব্যাটনটা তুলে চালাবার নির্দেশ দেয়। সেই ট্রাকটা চলে গেলে বাহাদুর চিৎকার করে ওঠে, 'হান্টুপাডা টি এস্টেট চলি গেইছে, এ্যালায় লঙ্কাপাডা আসিবার ধরিছে—'

'তা তোমারখান কখন আসিবার ধরিবে হে বাহাদুর ?' বুড়োমত ছোটখাট একজন এসে বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করে।

'উমারায় সব বাগানের মানষি, নিজের ট্রাক, উঠি বসিছে, স্টার্ট দিছে, আর তোমাব এ্যালায় কুন কনট্রাকটর আসি ট্রাকগাড়ি দিবে, ছাড়িবে, তার বাদে তোমরালা জলুশত্ যাবেন। স্যালায় জলুশ ফরসা। হ-য়, পঁক পঁক করি মুখ্যমন্ত্রী আসিবেন মোর বনমন্ত্রীখানও থাকিবে। আর হামরালা য্যালায় যাম, দেখিম বাঁশ গিলান খাড়া আছে—মন্ত্রীও নাই, তিস্তাও নাই। 'তোঁসার মানষির তিস্তা নাই রো, তিস্তা নাই'—বাহাদুর আবার সেই নাচের দলটার দিকে চলে যায়। যাবা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িযে দেখছিল তাদের ভিড়টাও একটু আলগা হয়ে গেছে। পেছন থেকে বাহাদুর চিৎকার করে ওঠে, 'হে-ই, লাইন ঠিক রাখো কেনে, লাইন ঠিক বানাও, এই ছাওযা-ছোটর দল, মারিব একখান, ব্যাস, ট্রাক আসি গেলে সব লাইন দিয়া উঠিবেন, ওয়ান-টু-থ্রি।'

এখন এই ভিড় দেখে মনে হতে পারে, জলুশ বোধহয় একটাই হচ্ছে আর এব মধ্যে কামতাপুর, উত্তরখণ্ড, গোর্খাল্যান্ড, নমশূদ্র সমিতি—এই সব ভাগাভাগিও যেন কিছু নেই। সরকার ও সবকাবের দলগুলি যে-ভাবে তিস্তা ব্যারেজের উদ্বোধন অনুষ্ঠানকে আগামী নির্বাচনেব প্রথম মিটিঙে পবিণত করতে চাইছে তাতে ঐ সব খুচরো দলের পাত্তা পাওয়াই মুশকিল। তার ওপব, ফবেস্ট ডিপার্টমেন্টের, এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজের আর চা-বাগানের ট্রাক সারা জেলা থেকে লোকগুলোকে তুলে নিযে সেই ব্যারেজ ফেলবে। সকাল হতে না-হতেই সে-কাজ শুরু হয়েছে। লোক জড়ো করাই যদি সরকারের ও সরকারের দলগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য হত তা হলে তিস্তা ব্যারেজেব কাছাকাছি জাযগাগুলো থেকেই ত যথেষ্ট লোক আনতে পাবত। কিন্তু সরকার ও সরকারের দলগুলি চায়, এই সমাবেশ থেকে সবাই যেন নিশ্চিত হয়ে যায় যে এই জেলায় ঐ-সব খুচরো দলের কোনো অস্তিত্ব ত নেইই, এমন-কি কংগ্রেসও নেই। সেই জন্যেই এত দূর-দূর থেকেও লোক নিয়ে যাওযা।

কিন্তু এই সব ট্রাকে করে যারা যাচ্ছে তাদের ভেতর কামতাপুর, উত্তবখণ্ড, নমশূদ্র সমিতি বা গোর্খাল্যান্ডের লোকজনও দু-চারজন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতে পারে। এভাবে ত তাদের বাছাও যাবে না। এমন-কি উত্তরখণ্ড বা গোর্খাল্যান্ডের লোকজনের সরকারি ব্যবস্থায় যাওয়া অনেক বেশি নিরাপদ বোধ হতে পারে। এখানে, এই হাটখোলায় সেই ভাগাভাগি নিয়ে কোনো উত্তেজনা নেই, বা, পরস্পরের কোনো সন্দেহও নেই—যে-উত্তেজনা ও সন্দেহ থাকে ভোটের দিন, সে পঞ্চায়েতের ভোটই হোক আর লোকসভার ভোটই হোক। দুটো আলাদা অফিসই যে তৈরি হয়ে যায় গাছতলায়, তাই নয়। এক-একটা ভোটকেন্দ্রে মাত্র সাতশ-আটশ ভোটারের মধ্যে হয়ত ভোট দেয়, বড জোর সাডে তিনশ-চারশ জন ; কিন্তু সেই ক-জন ভোটারের পছন্দ-অপছন্দ নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে পুরো এলাকাটাতেই একটা উদ্বেগ-উত্তেজনা, কোনো সময়-বা হিংস্রতা ছড়িয়ে পড়ে। তা সব সময় চাপাও থাকে না, বিশেষত চা-বাগান এলাকায় প্রকাশ্য হয়েও যায়।

তাছাড়া, কামতাপুর-গোর্খাল্যান্ড-উত্তরখণ্ড-নমশূদ্র সমিতি এই সবের সঙ্গে তিস্তা ব্যারেজের উদ্বোধনের ঘটনার ভেতরের সংযোগ কোথায়, তা ত এদের জানার কথাও নয়, এবা জানেও না। কিন্তু, না-জানলেও, চা-বাগানের আন্দোলন বা জমি-জিরেতের নানা গোলমালে সরকার ও সরকারের দলগুলি সম্পর্কে যে-মনোভাব তৈরি হয়ে আছে, তা থেকেই ত এরা নিজেদেব ভূমিকা যথাস্থানে ঠিক করে নিতে পারবে।

আটটা বেজে যাওয়ার পর ধূপগুড়ির ভটচাজদের দুটো হাটবাস আর সিংজির একটা বিরাট বড় ট্রাক এসে দাঁড়ায়।

দুশ ছয়

বাসে-ট্রাকে মিছিল ওঠে

ট্রাকটা আর বাস দুটো প্রথমে এসে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে পড়ে। ড্রাইভার মুখ বাড়িয়ে লোকজনকে কী জিজ্ঞাসা করে।

বাহাদুর তখন ছিল নাচের ওখানে, ভিড়ের পেছনে। বোধহয়, তারও একটু ক্লান্তি লেগেছিল। সে বাস আর ট্রাক দাঁড়াতে দেখে ছুটে রাস্তাব দিকে যায়, ডান হাতে ব্যাটনটা তুলে। তার পেছন-পেছন বাচ্চাকাচ্চাদের একটা দলও ছোটে। ততক্ষণে বাসদুটোর ছোকরা দুজন রাস্তায় নেমে পেছনের ট্রাকটাকে একটু পেছিয়ে যেতে ইশারা করছে, আর বাসের গায়ে চড় মারছে একটা করে। পেছনের ট্রাকের ছোকরাটা ট্রাকের ওপর থেকেই ড্রাইভারের মাথার টিনে একটা চড় মারে, তারপর আস্তে-আস্তে চড় মারতেই থাকে। ট্রাকটা একটু পেছয়, তারপর রাস্তার উল্টোদিকে পেছনের চাকা চালায়। এর মধ্যে দ্বিতীয় বাসটাও একটু পেছিয়ে যায়।

বাহাদুর এসে রাস্তা আর হাটখোলার মধ্যে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ব্যাটনটা তুলে চিৎকার করে, 'এইঠে, এইঠে, ব্যাস, ঠিক আছে, সিধা, সিধা, সিধা—'

ট্রাক ও বাস দুটো ততক্ষণে রাস্তার ওপর পেছন ঘুরিয়ে এমন ভাবে দাঁড়িয়েছে যে একে-একে হাটখোলার সামনের জায়গাটুকুতে এসে ঢুকবে। বাহাদুর ব্যাটন উঁচু করে বাচ্চাদের দলটাকে তাড়া করে—'এই হট্, হট্, বাস ঢুকিবার রাস্তা দে কেনে, সরি যাও, সরি যাও।'

ট্রাক আর বাসগুলো সত্যিই যেন বাহাদুরের নির্দেশ মেনে-মেনেই নিজেদের মুখ ঠিক কবে। তাবপর রাস্তার ঢালে এসে দাঁড়ায় আর প্রথম বাসটা ধীরে-ধীরে হাটখোলায় নেমে আসে, ধীরে-ধীরে খানিকটা এসে দাঁড়ায়, ড্রাইভার জানলা দিয়ে মাথা গলিয়ে পেছনে কী দেখে আবার খানিকটা এগিয়ে নিয়ে যায়।

পেছনের বাসটা ততক্ষণে, প্রথম বাসটার চাকার দাগ ধরে-ধরেই যেন, ঢাল থেকে হাটখোলায নামে। প্রথম বাসটার পেছনে দাঁড়িয়ে বাহাদুর দুহাত উঁচু করে তাকে নির্দেশ দিতে থাকে—তাব ডান হাতে ব্যাটন।

ট্রাকটা একটু তফাতে ছিল। সেটা একটা বেশ বড় ধরনের আওয়াজ করে বাঁ দিকে নেমে যায়, এই বাসগুলোর সঙ্গে ফাঁক রেখে বাঁ দিকে। তাবপব আরো একটা আওয়াজ তুলে থেমে যায।

বাস আর ট্রাক যতক্ষণ রাস্তা থেকে মাঠে নামছিল ততক্ষণ এই ভিডা নাচগুলোর দিকে পেছন ফিরে স্থির হয়ে দেখছিল। এক নাচের দলগুলোই যেন নেশায় নেচে চলে, যেন এই ব্যস-ট্রাক ইত্যাদিব সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই, যেন এই ভিড় চলে গেলে যে-নির্জনতা পড়ে থাকবে তাতে তারা নাচের আরো গভীরে চলে যেতে পারবে।

কিন্তু বাস আর ট্রাকগুলো যেই দাঁড়িয়ে গেল, সবগুলো নাচের দল পরস্পরের বাঁধা হাত মুহূর্তে খুলে ফেলে এই বাস আর ট্রাকগুলোর দিকে ছুটে গেল। গ্রামের রাজবংশীদের ভিড়টা ত নাচের বাইরে, এই বাস-ট্রাকগুলোর চারপাশেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। তারা কিছু বুঝে উঠবার আগেই নাচের মেয়েরা তাদের ফাঁক দিয়ে দৌড়ে বাস আর ট্রাকে উঠে পড়ে। তারপর তারা নিজেরা এক-একটা জায়গায় বসে পড়ার আনন্দে হেসে ওঠে। যে যখন জায়গা পাচ্ছে তখন হেসে উঠছে। একলা নয়, কয়েক জন। এক সঙ্গে ত আর তারা জায়গা পায় না। তাই কিছুক্ষণ শুধু হাসি ওঠে আর থামে। এত মাইল-মাইল হেঁটে এসে, এত ঘণ্টা-ঘণ্টা নেচে, এমন দৌড়ে বাসে-ট্রাকে ওঠায় তাদের হাসির মধ্যে একটু হাঁফছাড়া শ্বাসও ছিল।

এই মেয়েরা বাসে-ট্রাকে উঠে যাবার পর বাকিরা বুঝতে পারে ওরা তাড়াতাড়ি ভাল জায়গা নিয়ে নিল্। তখন গ্রামের লোকজন, ছেলেপিলে, বেউ-বুড়িরাও দৌড়ে বাস আর ট্রাকের ভেতর উঠতে শুরু করে। উঠতে গিয়ে একজনের সঙ্গে আর-একজনের ধাক্কা লেগে যায়, একজনের ছাতা আর-এক জনের পেটে লাগে, কারো হাত থেকে বাচ্চাছেলে খসে গেছে—বাচ্চাটা তারস্বরে কাঁদে।

আর, বাহাদুর তার ব্যাটন উঁচিয়ে একবার প্রথম বাসটার সামনে দাঁড়ায়—'এই খবরদার, সাবোধান, লাইন লাগাও',—আর এই একই কথা বলতে-বলতে একবার দ্বিতীয় বাসটার সামনে, আর-একবার ট্রাকটার সামনে গিয়ে, লাফায়।

ততক্ষণে পুরুষমানুষরা বাসের ছাদে ও ট্রাকের ভেতরে ওঠা শুরু করেছে—ট্রাকের ভেতরে তখনো কিছু জায়গা ছিল।

এর মধ্যে আবার বাসের ও ট্রাকেব ভেতর থেকে ডাকাডাকি শুরু হযেছে। যে যার নিজের লোকদের জন্যে জায়গা বেখে ডাকছে। এক বাড়ির লোক এক জায়গায গাযে গা লাগিয়ে বসতে চায়, এক পাড়ার লোকও এক জায়গাতেই থাকতে চায়।

কিন্তু গাড়িতে ওঠার সময় ত আব কেউ পেছনে ফিরে তাকায় নি—তখন যে যাব মত আগেভাগে জায়গা নিতে চেয়েছে। এখন তাই বাসের ভেতব-বাহিবে এ-বকম সব আওযাজ উঠছে—

'হে-এ-ই মাই গে, এইঠে আয় কেনে'

'কাকা গেই, হে-এ-ও কাকা, কাকা গেই'

'হে-এ বাহাদুর, বাহাদুব, মোর বিটিখান কোটত উঠিল এট্টু দেখি দে।'

'চাপি বসেন, চাপি বসেন, আবো লোক সিন্ধাবাব নাগিবে।'

'এইঠে উঠিলেন আবার এইঠে নামি যাছেন?'

'আরে উঠিবার দেন, উঠিবার দেন, মোব বহিন নাগে, উঠিবাব দেন।'

'যায় যেইঠে আছেন, নডিবেন না, স্যালায় ব্যাবাজত গিয়া বাছি নিবেন।'

'ছাদের উপব সাবোধান, ডালত ধাক্কা না খান।'

কিন্তু, এত কিছু সত্ত্বেও দুটি বাসে আব একটি ট্রাকে, জাযগা কুলোয় না। তখনো অনেকে বাইরে দাঁডিযে থাকে—তাব মধ্যে বাচ্চা আছে, বুডি আছে, কযেকজন ধুতি-শার্ট পবা, ছাতা হাতে, দেউনিয়া মানুষ আছে যাদের পক্ষে বাসের ছাদে ওঠা সম্ভব নয়।

রাস্তার ওপর দুজন শহবেব ছেলে যে এতক্ষণ দাঁডিযে ছিল, তা কাবো যেন খেযালেই পড়েনি। এখন তারা এগিয়ে আসতে বোঝা যায়, তাবা এই বাস-ট্রাকেব সঙ্গে এসেছে। তাবা এসে ট্রাকেব কাছে দাঁডায। একটি ছেলে চাকা বেয়ে ওপবে উঠে যায। উঠেই ধমকাতে শুরু করে- 'কী, নিজেরা বসলেই হবে, আব কাউকে উঠতে দিতে হবে না? নিন, সবে বসুন, এগিযে যান, এগিযে যান। দেখি, এই যে বুড়িমা, আপনি এই কোনায, হ্যাঁ এই কোণে বসুন, তা হলে আব লোকের চাপ লাগবে না—।'

ছেলেটি বুড়িমাকে পেছন থেকে ধরে একটু উঁচু করে কোনাকুনি বসিয়ে দেয। তাতে একটু হাসিব রোল ওঠে। ছেলেটি বলে, 'হ্যাঁ, হাসতে-হাসতে এগিয়ে যান, এগিয়ে যান।'

মেয়েদের সম্পর্কে তার স্বাভাবিক সম্ভ্রমবোধ থেকে সে তাদের হাত দিয়ে ঠেলতে পাবে না, কিন্তু 'সরে যান, সরে যান' বলতে-বলতে সে যে-ভাবে এগিয়ে যায় তাতে তার হাঁটুর খোঁচায অনেকে সত্যি একটু সরে বসে।

ছেলেটি হঠাৎ মুখ বাড়িয়ে নীচের ছেলেটাকে বলে, 'বাসেব ভেতর বাচ্চাদের কোলে নিয়ে বসা ত, দেখবি জায়গা হয়ে যাবে।'

এই ছেলেটি ট্রাকেব ওপব এক-একটা বাচ্চাকে তুলে ধবে বলে, 'এ কাব বাচ্চা।'

বাচ্চার মা 'এই-যে, এই-যে' কবতেই সবাই হেসে ওঠে। বিশেষত বাগানেব মেয়েরা। তাবা ত হেসেই আছে। বাগানে আজ করার সূত্রেই তারা ভদ্রলোকেব ছেলেদের কথার ধারধোর ধরতে পারে কিছুটা।

এদিকে অন্য ছেলেটি বাসদুটোর জানলা দিয়ে চেঁচায়—'বাচ্চাদের কোলে বসান, বাচ্চাদের কোলে বসান।' তারপর বাহাদুরকে ডেকে বলে, 'বাচ্চাদের কোলে বসাতে বলুন, আর, এই বাচ্চাদের বাসে তুলে দিন'—কয়েকটি বাচ্চাকে মাঠ থেকে টেনে এনে সে বাহাদুরের সামনে দেয়। কিন্তু সে সরে যেতেই বাচ্চাগুলো তাঁদের বাবা-কাকা মা-মাসির কাছে ছুটে চলে যায়। বাহাদুর অবিশ্যি ততক্ষণে বাসের জানলা দিয়ে তার ব্যাটন চালাচ্ছে—'হেই ছোয়া, সিট ছাড়, তর মায়ের কোলত বস্।'

ট্রাকের পেছন দিকে তখন খানিকটা জায়গা বেরিয়েছে। সেই দেউনিয়া চেহারার কয়েকজন এবং মেয়েরা ট্রাকে উঠে যেতে পারে।

দুশ সাত

মাদারিব মায়ের ট্রাকারোহণ

মাদাবিব মা কোথাওই উঠতে পাবে না। মাদাবি যে-কোনো জায়গাতেই উঠতে পারত, কিন্তু মাকে ছাড়া ওঠে কী কবে।

জলুশ মানেই ত দল বেঁধে যাওয়া। বাড়ির লোকবা দল বাঁধে, টাড়িব লোকবা দল বাঁধে, বস্তির লোকরা দল বাঁধে, বাগানেব লোকবা দল বাঁধে। কেউ ছুটে গেলে দলেব লোকরাই তাকে ডেকেড়ুকে নিযে নেয।

কিন্তু মাদাবিব মা-ব দল বাঁধা ত তাব এইটুকু ছেলেব সঙ্গে। তাব ত আব কোনো টাড়ি নেই যে 'মাদাবিব মা' বলে কেউ ডাকবে। সে বাসটাব দিকে না গিয়ে যদি ট্রাকটাব দিকে ছুটত তা হলে হযত একটা জাযগা পেযে যেত। কিন্তু বাসটাতে ত সে একটা বসাব জাযগা পেয়েছিলও। একটা মোটামত বেটিছোযা এসে তাকে ধমকে বলে, 'এইটা ত ধূপগুড়িব ভটচাজদের বাস, আমাদেব জন্যে পাঠাইছে, তোমবা কেন উঠছ, নামো, নামো।'

মাদাবিব মা তাব কথাকে সত্য বলে মানে বটে কিন্তু নামে না।

সে-মহিলা একটু পেছিয়ে চেঁচাতে শুরু কবে, 'এ-এ-ই বিশ্বাস, দেখ ত এইখানে কে বসে আছে?' তাবপর, আবাব মুখটা মাদারির মা-ব দিকে ঘুবিযে এনে বলে, 'নামো, নামো সিট থিকে', এবাব সে মাদাবিব মাযেব হাত ধবে টানও দেয।

'এই উঠো না কেনে, তোমরালা যেইঠে আসিছেন সেই বাসত যান, হামবালাব বাসত উঠিছেন কেনে। এই ওঠো, নামো'—মাদাবিব মাযের দুপাশ থেকে এই কথা শুরু হলেও মাদাবিব মা নড়েনি। কিন্তু এই সমর্থন পেয়েই মহিলা মাদাবির মা-র একটা হাত ধবে এমন হ্যাঁচকা টান দিল যে মাদাবিব মা উঠে পড়ে। মহিলার এটা হিশেবে ছিল না। আবো গোটা কযেক টান দিলে মাদাবিব মা উঠবে, এ-বকম ভেবেই তার টানাটানি শুরু। কিন্তু তার প্রথম টানের মাঝামাঝিই মাদাবির মা উঠে পড়ে। মহিলা হঠাৎ হুড়মুড় করে পেছনে পড়ে যায। তবে বাসে এতই গাদাগাদি ভিড় যে কাউকে পড়ে যেতে হলেও বাচ্চাকাচ্চার ওপর, বা, উল্টো দিকেব বেঞ্চে যাবা বসে আছে, তাদেব ওপব পড়তে হবে। মহিলা পড়ে যাওযা মাত্রই 'হে-ই মাই গে' বলে কান্নাকাটিব একটা আভাস তৈবি হতেই, মাদাবিব মা বাস থেকে নেমে যেতে পারে, আর মহিলাকে পেছনেব মেয়েবা ঠেলে সোজা করে বাসের ভেতর দাঁড় করিয়ে দেয়। বাসের ভেতর ত আর দাঁড়ানো যায না। মহিলাব মাথাটা কাঠে একটু ঠক কবে লাগতেই মাথায হাত দিয়ে নিজের পায়ের ওপর সোজা হয়ে গিয়ে, ঘুবে, মাদাবিব মাযের ফাঁকা জায়গাটাতে বসে পড়ে।

মাদারি বাসের বাইরে মাকে জিজ্ঞাসা কবে 'মাই গে, নামিবাব ধবিছিস কেনে?'

মাদাবির মা খুব আস্তে বলে, 'মোক নিছে না, নামি দিছে।'

'কায় নামি দিছে?' মাদারি তার মাযের সামনে এসে, তার পেটে হাত রেখে জিজ্ঞেস করে।

'সগায় ত নামি দিছে—কহিছে এ-বাসত হামরালাক নিবে না', মাদারির মা নিবাসক্ত ভাবে তাব ছেলের দিকে তাকিয়ে বলে, যেন সে তাকে নামিযে দেয়ার যুক্তিটা বোঝে। জলুশ মানে ত সবাই মিলে একসঙ্গে যাওয়া। মাদারিব মা ত সেখানে সত্যি একা, তার ত আর কোনো দল নেই। যাদের দল আছে, তারা ত তাকে নাও নিতে পারে। মাদারির মা ত আর কোনো বস্তিতে থাকে না—তাকে বস্তির লোকরা দেখেই ভাবে কোনো বাগানের লোক। কেউ যদি তার সঙ্গে কোনো কথা বলত, তা হলেও কি তারা, গ্রামের লোকরা, বুঝতে পাবত সে তাদেরই লোক? শুধু কথা শুনেই কি আর তারা মেনে নিত?

মাদারি ব্যস্ত হয়ে ওঠে, 'তুই জলুশত যাবু না?'

মাদারির মা একটু হেসে বলে, 'ক্যানং করি যাম? কোনো বাস নাই রো।'

মাদারি হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে তাব হাত ধরে টানে, 'চল্, মোরা ঐ বাসঠে যাই—'

মাদারির মা তার সঙ্গে-সঙ্গে যায়। কিন্তু সেই বাসের পেছনের দরজায় মানুষ ঝুলে আছে, বাস ছাড়ার আগেই। জানলা দিয়ে বাগানের মেয়েরা কিছুটা মুখ বাড়িয়ে আছে। মাদারি তাদের দিকে তাকিয়ে বলে, 'হে-এ দিদি, মোর মাইটাক্ আর হামাক নে কেনে, হে দিদি, মোক নে কেনে, মোর মাইটাক্ নে কেনে।'

এত চেঁচামেচির ভেতর মাদারির কথা কারো কানে ঢোকে না। কিন্তু একটা মেয়ে হাত বাড়িয়ে বলে—'ই ত বাগানকা বাস হলেক, ঐ ট্রাকমে চড়ি যা', সে আঙুল দিয়ে ট্রাকটা দেখায়ও।

মাদারির মাকে দেখে বাগানের মেয়েরা ভেবেছে, গ্রামের থেকে এসেছে।

মায়ের হাত ধরে টানতে-টানতে মাদারি তখন ট্রাকের দিকে ছোটে। সে ছোটে বলেই তার মাকেও একটু ছুটেই হাঁটতে হয়। আবার প্রথম বাসটা পেরিয়ে ট্রাকটার কাছে যেতেই মাদারি দেখে বাহাদুর ব্যাটন হাতে বাসের ওপরে লোক তুলছে।

'হে-এ বাহাদুরদা', এক হাতে মার হাত ধরা, আর এক হাতে বাহাদুরের বেল্ট ধরে মাদারি টানে, 'হে-এ বাহাদুরদা, হে-এ—'

বাহাদুর মাথা না ঘুরিয়ে চিৎকার করে, 'চোপ যাও', তারপর বাসের সিঁড়ির মাঝামাঝি পর্যন্ত যে-লোকটা উঠেছে, কিন্তু, বাসের ছাদে আর পা রাখার জায়গা পাচ্ছে না, তার পেছনে ব্যাটনের খোঁচা দিয়ে বলে, 'উঠো উঠো কেনে, উঠো।'

লোকটি বিপদে পড়ে। সে সত্যিই পেছনে ব্যাটনের খোঁচা খেয়ে বাসের ছাদে একটা পা রাখে তাড়াতাড়ি। পাটা একজনের গায়ের ওপর পড়ে, সে 'কায রে' বলে পাটা সরিয়ে দেয়, কিন্তু পাটা পড়ে ছাদের ওপরই। লোকটা তাড়াতাড়ি হামাগুড়ি দিয়ে উঠে পেছন ফিরে বাহাদুরকে বলে, 'পাছত কাঠি সিন্ধাইছেন কেনে ?'

বাহাদুর নীচে থেকেই চিৎকার করে, 'যান, ভিতরত যান।'

লোকটার তখন হামাগুড়ি-দেয়া অবস্থা, সে পায়ের ওপরে বসতে গেলে গড়িয়ে পড়ে যাবে, কিন্তু সামনেও বসার জায়গা নেই।

বাহাদুর 'উঠো উঠো' করে ব্যাটন ঘুরিয়ে পেছন ফিরেই দেখে, মাদারি। দেখে সে চিৎকার করে ওঠে, 'হেই গে, এ্যালায়ও উঠিস নাই গে।'

মাদারি বাহাদুরের দিকে মুখ তুলে বলে, 'মোক নামি দিছে, মাঅক নামি দিছে, মোর যাইবার বাস নাই রো—'

'কায নামি দিছে ?' বাহাদুর চিৎকার করে ওঠে। কিন্তু ততক্ষণে ওদিককার বাসটা স্টার্ট দিয়েছে। এই বাসের ক্লিনার গাড়ির গায়ে জোরে-জোরে চড় মারে। বাহাদুর হঠাৎ সচকিত হয়ে বলে, 'খাইছে, খাইছে, সব স্টার্ট নিবার ধরিছে, চল কেনে, চ—ল।'

বলেই বাহাদুর ব্যাটনটা বাঁ হাতে নিয়ে, ডান হাতে মাদারির হাত ধরে টানে আর মাদারি তার মার হাত ধরে টানে। বাহাদুরের টানে তাদের, মাদারি ও তার মাকে, দৌড়তে-দৌড়তেই ট্রাকের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হয়।

ট্রাকের পেছনের ডালা তখন উঠে গেছে। বাহাদুর সেই ডালার ওপর তার ব্যাটন মেরে চিৎকার করে, 'হে-ই খুলি দাও কেনে, মানষি পড়ি আছে, খুলি দাও, খুলি দাও।'

ট্রাকটায় তখন অনেকে দাঁড়িয়ে, বাগানের অনেক ছোকরা তিনটি ডালার ওপর বসে। নীচে থেকে কে চেঁচাচ্ছে, সেটা শোনার মত অবস্থাও কারো নেই। বাহাদুর আবার মাদারির হাত ধরে সামনে চলে আসে, ড্রাইভারের দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলে, 'আরে মানষি পড়ি আছে, তুলি নেন কেনে।'

ওদিকের প্রথম বাসটা ততক্ষণে পেছনে চলতে-চলতে রাস্তায় উঠে দাঁড়িয়ে আছে। স্টার্ট চালুই—বোঝা যাচ্ছে না, বাকি বাসটা ও ট্রাকটার জন্যে অপেক্ষা করছে, নাকি এখনি ছেড়ে দেবে। বাকি বাসটা আর পেছচ্ছে না, মাঠের মধ্যেই একটু-একটু করে গাড়িটা রাস্তার দিকে মুখ করে নিচ্ছে। ট্রাকের ড্রাইভার সিটে বসে স্টিয়ারিঙে হাত দিয়েছে—বাসটা রাস্তাতে উঠলেই সে স্টার্ট দেবে।

ড্রাইভার বাহাদুরকে ওপর দিকে হাত দেখায় আর তখনই ওপর থেকে সেই ছেলেটি গলা বাড়িয়ে ধমকে ওঠে, 'কী ব্যাপার, চেঁচাচ্ছেন কেন ?'

ঘাড় হেলিয়ে বাহাদুর বলে, 'ইমরাক ফেলি যাছেন, কায়ও উঠিবার দিছে না।'

'এতক্ষণে সময় হল ? দিন, ছেলেটিকে তুলে দিন'—ছেলেটি হাত বাড়ায়। বাহাদুর ব্যাটনটা মাটিতে ফেলে মাদারিকে মাথার ওপর তুলতেই মাদারি পায়ের এক দুলুনিতে পায়ের ট্রাকের তলায় ডালা পেয়ে যায়। 'ওঁকে এখান দিয়ে তুলুন', ড্রাইভারের দরজার পাশে লোহার ধাপ দেখিয়ে দেয় ছেলেটি।

দুশ আট

ট্রাকে শ্লোগান ও নির্জনতা

রাস্তাব ওপর উঠে বওনা হতেই ছেলেটি ট্রাকের ওপর শ্লোগান দেয়—'ইনকিলাব জিন্দাবাদ ।' এই শ্লোগানটার জবাবে সবাই-ই 'জিন্দাবাদ' দিতে পারে, বেশ জোরেই । তার পরেও চেনাজানা শ্লোগানই ওঠে, 'বামফ্রন্ট জিন্দাবাদ ।' 'গরিবের সরকার বামফ্রন্ট সরকার ।' 'পঞ্চায়েত আইন করল কে, বামফ্রন্ট সরকার আবার কে ?' 'গ্রামের মানুষের বন্ধু সরকার, বামফ্রন্ট সরকাব ।'

বেশ খানিকক্ষণ ট্রাকের ওপব থেকে উৎসাহের সঙ্গে হাত নাড়িয়ে নাচিয়ে শ্লোগান চলে । যারা শ্লোগানগুলো জানে না, কয়েকবারেব পর তারাও শ্লোগান ধবতে পারে । ট্রাকটা জোরে চলছে, মাথার ওপর দিয়ে বাতাস বইছে, দুপাশের ফরেস্টের গাছ-গাছড়া কোথাও-কোথাও মাথার ওপরই প্রায় ঝুঁকে আসে । বিশেষত বাঁশগাছের হাত থেকে বাঁচার জন্যে বাসের মাথার লোকজনকে পরস্পরের পিঠের ওপর মাথা রাখতে হয় । শ্লোগান দিতে খুব ভাল লাগে । আর এত মানুষের গলায় শ্লোগানও এত বাতাসে যেন মুহূর্তে উড়ে চলে যায়, ভারী হয়ে আটকে থাকে না ।

সেই ছেলেটি শ্লোগানগুলোকে ধীরে-ধীবে সাধারণ থেকে নির্দিষ্টে নিয়ে আসে । এই শ্লোগানগুলি নতুন, তিস্তা ব্যারেজের উদ্বোধন উপলক্ষেই তৈরি । সরকারি দলগুলো টাড়িতে-টাড়িতে, বাগানে-বাগানে, বস্তিতে-বস্তিতে গত মাসখানেক ছোট-ছোট মিটিং করেছে, স্কোয়াড তুলেছে, ইউনিয়নের সভা, হাট মিটিং, হাট স্কোযাড কবেছে । ফলে, এই নতুন শ্লোগানগুলিও কিছু লোকের জানা হয়ে গেছে । কিন্তু স্থায়ী শ্লোগানগুলি যেমন না-জানলেও বলা হয়ে যায়, এই শ্লোগানগুলি তেমন নয় । এগুলো মনে রেখে বলতে হয় । আব, মনে যদি-বা রাখা যায়, বলতে গেলেই একটার পিছে আর-একটা চলে আসে ।

ছেলেটি এই সব শ্লোগান প্রথমে পুরোটাই নিজে-নিজে দিচ্ছিল । একটা-একটা করে । প্রথমবার দিয়ে হাতের ইশারা করছিল, পরের বার সবাই যেন একসঙ্গে দেয় । তারপর খানিকক্ষণ সেই শ্লোগানটিই পর পর চলে মুখস্থ কবানোর মত । তারপর আবার সেই 'বামফ্রন্ট সরকার জিন্দাবাদ', '...আবার কে' এই সব স্থায়ী শ্লোগানের পর আবার নতুন শ্লোগান ।

ছেলেটি বলে, 'উত্তরাখণ্ড-গোর্খাল্যান্ড নাহি চলে গা নাহি চলে গা' । হিন্দি শ্লোগান বলেই বাগানের লোকজন আগে গলা মেলায় । গ্রামের লোকজন প্রথমে একটু ইতস্তত করে এটা তাদের শ্লোগান কিনা বুঝে নিতে । তা ছাড়া, এই একই শ্লোগান গ্রামে দেয়া হয়েছে, 'উত্তরাখণ্ড-গোর্খাল্যান্ড চলবে না চলবে না ।' যারা সেটা জানে তারা বাংলাতেই জবাব দেয । ছেলেটি এই শ্লোগান খানিকক্ষণ চালানোর পর এই একই বিষয় নিয়ে নতুন শ্লোগানে যায়, 'উত্তরবঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবাদ রুখবোই রুখবো' । একই ছন্দে এই শ্লোগানের একটা হিন্দি চেহারাও আছে 'রুখনে হোগা, রুখনে হোগা ।'

কিন্তু 'বিচ্ছিন্নতাবাদ' এই একটি আওয়াজের জন্যে শ্লোগানটা যেন জমে না । পরের শ্লোগানটা হিন্দিতে-বাংলায় দুটোতেই জমে যায়, 'বাংলাকো পাঞ্জাব বানানা রোখনা হি রোখনা ।' 'রুখবই রুখব ।'

এদের শ্লোগান বলার নিজস্ব একটা ধরন আছে—সে গ্রামেরই লোক হোক আর বাগানেরই হোক । প্রথমে কিছুক্ষণ চেঁচামেচি করে গরম-গরম ভাব হয়ত কিছু ছেলেছোকরা এনে দেয় । কিন্তু যখনই দরকার হয়ে পড়ে অনেকক্ষণ ধরে টানা শ্লোগানের, তখনই এদের গলা একটা অদ্ভুত খাদে নেমে আসে, আর প্রায় গুনগুনের চাইতে সামান্য একটু উঁচু গ্রামে শ্লোগান চলতেই থাকে, চলতেই থাকে, কখনো না-থামার মত করে চলতে থাকে । এক দিকে যেমন সেই স্বরগ্রামকে কিছুতেই উঁচু করা যায় না, তেমনি, যেন এদের শ্লোগান দেয়া থামানোও যায় না ।

ছেলেটি এবার তার শ্লোগানগুলোকে আরো নির্দিষ্টতায় আনতে চায় । সে সেই স্থায়ী শ্লোগানগুলি আউড়ে এবার বলে, 'তিস্তা ব্যারেজ করল কে, বামফ্রন্ট সরকার আবার কে ?' 'তিস্তা ব্যারেজকা পানিলেক নয়া দিন আগেলাক', 'পাহাড় ও সমতলের ঐক্য জিন্দাবাদ'. 'গোর্খা-রাজবংশী ভাই ভাই জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ', 'গোর্খা-দেশিয়া-মদেশি একাই, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ', 'চা-বাগিচা কা মজদুর বস্তিলোককা দোস্ত ভুলো মত, ভুলো মত ।'

কিন্তু এই শ্লোগানগুলির মধ্যে এমন বাজনীতি নিহিত আছে যে কিছুতেই স্বচ্ছন্দ হতে চায় না। বেশ খানিকক্ষণ শ্লোগান চালানোব পব ছেলেটি থামে, পকেট থেকে রুমাল বেব কবে মুখ মোছে। সে থেমে যাওয়াব পবও কিন্তু ট্রাকেব ভেতব থেকে শ্লোগানের দোহারকিব গুঞ্জন উঠতেই থাকে—সে যে থেমে গেছে ওটা টের না পেযে কেউ-কেউ 'জিন্দাবাদ' 'জিন্দাবাদ' 'নাহি চলেগা নাহি চলেগা' বলেই যায়। এ-রকম দু-চারবার বলবার পর তারা বোঝে শ্লোগান থেমে গেছে।

সেই নাচাব দলের বাঁশিওযালা এই ট্রাকেই উঠেছিল। সে এই শ্লোগান পরবর্তী নীরবতাব সুযোগে হঠাৎ হাত উঁচু কবে বলে ওঠে, 'জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ', তাবপব আবাব চুপ কবে যায়। কিন্তু, সে হয়ত আশা করেছিল আবার কিছুক্ষণ শ্লোগান চলবে। তেমন শ্লোগান চলছে না দেখে সে যেন কিছু করাব উৎসাহ পায়। সে উঠে দাঁড়ানোব চেষ্টা করে কিন্তু পা দুটো এক করতেই বসে-বসে টলে যায়। সে বসে ছিল মেয়েদেব কাছে—টলে পড়তেই বাগানেব এক বুড়ি তার পিঠ ধবে সোজা কবে দিয়ে বলে, 'বাঁশি বাজাগে, বাজা।' আব মেযের দল খিলখিল হেসে ওঠে। বুড়ি পেছন থেকে লোকটার বাঁশি ধরা হাতটি তাব ঠোঁটেব কাছে তুলে বলে, 'হে-ই আওযারা বাঁশি বাজাগে, বাজা, হামবামন নাচ করবেক, বাজা।'

লোকটি বাঁশি ধরা হাতটি সবিযে নিয়ে বলে, 'হাম বাঁশি নাহি বাজায গা, হাম লেকচাব দেগা, বড়া লেকচাব।'

'তো দে কেনে, লেকচাব দে, বৈঠকে দে ঝুবরু, বৈঠকে দে', বুড়ি পেছন থেকে আস্তে-আস্তে তাকে সমর্থন দেয়।

'হ দেগা। হামবামন ইউনিযন তোড দেগা। কাহে? না, হামবামন আউর ই লাল ইউনিয়ন নাহি করেগা। হামরামন আদিবাসী হ্যায়। আদিবাসীবাজ কায়েম করনে হোগা। হামবামন ঝাড়খণ্ড পার্টিকা মদত করেগা। বুঝলেক? দেবপাড়া বাগানমে সব কোই ঝাড়খণ্ড হো গেলাক। হলেক কি না-হলেক, কহ, কহ, হলেক কি না-হলেক?'

সেই বুড়ি পেছন থেকে বলে, 'হলেক, হলেক, ব্যাস, লেকচাব খতম কর দে।'

একটা মেয়ে বলে ওঠে, হে ঝুবরু, খাড়া হোকে লেকচাব লাগা দে।'

ঝুবরু তাব বাঁশিসহ হাত বাতাসে খেলিয়ে বলে, 'নাহি, হাম আউর লেকচার নেহি দেগা, আভি হাম প্রেসিডেন্ট হোগেলাক, অউর ইউনিয়ন বাবু লেকচার দেগা। ইউনিয়ন বাবু, বোল দেও, লেকচার দেও।' বলতে-বলতে ঝুবরু নেতিয়ে পড়ে। পেছনেব বুড়ি একটু সরে গিয়ে তাকে আরো নেতিয়ে পড়ার কিছুটা জায়গা দেয। ঝুবরু পুবো শোয়াব জায়গা পায না বটে কিন্তু এর হাতের ফাঁক দিয়ে, ওর পায়েব ফাঁক দিয়ে নিজের শরীরটাকে এলিয়ে দিতে পারে। সকালের হাড়িয়ার নেশা এই আধো ঘুমে কেটে যাবে, বিশেষত ট্রাকের ওপবেব এই বাতাসে, যদি যেখানে নামবে সেখানে পৌঁছেই আবার হাড়িয়া না খায়।

শ্লোগান থেমে যাওযাতেই খানিকটা যেন দূরযাত্রার একঘেয়েমি ট্রাকটার মধ্যে এসে গিয়েছিল। অনেক দূর যেতে হবে, তাই কারো কোনো উত্তেজনা নেই। ঝুবরুর বক্তৃতার আয়োজনে একটু বদল আসতে না-আসতেই শেষ হয়ে যায়, ঝুবরু যে এত তাড়াতাড়ি তার বক্তৃতা শেষ করে দেবে, তা যেন ঠিক প্রত্যাশিত ছিল না। এখন এই ট্রাকের ভেতরকার ঝাঁকি, ট্রাকের ওপরের ঝোড়ো বাতাস, মাঝে-মাঝে ডালপালা থেকে বাঁচাতে মাথা নুইয়ে ফেলা—বিশেষত তাদের যারা ড্রাইভারের ছাদে বসেছে, এমন-কি বাগানের মেয়েদেব একটু-আধটু হেসে ফেলাও, যেন একঘেযে হয়ে এসেছে, এরই মধ্যে।

প্রথম-প্রথম বাস দুটোর পেছন-পেছন ট্রাকটা যাচ্ছিল, আস্তে-আস্তেই। কিছু দূর চলার পরই বোঝা গেল—বাসদুটোর পক্ষে আব-গতি বাড়ানো সম্ভবই নয়, আর ঐ গতিতে গেলে তিস্তা ব্যারেজে পৌঁছবে যখন, তখন, সবাই ফেরার ট্রাকে-বাসে উঠছে। এটা বুঝে ফেলার পর ট্রাক ড্রাইভার কয়েকবার হর্ন দিয়ে বাসদুটোকে পেরিয়ে এগিয়ে যায়। তখন দুই বাস থেকেই আবার আওয়াজ ওঠে, হাত দেখানো হয়, বিশেষত বাসের ছাদে যারা বসে আছে তারা হাত নাড়ায়। তারপর থেকে এই ট্রাকটা একাই যাচ্ছে।

দলগাঁও পেবিয়ে গেল।

দুশ নয়

চা-বাগান ঘিরে মিলিটারি

গয়েবকাটাব কাছাকাছি এসে ডান দিকে মোড় নিয়ে ন্যাশন্যাল হাইওয়ে ছাড়তে হল। এটা চামুর্চির বাস্তা—বিন্নাগুড়ি-বানারহাট হয়ে চামুর্চি গেছে। এই রাস্তা ধরে অনেকখানি গিয়ে ট্রাক বাঁয়ে ঘুরবে। আবার কিছুটা গিয়ে ল্যাটার‍্যাল রোড ধরবে—দুই ন্যাশন্যাল হাইওয়েকে যুক্ত করেছে যে-ল্যাটার‍্যাল বোড।

এই রাস্তাটা সরু, বোধহয় গর্তটর্তও একটু বেশি। তাই ট্রাকটাও আস্তে-আস্তে চলে, ঝাঁকি আর দুলুনিও একটু বেশি লাগে। কিন্তু একেবাবে ফাঁকা। যতদূব চোখ যায় ঝকঝকে রাস্তা চলে গেছে, সামনে কিছুই নেই। মাঝেমধ্যে উল্টো দিক থেকে দুটো-একটা ফাঁকা ট্রাক আসে—বাগানেব। সেই ট্রাকেব দু-একজন কুলি মাথা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে এই লোকভর্তি ট্রাকটাকে দেখে। কোনো বিস্ময় নেই। কিন্তু এত প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিস্তৃতির মধ্যে মানুষকে নিয়ে দৃশ্য বড় কম। তাই, কোথাও একজন মানুষ দেখলেও তাকাতে হয়।

রাস্তার পাশ দিয়ে গযেরকাটা নদী অনেক দূর পর্যন্ত চলে। নদী বলে বোঝা যায় না, তা ছাড়া ঝোপঝাড়ে ঢাকাও থাকে অনেকখানি। হঠাৎ এক-একটা জায়গায় ঝোপঝাড়হীন, খোলা, ছোট নালার মত নদীটাকে দেখা যায়, একটু উঁচু জায়গা থেকে বেশ মোটা ধারায় নীচে ঝরে পড়ছে, আর সেখান থেকে জল নিযে কেউ-কেউ কোথাও-কোথাও যাচ্ছে। খানিকটা এমন খোলামেলা বয়ে গিয়ে নদীটা আবার ঝোপঝাড়ে ঢেকে যায়।

কিন্তু নদীর ঐ খাতটা মাঝেমধ্যে দেখেই চমকে বুঝতে হয়, গাড়িটা একটু ওপর দিকে উঠছে, ঠিক পাহাড়ে না হলেও পাহাড়ের তলাব দিকে যেন। নদীটার উল্টো দিকে ট্রাকটা চলেছে, তাই যেন আরো বিশেষ করে বোঝা যায় কী ভাবে জমির একটু পাথুরে ঢাল বেয়ে নদীটা অত কম জল নিয়েও, অত সরু খাত দিয়েও লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে, আয়তনের চাইতে একটু বেশি খর বেগে।

মাদারি বসে ছিল ড্রাইভারেব চালের ওপরে আরো অনেকের সঙ্গে। সে বাচ্চা বলে, তাকে একটু পেছনে সকলের মাঝখানে বসানো হয়েছে, যাতে আচমকা ধাক্কায় সামনের দিকে হোঁচট না খায়, বা ট্রাকটা গর্তটর্তের মধ্যে পড়ে দুলে উঠলে পিছলে না যায়। পেছন দিকে গেলে ত লোকের মাথায পডবে, কিন্তু সাইডে হড়কালে ত রাস্তায়।

ট্রাকে-বাসে যেমন হয়—চলার আগে মনে হয় আর-একটা লোকও আঁটবে না, আর চলা শুরু করলে দেখা যায় প্রত্যেকেই একটু না-একটু জায়গা পেয়েই গেছে আর কিছুটা জায়গা যেন ফাঁকা থেকে যায়। কিন্তু সবটাই ঘটে, একটা সীমার মধ্যে। যেমন, যারা ট্রাকে ডালার ওপর বসে আছে লাইন দিয়ে, তারা ডালাটাকে দুই হাতে চেপে, সামনে ঝুঁকে ট্রাকের ঝাঁকুনি সামলাচ্ছে। সে-ভাবে খানিকটা যাওয়া যায় কিন্তু এ-রকম মাইলের পর মাইল কি আসা যায় ? গয়েরকাটা পর্যন্তই ত প্রায় বিশ মাইল, তার পর এই রাস্তা আরো কত মাইল কে জানে। ডালার ওপর বসে থাকতে-থাকতে ব্যথা লাগে। তখন পা-দুটো ছড়িয়ে দিতে ইচ্ছে হয়। ছড়িয়ে দেয়ার জায়গাও আছে। কিন্তু তারপরই ট্রাক এমন ঝাঁকি খায় যে পা গুটিয়ে এনে শরীরের ভার সামলাতে হয়। এব মধ্যে দু-একজন ডালার ওপর থেকে পিছলে পাটাতনের ওপর বসে পড়েছে। জায়গাও হয়ে গেছে। অনেকে দাঁড়িয়ে পড়েছে—সামনের কারো ঘাড় ধরে টাল সামলাতে-সামলাতে। কিন্তু ট্রাকের ওপর দাঁড়িয়ে টাল সামলানো মুশকিল—একটা লোহার শক্ত কিছু থাকলে ভাল হয়। ড্রাইভারের কেবিনটার পেছনের দেয়ালে হেলান দিয়ে যারা ট্রাকের মাথার দিকে বসেছে তারা ঐ লোহার রডগুলো ধরতে পারে, যা দিয়ে ট্রাকের ডালাগুলো এঁটে রাখা।

রাস্তায় এমনি ট্রাক-বাসের চাইতে মিলিটারির গাড়ি যেন বেশি। খাকি রঙের মিলিটারি ট্রাকগুলো ছুটতে-ছুটতে ফাঁকা চলে যাচ্ছে। একটা জায়গায় মিলিটারির তাঁবু পড়েছে, অনেকগুলো ট্রাক মাঠটার একপাশে লাইন দিয়ে ; এক জায়গায় মিলিটারিরা গোল হয়ে বসে, আর একটা মিলিটারি কিছু বলছে।

বিন্নাগুড়ির কাছাকাছি আসতেই রাস্তার চেহারা বদলে যায়, আরো ঝকঝকে আর চওড়া। রাস্তার মুখে-মুখে চায়ের বড়-বড় পেটির মত কাঠের বাক্স উপুড় করা, তার ওপর আবার একটা তেকোনা কাঠের ফলকে কী সব লেখা। এই সব বাক্স আর লেখা প্রায়ই দেখা যায়, ঘন-ঘন। বেশ খানিকটা মাঠ

পরিষ্কার ঝকঝক করছে, তাতে বঙিন খুঁটি পোঁতা—এক-একটাতে এক-একভাবে। রঙ যেন সদ্য লাগানো হয়েছে এতই জ্বলজ্বলে। এ-রকম মাঠ প্রায়ই দেখা যায়।

বিন্নাগুড়ির মোড়েই আর-একটা রাস্তা পুবে বেরিয়ে এসেছে, যে-মাদাবিহাট থেকে এই ট্রাক এল সেই মাদারিহাটেরই দিকে, কিন্তু নিশ্চয়ই মাদারিহাট থেকে খানিকটা উত্তরে। এই বাস্তাটি অনেক প্রাচীন। জলুশ ছাড়া, বাস ছাড়া, এমন-কি হাটবার ছাড়াও যাদেব বন-নদী এই সব পেবিয়ে-পেরিয়ে এই সব জায়গায় ঘুরতে হয়েছে কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো সাইকেল ঠেলে, তাবা জানে, এই বাস্তা গেছে দেওবুড়াপাড়া, শোভাবাম দিয়ে, তিনি নদী, বানগুড়ি নদী পেরিয়ে টোপাভাসা। এখন এখানে নেমে গেলে এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে-হেঁটে মাদাবিহাট পৌঁছে যাওয়া যাবে। এই পথে মাদাবিহাট থেকে নিয়মিত যাতায়াত করেছে এমন লোক এই ট্রাকে দু-চাবজন আছে। আজকাল এ-বকম যাতায়াত লোকজনেব কমে আসছে। এখন বাসরাস্তা অনেক বেড়েছে। এক বাস থেকে আব-এক বাস ধবে লোকে যাতাযাত কবতে চায়।

কিন্তু অনেক দিন ধরেই নাকি এই বাস্তাটা পিচ ঢেলে বড কবাব কথা চলছে। তা হলে বিন্নাগুড়ির সঙ্গে হাসিমারাব একটা সরাসবি আলাদা রাস্তা চালু হতে পারে—আবো ফাঁকায়-ফাঁকায়, আরো গোপন। বিন্নাগুডিতে, হাসিমারাতে—দুই জাযগাতেই দরকারে এমন-কি প্লেনও নামে। যদি এই বাস্তাটা তৈবি হয়ে যায় তা হলে আর ন্যাশন্যাল হাইওযে দিযে সেই সব দরকাবে চলাচল কবতে হয না। বরং সকলের চোখের আড়ালে সহজেই এই বাস্তাটা ব্যবহাব কবা যায়।

আর, তাতে ত শুধু বিন্নাগুডি-হাসিমাবা সংযোগই হবে না। আসলে সেই চালসাব মোড থেকে ল্যাটাব্যাল বোড ধবে বিন্নাগুডি পর্যন্ত এসে যে-সব কনভযেব যাবার দরকার, সোজা হাসিমারা চলে যেতে পারে—কারো চোখে না পড়ে। শিবক পাহাডেব পবে তিস্তাব পশ্চিম পারে ফবেস্টেব মধ্যে বিবাট ক্যাম্প ফরেস্টের ভেতর দিযে-দিয়ে সেই বাগডোগবা প্লেন ঘাটিব কাছে ব্যাঙডুবি পর্যন্ত গেছে। পশ্চিমে ব্যাঙডুবি আর পুবে হাসিমাবা—শিলিগুড়ির কাছ থেকে জলপাইগুডির প্রায় পুব সীমাব কাছাকাছি পর্যন্ত সেনাবাহিনীর কর্তৃত্বাধীন অঞ্চলটা তাহলে নিজেদেব বাস্তাঘাট ও যানবাহন নিয়ে স্বাবলম্বী হয়ে যেতে পাবে। এখন বিন্নাগুড়ি পর্যন্ত সেই স্বাবলম্বন ঘটেছে কিন্তু তাব পুরে আব এগতে পাবছে না। বা, হযত ইচ্ছে করেই এগচ্ছে না। শোনা যায়, কযেকটা নদীর ওপব ব্রিজের জন্যে নাকি বাস্তাটা আটকে আছে। এদিকেব কোনো রাস্তাই ত ব্রিজ ছাডা, ক্যালভার্ট ছাডা তৈবি কবা যায় না। মিলিটারি ইচ্ছে কবলে ডাবড়ব আর শুখাতিতি-ব মত নদীর ক্যালভার্ট বানাতে কতক্ষণ?

বিন্নাগুড়ি দেখলে চোখ একটু জুডোয় সত্যি। কিন্তু এদিককাব ফরেস্টে-ফরেস্টে বা বাগানে-বাগানে যাবা ঘোবে, কাজ করে, এই ফরেস্ট আব বাগানই যাদেব জীবিকা জোগায়, তাদের কাছে নতুনত্ব যা তা মিলিটারির খাকি বঙে। বাকিটা অনেকখানিই চেনা। ফবেস্টের রেঞ্জ অফিস, রেঞ্জাব ও অন্যান্যদের কোয়ার্টারগুলো ত এ-রকমই দেখতে ঝকঝকে। এগুলো ইটের, সিমেন্টের, ওগুলো কাঠেব। কিন্তু প্রত্যেকটিরই সামনে তারেব বেড়া, কাঠেব দেয়ালে বছব-বছর বঙ পড়ে, টিনে লাল রঙ।

বরং মিলিটারি ক্যাম্পগুলো যেন অনেকটা চা-বাগানের মতই দেখতে, ফরেস্টেব মত ততটা নয়। চা-বাগানগুলোতে দেয়াল ইটের আর সিমেন্টের, চালের টিন লাল রঙের। স্কুল, হাসপাতাল, ফ্যাক্টরি-অফিস, ওজনের জায়গা—এই সবের সামনেই অনেকখানি করে সবুজ মাঠ, তার দিয়ে ঘেবা। দু-একটা জায়গায় ফুলবাগানও। বাস্তাগুলোও পিচ ঢালা, বা অন্তত কাঁকর ঢালা।

একই রকম দেখতে এই চা-বাগানগুলোই মিলিটারি ক্যাম্পগুলোকে ঘিরে বেখেছে, নাকি, মিলিটারি ক্যাম্পগুলোই চা-বাগানগুলোকে ঘিরে রেখেছে?

দুশ দশ

ট্রাকের ভেতরে নির্জনতার গান

গয়েরকাটা থেকে ডান দিকে ঘুরে এই রাস্তাটা ধরতেই কিছুক্ষণের মধ্যে যেন ট্রাকটাব ওপর নির্জনতা চেপে বসে—যে-নির্জনতা থাকে দূরযাত্রী ট্রেনের কামরায়। ন্যাশন্যাল হাইওয়ে দিয়ে আসতে-আসতে

নানা গাড়ির পাশ কাটাতে হয়, তাদের পাশ কাটিয়ে নানা গাড়ি যায়, উল্টো দিক থেকে কত গাড়ি গায়ে বাতাস ছুঁড়ে দিয়ে চলে যায়। কিন্তু এ-রাস্তায় তেমন কিছুই নেই, প্রায় একা-একা মাইলের পর মাইল যাওয়া, মাইলের পর মাইল। কখনো-কখনো পাওয়া বাগানের ট্রাক আর মিলিটারির ট্রাকে সেই একাকিত্ব ঘোচে না। বরং মনে হতে থাকে যে তারা এই নির্জনতা দিয়ে আরো নির্জনতায় যাবে। ফরেস্টের ভেতর দিয়ে একা-একা মাইলের পর মাইল হাঁটতে এ-রকম নির্জন লাগে, বা পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসতে, বা, এমন-কি চা-বাগানের ভেতর দিয়ে ভেতর দিয়ে কোথাও যেতে, বা বর্ষায় জল এসে ভাসায় এমন এক শুখা নদীর খাত ধরে-ধরে নিধুয়া কোনো পাথার পার হতে। এই ট্রাকে উঠে যারা এখন দল বেঁধে তিস্তা ব্যারেজে যাচ্ছে, তাদের সবাইই এমন নির্জনতায় আজন্ম অভ্যস্ত। তারা নিজের নিজের মত করে জানে, এই নির্জনতা কেমন করে কাটাতে হয়। যে-মেয়েগুলো হাটখোলাতে নাচছিল, তারা এখন পরস্পরের কাঁধে মাথা দিয়ে হেলে থাকে। কেউ-কেউ আবার পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ট্রাকের টাল সামলায়। চোখ খোলা রাখে যেখানে চোখ যায় সেখানে। সে-রকম ভাবেই কেউ একজন গান ধরে কেমন গুনগুন কান্নার মতন সুরে। কে গায় বোঝা যায় না, কিন্তু সুরটা বোঝা যায়। সেই সুরটা যেন দীর্ঘ একা যাত্রার সঙ্গ দেয়।

এই ট্রাকের ঝাঁকানিতে গানের সুর কেটে যায়, হঠাৎ একটা জায়গা উঁচু হয়ে যায়, আর একটা জায়গা পড়ে যায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও সুরটা সুরই থাকে। যে গানটা শুরু করেছিল, তার গলা থেকে কখন আর-একজন সুরটা নিয়ে নিয়েছে বোঝাই যায় না—গুনগুনানি কান্নার সুরের পার্থক্য এতই কম। কিন্তু, তারও পরে, কখন, দেবপাড়া চা-বাগানের এই সব মেয়েরাই একে অন্যের পিঠে বা ঘাড়ে মাথা হেলিয়ে ট্রাকের ওপর দুলতে-দুলতে একসঙ্গে কান্নার সুরে সেই গানটা গেয়ে যায়।

মাসি, তুই আর ভাল কম্বল খুঁজিস না,
সব কম্বলে একই লোম,
সব লোমে একই উকুন,
সারা রাত জেগে থাকি আর উকুন কুটুস কুটুস করে কামড়ায়,
নাকি উকুন কামড়ায় বলেই সারা রাত জেগে থাকি।
মাসি তুই আর হাট থেকে
উকুন মারা তেল আনিস না
নইলে, সারা রাত আমাকে কামড়াবে,
এমন উকুন আর আমি কোথায় পাব ?
এমন উকুন আর আমি কোথায় পাব ?

এই গান অনেকক্ষণ ইনিয়ে-বিনিয়ে চলে। কখনো দশজন গলা দেয়, কখনো-বা দশজনই এক সঙ্গে থেমে যায়, নতুন দুজন নতুন লাইনটা গেয়ে ছেড়ে দেয় ; আবার হঠাৎ সবাই মিলে পুরনো লাইনটাতেই ফিরে যায়—সবাই যেন ডুকরে ওঠে উকুনের শোকে, আবার সবাই একজনের কাছে গানের সুতো ছেড়ে দেয়। এ যেন তাদের অলস সময়ের খেলা—দীর্ঘপথ হাঁটতে-হাঁটতে যে-আলস্য আসে।

হঠাৎ একটা মেয়ে সোজা হয়ে বসে বলে, 'চা-বাগানের গ্যামাক্সিন এখন আবার উকুনও খেয়েইছে, থাকার জন্যে পোকারা এখন গাছের পাতাও পায় না, হায় রে এর পর পোকাগুলো থাকবে কোথায় ?'

মেয়েটি কথা-বলার মত করেই বলে, বলেই তার মাতৃভাষায় সে গানটি গায়। কিন্তু সে-ভাষা শোনা যেতে পারে মাত্র, তার অর্থ ত বুঝতে হবে এই বৃত্তান্তপাঠকের নিজের ভাষায়। হায়, সেই মেয়েটি ত এ বৃত্তান্তের পাঠক নয়। মেয়েটির মুখের কথার মানেটা গানের মানের সঙ্গে এমনই এক হয়ে যায় যেন মনে হয় মেয়েটা তার মা-ঠাকুমা, ঠাকুমার ঠাকুমার কাছে মধ্যপ্রদেশ থেকে বিহার পর্যন্ত অরণ্য-পাহাড়ে ছড়ানো এই যে-গানটি পেয়েছিল সেটাতে নতুন লাইন যোগ করে দিচ্ছে। অথবা হয়ত এই ট্রাকে সেই প্রাচীন গানটাও একঘেয়ে লাগছে, সেই গান গেয়েও আর একঘেয়েমিটা কাটছে না। তাই সে আসলে ঐ পুরনো গানটাকেই বাতিল করছে এই কথাগুলো বলে। গানের সম্প্রসারণ, না, বর্জন, তা বুঝতে না-দিয়ে, বা নিজেরাও না-বুঝে, মেয়েদের দলটা একসঙ্গে হেসে ওঠে, হেসে উঠতে-উঠতে সোজা হয়ে বসে, আবার হাসে, তাদের গায়ে গা ঘষা একাকিত্বেই।

কিছুক্ষণ দল বেঁধে হেসে মেয়েরা গানটা ছেড়ে-ছেড়ে দেয়। এখন, তারা গানের চাইতে হাসতে যেন

আনন্দ পায় বেশি। তারপর এক সময়ে সেই হাসিটাও থামে। ট্রাকটার ভেতরে কিছুক্ষণের জন্যে যে-পরিবর্তন এসেছিল, তা বাতাসে-বাতাসে ঝাঁকুনিতে-ঝাঁকুনিতে শেষ হয়ে যেতে থাকে। আবার সেই দোলা, পা ছড়ানো, পা গুটানো, কিছু ধরে নিজের শরীর সামলানো। আবার সেই নির্জনতার ভেতব ট্রাকটা ঢুকে যায়।

রাজবংশী মেয়েরা বসে ছিল ট্রাকের পেছন দিকটাতে। সেখান থেকে সেই একক গুনগুনে একটা গানের মত আওয়াজ ওঠে। গানেব সুরে সবাই ভাবে, দেবপাড়ার মেয়েরাই বুঝি আবার গান ধরল। কিন্তু সুরটা একটু এগতে-পেছতেই বোঝা যায়—না, এখন গাইছে রাজবংশী মেয়েরা। গলাব কী একটা খাঁজে তারা ধরা পড়ে যায়। দেখতে-দেখতে সে-গানটাতেও সুরের পব সুর এসে জড়ো হয়। মাথা নিচু করা, মাথায় ঘোমটা দেয়া ঐ ভিড়টা থেকে গানটা যেন ওপরে উঠে আসে। একটা মেয়ে মা-র কোলে শুয়ে পড়েছিল, সেও উঠে গান ধরে।

আকাশ ত পরিষ্কার হয়ে গেল,
কাল মুবগিটা শাদা হয়ে গেল,
নাকি কাল মুরগিটাকে ঢাকা দিয়ে
শাদা মোরগটা তার পাখনা মেলে দিল
আর ঝুঁটিটা ফোলাল।
আর সারা বাতের পর তোর সময় হল রে বিদেশিযা বন্ধু,
পান-সুপুবি নিয়ে আমাব গোসা ভাঙানোব ?

চাপা কান্নাব সুরে এই গোঁসা-ভাঙানো চলতেই থাকে ট্রাকে ঝাঁকি-দুলুনিব সঙ্গে-সঙ্গে। কিন্তু বানাবহাট আসতেই গোঁসা ভেঙে যায়। ডান দিক দিয়ে সোজা চামুর্চির রাস্তা চলে গেছে, সামনে বানারহাট বাজার, রেল স্টেশনের ইশারা পাওয়া যায়, প্যাঁক প্যাঁক করে কিছু রিক্সা যায়, তাবপরই খোলা মাঠে তিনটি ট্রাক আর অনেক লোক, ঝাণ্ডা, ফেস্টুন। এই ট্রাকটাকে দেখেই মাঠেব লোকবা দৌড়ে রাস্তাব পাশে আসে, চিৎকার কবে হাত নাড়াতে থ.কে—এই ট্রাকটাব গতি একটু কমে আসে। এতটাই কমে যে ট্রাকের আর মাঠের লোকজনের মনে হয়, ট্রাকটা বোধহয় থেমেই যাবে। ট্রাকেব লোকজনও দাঁড়িয়ে পড়ে মাঠের লোকজনের দিকে হাত নাড়ায়।

মাঠে ঢোকাব ক্যালভার্টটা পেরিয়ে যেতেই বোঝা গেল ট্রাকটা দাঁড়াবে না। তখন মাঠেব লোকজন আবার দৌড়ে এগিয়ে এসে হাত নাড়ে। মাঠের ভেতর থেকে হঠাৎ শ্লোগান ওঠে, 'বামফ্রন্ট সবকার জিন্দাবাদ', 'চলো, চলো, ব্যারেজ চলো', 'ব্যাবেজমে আজ কিয়া হোগা, লহর লহর লহর দেগা।'

ট্রাকেব লোকজনও দাঁড়িয়ে উঠে শ্লোগান দিতে থাকে। কে কোন শ্লোগান দিচ্ছে বোঝা যায় না, কিন্তু অতগুলো মানুষের সমবেত গলার আওয়াজে এতক্ষণকার নির্জনতা ভেঙে যায়। একে বানারহাটেব আধা-শহুবে চেহাবা, তার ওপর সারি দিয়ে দাঁড়ানো একই মিছিলের ট্রাক, মাঠভর্তি লোক—সব মিলিয়ে হাটখোলার সকালের অবস্থাটা যেন ফিরে আসে—সবাই মিলে যেন কোথাও যাওয়া হচ্ছে, কিছু করা হচ্ছে। এই ট্রাকের এতগুলো মানুষ এতক্ষণ যেন বড় একলা ছিল, এখন তাদের সেই একলা ভাবটা কেটে যায়।

বানারহাটটা পেরনোর পর আবার চা-বাগান শুরু হয়। সেই চা-বাগানের পাশ দিয়ে একটা ট্রাক রঙে ঝলমল করতে-করতে এগিয়ে যাচ্ছে। যেমন নদীতে হয়, পেছনের নৌকো সামনের নৌকোর সঙ্গ নিতে চায়, এই ট্রাকটা গতি বাড়ায়। আর ট্রাকের ওপরের লোকজন শ্লোগান ধরে—'…জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ'। কিন্তু বাতাস ত ট্রাকেব শ্লোগান পেছনে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

দুশ এগার

মাদারির মা মানুষের গন্ধ শোঁকে, আওয়াজ শোনে

সেই শুরু, বাকি পথটা আর তাদের কখনো সঙ্গীর অভাব হয় না। বানারহাট থেকে সোজা গিয়ে ল্যাটার‍্যাল রোডে উঠতে হবে। বানারহাটের পর থেকেই তারা দেখে সামনে দূরে কোনো ট্রাক যাচ্ছে,

বা, তাদেব পেছনে কোনো ট্রাক আসছে। গযেবকাটা থেকে ল্যাটার‍্যাল রোডের মাইল পনেব-ষোলব দূরত্বে বানাবহাট পাব হয়ে দূবে দূবে ছড়ানো-ছিটনো ট্রাকের সঙ্গ সংখ্যার দিক থেকে হযত তেমন কিছু নয় কিন্তু আর-একটা ট্রাক দেখলেই কেমন উৎসাহ আসে। সবগুলো ট্রাক একই দিকে যাচ্ছে, সবাই একই শ্লোগান বলছে, যে-কোনো ট্রাকের সঙ্গে যে-কোনো ট্রাক বদল করে নিলেও কিছু এসে যাবে না—এতে দূরত্ব আর দূবত্ব থাকে না।

মাদাবির মা-র খুব ভালো লাগে।

তাকে ট্রাকে তুলে যেখানে বসিয়ে দেযা হয়েছিল, সে সেখানেই বসে আছে। এটা দেবপাড়ার মেয়েদেব ভেতরেই একটা কোণ। কোণ হওয়ায মাদারিব মা-ব খুব সুবিধে হযেছে। সে ড্রাইভারেব কেবিনেব পেছনের দেযালটাতে হেলান দিতে পারছে। নইলে, সে হেলান দেযাব জন্যে আব-একটা ঘাড় পেত কোথায় ? আর, মাদারিটা আছে তাব মাথার ওপরে—ইচ্ছে কবলেই ডেকে মুখটা দেখে নিতে পারে, বা দাঁড়িযে ছুঁয়ে আসতে পাবে।

এই এত লোক, এত ট্রাক, এত মিছিল, এত আওয়াজ, এত কথা—এব ত কোনো মানেই নেই তাব কাছে। তাকে যেমন কেউ আজকেব মিছিলে যেতে ডাকত না, তেমনি সে-ও ত আজকেব মিছিলে আসত না, কোনোভাবেই আসত না। মিছিলেব সঙ্গে তাব কোনো সম্পর্কই নেই। ফরেস্টেব অজস্র লতাপাতা, গাছ, ঝোবা—এব সঙ্গে তার সম্পর্ক এমন সর্বাঙ্গীণ ও দৈনন্দিন যে সেই সম্পর্কেব বাইবে তার পক্ষে আসা সম্ভবই নয। নেহাত মাদারি জেদ ধরল। আর মাদাবির মা এখনই মাদাবিকে একা-একা মিছিলে যেতে দিতে চায না। এখনই যদি মিছিলে চলে যায় মাদারি, তা হলে সে আব-একটা ছেলে পাবে কোথায় ? একটা ছেলে ছাড়া ত তার চলবে না। আজ না-হয সে সঙ্গে এল কিন্তু আব-বড জোব বছব দুয়েক, তারপর ত মাদারি চলে যাবেই—হাসিমারা, শিলিগুড়ি বা নেপাল—তখন ? তখন মাদারির মা ছেলে পাবে কোথায় ? একটা ছেলে পাবে কোথায় ? একটা ছেলে হতে ত বছব লাগে না, কিন্তু আবাব একটা ছেলে পেটে নেয়া যেন তাব পক্ষে ক্রমেই কঠিন হয়ে গেছে।

আরো একটা কথা মাদাবির মাযের মনে এসেছে। সে কোনোদিন এত দূবে আসেনি, এত বড মিছিলে আসেনি ! এত দূর-দূর থেকে যখন এত-এত লোক আসছে, তাব মধ্যে ত তার আট-না-দশটা ছেলেও থাকতে পারে, অন্তত কয়েকটা ত থাকতেই পারে। তারাও ত দূবে-দূরেই গেছে।

মাদারির মায়ের কাছে এই এত মিছিল, এত মানুষজন, এত হৈ-চৈ একদিক থেকে অর্থহীন হলেও সেই হাটখোলা থেকেই তাব কেমন ভাল লাগছিল। প্রথম দিকে না—যখন সে আব মাদাবি চা খায। কিন্তু দেবপাড়ার দলটা এসে যাওয়াব পরই ঐ ভিড়ের মধ্যে ঘুরে-ঘুরে বেড়াতে তার ভাল লাগছিল। প্রত্যেকদিনই ত সকাল থেকে তাকে এরকম হাঁটাই হাঁটতে হয কিন্তু সে ত গাছপালাব লতাপাতার গা ঘেঁষে-ঘেঁষে। আর যদি, সে ফরেস্টেব ভেতর ঢুকতে কোনো-কোনো দিন একটু দেরিও কবে, ঐ শ্যাওড়াঝোরায় তার ঘরের মধ্যেও ফরেস্টের গন্ধটা ত তাকে ছাড়ে না, এমন-কি ঘুমেব মধ্যেও ছাড়ে না। সবুজের তীব্র এক কষা গন্ধ, তার সঙ্গে মিশে যায় ফরেস্টেব ভেতর কত পচনেব গন্ধ—শুকনো পাতা পচে, মৃত পশু পচে, কাল বাতে গাছ চাপা পড়া লতা পচে। তার সঙ্গে থাকে এমোনিযার ঝাঁঝ। আর মাদারির মাকে সেই মিশ্র গন্ধের মধ্যে সব সময় শ্বাস টানতে হয়।

সে যে এই গন্ধ সম্পর্কে সচেতন, তা নয়। এমন-কি গন্ধটা যে আছে, তাও তার খেয়াল থাকে না। এ-রকম অপ্রয়োজনীয় খেয়াল রাখার অবকাশ তার জীবনযাপনে নেই। কিন্তু সেই হাটখোলা থেকেই এত মানুষের ভিড়ে ঘুরতে-ঘুরতে তার কখন যেন হালকা লাগতে শুরু কবে, একটু হালকা ভাবে শ্বাসও টানতে পারে যেন। তার পর এই ট্রাকে এত মানুষজনের ভেতরে বসে রাস্তা দিয়ে মাইলের পর মাইল চলে আসতে-আসতে তার শ্বাসটা আরো হালকা হয়, আরো হালকা। তাব জীবন কাটানোব নকশা এমন নয় যে একটু দুঃখবিলাস করে, শ্যাওড়াঝোরার কথা তার মনেও আসে না, বা, তার বর্তমান এই মুক্তির সঙ্গে সে শ্যাওড়াঝোরার তুলনাও করতে যায় না, কিন্তু, তার বড় ভাল লাগে এত মানুষের সঙ্গ, এত মানুষের চামড়ার গন্ধ।

মাদারির মা ত মানুষের এই সঙ্গটাই পায় না। এখন, এই মিছিলে, এই ট্রাকে মানুষই তার কাছে প্রধান। যে-মানুষের কাছ থেকে তার দৈনন্দিনেব আহার জোটে না বলেই সে ফরেস্টে গিয়ে গাছপালা পশুপাখি কীটপতঙ্গ আর নদীঝোরার সঙ্গে থাকে, সেই মানুষেরই গায়েব গন্ধ তাকে এক মুক্তির স্বাদ

দেয়, তার এখনকার দৈনন্দিনের গন্ধের চাপ থেকে তাকে সরিয়ে আনে। সেই সরে আসাটা আস্বাদ করতে মাদারির মা, মাঝে-মাঝে গভীর শ্বাস টানে। একজন লোকও নেই যার সঙ্গে সে এখানে কথা বলতে পারে। হাটের দু-চারজন দোকানদার এলে হয়ত তাকে মাদারির মা বলে অন্তত চিনত, এখন, এক বাহাদুরই চেনে বা দরকার হলে ডাকতে পারে। তার নাম ধরে ডাকতে পারে এমন একজনও না থাকা এই ভিড়ে তাকে ত চুপচাপই বসে থাকতে হয়, এক কোণে। বা, হাটখোলায় যেমন ভিড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, এই জলুশ যেখানে নামবে সেখানেও হয়ত একা-একা ঘুরেই বেড়াবে অথচ সঙ্গ পাবে, মানুষের।

যেমন মানুষের গায়ের গন্ধ থেকে মাদারির মা সঙ্গ পায়, তেমনি সঙ্গ পায় মানুষের আওয়াজ থেকে। ফরেস্টের প্রত্যেকটা আওয়াজ ত তার জানা। শুধু শ্যাওড়াঝোরায় তার পাতার ঘরের চারপাশের আওয়াজ নয়, তার ঘর থেকে অনেক দূরে ফরেস্টের ভেতরের আওয়াজগুলোও তার চেনা—মাদারির শ্বাসের মতন চেনা। ফরেস্টে কোনো আওয়াজ অকারণ ঘটে না। প্রত্যেকটা আওয়াজের একটা কারণ থাকে, ইতিহাস থাকে। ফরেস্টের পশুপাখি পোকামাকড় এই প্রতিটি আওয়াজের কারণ ও ইতিহাস জানে, বোঝে। তাদের শরীর দিয়ে জানে, শরীর দিয়ে বোঝে। আর, শরীর দিয়েই সেই আওয়াজের অর্থের সঙ্গতিতে নিজেকে বদলায়। শরীর দিয়ে যে ফরেস্টের আওয়াজ চেনে না আর শরীর দিয়ে সে-আওয়াজের প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে না—সে ফরেস্টে থাকতে পারে না। কিন্তু মাদারির মা ত আর পশুপাখি কীটপতঙ্গ নয়। তার মানুষের শরীরে ফরেস্টের ঐ আওয়াজ নিশিদিন গ্রহণবর্জনের ত একটা শারীরিক সীমাও আছে। কত লক্ষ বছর আগে মানবজাতির শরীর থেকে যে-আওয়াজ শোনার অভিজ্ঞতা লুপ্ত হয়ে গেছে, এক মাদারির মা-র শরীরে তা ত আর সঞ্চিত রক্ষিত থাকতে পারে না, শুধু এই সুবাদে যে গ্রাম-শহর ইত্যাদি কোথাও কোনো মানববসতিতে তার জায়গা জোটেনি এবং এক ফরেস্টই তাকে জায়গা দিতে পেরেছে। সব বাঁদর ত আর মানুষ হয়ে যায়নি, তেমনি, সব মানুষই ত আর গ্রামশহরে চলে যায়নি—এই যুক্তিতে মাদারির মা ত আর নিজের শরীরে লক্ষ বৎসর আগের আরণ্যক স্মৃতি বহন করে যেতে পারে না। মিছিলের এই মানবিক কলরোল তার ভাল লাগে। এই যে সবাই মিলে একটা কথা ধরে গানের মত চেঁচিয়ে ওঠে—তার ভাল লাগে। বর্ষার নদীর চাইতেও, বা আকাশের মেঘের চাইতেও, গমগমিয়ে এই আওয়াজ যে আকাশে উঠে যাচ্ছে—তার ভাল লাগে। এত মানুষের গলার এত কথা—তার ভাল লাগে।

রাতদিন, দিনরাত, মাসবছর, বছরমাস ঝিঁঝির ডাকে আচ্ছন্ন তার কানে এই মানবিক সমবেত স্বর এক পরিচিত বিভ্রম আনে, জেগে-জেগে স্বপ্ন দেখার মত বিভ্রম। এই এত মানুষের এত আওয়াজ তাকে সেই বিভ্রমে জাগায়।

আর, এখন যেন এই আওয়াজটা আরো দূরে-দূরে ছড়িয়ে যাচ্ছে। একটা পাহাড়ের ইশারা মাঝেমধ্যে সামনের ফরেস্টের গাছপালার ওপর দিয়েও কখনো-কখনো দেখা যায়। ট্রাকের চাকার তলার মাটিটা ইতিমধ্যেই হয়ত চড়াই ধরেছে। হঠাৎ-হঠাৎ ডাইনে-বাঁয়ে একটু উঁচু দিয়ে যেন একটা ট্রাক চলে যায়। চা-বাগানের সবুজ বা মাঠের সবুজের সঙ্গে ট্রাকের সবুজ মিশে থাকে, শুধু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কোনো-কোনো ট্রাকের ওপরের ঝাণ্ডা আর মানুষজনের রঙিন পোশাক। মাঝখানে সবুজের পার্থক্য রেখে এই ট্রাক আর দূরের সেই ট্রাকটা যেন অনেকক্ষণ সমান্তরালে চলে।

তারপর আড়ালে পড়ে যায়।

দুশ বার

পাহাড়, খাদ, নদী, ব্রিজ

ট্রাকটা একটা আওয়াজ করে খানিকটা উঁচুতে ওঠে, তারপর বাঁ দিকে ঘুরে যেতেই সামনে চকচকে এক কাল রাস্তা আর ডান দিকে, হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায় এমন দূরত্বে পাহাড়, নীল পাহাড়। মাদারি, তার সামনে যারা বসেছিল তাদের দুজনকে দুহাতে একটু সরিয়ে মাঝখান দিয়ে মাথাটা গলিয়ে দেয়, তারপর

ডান দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে একবার পাহাড় দেখে, আর একবার রাস্তা দেখে। মাদারি যেন বুঝে উঠতে পারে না, তার পক্ষে কোনটা বেশি আকর্ষণীয়। রাস্তা ত তার কাছে নতুন কিছু নয়, ফরেস্টের মতই চেনা, তবু এ-রাস্তাটা নতুন লাগে কেন ? খোলা রাস্তা—ওপরে আকাশ আর নীচে রাস্তা, এটা ত সে সেই বিন্নাগুড়ি থেকেই দেখে আসছে। কিন্তু এখানে রাস্তাটা যেন আরো খোলা হয়ে যায়—কারণ বাঁ দিকে খাদ, সেই খাদের ভেতর দিয়ে নদী বয়ে যায় মাঝে-মাঝেই, আর, সেই খাদটা দিয়ে বহুদূরে তাকানো যায়—বহুদূরে নীলচে ফরেস্ট। সঙ্গে-সঙ্গে ডান দিকে মেঘের মত পাহাড়। খানিকটা যেতেই মাদারি বোঝে পাহাড়টা খুব কাছাকাছি নয়। কিন্তু পাহাড়ের গা বেয়ে যে-থিকথিকে জঙ্গল নেমে এসেছে সেটা বোঝা যায় অথচ তার সবুজ রঙ চেনা যায় না। ট্রাকটা নতুন রাস্তায় এত জোরে চলে যে মনে হয় সঙ্গে-সঙ্গে পাশের পাহাড়টাও দিক বদল করছে। মাদারি সামনের দুজনের ফাঁক দিয়ে তার গলা এতটাই বাড়ায় যে দুই হাত দিয়ে তাকে সামনে ভর সামলাতে হয়। বাঁয়ের যুবকটি বলে, 'কী দেখিছিস রে ?'

'পাহাড়, পাহাড়'

'আগত দেখিস নাই কোটত ?'

'না দেখি। এই এত উঁচা পাহাড়ত কায় থাকে ?'

'মানষি থাকে—'

'নামিবার নাগে না ? ঐঠে ঢুকে ক্যানং করি ? এ্যানং ফরেস্ট যে নদীও সিন্ধাবার পারিবে না,' নদীও ঢুকতে পারবে না—এমন জঙ্গল—মাদাবি বলে। লোকটি হাসে, 'এইঠে দেখাছে এ্যানং। ঐঠে তুইও যাবার পারবু।'

মাদারি নিজে এ-রকমই একটা ফরেস্টের একেবারে ভেতরে থাকে কিন্তু সে ত কোনো দিন এতটা দূর থেকে সে-ফরেস্ট দেখেনি।

'পারবু ?' মাদারি, যেন সম্ভাবনাটাকে যাচিয়ে দেখতে চায়। তারপর সেই পাহাড়ের দিকে তাকিয়েই গভীর প্রশ্ন করে, 'নামিবু ক্যানং কবি, এ্যানং উঁচা ?'

'পথ আছে, পথ ধরি নামিবু, ঐঠেও ত মানষি থাকে—'

'থাকে ? মানষি ? ঐঠে ?' মাদারি জিজ্ঞাসা করে, তারপর একটু চুপ করে গিয়ে নিজে অপরিবর্তিত থেকেই চেঁচায়, 'হে মা, মা-ই-গে-এ।'

মাদারির মা সোজা হয়ে বলে, 'ক কেনে— ।' কিন্তু মাদারি শুনতে পায় না। সে ওপর থেকে চেঁচায়, 'হে মা, মা-ই-গে-এ, পাহাড় দেখছু, উঁচা পাহাড় ?'

মাদারির কথায় ট্রাকের সবাই হেসে ওঠে। মাদারির মা আস্তেই জবাব দেয়, 'দেখছু।' মাদারির জিজ্ঞাসায় সকলেই মাদাবির মায়ের দিকে একবার তাকিয়ে নেয় যেন। মাদারিব মা একটু অস্বস্তি বোধ করে—এতগুলো লোক তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে চোখ নামায়, আবার চোখ তোলে।

মাদারির মা যেখানে বসেছিল সেখান থেকে দেখায় যেন পাহাড়গুলো পেছন থেকে ছুটে আসছে। তাতে অনেক সময়ই পাহাডের চূড়া দেখা যায় না, মনে হয় আকাশ পর্যন্ত ঢাকা পড়ে আছে পাহাড়ে। আবার, কোনো-এক সময় পাহাড়ের দেয়ালটা ভেঙে যায় যেন। বরং বাঁ দিকে তাকালে সে দেখে টানা খাদ চলেছে, আর সেই খাদের ভেতরে, নদী, ঝোরা, চা-বাগান, চষা খেত, দূরে দূরে ফরেস্ট। নাগরাকাটার কাছাকাছি আসার পর দেখা যায়, আরো দুটো-একটা ট্রাক একই ভাবে চলেছে। তাদের কোনোটাকে এই ট্রাক পার হয়ে যায়, আবার কখনো পেছনের একটা ট্রাক, এই ট্রাকটাকে পার হয়ে যায়। পার হওয়ার সময় সেই আগের মতই হাত তুলে হৈ হৈ হচ্ছে, কখনো শ্লোগান বিনিময়ও হচ্ছে, কিন্তু, এই ট্রাকের লোকজন ত ততক্ষণে মাইল চল্লিশেক পার হয়ে এসেছে, প্রায় ঘণ্টা দেড়েক হল, ফলে এরা অনেক সময় হাত তুলেই সারছে।

বানারহাটের পর দূরে-দূরে ট্রাক দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু, এই রাস্তায় ওঠার কিছুক্ষণ পর মনে হল সব ট্রাকই এই রাস্তা দিয়ে চলেছে। অনেক জায়গায় দাঁড়ানো ট্রাকের পাশেও লোকজন দাঁড়িয়ে। তারা ট্রাকে করে ব্যারেজেই যাবে, নাকি কোনো হাটে, নাকি ওখানকার পাতি তুলে ট্রাকে করে ওজনের জায়গায় যাবে, তা বোঝা যায় না। কিন্তু হাত নাড়ানাড়ি, একটু চেঁচামেচি হয়েই যায়।

সেই মাদারিহাট থেকে বেরিয়ে এই রাস্তাটায় পড়ার পর মনে হচ্ছে তারা সেই তিস্তানদীর ব্যারেজের কাছাকাছি যেন চলে আসছে। তিস্তা ব্যারেজের উদ্বোধনের দিন এই জলুশের কথা তারা যখন থেকে

শুনেছে, টাড়ির বৈঠকে, লাইন মিটিঙে, হাট মিটিঙে, তখন থেকেই ত এই নদী, বাঁধ, জলের একটা কল্পনাকে তারা লালন করেছে। এই ট্রাকটা ত আসছে তোর্সা পার থেকে। তোর্সা থেকে তিস্তা। তিস্তার সঙ্গে ত তাদের দৈনন্দিন চেনাজানা নেই। সে-নদী তোর্সা থেকে বড় ও ভয়ংকর—পাহাড়টাহাড় ভেঙে, বনজঙ্গল উপড়ে, গ্রাম-শহর ভাসিয়ে চলে যায়। প্রত্যেক বছরই তাদের তিস্তার বন্যার কথা শুনতে হয়। সেই সব শোনা থেকে তাদেব কাছে তিস্তা ব্যারেজের যে-কল্পনা প্রশ্রয় পেয়েছে, এই পাহাড় আর এই খাদ, এই অপরিচিত প্রকৃতি যেন সেই কল্পনাটিকে সত্য করে তুলেছে। মনে হতে শুরু করেছে যে এই সব পাহাড়েরই একটা বাঁক থেকে তিস্তা একেবারে আকাশ ছাপিয়ে নামছে, তাদের ট্রাকটা হঠাৎ সেদিকে মুখ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে যাবে আব তাদেব দাঁড়িযে-দাঁড়িয়ে দেখতে হবে, তিস্তা, এই পাহাড়গুলির মতই, তিস্তা ব্যাবেজ।

তাবা যে তিস্তা ব্যাবেজেব কাছে চলে আসছে, সেটা মনে হওযাব আর-একটা কারণ এই রাস্তাটায় নদীর পব নদী, ব্রিজের পর ব্রিজ। ডান দিকটাতে পাহাড আর চডাই, বাঁ দিকটাতে খাদ। ফলে, একটু পব-পবই দেখা যাচ্ছে ডান দিক থেকে শাদা ফেনা-তোলা জল বড-বড পাথবে ধাক্কা খেয়ে লাফিয়ে উঠে এক-একটা রঙিন ব্রিজেব তলা দিয়ে বাঁ দিকে খাদের মধ্যে গিযে পড়ে বয়ে যাচ্ছে। এতগুলো নদীব ঝর্না হয়ে ঝবা আব নদী হযে বওয়া দেখতে-দেখতে এক-একটা ব্রিজ সাঁ সাঁ করে পেরিয়ে যায়—লংতি, চুযা পাথাং, ডাযনা, জলঢাকা, মূর্তি, নেওরা, জুর্তি। মনে হয়, এই বাস্তা গিয়ে থমকে শেষ হবে যেখানে তিস্তা পাহাড থেকে পাহাড ভেঙে নামছে।

চালসাব মোড়ে পুলিশ ট্রাক থামাল। মাদাবিহাট ছাড়াব পব সেই প্রথম থামা। সামনেও অনেকগুলি ট্রাক। থামল বলেই অনেকে উঠে দাঁড়িয়ে হাত-পা ছড়ায়। দু-এক জন নামতেও গিয়েছিল কিন্তু পুলিশ দেখে আব নামে না।

পুলিশ এসে জিজ্ঞাসা কবে—'কোথ থেকে আসছে ট্রাক? কোথ্ থেকে?' গলাব স্বরে ব্যস্ততা বোঝা যায়।

যাবা ডালাব ওপব বসে ছি‌ল, তাবা তখন দাঁড়িযে, প্রায এক সঙ্গেই বলে ওঠে, 'মাদারিহাট।'

'ড্রাইভাব কোথায? পাবমিট দেখি'—পুলিশ ড্রাইভাবেব কেবিনেব পাশে গিয়ে দাঁড়ায। ড্রাইভার একটা কাগজ হাতে-হাতে এগিযে দেয। সেটা দেখে ফেবত দিতে-দিতেই চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করে, 'লিডার কে আছে, ট্রাকে, লিডাব কে।' এব জবাব কী হবে বোঝাব জন্যেই পুলিশ যেদিক থেকে কথা বলছে সেদিকে বসা লোকজন সেই ছেলেটিব দিকে তাকায। ছেলেটি দাঁড়িযেছিল উল্টোদিকে, সে মেয়েদেব ভিডেব মধ্যে সাবধানে একটা পা দেয, তারপর আর-একটা পা দেয়াব জায়গা খুঁজতে-খুঁজতে সামনেব একজনেব ঘাড ধবে মুখ বাডিযে দেয—'কী ব্যাপাব?'

'আপনি নিযে যাচ্ছেন? নাম বলেন—'

'সুখেন্দু বায'

'বাগানেব লোক সব, নাকি বস্তিব লোক—'

'দুইই আছে—'

'একটু নাম দিতে পাববেন?'

'কী? এই প্রত্যেকেব নাম?'

'না। গ্রামেব আব বাগানেব। আচ্ছা, বাদ দেন। ওদলাবাড়িতে যদি চায় দেবেন। নেন, এই স্লিপটা রাখেন'—পুলিশের বাড়ানো হাত থেকে একজন কাগজটা নেয।

দুশ তের

শতাব্দী-সহস্রাব্দীর স্বাদ

চালসার মোড়ে পুলিশ সব গাড়ি আটকে চেক করে বলে গাড়ির একটা ভিড় হয়ে যায়। এই ল্যাটারাল রোডে আর ওদিককার ন্যাশনাল হাইওয়েতে গাড়ির লাইন পড়ে যায়—মাটিয়ালির দিকেব রাস্তাটা

ফাঁকাই। আর সব গাড়িই ত সোজা মাল হয়ে ওদলাবাড়ি যাবে—তাই ওদিক থেকে যে-সব গাড়ি এদিকে আসছে, সেগুলোকে পুলিশ আটকাচ্ছে না।

পুলিশ অবিশ্যি গাড়িগুলো বেশিক্ষণ আটকায় না। মিছিল-ছাড়া কোনো গাড়ি থাকলে সেটাকে রাস্তার পাশে সাইড করতে বলে মিছিলের গাড়ি ছেড়েই দেয়। কিন্তু ঐখানে দাঁড়ানোর ফলে আর পুলিশের স্লিপ নিয়ে ছাড়ার ফলে চালসা থেকে মালবাজার পর্যন্ত রাস্তা মিছিলের ট্রাকেই ভর্তি হয়ে যায়। মনে হয়, আজ এ-রাস্তায় আর-কোনো কিছুই ঘটবে না। আর, এতগুলো ট্রাক একসঙ্গে যাচ্ছে, এখন আর কেউ-কাউকে পেরিয়েও যাচ্ছে না, তাতে মনে হয় যেন ট্রাক দিয়েই মিছিলটা সাজানো হচ্ছে। মালবাজারের ভেতরে ত আর এই ট্রাকের মিছিল ঢোকে না—ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে সোজা বেবিয়ে যায়। মালবাজারের মোড়ে বিরাট গেট বানানো হয়েছে, তার ওপর বামফ্রন্টের লাল ঝাণ্ডাই উড়ছে। আর মোড়ের মাথাতেও লোকজন সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে। সেখানেও কিছু-কিছু ট্রাক, কিছু-কিছু মিছিল তৈরি হচ্ছিল বটে কিন্তু তখন রাস্তার মিছিলটাই প্রধান হয়ে উঠেছে। মালবাজার থেকেই আবার শ্লোগান শুরু হল।

কিন্তু এবারের শ্লোগানের জোর আলাদা। এক-একটা ট্রাকে কেউ বসে নেহ—সবাই দাঁড়িয়ে, গায়ে গা লাগিয়ে, এক হাতে পরস্পরের কাঁধ ধরে ট্রাকেব ঝাঁকি সামলাচ্ছে, আব-এক হাত আকাশে তুলে শ্লোগান দিচ্ছে। এমন ভাবে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে যে তাদের মুখটা বাইরের দিকে ঘোরানো। শ্লোগানের সঙ্গে-সঙ্গে নাচের ভঙ্গিতে কোমরেব ওপব অংশ আব হাঁটু দোলাচ্ছে।

কোনো-কোনো ট্রাকে আবার শুধুই মেযেবা। তারা তীব্র স্বরে গান গেয়ে যাচ্ছে, শ্লোগানেরই গান কি না কে জানে কিন্তু এই সাবি-সারি ট্রাকের নানা ধরনের শ্লোগানের ফাঁকে সেই সমবেত স্বরের তীব্রতা বাতাস চিরে দিচ্ছে।

দু-তিনটি ট্রাকে এন-সি-সি-রা পোশাক পরে যাচ্ছে। দু-তিনটি ট্রাকে ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা তাদের পোশাক পরে।

এখন মনে হচ্ছে তারা সেই ব্যারেজেব কাছাকাছি চলে এসেছে—সবাই মিলেই সেখানে পৌঁছনো হবে। আর, এই পৌঁছনোর একটা নিয়ম-শৃঙ্খলা আছে, একটা ছন্দ আছে—ইচ্ছে করলেও সেই শৃঙ্খলা বা ছন্দ কেউ এড়িয়ে যেতে পারবে না। মাদারিহাটের ট্রাকের ভেতর ওরা মালবাজারের পর থেকেই একটা বৃহৎ ব্যাপারে নিজেদের একটু-একটু করে হারিয়ে ফেলতে শুরু করে।

ওদলাবাড়িতে এসে ট্রাকটা থামে—কাবণ, আগের ট্রাকটা থেমেছে। থামার পব এই ট্রাকের ওপর থেকে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখা যায়, আরো সামনেরটাও থেমেছে। চালসার অভিজ্ঞতাটা আছে বলেই হয়ত এখানে একজন ট্রাক থেকে চাকা বেয়ে নেমে যেতে সাহস পায়। কিন্তু এগয় না। ট্রাকের কাছেই রাস্তার পাশে পেচ্ছাপ শুরু করে। করে আর মাঝে-মাঝেই উদ্বিগ্ন ভাবে বাঁয়ে তাকায়—আগের ট্রাকগুলো চলতে শুরু করল কিনা। ট্রাকের ভেতর থেকে একজন চিৎকার করে—'হে বেঙ্গু, কলখান খুলি রাখি চলি আয়।' আর-এক জন প্রায় নিদ্রিতস্বরে যোগ করে, 'বেঙ্গুর কলখান পাবলিক হেলথের কল না-হয়, ঘোষমশাইয়ের টিউবওয়েল, হ্যান্ডেল খাড়াই থাকে, নামিবার না-পারে।' যে-স্বরে এই মন্তব্য আসে তা শ্লেষ্মাজড়ানো। কিন্তু বেঙ্গুর পেচ্ছাপ শেষ হতে না-হতেই আরো কয়েকজন ট্রাক থেকে নামে—কেউ ডালার ওপর দিয়ে লাফ মেরে, কেউ চাকা বেয়ে, কেউ পেছনের ডালা ধরে ঝুলে। একজন বুড়োমত দেউনিয়া নামতে পারে না। সে চাকার ওপর পা রাখতে পারে না, উঠে আসে, আবার ডালা ধরে ঝুলতেও পারে না। নীচের থেকে একজন বলে, 'হে-এ তালই, তোমার নামিবার নাগিবে না, ঐঠে ছাড়ি দাও, মায়ের কোলত ছাওয়াছোটর আর নাজ্জা কী?'

সেই ছেলেটি ডাকে, 'এদিক দিয়ে নামুন', বলে মাদারির মার কোণ দিয়ে, ড্রাইভারের দরজার পাশ দিয়ে নামার রাস্তাটি দেখায়। দেউনিয়া একটু লজ্জিত মুখেই মেয়েদের ভিড়ের ভেতর দিয়ে পা ফেলে-ফেলে সেই কোণটায় আসে তারপর ঝুঁকে দেখে নেয় কী ভাবে নামতে হবে। তার সামান্য হাসিতে বোঝা যায়, এই পথটা তার কাছে নিরাপদ ঠেকেছে। ডান হাতে ড্রাইভারের চালের পেছনটা আর বাঁ হাতে ড্রাইভারের দরজার ওপরটা ধরে দেউনিয়া যেই দুই ধাপ নেমেছে, সামনের ট্রাকটা চলা শুরু করে। এই ট্রাকের লোকজন চিৎকার শুরু করে—'হে তালই, উঠি আসেন, উঠি আসেন।' দেউনিয়া তাড়াতাড়ি আবার যেই ড্রাইভারের দরজার ওপরটা ধরে ধাপে বাঁ পা দিয়েছে, তার পায়ের

ধুতিটা পেছনে আটকে যায়। ততক্ষণে সেই ছেলেটি মুখ বাড়িয়ে বলে, 'আপনি যান, গাড়ি যাবে না, যান।' দেউনিয়াকে প্রধানত ধুতির কারণেই নামতে হয়। ছেলেটি আশ্বাস দেয়ায় রাস্তায় নেমে একটু সরে গিয়ে বসে পড়ে।

ততক্ষণে সামনের ট্রাকটা অনেকখানি চলে গিয়ে বাঁ দিকে ঘুরে গেল। পেছনের ট্রাক হর্ন বাজাচ্ছে। সামনের পুলিশ হাত দিয়ে ডাকছে। ছেলেটি ডালার ওপর উঠে দাঁড়িয়ে পুলিশকে হাত দেখিয়ে ইশারা করে।

ট্রাকের ভেতর থেকে আবার চিৎকার ওঠে, 'হে-এ তালই, বাকিখান এইঠে করিবেন, চলি আসেন।' রসিকতা করে ড্রাইভারই বুঝি হর্ন দিয়ে বসে। আর, দেউনিয়া উঠে দাঁড়ায়, তাড়াতাড়ি ঘুরে ট্রাকের দিকে মুখ করে কাপড় নামায়। তারপব দৌড়ে এসে ড্রাইভারের দরজা ধরে পাদানিতে ওঠে।

দেউনিয়া ট্রাকের ভেতর নামলে সেই লিডার ছেলেটি হাত বাডিয়ে ড্রাইভারের দরজার ওপরের টিনে আওয়াজ করে বলে, 'চালান।'

একটু চালিয়ে ক্যাম্পটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। পুলিশ এসে বলে 'পারমিট?'

ছেলেটি এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে চালসার শ্লিপ দেখায়। 'কতজন আছেন, একজ্যাক্ট নাম্বারটা বলুন—'পুলিশের লোকটি না-তাকিয়ে বলে। ছেলেটি সেখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই গুনতে শুরু করে। গোনা হচ্ছে এটা বোঝার পর সকলেই একটু সোজা হয়ে বসে। একবার গোনা শেষ হলে ছেলেটি জিজ্ঞাসা করে, 'কেউ নীচে নেই ত? ড্রাইভারের ওখানে কজন আছে?' বলে, আর-একবার গোনা শুরু করে—সাতাশি। তারপর মুখ বাড়িয়ে বলে, 'এইট্টি সেভ্‌ন।'

পুলিশ পাশের ছেলেটিকে বলে, 'এইট্টি সেভ্‌ন। তারপর একটা বড কাগজ এগিয়ে দেয়, 'এইটা কাচে লাগিয়ে নেবেন, নইলে ট্রাক ঢুকতে দেবে না।' ছেলেটি হাত বাডাতেই পুলিশের পাশের ছেলেটি একটি ব্যাজের বান্ডিল এগিয়ে দিয়ে বলে, 'প্রত্যেককে পরে নিতে বলবেন, নইলে এনক্লোজারের ভেতর ঢুকতে দেবে না। আর, একটু দাঁড়ান।'

সেই ফাঁকে পুলিশ বড় কাগজটি ছেলেটির হাতে ধরিয়ে দেয়। পুলিশের পাশের ছেলেটি একটা ঝুড়ি, তুলে ধরে বলে, 'টিফিন। সাতাশিটা আছে, নামিয়ে নিয়ে ঝুডিটা দিন, ঝুড়িটা দিন।'

ছেলেটির হাত থেকে ট্রাকের কয়েকজন ঝুডিটা তুলে নেয়। তারপর ইতস্তত করে, কোথায় রাখবে। সেই লিডার ছেলেটি বলে, 'ওখানেই ঢেলে রেখে ঝুড়িটা ফেরত দিয়ে দিন।'

ট্রাকের ভেতর একটু জায়গা করে দেয় সবাই। ওরা ঝুডিটা উপুড় করে বাইরে ফেরত দেয়। ট্রাকের ভেতরটা আলু আর আটার গন্ধে ভরে যায়। ট্রাক চলতে শুরু করে। মানাবাড়িব বাঁক নেয়।

ট্রাক যখন আপলচাঁদ ফরেস্টের ভেতর ঢোকে মাদারি ও মাদারির মার মনে হয় তারা যেন আবার শ্যাওড়াঝোরায় ফিরে আসছে।

সেই সময় মাদারির মা ব্যাজ পায়, সঙ্গের সেফটিপিন দিয়ে সেটা ফোতার ওপর বুকের কাছে এঁটে নেয়। টিফিনের ঠোঙা পায়। কয়েক শতাব্দী পর যেন মাদারির মা তার জিভে মানুষের তৈরি গম ও সেই গম থেকে তৈরি আটার স্বাদ পায়। কয়েক সহস্রাব্দী পর মাদারির মা জিভ দিয়ে জানে—পৃথিবীতে স্বাদের বৈচিত্র্য কতটাই। মাদারির মা-র মুখের ভেতরে আলু আর রুটির টুকরো মুখবিবরের সহস্র গ্রন্থিমুখ থেকে নিঃসৃত লালায় যখন ভিজছে, ভিজছে, আর মুখের ভেতর ছডিয়ে পডছে, ঠিক তখন সে দেখে আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত এক নদীকে আড়াআড়ি ভাগ করে এক দেয়াল যেন আকাশের দিকেই ছুটে যায়। তিস্তা ব্যারেজ।

দুশ চোদ্দ

নেতা আর মিছিল

ব্যারেজের চারটে স্লুইস মাত্র সম্পূর্ণ হয়েছে। তাতেই এখন এই উদ্বোধন করাতে হচ্ছে! ব্যারেজের সবগুলো স্লুইস না-হলে তার কোনো অর্থই নেই কিন্তু এখানে উদ্বোধনের জন্যে তিস্তা ব্যারেজকে সাজানো হয়েছে বেশ কৌশল করে।

তৎসত্ত্বেও লোকজনকে স্লুইস খোলার ঘটনাটা দেখানো দরকার যাতে সবাই বোঝে তিস্তাকে আটকে তার মূলখাতে ফিরিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা বলতে আসতে কী বোঝায়। কিন্তু সারা বর্ষা ত তিস্তা নির্দিষ্ট খাতেই বয়ে গেছে। এখন ত আর উদ্বোধনের সুবিধের জন্যে তার জলকে ভাটি থেকে ফিরিয়ে এনে যাকে বলে রিজার্ভোয়ার সেখানে ঢোকানো যাবে না।

সেই কারণে, উদ্বোধন-অনুষ্ঠানের জন্যেই বিশেষ করে, ব্যারেজের উত্তরদিকে তিস্তার জলকে কৃত্রিম বাঁধ দিয়ে-দিয়ে পুব পারের দিকে, আপলচাঁদ ফরেস্টের দিকে, সরিয়ে আনা হয়েছে। উদ্বোধন হয়ে গেলে, এই বাঁধ ভেঙে আবার জল ছড়িয়ে দিতে হবে, নইলে ব্যারেজের কাজ এগবে না। বাঁধ মানে, বন্যা-ঠেকানো বাঁধ নয় জল-সরানোর বাঁধ। সে-জন্যে গত প্রায় মাসখানেক, বিশেষত দিনবিশেক, ব্যারেজের সব কুলিকে এই বাঁধেব কাজে লাগানো হয়েছে। একটু ওপর থেকে কোনাকুনি এনে বাঁধের মুখটাকে ব্যারেজের প্রথম দুটি স্লুইসের দিকে ঘুবিয়ে দেয়া হয়েছে। চাবটে স্লুইস সম্পূর্ণ হলেও, স্লুইস দিয়ে জলের প্রবাহ যদি দেখাতে হয় তা হলে দুটো স্লুইস দিয়েই জল ছাড়তে হবে। চাবটে স্লুইস দিয়ে সমান তোড়ে ছুটে হারিয়ে যাবে—তিস্তায় এখন এত জল নেই।

ব্যারেজটা যত উঁচু, ততটা উঁচু দেখায় না—তার কারণ তিস্তার মাইল-মাইল বিস্তার, আর পাড়ে এমন আকাশসমান ফরেস্ট। আকাশের কত কাছাকাছি গেছে, তাই দিয়েই ত একটা উচ্চতা মাপা হয়! এখানে সবাইকে আকাশসমান শালগাছের তলায় দাঁড়িয়ে ব্যারেজটাকে দেখতে হয়। পাডেব কাছে ব্যারেজের ওপরে বিরাট এক স্টেজ বানানো হয়েছে, এত উঁচু যে ঐ উঁচু পাড় থেকেও চোখ একটু তুলে দেখতে হয়। নানা রঙেব কাপডে স্টেজটা ঝলমল করছে। স্টেজেব দুদিকে দুটি বড় জাতীয় পতাকা আর মাঝখানে সরকারি দলগুলির নিজস্ব পতাকা। স্টেজের বাঁ দিকে আবার একটু বেশি উঁচু মঞ্চ। সেখান থেকে বক্তৃতা হবে। ডান দিকে ঐ একই সাইজের আর-একটা মঞ্চ—ওখান থেকে বোতাম টিপে স্লুইস গেট খোলা হবে। তিস্তাব বুকে সব সময়ই জোর বাতাস থাকে। সেই বাতাসে স্টেজের কাপড়চোপড়গুলো ফুলে-ফুলে ওঠে, ঝালরগুলো বাঁ থেকে ডাইনে ওডে, জাতীয় পতাকাদুটিসহ অন্যান্য সব পতাকাই বাঁ থেকে ডাইনে ওড়ে, যেন, মনে হয়, এই যেদিকে মুখ কবে মঞ্চ বানানো হয়েছে সেটা সোজা দিক নয়, সোজা দিকটা তিস্তার ভাটি বুকের মধ্যে।

তিস্তা ব্যারেজে আসার রাস্তা একটাই—ঐ মানাবাবাড়ির মোড দিয়ে। আর-এক আসা যায় লাটাগুডি থেকে ক্রান্তিহাট হয়ে আপলচাঁদ ফরেস্ট দিয়ে। কিন্তু ব্যারেজ-উদ্বোধন মানে ত এসে ফিতে কাটা বা বোতাম টেপাই নয়। ঐ ক্রান্তিহাটের রাস্তায় লোকজন দেখবে কী করে যে মন্ত্রীবা ব্যাবেজ উদ্বোধনে আসছেন।

কিন্তু ভি-আই-পিদের জন্যে ত আব স্বতন্ত্র রাস্তার ব্যবস্থা করা যায়নি। পুলিশ জেলা কর্তৃপক্ষকে বারবার একটা কথাই বলেছে যে কোনো অবস্থাতেই যেন ভি-আই-পিদের আসাব সময়টা বদলানো না হয়। শেষ মুহূর্তের সময়বদল সামলানোর মত ব্যবস্থা করা এই তিস্তার চরে, পাহাডের তলায়, ফরেস্টের মধ্যে সম্ভব নয়।

সেই নির্দিষ্ট সময়েই ভি-আই-পিদের কনভয় জাতীয় সড়ক ধরে বেশ জোরেই আসে—সামনে ছয় মোটর সাইকেলের এসকর্ট ছুটে গেলে রাস্তায় যত জোরে গাড়ি চালানো যায়।

নির্দিষ্ট সময়ের আধঘন্টা আগে চালসার মোড়ের সব দিকেই মিছিলের ট্রাক সাইডে দাঁড় কবিয়ে দেয়া হয়। রাস্তার পাশে রাইফেল কাঁধে পুলিশ দাঁড়িয়েই ছিল— ট্রাকগুলো দাঁড়ানো মাত্র এক-একজন এক-এক ট্রাকে উঠে পড়ে রাস্তার দিকে রাইফেল তাক করে দাঁড়িয়ে পড়ে।

চালসার মোড়ে টিলার ওপরে গাছপালার সবুজের সঙ্গে মিশে কিছু কম্যান্ডো ফোর্স ছড়িযে-ছিটিয়ে থাকে—বিশেষত চালসা থেকে মাটিয়ালি যাওয়ার পথের দুপাশে। পুলিশের দিক থেকে এই দুটো পয়েন্টেই 'সিকিউরিটি রিস্ক' আছে—দাঁড়ানো ট্রাকের পাশ দিয়েই ত ভি-আই-পিদের গাড়িগুলো আসবে।

ভি-আই-পিদের কনভয়টা চালসার মোড়ে পৌঁছনোর আগেই এসকর্টের মোটর সাইকেলগুলো যেন গতি বাড়িয়ে দেয়। আর সেই বর্ধিত গতির সঙ্গতি রেখে কনভয়ের সব গাড়ির গতিই বেড়ে যায়। সেই প্রবল গতিতে চালসার মোড়ে ছটি মোটর সাইকেলের পেছনে অন্তত চল্লিশটি গাড়ি বাঁক নেয়—রাস্তার সঙ্গে টায়ারের সংঘর্ষে একটা আওয়াজ কয়েক সেকেন্ড পরপরই উঠতে থাকে। সমকোণে দাঁড়িয়ে থাকা

সারি-সারি ট্রাক থেকে স্তম্ভিত মিছিল, দেখে। ভি-আই-পিদেব কনভয়ের পেছনের পুলিশেব গাড়ি চলে যাওয়ার মিনিট তিন পর যখন পথ খুলে যায়, তখন নেতাদের পেছনে-পেছনে মিছিল যাচ্ছে—এই বোধটা ফিরে আসে আর সব ট্রাক থেকেই শ্লোগান উঠতে থাকে।

মানাবাড়ির মোড়ে একই ঘটনা। সেখানে একই পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সময়ের মিনিট পনের আগে সব ট্রাককে রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে। মানাবাড়ি থেকে তিস্তা ব্যারেজ পর্যন্ত ফাঁকা বাস্তায় সেই চল্লিশটি গাড়ি ও ছটি মোটব সাইকেলকে বাধ্যতই একটু ধীর গতিতে বাঁক নিতে হয়—বাস্তাটা ছোট। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দাঁড়িয়ে থাকা মিছিলে কোনো শ্লোগান ওঠে না। একটা গাড়ির জানলা দিয়ে কোনো একজন নেতা হাত বাডিয়ে খানিকটা নাড়ান। তাতেও রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে দেয়া মিছিল বুঝে উঠতে পারে না তাদের কাছে এখন কোন ব্যবহার প্রত্যাশিত। এক অদ্ভুত ধাঁধায় এই মিছিলও পড়ে গেছে আর নেতাদের নিয়ে আসা চল্লিশটি গাড়িও পড়ে গেছে। মিছিলের অংশ হবেন বলেই নেতাবা মিছিলের পাশ দিয়ে, বা, ভেতর দিয়ে, বা, মিছিলের সঙ্গেই যেন ব্যারেজে আসতে চেয়েছেন, তাই ত এই পথ বেছে নেয়া। আর, উত্তরবঙ্গেব পক্ষে বৃহত্তম এই কর্মযজ্ঞ উপলক্ষে বৃহত্তম এই সমাবেশেবও ত উল্লসিত হয়ে ওঠার কথা—তাদেব নেতাদের পেয়ে। কিন্তু, কার্যত মিছিল আটকে, রাইফেলধারী পুলিশ আর গোপন কম্যান্ডো বাহিনীর পাহারায় তাদের দাঁড় করিয়ে রেখে, নেতাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত কবা হয়। সেটা ত সমর্থনযোগ্যই—উত্তবখণ্ড বা গোর্খাল্যান্ড-এব লোকদের হাত থেকে নেতাদের বাঁচানোব দায়িত্ব ত নিতেই হবে। কিন্তু এমনই মানবস্বভাব যে কাউকে যখনই সন্দেহ করা হবে, বা,সন্দেহের সীমার মধ্যে যখন কাউকে টেনে আনা হবে, সে তখনই সন্দেহজনক হয়ে পড়ে নিজেবই কাছে। সত্যি ত এই এত বড় মিছিলেব যে-কোনো ট্রাকে বা বাসে এক দল বা একজন আততায়ী আত্মগোপন করে থাকতে পারে। কিন্তু সেই সত্য আশঙ্কারই আবো একটা অর্থ ত এই যে এই আমাদেব এই মিছিলের ভেতরই আততায়ী লুকিয়ে থাকতে পাবে। একবার এই সত্য পরিষ্কাব হয়ে গেলে মিছিলের মূলে টান পড়ে, তখন নেতাদের চল্লিশ গাড়ি আর মিছিলেব শ-শ ট্রাকেব মধ্যে দূবপনেয় পার্থক্য ঘটে যায। মিছিলেব জন্যেই এসেছেন নেতাবা, নেতাদেব জন্যেই মিছিল আসছে, একই কর্মকাণ্ডের শরিক হবেন নেতারা ও মিছিলের মানুষ, তাবপর এই কর্মকাণ্ডের 'বাণী' এই মিছিলই উত্তরবঙ্গের কোণে-কানাচে নিয়ে যাবে, যাতে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী'দেব সত্যি কবেই 'করব' দেয়া যায়, তাদেব 'কাল হাত' ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া যায। কিন্তু কার্যত নেতাদেব জন্যেই মিছিল আটকে রাখা হয়, নেতাদেব জন্যেই মিছিলকে উদ্যত ও গোপন রাইফেলেব সামনে অন্তত কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকতে হয, মিছিল থেকে নেতাদের নিশ্চিত ও নিরাপদ দূবত্বে নিয়ে যাওয়া যতক্ষণ শেষ না হয়, ততক্ষণ, পুলিশ অন্তত এই মিছিলকেই তার সন্দেহের একমাত্র লক্ষ্য করে রাখে। মিছিল, তার নেতাদেব নিবাপত্তা নিশ্চিত কবতে পারে না, নেতারা তাদের মিছিলের আশ্রয়ে নিশ্চিত থাকতে পারে না—ঐ চল্লিশটি গাড়ি অনেক বেশি নিরাপদ থাকে মিছিল আর নেতাদের মাঝখানে দাঁড়ানো পুলিশের পাহারায়। নেতা আব মিছিল আলাদা হয়ে গেছে।

দুশ পনের

নদীর বুকের ওপর দিয়ে হাঁটা

মানাবাড়ি থেকে আপলচাঁদ পর্যন্ত রাস্তা ফাঁকা রাখা হয়েছে।

ভি-আই-পিদের নিয়ে চল্লিশটা গাড়ি, ছটি মোটর সাইকেলের পাহারায় সেই সরু রাস্তায় ঢুকে যায়। এখানে পাহাড় নেই ও জঙ্গলও নেই। ফলে নিরাপত্তার প্রশ্ন কিছুটা সরল। মোটর সাইকেলের পুলিশরা তাদের গতি একটু কমিয়ে আনে। এখানে ভি-আই-পিরা একটু অলস ভাবে প্রকৃতি ও পরিবেশ দেখতে পারেন। পেছনের গাড়িগুলোর গতিও স্বাভাবিক ভাবেই কমে আসে। একটা শিথিলতা অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে পুরো কনভয়টাতেই ছড়িয়ে পড়ে—অবকাশের শিথিলতা।

আপলচাঁদের কাছে পৌঁছে রাস্তাটা দুভাগ হয়ে যায়। একটা রাস্তা সোজা চলে যায়, আর-একটা

ডাইনে। এই ডাইনের রাস্তাটা নতুন বানানো হয়েছে— ব্যারেজের জন্যে। সোজা রাস্তাটাও ব্যারেজেই গেছে, ফরেস্টের মধ্যে দিয়ে একটু ঘুরে। ভি-আই-পিদের গাড়িগুলো ব্যারেজের নতুন রাস্তা ধরে আলাদা হয়ে গেলে—মানববাড়ি থেকে ট্রাকগুলো ছাড়া হয়। মিছিলের ট্রাক পুরনো রাস্তা ধরে ব্যারেজের কাছে নির্দিষ্ট জায়গায় যাবে।

ভি-আই-পিদের কনভয় সোজা ব্যারেজের মুখে চলে যায়। গাড়ি থেকে নেমে তাঁরা মঞ্চে যাবার রাস্তায় পা দেন। আর গাড়িগুলো সোজা গিয়ে গাড়ি রাখার নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে। ছোট-ছোট প্ল্যাকার্ডে জায়গা নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে—'সি-এমস কার', 'ইউনিয়ন মিনিস্টার অব স্টেটস কার' 'ইরিগেশন মিনিস্টারস কার', 'পি-ডব্লু-ডি মিনিস্টারস কার' ইত্যাদি।

গাড়ি থেকে মঞ্চে যাবার রাস্তাটা নতুন করে বানানো হয়েছে এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানের জন্যে। তিস্তার শুকনো খাত থেকে ছোট নুড়ি পাথর তুলে এনে বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। জলের নীচে থাকলে এগুলোর আলাদা-আলাদা রঙ দেখা যায় কিন্তু রোদে সে-রঙ নষ্ট হয়ে যায়। যাতে অন্তত কিছুটা বঙ থাকে, সেজন্যে কাল রাতে এই সব পাথর তোলা ও বেছানো হয়েছে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টও কাল রাতেই দুট্রাক গাছ দিয়েছে, সেগুলো রাস্তার দুপাশে পুঁতে দেয়া হয়েছে। সে-সবই গোটা-গোটা গাছ—দুদিনের মধ্যে শুকিয়ে মরে যাবে, কিন্তু, এখন দেখাচ্ছে যেন কত শুশ্রূষায় এই সব গাছকে বড কবা হযেছে। গাছ ত আর রাতারাতি বড় হয় না—তাই একটা গাছ বহু বছবের যত্নেব প্রমাণ দেয।

ওঁরা নেমে একটু দাঁড়ান। অনেকে দুহাত ওপরে তুলে আডমোড়া ভেঙে নেন সশব্দ হাই তুলে। দু-একজন একটু চারপাশে তাকান—প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার তৃপ্তি পেতে। মুখ্যমন্ত্রী একটু অন্যমনস্ক ভাবে তৈরি থাকেন—নিশ্চয়ই কেউ এসে বলবেন কী কবতে হবে। সেই মুহূর্তেই ইনজিনিযাববা এসে প্রত্যেকের বুকে বড়-বড় ব্যাজ এঁটে দেন। মুখ্যমন্ত্রীর ব্যাজটা সবচেযে বড ও সবচেযে রঙিন।

ওতে খানিকটা সময় যায়। কেন্দ্রের জলপথমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এসে জানতে চান পাহাড এখান থেকে কত দূর হবে, মানে কোন জায়গায় নদী সমতলে নেমেছে। মুখ্যমন্ত্রী নদীর ওপারেব দিকে তাকান। ওপারটা দেখতে তাঁকে কোনাকুনি তাকাতে হয়, কারণ সোজা পথটা আটকে বেখেছে মঞ্চ। তারপর একটু আনমনা ভঙ্গিতে ডান হাতটা দিয়ে একটা দিক দেখান। উত্তবটা খুব সম্পূর্ণ হল না ভেবে হাতটা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে জানান—পশ্চিমবঙ্গের পাহাড় অঞ্চল, সিকিম ও ভুটান এই জায়গাটিকে ঘিরে রেখেছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তাঁর চোখ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হাত অনুসরণ করে ইংরেজিতে বলেন, 'এই জায়গাটি দেখতে একেবারে গাড়োয়ালের মত। আপনি গাড়োয়ালে গেছেন?'

মুখ্যমন্ত্রী হেসে বলেন, 'এত বয়স হয়েছে যে ভারতের কোনো জায়গায় আর যাওয়া বাকি নেই। গাড়োয়ালে ত গিয়েইছি। সেবার বহুগুণার ইলেকশনে অনেকগুলো মিটিং করলাম, ইলেকশন মানে স্থগিত ইলেকশনে, মিসেস গান্ধীর প্রেস্টিজ ইলেকশনে। আপনি কি গাড়োয়ালেব? না ত?'

'না, না, আমি ত সমতলের লোক। কিন্তু গাড়োয়ালে গিয়েছি, থেকেছিও।'

'কেন?'

'আমার কাকার বড় ফলের খেত আছে।'

ইনজিনিয়ারদের একজন, মুখ্যমন্ত্রী বুঝে নেন ইনিই নিশ্চয় ব্যারেজের প্রধান ইনজিনিযাব, এসে বলেন, 'স্যার, ডায়াসে ওঠার আগে একবার ব্যারেজটা দেখে নিন।'

'হ্যাঁ। গাড়োয়ালে ফলের শিল্প খুব বেড়েছে, হিমাচল প্রদেশেও খুব বেড়েছে। এই শিল্পটা ওখানকার পাহাড়ি লোকদের একটা অর্থনৈতিক ভিত্তি দিয়েছে। সে জন্যে দেখবেন, উত্তর প্রদেশের পাহাড় অঞ্চলে কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন নেই—ওরা প্রধান ভূখণ্ডের সঙ্গে থাকতে চায়, তাতেই ওদের লাভ,' বলতে-বলতে মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে নিয়ে এগিয়ে যান।

'তা আপনি বলতে পারেন না—আর্থিক দিক থেকে সবচেয়ে উন্নত রাজ্যেই ত খালিস্তান শ্লোগান উঠল', কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন।

নুড়ি পাথর এত গভীর করে ঢালা যে হাঁটা মুশকিল, জুতো হড়কে যায়। পেছন থেকে একজন মন্তব্য করেন, 'এত পাথর ঢেলেছেন কেন, মন্ত্রীদের আছাড় খাওয়াবার জন্যে?'

'একটু আস্তে-আস্তে হাঁটুন স্যার, আমরা ত বাঁধিয়ে দিতে চেয়েছিলাম, সিকিউরিটি বলল পাথর

ঢালতে', একজন ইনজিনিয়ার ব্যাখ্যা কারেন।

মুখ্যমন্ত্রী আর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীই সবার আগে-আগে যাচ্ছিলেন, ধীরে-ধীরে, কিন্তু নিশ্চিত ভাবে, যেন, ওঁদের একটু বিশেষ ভাবে জানা আছে নুড়ি পাথরে কী করে হাঁটতে হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'পাঞ্জাব ত আসলে আপনাদের পার্টির কেলোর কীর্তি। আপনারা আকালি রাজনীতিব ভেতর ঢুকলেন আর তার সঙ্গে পাকিস্তান জড়িয়ে গেল।'

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কোনো জবাব দিলেন না। নুড়ি পাথবের স্তূপ তাঁবা প্রায় পেরিয়েই এসেছেন। মঞ্চেব তলা দিয়েই তাঁদের ব্যারেজের ওপর যেতে হবে। মঞ্চেব তলাটাও তাই কাপড় দিয়ে মোড়া ও পেছনে, যেখান দিয়ে তাঁরা ব্যারেজে ঢুকবেন, সেই জায়গাটায় পর্দা ঝোলানো। দুই ইনজিনিয়ার দুদিক থেকে পর্দাটা সবিয়ে ধবেন আব মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ব্যারেজের ওপর পা রেখে দাঁড়ান।

মঞ্চের পেছনে টিভি ক্যামেরাম্যান, প্রেস ফটোগ্রাফার ও রিপোর্টাররা তৈরি হয়েই ছিলেন। যে-পর্দা ঠেলে ওঁরা ঢুকলেন তারই দুপাশে বিপোর্টাররা, মাটির ওপর উবু হয়ে বসে ফটোগ্রাফাররা, একটু দূরে টিভি-ক্যামেরা, তার বাঁয়ে সবকারের প্রচারবিভাগেব ক্যামেবা, এই দুই-এর মাঝখানে আর-একটু পেছনে ফিল্ম ডিভিশনের দল। একটা ক্যাসেট-রেকর্ডার কাঁধে ঝুলিয়ে লম্বা একটা মাইক্রোফোন নিয়ে অল ইন্ডিযা বেডিও।

মুখ্যমন্ত্রীও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এসে দাঁড়াতেই একসঙ্গে ফ্ল্যাশ জ্বলে, টিকটিক কবে মুভি ক্যামেরা তিনটি চলতে থাকে। মুখ্যমন্ত্রী একটু ডান দিকে তাকান যেদিকে তিস্তার জল ফুলে-ফুলে উঠছে। তারপরই কয়েক পা এগিয়ে যান—কারণ ততক্ষণে পেছনের পর্দা ঠেলে বাকি ভি-আই-পিরাও এঁসে গেছেন, তার মধ্যে জনাকয়েক মন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী মাঝখানে যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, দাঁড়িয়ে থাকেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তাঁর পাশে। অন্য মন্ত্রী কজন এদের দুপাশে নিজেদের জায়গা করে নেন, পেছনে অফিসাররা দাঁডিয়ে পড়েন। কেউ কিছু বলাব আগেই গ্রুপ ছবিব মত কবে সবাই দাঁড়িয়ে যান এবং মাত্র কয়েক সেকেন্ড পবই এই পুরো দলটা হাঁটতে শুরু কবে।

যাঁবা ছবি তুলছেন ও যাঁদেব ছবি তোলা হচ্ছে এই দুই দলের মধ্যেই অদ্ভুত বোঝাপড়া কাজ করে। প্রত্যেকেই জানেন, কখন কী করতে হবে। এমন-কি প্রেস ফটোগ্রাফাররা এগিয়ে গিয়ে ছবি তোলার সময়ও সচেতন থাকেন যেন যাঁবা মুভি তুলছেন তাঁদের ক্যামেরার পথে বাধা না হন। প্রায় দৈনন্দিন অভ্যস্ততায তাঁবা এই অনভ্যস্ত পথে হাঁটছিলেন, তিস্তাব বুকেব ওপর দিযে তিস্তা পেরচ্ছিলেন, অথচ যেন সেই কথাটা কেউই খেযাল কবেন না।

দুশ ষোল

অভিনয়ে স্লুইস গেট খোলা

উদ্বোধন অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যায়।

উত্তববঙ্গেব এম-এল-এরা কেউ-কেউ বলবেন—দার্জিলিং থেকে মালদহ পর্যন্ত। উত্তরবঙ্গের এম-পিবা বলবেন। কংগ্রেসেব কোনো এম-পি আসেননি, বলবেন প্রধানত রাজ্যের সরকারি দলের এম-পিরা। তারপর যাঁর-যাঁব দপ্তর এই কাজের সঙ্গে জড়িত, তাঁরা বলবেন—রাজ্যের সেচমন্ত্রী, পি-ডবলু-ডি মন্ত্রী। শেষে বলবেন বিশেষ অতিথি কেন্দ্রের মন্ত্রী। আর তারপর মুখ্যমন্ত্রী বলবেন ও বলার শেষে, আর-এক মঞ্চ থেকে বোতাম টিপে স্লুইস গেট খুলবেন। বেলা দুটোর মধ্যে সমস্ত প্রোগ্রাম শেষ করতে হবে। তারপর ভি-আই-পিরা চলে যাবেন, তারপর মিছিলগুলো ফিরতে শুরু করবে।

মিছিল জড়ো হয়েছে ব্যারেজের দক্ষিণে, ভি-আই-পিদের গাড়ি রাখার জায়গার পেছন থেকে তিস্তার পাড় ধরে—যতদূর চোখ যায়। জায়গাটা আগেই পরিষ্কার করা ছিল কিন্তু এতটা জায়গা নয়। ব্যারেজের জলের জন্যে এখানটা খোলা রাখারই কথা। পরে এই খোলা জায়গাসহই এই অংশটাকে নিশ্চয়ই কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে দেয়া হবে অথবা অন্য কোনো ভাবে পাহারাধীন রাখা হবে—কারণ মানুষের পক্ষে এই জায়গাটাই সবচেয়ে বিপজ্জনক। স্লুইস খুললে এখান দিয়েই ত সবচেয়ে জোরে জল

বইবে—প্রায় জলপ্রপাতেব বেগে। তা ছাড়া ব্যারেজের নিরাপত্তার জন্যেও এত কাছে কাউকে আসতে দেয়া হবে না।

দুদিন ধরে ফরেস্টেব নীচেব জঙ্গল কেটে ঐ মাঠটাকেই আরো বড় করে দেয়া হয়েছে। ওরও পেছনে এক জায়গায় সারি দিয়ে ট্রাকগুলোকে দাঁড় করানো হচ্ছে। মঞ্চ থেকে দেখাচ্ছে, যেন মানুষের মাথা আব ফরেস্টের গাছ মিশে গেছে। মঞ্চে একজন ইনজিনিয়ারের হাতে মেড-ইন হংকং একটা বাইনোকুলার ছিল—সেটাই সবার হাতে-হাতে ঘুরছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজেও ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখলেন। তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে দিলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীটি তরুণ। তিনি ঠিক এত বড সমাবেশের সঙ্গে খুব পরিচিত নন। এই সমাবেশ গডে তুলতে যে-শ্রম, নিষ্ঠা, ও ধৈর্য দরকার, তাঁর দলের কাজকর্মের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সেটা মেলে না। ঠিক বুঝে উঠতেও পাবেন না, ব্যাপাবটা কী। তিনি ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখে বাইনোকুলারটি ফেবত দেযার জন্যে হাত বাড়ালে পেছন থেকে একজন নিয়ে নেন। মুখ্যমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে তিনি মন্তব্য করে ফেলেন, 'আপনাব জনপ্রিযতা যে এতটাই আমাব ধারণা ছিল না।'

মুখ্যমন্ত্রী স্মিত মুখে তাঁব দিকে তাকিযে ঘাড ঘুবিয়ে আবার সমাবেশের দিকে তাকান। সমাবেশেব শ্লোগান, হৈ-হৈ সব শোনা যাচ্ছে কিন্তু মানুষের মুখ দেখা যাচ্ছে না, মঞ্চটা এতই উঁচু আব সমাবেশটা এতই দূরে। কোথায় একটু বিষণ্ণতা এসে যায়। ঘাড ঘুরিয়ে তিনি একটু জোব দিয়ে বলেন, 'আপনাদের জন্যেই আমাদেব এই সমাবেশ সংগঠিত করতে হল।' 'আমাদের' ও 'সমাবেশ' কথা দুটির ওপব মুখ্যমন্ত্রী একটু অতিরিক্ত জোর দিলেন। তাবপর যোগ করেন, 'পশ্চিমবাংলাকে ত আমবা পাঞ্জাব হতে দিতে পারি না।' এ-কথাটার মধ্যেও জোর ছিল, যেন, মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতার লাইন বলছেন। তাঁর বক্তৃতার এই জোরটাই বৈশিষ্ট্য, শুনলে আত্মবিশ্বাস আসে যেমন, তেমনি, ওঁর ওপর নির্ভরতাও আসে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর কথাটাকে একটু বুঝে নেন। মনে হয, মুখ্যমন্ত্রীর কথার মধ্যে তাঁদেব দলেব বা সরকারের বিরুদ্ধে যে-সমালোচনাব ছোঁয়া ছিল সেটা আব তিনি ঘাঁটাতে চান না। বিষয়টা তিনি জানেনও না, আর, মুখ্যমন্ত্রীব কথা তিনি শুনেওছেন অনেক, সকলেই ত বেশ শ্রদ্ধা করেন। এই প্রথম তাঁর সঙ্গে আলাপ। মিছিমিছি একটা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসে তিনি বাদানুবাদে জড়িয়ে পডতে চাইছেন না। ইংরেজিব কুশলতায় তিনি কথাটা এড়িযে যেতে চাইলেন, 'মন্ত্রী হওয়ার পব আমাব সবচেযে বেশি সময় কিসে লাগছে, আপনাকে বলতে ইচ্ছে কবছে।'

মুখ্যমন্ত্রী ঘাড় ঘুবিযে বলেন, 'বলুন না। আপনি কি নতুন মন্ত্রী হলেন ?'

'হ্যাঁ। আমাব এখন সবচেযে বেশি সময যায মধ্যমপুরুষ বহুবচনের অর্থ বুঝতে। মানে, কখনো আমাকে বলা হয় তোমাদের কথা ছাড়ো, তোমবা ত ভাবতের নযা শাসক। তখন বুঝতে হয, আমি ইউ-পির লোক। কখনো বলা হয—প্রধানমন্ত্রীব নতুন ছেলেরা। তখন বুঝতে হয, আমি প্রধানমন্ত্রীব লোক। কখনো বলা হয়—তোমরা ব্রাহ্মণ।' এই পর্যন্ত বলেই মন্ত্রী থেমে যান।

মুখ্যমন্ত্রী সামান্য একটু হেসে বলেন, 'আপনাদের দলের ত একটা রাজনৈতিক সমস্যা আছেই—এ রাজ্যে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের মত পশ্চাদপদ জায়গায় সমস্যাটা অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে। আপনাদেব লোকজন সব দলে-দলে গোর্খাল্যান্ড, উত্তরখণ্ড, এই সব বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনেব দিকে চলে যাচ্ছে। আর আপনাদের স্থানীয নেতারা তাদের সঙ্গে-সঙ্গে যাচ্ছে। তাতে একটা বিপদ দেখা দিচ্ছে।'

মঞ্চের ওপর থেকে মাইকে শ্লোগান দেয়া শুরু হয় আর দেখতে-দেখতে সামনের সমাবেশ জমাট বেঁধে যায়। মঞ্চের শ্লোগানের জবাবে সমাবেশের হাজার-হাজার মানুষ একসঙ্গে হাত তুলে শ্লোগান তুলছে। এত মানুষের গলার আওয়াজ এক সঙ্গে কী প্রবল শক্তি হয়ে ওঠে, মুহূর্তে, তা শ্লোগান ওঠার পূর্ব মুহূর্তেও যেন ভাবা যায়নি। এই শ্লোগানই যেন এই মঞ্চ, এই ফরেস্ট, এই নদীর সঙ্গে এই মানুষকে জুড়ে দেয়। এত মানুষ যেখানে এমন সরবে এতটা সমর্থন জানাতে চায় তখন রাজনীতির তত্ত্ব যেন দুই হাতে ধরা যায়, ছোঁয়া যায় এমন এক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা পায়।

মঞ্চের এই নেতারা ত সব সময়ই মিটিং করেন। আর বছরে দু-বছরে অন্তত একবার ব্রিগেডের জনতা তাঁরা মঞ্চ থেকে দেখে থাকেন। কিন্তু এখানে, এই সমাবেশে, সেই সব অভিজ্ঞতার বাইরের একটা ব্যাপার ঘটে যায়। তিস্তার একটা গম্ভীর ধ্বনি সব সময় শোনা যাচ্ছিল। সেই গাড়ি থেকে নামার পর থেকেই সব সময় সেই আওয়াজটা পরিবেশের সঙ্গে লেগে আছে। অনেকটা যেন দিগন্তের মেঘ-গর্জনের মত। তার সঙ্গে প্রবল বাতাস—তিস্তার জলময় বুক থেকে প্রবল উঠে এসে বয়ে যাচ্ছে।

নদীস্রোতেব সমান্তবালে অত বড আকাশেব নীচে সে যেন বাতাসেব আব-এক তিস্তা। আর, এরই সঙ্গে আছে ফবেস্টেব ভেতব দিয়ে বাতাস বয়ে যাওয়ার অবিরল দীর্ঘশ্বাস, বিরতিহীন, পতনহীন। সেই তিস্তাব, ফরেস্টেব, বাতাসের আওয়াজের সঙ্গে মিশে শ্লোগানেব নাদ বদলে গেছে। আদিবাসী উচ্চারণে শ্লোগানে যেন মাঝে-মাঝে টঙ্কারও জাগছে। এ-শ্লোগানের ভেতব যেন এক বিষাদও মাখানো থাকে—পাহাড়েব বা জঙ্গলেব বা নিধুযাপাথাবের গানে যে-বিষাদ থাকে।

যাঁরা ফিল্ম তুলছিলেন, তাঁদেব কয়েকজন গুটিগুটি মুখ্যমন্ত্রীব চেয়ারের পেছনে এসে দাঁড়ান, কিছু বলতে। টেব পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী ঘাড় ঘুবিয়ে তাকান। বয়স্ক-মত একজন, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সুবাদে যাঁর মুখ মুখ্যমন্ত্রী চেনেন, বলেন, 'স্যাব, একটা বিপদে পড়েছি।'

'কী হল?'

'আসলে আমবা ত একটা কবে ক্যামেবা এনেছি। আব এরা ডায়াস এমন ভাবে বানিয়েছে যে আপনাব বোতাম টেপাব শট নেয়াব পব দৌড়ে নেমে আব স্লুইস খুলে যাচ্ছে সেই শট নেয়া যাবে না।'

'ত, কী, কবতে হবে কী?'

'স্লুইসের শট নেয়াব জন্যে ত এখন থেকেই ওখানে ক্যামেবা ফিট করে রাখতে হবে। ঐ শট স্যাব ঐ মিছিলের ভেতব থেকেই নিতে হবে। ধাক্কাটাক্কা লেগে যেতে পারে।'

'ফিট কবে বাখুন গিয়ে।'

ভদ্রলোক এবাব আব-একটু হেসে বলেন, 'আপনি যদি স্যাব এখান থেকে একবার হেঁটে ঐ বোতাম টেপাব ডায়াস পর্যন্ত যান, ওখানে গিয়ে একবার দাঁড়ান, তা হলে আপনাব বোতাম টেপার শটটা এখনই নিয়ে আমবা নীচে চলে যেতে পারি।'

'ও। এ্যাকটিং কবতে হবে? যান, আপনারা যন্ত্রপাতি লাগান গিয়ে।'

'আমবা লাগিয়েই এসেছি স্যাব।' শুনে, মুখ্যমন্ত্রী দাঁড়ান, তারপব দ্রুত পায়ে ডাইনের সেই মঞ্চের দিকে হেঁটে যান, বোতাম টিপছেন—এ-বকম একটা ভঙ্গি করেন। অনেকগুলো ঘড়ি একসঙ্গে চললে যেমন আওয়াজ হয় সে-বকম সমবেত টিকটিক শব্দে ফিল্ম চলতে থাকে। 'স্যাব, হাতটা একটু নাড়ান স্যাব।' মুখ্যমন্ত্রী হাত নাড়ান।

দুশ সতের

মাদারির মায়ের সন্তান সন্ধান

বক্তৃতায়-বক্তৃতায় মিটিং জমে ওঠে।

মঞ্চে এক-একজন বক্তা আসছেন, কেউই বেশিক্ষণ বলছেন না, কিন্তু পব-পর বলে যাওয়ায় মনে হচ্ছে একটা বক্তৃতাই যেন অনেকক্ষণ ধরে চলেছে।

নদীর কল্লোল, হাওয়ার গর্জন আর ফরেস্টের প্রবল মর্মর যেমন শ্লোগানের ধ্বনি বদলে দিচ্ছিল, তেমনি বক্তৃতাব আওয়াজও বদলে দিচ্ছে। বাতাসটা বইছে নদীর স্রোতের অনুকূলে পুব থেকে পশ্চিমে। আর বিরাট-বিরাট স্পিকাবের মুখগুলোও পশ্চিম দিকে। সেই চোঙাগুলো দিয়ে আওয়াজ বেরনো মাত্র বাতাস সে-আওয়াজ উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে সমাবেশের ওপর দিয়ে, ভেতর দিয়ে। তা ছাড়া, নদীর ওপবের বাতাস ত আর জলস্রোতের মত মাটির ঢাল বেয়ে-বেয়ে যায় না। পুবের বাতাস নদীর ওপরের অতটা অবকাশে এলোমেলো বয়ে যায়। যে-সব চোঙ লাগানো হয়েছে তার আওয়াজগুলো এ-রকম বাতাসের ধাক্কায় এলোমেলো বয়ে যাচ্ছে। ফলে বক্তার একটা কথাই বিভিন্ন চোঙ থেকে বিভিন্নভাবে এসে সেই সমাবেশের ওপর পড়ছে, তারপর মুহূর্তে ভেসে যাচ্ছে—তিস্তার জলে কুটো পড়লে যেমন ভেসে যায়।

মাদারির মা মিটিঙের ভেতরে ঘুরে-ঘুরে বেড়ায়। এত মানুষ এসেছে যেন মনে হয় দশটা মাদারিহাট এই মিটিঙের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে। হাটে ত তাও দোকানের জন্যে জায়গা ছাড়তে হয়, খদ্দেরদের চলাফেরার জন্যে বাস্তা রাখতে হয়। কিন্তু এখানে ত মানুষে-মানুষে কাঁধ লাগিয়ে বসে আছে, দাঁড়িয়ে

আছে—ফরেস্টের গাছের মত, একটা গাছের সঙ্গে আর-একটা গাছের কোনো-না-কোনো একটা সংযোগ থাকেই।

মানুষই ত ভালবাসছিল মাদারির মা, মানুষের আওয়াজ, মানুষের চামড়ার গন্ধ, মানুষের সব কিছু। যেন, সে যখন এই জলুশটাতে এসে পড়েইছে, এত মানুষের ভেতরে এতক্ষণ যখন সে থাকতে পারছেই, তখন, তাব এই ভাল লাগাটা সে পুরো উশুল করে নেবে।

কিন্তু মানুষকে ভালবাসতে-বাসতে, মানুষের আওয়াজ শুনতে-শুনতে, মানুষের গন্ধ শুঁকতে-শুঁকতেও মাদারির মা তার ছেলেদের খুঁজছিল। এখানে ত সারা দুনিয়ার মানুষ এসেছে। এত মানুষ এক সঙ্গে কোনো দিন মাদারির মা দেখেনি। তার বাকি জীবনে সে আরো একবার এত বড় মিটিঙে কখনো আসতে পারবে না। আজকের জলুশ যে এতই বড় আর, তাদের যে সেই মাদারিহাট থেকে এই এত দূরে আসতে হবে—তা সে ভাবেও নি। এই জায়গাটাকে যদিও তার তত অপরিচিত ঠেকে না—এমন বড় নদী না দেখলেও ত সে তোর্সার জল ও চর দেখেছে আর নদীর পাশের এই ফরেস্ট। কিন্তু আসতে-আসতে রাস্তাটা দেখে তার মনে হচ্ছিল সত্যি তারা এত দূরে যাচ্ছে যে আর শ্যাওড়াঝোরায় ফেরা যাবে না। দেশ বোঝে না মাদারির মা, কিন্তু বিদেশ বোঝে। এত দূর বিদেশেও সে কি আব-কোনো দিন আসবে ? তা হলে সে তার ছেলেদের একবার খুঁজে দেখবে না, এখানে ? তার আটটি কি দশটি সন্তানের মধ্যে দুটি-একটি ত এই মিটিঙে এসে থাকতেই পারে।

মাদারির মা যে খুব একটা নিয়ম মেনে খোঁজে, তা নয়। এই মিটিঙে কোন-কোন জায়গা থেকে লোক এসেছে, তা ত সে জানতে পারবে না। তার ছেলেরা কোথায়-কোথায় চলে গেছে, তাও সে জানে না। তা হলে আর জায়গা মিলিয়ে-মিলিয়ে সে খুঁজবেই-বা কেমন করে ? তাকে এই হাজার-হাজার মানুষের মধ্যে ধীরে-ধীরে ঘুরে বেড়াতে হয়, হেঁটে বেড়াতে হয়, যেমন সে প্রতিদিন ঘুরে বেড়ায় ফরেস্টের মাটির দিকে চোখ রেখে তার খাদ্যের সন্ধানে। এমন একা-একা হাঁটা আর খোঁজা, খোঁজার জন্যে হাঁটাই ত তার রোজকার জীবন।

কিন্তু এখানে ফরেস্টের অন্ধকাব নেই, এখানে পচা শুকনো পাতা নেই, এখানে লতাপাতার জঙ্গলের আড়াল নেই, এখানে ভেজা মাটি নেই। এখানে, আকাশ থেকে রোদ মাটিতে সম্পূর্ণই আসছে—একটা মেঘের ছায়ার বাধাও নেই। এত বড আকাশ থেকে এত রোদ এত দূর পর্যন্ত ঝরে পডছে যে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। এখানে, সামনে আকাশ পর্যন্ত চওড়া একটা নদীকে দু-টুকরো করে শুকনো খটখটে সিমেন্টের দেয়াল সেই আকাশ পর্যন্তই ছড়িয়ে গেছে। এখানে পায়ের নীচে শক্ত মাটি, সবুজ ঘাসের মাটি। এখানে এই রোদে আর এই হাওয়ায়, এই নদী আর এই জলের সামনে এই হাজার-হাজার মুখ। সব মুখ একই দিকে উঁচু করা—সামনে মঞ্চের দিকে তাকাতে ঘাড়টা একটু হেলাতেই হয়। মঞ্চের মানুষগুলোর চোখ এখান থেকে দেখা যায় না, কিন্তু, তাদের হাত নাড়ানোটা বোঝা যায়। সেই হাজার-হাজার একটু উঁচু করা মুখের প্রায় প্রত্যেকটা খুঁটিয়ে দেখার এমন সুযোগ মাদারির মা আর-কোথায় পাবে ?

তাই মাদারির মা হাঁটে, তার প্রতিদিনের হাঁটা-হাঁটে। প্রতিদিনের মত বেগেই হাঁটে। ধীরে-ধীরে। তাড়াহুড়ো নেই। যা খুঁজছে তা খুঁজে যেতে হয়, তাড়াহুড়ো করলেই পাওয়া যাবে, তা নয়। শুধু বেঁচে থাকার জন্যে দরকারি খাদ্যটুকু ফরেস্টের ভেতর থেকে জোগাড় করতে যে-প্রয়াসহীন ক্লান্তিহীন হাঁটা হাঁটতে হয়—তেমনি ভাবে সে হাঁটে। শুধু তার হাতে অস্ত্র হিশেবে সেই লাঠিটা নেই, তলার দিকে সমকোণ হয়ে যাওয়া সেই লাঠিটা, যা মাথার ওপর তুলে সে খড়োর মত নামিয়ে আনতে পারে, নির্ঘাত। এখন তার হাতে কোনো অস্ত্র নেই, শুধু চোখদুটো আছে, চোখের সেই দৃষ্টিটুকু আছে। এত রৌদ্রভাসিত, বায়ুতাড়িত মুক্ত জায়গায় এত মানুষের ভিড়ে চোখের দৃষ্টি সে অত তীব্র না করলেও পারত।

মাদারির মা হাঁটে আর সেই ব্যগ্র মুখগুলির দিকে চাপা তীব্রতায় চেয়ে যায়। কতগুলো গর্ভ সে ধরেছে তার একেবারে ঠিক হিশেব তার পক্ষে দেয়া সম্ভবই নয়। কোনোদিন ত সেভাবে সন্তানদের হিশেব রাখেনি। কিন্তু, একটা ছেলে ছাড়া ত তার কোনো সময়ই চলেনি। আর, ছেলেরা মাথায় একটু লম্বা হলেই ত চলে গেছে। ততদিনে ত আর-একটি ছেলে এসে গেছে।

মাদারির মা এখন তার সেই সব ছেলেদেরই খুঁজছে।

সে একের পর এক মুখ দেখে যায়—এই মুখগুলি তার চেনা রাজবংশী মুখ। একটা আন্দাজ ত তার আছে তার ছেলেদের বয়স এখন কত হতে পারে—ওপরের দিকে। তাই সেই আন্দাজি বয়সের চাইতে বয়স্ক মুখগুলো এক পলক দেখেই সে সরে যায়। আর, তার ছেলেদের আন্দাজি বয়সের সীমার মধ্যে পড়তে পারে এমন যে-কোনো মুখের দিকেই সে নিবিড় ভাবে এক পলক চায়।

এ-রকম চাইতে-চাইতে মনে-মনে সে তার ছেলেদের কথাটা একবার যাচাই করে নেয়। নেপালি জ্যেষ্ঠপুত্রের কথা আর তার পরের মদেশিয়া ছেলের কথা পরপর মনে আসে। কিন্তু তারপর সব গোলমাল হয়ে যায়। কোন ছেলে আগে—সেই মিলিটারি, নাকি সেই রাজবংশী দেউনিয়া—সে নিশ্চিতভাবে মনে করতে পারে না। তার বাকি সব ছেলে যে-কোনো বয়সী হতে পারে।

মাদারির মা একের পর এক গোর্খা মুখ দেখে যায়।

বড় বেশি চেনা এই সব ছোট-ছোট মুখ, প্রবল চিবুক আর তীব্র হনু। বয়স খুব একটা বোঝা যায় না বলে সে প্রায় কোনো মুখই বাদ দিতে পারে না আর হঠাৎ-হঠাৎ এক-একটা মুখ দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে। কোথায়, কত দূরে তার ছেলেরা গেছে যে দুনিয়ার মানুষের এই মিছিলেও তারা কেউ আসে না! তার একটা-দুটো ছেলে এ মিটিঙে আছেই, শুধু খুঁজে যেতে হবে, প্রতিদিনের খাদ্য খোঁজার মত ধীরে, অত্যন্ত ধীরে, দৃষ্টিটাকে তীক্ষ্ণ অভ্রান্ত রেখে, এই রৌদ্রভাসিত প্রান্তরেও অভ্রান্ত রেখে।

এর ভেতর প্রবল জয়ধ্বনির মধ্যে, স্লুইস গেটের অবকাশ দিয়ে কৃত্রিম বাঁধে-বাঁধে প্রবাহিত তিস্তার জল তার স্বাভাবিক গতির চাইতে বহুতর গুণ বেগে নিজেরই খাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আকাশে ফেনা ছুঁড়ে, ছুটে যায় এই মিটিঙের হাজার-হাজার মানুষের সামনে ভবিষ্যতের প্রতীক হয়ে। মাদারির মা সেই মুক্ত সফেন জলরাশির দিকে তাকায় না। তার কাছে এই ব্যারেজ, এই স্লুইস গেট, এই নদীনিয়ন্ত্রণ, এই মঞ্চ, এই জয়ধ্বনি অবান্তর। তিস্তার জল এমনিতেও তার শ্যাওড়াঝোরায় যায় না। ব্যারেজ হলেও যাবে না। কিন্তু এই জলরাশিকে, এই নতুন তিস্তাকে অভিনন্দন জানানো জয়ধ্বনিমুখর মুখগুলো তার পক্ষে বড় বেশি প্রাসঙ্গিক। এই মুখের অরণ্যে তার ছেলেদের মুখগুলো আছে। খুঁজতে হবে। মাদারির মাকে ধীরে পায়ে খুঁজতে হবে। ফরেস্টের ভেতর যে-পদক্ষেপে সে রোজ তার খাদ্য খোঁজে, সেই পদক্ষেপে খুঁজতে হবে।

মাদারির মা একের পর এক মদেশিয়া মুখ দেখে যায়—তার ছেলেদের সমবয়সী মুখ—বড় বেশি চেনা এই মুখের লম্বা ধাঁচ, চওড়া কপাল, চোয়ালের চওড়া হাড়।

দুশ আঠার

মাদারির মায়ের স্বরাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তন—অন্ত্যপর্বের শেষ অধ্যায়

রাত মাঝামাঝি কাবার হয়ে যাবার পর একটা ট্রাক ন্যাশন্যাল হাইওয়ে দিয়ে ছুটতে-ছুটতে এসে মাদারিহাটের হাটখোলায় দাঁড়িয়ে পড়ে, কিন্তু স্টার্ট বন্ধ করে না। ট্রাকভর্তি মেয়েপুরুষ ঐ আচমকা থামার ঝাঁকুনিতে ঝিমুনি থেকে জেগে ওঠে। ট্রাকের ভেতরের এক কোণ থেকে ক্লিনার নিদ্রিত গলায় বলে ওঠে, 'কে নামবেন, মাদারিহাটে, নামেন।'

মাদারির মা ট্রাকের পেছনে বসে ছিল। সে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে তাকিয়ে মাটির দূরত্ব দেখে নেয়। ক্লিনার আর-একটু কম নিদ্রিত গলায় বলে, 'এদিক দিয়ে নামেন, এদিক দিয়ে।' বলে ক্লিনার উঠে দাঁড়ায়! পুরো ট্রাকটা পার হয়ে মাদারির মাকে সামনে দিয়ে নামতে হবে।

সে বাঁ পাশ দিয়ে এগতে-এগতে চাকার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর ডালাটা ধরে বাঁ-পাটা নামিয়ে চাকার ওপর রাখে, 'আরে, আরে পড়ে যাবেন, পড়ে যাবেন', ক্লিনারের এই কথা শুনতে-শুনতে ডান পাটাও সে চাকার ওপর নামায়, তারপর চাকার ওপর থেকে বাঁ পাটা মাটির দিকে নামায়—ট্রাকের ডালা ধরে থাকা হাত টানটান করে যতটা ঝোলা সম্ভব ঝুলে—হাত ছেড়ে দেয় আর রাস্তার ওপর ধুপ করে বসে পড়ে। ক্লিনারটি ওদিক থেকে এদিকে এসে উঁকি দিয়ে দেখে, ততক্ষণে মাদারির মা দাঁড়িয়ে

পড়েছে। ক্লিনার ভাল করে তাকে দেখে নিয়ে ড্রাইভারের কেবিনের পেছনে চড় মারে। রাতময় একটা আওয়াজ তুলে ট্রাকটা সোজা বেরিয়ে যায়—আওয়াজের প্রতিধ্বনিকে দীর্ঘ, দীর্ঘ করে। বাঁক নিতেই ট্রাকের লাল আলোটা আর মাদারির মা দেখতে পায় না, কিন্তু আওয়াজটা অনেকক্ষণ ধরে শুনতে পায়। এবং শোনে।

মাদারির মা তার গাড়ি হারিয়ে ফেলেছিল। শেষে এক ভদ্রলোকের ছেলে, তাকে নিয়ে খুঁজে-খুঁজে এই ট্রাকটাতে তুলে দিয়েছে, ট্রাকটা মাদারিহাটের ওপর দিয়ে ফালাকাটার দিকে যাবে।

ট্রাক চলে যাবার পর মাদারির মা সেই নিশুতরাতের মাদারিহাটের একই জায়গায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকায়। মাদারি আগে এসে কোথাও বসে থাকতে পারে, সে যাতে তাকে দেখে 'মাই গে' বলে ডেকে উঠতে পাবে সেজন্যে মাদারির মা নিজেকে দৃশ্যমান করে রাখে—ঐ রাতে ঐ অন্ধকারে যতটা দৃশ্যমান করে রাখা সম্ভব।

মাদারি যদি তার অপেক্ষায় কোথাও বসেই থাকত এই হাটখোলায় তাহলে ট্রাক থামলেই চলে আসত। অবিশ্যি ঘুমিয়ে পড়ে থাকতে পারে।

মাদারির মা রাস্তা ছেড়ে রাস্তার পাশের দু-একটা দোকানের বারান্দা দেখে। ঘোষমশাইয়ের দোকানের ঝাঁপ বন্ধ। তার বাইরে থেকে মাদারির মা ডাকে—'হে-এ মাদারি, মাদারি, হে-এ মাদারি।' একটা কুকুর অন্ধকারের ভেতর থেকে নিঃশব্দে এসে মায়ের কোমরের দিকে তার নৈশ গ্রীবা তুলে দেয়। তার ঘন নিশ্বাসের বাতাস মাদারির মায়ের কোমরে, উরুতে, লাগে। সে কি খাবার চায়, নাকি সঙ্গ, নাকি আক্রমণই করতে চায়—বোঝা যায় না।

মাদারির মা ডাকে, 'হে-এ মাদাবি, মাদারি গে, মাদারি।'

এবার ভেতর থেকে বাহাদুরের ঘুমজড়িত স্বরে জবাব আসে, 'মাদাবি গাড়িত আসে নাই।'

মাদারি আসে নাই। এলে ত বাহাদুরেব গাড়িতেই মাদারি আসবে। নাকি মাদাবি আর বাহাদুবও ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল? কুকুরটার আরো ঘন শ্বাস মাদারির মায়েব গায়ে লাগে। মাদাবির মা ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'মাদারি কোটত গেইল?' একবারই জিজ্ঞাসা কবে। সে জানে এই প্রশ্নেব কোনো জবাব পাওয়া যাবে না, তাই একটু দাঁড়িয়ে থেকে সে আবার রাস্তায় ওঠে।

এখন সে শ্যাওড়াঝোবার দিকে হাঁটে। তার প্রতিদিনের হাঁটার মত করে নয়, কারণ এখন তাকে ত কিছু খুঁজতে হয় না—এই নিশুতিতে, অন্ধকারে। এখন তাকে মাইল-মাইল হেঁটে শ্যাওড়াঝোরায় ফিরতে হবে—ততক্ষণে রাত আরো কয়েক ঘণ্টা ফুকবে। কত মাইল তাকে হাঁটতে হয়, সে জানে না—যতক্ষণ না পৌঁছয় সে হেঁটে যাবে।

সে বোঝে কুকুরটা তার সঙ্গে-সঙ্গে চলেছে—কিসের গন্ধে, কে জানে? একবারও ডাকেনি। মাঝে-মাঝে দু-এক পা পেছিয়ে পড়ছে, মাটি শুঁকছে বোধহয়—সেটা মাদারির মা অনুমান করে রাস্তার ওপর কুকুরটির শ্বাস ফেলার প্রতিধ্বনিতে। মাঝে-মাঝেই তার গলাটা লম্বা কবে মাদারির মায়ের গায়ের গন্ধ শোঁকে।

মাদারি ফেরেনি। বাস বা ট্রাক গোলমাল করে থাকতে পারে—যেমন মাদারির মা নিজেই করেছে। তা হলে, মাদারির মায়ের মতই কি সে আর-কোনো গাড়িতে এসে পড়ত না? বাহাদুরের সঙ্গ মাদারি ছাড়ল কেন? এমনিই ছাড়াছাড়ি হয়ে থাকতে পারে। বা, মাদারিকে দেখেশুনে ফেরত নিয়ে আসছে—সে-দায়িত্ব ত বাহাদুরকে কেউ দেয়নি।

এক হতে পারে—মাদারি চলে গেল, আর-কোনোদিনই ফিরবে না। এত জায়গা থেকে এত গাড়ি এসেছে, এত মানুষ, এত কাজ। পাহাড় বেঁধে নদীর বন্যাকে আটকে দেয়া হচ্ছে, আবার ইচ্ছে মত বন্যা ছেড়ে দেয়া হচ্ছে, বন্যার জলও নদীর খাত ছেড়ে যেতে পারবে না—এই সব একবার দেখে ফেলার পর মাদারি আর ফিরতে পারে না। তার ছেলেরা হাসিমারা, শিলিগুড়ি, নেপাল—এই সব দূর-দূর জায়গায় চলে গেছে। মাদারিকে, আর সে-ভাবে যেতে হল না—সে তার মায়ের সঙ্গেই সেই দূরের একেবারে ভেতরে গিয়ে সেখানেই থেকে গেছে।

রাস্তাটা যেখানে ফরেস্টে ঢুকে পড়ল, সেখানে ফরেস্টের গাছগুলোও যেন রাস্তার ওপর উঠে এসেছে। পাতায়-পাতায় ছাওয়া সেই রাস্তাটাকে একটা গুহার মত লাগে, আরো অন্ধকার গুহা। সেইখানে, প্রায় সীমান্তে, কুকুরটা দাঁড়িয়ে গেল। মাদারির মায়ের নাকে এসে লাগে ফরেস্টের তীব্র

ভেজা গন্ধ, সবুজের, এমোনিয়ার। কুকুরটাও সে-জন্যেই দাঁড়িয়ে যায়—এই গন্ধের ভেতব মানুষেব সঙ্গে-সঙ্গে থাকা কুকুর ঢুকতে ভয় পায়। ঐ গন্ধের ভেতর অনেক বেশি ছায়া, অনেক বেশি আওয়াজ, অনেক বেশি গন্ধ। মাদারিব মায়ের গায়ে কুকুরটি সেই কোন আবণ্যক জন্মান্তরের গন্ধ পেয়েই কি কুকুরটা সঙ্গ নিয়েছিল ?

সেই অন্ধকার গুহার মত রাস্তা দিয়ে তরতরিয়ে মাদারির মা চলে যায়। ঐ গন্ধের ভেতরে, আরো ভেতরে, ঢুকে যায়। তার নিজের পায়ের সঙ্গে রাস্তাব ঘর্ষণের আওয়াজ এমনই তীব্র হয়ে কানে আসে যে জঙ্গলের আওয়াজগুলো তার কানে আসে না। সে খুব একটা কানও দেয় না।

রাত্রির পশুর মত খর অথচ সতর্ক পায়ে মাদারির মাকে সেই ঢাল আর বাঁক পেরিয়ে তাব তৈরি শ্যাওড়াঝোরার জলেভেজা ন্যাশন্যাল হাইওয়েতে দাঁড়াতে হয়। তার সামনের অন্ধকারটা, একটা পাথরের মত গোটা। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে সেই পাথরটা, অন্য আকার পায়। তার শ্যাওড়া গাছটার যে-ডালটা ওপরের দিকে উঠে গেছে তা অন্ধকারে দাঁড়ানো হাতির শুঁড়ের মত দোলে আব যে-ডালটা নীচে নেমে গেছে তা অন্ধকারের হাতির মত ঝোরা থেকে জলপান করে।

এই জাতীয় সড়ক দিয়ে ভারতবর্ষ যাতায়াত করে, রোজ। আজ মাদারির মা দেখে এল মানুষ পাথব বেঁধে-বেঁধে নদী বানাল, নদীর বন্যা বানাল, তৈবি-করা বন্যার সে-জলও খাত মেনে চলে—উপছোয় না।

মাদারির মায়ের কাছে এই সবই অবাস্তব—এই জাতীয় সডক, এই সড়ক দিয়ে প্রতিদিন যাতাযাত করা ভাবতবর্ষ, ঐ নদী, ঐ ব্যাবেজ, ঐ বন্যা। সে জাতীয় সড়কের পাশেই তার নিজের নদী, নিজেব বৃক্ষ, নিজের পাথব দিয়ে নিজের শ্যাওড়াঝোরা তৈরি করে নিয়েছে। তাব নিজের তৈরি শেষ মানুষটিও ছিল, আজ থেকে আর-থাকল না বোধ হয।

মাদারির মা কোমর বেঁকিয়ে চডাইটা পেরিয়ে তার পাতার ঘরের দিকে উঠতে শুরু করে।

বহু-বহু মাইল দূব থেকে সেই কুকুবটাব প্রবল কান্না এতক্ষণে একটানা ছুটে আসে অন্ধকাব গুহাব মত সেই জাতীয় সডক দিয়ে—এই ফরেস্টে এখন মনুষ্যপালিত কোনো পশুবও প্রবেশ নিষেধ।

বাকি রাতটুকুর জন্যে মাদাবিব মা তার পাতাব ঘরে প্রবেশ করে।

এ-বৃত্তান্ত এখানেই শেষ কবা ভাল—সব বৃত্তান্তই ত একটা যোগ্য জায়গায় শেষ কবতে হয়। এ-বৃত্তান্তের পক্ষে এটা বেশ যোগ্য জায়গা। মাদারিব মায়েব পক্ষে দূবতম ভ্রমণশেষে ঘবে ফিরে আসা—একা। মাদারি ফেরে না।

শেষ না-কবলে ত এ-বৃত্তান্ত চলতেই থাকবে—পরদিন, তাব পরদিন, তার পরদিন।

কারণ, মাদারির মা ভারতবর্ষের প্রায় আশি কোটি মানুষের মধ্যে সেই ছ-সাত কোটির এক জন, যারা বনের পশুর নিয়মে বাঁচে। 'দারিদ্র্যসীমা', 'পশ্চাদপদ অংশ', ইত্যাদি-ইত্যাদি শব্দ তাকে ছোঁয না।

ফলে, মাদারির মায়ের প্রতিদিনেব বাঁচাই এক স্বাধীন, সার্বভৌম, স্বরাট্‌, স্বাবলম্বী বাঁচা। সেই বাঁচা, দিনের পর দিন বেঁচে থাকা নয় মাত্র, প্রতিটি দিনই একটা পুরো জীবন বাঁচা, একটা গোটা মানবজীবন বাঁচা। সেই বাঁচার নিয়মেই সে তিস্তা ব্যারেজ, কাবেরী ব্যারেজ, হীবাকুঁদ ড্যাম, ভাকরা-নাঙ্গাল এই সবের বিরুদ্ধে তার নিজের এক শ্যাওড়াঝোরা বানাতে পারে। সেই বাঁচার নিয়মেই নিশিদিন ভারতবর্ষ যাতায়াত করে এমন একটা সড়কের পাশে নিজের এক রাষ্ট্র কায়েম করতে পারে।

কিন্তু এ-নিয়ে গৌরব করারও কিছু নেই। মাদারির মায়ের দারিদ্র্যের মধ্যে ত কোনো গৌরব নেই, বড় বেশি অপমান আছে।

সেই অপমানের বিচ্ছিন্নতাকে বিদ্রোহের বিচ্ছিন্নতা বলে ভাবার মধ্যে, তার সাতকাহন বৃত্তান্ত রচনার মধ্যে, মিথ্যা কিছু থেকেই যায়। ভারতবর্ষে যারা কালি-কলম ব্যবহার করতে জানে, আমাদের মত, তারা জানে না ভারতবর্ষের দরিদ্রতম ছ-সাত কোটির কথা কোন অক্ষরে লেখা যায়। তাই অক্ষরজ্ঞানহীন এই বৃত্তান্ত যত লেখা হবে, ততই মিথ্যা হবে—'সে কহে বিস্তার মিছা, যে কহে বিস্তর।'

এ বৃত্তান্ত তাই এখানেই, এমনই একটা যোগ্য জায়গায়, শেষ হোক।

মাদারির মা তার পাতার ঘরে রাত্রির বাকি কয়েক ঘণ্টা শেষপুত্রহীন কাটাক।

পরিশিষ্ট

দুশ উনিশ

এই বৃত্তান্তরচনার যুক্তি ও বৃত্তান্তসমাপ্তির কারণ

তিস্তাপারের বৃত্তান্ত শেষ হয়ে গেছে।

পাহাড় থেকে সমতলে নামার পর তিস্তার দৈর্ঘ্য ত মাত্র কয়েক মাইল। তাও আবার ভারতীয় ইউনিয়ন আর বাংলাদেশের মধ্যে ভাগ হয়ে গেছে। কিন্তু সেই কয়েক মাইলের মধ্যেই জোতপর্ব, বনপর্ব, চরপর্ব, ফরেস্টের বৃক্ষপর্ব, মিটিং-মিছিলপর্ব, তিস্তা ব্যারেজ পর্ব এই সব নানা ভাগ আছে। এগুলো আসলে নানা চিহ্নও ত বটে। এই সব চিহ্ন রেখে-রেখেই একটা নদী উপন্যাসেব ভেতর দিয়ে-দিয়ে বয়ে যায়। এই সব চিহ্ন দেখে-দেখেই আমবা উপন্যাসের ভেতরে প্রবহমাণ একটা নদীকে চিনে নেই।

সেই আদি পর্বের লোকরা অনেকেই অন্ত্যপর্বে তিস্তা ব্যাবেজের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল। আদিপর্বে তিস্তাব জলপ্রান্তর আপলচাঁদ ফবেস্টেব ভেতর যে-গাজোলডোবা গ্রামে প্রথম এ-বৃত্তান্তে দেখা গিয়েছিল, ঘটনাক্রমে সেই গাজোলডোবাতে সেই আপলচাঁদের ভেতবই তিস্তার ভেতর মৈনাকের মাথা, মানুষের তৈরি মৈনাকের মাথা, জেগে উঠেছে—তিস্তা ব্যারেজ। এতে সত্যি-সত্যি যেন একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ হল। একটি বৃত্তান্তের সমাপ্তি ঘটল।

বাস্তবে কিন্তু তেমনটি হয়নি। এ-বৃত্তান্ত লিখবার সময় জুড়ে তিস্তা ব্যারেজের কাজ চলেছে। এখনো সে-কাজ শেষ হয়নি। এ-বৃত্তান্তে যখন প্রথম গাজোলেডোবা গ্রামে তিস্তার পাড়ে সার্ভেব কথা লেখা হযেছিল, তখন জানাও ছিল না—ঐ গাজোলডোবাতেই তিস্তা ব্যারেজেব প্রধান ঘাঁটি হবে। এ-বৃত্তান্তে তিস্তা ব্যাবেজেব উদ্বোধনেব কথা যখন লেখা হয়েছিল—তখন উদ্বোধন হবে এমন কথা ওঠেই নি। কিন্তু কিছু দিন পরে এই বৃত্তান্তের বর্ণনানুযায়ীই একটি উদ্বোধন-অনুষ্ঠান ঘটেছিল। এ-বৃত্তান্তে কোনো ব্যক্তি বা ঘটনাকে বা ইতিহাসকে নথিভুক্ত কবা হয়নি। ববং বাববার এই বৃত্তান্ত থেকে বেবিযে গিয়ে কোনো ঘটনা বাইরে কোথাও ঘটে গেছে, হযত ইতিহাসও হযে গেছে। উপন্যাসেব মতই এই সব ব্যারেজও ত একটা সৃষ্টিকর্ম। তাই সৃষ্টির যুক্তিতে এ দুই ঘটনা, এই ব্যারেজ আব এই বৃত্তান্ত, একই জায়গায় ফিবে-ফিরে আসছে। আসছেই যখন, তখন সেইখানে ফিবে আসার আগে এ-বৃত্তান্ত শেষ করা যেত না।

এ-বৃত্তান্ত শেষ হওয়ার পব এর আর নতুন কোনো পর্বান্তরও সম্ভব নয়। ব্যারেজ উদ্বোধনের সঙ্গে-সঙ্গে এ-বৃত্তান্তের তিস্তা ইতিহাস হযে গেল। এখন আর তিস্তা সেই পুরনো তিস্তা থাকল না। এখন প্রকৃতির সেই নদীর পুনর্জন্ম ঘটবে মানুষের হাতে। হিমালয়ের তুষাবগলা জল আর মৌসুমি মেঘেব বৃষ্টিধারায় তিস্তার জল যতই বেড়ে উঠুক, তা বয়ে যাবে মানুষের নির্দেশিত খাতে, নির্দেশিত গতিতে। তখন চর জেগে উঠবে মানুষের ইচ্ছায়। সে-চরকে সবুজ করে দিয়ে নদী তার পাশ দিয়ে অনুগত বয়ে যাবে—মানুষের তৈবি নিসর্গে। তিস্তা নিয়ে কোনো উপকথা পুরুষানুক্রমে বয়ে আসবে না। তিস্তা ব্যারেজের পর তিস্তার প্রাকৃতিক জীবন শেষ, এখন সে এক মানবিক নদী। তিস্তা তার মানবিক ইতিহাসেব পর্বে ঢুকবে। তিস্তাবুড়ি, কুমারী হযে উঠবে।

এই 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' সেই প্রাকৃতিক তিস্তাব সঙ্গে মানুষজনের সহবাসেব রীতিনীতির বৃত্তান্ত। গয়ানাথের সঙ্গে তিস্তার সহবাসের এক রকম রীতিনীতি, নিতাইদের সঙ্গে আর-এক রকম আর সীমান্তবাহিনীর সঙ্গে আরো এক রকম। বাঘারুর রীতিনীতি বলে কিছু নেই। তিস্তা তার নদীস্বভাবে প্রাকৃতিক, সে জল ছাড়া কিছু নয়। বাঘারু তার মানবস্বভাবে প্রাকৃতিক—সে কেবল মানুষ, একজন মানুষ ছাড়া কিছু নয়।

এই বৃত্তান্ত লেখা এখানেই শেষ হল। তিস্তা ব্যারেজ আরো কয়েক বছর পর শেষ হবে। তখন সেই নতুন, মানুষের তৈরি নদীর সঙ্গে মানুষজনের সহবাসের বীতিনীতি একেবারে আমূল বদলে যাবে। কত দ্রুত আর কতটাই আমূল যে তা বদলায—তা বদলানোর আগে আমরা ধারণাও করতে পাবি না, বদলানোর পরও মাপতে পারি না।

ব্যারেজে জল আটকে ফেলায় কত নতুন জমি চাষে আসবে। ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ায় কত নতুন

জমি চাষে আসবে। দুই নম্বর কচুয়ার সঙ্গে মণ্ডলঘাটের আর কোনো তফাত থাকবে না—সেটা মণ্ডলঘাটেব ভেতরই চলে আসবে।

নিতাইদের চরটা বোধহয় থাকবে না—ব্যারেজের অত কাছে অত বড় চর রাখা যাবে না। কিন্তু তার বদলে তিস্তার বাঁয়ে বা ডাইনে তিস্তাকে সরিয়ে এনে নতুন জমি বের করে নিতাইদের নতুন গাঁ বসানো হবে হয়ত। দহগ্রামের ছিটমহলগুলো নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে কথাবার্তা বলে সীমান্তটা শুধু স্থলভাগ দিয়েই চিহ্নিত করা হবে হয়ত!

তিস্তা ব্যারেজের ফলে তিস্তার সঙ্গে গয়ানাথের সহবাসের রীতিনীতি সবচেয়ে বেশি বদলে যাবে। সে পুরনো মামলাগুলির কিছু জিতবে, কিছু হারবে। নতুন মামলাও কিছু করতে পারে। কিন্তু সে-ই সবচেয়ে তাড়াতাড়ি অভ্রান্ত বুঝে যাবে—ব্যারেজের অর্থ কী? ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে ভাগের মামলায় সে জিতলেও পাবে এক চিলতে জমি আর কয়েকটা শালগাছ। আর তিস্তা ব্যারেজের ফলে সে পাবে এক জমিতে তিন ফসল। ব্যারেজের নিশ্চিত জল, ব্যারেজের ফলে বন্যার অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি, কেমিক্যাল সাব আর ট্র্যাক্টার—সেই তিনটি ফসল খোলানে তুলে দিল বলে। গয়ানাথ পাওয়ার-টিলার কিনে ভাড়া খাটাবে। গয়ানাথের গাই-বলদ কমে আসবে, জমিও হয়ত একটু কমে আসবে, বাঘারুও কমে আসবে—কিন্তু ফলন বাড়বে, বিক্রি বাড়বে, লাভ বাড়বে।

আর, এই ব্যাবেজেব ফলেই গয়ানাথের কত কাছাকাছি চলে আসবে রাধাবল্লভদের কৃষক সমিতি। গয়ানাথদের সঙ্গে রাধাবল্লভদের ঝগড়া-মারামারি ছিল খাশজমির দখল নিয়ে। পুরনো তিস্তায়, এই বৃত্তান্তের তিস্তায়, ছিল সম্পত্তির জোতদারি। নতুন তিস্তায়, এই বৃত্তান্তের পরের তিস্তায়, শুরু হবে ফলনের জোতদাবি। সম্পত্তির জোতদারিতে রাধাবল্লভদের সঙ্গে গয়ানাথদের সংঘাত ছিল। ফলনের জোতদারিতে রাধাবল্লভরা আর গয়ানাথরা ত সহকর্মী। গয়ানাথের পাওয়ারটিলার ছাড়া রাধাবল্লভদের চলবে না। আবার গয়ানাথের নিজের জমিতেও তিন-চারটি ফসল ফলবে, কৃষক সমিতির ভেস্টজমিতেও তিন-চারটি ফসল ফলবে। গয়ানাথ আর কৃষক সমিতি একসঙ্গে তখন ন্যাশন্যাল হাইওয়ের ওপর বসে—'রাস্তা রোকো' আর 'জেল ভরো' আন্দোলন করবে। আন্দোলনের যে-সব কায়দা রাধাবল্লভদের কৃষক সমিতির জানা আছে, সেই সব কায়দা দিয়ে সরকারের কাছ থেকে কৃষিপণ্যের 'ন্যায্য' দর আদায় করার জন্যে গয়ানাথ আর কৃষক সমিতি মিলে আন্দোলন করবে—যেমন করছে উত্তরপ্রদেশে, যেমন করছে মহারাষ্ট্রের 'খেতকারী'রা।

ব্যারেজের ফলে তিস্তাপারের ফরেস্ট বদলে যাবে, আপলচাঁদ বদলে যাবে। এ-সব ফরেস্ট ত মানুষের পরিকল্পনার ফলে তৈরি হয়নি। প্রচুর-প্রচুর বৃষ্টিপাতে আর তিস্তার পলিতে এই তরাই-ডুয়ার্স সেই কবে থেকে ত এমন ঘন বন হয়ে আছে। যত ঘন হয়েছে, তত লম্বা-লম্বা গাছ হয়েছে। এক-একটা শাল, সেগুন, অর্জুন, খয়ের, লাম্পাতি গাছ দশকের পর দশক ধরে বেড়ে উঠেছে। আর সেই ভাবে বড় হতে-হতে স্থায়ী হতে-হতে এই পর্ণমোচী অরণ্য হয়ে উঠেছে প্রাকৃতিক। তা থেকে গাছ কেটে বিক্রি করা হয়েছে। দেশ-দেশান্তরে এখানকার শালগাছের সুখ্যাতি রটেছে। কিছু নতুন গাছ লাগানোও হয়েছে নিশ্চয়ই। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতাই ত হয়েছে মাত্র চল্লিশ বছর। শালগাছের একটা বন তৈরি করতে চল্লিশ বছর আর-কতটুকু সময়।

ব্যারেজ জল দেবে, ব্যারেজ বন্যা ঠেকাবে—তা হলে এই সব হাজার বছরের পরমায়ুওয়ালা গাছ নিয়ে কী হবে? এ-সব গাছ উৎপাটিত হয়ে যাবে—তার জায়গায় নতুন গাছ বোনা হবে। সে-সব গাছ অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বাড়ে, তাড়াতাড়ি পাকে, তাড়াতাড়ি বিক্রি হয়। ইউক্যালিপটাস হয়ত এ-সব বৃষ্টি-বাদলের জায়গায় তত ভাল হবে না। কিন্তু অন্য কোনো গাছ আবিষ্কার হবে—নরম গাছ। সে-গাছ থেকে ত স্থানীয় কোনো শিল্পও তৈরি হতে পারে।

বন বদলালে জীবজন্তু বদলে যাবে। হরিণ যদি তার খাবারযোগ্য ঘাস না পায়, তার নাকে যদি অভ্যস্ত গন্ধ না আসে, সে যদি এ-বনভূমিতে নিজেকে মিশিয়ে দেবার কোনো আবরণ না পায়, তা হলে সে এখানে থাকবে কী করে। গণ্ডারের যদি ছায়া না জোটে, ভেজা পচা পাতা না জোটে, গড়াবার মত কাদা না জোটে তা হলে সে তার উদাসীন পা ফেলে-ফেলে কোনো এক দিকে হেঁটে চলে যাবে। হাতিরা দল বেঁধে চলাফেরা করে। শিশু বয়সে দলের সঙ্গে-সঙ্গে থেকে শেখে পাহাড়ের কোন পথ দিয়ে নামতে হয়, কোন নদীর পাড় ধরে-ধরে এগতে হয়, কোথায় নদী পেরতে হয়, কোন জায়গায় পাওয়া যাবে স্বাদু

চালতার বন, কোথায় আছে বড়-বড কলাগাছ। তারপব নিজে জোয়ান হয়ে তার দলকে সেই পুরুষানুক্রমিক পথেই নিয়ে আসে। কিন্তু এই বনই যদি না থাকে—হাতির পাল কী করে নিজে পথ নির্ণয় করবে। তা ছাড়াও সেই নতুন বনের নতুন গাছ দ্রুত বেড়ে ওঠে, দ্রুত বিক্রি হয়। হাতির পালকে ত আর সে-বনে ঢুকতে দেয়া যায না। একটা শালগাছেব ডাল ভাঙলে আব-একটা ডাল গজাবে। কিন্তু এ-সব গাছেব ডাল ভাঙলে ত আর্থিক ক্ষতি ' নগদ ক্ষতি ' সেই নতুন বনে হাতিব পাল পথ বদলাবে।

তিস্তাপাবের এই সব বনে বানর খুব বেশি। এত ঘন বনে, এত উঁচু-উঁচু গাছে আব এত জমাট জঙ্গলে ('আন্ডারগ্রোথ') বানরদের সব দিক থেকেই সুবিধে। তাবা একটা এলাকায গাছ থেকে গাছে চলে যেতে পারে অনায়াসে। গাছেবও খেতে পাবে, তলাবও কুড়োতে পারে। পাখি আর জন্তু-জানোয়ারদের সঙ্গে তাদের নানা রকম খেলাও চলে। কিন্তু সেই নতুন ফরেস্টে বন ত এত ঘন হবে না—ফরেস্টেরই প্রয়োজনে। সে-বনে এই জঙ্গলও হয়ত থাকবে না—ফবেস্টেরই প্রয়োজনে। সেই নতুন বনে যে-গাছগুলো দ্রুত বেড়ে উঠবে আব দ্রুত বিক্রি হবে সেগুলোর ডালপালা এতই দামি যে বানরদের সেখানে ছেড়ে দেয়া যায় না!

এই সব ফরেস্টে অজস্র পাখি আছে। নতুন পাখি আসে কি না কে জানে কিন্তু পুরনো পাখিদেরই এক বিশাল পৃথিবী তৈরি হয়ে আছে বড-বড় গাছের সুযোগে। আর ঘন জঙ্গলের সুযোগে আছে নানা ধরনের সাপ, প্রধানত পাইথন। এদের এই বন ছাড়তে হবে।

কিন্তু তিস্তাপরের বৃত্তান্ত যে-এমন আমূল বদলে যাবে—তাতে বাঘারু, মাদারিব মা ও মাদারির কী হবে?

তারা কি গয়ানাথ-রাধাবল্লভ-নিতাইদেব মত নতুন তিস্তাব সঙ্গে, নতুন ফরেস্টেব সঙ্গে, নতুন চাষবাসের সঙ্গে মিলেমিশে যাবে? নাকি, তাবা ঐ গণ্ডার, হরিণ, হাতিব পাল, বানরের দল, পাখি, সাপদের মত এই বন্ন বদলাবে, এই নদীকে ছেড়ে অন্য কোনো অপরিবর্তিত নদী-তীর খুঁজবে?

নৃতত্ত্বে অবিশ্যি এর একটা জবাব আছে। বানব থেকে মানুষ হয়ে ওঠাব পাঁচ লক্ষ বছব ধরে যে-সব মানবগোষ্ঠী নিজেদের নিয়ত বদলাতে-বদলাতে এসেছে, তাদেব মধ্যে অনেকগুলি গোষ্ঠী সেই আদি মানবসমাজ থেকে আধুনিক মানবসমাজেব রূপান্তরের মাত্র হাজাব পাঁচেক বছব আব তাল রাখতে পারেনি। তারা সেই পাঁচ হাজার বছরেব ভেতরে কোনো একটা স্তবে ঠেকে গেছে। যেমন, আন্দামান-নিকোবরের জারোয়া, উঙ্গি, সেনটিনেল বা কেরালাব গুহামানববা। তেমনি নদী-অরণ্য এই সব প্রাকৃতিক বিষয় বদলে দিয়ে যে-নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা তৈরি হচ্ছে, তার সঙ্গে বাঘারু, মাদারির মা ও মাদারি তাল রাখতে পারেনি, তারা ঐ আদি একটা স্তরে আটকে গেছে। এদের জন্যে অর্থনীতিতে একটা নতুন নামও তৈরি করা যায়, 'উৎপাদন ব্যবস্থার আদিবাসী-উপজাতি।' কিন্তু এ-রকম নৃতাত্ত্বিক তত্ত্ব বা তুলনা দিয়ে বাঘারুসমস্যা সামলানো যাবে না। অবিশ্যি সমস্যা বলে মেনে নিলে তবে ত সমাধানের কথা আসে। এ-বৃত্তান্তের যে-কোনো পাঠকই অনুমান কবতে পারবেন যে এখন নদী যতই বদলাক, ফরেস্ট যতই বদলাক—বাঘারু, মাদারির মা ও মাদারি বদলাবে না। বদলের আগেই আমরা জানি কী বদলাবে আর কী বদলাবে না। কিন্তু নৃতত্ত্বে কি এমন কোনো পদ্ধতি আছে যাতে এ-রকম আগে থেকে বলা যায় কোন্-কোন্ গোষ্ঠী তাল মেলাতে পারবে না, ও আটকে যাবে? মাদারির মা আর বাঘারু ত পুরনো উৎপাদন ব্যবস্থারও কেউ ছিল না। তাদের তাই আটকে থাকারও কোনা জায়গা নেই। আর, পুরনো উৎপাদন ব্যবস্থায় তারা কোথাও ছিল না বলেই নতুন ব্যবস্থাতেও তাবা কোথাও থাকবে না। মাদারির মা যেখানে আছে, সেখানেই থাকতে-থাকতে ঘাসপাতার সঙ্গে মিশে যাবে। কিন্তু বাঘারু ও মাদারির কী হবে? এরা দুজনই শেষ পর্যন্ত এই বৃত্তান্তে অমীমাংসিত থেকে যাচ্ছে।

সেদিন বাঘারু স্বাধীন পা ফেলে উদ্বোধন মঞ্চের দিকে হেঁটে আসছিল। স্বাধীন—কারণ, গয়ানাথ তাকে বলেনি ঐ উৎসবে যেতে। স্বাধীন—কারণ, সে তার শরীরে এক দায় বোধ করেছিল এই নদীর ভেতর গজিয়ে ওঠা পাহাড়টার সঙ্গে তার সম্পর্ক কী তা বোঝার। সে এক ঝাঁকিতে গয়ানাথের ঝাণ্ডা ফেলে দিয়ে নদীর ব্যারেজ ও ব্যারেজের প্যান্ডেলের দিকে এগয়। আপলচাঁদ ফরেস্ট ও তিস্তা নদীতে ত এমন কিছু ঘটতে পারে না যা বাঘারুর শরীরনিরপেক্ষ। পাখিদেরও এ-রকমই স্বভাব। কোনো এক মহীরুহের ডালে-ডালে, খোঁদলে-খোঁদলে, কত বিচিত্র জায়গায় কত রকম ভাবে তারা বাসা বাঁধে, জন্ম-জন্মান্তর ধরে সে-বাসায় থাকে। একটা পাখির জীবন একটা মহীরুহের তুলনায় ক-দিনের। সেই

মহীরুহকে পাখিরা পুরুষানুক্রমিক চেনে। তারপর মহীরুহটি উৎপাটিত হলেও পাখিরা তাদের অভ্যেস ছাড়তে পারে না। তারা আকাশের সেই শূন্যতাটাকেই ডালপালা ভেবে নেয়, উড়ে-উড়ে এসে বসতে চায়। সেখানে যে সত্যি আর গাছটা নেই এটা বুঝতে সেই পাখিগুলোকে দু-এক বর্ষায় ভিজতেই হয়। শরীর দিয়ে তারা জেনে নেয়—পুরনো আশ্রয় আর নেই। তখন নতুন গাছ খোঁজে।

বাঘারু সে-ভাবেই এগচ্ছিল দক্ষিণ থেকে উত্তরে। যেন সে আছে আর ব্যারেজ আছে আর ব্যারেজের প্যান্ডেল আছে।

এখান থেকে মঞ্চে পৌঁছুবার কোনো রাস্তা ছিল না। ভি-আই-পিদের গাড়ি রাখার জায়গার পেছনে মিছিলগুলোকে বসাবার ব্যবস্থা—একেবারে ফরেস্টের ভেতর। জঙ্গল বহুদূর পর্যন্ত পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে। বাঘারু সোজা আসছিল। তার পা ফেলায় মুক্তির ছন্দও ছিল হয়ত। তার কাঁধে ঝাণ্ডা নেই, হাত-পা ঝাড়া। আপাদমস্তক খোলামেলা। অথচ অতটা নগ্নতাতেও দারিদ্র্য থেকে সে সম্পূর্ণ মুক্ত। বাঘারুকে এখন শালপ্রাংশু বলা চলে। সোজা হাঁটতে-হাঁটতে এসে বাঘারু বাঁশের বেড়ায় ঠেকে যায়। ঠেকে গিয়ে বেড়াটা টপকাতে নেয়।

তখন এক পুলিশ এসে তাকে বোঝায় এ-বেড়াটা টপকাতে দেয়া যাবে না। পুলিশটি খুব ভদ্রতার সঙ্গে বাঘারুকে দেখিয়ে দেয় এবং এগিয়েও দেয়। বাঘারুকে এখন ডাইনে ঘুরে এই বাঁশের বেড়াটার সঙ্গে-সঙ্গে এগিয়ে যেতে-যেতে আবার ফরেস্টের ভেতর ঢুকতে হবে। সেখান থেকেই বক্তৃতা শুনতে হবে। বেড়ার এক পাশে পুলিশ, এক পাশে বাঘারু—একই সঙ্গে পা ফেলে এগিয়ে যায়। তারপর এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পুলিশ আঙুল তুললে দেখাই যায়—ফরেস্টের ভেতর মানুষের অগুনতি মাথা। বাকি পথটুকু বাঘারু একাই যায়। এক জায়গায় বেড়াটা বাঁ দিকে ঘুরেছে। সেখান থেকে লোকজন বসেছে।

বাঘারু প্রথম সারিতেই ঢুকতে যায়।

বাঘারু যেদিক থেকে জনসভায় ঢুকছিল সেদিক থেকে আর-কেউই ঢোকেনি। মঞ্চ থেকে কেউ যদি নেমে এই সভার লোকজনের কাছে আসে, তাকেও ত প্রথম সারিতেই আসতে হবে।

কিন্তু প্রথম সারি ত দূরের কথা ততক্ষণে ত সভার সেই জায়গা মিছিলে-মিছিলে ভরে গেছে। সব মিছিলই এই তিস্তা ব্যারেজের উদ্বোধনে সরকারকে 'জিন্দাবাদ' দিতে এসেছে, কিন্তু, প্রত্যেকটা জায়গার মিছিলকে ত আলাদা-আলাদাই রাখতে হবে, থাকতে হবে। এক জায়গার মিছিলের সঙ্গে যদি আর-একটা জায়গার মিছিল মিশে যায় তা হলে ত সবাই হারিয়ে যাবে, একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা হবে। ফলে, এক-একটা জায়গার মিছিল এক-একটা জায়গায় গায়ে-গা লাগিয়ে, হাঁটুতে হাঁটু লাগিয়ে বসে আছে প্রায় দেয়ালের মত। বাঘারু ঐ বেড়া ধরে এসে ঐ দেয়ালের ভেতর ঢুকতে যায়। তাকে তাই ঢুকতে হবে, কারণ, বাঁশের সেই বেড়া ওখানেই বাঁয়ে বেঁকেছে আর বাঘারু ত বেড়া ধরেই এগচ্ছে। কিন্তু বাঘারু ঢুকবেই-বা কী করে, ঢুকতে দেবেই-বা কে ? তাকে সেটা বুঝতে হয়, ধাক্কা খেতে-খেতে। নানা ভাষায় তাকে একটা কথাই শুনতে হয়, পেছনে যাও, পেছনে যাও, নিজের জায়গায় যাও, নিজের জায়গায় যাও। তাদের সবার বুকে ব্যাজ। তারা বাঘারুর ব্যাজহীন বুকের দিকে তাকায়। বাঘারুর বুকে ব্যাজ লাগানোর মত কাপড় নেই। কেউ রাগ করে তাকে বলে না। কেউ-কেউ ত সহানুভূতির সঙ্গেই তাকে রাস্তা দেখিয়ে দেয়। কিন্তু সবাইই এ-ব্যাপারে প্রায় রাতে গাঁয়ের পাহারাদারদের মত সতর্ক ও সাবধান যে, তাদের মিছিলের ভেতর যেন অন্য কেউ ঢুকে না পড়ে। এই কারণে বাঘারুকে ক্রমেই পেছিয়ে যেতে হয়, ক্রমেই সরে যেতে হয়, ক্রমেই দূরে যেতে হয়।

এই প্রসঙ্গটি এখানেই থাক। যদি এটা বৃত্তান্তের প্রধান অংশের অন্তর্গত হত তা হলে না হয়, 'বাঘারুর মিছিল প্রবেশের চেষ্টা' বা 'মিছিলের বাঘারু-অবরোধ' এই নামে একটি অধ্যায় লেখা যেত। কিন্তু এখন আমরা এ-রকম কোনো ঘটনার বর্ণনা দিতে পারি না। আমরা শুধু কয়েকটি খবর জানাতে পারি।

বাঘারুকে শেষ পর্যন্ত সেই ফরেস্টের ভেতর ঐ ফরেস্টেরই মত বিরাট জনসভার একেবারে শেষে পৌঁছুতে হয়। ততক্ষণে মাইকে নানা রকম চেঁচামেচি, বক্তৃতা, শুরু হয়ে গেছে। ততক্ষণে, ফরেস্টের ভেতর এই ফরেস্টেরই মত লক্ষ-লক্ষ মানুষ সেই মঞ্চের সঙ্গে গলা মিলিয়ে স্লোগান দিতে শুরু করেছে। এই বক্তৃতা, এই স্লোগান আর এই মিছিলের মধ্যে দিয়ে বাঘারু সেই মিছিলের শেষে এসে পৌঁছয়। সেখান থেকে একবার দেখবারও চেষ্টা করে—নদীর ভেতর গজানো সেই পাহাড়ের

প্যান্ডেলটা দেখা যায় কি না। প্যান্ডেল ত দূরের কথা—মানুষের মাথারই শেষ দেখা যায় না। বাঘারু একটা গাছে হেলান দিয়ে মাটির ওপর বসে পড়ে। মিছিলের সেই শেষেও বাঘারুর আশেপাশে কিছু লোক ঘোরাফেরা করছিলই। মানে, অত শেষে গিয়েও বাঘারু মিছিলের মাঝখানেই থাকে, অথচ মিছিলগুলো সেখানে অতটা আত্মরক্ষাপ্রবণ নয়। বাঘারু সেখানে শুধু দাঁড়াবারই জায়গা পায় না, ইচ্ছেমত বসারও জায়গা পায়।

কিন্তু বাঘারু ত গয়ানাথের মিছিল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর এগিয়েছিল তিস্তা নদীর ব্যারেজ ও ফরেস্ট ও তার ভেতরকার মিলটা বুঝে নিতে। একবার বুঝে নিতে। একবার বুঝে নিলেই তার সারা জীবন চলে যায়। কিন্তু শরীর দিয়ে একবার অন্তত বুঝে নিতে হবে।

অথচ সেই মিছিল আর মিছিল আর মিছিল তাকে ঐ ব্যারেজ ও ব্যারেজের মঞ্চ থেকে এই এতদূরে সরিয়ে নিয়ে এসেছে যেখানে মাইকের আওয়াজ শুধু পৌঁছচ্ছে, সেখান থেকে নদীর বা ব্যারেজের বা মঞ্চের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মাইকের আওয়াজের ত আর কোনো অর্থ নেই বাঘারুর কাছে। সুতরাং বাঘারু যে-গাছতলায় বসে পড়েছিল, সেই গাছতলাতেই ঘুমিয়ে পড়ে। গাছে হেলান দিয়ে বাঘারু বসেছিল। গাছে হেলান দিয়ে বাঘারু ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে পড়লে মাথাটা আর সোজা থাকে না। বুকের ওপর হেলে পড়ে, না-হয় পাশে হেলে যায়। বাঘারুর মাথাটা ডান পাশে হেলে গেল। সে গাছতলায় গড়িয়ে পড়ে ঘুমোয়। শরীরটা তার গাছটাকে এমন ঘিরে থাকে যেন মনে হয় ফরেস্টের ঐ গাছটার গোড়াটা সে আঁকড়ে জড়িয়ে থাকতে চাইছে।

কিন্তু এ-প্রসঙ্গ এখানেই থাক। এটা যদি বৃত্তান্তের প্রধান অংশের অন্তর্গত হত তা হলে না-হয়, 'আপলচাঁদে বাঘারুর শেষবার ঘুমিয়ে পড়া' বা 'বাঘারু ও তার শেষ বৃক্ষ' এই শিরোনামে একটি অধ্যায় লেখা যেত।

কিংবা, 'বাঘারুর নিদ্রাভঙ্গ' বা 'মিছিলের বাঘারুবর্জন' নামে আরো একটি অধ্যায়। কারণ, বাঘারু যখন জাগে, তখন সন্ধ্যা উত্তরে গেছে, কোথাও কোনো মানুষ নেই, আপলচাঁদ আপলচাঁদের মতই নির্জন, বাঘারুর চারপাশে জোনাকি জ্বলছে, একটা পাখি বাঘারুর মাথার ওপরে ডাল বদলায়—প্যাচা হতে পারে, ময়ূরও হতে পারে। বাঘারু দাঁড়ালে বহু দূরে কিছু আলোর সারি দেখতে পায়। বাঘারু সেই আলো দেখেই বুঝতে পারে ব্যারেজ, সেই নদীর ভেতর জেগে ওঠা পাহাড়, পাহাড়ের ওপর বানানো প্যান্ডেল। বাঘারু সোজা সেই আলোর দিকে হাঁটে।

এই হাঁটাটা বাঘারুকে বদলে দিল? পরে, সে-রকমই মনে হতে পারে, কারণ সে আর ফিরে আসেও নি। কিন্তু এই হাঁটাটা কি মিছিল-মিটিঙের শেষে ঘুমভাঙা থেকে শুরু হল? এই এখন? নাকি এটা শুরু হয়েছিল, সেই সকালের দিকেই, যখন গয়ানাথের ঝাণ্ডা কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফেলে দিয়ে সে গটগটিয়ে হাঁটতে শুরু করেছিল ঐ ব্যারেজ আর মঞ্চের দিকে? যদি তখন বাঁশের বেড়ার ও পুলিশের বাধা না পেত, যদি তখন মিছিলের বাধা না পেত, তা হলে ফরেস্টের এই এত ভেতর পর্যন্ত ত সে পৌঁছুতই না! এখন সব, বাধা সরে গেছে, এখন রাত্রি, এখন রাত্রির পাখিরা ডাল বদলায়, এখন বাঘারুকে ঘিরে জোনাকি জ্বলে ও ঝিঁঝি ডাকে, এখন সেই ব্যারেজের আলোর সারি দেখা যায়, এখন বাঘারু সোজা আপলচাঁদের ভেতর দিয়ে গয়ানাথের বাড়িতে চলে যেতে পারত, কিন্তু তা না গিয়ে বাঘারু সেই সকালের দিকের বাধ্যত ছেড়ে-দেয়া হাঁটা আবার শুরু করে। তখন পথ পায়নি বলে এতক্ষণ ঘুমল। এখন পথ পেয়েছে, এখন যাচ্ছে। বাঘারুকে এ-রকম ঘুরপথে ত অনেক সময়ই যেতে হয়েছে। নইলে, গয়ানাথ তিস্তার ভেতরে ডোবা জমি তাকে দিয়ে মাপাত কী করে, তিস্তায় ভাসিয়ে দেয়া ফরেস্টের গাছ ডাঙায় তুলে বেচত কী করে। বাঘারুর পথ ত এ-রকমই একটু অদ্ভুত—গ্রহণে বাথানের গাইকে প্রসব করানো, রমণ-ইচ্ছুক পাখির ডাক ডেকে ওঠা, জলের ওপর দিয়ে হাঁটা, শ্রীদেবীর সামনে নাচা। এখন বাঘারুকে জোনাকির মধ্যে দিয়ে সেই ব্যারেজের দিকে হাঁটতে হয়।

কিন্তু এ-প্রসঙ্গ থাক। যদি একটা বৃত্তান্তের মূল অংশের অন্তর্গত হত তা হলে না-হয় 'জোনাকিসহ বাঘারুর হাঁটা,' বা 'বাঘারুকে নিয়ে জোনাকিস্রোত' এই শিরোনামে কোনো অধ্যায় লেখা যেত। বাঘারুকে জোনাকির ভেতর দিয়ে যেতে হচ্ছিল। ফলে, দূর থেকে কেউ দেখলে, দেখত, ফরেস্টময় ঐ জোনাকির মধ্যে বাঘারুর শরীরের আকারের একটা অন্ধকার এগিয়ে আসছে। সে-অন্ধকারের গায়েও দুটো-একটা জোনাকি লাগছে বটে কিন্তু তাতে জোনাকির ভেতর অন্ধকার দিয়ে তৈরি বাঘারুকে চিনে

নেয়া যায়—আকাশের অবান্তর অত তারা সত্ত্বেও ত নানা তারার অন্তর্বর্তী অন্ধকার দিয়ে তৈরি 'কালপুরুষ' বা 'সপ্তর্ষি' চিনে নিতে ভুল হয় না।

এবার বাঘারু বেড়া টপকায়। কয়েকটা ফ্লাড-লাইট ঐ ব্যারেজের প্যান্ডেলের ওপর ফেলা। বেড়া টপকে সেই আলোর ভেতর দু-চার পা যেতেই দুটো-একটা জায়গা থেকে চিৎকার ওঠে, 'এই, এই, আরে থামো, এই কোথায় যাচ্ছ? এই। এই।'

বাঘারু দাঁড়িয়ে পড়ে। এখন ত ফ্লাড-লাইটগুলি তার আপাদমস্তক নগ্ন শরীরের পেছনের ওপর। ঐ ভাবে আলোর বৃত্তে দাঁড়িয়ে বাঘারু কিন্তু দেখে সামনে সেই মঞ্চ। এখন আর মঞ্চের ওপর ঝাণ্ডা নেই।

দুজন পুলিশ বন্দুক ঘাড়ে করে ধীরেসুস্থে বাঘারুর দিকে আসে। তাদের শরীরের সম্মুখভাগে ঐ ফ্লাড-লাইট পড়ে। তারা সামনে এসে বাঘারুকে একবার আপাদমস্তক দেখে ঘাড় হেলিয়ে তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে, বেশ শান্ত নিরুত্তেজ গলায় জিজ্ঞাসা করে, 'কোথায় যাচ্ছ?'

বাঘারুও হাতটা বাড়িয়ে দেখায়, 'ঐঠে যাম, প্যান্ডেলত্!'

একটি পুলিশ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে বাঘারু প্যান্ডেল বলে কাকে। আর-একটি পুলিশ তখনই অর্ধেক ফিরে বাঘারুকে হাত নাড়িয়ে বলে দেয়, 'যাও, যাও, এখন ওখানে যাওয়া নিষেধ। মিছিল হারাইছ বুঝি-ই?'

পুলিশ দুটো প্রায় সম্পূর্ণ পেছন ফিরলে বাঘারু একই জায়গায় দাঁড়িয়ে বলে, 'না। মোর কুনো মিছিল নাই।' যেন সেই কথাটা শুনলে তাকে যেতে দিতে পারে। এবার একজন পুলিশ খুব জোরে বলে, 'মিছিল নাই ত বানাও গিয়া। যাও যাও, এখন এখানে ঢোকা নিষেধ।'

বাঘারু আর-একবার সেই ফাঁকা কিন্তু রঙিন ঝাণ্ডাহীন আলোকিত মঞ্চটা দেখে, তারপর পেছন ফিরে হাঁটা শুরু করে। যেন এদিক দিয়ে যখন ঢোকা গেল না, তাকে আর-এক রকম চেষ্টা করতে হবে। সে আলোর বৃত্তটা যখন প্রায় পেরিয়ে এসেছে, বেড়াটা টপকাবে, তখন পেছন থেকে শোনা যায়, 'এই, এই, শোনো, এই, আরে এই বাউ, শুইন্যা যাও, এই।' বেড়ার কাছ থেকে বাঘারু দেখে ঐ পুলিশদুটো কপালের ওপর হাত দিয়ে তাকে খুঁজছে। আলোর পেছনে তাকে দেখতে পাচ্ছে না।

বাঘারু কোনো জবাব না দিয়ে ঐ আলোর সীমায় ফিরে যায়, ঠিক সীমাটিতে, যাতে ওরা তাকে দেখতে পায়। ঢুকে, দাঁড়িয়ে থাকে।

পুলিশদুটোকে এবার অনেকটা হেঁটে তার সামনে আসতে হয়। এই জায়গাটা বালিভর্তি। মঞ্চে প্রবেশের রাস্তা আর সভার সীমার মাঝখানে নো-ম্যানস ল্যান্ড। তাই এখানে আর পাথর ফেলাও হয়নি, গাছও পোঁতা হয়নি। তিস্তার আদি বালি ফ্লাড লাইটে চকচক করছিল।

পুলিশদুটি সামনে এসে দাঁড়ায়। একজন বলে, 'শুনো। একটা ছোটো ছেলে হারাইয়্যা গিছে। এইখানে আছে। কী চায় বুঝি না। ঐডারে নিয়্যা যাও ত, ঠিক জায়গায় পৌঁছাইয়্যা দিও, আর কী দেইখব্যার চ্যাও ত এক পাক দেইখ্যা যাও।' তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে সেই মঞ্চের দিকে তাকিয়ে ডাকে, 'এই চ্যাংড়া, এদিকে আয়।' আবার বাঘারুর দিকে তাকিয়ে বলে, 'এক পাক কিন্তু, তার বেশি না।' তারপর আবার ঘাড় ঘুরিয়ে সেই ছেলেটির আসার সম্ভাব্য পথের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলে, 'তা, তুমিও কি হারাইছ নাকি? তোমার মিছিল গেল কই?'

'মোর কুনো মিছিল নাই।' বাঘারু জবাব দেয়।

'একলা আইছ?' পুলিশটি আবার জিজ্ঞাসা করে, বাঘারু কোনো জবাব দেয় না। তখন বাঘারু দেখে, মঞ্চের তলা থেকেই যেন, বা, যেন ঐ ব্যারেজের ভেতর থেকেই একটা ছোট ছেলে বেরিয়ে ধীরে-ধীরে এদিকে এগিয়ে আসছে। এই দূরত্ব থেকে বাঘারু অনুমানও করতে পারে না ছেলেটা কত ছোট। কিন্তু ছেলেটি ধীরে-ধীরে এই বেশি আলোতে স্পষ্ট হয়। ছেলেটি বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল। এত তীব্র আলোর দিকে আসতে ক্রমেই সে চোখ কোঁচকায়, তারপর বন্ধ করে ফেলে। পুলিশদুটো বুঝতেই পারে না—ছেলেটি তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সে আসছে কি না দেখবার জন্যে ঘাড়টা ঘোরাতেই দেখে ছেলেটি পাশে দাঁড়িয়ে। তখন তার মাথায় একটা হাত দিয়ে বলে, 'এই শোন্, এইডা এই মিটিঙের লোক, এইডার সঙ্গে যা, তোকে পৌঁছাইয়া দিব নে।'

বাঘারু ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বলে, 'মুই মিটিঙের মানষি না হই।' পুলিশটা ঠাট্টা করে ওঠে, 'আ হা হা মণি আমার, আইল্যা ঐ মিটিঙের জায়গা থিক্যা আর এ্যাহন কও মিটিঙের.লোক না।' তার পর

ধমকের সুরে বলে, 'যাও, ছেলেডারে নিয়্যা ব্যারেজ-ম্যারেজ কী দেইখব্যা দেইখ্যা রওনা দ্যাও। জলদি।' ছেলেটির মাথায় হাত দিয়ে পুলিশটি তাকে বাঘারুর দিকে ঠেলে কি ঠেলে না, মাদারি এসে বাঘারুর লম্বা হাতের আঙুলগুলি ধরে, 'তোমরালা এই ব্যারেজখান দেখিবেন?' যেন সেই লোভেই সে বাঘারুর সঙ্গে যেতে রাজি হয়।

এই অংশ যদি মূল বৃত্তান্তের কোনো পর্বের অন্তর্ভুক্ত হত, তা হলে 'মাদারি-হস্তান্তর' বা 'বাঘারু-মাদারি সাক্ষাৎ' এই শিরোনামে একটা অধ্যায় লেখা যেত। ফ্লাড লাইটের আলো এই ছোট, ঘেরা, বালুভূমিতে যেন ফেটে পড়ছে। সেই আলোর দিকে মুখ করে দাঁড়ালে চারপাশের অন্ধকারকে কঠিন মনে হয়। মঞ্চের ওপর আলো—নির্জন, রঙিন মঞ্চের ওপর। পুলিশদুটি ও মাদারির মাথা থেকে পা পর্যন্ত সম্মুখভাগে আলো। বাঘারুর মাথা থেকে পা পর্যন্ত পশ্চাদ্‌ভাগে আলো। বাঘারুর সেই শালপ্রাংশু নগ্নতা। মুহূর্তের মধ্যে মাদারি পুলিশের দিক থেকে বাঘারুর হাত ধরে বাঘারুর দিকে চলে আসে। তারও সম্মুখভাগ আবছা হয়ে যায়। মাদারি বাঘারুর হাত ধরে টেনে সেই মঞ্চের নীচ দিয়ে ব্যারেজের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

যে-পথে সকালে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রের রাষ্ট্রমন্ত্রী ও রাজ্যের অন্যান্য মন্ত্রীরা, নিরাপত্তার কারণে ছড়ানো পাথরের ওপর দিয়ে, মঞ্চের নীচের পর্দা তুলে ব্যারেজে প্রবেশ করেছিলেন, বাঘারুর হাত ধরে মাদারি সেই নিশীথ নির্জনতায় সেই পথ দিয়েই ব্যারেজে ঢোকে আর সঙ্গে-সঙ্গে সেই ব্যারেজের আলোহীন উচ্চতা, নির্জনতা, বিস্তার তাদের যেন গ্রাস করে ফেলে। নিজের চেনাজানা পথের বাইরে এসে হাতির পাল বা একলা বাঘ যেমন থমকে যায়, বাঘারু আর মাদারি তেমনি থমকায়। মাদারি ততটা নয়, বাঘারু যতটা। মন্ত্রীরা যেখানে গ্রুপ ফটোর জন্যে দাঁড়িয়েছিলেন, বাঘারুকেও সেখানেই দাঁড়াতে হয়। মাদারি বাঘারুর কব্জি শক্ত করে ধরে। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মাদারির কব্জি বাঘারু শক্ত করে ধরে, যেন এখানে আচম্বিতে আত্মরক্ষার প্রয়োজন হতে পারে।

মঞ্চের পেছনে একটি মাত্র অবান্তর আলো। কিন্তু একটা আবছায়া ছড়িয়ে আছে— আকাশ-নদী জুড়ে যেমন থাকে। বাঘারু দেখে—তিস্তা কোথাও দেখা যাচ্ছে না, তারা যেখানে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে সোজা তাকালে ওপারের বোদাগঞ্জ ফরেস্টের গাছগুলোকে মনে হচ্ছে তাদের পায়ের অনেক নীচে। এই আবছায়ায় বোদাগঞ্জ ফরেস্টের গাছগুলোকে চেনা যায় না। মনে হয়, ওর কাছাকাছি গিয়ে এই আলো, অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গেছে। কিন্তু বাঘারু এ-আকাশের ছায়া-আবছায়া, আলো-অন্ধকার সবই দেখতে পায়। সে জানে, ওটাই বোদাগঞ্জ ফরেস্ট। তা হলে, তারা কত উঁচুতে উঠে-এসেছে, যেখান থেকে ফরেস্টের গাছগুলোকে তাদের পায়ের তলায় দেখা যায়? কত উঁচুতে? তিস্তা কোথায়?

তিস্তাটাকে খুঁজে বের করতেই বাঘারুকে কয়েক পা হেঁটে এগতে হয়। খালি পায়ে পাথরের ওপর হাঁটতে তাদের অসুবিধে হয় না। বাঘারু লম্বা কিন্তু ধীর পা ফেলে—ডাইনে-বাঁয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে। অথচ তার ডাইনে ও বাঁয়ে ধু ধু আকাশ —সেখানে কী এমন ঘটতে পাবে যে বাঘারুকে আত্মরক্ষার ভঙ্গি নিতে হতে পারে ত্বরিত?

মাদারির কব্জি বাঘারুর হাতে ধরা। বাঘারু জোরে চেপে ধরে ছিল—যেন কোনো কারণে মাদারিকে তার হাত থেকে ছিটকে তেতে হতে পারে, যেন তেমন কোনে টান আচমকা আসতে পারে। বাঘারুর মুঠোর ঐ চাপের ফলেই মাদারির ভেতরা টান আচমকা আসতে পারে। বাঘারুর মুঠোর ঐ চাপের ফলেই মাদারির ভেতরও হয়ত বাঘারুর আশঙ্কা সঞ্চারিত হয়ে যায়। সে বাঘারুর পায়ের সঙ্গে লেপ্টে যায়।

কয়েক পা গিয়েই বাঘারু দাঁড়ায়। তারপর ডান দিকে সরে যায় ধীরে-ধীরে। ধীরে-ধীরে, প্রায় ব্যারেজের কিনারায় এসে দাঁড়ায়।

'এইঠে গেট বানাইছে, জল আটকি রাখিছে—' বাঘারু বলে। আর, সেই নিজের কাছে বলা কথাগুলোও যে-রকম উড়ে যায় তাতেই তারা বোঝে তাদের ডাইনে থেকে বাঁয়ে, উত্তর থেকে দক্ষিণে বাতাস ছুটে যাচ্ছে। সেই বাতাসে ভর দিয়ে বাঘারু ঘাড় নুইয়ে দেখে, নীচে, কোন পাতালে জল চিকচিক করছে। বাঘারু আরো খানিকটা তাকিয়ে থেকে দেখে নিতে পারে—আরো অনেক দূর পর্যন্ত জলের অস্পষ্ট চিকচিক। এই একটা স্লুইস গেট দিয়ে জল বের করে উদ্বোধন ঘটানোর জন্যে তিস্তায় নানা স্রোতকে দূর-দূর থেকে ছোট-ছোট বাঁধ বেঁধে-বেঁধে এই গেটটার সামনে নিয়ে আসা হয়েছে।

বাঘারু সেই বাঁধগুলো দেখতে পায় না। সে দেখে, নীচে কিছুদূর পর্যন্ত জলের আবছা তরলতা। দেখে, সে বুঝে উঠতে পারে না তিস্তার স্রোত কোন দিক থেকে কোন দিকে বইছে। বুঝে উঠতে পারে না, তিস্তা কোন পথে কোথায় যাচ্ছে। বাঘারু ত তিস্তার ভেতর থেকে তিস্তা দেখে এসেছে—এখন সে কী করে, এত উঁচু থেকে তলায় তাকিয়ে তিস্তাকে চিনে নিতে পারবে।

বাঘারু কিনারা থেকে সরে আসে। হাতের মুঠিতে ধরা মাদারি এখন তার ডান পায়ের সঙ্গে সেঁটে। বাঘারু এবার উল্টো দিকের কিনারার দিকে চলে।

মাদারি জিজ্ঞাসা করে, 'ঐঠে জল বান্ধি রাখিছে ?'

'বান্ধি রাখিছে।'

'ক্যানং করি বান্ধে জল ?'

'না জানো—।'

এখন বাতাস তাদের পেছনে। বাঘারু মাদারিকে বাঁ হাতে নিয়ে নেয়—পেছনেই হাত বাড়িয়ে। মাদারি তার বাঁ পায়ের সঙ্গে সেঁটে। এবার আর অতটা কিনারে যায় না বাঘারু, যেন বাতাস পেছন থেকে তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে পারে। সে বাঁ হাত আর বাঁ পাটা শরীর থেকে সরিয়ে রাখে। মাদারিকে তলায় নদী দেখতে হয় সেই পায়ের বাধার ওপার থেকে। একটু ঝুঁকি দেবার জন্যে মাদারি বাঘারুর পেছনে হাত দেয় শরীরের ভর রাখতে। সেই ভরটা তাকে বদলাতেও হয়। বাঘারু টের পায়, মাদারি মাঝে-মাঝেই তার পেছনে সেই বাঘের থাবাটার ওপর হাত রাখছে। শেষে, সেখানেই রাখে—বাঘারুর পিচ্ছিল শরীরে ঐ বাঘের থাবার অসমতলে যেন হাতের ভর রাখার সুবিধে।

স্লুইস গেট খুলে জল এই দিক দিয়ে বের করা হয়েছিল। বেশিক্ষণ নয়, জল ছিল না। সেই জল এখন এদিকের নানা জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে—বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর যেমন দেখায়। বাঘারু অত উঁচু থেকে অত কিছু দেখতে পায় না কিন্তু জল যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে সেটা বুঝতে পারে।

'এইঠে জল ছাড়িছে, এইঠে', বাঘারু নিজের কাছে বলে বুঝে নেয়। কিন্তু ব্যারেজের সেই তলদেশ থেকে চোখ তুলে তাকে তার আনুমানিক তিস্তার ওপর দিয়ে আবছায়ায় চোখ ছড়িয়ে দিতে হয় তিস্তাকে চিনে নিতে। বহু-বহু ভাটিতে রাত্রির আকাশের তারাগুলোর ভেতর সে যেন দেখতে পায় তার শরীরের তিস্তাকে। কিন্তু নিশ্চিত হয় না। বাঁ হাতটা আরো পেছিয়ে মাদারিকে আগে সরিয়ে বাঘারু সেই কিনারা থেকে সরে আসে।

মাদারি তার পায়ের সঙ্গে লেপ্টে থেকে জিজ্ঞাসা করে, 'জল ছাড়েন ক্যান্‌ং করি ?'

'না জানো, না জানো'—বাঘারু ব্যারেজের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়।

এখন বাঘারু ব্যারেজের ওপর দিয়ে সামনে তাকিয়ে। ব্যারেজ ধরে সে সামনে এগিয়ে যাবে—তার প্রস্তুতি নেয়, তারপর হাঁটা শুরু করে। মাদারি বাঁ হাতেই ধরা, বাঘারুর বাঁ পায়ের সঙ্গে লেপ্টে। আকাশের ভেতর দিয়ে যেন তারা হাঁটে—বাঘারু তলার তিস্তা আর ওপরের আকাশের দিকে যতবারই তাকায় ততবারই মনে হয় আকাশের ভেতর দিয়ে তারা হাঁটছে। আর, আকাশের সমস্ত বাতাস বাঘারু আর মাদারির শরীরের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। এ-বাতাস অনেক ওপরের বাতাস। এর কোনো আওয়াজ নেই কিন্তু বাঘারু শরীর দিয়ে বোঝে সেই নিঃশব্দ বাতাসের জোর কতটা। ব্যারেজের ওপর তার পা দুটো গেঁথে দিতে চায় কিন্তু ব্যারেজের ওপর পা সেঁটে যায় না। বাঘারু তার হাঁটুটায় ভাঁজ ফেলে, যেন প্রস্তুত হয়ে নেয়, এই বাতাস তাকে উল্টে দিতে গেলেই সে মাদারিকে টেনে নিয়ে বসে পড়বে। গভীর বনের ভেতর যে-প্রস্তুতির ভঙ্গি বাঘারুর শরীরগত, এই ব্যারেজে সেই ভঙ্গিতেই বাঘারু প্রস্তুতি খোঁজে। কিন্তু বনের গভীরতাও তার পায়ের চেনা, ব্যারেজের এই উচ্চতার মুক্তি তার চেনা নয়।

বাঘারু জানে না, ব্যারেজটা কতখানি লম্বা। সে শুনেছে বটে ব্যারেজ শেষ হয়নি কিন্তু কোন পর্যন্ত হলে শেষ তা ত আর সে জানে না। এই বাতাসের ধাক্কা সামলাতে-সামলাতে এই আবছায়া ঠেলে এগতে-এগতে তার মনে হয় সে অনেকদূর এসে পড়েছে। সে আর এগবার সাহস পায় না। বাঘারু সামনে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। দাঁড়ানোর পর তার দুই পা ফাঁক করে দেয়—আবার সেই প্রস্তুতিতে। বাঘারুকে মাথাটা একটু পেছনে হেলাতে হয়—বাতাসের বেগ সামলাতে বা সামনের দূরত্বের আন্দাজ পেতে।

মাদারি তার শরীরের ভেতর থেকে চিৎকার করে, 'এইঠে শেষ ? এই ব্যারেজখান ?'

'না জানো।'

মাদারি শুনতে পায় না। সে বাঘারুর বাঁ পা থেকে মাথাটা বের করে এনে আবার চিৎকার করে, 'এইঠে শেষ ? এই ব্যারেজখান ?'

এবার বাঘারু মাদারিকে পেছন থেকে সামনে টেনে আনে—'মোক জোর করি ধরি থাক্—ক্যানং বাতাস !'

মাদারি বাঘারুকে জড়িয়ে ধরে কিন্তু বেড় পায় না। না-পেয়ে ছোট-ছোট হাতদুটো বাঘারুর শরীরে আরো গেঁথে দেয়। তার পর বাঁ হাতটা আলগা করে বাঘারুর পেছনে সেই বাঘের থাবার অসমতলটা খোঁজে যেখানে হাতটা আটকানো যেতে পারে। মাদারি বাঘারুকে চিনে নিয়েছে—তিস্তা বদলে দেয়া এই অজ্ঞাতপূর্ব ব্যারেজের ওপর এই নিশীথিনীতে একসঙ্গে থাকলে যে-দ্রুততায় চিনে নেয়া যায়, চিনে নিচ্ছে। বাঘারু মাদারিকে দুই হাতে তার শরীরে জড়িয়ে ধরে।

মাদারি ঘাড় হেলিয়ে বাঘারুকে জিজ্ঞাসা করে, 'এইঠে শেষ ? এই ব্যারেজখান ?'

'না জানো।'

'এইঠে তিস্তা ? তিস্তা নদী ?'

কথাটার জবাব দেবার জন্যেই হোক অথবা নিজেই সে তিস্তাকে খুঁজছে বলেই হোক, বাঘারু ডাইনে-বাঁয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে।

'না জানো।'

'তোমরালা তিস্তা নদীখান্ না-চেনেন ?'

'না চিনো।'

'এইঠে তিস্তা নদীখান্ তুলি দিছে ?'

'না জানো।'

'নতুন নদী বানাইছে ? এইঠে ?'

'না জানো।'

'তোমরালা এইঠেকার মানষি না হন ?'

বাঘারু জবাব দেয় না।

'জলুশত্ আসিছেন ?'

'মোর কুনো মিছিল নাই।' বাঘারু হাতদুটো মাদারির মাথার চুলের ওপর রাখে আর মাদারি এই মিছিলহীন ও নদীহীন সর্বস্বহারা মানুষটিকে মমতায় আরো জড়িয়ে ধরে। তারপর আধা কৌতুকে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমরালা কি মোর নাখান হারি (হারিয়ে) গিছেন ?'

বাঘারু খুক করে হেসে ফেলে।

পেছনে পুলিশের চিৎকার শোনা যায়, 'এই চইল্যা আইস, টাইম হইয়া গিছে, চইল্যা আইস।'

মাদারি আর বাঘারু ঘুরে দেখে পুলিশ টর্চ ফেলে তাদের ফিরে যেতে বলছে। তারা ফিরে আসতে থাকে।

পুলিশটি তাদের ডেকে ও তাদের ফিরে আসতে দেখেই চলে গিয়েছিল। মঞ্চের তলার পর্দা ঠেলে বাঘারু আর মাদারি যখন সেই তীব্র আলোকিত, ছোট বালুভূমিতে ঢোকে তখন সেখানে আর-কেউ ছিল না। মাদারি বাঘারুকে ছেড়ে দেয়, বাঘারু মাদারির মুঠো আলগা করে দেয়। মাদারি এক পায়ে ভর দিয়ে নাচতে-নাচতে সেই বালুভূমি পার হয়। পেছন ফিরে বাঘারুকে ডাকে, 'আইসেন'। শাদা বালির ওপর তাদের ছায়াদুটো ক্রমেই লম্বা হতে থাকে, শেষে সেই শাদা মাঠের সবটুকু জুড়েই ওদের ছায়াদুটো। যেই তারা আলোর স্তম্ভটা পার হয় অত দীর্ঘ ছায়াদুটো নিমেষে মুছে যায়। ওখানে বাঁশের বেড়া আছে। বাঘারু ও মাদারি সেটা টপকে আপলচাঁদের ভেতর ঢুকবে। আপলচাঁদে এখন জঙ্গলময় জোনাকি। মঞ্চের নীচ থেকে ঐ ফ্লাড-লাইটগুলো পেরিয়ে বাঘারু-মাদারিকে বা সে-সব কিছু দেখা যায় না।

আমরা বাঘারু-মাদারিকে আর অনুসরণ করব না।

বাঘারু তিস্তাপার ও আপলচাঁদ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। মাদারিও তার সঙ্গে যাচ্ছে। যে-কারণে তিস্তাপার ও আপলচাঁদের শালবন উৎপাটিত হবে—সেই কারণেই বাঘারু উৎপাটিত হয়ে গেল। যে-কারণে তিস্তাপার ও আপলচাঁদের হরিণের দল, হাতির পাল, পাখির ঝাঁক, সাপখোপ চলে যাবে—সেই কারণেই বাঘারু চলে যায়। তার ত শুধু একটা শরীর আছে। সেই শরীর এই নতুন তিস্তাপারে, নতুন ফরেস্টে বাঁচবে না। এই নদীবন্ধন, এই ব্যারেজ, দেশের অর্থনীতি বদলে দেবে, উৎপাদন বাড়াবে। বাঘারুর কোনো অর্থনীতি নেই। বাঘারুর কোনো উৎপাদনও নেই। বাঘারু এই ব্যারেজকে, এই অর্থনীতি ও এই উন্নয়নকে প্রত্যাখ্যান করল। বাঘারু কিছু-কিছু কথা বলতে পারে বটে কিন্তু প্রত্যাখ্যানের ভাষা তার জানা নেই। তার একটা শরীর আছে। সেই শরীর দিয়ে সে প্রত্যাখ্যান করল।

সে এখন সারারাত ধরে এই ফরেস্ট পেরবে—যেখানে সে জন্মেছিল। দুটো-একটা রাস্তাও পেরবে। কাল সকালে আবার ফরেস্ট পেরবে। দুটো-একটা হাটগঞ্জও পেরবে। কখনো মাদারির ঘুম পাবে। বাঘারু মাদারিকে বুকে তুলে নেবে। কখনো মাদারি বাঘারুর আগে-আগে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে-দিয়ে রাস্তা বানাবে। মাদারিও ত আর-এক ফরেস্টের সন্তান। এ-রকম হাঁটতে-হাঁটতে যখন বাঘারুর মনে হবে নতুন একটা ফরেস্ট, নতুন একটা নদী খুঁজে পেল, তখন বাঘারু থামবে। সেই নতুন নদী, নতুন ফরেস্টটা বাঘারু এই শরীর দিয়েই চিনবে। বাঘারু জানে না—মাদারি কে, সে কোথায় থাকে, সে কেমন করে ফেরত যাবে। কিন্তু পাঠক ত জানেন—মাদারি কে, সে কোথায় থাকত। এখন, সারারাত, সারা দিন ফরেস্টের পর ফরেস্ট, নদীর পর নদী, হাটের পর হাট পেরতে-পেরতে তাদের কত কথা হবে, তারা দুজন-দুজনকে কত জানবে, তাদের কতবার ঘুম পাবে আর কতবার জাগরণ ঘটবে, তারা দুজন দুজনের পক্ষে কত অপরিহার্য হয়ে উঠবে। সে ত আর-এক স্বতন্ত্র বৃত্তান্ত।

এ-বৃত্তান্ত এখানেই শেষ হোক।

এই প্রত্যাখ্যানের রাত ধরে বাঘারু মাদারিকে নিয়ে হাঁটুক, হাঁটুক, হাঁটুক···